দুই কিশোরী দুই প্রেমিক

সুবোধ ঘোষ

১) টুকুনের অসুখ
২) সমুদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ

দুই কিশোরী দুই প্রেমিক

টুকুনের অসুখ

।। এক ।।

খরা, প্রচণ্ড খরা। কবে কোন বছরে একবার বৃষ্টি হয়েছিল এ অঞ্চলে, কবে কোন বছরে সবুজ শ্যামল মাঠ ছিল এ অঞ্চলে— মানুষেরা যেন সব তা ভুলে গেছে। গ্রাম মাঠ খা খা করছে। নদী-নালা সব হেজে মজে গেছে। শুকনো বাতাস আর মাঠে মাঠে শুধু ধুলো উড়ছে।

ফাল্গুন মাস, বৃষ্টি হচ্ছে না। মনে হয় কোন দিন আর বৃষ্টি হবে না, মাঠে শুধু ধুলো উড়ছিল। গরু-বাছুর নিয়ে দেশ ছেড়ে মানুষেরা সব চলে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের মত ধান-চাল নেই, মাঠে শস্য নেই। দু'সাল হল দুর্ভিক্ষের মত চলেছে।

গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ সব জলবিহীন। নদী যেখানে গভীর ছিল সেখানে সামান্য মাটি খুঁড়ে গত সালেও জল পাওয়া যেত—এবার তাও নেই।

যা কিছু অবশিষ্ট মানুষ গ্রামে রয়েছে, নারী যুবক-যুবতী, ছেলে-বুড়ো সকলে মাটি খুঁড়ছিল নদীর ভিতর। ভিতর থেকে যদি সামান্য পরিমাণ জল পাওয়া যায়। সামান্য জল পেলে ওরা সংরক্ষণ করে রাখবে। অন্তত আগামী বর্ষা পর্যন্ত ওরা সেই জল নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি সকলের আগে আগে কাজ করছিল। তার হাতে যেন গুপ্তধন আবিষ্কারের চাবিকাঠি। সে দাগ দিয়ে যাচ্ছিল লাঠি দিয়ে। বালির ওপর একটা করে গুপ্ত চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। আর প্রতিটি গুপ্ত চিহ্ন প্রায় ত্রিশ হাত থেকে চল্লিশ হাত দূরে, এঁকে-বেঁকে গেছে অনেকটা সাপের মত— কারণ কেউ জানে না নদী কোথায় অন্তঃসলীলা। এ নদী যদি মরে যায়, মানুষরা তবে সব মরে যাবে। ওদের হাতে সামান্য শস্য—দু'সাল আগের সমান্য শস্য— সঞ্চিত শস্য এখন প্রায় নিঃশেষ, তবু এই জল পেলে তৃষ্ণার হাত থেকে বাঁচবে, জল পেলে পাতা ঘাস এবং অন্য যা কিছু আছে এ অঞ্চলে, পাহাড়ে, ছোট পাহাড় অঞ্চলে এখনও যেসব লতাগুল্ম রয়েছে, তার শিকড়-বাকড় আছে, বনআলু রয়েছে, জল পেলে যে কোনভাবে সিদ্ধ করা যাবে, খাওয়া যাবে, খেলে পরে এ বর্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে।

এই মাটি, বাপ-পিতামহের মাটি। সোনার ফসল হত মাটিতে। সব

ফসল হায় কোথায় এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বৃদ্ধ লোকটির হাতে লাঠি। সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। নদীর দু' ধারে ছোট ছোট পাহাড়। ঝরনার জল আর নামছে না। গাছে গাছে কোন পাখির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই যেন মন্বন্তরের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে।

বৃদ্ধ হেঁটে যাচ্ছেন, মাটিতে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিচ্ছেন। একজন করে মানুষ কেউ চিহ্নের ওপর বসে পড়ছে মাঠ খোঁড়ার জন্য। যেখানে জলের সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানেই পরদিন জড় হব সব অন্য মানুষেরা — সরাদিন খেটে জল বের করবে। নিজেরা জল ভরে রাখবে ঘড়াতে। জলের জন্য ওরা মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ মানুষটিকে মোজেসের মত মনে হচ্ছিল। লম্বা আলখেল্লার মত জামা গায়, পায়ে নাগরী জুতা, মাথায় ফেটি বাঁধা। উঁচু লম্বা মানুষ, চুল ছোট করে ছাঁটা, শক্ত সব রেখা — যেন দেখলেই মনে হয় মানুষটা আজ হোক কাল হোক এ অঞ্চলে জল নিয়ে আসবে।

গেরস্থের বৌরা, বিবিরা, যুবক যুবতীরা ছোট-বড় সকলে লম্বা লাইন দিয়ে এঁকে বেঁকে জলের জন্য মাটি খুঁড়তে বসে গেছে। বৃদ্ধ যেখানে পাহাড়ের ঢালু জায়গাটা ছিল, সেখানে উঠে দাঁড়ালে, পেছনে প্রায় দু-তিন মাইল পর্যন্ত শুধু নদীর বালি চোখে পড়ে — খরার জন্য, গ্রীষ্মের জন্য বালি চিক্ চিক্ করছিল। নদীটাকে এখন মরা একটা সাপ মনে হয়। আবার মনে হয় — চিত হয়ে আছে অজগরটা। এক লম্বা অজগর — দু-তিন মাইল লম্বা, চার মাইল লম্বা, আর ও কত লম্বা হবে কে জানে, দিগন্তের দিকে ছুটে গেছে — যেন নদীটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কারু জানা নেই।

পাহাড়ের পর পাহাড়, কোথাও সমতল মাঠ আবার পাহাড়, ছোট পাহাড়, কত রকমের লাল-নীল পাথর, পাহাড়ে কত রকমের গাছ-গাছালি, গুল্মলতা আর কত রকমের পাখি ছিল। সব পাখিরা উড়ে চলে গেছে। গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে। গাছগুলো মৃতের মত পাহাড়ময় দাঁড়িয়ে — সমতল ভূমিতে সব কুঁড়ে ঘর, খড়ের চাল। ঝোপে-জঙ্গলে শুধু শুকনো পাতার খস খস শব্দ। ঘাস আর নেই। মাটির নীচে ঘাসের শেকড় মরে যাচ্ছে। বৃদ্ধের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা।

ঠিক সামনেই বালুবেলাতে এই অঞ্চলের ছোট ছেলেটি বসে মাটি খুঁড়ছিল। বৃদ্ধ দেখল ছোট ছেলেটি সকলের শেষে মাটি খুঁড়তে বসেছে। ওর গায়ে লম্বা ঝুলের জামা। জামাটি ওর নয়, সুদিনে কি দুর্দিনে ওর বাবা হয়তো তৈরী করেছিল। পার্বণের দিনে ওর মা-বাপ একবার মেলায় গিয়েছিল এবং পরে, এই মাস দুই পরে হবে, ওলাওঠায় বাপ-মা দু'জনই গেছে। তখনও সামান্য জল ছিল পাতকুঁয়াতে, সামান্য জল তুলে রাখা যেত। এখন এই সামান্য বালক হাতে একটা খুরপি। পিঠের

নীচে বাঁশের এক হাত লম্বা একটা চোঙ। ভিতরে কিছু যত্ন করে রেখে দিয়েছে মনে হয়। বালিমাটি খোঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই লম্বা চোঙ থেকে ম্যাজিকের মত ছোট একটা পাখি বের করে আনছিল এবং বোধ হয় শুকনো বটফল খাওয়াচ্ছিল। সে, এই বালক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে দেখে পাহাড়ের ঢালু থেকে হেঁকে উঠল — হেই সুবল।

দূরে দূরে এই হাঁক ভেসে যাচ্ছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল।

সুবল তাড়াতাড়ি পাখিটাকে বাঁশের চোঙের ভেতরে ভরে মুখটা সামান্য একটা ছোট্ট কাঠ দিয়ে ঢেকে দিল, তারপর আপন মনে এবং এক নাগাড়ে সে মাটি খুঁড়তে থাকল। দলের লোকেরা মাটি খুঁড়ছে। ওদের কোচড়ে শুকনো চানা ছিল। ক্ষুধার জন্য ওরা শুকনো চানা চিবিয়ে খাচ্ছিল। শুকনো চানা গালে এবং দাঁতের ফাঁকে সাদা অথবা হলুদ রঙের ফেনা তুলছে। দেখলেই বোঝা যায় ওরা জলের বিনিময়ে নিজের রক্ত চুষে তৃষ্ণা নিবারণ করছে। মানুষগুলোর মুখ, যুবতীর মুখ, বৌ-বিবিদের মুখ, মিঞা-মাতব্বরদের মুখ যন্ত্রনায় ছটফট করছিল, বৃদ্ধের জন্য ওরা এখনও গ্রাম ছেড়ে পালায় নি, যেন একা বৃদ্ধ সকলকে আটকে রেখেছে। সকলকে বলছে — কোথাও না কোথাও নদীর অন্তঃস্তলে জল আছে, আমাদের এই জল অনুসন্ধান করে বের করতে হবে।

নদী অন্তঃসলীলা। বৃদ্ধ বড় একটা অর্জুন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভাবল, নদী অন্তঃসলীলা। নদী কোথাও না কোথাও এইসব লোকালয়ের জন্য জল সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছে। কি এমন পাপ ছিল, কি এমন জঘন্য অপরাধ ছিল মানুষের, যার জন্য হায়, ঈশ্বর বাধ সাধলেন। বৃদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি মানুষের দুঃখ অনন্তকাল ধরে সহ্য করেন না। তিনি নিশ্চয় সরল এবং গরীব এই মানুষগুলোর জন্য নদীর বালুগর্ভে জল সঞ্চয় করে রেখেছেন।

শুধু এখন প্রচেষ্টা। সমবেত প্রচেষ্টা। আজ প্রায় পনের দিন ধরে এই সমবেত প্রচেষ্টা — জলের জন্য সপ্তাহে যে মোষের গাড়ি তিনটি আসে, যারা জল আনতে বিশ ক্রোশ দূরে যায় — তাদেরও ক'দিন ধরে আর দেখা নেই। লোকগুলো জলের অভাবে মরে যাবে এবার।

শহর অনেক দূরে — শহরের দিকে যে গেছে সে আর ফেরে নি। ক্রমশ এক-দুই করে গ্রামের মানুষেরা সরে পড়ছে। বৃদ্ধের দু'চোখ জ্বালা এবং যন্ত্রণায় জ্বলছিল। মানুষগুলো বলে দিয়েছে আজই ওরা শেষ চেষ্টা করবে, জল না পেলে শহরের দিকে চলে যাবে। গ্রামে আর একজন মানুষও থাকবে না। মাঠ এবং নদী ভেঙ্গে ওরা সকলে শহরের দিকে চলে যাবে।

দুপুর পর্যন্ত জল পাওয়া গেল না। বালিয়াড়ি তেতে উঠেছে। উত্তপ্ত এই বালিয়াড়িতে মানুষগুলো বসে থাকতে পারছিল না। ওরা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে

আট-দশ-বারো হাত পর্যন্ত গর্ত করে ফেলেছে, ভিতরে ঠাণ্ডা ভাব, অথচ জলের কোন চিহ্ন নেই।

পাহাড়ের ওপারে রেল লাইন। দুপুরের গাড়ি চলে যাচ্ছে। পাহাড় এবং মাঠ অথবা দিগন্তের ওপারে ওই রেলের হুইসল ওদের বুকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যেন। ওরা এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল — এই ট্রেনে উঠলে অনেক দূরে এক শহর আছে, বড় শহর, বড় ইটের সব বাড়ি, আকাশ ছুঁয়ে আছে সেই সব উচু বাড়ি, কলকারখানা এবং নদীর ওপরে বড় জাহাজ, নদীতে কত জল, জলের জন্য বালি খুঁড়ে মরতে হয় না, সুতরাং সেই বড় শহরে চলে যাবার হাতছানি ওদের মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

বৃদ্ধ মানুষটি অর্জুনগাছের নীচে বসে দূরে, বহু দূরে যাদের এখান থেকে পিঁপড়ের মত মনে হচ্ছিল — লম্বা বালিয়াড়ি, দিগন্তে ভেসে গেছে এই নদী, সোজা, কোথাও সামান্য বেঁকে নদীর বালুবেলা সূর্যের উত্তাপে আগুনের মত ঝলসে যাচ্ছিল। মানুষগুলোকে কালো কালো কীট-পতঙ্গের মত মনে হচ্ছে। যেন একটা বড় পিঁপড়ের সারি নদীর মোহনা খোঁজার জন্য নদীর ঢালুতে নেমে যাচ্ছে। পাহাড় উঁচু বলে এবং এখানে সামান্য ছায়া রয়েছে বলে, ঝোপজঙ্গলের শেষ সুষমাটুকু নষ্ট হয় নি। বৃদ্ধ কোথায় এবং কোনদিকে গেলে বনআলু প্রচুর সংগ্রহ করা যেতে পারে — অর্থাৎ এই মানুষ যিনি আপ্রাণ তার মানুষের বেঁচে থাকার এলাদ সংগ্রহের জন্য ভেবে চলেছেন।

কবে একবার এ-অঞ্চলে মহারানীর মত এক সম্রাজ্ঞী এসেছিল — খরা অঞ্চল তিনি দেখে গেছেন। বড় বড় পরিকল্পনা হচ্ছে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই — জল এ অঞ্চলে আজ হোক কাল হোক আসবে। মানুষগুলো সম্রাজ্ঞীর কথায় প্রাণের ভিতর জীবনধারণের আকুল ইচ্ছায় গ্রাম ছেড়ে পালায় নি। ওরা দিনের পর দিন জলের জন্য অপেক্ষা করছে। জল আসবে। এই গ্রীষ্মের খরা রোদ আজ হোক কাল হোক মরে যাবে। ওরা সকলে একবার আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাল, কোন দিগন্তে যদি সামান্য মেঘের আভাস চোখে পড়ে। কোথাও কোন মেঘের আভাস নেই। খালি আকাশ। নীল হরিদ্রাভ বর্ণ, যা শুধু মাঠের ওপর এবং ঘাসের ওপর আগুন ছড়াচ্ছে।

ঘাস নেই, শুকিয়ে কবে ধুলোবালির সঙ্গে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে অন্য কোন নদী অথবা মাঠের ছায়ার সঙ্গে যেন বাতাসে ভেসে চলে গেছে। মানুষগুলো এখন কোন মেষপালকের মত আজগুবি স্বপ্ন দেখছিল। কারণ দুপুরের রোদে, কবে একবার ওরা পেট পুরে তৃষ্ণার জল পান করছিল মনে নেই — মানুষগুলো সব ঝিমিয়ে পড়ছে। ওদের হাত অসাড় হয়ে পড়ছে। চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ঘুরছে। ওরা উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল না। কারণ সারাদিন মাটি খুঁড়ে ওরা জলের সন্ধান পেল না। ওরা ক্লান্ত।

এবং প্রায় হতচেতন। ওরা প্রায় কিছুই ভাবতে পারছিল না। ওরা বালিয়াড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এবং এক আজগুবি স্বপ্ন সেই মেষপালকের মত। হাতে বড় এক শক্ত লাঠি মেষপালকের — আগুন, লাঠি তুললে আগুন। জল, লাঠি তুললে জল। অন্নবস্ত্র, লাঠি তুললে অন্নবস্ত্র। এমন এক মানুষ কি তাদের জন্য কোথাও অপেক্ষা করছে না! যে তাদের জন্য এই মাটিতে জল নিয়ে আসবে। অন্নবস্ত্র নিয়ে আসবে।

ঠিক তখনই অর্জুনগাছের নীচ থেকে বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠল। বলল, তোমরা সকলে উঠে এস।

সেই শব্দ আবার পাহাড়ের সঙ্গে সমতল ভূমিতে এবং ঢালু বালিয়াড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে নেমে গেল। মানুষগুলো কোন স্বপ্নলব্ধ আদেশের মত সেই উঁচু পাহাড়ের দিকে যেতে থাকল।

সেই বালকটি তার পাখিটাকে চোঙের ভিতরে রেখে পিঠে ছোট্ট একটা হুক দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তার সঙ্গে টিনের থালা-মগ ছিল একটা এবং সমান্য কাপড়জামা। কালো নোংরা পুঁটলিটা সে পিঠের বাঁ দিকে ঝুলিয়ে সকলের সঙ্গে উঠে যেতে লাগল পাহাড়ের দিকে।

বৃদ্ধ পাড়ড়ের নীচে সমান্য এক সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে অনুসন্ধান করে এই স্থানটুকু আবিষ্কার করেছে। কিন্তু গুল্মলতা দেখে সে বুঝে নিয়েছিল এই মাটির নীচে রসাল এক রকমের শিকড় রয়েছে। সুতরাং খুঁড়ে খুঁড়ে এক পাহাড় রসাল শেকড় তুলে রেখেছে। তার শক্ত বাহু কাজ করার জন্য বড় বেশি পাথরের মত কঠিন মন হচ্ছিল।

বৃদ্ধ সকলকে প্রায় সমানভাবে ভাগ করে দিল। এবং বলল, চুষে খাও। তোমাদের তেষ্টা নিবারণ হবে।

মানুষগুলোর কাছে এই বৃদ্ধ মোজেসের মত। এই দুর্দিনে এই একমাত্র মানুষ যে তাদের আশা দিয়ে বাঁচবার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। তিনি কেবল বলছেন, জল হবে। এবার বর্ষার জল হবে। জল হলে নদীর সব জল আমরা নেমে যেতে দেব না। বাঁধ দিয়ে আমরা জল আটকে রেখে দেব। সুদিনে দুর্দিনে জল আমাদের কাজে আসবে।

বৃদ্ধ আরও বলছিল, এই মাটি সোনার ফসল দেবে। এই মাটি ছেড়ে কোন শহরে চলে যাবি — ভিখারি বনে যাবি, এই মাটিতে জল হলে আমরা সকলে মিলে সোনার ফসল ফলাতে পারি। বৃদ্ধ এইটুকু বলে পিতামহের আমলের এক মন্বন্তরের গল্প শোনাল।

সুবল কান খাড়া করে রাখল। নানা রকমের বীভৎস দৃশ্য চোখের ওপর ভাসছিল সুবলের। বৃদ্ধ পুরাতন এক মন্বন্তরের গল্প শুনিয়ে বলল, সংসারে এমন হয় মাঝে মাঝে। তাতে ভেঙ্গে পড়লে চলে না। মানুষ, গরু-বাছুর পথে-ঘাটে মরে পড়ে থাকে। ঘরের ভিতর মৃতের দুর্গন্ধ। মহামারী আসে। গ্রামের পর গ্রাম ক্রমশ খালি হয়ে যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে ধূলোর ঝড় উঠেছে। ওরা দলবেঁধে হাঁটতে থাকল। ওরা জানতো, এই সামনের ঢালু বেয়ে নেমে গেলে বড় এক পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে। তারপর দু'ক্রোশের মত হেঁটে গেলে রেল-লাইন, লাইনের ধারে লঙ্গরখানা খুলেছে সরকার, সেখানে পৌঁছুতে পারলে এক হাতা খিচুরি পাওয়া যাবে। এই সামান্য আহার সারা রাত্রির জন্য ওদের সামান্য শান্তি দেবে। তারপর ফের আগামীকাল নদীর ঢালুতে জলের সন্ধান চলবে। ক্রমশ এভাবে চলবে। কতদিন চলবে এভাবে ওদের জানা ছিল না। শুধু বৃদ্ধ আগে আগে হাঁটছে। হাতে লাঠি। সে মাঝে মাঝে হাতের লাঠি আকাশের দিকে তুলে দিচ্ছে, পথে-ঘাটে গরু-বাছুর মরে পড়ে ছিল, পচা দুর্গন্ধ। কোন গ্রামে ওরা মানুষের চিহ্ন দেখতে পেল না। কেবল দূরে ট্রেনের হুইসল শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

ওরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় রেল-লরইনের ধারে পৌঁছাল। গ্রামটাকে উৎসবের মত মনে হচ্ছিল। বড় বড় কড়াইয়ে খিচুরি রান্না হচ্ছে। দূর দূর গ্রাম থেকে সব মানুষেরা এসে বসে রয়েছে। বড় বড় অর্জুন গাছের নীচে খড়-বিচালি বিছিয়ে বৌ-বিবিরা শুয়ে আছে, খাবার হয়ে গেলে টিনের থালা এবং মগ নিয়ে সকলে লাইন দেবে। অবশ্য শিশুদের এবং বালক-বালিকাদের খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। ওরা খেলে খাবে বুড়ো-বুড়িরা, এবং বৌ-বিবিরা। তারপর যুবক এবং মরদ মানুষেরা।

উৎসবের মত এই গ্রাম। ব্যাজ পরা একদল মানুষ। বড় বড় তাঁবু খাটানো হচ্ছে। ডে-লাইট জ্বলছে, কোন পরিত্যক্ত ধনী গৃহস্থের বাগানবাড়ি হবে এটা। প্রায় দশ-বারোটা উনুনে লোহার বড় বড় কড়াইয়ে খিচুরি ফুটছে। ত্রিপাল গোল করে মাটির গর্তে খিচুরি রাখা হচ্ছে। বড় বড় কাঠের হাতা নিয়ে বড় বড় বালতি নিয়ে ব্যাজ পরা মানুষগুলো ছুটোছুটি করছে। কিছু লোক কোথায় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, একদল স্বেচ্ছাসেবক সেদিকে ছুটল। ওরা লুকিয়ে খাবার চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

বড় বড় মোষের গাড়িতে শহর থেকে জল এসেছে। বড় বড় মাটির জালা জল ভর্তি ছিল, এখন সেই জল নিঃশেষ। কেউ খিচুরি খাবার পর এক ফোঁটা জল খেতে পারছে না। মানুষগুলোর মুখে বিরক্তির ছাপ এবং উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে।

জল নেই, খাবার জল নেই। এই অঞ্চলে — পাঁচ-সাত ক্রোশ এমন কি দশ ক্রোশ হবে জল নেই — খাবার জল নেই, পাতকুঁয়াতে কোথায় সামান্য জল একজন গেরস্থ মানুষ লুকিয়ে রেখেছিল — সেখানে খণ্ডযুদ্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের। কারণ কে যেন বলছিল এই দুর্দিনে জল লুকিয়ে রাখতে নেই।

তখন তাঁবুতে তাঁবুতে সরকারের লোক সব ফিরে যাচ্ছিল। জলের কথা বললে ওরা না শুনি না শুনি করে পেতল-কাঁসা যা ছিল কিছু সামনে

তা দিয়ে কান ঢেকে দিল। অর্থাৎ ওরা কিছু শুনতে চাইল না। উপরন্তু তাঁবু থেকে হ্যাট পরা মানুষটা বের হয়ে বলল, কাল থেকে লঙ্গরখানা বন্ধ। কতদিন বন্ধ থাকবে জানা নেই, গুদামখানায় চাল-ডালের মজুত শেষ। আবার কোথা থেকে গম আসছে, আসার যদি কথা থাকে তবে এখানে দু'চারদিন রুটি মিলতে পারে আবার নাও মিলতে পারে। সরকারের লোকটি নিজের দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তাঁবুর ভিতর ঢুকে গেল।

মানুষগুলো, কত মানুষ হবে— প্রায় হাজার মানুষ, ছেলে-বৌ-বিবি নিয়ে হাজারের ওপর হতে পারে, বিশেষ করে সুবল, যার বাঁশের ভেতর ময়না পাখির বাচ্চা, বাচ্চাটাকে সুবল একটা মরা গাছের নীচে কুড়িয়ে পেয়েছিল। কারণ পাখিরা পর্যন্ত ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, জলের অভাবে, শস্যের অভাবে এখন আর কোন পাখি পর্যন্ত ডাকে না— সুবল সেই মরা গাছের ডালে একটা ভাঙা বাসা দেখেছিল। বোধ হয় পাখিটা বাসা থেকে পড়ে গেছে। পাখিটা জলের জন্য অথবা ক্ষুধায় দু' ঠোঁট ফাঁক করে দিচ্ছিল— সুবল পাখি নিয়ে ছুটে ছুটে ওর যে শেষ সামান্য সঞ্চিত জল ছোট কাঁচের শিশিতে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই জল থেকে প্রায় মধুর মত একটু একটু করে জল দিতেই পাখির বাচ্চাটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। সুবল হাতে তালি বাজাল এবং এত বড় খরা চলেছে, মন্বন্তর এসে গেল দেশে— এই পাখি মিলে যাওয়ায় ওর ভয় যেন সব কেটে গেল। সেই সুবল যাকে দেখলে এখন ভিড়ের মধ্যে মনে হল বড় কাঙ্গাল, সরল সহজ— গোবেচারা সুবল পিঠে বাঁশের ভেতরে পাখি নিয়ে এগিয়ে গেল। বলল, আমরা খেতে না পেলে মরে যাব।

তাঁবুর ভিতরে বোধ হয় কি নিয়ে হাসি-মসকরা হচ্ছিল। ওরা খুব জোরে হাসছে। ওরা সুবলের কথা শুনতে পায় নি। সুতরাং সুবল পেছনের দিকে তাকাতেই দেখল সেই বৃদ্ধ লাঠি উঁচু করে রেখেছে। যেন এই লাঠিতে মোজেসের প্রাণ আছে। লাঠি এখন ওদের সব আশা পূরণ করবে। সে লাঠি তুলে ওপরে কি নির্দেশ করতেই সকলে বুঝে নিল, ওদের এবার এ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। ওরা বৃদ্ধের কথামত পিছনে পিছনে চলতে থাকল। তাঁবুর চারিপাশে পুলিশ ছিল কিছু . . . ওদের হাতে বন্দুক ছিল, গ্রামের মানুষেরা হিংস্র, ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠছে অথচ এই বন্দুক দেখলে তাদের প্রাণ শুকিয়ে যায়— ওরা অর্থাৎ এই— এই মানুষেরা, যারা হা-অন্নের জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকছে, তাদের নীরবে অন্ধকারে নেমে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না।

অন্ধকারে বৃদ্ধ বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি সুবল?

—জানি না কর্তা।

—আমরা কোথাও যাচ্ছি না। আমরা এই পাহাড়ের ওপর আগুন জ্বেলে দেব। সব পুড়িয়ে দেব। যখন মাটি এত নেমকহারাম ঈশ্বর এত

বেইমান — যখন বৃষ্টি হচ্ছে না, যখন ঘাসমাটি পুড়ে গেল সব তখন আমরা আগুন জ্বেলে বাকি যা আছে সব পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাব শহরে।

কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন রুখে উঠল। বলল, আমরা জল খেতে চাই কর্তা। তুমি সারাদিন বালুর ভিতর পুরে রেখেছিলে জল দেবে বলে, কিন্তু জল কই ?

দলের ভিতর শিশুদের কান্না, জল খাব। ওদের সকলের ভয়ঙ্কর তেষ্টা। বৃদ্ধ নিজেও তেষ্টায় মরে যাচ্ছে। ভিতরে এক ভয়ঙ্কর হিংস্রতা কাজ করছে। ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি পাল্টায়। মনে হয় এই মাটি সোনার ফসল দেবে, আবার মনে হয় জল বুঝি এখানে আর কোন দিন হবে না, মাটি আর সোনার ফসল দেবে না। সব শুকিয়ে যাবে তারপর একদিন এই অঞ্চল মরুভূমি গ্রাস করে নেবে।

তখন দূরে ট্রেনের হুইসল। বড় একটা ট্রেন বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে। কোথায় এক দিল্লী বলে শহর আছে, কোথায় এক কলকাতা বলে নগর আছে, সেখানে ট্রেনটা যাবে। দিল্লী থেকে কলকাতা। বৃদ্ধ এবার লাঠিটা শক্ত করে ধরে ফেলল। তারপর সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা এই লাইনের ওপর বসে যাও। শহর থেকে নগরে যাবার জন্য বড় ট্রেন আসছে। আজ আমরা ট্রেনটা থামিয়ে দেখব কি আছে, যদি ভিতরে জল থাকে, তবে আমরা জল নিয়ে চলে যাব। জলের জন্য অন্নের জন্য আমাদের এই দস্যুবৃত্তি। আমাদের কোন পাপ হবে না।

সুবলের ভয় ছিল, ট্রেনটা হুড়মুড় করে এসে ওপর উঠে যেতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, কর্তা, আমরা যে তবে সব মরে যাব।

— মরে যাবে কেন ?

— ট্রেনটা আমাদের ওপর দিয়ে চলে যাবে।

— আরে না, ট্রেন মানুষের ওপর দিয়ে যায় না। এতগুলো লোক দেখলেই ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দেবে।

কর্তামানুষ এই বৃদ্ধ, এ অঞ্চলের পুরোহিত মানুষ, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে প্রবল সুতরাং সুবলের আর কোন ভয় থাকল না। সে তার পাখি পিঠে রেখে দিল, সে তার ঝোলাঝুলি, বগলের নীচে ঝুলিয়ে রাখল। সুবল অন্ধকারে টিপে টিপে দেখল ঝোলাঝুলিতে ওর সংগ্রহ করা পোকামাকড়গুলো রয়েছে কিনা! কারণ সে খুব ভোরে উঠে পোকামাকড় সংগ্রহ করে রেখেছে পাখিটার জন্য! খুব ভোরে উঠে সে পাখিটাকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা করেছে। কারণ তখন প্রবল খরা থাকে না, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকে, এবং খুব ভোরেই পাখিটা যেন সামান্য সতেজ থাকে। তারপর সূর্য ওঠার সঙ্গে পাখিটা গরমে ছটফট করতে থাকে। সুবলের মনে হয় তখন সে পাখিটাকে আর বুঝি বাঁচাতে পারবে না। সে যখনই সামান্য অবসর পায় পাখিটাকে বাঁশের চোঙ থেকে তুলে এনে হাতের ওপর বসিয়ে রাখে। এবং

নিজে সূর্যের দিকে পিঠ রেখে পাখিটাকে ছায়া দেয়। যদি ফুরফুরে হাওয়া থাকে তবে পাখিটাকে হাওয়া লাগাবার জন্য হাতের কব্জিতে বসিয়ে সে আপন মনে শিষ দিতে থাকে এবং গ্রাম্য কোন সঙ্গীত অথবা লোকগাথা সে কবিতার মত উচ্চারণ করতে করতে এই প্রবল খরা, মন্বন্তর আসছে, দুর্ভিক্ষ সারা দেশে, আবার ওলাওঠা মহামারীর আকারে দেখা দিচ্ছে, সুবল পাখিটাকে রক্ষা করার জন্য সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে এখন সে অন্য কোথাও পালাতে পারলে বাঁচে।

ভয়ঙ্কর অন্ধকার। এতগুলো মানুষ নিঃশব্দে হাটছে। শুকনো পাতার শুধু খস খস শব্দ উঠছিল। ওরা প্রায় সকলেই বনবেড়ালের মত চুপি চুপি রেল-লাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের কান্না মাঝে মাঝে বড় ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছিল।

শাল গাছের জঙ্গল আছে। অন্ধকারে গাছের ডাল-পালাগুলোকে খুব ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল। কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। কোন গ্রাম থেকে একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। মাঝে মাঝে শেয়ালের চিৎকার রাতের অন্ধকারকে তীক্ষ্ণ খোঁচা মারছিল — কারণ দূরে অথবা আশে-পাশে শেয়ালের চিৎকার — আর এক ঝিল্লির ডাক, মনে হয় এই সংসারে জীবনধারণের উপযোগী আর কিছু থাকল না, কোন আলো অথবা হাওয়া, সর্বত্র ভয়াবহ মৃতের গন্ধ শুধু।

বৃদ্ধ পুরোহিত রেল-লাইনে ওঠার আগে বললেন, বিবি-বৌদের এবং শিশুদের আলাদা রেখে দাও। ওরা বড় কড়ুই গাছের নীচে বসে থাকুক।

বৃদ্ধ এবার যুবকদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা হাতে সামান্য কাপড় নাও। ট্রেনের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাত ওপর তুলে গাড়ি থামাবার নির্দেশ দেবে। বৃদ্ধ পুরোহিত এইসব বলে রেলের লাইনে কি নুয়ে যেন দেখল। তারপর সে সকলের আগে হাতে সেই লাঠি, পুরোহিত নিজের হাতে লাঠি নিয়ে সামান্য সময় স্থির হয়ে দাঁড়াল। অপলক সে যেন কিছু দেখছে, — অন্ধকার, না এই জগৎ-সংসার, না পূর্বস্মৃতি তার কাজ করছিল। কি ছিল এই অঞ্চলে। বড় মাঠে সোনার ফসল ছিল, বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, গোয়ালে বড় বড় গরু, মোষ ছিল, শীতের সময়ে রামায়ণ-গান ছিল, আর গ্রীষ্মকালে ঢোলের বাজনা ছিল, রামাইই গান ছিল। এখন সব নিঃশেষ। কেবল ভয়, যা কিছু সামান্য মানুষ আছে তারাও চলে যাবে সব বাড়ি ছেড়ে। ভয়, মহামারী, মন্বন্তর এসে গেল। সামান্য খয়রাতি সাহায্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে আর কি থাকল মানুষগুলোর, কি জন্য আর অপেক্ষা করা। এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে মানুষগলো বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বৃদ্ধ পুরোহিত অন্ধকারের ভিতর কোন আলোর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না।

ট্রেনটা বোধ হয় তখন নদী পার হচ্ছিল, কোন বড় সেতু পার হচ্ছিল, অথবা বাঁকের মুখে কোন পাহাড়ের ভিতর ট্রেনটা ঢুকে যাচ্ছে — সুতরাং গম

গম, খুব দূর থেকে গম গম শব্দ, মনে হয় খুব দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দ, যেন হাওয়ায় ভর করে শব্দটা কানের পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তারপর সেই আলো, ট্রেনের আলো, দূর থেকে ওরা ট্রেনের আলো দেখতে পেল। ট্রেনটা যত দ্রুত এগিয়ে আসছে তত ওদের বুক ভয়ে দুরু দুরু করছিল। তত ওরা মরিয়া হয়ে উঠছে। যেন ওরা কোন দীর্ঘ মরুভূমি পার হবে এখন — সুতরাং সকলের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, সকলের রক্তে এক অমানুষিক উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে।

হাড়গোড় বের করা মানুষগুলোর দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছে না। লাইনের ওপর যেন শত শত কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষদের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, স্নান না করার জন্য চুল শনের মত হয়ে গেছে, গায়ে খড়ি ওঠা, পেটের ভিতর যন্ত্রণা, ক্ষুধার যন্ত্রণা। সামান্য লঙ্গরখানার দান এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতেই হজম হয়ে গেছে।

ওরা সকলে আলোটা দেখে ভয় পাচ্ছে। ওরা এই ভয়ের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওরা অন্ধকারে পরস্পর মুখের দিকে তাকাল। বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন। দৈত্যের মত ঝড়ের বেগে ট্রেনটা ছুটে আসছে, পাহাড়ের ওপর পড়লে রক্ষা থাকছে না। সব মানুষগুলোর রক্তে এই লাইন ভেসে যাবে, শকুনের আর্তনাদ শোনা যাবে দূরে — বৃদ্ধ ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন ডেকে উঠল, জল চাই, আমরা জল চাই।

সঙ্গে সঙ্গে সুবল ওর পাখিটাকে বুকের কাছে এনে বলল, হ্যাঁ, আমরা জল চাই, জল চাই।

যুবক-যুবতীরা বলল, জল চাই, জল চাই।

কড়ুই গাছের নীচ থেকে বৌ-বিবিরা চিৎকার করে উঠল, জল চাই জল চাই।

ভূতের ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন ওই মানুষগুলো জল চাই, জল চাই বলে হরি নামের মত মন্ত্র উচ্চারণ করছে। এই উচ্চারণ কেবল দীর্ঘ মাঠে শব বহনকারী মানুষের কান্নার মত শোনাচ্ছে। বড় মাঠ সামনে, লাইনের পাশে বড় পাহাড়, শাল গাছের মাথায় ভাঙ্গা চাঁদের আবছা অন্ধকার, এতগুলো মানুষের ভয়াবহ কণ্ঠ চারপাশের পরিবেশকে খুব বিষণ্ণ করে তুলছে।

ট্রেনটা হুইসল দিচ্ছে, ড্রাইভার টের পেয়ে গেছে বুঝি। আবছা আবছা কি যেন দেখা যাচ্ছে লাইনের ওপর। প্রথম কুয়াশার মত মনে হচ্ছে, তারপর মনে হচ্ছে মরীচিকার মত হাজার সরল রেখা পুতুল নাচের দড়িতে ঝুলছে।

ড্রাইভার চোখ মুছে নিল। এই অঞ্চলে ভয়ঙ্কর খরা চলছে, এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল বৃষ্টিপাত নেই এবং এই অঞ্চলে মহামারী আরম্ভ হয়ে গেছে — ড্রাইভার চোখ মুছে ভাল করে দেখে নিল। কিছুদিন আগে ড্রাইভার

দেখেছে দূরের মাঠে সব মৃত গরু-বাছুর-মোষ, হাজার হবে প্রায়, লাইনের ধারে ধারে মরে আছে। মাঝে মাঝে সে মৃত মানুষের মুখও দেখেছে। লোকালয়ে আর কোন লোক নেই, সকলে শহরে গঞ্জে চা-বাগানে এবং দূরদেশে চলে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর দুর্দিন মানুষের।

আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা বাঁক নিলে ড্রাইভার টের পেল, শত শত কঙ্কাল যেন লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ভূতের মত নৃত্য করছে। সে এবার প্রাণপণে রড চেপে ধরল, প্রাণপণে সে হুইসল বাজাতে থাকল। এরা সব মানুষের খঙ্কাল, চোখ-মুখ কোটরাগত, লাইন থেকে একটা প্রাণী সরছে না এবং ড্রাইভার ভূতের ভয়ে প্রথম ভাবল যদি ওরা যথার্থই মানুষের অভুক্ত আত্মা হয় তবে আর ট্রেন থামিয়ে কি হবে, বরং সে জোরে বের হয়ে যাবে, ট্রেন থামালে মৃত আত্মারা ওর ট্রেনটাকে এই নির্জন মাঠে আটকে দিতে পারে। সুতরাং ফের চাকা ঘুরিয়ে দিতে গেলে — ফায়ারম্যান শক্ত হাতে বাধা দিল, বলল, না। ওগুলো ভূত নয় দাদা। ওগুলো মানুষ। সে ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেনটা থামিয়ে দিল।

মানুষগুলো কোলাহল করতে থাকল, জল চাই, জল চাই। মানুষগুলো কামরায় কামরায় উঠে গেল। বলল, জল চাই, জল চাই।

ভিতরের যাত্রীরা ভয় পেয়ে গেছে। সব কঙ্কালের মত মানুষের চেহারা, ক্ষুধার্ত, চোখ কোটরাগত, হাত-পা শীর্ণ, ক্লান্ত এবং অবসন্ন এই সব মানুষের শরীরে জীর্ণ-বাস, ময়লার জন্য দুর্গন্ধ, ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, যাত্রীরা সকলে নাকে কাপড় দিচ্ছে। ভয়ে ওরা কথা বলতে পারছে না। যেন শয়তানের প্রতীক এইসব মানুষেরা। যাত্রীদের সুন্দর সুদৃশ্য কামরায় প্রাচুর্য ওদের পৈশাচিক করে তুলছে। ওরা প্রেতের মত ভিতরে ঢুকে দু'হাত ওপরে তুলে জলের জন্য, জল চাই, জল চাই, বলে নাম কীর্তনের মত নাচতে থাকল।

যাত্রীদের মনে হল, ক্ষুধার্ত সব রাক্ষস অথবা ডাইনীর মত মানুষগুলো আকাশে বাতাসে দুঃখের খবর পাঠাচ্ছে, ওরা ভিতরে ঢুকে সব তছনছ করে দিচ্ছিল। জল কোথায়, জলের জন্য ওরা ওদের মগ থালা এবং চামড়ার ব্যাগ খুলে রেখেছে, অথচ জল কোথায়, বৃদ্ধ পুরোহিত শুধু জানতেন জল কোথায়, তিনি সকলকে দু' হাত তুলে শান্ত থাকতে বলেছেন, সামান্য জলটুকু সকলকে সমান ভাগ করে দিতে হবে। তিনি প্রতি কামরায় একজন করে যুবককে জলের কল দেখিয়ে দিলেন, কি করে খুলতে হবে বন্ধ করতে হবে দেখিয়ে দিলেন, প্রত্যেককে লাইন দিয়ে যেমন মানুষগুলো সরকারের লঙ্গরখানাতে লাইন দিয়ে খাদ্যবস্তু থালায় নিত তেমন লাইন দিয়ে সামান্য জলটুকু সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বললেন।

সুবলের কামরায় খুব অল্প মানুষ। সুখী মানুষ, তাঁর স্ত্রী এবং রুগ্ন এক বালিকা নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। এতবড় কামরা — রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীর কামরা, মাত্র তিনজন মানুষ। রুগ্ন বালিকা মোমের মত সাদা। সাদা চাদরে

শরীর ঢেকে রেখেছে। মাথায় আলো জ্বলছিল। খুব অনুজ্জ্বল আলো। ওরা সকলে ভয়ে কেমন চোখ-মুখ সাদা করে রেখেছে। বালিকাটি পর্যন্ত মুখ-নাক দেখে আঁৎকে উঠেছে। সুবলের পিছনে বড় বড় সব মানুষ। মানুষ বলে চেনা যায় না। যেন বড় এক রাজপুরী। সুন্দর সব বাদামী রঙের গাছ। গাছে হীরে-পান্নার ফুল। নীচে রাজকন্যা আঙুর খেতে খেতে কোন রাজপুত্রের জন্য অন্যমনস্ক। অথবা এও হতে পারে রাজকন্যার জানা ছিল না, রাজ্যের কোথাও দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। জানা ছিল না, রাজ্যের রাজা বনের হরিণ অনুসন্ধানে মত্ত। রাজা, রাজ্যের খবর রাখছে না। হাজার হাজার গ্রামে মড়ক লেগেছে। অনাবৃষ্টির জন্য ফসল ফলছে না। অল্প বৃষ্টির জন্য মাটি ক্রমশ মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। হায়, তখনও রাজা মনোরম রাজপ্রাসাদে নূতন অরণ্যের সৃষ্টি করছে। কারণ ওর প্রিয় হরিণটি এই বনের ভিতর হারিয়ে যাবে। সে সেই হরিণের জন্য শুধু ব্যস্ত থাকবে। রাজকার্যের জন্য বনের হরিণটি ওর বড় প্রিয়। মরীচিকার পেছনে ছোটার মত রাজা শুধু ছুটছেন। তখন রাজকন্যা দেখতে পেল হাজার হাজার কঙ্কালপ্রায় মানুষ তাকে ঘিরে ফেলেছে, হাউ মাউ কাউ মানুষের গন্ধ পাঁউ — এই সব কথা বলছে।

সুবল হাতের ইশারা করলে সকলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুখী মানুষটি প্রথম খুব চেঁচামেচি করছিল, পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিল, কিন্তু এত বড় নির্জন মাঠ, এক দিকে দীর্ঘ পাহাড়, অন্যদিকে এক মরা নদী, নদীতে মানুষগুলো জলের জন্য দিন নেই, রাত নেই মাটি খুঁড়ে চলেছিল, অথচ জল নেই, জল নেই, হাহাকার জলের জন্য। সুতরাং সামান্য পুলিশের ভয় সুবল অথবা এইসব কঙ্কালপ্রায় মানুষদের এতটুকু বিচলিত করতে পারল না।

বরং মানুষগুলো, সুদৃশ্য এই কামরা, আসবাবপত্র দেখে কৌতুক বোধ করতে থাকল। ওরা সুবলকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে। অথবা সুবলকে অনুনয়ে বলছে, ওরা এই কামরার ক্ষতি করবে না। শুধু ঢুকে দেখবে, মোটা গদী, এবং আলোর কাছে হাত রেখে দেখবে — কেমন ভিতরে অনুভূতি জন্মায়। সুবল ওদের এক এক করে জল খেতে দিচ্ছে, আর এক এক জন কামরার ভিতর ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখল, অথবা একটু আরাম করে গদিতে বসে শুয়ে কেমন লাগে দেখতে থাকল। বা বেশ তো, ওদের কেউ কেউ যেন চোখ বুজে আরামটুকু অনুভব করছে। বাংকের ওপর বসে, হাঁটু মুড়ে বসে শুধু চারিদিকের দৃশ্য, — জানালা দিয়ে শুধু অন্ধকার মাঠ, পেছনের করিডোরে মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে, কোলাহল করছে। গার্ডের লালবাতি, যেন মাঠ, মরা নদী অথবা শুকনো পাহাড়ের উদ্দেশ্যে লালবাতি জ্বেলে গার্ড বসে আছে।

কামরার ভিতর সুখী মানুষ, তাঁর স্ত্রী এবং রুগ্ন বালিকা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, ওরা ভয়ে কামরার এক পাশে, যেন ভয়ঙ্কর কোন দুর্ঘটনার

অপেক্ষায় আছে ওরা।

ড্রাইভার নিচে নেমে দেখল, পিপীলিকার মত মানুষগুলো কামরায় কামরায়, ছাদের ওপরে উঠে হৈ-হুল্লড় করছে। শিশুদের মত চিৎকার, যেন এই ট্রেন ওদের কাছে খেলনার মত অথবা যুদ্ধে প্রতিপক্ষের পরিত্যক্ত কামান, কামানের গোলাগুলি শেষ, গ্রামের দুষ্ট বালকবালিকারা কামানটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার যাত্রীদের পার হয়ে গার্ডের ঘরে গিয়ে দেখছে, ভয়ে গার্ড সাহেব লালবাতি জ্বেলে বসে রয়েছে।

এবার ড্রাইভার মরিয়া হয়ে বলল, এবার নীলবাতি জ্বালুন, ট্রেন ছেড়ে দিই, একটা মানুষও লাইনের ওপর আর নেই। শালা সকলকে নিয়ে এবার স্টেশনে নিয়ে ফেলি।

ড্রাইভারের চিৎকারে গার্ডসাহেব ভয়ে তিরিঙ তিরিঙ করতে থাকল। ঘুরে ফিরে কেমন মাতালের মত কিছুক্ষণ নেচে বেড়াল। ড্রাইভার বুঝল গার্ডসাহেব ভয়ে ভিরমি খেয়েছে। সে বলল, গার্ডসাহেব, বেশি দেরি করলে বয়লার থেকে জল ঢেলে নেবে। ট্রেন তবে আর চলবে না!

গার্ডসাহেব কি যেন ভাবলেন।— এদের এত তেষ্টা?

— তেষ্টা, কি যে জল খাচ্ছে! কেবল জল খাচ্ছে।

— কেবল জল খাচ্ছে?

— কেবল জল খাচ্ছে। জল খাচ্ছে। জল খাচ্ছে। কেবল জল খাচ্ছে।

— অন্য কিছু না?

— না, কিছু না। কোন দিকে আর ভ্রুক্ষেপ নেই। বড় সজ্জন।

— তবে এবার সজ্জনদের চল শহরে নিয়ে তুলি। বলে তিনি বসে টুক করে লাল বাতিটাকে নীল করে দিলেন।

ড্রাইভার নামার সময় বলে এল, আপনি সাব হুইসল বাজাবেন না। আমি সেকেণ্ডে এমন গতি বাড়িয়ে দেব না, শালা একটাকেও নামতে দেব না। বলে ড্রাইভার অন্ধকারের ভিতর নিচু হয়ে হাঁটতে থাকল। এবং দেখল ট্রেনের নীচে আবার কেউ বসে রয়েছে কিনা। সে কোন মানুষ দেখতে পেল না। কেবল মনে হল নীচে ঠিক বড় একটা গাছের অন্ধকারে একজন আলখেল্লা পরা মানুষ দাঁড়িয়ে দুঃখী লোকদের যেন জলপান দেখছে।

ড্রাইভার বলল, শালা, তুমি লিডার আছে। তোমাকে ফেলে দেখ শালা, কেমন সব ফাঁক করে দিই! তুমি শালা এখানে পড়ে পড়ে এবার ঘাস খাও। মুরগী খাও। মুরগীর নাম মনে হতেই ড্রাইভারের জিভে জল এসে গেল।

ওদের এত জলতেষ্টা যে, কোথায় ড্রাইভার, কোথায় ফায়ারম্যান

দেখবার ফুরসত নেই। আর এতগুলো মানুষ একসঙ্গে ট্রেনে উঠে পড়বে সেও, কেউ ভাবে নি।

বৃদ্ধ পুরোহিত ওদের জল খেতে দেখে, ওদের হৈ চৈ দেখে খুব খুশি। দীর্ঘদিন পর জল পান, তৃষ্ণার জল কতদিন পর পান করা গেল! তিনি নিজেও জল এনে গাছের নীচে পান করছেন। মনে হচ্ছিল পেটে আর জায়গা নেই, তবু মনে হচ্ছিল জলের আর এক নাম জীবন, এই জল এবং জীবনকে চেটে চেটে খাবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ পর পরই গলায় জল ঢেলে দিচ্ছেন, এবং জল খাবার সময় যেন অন্ধকারে টের পেলেন, ট্রেনটা নড়ছে, ট্রেনটা সহসা এত গতি বাড়িয়ে দিল যে, তিনি অনুমানই করতে পারলেন না কি করে চোখের পলকে এতগুলো লোক নিয়ে ট্রেনটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনি চিৎকার করতে করতে ট্রেনটার পিছনে ছুট দিলেন। তিনি অন্ধকারেও দেখতে পেলেন সেইসব দুঃখী মানুষদের হাত — ওরা যেন বলছিল, দেখ দেখ, কেমন বেইমান এই ট্রেন, আমাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি শুধু চিৎকার করছিলেন, তোরা সব নেমে পড়। তোদের নিয়ে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে, তোরা লাফিয়ে পড়।

কিন্তু সুবল ট্রেনের ভেতর জানালাতে সামান্য সময়ের জন্য উঁকি দিয়েছিল। অন্ধকারে গাছপালা আবছা আবছা, সে কোন মানুষকে কোন বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নি। সে ভেবেছিল হয়তো দু-একজন পড়ে থাকল — আর সকলকে নিয়েই ট্রেনটা মোটামুটি শহরে পৌঁছে যাবে। কারণ এই মন্বন্তর মানুষের আত্মবিশ্বাস হরণ করে নিয়েছে। ট্রেন ছেড়ে দিলে কেউ লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেনি। সকলে যেন মোটামুটি ভিতরে ভিতরে খুশি।

ট্রেনটা ওদেরকে কোন না কোন শহরে পৌঁছে দেবে। অন্ন-জল এবং বস্ত্রের অভাব হবে না। একবার শুধু পৌঁছে যাওয়া। সেখানে পুলিশের ভয় সামান্য থাকবে। সুতরাং ওরা সকলেই প্রায় ভদ্রলোকের মত কামরায় কামরায় টিকিটবিহীন যাত্রীর মত বসে থাকল। ওরা আর কিছু তছনছ করছে না। যাত্রীদের মনে সাহস ফিরে এসেছে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে বড় নিস্তেজ মনে হচ্ছিল। শরীর শক্তিবিহীন। অনেকের ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম পাচ্ছিল।

সুবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর ঘরে এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকল। সাদা মোমের মত বালিকার মুখ। চোখ বড় বড়। সুবলকে বালিকাটি দেখছে। ঘরে অন্য যারা ছিল তারা জল খেয়ে চলে গেছে।

এই কামরায় অবশিষ্ট জলটুকু নিঃশেষ। প্রৌঢ় মানুষটি কি যেন বই পড়ছিলেন। তাকে এখন আর উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে না। এমন কি তিনি যেন ভেবে নিয়েছেন, এইসব দেহাতি মানুষেরা কোন কিছু আর অনিষ্ট করবে না। ফাঁক বুঝে জলের জন্য ট্রেন আক্রমণ করতে এসে ট্রেনে চড়ে শহরে চলে যাচ্ছে। এক ঢিলে দুই পাখি। রথও দেখা হল, কলাও বেচা হল। সুবলের মুখ দেখে তাই মনে হয়।

সুবল এখন ট্রেনে চড়ে কোথাও চলে যেতে পারছে ভেবে খুশি। অন্ততঃ জলের জন্য আর মাঠ-ঘাঠ ঘুরে মরতে হবে না। সুবলের মুখ দেখলে তাই বনে হয়। বালিকাটি অসুস্থ। সাদা মোমের মত মুখে শুধু চোখ দুটোই অবশিষ্ট। চোয়ালে সামান্য মাংস। হাত-পা বড় শীর্ণ। শুধু মুখে সামান্য সতেজ ভাব। চোখ দুটো বড় টল টল করছিল। সুবলের আশ্চর্য লাগছে— এই মুখ, সুন্দর সতেজ মুখ রুগ্ন এবং পীড়িত। ভিতরে ভিতরে অসামান্য কষ্ট। শিয়রে বসে আছেন যিনি— বালিকাটির মা হবে নিশ্চয়ই। তিনি বুক পর্যন্ত সিল্কের চাদরটা মাঝে মাঝে টেনে দিচ্ছেন। যারা পরে তৃষ্ণার জল খেতে এসেছিল— অবশিষ্ট জল, এমন কি এই রুগ্ন বালিকার জন্য যে মাটির জারে অল্প জল ছিল, জলের স্বাদ পেয়ে সবটুকু জল খেয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছিল, বালিকার এখন তৃষ্ণা পেয়েছে। বালিকা তৃষ্ণার জলের জন্য ঠোঁট চাটছে। শিয়রে মা বসে। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে বললেন, টুকুন জল খেতে চাইছে।

প্রৌঢ় মানুষটি উঠে বসলেন, তিনি দেখলেন জল কোথাও নেই। দরজার গোড়ায় সুবল বসে বসে ঝিমুচ্ছে। এখন আর স্টেশন না এলে জল পাওয়া যাবে না। কোন বয়কে ডেকে অথবা খাবার ঘরে অনুসন্ধান করলে হয়। তিনি সুবলকে অতিক্রম করে বাইরে বের হতেই দেখলেন বারান্দায় সেইসব দেহাতী মানুষেরা ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছে। কোথাও এতটুকু স্থান নেই যে, তিনি পা ফেলে তাদের অতিক্রম করে যাবেন। এবং এইসব দেহাতী মানুষদের দেখেই মনে হল, জল কোথাও আর অবশিষ্ট নেই। শুধু এনজিনে জল আছে এবং তিনি ঈশ্বরের নিকট কেমন অন্যমনস্কভাবে হাত জোড় করে ফেললেন। বললেন, ঈশ্বর, এই নির্জন মাঠে ট্রেন ফের থেমে পড়লে মেয়েটাকে আর জল দিতে পারব না। জল না পেলে বড় ছটফট করবে।

সুবল ঝিমুচ্ছিল। সহসা আর্তনাদে সুবলের ঘুম ভাবটা কেটে গেল। সুবল দেখল সেই সুন্দর সতেজ মুখ বালিকার, অথচ চিৎকার করছে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কোথাও চলে যাব, কষ্ট আর সহ্য হয় না মা! কি যে এক ভীষণ রোগ মেয়ের, মা পর্যন্ত তার দুঃখে আর্তনাদ করছিলেন।

বড় শহরে যাচ্ছে মা-বাবা, মেয়েকে নিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে। অথবা মনে হচ্ছিল এই মেয়ের জন্যই মা বাবা প্রবাস ছেড়ে নিজের দেশে চলেছেন। অনেক ডাক্তার দেখানো হল। জলবায়ু পরিবর্তন করা হল। কত টোটকা, কবিরাজী কি-না করেছেন প্রৌঢ় মানুষটি, হায়, মনের অসুখ মেয়ের, কেউ কিছু করতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে বালিকার শুধু জলতেষ্টা পায়।

ছেঁড়া জামা সুবলের গায়ে। সুবলের পরনে প্রায় নেংটির মত একটু কাপড়। জামাটা হাঁটু পর্যন্ত সুবলের ফুলে-ফেঁপে ছিল। দেখলে মনে হবে, দুটো সুবলকে ভিতরে পুরে রাখা যায়।

সুবল উঠে দাঁড়াল এবং ওর মাথায় লম্বা টিকি দেখে মেয়েটি প্রথমে চিৎকার থামিয়ে দিল। সুবলের বড় বড় চুল, প্রায় চুলে মুখ ঢেকে যাচ্ছে. সুবলের শরীরে ঘাম এবং ময়লার অথবা বলা যেতে পারে অপরিচ্ছন্দতার গন্ধ। সুবলকে দেখে মেয়েটি এবার ভয়ে যেন গুটিয়ে যাচ্ছে ফের। সে সন্তর্পণে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

সুবল বলল, মা, আমার একটু জল আছে। জলটা ওকে দিতে পারি মা। ওর খুব তেষ্টা পেয়েছে।

মা বললেন, তুমি জল দেবে কি বাছা! জল তোমার কোথায়? সুবল বলল, এই যে। সে একটা বাঁশের চোঙ বের করে দেখালো।

—এই চোঙে জল আছে মা। আমার একটা পাখি আছে মা! পাখির জন্য একটু জল নিয়েছি মা।

মা বললেন, না বাছা। জল তোমার বড় নোংরা।

সুবল কোন কথা বলল না। সে তার পাখিটাকে পাশের পকেট থেকে তুলে এনে হাতের কব্জিতে বসাল। নিচে ছোট ছোট পুঁটলী সুবলের। সংসার বলতে যা-কিছু সবই শেষদিকে সুবলের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। কারণ ওদের কোন ঠিক ছিল না কখন কোথায় ওরা থাকবে। বৃদ্ধ পুরোহিত মানুষটি তাদের সকলকে নিয়ে স্থানে স্থানে জলের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। বৃদ্ধের কথা মনে হতেই অন্য একটা চোঙে পাখিটাকে পুরে রাখল। পোকামাকড় যা-কিছু পাখিটার জন্য, পোঁটলা খুলে দেখলো। পোঁটলা খুলতেই পোকামাকড়গুলো পর পর ছড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধের কথা মনে পড়ছে, কামরায় কামরায় খুঁজে দেখলে হয়, কোন কামরায় তিনি হয়তো আছেন। কারণ সুবল ভেবেছে ভিড়ের সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই উঠে এসেছেন। কিন্তু পোকামাকড়গুলো ছড়াতেই যাত্রী তিনজন, বিশেষ করে রুগ্ন মেয়েটি হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল ভয়ে।

পোকামাকড়গুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। আলোর ভিতর ওরা চোখে দেখতে পাচ্ছে না— বালিকার অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পিঠে শরীরে মুখে বেয়ে বেয়ে উঠে যাচ্ছে। সুবল ভয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমনটা হবে জানা ছিল না। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হাত থেকে পোঁটলা খসে পড়বে এবং ঘরময় কীটপতঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে ভাবতে পারে নি সুবল।

ট্রেন বেগে চলছে, মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসল্ কানে বড় বেশ বাজছে! পাখিটা সুবলের মাথায় হাতে এবং ঘাড়ে উড়ে উড়ে বসছে। পাখিটাকে দেখে মেয়েটি ওর সব দুঃখ যেন ভুলে যাচ্ছে। এমন কি এই যে কীটপতঙ্গ মেঝের ওপর, দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কি সুন্দর পাখি, সোনার রঙের ঠোঁট, পায়ে সবুজ ঘাসের রঙ, পাখা কালো, গলার নীচে লাল রিবন যেন বাঁধা, নরম এবং কোমল পাখি। সুবলকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখে পাখিটা, পাখিটার বয়স আর কত, পাখিটা উড়ে উড়ে দেয়ালের দিকে চলে যেতে থাকল এবং একটা একটা করে কীটপতঙ্গ ধরে

এনে সুবলের জেব ভরে দিতে থাকল।

সুবল দেখল, তার পোয়া পাখিটা বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছে। সে যেন ইচ্ছা করলে এই পাখি নিয়ে সকলকে এখন' খেলা দেখাতে পারে।

সুতরাং এখন কামরায় চার জন। বিশেষ করে মা-বাবা এই পাখিয়ালা সুবলকে আর ঘৃণার চোখে দেখতে পারছে না। মেয়েটা এই যে এতক্ষণ কেবল ছটফট করছিল — আমার কিছু ভাল লাগছে না মা, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কোথাও চলে যাব মা, মা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? এইসব দুঃখকর কথা আর বলছে না। একটা পাখি, সাধারণ পাখি আর এক পাখিয়ালা, কোথাকার এক পাখিয়ালা, ময়লা, বিশীর্ণ চেহারা, দেহাতী — কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু যেন এই পাখি বেঁচে থাক, পাখি থাকলেই সব থাকল, পাখির খেলা দেখিয়ে সে সকলকে বুঝি মুগ্ধ করতে চায়।

টুকুন বলল, এই পাখিয়ালা।

সুবল চোখ তুলে তাকাল।

— পাখিয়ালা, দেখ এখানে একটা লম্বা গঙ্গাফড়িঙ।

পাখি কি দেখল, সুবল পাখিকে কি বলল বোঝা গেল না। পাখি উড়ে গিয়ে ফড়িঙটাকে ঠোঁটে ঠেসে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টুকুন অতীব আনন্দে হাততালি দিতে থাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল এসে গেল। যেন বলতে চাইল — পাখিয়ালা, তুমি জাদুকর, জাদু তোমার হাতের খেলনা। এই মেয়ে কতকাল তার হাসি ভুলে ছিল, কতকাল এই মেয়ে আমার হাততালি দেয় না, আনন্দ করে না। পাখিয়ালা, তুমি আমার এই মেয়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছ, তুমি বুঝি জাদুকর!

এই করে এখন আর কোন বেদনার চিহ্ন আঁকা নেই। কোন জলতেষ্টা নেই।

টুকুন বলল, পাখিয়ালা, তুমি এই পাখি কোথায় পেলে?

— গাছের নীচে দিদিমণি।

— কি গাছ ছিল ওটা?

— একটা শিরিশ গাছ ছিল।

— পাখিটার বুঝি কেউ ছিল না?

— কেউ ছিল না। ওর মা-বাবা ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কী খরা আমাদের দেশে! কী রোদ ছিল, কী দুঃখ। আমাদের লোকগুলো টুকুন দিদিমণি, তোমাকে কি বলব, আমাদের লোকগুলো সতেরো আঠারো দিন জল খেতে পায় নি।

বাবা বললেন, সুবল, তোমাদের কোন সরকারী সাহায্য মেলে কি?

সুবল কি বলবে ভেবে পেল না, কিছুদিন কিছু লোক বড় বড় গাড়ি করে পাহাড়ী অঞ্চলে ঘুরেফিরে গেছে, বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলে গেছে। ঐ সব পরিকল্পনার কথা সুবল বোঝে না। বড় বড় নেতাগোছের মানুষ

এসেছিল। দেশের জননী এসেছিলেন। তিনি খিচুড়ি মুখে দিয়ে কেমন খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে সকলকে, তার স্বাদ চেখে গেছেন। কিন্তু মানুষের বুঝি তেষ্টা দেখে যান নি।

হায়, সুবল যেন বলতে পারত, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো আর। গরু-ভেড়া নিয়ে মানুষেরা চলে যাচ্ছে, মাটি ফেটে গেছে, শুকনো উত্তাপ, লু বইছে এবং গাছে মৃত ডাল শুধু, মাঝে মাঝে কোন পাহাড়ের গায়ে দাবানল জ্বলতে দেখা গেছে। এক বুড়ো ঠাকুর সেই দাবানল দেখে বলেছে, দেশের পাপ, এত পাপ আর ধরণী সহ্য করবেন না। পাপে পাপে দেশ ছেয়ে গেছে, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মরুভূমির মত হাহাকার করছে গোটা দেশ। বুড়ো ঠাকুর এই বলতে বলতে একটা গাছের ডালে নিজের বস্ত্র বেঁধে আত্মহত্যা করেছিল।

আর কি দেখেছিল! দেখেছিল সেই চৌবেজীর বৌকে। বৌটা এমন খরা দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। অভাব দেখে চৌবেজীর বৌ অন্ন-বস্ত্রের সব আশা ত্যাগ করা যায় কিনা তার পরীক্ষা করত। সে অন্ন পেলে বলত, বিষ্ঠা খেতে নেই, জল পেলে বলত, বিষ, বিষ খেতে নেই। কাপড় পরতে দিলে বলত, আগুন আগুন পরতে নেই। চৌবেজীর বৌটা রাতে মাঠে নেমে উলঙ্গ হয়ে নাচত। ভয়ে বিস্ময়ে সকলে একদিন দেখেছে, চৌবেজীর বৌ শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সবই অভাবের জন্য এবং অন্নের জন্য। সারা গ্রামময় যখন ওলাওঠা, তখন মহাবীর মা শীতলার একটা মূর্তি বানিয়ে দিনরাত অশত্থ গাছটার নীচে বসে থাকত। মূর্তিটাকে সে সবসময় বগলের নীচে চেপে রাখত। যেন বগল থেকে ছেড়ে দিলে তার শরীরে মায়ের দয়া হবে। বগল থেকে ছেড়ে দিলেই মা শীতলা ওর ভিতরে ঢুকে ওলাওঠা বানিয়ে দেবে।

বস্তুত মহাবীর অভাবের জন্য, অন্নের জন্য, এবং এমন অনাবৃষ্টি আর আকাল দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে সেই খড়ের তৈরি মা শীতলাকে বগলে চেপে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকত। বিড় বিড় করে বকত। তারপর একদিন সকলে দেখল মহাবীর মাথায় পাগড়ী বেঁধে মা শীতলাকে বগল তলায় রেখে উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছে। লোকটা আর এ-অঞ্চলে ফিরে এল না। লোকটা অভাবের জন্য, খরার জন্য পাগল হয়ে গেল, নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

সুবল খুব নিবিষ্টমনে পোঁটলাটা বাঁধছে। এখন আর একটাও পোকামাকড় কামরার ভিতর উড়ে বেড়াচ্ছে না। পাখিটা উড়ে উড়ে সব ক'টি পোকামাকড় ধরে দিয়েছে সুবলকে। তারপর বড় জেবের ভিতর ফুর ফুর করে উড়তে উড়তে ঢুকে গেছে।

ট্রেন চলছিল। বেগে চলছিল। জানালা খুলে সুবল দেখল সারা মাঠে শুধু অন্ধকার। মাঝে মাঝে কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে। বোধহয় দূরে কোথাও অন্য ট্রেন লাইন আছে। দূরে একটা ট্রেন বাঁক নিচ্ছে। ঠিক একটা

আলোর মালা, সুবলের এই আলোর মালা দেখতে বড় ভাল লাগছিল।

ওর ঘুম পাচ্ছে, মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস মনে হচ্ছিল ভিতরে ঢুকছে— বোধহয় রাত শেষ হয়ে আসছে। এই শেষ রাতটুকুতে মনেই হয় না কোথাও কোন অঞ্চল এখন জলাভাবে পুড়ে যেতে পারে। সুবলের চোখে ঘুম এসে গেল। জেবের ভিতর পাখিটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

।। দুই ।।

অতর্কিতে এই ট্রেনটা চলে যাওয়া— যেন নিমেষে এক বড় সংসার নিয়ে ট্রেনটা উধাও হয়ে গেল। পুরোহিত মানুষটি কি করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে উঠে যেতে থাকলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন মানুষ অথবা পরিবারকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন আশার কথা শোনাতেন, হা অন্নের জন্য, জলের জন্য এবং অনাবৃষ্টির জন্য যখন মন্বন্তর আসে তখন হাজার হাজার লোক মরে যায়, মহামারী দেখা দেয়, গরু-বাছুর সব বিক্রি করে দিতে হয়, শুধু সামান্য কুঁড়েঘর পড়ে থাকে অবশিষ্ট— কিন্তু তারপর ঈশ্বর মঙ্গলময়, তারপর সব পাপের সংসার আগুনে পুড়ে গেলে ঘন বৃষ্টি। বৃষ্টি হলেই নতুন গাছগাছালি, মাঠে সবুজ ঘাস দেখা দেয়, কোথা থেকে সব পাখি উড়ে আসে তখন। কোথা থেকে সব বন্য প্রাণী নেমে আসে। এবং ধীরে ধীরে অঞ্চলটা তপোবনের মত হয়ে যায়। তখন আর পাপ থাকে না, শুধু পুণ্য পড়ে থাকে, এই পুণ্যের জন্য আবার শতবর্ষ ধরে ফসল ফলাও, ঘরে উৎসব, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। তারপর ফের পাপ, ফের হা অন্নের সম্মুখীন হওয়া।

বস্তুত এই বৃদ্ধ পুরোহিত ভোর হলেই আকাশ দেখতেন, তিনি প্রায় সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একটু মেঘ দেখলে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। বুঝি আজই বৃষ্টি হবে। কিন্তু তারপর কোথায় বৃষ্টি, সামান্য মেঘটুকু ফুসমন্তরে আকাশের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেত। তিনি তখন ফের অন্য এক টুকরো মেঘের সন্ধানে পাহাড়ের টিলাতে উঠে যেতেন। যেন মৃত সব গাছগাছালি, কুঁড়েঘর অথবা উত্তর-পশ্চিমের পাহাড় যাবতীয় মেঘকে তার দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিয়েছে।

তিনি ভেবেছিলেন মানুষের অসীম দুঃখ-কষ্টের দিন শেষ হয়ে আসছে। এবার এ অঞ্চলে ঈশ্বরের করুণার ধারা দ্রুত নেমে এসে মাঠ-ঘাট ভাসিয়ে দেবে। তিনি সেই আশায় পাহাড়ের টিলাতে দাঁড়িয়ে দিগন্তে সামান্য মেঘের অনুসন্ধান করতেন।

অথচ এক ট্রেন এসে এ অঞ্চলের সব লোকজন নিয়ে চলে গেল। শহরের দিকে ট্রেন চলে গেছে। জলের জন্য ট্রেন ধরতে আসা, আর সেই

ট্রেনে চড়ে মানুষজনেরা সব চলে গেল!

পাহাড়ের উৎরাই ভেঙ্গে উঠতে ভীষণ কষ্ট। পথ, অন্ধকার স্পষ্ট নয়। চাঁদের ম্লান আলোটুকু নিভে গেছে। ইতস্ততঃ কিছু কুঁড়েঘরে ছোট ছোট পহাড়ী-উপত্যকা— তিনি পাহাড়-উপত্যকায় নেমে গেলেন। পথের দু'ধারে শূন্য সব কুঁড়েঘর। একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। অন্ধকার এবং মৃত অরণ্য ভয়ের সঞ্চার করছে। তিনি চলতে চলতে কিছু কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাচ্ছিলেন। ওরা সামান্য জীব মাত্র, এত বড় লোকালয় এখন একেবারে জনহীন।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কে বা কারা সারাক্ষণ পাহাড়ের নীচে দৌড়াচ্ছে মনে হল। যেন কোন বন্য জন্তুর দল ক্লপ ক্লপ শব্দ তুলে খুরে, অনবরত সমতল মাঠে ছুটছে। তিনি দ্রুত পাহাড়ের ঢালুতে নেমে এলেন, মনে হল ভোরের হাওয়া বইছে। মনে হল এবার পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। আর মনে হল শান্ত এক ভাব ধরণীর কোলে। এইসব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে বসে পড়লেন। তাঁর ঘুম এসে গেল।

সুবল কিসের শব্দে জেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত জেবের ভিতর, পাখিটা পোষা এবং ভালবাসার পাখিটা কি করছে দেখতে থাকল। চারিদিকে কোলাহল। ট্রেন বড় একটা স্টেশনে থেমে আছে। কেবল ফুঁসছে ট্রেনটা, সে জানালাতে মুখ রাখতেই দেখল, দেহাতী মানুষগুলো সারা রাস্তায় ট্রেন আটকে জল শুষে নিয়েছে, সেই মানুষগুলো স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। গোটা স্টেশন একদল পুলিশ। দেখলে মনে হবে না ওদের এই মানুষগুলো সম্পর্কে কোন কৌতূহল আছে। নির্বিকার ভাবে যেন একদল বন্য মানুষকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবাই পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাতে বন্দুক, কিছু ফাঁকা আওয়াজ ওদের সন্ত্রস্ত করছিল।

সুবল এবার দ্রুত নেমে যাবার জন্য দরজা টানতেই দেখল দরজা খুলছে না। সে এবার কামরার ভিতরটা দেখল। এত কোলাহলের ভিতরও টুকুন এবং টুকুনের মা-বাবা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে ভেবে পেল না এখন কি করবে! সে পুলিশের ভয়ে, নিশ্চয়ই ওরা এসে দরজা খুলে ওকে ধরে নিয়ে যাবে, সে কি করবে ভেবে পেল না! নিশ্চয়ই ওরা এসে ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নামাবে। ওর ভয়ে কান্না পাচ্ছিল প্রায়।

ঠিক তখন টুকুন জেগে গেছে। এই সব শব্দে, টুকুন জেগে দেখল সুবল দরজা খুলতে পারছে না। টুকুন বাবাকে দেখেছিল দরজা লক করে দিতে। সুতরাং সুবল দরজা খুলতে পারছে না। সে সুবলকে কিছু বলার জন্য উঠে বসতেই জানালায় দেখতে পেল একজন পুলিশ ওদের কামরার দিকে ছুটে আসছে। প্ল্যাটফরমে হৈ-চৈ। মানুষের ছোটাছুটি, এবং কান্না। যারা জল চুরি করেছিল অথবা লুঠ করেছিল তাদের এখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

টুকুন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ডাকল, সুবল, সুবল। দরজা খুলবে না। দরজা খুললে ওরা ঢুকে পড়বে ঘরে।

সুবল বলল, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে!

টুকুন বলল, তাড়াতাড়ি এদিকে এস সুবল। বলে, সে বাংকের নিচে সুবলকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর লম্বা চাদর দিয়ে পর্দার মত একটা আড়াল সৃষ্টি করে সুবলকে অদৃশ্য করে দিল।

সুবল সব পোঁটলাগুলো শিয়রের দিকে রেখে দিল। জেবের ভিতর পাখিটা আছে, সুতরাং সুবল পাখিটাকে একটু আলগা করে রেখে দিল পাশে। পাখিটা এখন প্রায় জড় পদার্থের মত যেন শীতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে অথবা পাখিটার ঘুম পাচ্ছিল বোধহয় — খুব জড়সড় হয়ে সুবলের শিয়রে বসে রয়েছে। টুকুন তার বিছানার চাদরটা নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছে। টুকুন রুগ্ন এবং দুর্বল। টুকুন কোন রকমে উঠে বসল এবং চাদর ঠিক মেঝের সঙ্গে মিলে আছে কিনা, সুবলের হাত-পা এবং অন্য কোন অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াল। টুকুন বড় দুর্বল, ক্ষীণকায়। সিল্কের দামী ফ্রক গায়ে ঢল ঢল করছে। শুধু সামান্য মুখে সতেজ সুন্দর চোখ কালো জলের মত গভীর মনে হয়, বেদনার চিহ্ন এই চোখে। দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। টুকুন কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা এবং বাবা শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসটুকু পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সুতরাং টুকুন নিজে ধীরে ধীরে উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল — লম্বা এক পুলিশের মুখ, গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টুকুন খুব আস্তে আস্তে বলল, কেউ নেই।

— কেউ তোমাদের কামরায় ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?

— না।

— বড় জ্বালাতন করছে এইসব দেহাতী মানুষগুলো।

টুকুন কোন জবাব দিল না। কারণ সে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার শরীর এত দুর্বল যে, মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যাবে। সে পুলিশের কথা প্রায় শুনতে পাচ্ছিল না। এটা প্রথম শ্রেণী, ওরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। পুলিশের গার্ড এসেছিল, স্টেশন মাস্টার এসেছিল, ওদের কামরাতে এইসব দেহাতী মানুষগুলো উপদ্রব করে গেছে কিনা, অথবা কোন দুর্ঘটনার জন্য এই দেহাতী মানুষগুলো দায়ী কিনা অনুসন্ধানের চেষ্টায় আছে।

টুকুন এবার শক্ত গলায় বলল, এ ঘরে কেউ আসে নি গার্ডসাহেব। বলে, সে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বাংকে কোনক্রমে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর অবাক টুকুন, কি বিস্ময় টুকুনের, আজ প্রথম কতদিন পর সে নিজে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে পেরেছে। সে কতদিন পর নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পেরেছে। সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল

না। মা-বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা-বাবা দেখতে পেলেন না টুকুন নিজে উঠে বসেছে এবং নিজে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। দরজা বন্ধ করেছে।

সে মা-বাবাকে ডাকে নি, কারণ মা-বাবা হয়তো ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে সব বলে দিতেন। হ্যাঁ, এসেছিল, সুবল এক পাখিয়ালা, সেই পাখিয়ালা এসেছিল দলবল নিয়ে, সে তার দলবল নিয়ে এই ঘরের শেষ জলটুকু নিঃশেষ করে গেছে। মাকে হয়তো বোঝাতেই পারত না, সুবল এক পাখিয়ালা এসে টুকুন নামে এক রুগ্ন স্থবির বালিকার পায়ে শক্তি সঞ্চার করতে সাহায্য করেছে। টুকুন মাকে বাবাকে তার এই বিস্ময় দেখানোর জন্য ডাকল, মা, মা!

সে ডাকল, বাবা, বাবা!

ট্রেন চলছে। ভোর হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে আবার বড় মাঠ দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের তার দেখা যাচ্ছে। পাখিরা ভোরের আলোতে উড়ে যাচ্ছিল। এই মাঠ দেখলে এখন আর কোন জলকষ্টের কথা মনে পড়ছে না। কিছুটা সবুজ আভা এখন দেখা যাচ্ছে। গ্রামে মানুষের চালাঘর, গরুবাছুর এবং মাঠে সামান্য শস্য দেখা যাচ্ছিল। টুকুন খুব ধীরে ধীরে তখনও ডাকছে, মা, বাবা, দেখো দেখো। মা, বাবা, ওঠো ওঠো। দেখো তোমরা, তোমরা দেখো, টুকুন শুয়ে নিজের মায়ের ওপর কোমল হাত রাখল।

সুবল বাংকের নিচে চুপ মেরে শুয়ে আছে। এখন বের হলে যে কোন আর ভয় নেই সে তা ধরতে পারছে না। ওর ধারণা পুলিশ এখনও এই ট্রেনে দলবল নিয়ে ঘুরছে। সে এতটুকু নড়ছিল না। সে পাখিটাকে পর্যন্ত হাতের ইশারাতে দুষ্টুমি করতে বারণ করে দিল। কারণ ভোর হয়ে গেছে বোধহয় আর খরা অঞ্চলের ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে না। সে ট্রেনে শুয়ে শস্যের গন্ধ পেল। এই শস্যের গন্ধ পেয়ে পাখিটা কেমন শক্তি পাচ্ছে ভিতরে। ওর ফুর ফুর করে উড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। সে এত উত্তেজিত যে বাংকের নিচেই দুবার ফুর ফুর করে উড়ে সুবলের মাথায়-মুখে এসে বসে পড়ল।

সুবল এতটুকু নড়ছিল না। সে পাখিটার দুষ্টুমি ধরতে পেরে বাঁশের অন্য একটা চোঙ টেনে আনল সন্তর্পণে। তারপর পাখিটাকে চোঙের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এবং মুখ বন্ধ করে বলল, বড় বজ্জাত পাজি তুই। বড় শহরে না গেলে তোমাকে আর ছেড়ে দিচ্ছি না।

টুকুন নিজের পায়ের ওপর চোখ রেখেছিল বিস্ময়ে। মা-বাবা উঠে গেছেন। টুকুন ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, আমি উঠে দরজা পর্যন্ত গেছি, দরজা খুলে দিয়েছি।

মা এত বিস্মিত যে কথা বলতে পারছিলেন না। বোধহয় টুকুন স্বপ্নের কথা বলেছে।

— বাবা, পুলিশ এসেছিল।

বাবা টুকুনকে দেখতে থাকলেন। কথা বলতে পারছিলেন না।

— বাবা, সত্যি আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। ওরা সুবলকে ধরতে এসেছিল। আমি বলেছি এখানে কেউ নেই।

বাবা এবার দরজার দিকে চোখ তুলে দেখলেন, দরজা তেমনি লক্ করা আছে। তিনি ভাবলেন টুকুন হয়তো কোন স্বপ্ন দেখেছে। টুকুন স্বপ্ন দেখেছে কোন মাঠ অথবা ওর প্রিয় লেবুতলায় সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। ওর শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শুকিয়ে আসছে। পায়ের কোথাও আর কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। কেমন ক্রমশঃ টুকুন স্থবির হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোন জায়গা নেই, বড় ডাক্তার নেই যেখানে তিনি টুকুনকে নিয়ে না গেছেন। হতাশা এখন সম্বল। মেয়েটা ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে যাবে তারপর সতেজ মুখে আর কোন বিষণ্ণ ছবি ঝুলে থাকবে না। টুকুন মরে যাবে। বাবা তার এই স্বপ্নটুকু ভেঙ্গে দিতে চাইলেন না। — বাঃ, বেশতো টুকুন, তুমি হেঁটে গিয়েছ, বাঃ, বেশতো। আমিতো বলেছি, তুমি আজ হোক কাল হোক হাঁটতে পারবে। তুমি হেঁটে হেঁটে কোথাও না কোথাও চলে যেতে পারবে।

— বাবা, আমি হেঁটে হেঁটে এই বাংকে এসে শুয়ে পড়েছি। আমি সুবলকে পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছি, সব আমি বাবা নিজের হাতে করেছি। আমি পায়ে হেঁটে করেছি। বলে টুকুন ফের উঠে বাবাকে দেখাতে চাইল, আমি হাঁটতে পারি, মাকে দেখাতে চাইল, এই দেখ আমার পায়ে কেমন শক্তি, কিন্তু হায়, টুকুন শত চেষ্টা করেও পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারল না, অতীব আশার উত্তেজনা ওকে বড় অসহায় করে তুলছে। তবে কি সব ভোজবাজির মত হয়ে গেল! টুকুন কত চেষ্টা করল। কতভাবে চেষ্টা করল। প্রাণে সকল আবেগ ঢেলে চেষ্টা করল, কিন্তু হায়, টুকুন কিছুতেই আর নিজের চেষ্টায় উঠে বসতে পারল না। টুকুন ভয়ঙ্কর হতাশায় ফের কেঁদে ফেলল, মা, আমার কিছু ভাল লাগে না, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, কোথাও আমি চলে যাব।

হায়, মেয়েটার দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছে না। সতেজ মুখে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। সাদা জামা, চোখের জলে ভিজে গেল। সারাজীবন ধরে কান্না। কি এক দুরারোগ্য ব্যাধি, কী এক অসীম হতাশা এই পরিবারকে ক্রমশঃ গ্রাস করছে। টুকুন ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা অচল হয়ে যাচ্ছে। ভিতরের শিরা-উপশিরা শুকিয়ে যাচ্ছে, রোগের কোন কারণ নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

ট্রেন চলছিল। পাখি উড়ছিল আকাশে। লাইনের তারে কিছু শালিখ পাখি দেখতে পেল ওরা। কত গ্রাম-মাঠ ফেলে ট্রেন ছুটছে। জানালায় ছোট ছোট কুঁড়েঘর, বড় দীঘি, কালো জল, সবুজ মাঠ ভেসে উঠছিল। যত ট্রেন বড় শহরের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে, তত লোকালয়, ইট-কাঠের বাড়ি, কারখানার চিমনি এবং লোহার পুল। সুবল বাংকের নিচে থেকে উঠে এলে দেখতে পেত সব। বোধহয় সুবল ফের ঘুমিয়ে পড়েছে বাংকের নিচে।

সুবলকে ঘুমোতে দেখে পাখিটা চোঙের ভিতর কিচ্ কিচ্ করছিল। ছটফট করছিল ভিতরে। ফুর ফুর করে ওড়বার ইচ্ছা পাখির, পাখি কেন আর এখন চোঙের ভিতর থাকবে। দুষ্টু পাখি সুবলের কানের কাছে চোঙের ভেতর থেকে বের হবার জন্য কিচ্ মিচ্ করে প্রায় কোলাহল জুড়ে দিল।

বোধহয় সুবল পুলিশের ভয়ে ঘাপটি মেরে আছে। নড়ছে না। পাখিটা চোঙের ভেতর থেকে ভাবছে সুবল ঘুমোচ্ছে। টুকুন ভাবছে সুবল ঘুমোচ্ছে। মা-বাবা এ ঘরে সুবল আছে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কারণ ওঁরা সুবলকে দেখতে পাচ্ছেন না। চাদরটা মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সুবলের হাত-পা মুখ কিছু দেখা যাচ্ছে না। সবটাই স্বপ্ন টুকুনের। সুবল, পাখিয়ালা সুবল চলে গেছে।

আর ঠিক তক্ষুনি সুবল চাদর ফাঁক করে কচ্ছপের মত মুখ বার করে বলল, মা, পুলিশ দরজায় দাঁড়িয়ে নেই তো। মা, আমরা আর কতক্ষণ ট্রেনে? পুলিশ আমাকে ধরবে না তো!

টুকুন শুয়ে শুয়ে বলল, তুমি কতদূর যাবে সুবল?

— আমি কলকাতা যাব দিদিমণি।

— সেখানে কে আছে সুবল?

— আপন বলতে কেউ নেই। বলে সুবল হামাগুড়ি দিয়ে চাদরটা সরিয়ে বের হয়ে এল। নোংরা জামাকাপড় বলে সে এক কোণায় মেঝের ওপর জবুথবু হয়ে বসল। সে দু'হাত জোড় করে বলল, মা, পাখিটা আমার বের হতে চাইছে। বের করব? পাখিটা একটু উড়তে চাইছে।

পাখিটা হেগে-মুতে দিতে পারে এই ভয়ে প্রৌঢ় মানুষটি কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করছিলেন। নোংরা সুবলকে সহ্য করতে পারছিলেন না। যেখানে সুবল বসছে ঠিক সেখানেই নোংরা লাগাচ্ছে। কিন্তু টুকুন পাখির নাম শুনেই বলল, সুবল, তুমি এখন পাখি ছেড়ে দিলে মাঠে উড়ে যাবে?

— না দিদিমণি। পাখি আমার পোষা। পাখির মা নেই বাবা নেই, আমার মত পাখির কেউ নেই। আমাকে ফেলে পাখি আর কোথাও যাবে না দিদিমণি।

— দেখি, কেমন যায় না!

— কেন দিদিমণি, তুমি দেখ নি পাখিটা আমাকে কেমন সব পোকামাকড় ধরে দিয়েছে?

— তা দিয়েছে তোমার পাখি।

— তবে এই দেখ। বলে চোঙের মুখ খুলে দিল সুবল। সেই পাখি সোনার ঠোঁটে কিচমিচ করে উঠল। পেটের দিকে সাদা রঙ, পাখা কালো আর ঘন সবুজ রঙ পাখির পায়ে। পাখিটা প্রায় নেচে নেচে বেড়াল সারা কামরাময়। পাখিটা দেয়ালে উড়ে গিয়ে বসল, ওপরের বাংকে বসে উঁকি দিয়ে যেন গাছের ডালে বসে উঁকি দিচ্ছে তেমনি পাখিটা নিচে টুকুনকে

দেখল। টুকুন পাখিটাকে দেখল, মাঠের ভিতর খোলা আকাশের নিচে এই পাখি কত সুন্দর দেখাত — সুবল এক পাখিয়ালা কলকাতা যাচ্ছে, যেন বলছে, দেখো দেখো, খেলা দেখো, পাখি আমার খেলা দেখাবে, নাচবে, গাইবে, হাওয়ার উড়বে, ষাঁড় গরুর মত, ভালুক অথবা বাঁদর নাচের মত, সুবল এক পাখিয়ালা কলকাতা নগরীতে অন্নসংস্থানের জন্য যাচ্ছে।

পাখিটা জানালায় বসল, পাখিটা টুকুনের শিয়রে বসে লেজ নাড়ল। আর পাখিটাকে টুকুন সামান্য আপেলের টুকরো দিল খেতে। শিয়রে বসে টুকুনের হাত থেকে পাখিটা ফলের নরম অংশ ঠুকরে ঠুকরে খেল।

তখন সুবল বসেছিল নিচে। ওর পোঁটলার ভিতর লুকনো বটফল. এক মুঠো ফল মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে থাকল। প্রায় যখন ফেনা উঠে গেছে মুখে তখন দলাটা কোঁৎ করে গিলে ফেলল সুবল। ফের এক মুঠো, ফের ফেনা ওঠা পিষ্ট সে খেয়ে সামান্য পাখিটার জন্য রেখে দিল হাতে।

সুবলের এই নোংরা স্বভাব দেখে টুকুনের মা ঘৃণায় মুখ কোঁচকাল, ঘৃণায় একবার চেকারবাবুকে ডেকে বলবে কিনা ভাবল, এখন তো আর খরা অঞ্চল নেই, এখন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের ভয় কি! সুতরাং এবার প্রায় টুকুনের মা ধমক দিয়ে বলল, সামনের স্টেশনে তুমি বাপু নেমে যাবে।

সুবল বলল, তাই যাব মা। স্টেশনের কি নাম?

— স্টেশনের নাম ব্যাণ্ডেল।

— যাব মা। সেখান থেকে কলকাতা কতদূর মা?

অত কথা শুনতে ভাল লাগল না। কোথাকার কোন এক মানুষ, উটকো মানুষ মা মা বলে একেবারে কামরাটাকে কদাকার করে তুলছে। সে বলল, মা, আমি তো আপনাদের কোন অনিষ্ট করছি না।

টুকুন শুনছিল সব। সে দেখল সুবল ভয়ে কেমন চুপ মেরে গেছে। সুবল ওর সব সম্বল নিয়ে এসেছে বলে পোঁটলা খুলে দেখল, ছোট ছোট পোঁটলার কোনটায় চন্দনের বীচি. কোনটাতে পুঁতির মালা।

তার মা একবার মেলা থেকে একটা পুঁতির মালা কিনে দিয়েছিল আর রঙ-বেরঙের সব পাথর, সে সেইসব পাথর পাহাড়ের নুড়িপাথর থেকে সংগ্রহ করেছে। সে কিছুই ফেলে না। যা ভাল লাগে, যা কিছু ভাল লাগে — সবই সঞ্চয়ের সামিল এই ভেবে সব সে সঞ্চয়ের ঝুড়িতে জমা রেখে দিত। চন্দনের বীচি, কুঁচফল এবং ভিন্ন ভিন্ন পাথরের উজ্জ্বল রঙ টুকুনকে পুলকিত করছিল। টুকুন মাকে ভয় পায়, মা সুবলকে নেমে যেতে বলেছেন, টুকুনের কষ্ট হচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল টুকুনের, কারণ সুবলের কেউ নেই — কত আর বয়েস সুবলের, সে সময় পেলে পাখির খেলা দেখায়। অথবা কোন কোন সময় ঋষিপুত্রের মত মনে হয় যেন সুবলকে, সবচেয়ে বড় আশ্চর্য, সুবলের জন্য টুকুন দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছিল। যেন এক দৈবশক্তি ভর করেছিল টুকুনের পায়ে। অথবা সুবল মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে টুকুনকে হাঁটতে সাহায্য

করেছে। এই সুবল চলে গেলে সে সত্যই পঙ্গু হয়ে যাবে। আর কোনদিন সে হেঁটে গিয়ে জানালায় দাঁড়াতে পারবে না, কোনদিন সে খোলা আকাশের নিচে আর দৌড়তে পারবে না।

।। তিন ।।

তখন খোলা আকাশের নিচে একটা গাছ, কি গাছ হবে, চড়ুই গাছ অথবা অর্জুন গাছ হতে পারে। গাছে পাতা নেই, রোদ এসে মুখের ওপর পড়ছে, প্রথমে মনে হচ্ছিল কেউ অন্ধকার রাতে ওর সামনে আলো বহন করে এনেছে, সে সচকিত হয়ে চোখ খুলল, মাথার ওপর প্রখর রোদ, সামনে খোলা মাঠ, শুধু ধূ ধূ করছে মাঠের রোদ। ঝিল্লীর আঁকা-বাঁকা রেখা দিগন্তে পাখির মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মরিচীকার মত মনে হচ্ছিল। বৃদ্ধ পুরোহিত প্রথমে শরীরের আলখেল্লা খুলে ফেললেন। মরিচীকার মত এই জলের চিহ্ন তিনি দেখতে পাচ্ছেন, মাঠ পার হয়ে হয়তো আকাশের নিচে কোথাও কোন মেঘের টুকরো উঠে আসছে, তিনি জলের সন্ধানে এই মরুভূমির মত প্রান্তরে ছুটতে থাকলেন। তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। তিনি প্রায় পাগলের মত ছুটে চলেছেন, যদি কোথাও কোন জলের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

আর তিনি ঠিক নিচে এসে যেখানে গতকাল মানুষেরা নদীর ঢালুতে জল অনুসন্ধান করে গেছে, সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে একটি ছোট্ট পাহাড়ের শিরা বের হয়ে এসেছে। দু'দিকে পাহাড়ের উপত্যকা গিরিখাতের মত সৃষ্টি করেছে। তারই নিচে ছোট পাতকোর মত গর্ত। বালুর পাহাড় চারধারে। একের পর এক এই সব গর্ত গতকাল তার দলের মানুষেরা করে গেছে। কোন গর্তেই জল নেই, তিনি তা জানতেন। শুধু দূরে দেখলেন তিনটি ছোট ছোট প্রাণী একটা গর্তের চারধারে কেবল ঘুরছে। এই খরা অঞ্চলে, জলের অভাবের জন্য যেখানে কোন পাখপাখালি পর্যন্ত নেই, যেখানে কোন কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না, সেখানে এমন তিনটি প্রাণী দেখে বিস্মিত হলেন।

তিনি যত এগুচ্ছিলেন তত এইসব ছোট ছোট প্রাণীগুলোকে কেমন চঞ্চল দেখাচ্ছিল। কাছে গেলে বুঝতে পারলেন দুটো হরিণ শিশু জলের জন্য পাশের সংরক্ষিত বন থেকে এখানে ছুটে এসেছে। ওঁকে দেখে তারা ছুটে পালাল না! শুধু সামান্য লাফ দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। তিনি গর্তের পাশে দাঁড়ালে আরও বিস্মিত হলেন — একটা বড় হরিণ গর্তের ভিতর পড়ে গেছে, হরিণটার হাঁটু পর্যন্ত জল, সে তার শিশুদের জল দেবার জন্য নিচে লাফিয়ে পড়েছে। আর উঠতে পারছে না। কেবল ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। বৃদ্ধকে দেখে কেমন কঁকিয়ে কঁকিয়ে একটু শব্দ করল তারপর বৃদ্ধকে অপলক

দেখতে থাকল।
তিনি এবার হরিণ শিশুদের অতিক্রম করে সেই গর্তে নেমে গেলেন। নিচে নেমে হরিণটাকে পাড়ে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর আলখেল্লাটা জলে ভেজালেন। হরিণী একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাচ্চাগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে। জলের পিপাসা ওদের এত বেশি যে, ওরা জল খাবার জন্য ঝুঁকে পড়ছিল গর্তে। প্রাণের মায়া ছিল না। বৃদ্ধ আলখেল্লা ভিজিয়ে জল তুলে আনলেন। একটু একটু করে তিনি সেই তিনটি শিশুকে আলখেল্লা চিপে জল খেতে দিলেন। ওরা জল খেল, লাফাল, তারপর হরিণীর সঙ্গে সেই বনের দিকে ছুটে যাবার জন্য পাহাড়ের কোলে উঠে গেল।

যতক্ষণ না ওরা তিনজন হারিয়ে গেল ততক্ষণ বৃদ্ধ সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এখন আর যেন কিছু করণীয় নেই। বালির নিচে চোরা স্রোত, এই স্রোতের সন্ধান যদি তিনি গতকাল পেতেন তবে বুঝি এইসব অঞ্চলের অন্ততঃ কিছু কিছু মানুষকে শস্য এবং সুদিনের আশ্বাস দিয়ে ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু হায়, ওরা এখন সব বিবাগী। ওদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর পড়ে আছে। পাহাড়ী উপত্যকাতে এই সময় অন্যান্য বছর যখন বর্ষার জলে মাটি ভিজতে থাকে তখন এক মেলা হয়, উৎসবে তিনি প্রধান মানুষ। এই উৎসব শস্যের জন্য, সম্পদের জন্য, কতকাল থেকে পৈতৃক এই ব্যবসা তাঁর। সকলের বিশ্বাস এখন তিনিই একমাত্র মানুষ যার মন্ত্রের উচ্চারণে আর তেমন শক্তি নেই। হোমে তিনি যে বিল্বপত্র দান করেন এখন তা আর তেমন পবিত্র নয়— নিশ্চয় কোথাও না কোথাও তিনি তাঁর পবিত্র জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মানুষের বিশ্বাসভঙ্গের দায়ভাগ তাঁর ওপর।

বৃদ্ধ পুরোহিতের নাম জনার্দন চক্রবর্তী। তিনি জলের ভিতর তাঁর মুখ দেখে আঁৎকে উঠলেন। চোখে-মুখে অবসাদ, বড় বড় দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে, তিনি ক্রমশঃ কেমন বন্য জীবের মত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে বনমানুষের মত মনে হচ্ছে। তিনি রোদের জন্য ওপরে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তিনি উলঙ্গ হলেন এবং সেই হাঁটুজলে নেমে শরীরে মুখে জল ঢেলে দিলেন। সমস্ত ক্লান্তি এবং অবসাদ শরীরে ক্রমশঃ কেমন উবে যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন পর ঠাণ্ডা জলের এই স্নান তাঁকে সুখী এবং তাজা যুবকের মত ফের সেই পুরানো মন্দিরে উঠে যেতে প্রেরণা দিচ্ছে। তাঁর সেই স্বপ্নের কথা মনে হল, জলের জন্য অনুসন্ধান, স্বপ্নে কে যেন বলল— অনুসন্ধান কর, কোথাও না কোথাও নদীর ঢালুতে চোরা স্রোত রয়েছে, তুমি তাই খুঁজে বের কর।

সে আবার চিৎকার করে উঠল, মা সুবচনী, তোর জয় হোক। কিন্তু মা তোর মনে কি এই ছিল? তোর মাটিতে মা ফসল ফলে না, তোর মাটিতে মা আর পালা-পার্বণ নেই, সব খা খা করছে, সব জনহীন প্রাণীহীন মা, আমি এখন এই জলে কি করব মা। তোর জলে তুই ডুবে মর। তুই ডাইনী। সকলের হাড়-মাংস খেয়ে তুই সুবচনী এখন ধেই ধেই করে নাচছিস।

জনার্দন পারে উঠে আলখেল্লা এবং পরনের কাপড়টা কাঁধে ফেলে একবার চারিদিকে তাকালেন। কবে সব মানুষজনদের নিয়ে তিনি জলের সন্ধানে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে চলে এসেছিলেন, এখন যেন আর তা মনে পড়ছে না। ভালবাসার মাটি সকলে ছেড়ে চলে গেলে কি আর থাকল। জনার্দন, এই মাটি ছেড়ে সকলে কোথাও চলে যাবে ভাবতেই জলের জন্যে হতাশ হয়ে মরছিল। পারে উঠে দেখল— তাঁর আবাস অনেক দূর। এত দূর তিনি হেঁটে যেতে পারবেন না, বিশেষ করে এই খরার রোদে। তিনি বালুর ওপর আর পা রাখতে পারছিলেন না। সূর্য যত ওপরে উঠে আসছে তত পায়ের নিচের উত্তাপ প্রখর মনে হচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি কোন নিকটবর্তী গ্রামে উঠে যাবার জন্য প্রায় ছুটে চললেন। পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে এখন অন্ততঃ সময়টা কাটিয়ে বেলা পড়ে এলে পর ছোট পাহাড়ে চলে যাবেন।

গ্রামের ভিতর ঢুকতেই জনার্দনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এখন আর এখানে মানুষের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। প্রিয় কদমফুল গাছটা মরে গেছে। পুকুরের মাটি ফেটে গেছে। সব কেমন জ্বলেপুড়ে খা খা করছিল। কোথা থেকে পচা দুর্গন্ধ আসছিল। জনার্দন ছোট একটা কুঁড়েঘর দেখে ভিতরে ঢুকে গেলেন। বস্তুত জনার্দন ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন দরজার পাশে একটা ছেঁড়া গামছা ঝুলছে এবং বাতাসে গামছাটা নড়ছিল। জনার্দন ভয়ে দরজা বন্ধ করে বসে পড়লেন। মনে মনে বললেন, মা সুবচনী, এত ভয় কেন প্রাণের জন্য। কিসের ভয় মা। আর তো কেউ নেই মা। আমি পুত্র-কন্যাবিহীন। শুধু এক অহঙ্কার ছিল মা। অহঙ্কার আমার এই উপবীতের। তিনি তাঁর উপবীতে হাত রাখলেন। পুরুষানুক্রমিক এই উপবীত, উপবীতের অহঙ্কার, কে যেন হেঁকে গেল মাঠে, ঠাকুরমশাই, মেয়ের বিয়ে কোন মাসে দেব, ঠাকুরমশাই মাথা চুলকে কি দেখলেন, তারপর বইয়ের পাতায় কি পড়লেন, শেষে বলে দিলেন, সাতাশে শ্রাবণ। সন্তানের কি নাম হবে, তিনি নাম বলে দিতেন, পুত্র হবে না কন্যা হবে, তিনি বলে দিতেন, জমিতে ধান চাষ হবে— তিনি বলে দিতেন, কালবৈশাখীর ঝড় থেকে রক্ষার জন্য ভৈরব ঠাকুরের পূজা দিতেন। বৃষ্টি না হলে হোম করতেন। সময়ে অসময়ে বৃষ্টি ঝরে পড়ত। জলে ভেসে যেত মাটি। লাঙ্গল কাঁধে তুলে সুবচনীর মন্দিরে চাষী মানুষেরা যেত, তিনি লাঙ্গলের ফলাতে সুবচনীর তেল-সিঁদুর মেখে দিতেন, গৃহস্থগণ চাষ করে আপন ঘরে সম্বৎসর সোনার ফসল তুলত।

জনার্দন ঘর অন্ধকার করে বসে থাকলেন। ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ, ঘরের ভিতর একটা ছেঁড়া বালিশ— তিনি তাঁর ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। দিনের বেলাতে আর বের হওয়া যাবে না বোধ হয়, চারিদিকে লু বইছে। মাথায় মুখে কাপড় জড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। তিনি স্থির করলেন, দিনের

বেলাতে সুবচনীর মন্দিরে নিদ্রা যাবেন, রাতের বেলাতে উঠে খাদ্য অন্বেষণ এবং অন্যান্য কাজ, কি করে এই মাটিকে ফের উর্বর করা যায়, কি করে ফের মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়, সে সবের চেষ্টা।

কারণ জনার্দন ঠাকুরের মন্ত্রের ওপর বড় বিশ্বাস ছিল। এই অঞ্চলের দেবী সুবচনী, এই অঞ্চলের রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। আর জনার্দন ঠাকুর পুরুষানুক্রমিক দেবীর সেবাইত। পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস, অঞ্চলের মানুষদের বিষয় সম্পর্কে জনার্দন ঠাকুর — প্রায় যেন ঈশ্বরের কাছের মানুষ। অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং পূর্ণিয়া অথবা বিহার-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ এরা। কিছু পাহাড়ী আদিবাসী। কিছু বাঙ্গালী। ভাষা, বিহার-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের। বড় গরীব মানুষগুলো। যা ফসল ফলত মাঠে, ওরা সোনার ফসল ভেবে নিত। এ-ভাবে ওদের বছরের পর বছর কেটে গেছে। জলের কষ্ট ছিল, কিন্তু জলের অভাবে গরু-বাছুর মরে যায় নি, অন্নের কষ্ট ছিল মানুষের — কিন্তু কেউ অনাহারে থাকে না। মা সুবচনী, বড় জাগ্রত, বড় লক্ষ্য তাঁর সন্তানের ওপর।

বিস্তীর্ণ পাহাড় আছে, শাল-শিমুলের গাছ আছে, বনে পাখি আছে, হরিণ আছে, আর কত রকমের মূল আছে গাছের যা তুলে ক্ষুধায় খেলে অন্নকষ্ট দূর হয়, শরীরে শক্তি সঞ্চার হয়। গৃহস্থের সোনার ফসল, গরীবের মুনীষ খেটে খাওয়া, কাজ না থাকলে, বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াও সকল অন্নকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তেমন অঞ্চলে পর পর তিন বছর খরা গেল — সকলে দুঃস্বপ্ন দেখল — বুঝি এই অঞ্চলে মরুভূমি গ্রাস করে খাচ্ছে।

সুতরাং মানুষেরা যাদের সহায়-সম্বল আছে তারা শহরে চলে গেল, মড়কে কিছু লোক সাফ হয়ে গেল আর বাকি যারা ছিল এতদিন তাদের জনার্দন ঠাকুর নানা রকম আশ্বাস দিয়ে ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু হায়, কোথাকার এক ট্রেন এসে তাদেরও নিয়ে চলে গেল। জনার্দন দুঃখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। তবু হায়, জনার্দন ঠাকুরের এই মাটির জন্য আশ্চর্য এক ভালোবাসা। এমন মাটি, ভালবাসার মাটি, কোথাও যেন তাঁর নেই। তিনি এখানে রাজার মত ছিলেন, মানুষের কাছে তিনি এখানে পীরের মত। সেই মানুষেরা চলে গেছে। সেই সব ভালবাসার মানুষেরা চলে গেছে। তিনি তাদের আর কিছুতেই বুঝি ফেরাতে পারবেন ন,। তাঁর বাপ-পিতামহের গল্প, দেবীর সব পৌরাণিক ইতিহাস, এবং যা চমকপ্রদ, ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রবাদ এই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। কেউ আর স্মরণ করবে না, জনার্দন ঠাকুরের পরিবার দশ পুরুষ আগে পূর্ববাংলার কোন প্রত্যঙ্গ অঞ্চল থেকে এসে এখানে সুবচনী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন এত লোকালয় ছিল না, দেবীর আশীর্বাদ পাবার লোভে মানুষেরা এই পাহাড়ের নিচে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর থেকে এই জনার্দন এবং তাঁর পরিবার পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাসের মত।

জনার্দন ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ফের উপবীতে হাত রেখে বিড় বিড় করে

কি যেন আওড়ালেন, যেন তিনি শপথ করছেন। কিসের শপথ স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবু তাঁকে দেখলে মনে হল আমৃত্যু এই মাটির সঙ্গে তাঁর লড়াই। দেবীর সঙ্গে তাঁর লড়াই। ঊষর এই দেশকে উর্বর করে তোলার জন্য তাঁর সংগ্রামকে বড় স্বাস্থ্যকর মনে হবে। কিন্তু তাঁর মুখের ছবি, চোখের দৃঢ়তা এবং উপবীতের অহঙ্কার তাঁকে যেন বড় এক লম্বা দৈত্যের মত বড় করে ফেলেছে! ভয়ঙ্কর খরা, বাইরের লু আর ঊষর প্রকৃতি তাঁকে নিরস্ত করতে পারল না।

শরীর-মন-প্রাণ শক্ত করার জন্য তিনি বিড়বিড় করে দেবী সুবচনীর পাঁচালী পড়তে থাকলেন, সুবচনী মায়গ বাড়ি বাড়ি যায়, বাড়ি বাড়ি গেলে মায়গ ধান-দূর্বা পায়। আরও কি বলার ইচ্ছা যেন। যেন বলার ইচ্ছা মা, তোর এত ছেলে আছে, আর তুই তোর মাটির ছেলেদের সব একসঙ্গে গ্রাস করে ফেললি! জনার্দন চিৎকার করে উঠলেন, সুবচনী মায়গ আমার বড় দয়াময়, ছেলে কোলে লইয়া ঘোরে পাড়াময়। জনার্দন আবছা অন্ধকারের ভিতর উঠে বসলেন, বললেন, তুই যদি দয়াময়ী হস মা তবে তোর এই রাক্ষুসী মুখ দেখতে পাচ্ছি কেন?

তখন সারা মাঠ খা খা করছিল। চিতার মত জ্বলছে গ্রাম-মাঠ গাছ-গাছালি। জনার্দন পরিত্যক্ত এক কুঁড়েঘরে বসে আছেন। তিনি ভিজা আলখেল্লাটা গায়ের ওপর রেখে দিয়েছিলেন, এখন সেই আলখেল্লা এবং কাপড় দুই-ই শুকিয়ে প্রায় শক্ত কাঠ।

তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বিশ-ত্রিশ ক্রোশ হেঁটে শহরের দিকে চলে যাবেন — কিন্তু যা খবর সেখানেও লোক নেই। লোক সব শহর-গঞ্জ ছেড়ে দিচ্ছে। সরকার থেকে যা সামান্য সাহায্য আসছে তাও বন্ধ। সরকার থেকে যে পাতকুঁয়ো গ্রামের মাঠে কাটা হয়েছিল, তাতে জল নেই। সুতরাং জনার্দন ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছেন। ওঁর প্রবল আবেগ, ঊষর জমি উর্বর করে তোলার আবেগ ক্রমশঃ মরে যাচ্ছিল। কারণ সর্বত্র এই হাহাকারের দৃশ্য — জনার্দন এবার পাগলের মত দরজা খুলে দিলেন এবং তপ্ত মাঠের ওপর দিয়ে লুএর ভিতর দিয়ে শ্মশানের মত এক সাম্রাজ্য শুধু চারিদিকে — জনার্দন চোখ-মুখ বন্ধ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই পাহাড়ের উদ্দেশে ছুটছেন।

।। চার ।।

তখন ট্রেনটা ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে ছাড়ব ছাড়ব করছে। সুবল কামরা থেকে নেমে গিয়েছিল, নেমে গিয়ে দেখল বড় একটা চোঙ দিয়ে আকাশ ফুঁড়ে যেন জল পড়ছে। এত জল! সে অবাক হয়ে তাকাল পশ্চিমের দিকে, সেখানেও বড় একটা চোঙ থেকে জল পড়ছে আকাশ থেকে। এত

জল ! সুবল দেখল নিচে ছোট ছোট টিপকল, কেবল জল অর জল। সে তাড়াতাড়ি পোঁটলাপুঁটলি রেখে জলে স্নান করে নিল। জল আর জল। চোখে-মুখে জল পড়তেই শরীরের সব অবসাদ কেটে গেল। যেন সমস্ত শরীরে ঈশ্বর তাঁর ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ দিচ্ছেন। সে কলের নিচে শুয়ে বসে লাফিয়ে স্নান করল। ওঃ, কি ঠাণ্ডা জল ! ওঃ, কি আরাম !

কিন্তু একজন নীল উর্দিপরা লোক এসে হেঁকে উঠতেই সে ভয়ে ভয়ে কলের নিচ থেকে বের হয়ে গা-শরীর মুছে যখন প্ল্যাটফরম ধরে হাঁটছিল তখনও ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। জেবের ভিতর পাখিটা আছে কিনা দেখে নিল সুবল, তারপর ছুটে গিয়ে সেই কামরার জানালায় দাঁড়িয়ে হাঁকল, টুকুন দিদিমণি, আমি স্নানটা সেরে নিলাম।

সুবলের মুখ কি সতেজ, আর কি এক গ্রাম্য সরলতা— আশ্চর্য সরল চোখ সুবলের। স্নান করার জন্য চুল থেকে এখনও টুপটাপ জলের ফোঁটা মুখে শরীরে পড়ছে। সেই লম্বা জামা গায়ে, পোঁটলা-পুঁটলি কাঁধের দু'ধারে ঝোলানো— প্রায় তীর্থযাত্রীর মত দেখতে। একটা শুকনো ডাল হাতে এবং বাঁশের চোঙটা পিঠের ডানদিকে ঝুলছিল।

টুকুন ওর সরল গ্রাম্য চোখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, সুবল, তুমি কলকাতায় গেলে আমাদের বাড়িতে এস।

— যাব দিদিমণি।

— তোমার পাখিটা কোথায় সুবল ?

— পাখিটা জেবের ভিতর বটফল খাচ্ছে দিদিমণি।

— তোমার পাখিটা আর একবার উড়বে না ?

— উড়বে না কেন ? বলে সে হাত দিল পকেটে। তারপর পাখিটাকে কাঁধে বসিয়ে দিল। তারপর এই প্ল্যাটফরমে পাখিটা সুবলের মাথার চার পাশে ঘুরে ঘুরে ফের জেবের ভিতর ঢুকে গেল।

টুকুন বলল, তুমি আমাদের বাড়িতে গেলে আমি আবার পাখির খেলা দেখব। বলতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। সুবল একটু সময় গাড়িটার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে গেল। সুবল, টুকুন দিদিমণিকে একটা চন্দনের বীচি, একটি পাথর এবং সেই দুর্মূল্য কুঁচফল দেবে ভেবেছিল, এত তাড়াতাড়ি ট্রেন ছেড়ে দেবে তার মনে হয় নি। সে পোঁটলা খুলে দিতে গিয়ে দেখল ট্রেনটা সামান্য চলছে ! সে দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিকে অপরিচিত জন, পাখিটা জেবের ভিতর খুঁটে খুঁটে কেবল ছোলা খাচ্ছে, আর একটা ট্রেন এসে এই মাত্র থামল প্ল্যাটফরমে। সব মানুষেরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামছে কিন্তু বড় নির্জন মনে হল জায়গাটা। যেন সেই পরিত্যক্ত মাঠ এবং পাহাড়ের মত এই প্ল্যাটফরমে শুধু হাহাকারের দৃশ্য। কোথাকার একটা ট্রেন তার প্রিয় দিদিমণিকে নিয়ে চলে গেল।

সুবলের দীর্ঘদিন পর আজ মা'র কথা মনে হল। মেলার কথা মনে

হল। সুবচনী দেবীর মন্দিরে ফসল ঘরে এনে যে উৎসব হত তার কথা মনে হল — সেই মেলায় বিদেশ থেকে কত লোক আসত, বাজীকর আসত, সাপের পেটে মানুষের মুখ, একটা মানুষের তিনটে মুখ, তিনটে মানুষের একটা মুখ, বড় বড় কাঁচের বৈয়াম, আর তার ভিতর বিভূত কিমাকার সব মানুষ, অথবা মাঠের শেষ দিকে বড় তাঁবু, সার্কাসের খেলা, হাতি, বাঘ, সিংহ, একটা মেয়ে তারে ঝুলে খেলা দেখাতে। একটা ট্রেন গাড়ি তার টুকুন দিদিমণিকে নিয়ে চলে গেল — এ-সব দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকল সুবলের। আর একটা ট্রেন এসে থেমেছে। ট্রেন চলে যাবে এবার। সুবল ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে বসে ওর পোঁটলাগুলো ফের বেঁধে নিল। তারপর যাকে সামনে পেল তাকেই শুধাল, এই ট্রেন, কর্তা, কলকাতা যাবে না ?

কে যেন বলল, যাবে।

সে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠে গেল। ট্রেনটা নীল রঙের। বড় হাতল ঝুলছে। সুবল বয়েস অনুযায়ী লম্বা এবং পায়ের পেশী পাহাড়ে ওঠা-নামার জন্য বড় শক্ত। সে এক পাশে ভিড়ের ভিতর একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন আর মনে কোন গ্লানি নেই। ট্রেনটা ওকে কলকাতা নিয়ে গেলে সে টুকুন দিদিমণির কাছে চলে যেতে পারবে।

আর এ-সময়ই সুবলের মনে হল ভীষণ ক্ষুধা পেটে। সে তার সঙ্গের শুকনো বটফল থেকে একটা দুটো করে মুখে পুরে দিতে থাকল। সে বটফল চিবুচ্ছে আর দু' পাশের বড় বড় কলকারখানা দেখে কেবল বিস্মিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন কোন এক রাজার দেশে চলে এসেছে। যেন এখানে অন্নের অভাব নেই। অন্ন চাইলেই অন্ন। জলের অভাব নেই, জল চাইলেই জল। আর ভালবাসার অভাব নেই, টুকুন দিদিমণি রাজ্যের সব ভালবাসা তার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। তার মনে হল, কলকাতায় পা দিলেই সে রাজা বনে যাবে।

সুবল দেখল তার গাড়ি আশ্চর্য এক নগরীর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। সে চোখ মেলে যত দেখছে তত বিস্মিত হচ্ছে। বড় আশ্চর্য এক নগরী — চারিদিক বড় বড় প্রাসাদের মত বাড়ি, সেই সুসনের রাজবাড়ির মত, কবে একবার বাবা তাকে রাজবাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, কবে একবার সে ছোটবেলায় গল্পের বইয়ে রাজবাড়ির গল্প পড়েছিল, চারিদিকে বড় বড় অট্টালিকা, চারিদিকে বাঁধানো রাস্তা। বড় বড় দেবদারু গাছ, গাছে গাছে রূপোর পাতা, সোনার ফল, নীচে বনের ভিতর সোনার হরিণ — এ যেন সেই রাজার দেশ, লাইনের ওপর তার, আর আশ্চর্য এক লম্বা ঘরের ভিতর তার গাড়ি ঢুকে গেছে, নানারকমের নীল-লাল রঙের বাতি, বেগুনী রঙের বাতি, কত হাজার হাজার লোক, সব রাজবাড়ির রাজপুত্রদের মত ফিটফাট, কোথাও কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই, ঝক ঝক করছে সবকিছু।

অথচ কেউ দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত গল্প করছে না, সকলে নিজের মত

হেঁটে যাচ্ছে। সকলে ব্যস্ত। সকলে যেন কোথাও কোন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে। অথবা কোথাও বড় এক রাজবাড়ি আছে, সকলে সেই রাজবাড়ির উদ্দেশে ছুটছে।

সুবল ভিড়ের ভিতর দেখল ডান পাশের লোহার গেটে চেকারবাবু কার সঙ্গে পয়সার হিসাব করছেন গোপনে, মনে হল, চেকারবাবুর হাতে কে পয়সা গুঁজে দিল। সুবল দাঁড়িয়ে থাকল। ওর কাছে পয়সা নেই, টিকিট নেই। এখন টুকুন দিদিমণি নেই যে ওকে গেট পার করে দেবে। এই লোহার দরজাটার কাছে এসেই সুবলের ভয়ে পা সরছিল না। সে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, ভিড় কমলে চেকারবাবুকে বলবে, বাবু আমার পয়সা নেই, আমার কিছু বটফল আছে, কিছু পাথর আছে আর আছে এক পাখি। আমি বাবু আমার পাখির খেলা দেখাতে পারি। বাবু পাখির খেলা দেখলে আপনি খুশি হবেন। খুশি হলে বাবু ওকে ছেড়ে দেবে এই ভেবে সুবল একটু পেছনের দিকে সরে তাকাতেই দেখল — ট্রেন, মেলা ট্রেন, কেবল ভোঁস ভোঁস করছে ট্রেন। মানুষ আর লটবহর চারিদিকে। লোহার রেলিং পার হলে ফলের দোকান। চারিদিকে এত প্রাচুর্য, এত সম্পদ, এত মানুষ, এত জল — সুবল ক্রমশঃ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ছে।

তখন চেকারবাবু ডাকলেন, এই ছোকরা, ওখানে কি হচ্ছে। টিকিট কোথায়?

-- বাবু টিকিট নেই।

চেকারবাবু দেখলেন সুবলকে এবং চেহারা দেখে না হেসে পারলেন না। ভিখারীর মত জামাকাপড় গায়ে কতরকমের পোঁটলা ঝুলছে কাঁধে, হাতে লাঠি এবং পিঠে বাঁশের চোঙ। একেবারে বহুরূপী।

অন্য চেকারবাবু বললেন, ঠিক শালা খরা অঞ্চলের লোক। উপদ্রব বাড়ছে।

— কি করে হবে! ওরা তো সব দল বেঁধে আসছে। এ তো একা।

— দল ছুট। দেখে বুঝতে পারছ না?

সুবল দেখল বাবু দু'জন ওকে দেখে খুব হাসাহাসি করছে। সুবল যেন সাহস পেল এবার। কাছে গিয়ে বলল, বাবু আমাকে ছেড়ে দিন। আমার পয়সা নেই। এই দেখুন বলে সে তার জেব উল্টে দেখাতে গেলে পাখিটা উড়ে এসে ওর মাথার ওপর বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে চেকারবাবু দু'জন বলল, শালা ভোজবাজি জানে। জেব উল্টে পয়সা নেই দেখাতে গেল আর শালার জেব থেকে পাখি উড়ে এসে মাথায় বসল। পয়সার বদলে পাখি!

চেকারবাবু বললেন, খুব তো ভোজবাজি শিখেছ।

— না কর্তা। কোন ভোজবাজি নেই। পাখি আমার পোষা। ও জেবের ভিতর থাকে। খুব নাছোড়বান্দা না হলে চোঙের ভিতর ভরে রাখি না। বলে সে পিঠ থেকে বাঁশের চোঙ এনে উল্টে দেখাল। তারপর একটু

হেসে খুব বিনীতভাবে বলল, যাব কর্তা ? শুকনো বটফল ছিল পোঁটলাতে, কথা বলতে বলতে দুটো একটা বটফল মুখে পুরে দিচ্ছিল।

এখন যথার্থই যেন সুবলের কোন ভয় ছিল না। কোন ডর ছিল না। চেকারবাবুরা ওকে কোন আর ভয়ও দেখাচ্ছে না, কেমন আল্লা করে পথ ছেড়ে দিলেন। সুবল পাখির খেলা দেখানো জন্য চেকারবাবু দু'জন বোধহয় খুশি। সে প্রায় চুপি চুপি বের হয়ে সোজা স্টেশনের কাউন্টার পর্যন্ত হেঁটে এল। প্রায় মুক্ত এখন সুবল। সে ঘুরে ফিরে এত বড় স্টেশন দেখতে থাকল। চারিদিকের এই প্রাচুর্য ওকে জীবন যাপন সম্পর্কে আর কেন ভয় উদ্রেক করতে পারল না। যখন এত প্রাচুর্য, এত জল আর এত সুখী মানুষের ভিড় তখন সামান্য এক সুবলের আহারের জন্য ভাবনা কি। সে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে থাকল, ঘুরতে থাকল এবং ছবির মত, রাজারানীর মত আর নদীর জলের মত পরিচ্ছন্ন এই স্টেশনের চারিদিকটা দেখতে পেয়ে সে আনন্দে প্রায় শিস দিয়ে উঠল।

কোন গ্রাম্য সঙ্গীত ও শিসে বাজাচ্ছিল। আর ওর মুখের শিস শুনে পাখি পর্যন্ত আত্মহারা। পাখি এবং সুবল এমন একটা দেশে চলে এসেছে— এমন প্রাচুর্যের দেশ, ভাবল সে। বাইরে বের হতেই দেখল বড় বড় দোতালা সব বাসগাড়ি, ট্রামগাড়ি দৈত্যের মত— সেই যেন আলাদীনের প্রদীপ, যা চওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। আলাদীনের পোযা দৈত্যের মত সব ট্রামগাড়ি। বাসগাড়ি সুবলের জন্য এবং ওর পাখির জন্য প্রতীক্ষা করছে। সুবল বলল, রোস। আমরা আসছি। কারণ ডানদিকে কিছুদূর হেঁটে গেলে জল, টিপকল থেকে কেবল জল পড়ছে।

সে জলের নীচে ফের ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। পাখিকে জল খাওয়াল, স্নান করাল। এবং শান্তশিষ্ট বালকের মত সে তার ভিজা নেংটি কাপড়, জামা সব রেলিঙে শুকোতে দিলে।

এখন নদীর জলের ওপর সব বড় জাহাজ ভাসছে, কোথাও আকাশের নীচে লম্বা ম্যাচ বাক্সের মত বাড়ি, ডানদিকে বড় এক পুল, মাথায় সারি সারি সব পাখি বসে রয়েছে আর সব ঠেলাগাড়িতে আলু, কপি, ফুলকপি, শাকসব্জি হরেক রকমের কত তরমুজ এবং ফল যাচ্ছে। সে অপলক দেখতে দেখতে সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা ভাবল। তিনি সামান্য জলের জন্য কি না-করেছেন। পাগলের মত পাহাড়ের নীচে, সমতলভূমিতে, নদীর ঢালু অঞ্চলে এবং পাহাড়ের গিরিপথে জলের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। হায়, যদি মানুষরা কলকাতার এত প্রাচুর্যের কথা জানতে পারত। তা হলে বুঝি তিনি সব ফেলে, তাঁর সুবচনী মন্দিরে তেলসিঁদুর ধান-দুর্বা ফেলে এখানে চলে আসতেন।

ঠিক তক্ষুনি এক বৃদ্ধ যেন সেই জনার্দন চক্রবর্তী, সে কাছে গিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল— না, জনার্দন ঠাকুর নয়, অন্য মানুষ, তেমনি লম্বা

জোয়ান মানুষ, মাথায় সাদা চুল, চোখ বড় বড়, পায়ে হরেক রকমের রং-বেরঙের কানি বাঁধা, হাতে পায়ে গলায়! ঠিক ফকির দরবেশের মত মুখ — কেবল হেঁকে যাচ্ছে। কি হাঁকছিল বোঝা যাচ্ছে না — খুব সন্তর্পণে কান পাতলে ওর অস্পষ্ট কথা ধরা যাচ্ছে। সে দু'হাত ওপরে তুলে নাচছিল, গাইছিল এবং মাঝে মাঝে কলকাতা শহরকে যেন সে জরীপ করছে — একটা ফিতা ছিল হাতে, সে ফিতা দিয়ে কি যেন কেবল মাপছে মাঝে মাঝে। সুবল বুঝল মানুষটা তবে জনার্দন চক্রবর্তী নয়। সুবল রেলিঙ থেকে ওর জামাকাপড় তুলে নিল। তারপর এক অনির্দিষ্ট যাত্রা। এই শহর এত বড় শহর ঘুরে ঘুরে দেখা। কিছু আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। সুবল আহার সংস্থানের নিমিত্ত চারিদকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটতে থাকল।

তখন টুকুন হাসপাতালের এক ঘরে শুয়ে ছিল। জানালার পাশে টুকুনের বিছানা। স্প্রিঙের খাট। মাথার দিকটা একটু ওপরের দিকে তোলা। টুকুন সামনের জানালা দিয়ে মাঠ দেখতে পাচ্ছিল। জানালার নীচে পথ, পথের ওপর এক ফুচকাওয়ালা ফুচকা বিক্রি করছে। বড় গরম চারিদিকে। বৃষ্টি নেই, টুকুন গরমে হাঁসফাঁস করছিল দুপুর থেকে।

এখন বিকেল সুতরাং এখন ফুচকাওয়ালা ফুচকা নিয়ে বের হয়েছে। এখন বিকেল সুতরাং মাঠে মাঠে খেলার দৃশ্য আর পার্কের ভিতরে ছোট বড় ছেলেমেয়ে সব খেলতে এসেছে। ওরা ঘাসের ওপর ছুটাছুটি করছিল।

টুকুন জানালা থেকে সব দেখতে পাচ্ছে। একটা গাছে কিছু ফুল ফুটে আছে — কি ফুল হবে, বোধহয় নাগেশ্বর ফুল, ফুলের সৌরভে সব পার্কটা কেমন আমোদিত এবং বোধ হয় এই সব ফুলের সৌরভের জন্য নানা রকমের পাখি উড়ে এসেছে, পাখিগুলো উড়ছিল, পাতা উড়ছিল, পাখিগুলো উড়ে উড়ে ডালে বসছে, ঠিক যেন সব সুবলের পাখি! সুবল, এক পাখিওয়ালা সুবল এই শহরে এসে নানা জাতের সব পাখি ছেড়ে দিয়েছে আকাশে।

কিন্তু রাস্তার অন্য দৃশ্য। রাস্তার ওপর বড় মিছিল। মিছিলের আগে একটা মানুষ লাঠি হাতে হেঁটে যাচ্ছে। পেছন একদল মানুষ, ওদের হাতে নানা রঙের ফেস্টুন, ভিন্ন ভিন্ন লেখা, বাঁচার মত খাদ্য দিতে হবে। চোরাকারবারী বন্ধ করতে হবে, অথবা যেন বলার ইচ্ছা সকলের, আমাদের দাবী মানতে হবে, না মানলে সংসারে সব আগুন লাগিয়ে দেব।

অযথা টুকুন মাঝে মাঝে এমন সব দৃশ্য দেখতে পায় যা মনকে ব্যথিত করে। সামনে একটা — বোধ হয় ওটা শাল-শিমুল জাতীয় গাছ, গাছের নীচে প্রায় উলঙ্গ সব কাচ্চাবাচ্চা, প্রায় নগ্ন সব যুবক যুবতী রাতে শুয়ে থাকে। ভোর হলেই ওরা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। আর টুকুনের চোখে ঘুম নেই বলে, শেষ রাতের দিকে কেবল মনে হয় ঘোড়ার গাড়িতে অথবা গরুর গাড়িতে কারা যেন শহরে কেবল কি সব ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে চুরি করে।

অথবা মাঝে মাঝে রাত গভীরে শহরের সব অলিগলিতে কিসের যেন ফিসফিস শব্দ, ওরা যেন এক ষড়যন্ত্র করছে।

ভোর হলেই টুকুন দেখতে পায় এক ছোট্ট বালক কাঁধে মই নিয়ে দেয়ালে দেয়ালে কেবল পোস্টার মেরে যাচ্ছে। ওর একদিন বলতে ইচ্ছা হল— এই পোস্টারয়ালা, তোমার পোস্টারে কি লেখা আছে?

হয়তো সেই পোস্টারয়ালা জবাব দেবে— কি করে বাঁচতে হয় তার কথা লেখা আছে।

আমার পায়ে শক্তি নেই, আমার শরীর ক্ষীণ হয়ে আসছে, আমি আর বাঁচব না বুঝি। পোস্টারয়ালা, তোমার পোস্টারে আমার বাঁচার কথা লেখা নেই? টুকুনের আরও যেন কি সব প্রশ্ন করার ইচ্ছা। শাল-শিমুলের নীচে যুবক-যুবতীরা কেন রাতে শুয়ে থাকে, অন্ধ গলিতে রাতে কারা ফিসফিস করে কথা বলে, কত রকমের ভোজ্যদ্রব্য চুরি যাচ্ছে শহরে, গ্রামে, কেবল মানুষেরা আপন স্বার্থের জন্য সঞ্চয় করে যাচ্ছে, অন্যের জন্য ভাবনা নেই, এমন কেন হয়, টুকুনের ঘুম আসে না রাতে, কেবল দুঃস্বপ্ন।

মা-বাবা বিকালে আসেন, ওঁদের মুখ বড় করুণ, বাবা সারাদিন অফিস করেন, কত হাজার টাকা বাবা রোজগার করেন, বাবা টুকুনের কাছে বীরপুরুষের মত, মা বাবাকে আদৌ সমীহ করেন না, মা কেমন গোমরামুখো অথবা বাবা টুকুনকে এই যে নানা রকমের খেলনা কিনে দিয়ে যাচ্ছে— গোটা ঘর ভর্তি খেলনা, রাতে ওরা টুকুনের সঙ্গে কেবল কথা বলতে চায়, কিন্তু টুকুন সামান্য তাজা মুখ নিয়ে টুকুন যখন কথা বলতে থাকে তখন বড় বেড়ালটা মিউ মিউ করে কাঁদে। টুকুনের রাগ হয়। তুমি কাঁদবে না, কাঁদলে তোমাকে বাছা জলে ফেলে দেব।

গোটা ঘর ভর্তি খেলনা! টুকুনের মাঝে মাঝে মনে হয় খেলনাগুলো সব নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। হাসি-মসকরা করছে। যেন টুকুনই এখন ওদের খেলনা হয়ে গেছে। কারণ টুকুন বিছানা ছেড়ে ওদের কাছে যেতে পারে না, হাঁটতে পারে না। দিনের বেলায় শুধু জানালা দিয়ে সামনের মাঠ দেখে, এবং মাঠ, গাছ, পাখি আর পথের বিচিত্র সব মানুষদের দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়। ওর তখন সব ছেড়েছুঁড়ে ছুটতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়, পায়ে একেবারে শক্তি পাচ্ছে না। হায়, সেই পাখিয়ালা যে টুকুনকে হাসিয়েছিল, যার জন্য টুকুন তালি বাজিয়েছিল এবং যে মানুষের জন্য টুকুন দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছিল, সেই মানুষের আর দেখা নেই।

টুকুনের বাঁ-দিকে বড় একটা পুতুল ছিল, টুকুন দেখল পুতুলটা যেন ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। সামান্য গোঁফের রেখা আছে পুতুলটার মুখে, পুতুলটার নামও আছে একটা, টুকুন চীৎকার করে উঠল, রাজা, এক থাপ্পর মারব। খুব হাসা হচ্ছে! সব খেলনাগুলো ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল।

টুকুন সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বালিশের নীচ থেকে চন্দনের বিচি, পাথর এবং কুঁচ ফল বের করে দেখাল রাজাকে এবং অন্যান্য পুতুলগলিও ওর দিকে যেন চন্দনের বিচি, লাল-নীল পাথর, কুঁচ ফল দেখার জন্য এগিয়ে এল। টুকুন এবার বলল, বুঝলি রাজা আমি মিথ্যা বলি না। এই দেখ, সুবল আমাকে কত কিছু দিয়েছে। সুবলকে পুলিশ ধরতে এসেছিল, আমি নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং কুদুমাসী বিড়াল সকলের হয়ে আদাব দিল টুকুনকে। তারপর টুকুন তাচ্ছিল্যভরে ওদের শোনাল, দেখিস সুবল এলে আমি তোদের হেঁটে দেখাব। সুবল জাদুকর, সে জাদুর পাখি রেখেছে কাঁধে। সে পাখি উড়িয়ে দিলেই আমি তোদের কাছে হেঁটে চলে যেতে পারব।

।। পাঁচ ।।

সেই এক জাদুকরের জন্য জনার্দন চক্রবর্তীও ঘুরছে। মাঠময় ঘুরছে। একা নিঃসঙ্গ মাঠে জনার্দন চক্রবর্তী রাতের অন্ধকারে অথবা ভোররাতের দিকে ঘুরছে। খরা থেকে এই মাটিকে রক্ষা করার জন্য ঘুরছে। এক প্রচণ্ড অহমিকা জনার্দনের। সুবচনী দেবীর মন্দিরে মাথা কুটছে, মা জল দাও। জল দাও। মা, জলে তুমি মাটি ভাসিয়ে দাও। মা, তোমার সন্তানেরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেল। কেউ আর ফিরে এল না, আমি মরে গেলে তোকে কে আর ফুল-জল দেবে ! কিন্তু নিষ্ঠুর সুবচনী দেবী, করালবদনী ডাইনী মুখ ব্যাদান করে আছে। লম্বা জিভে যেন জনার্দনকে ভেংচি কাটছে। শ্মশানের মত মন্দিরের চার পাশে শুধু আগুনের মত রোদ।

জনার্দন মাঝে মাঝে দেবীর কপালে হাত রাখত, কপাল ঘামছে কিনা দেখত, কপাল ঘামলে দেবী প্রসন্না হবেন।

সে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য এক রাতে হাজার বিল্বপত্র সংগ্রহের জন্য বের হয়ে দেখল, গাছে কোন বিল্বপত্র নেই। সে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য জল তুলে আনল নদীর গর্ত থেকে কিন্তু এমন মরুভূমির মত স্থান যে জলের রঙ ক্রমশ গাঢ় হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করল। দেবী হা হা করে হেসে উঠে যেন ভয় দেখালেন জনার্দনকে। জনার্দন ক্ষেপে গিয়ে বলল, বল মাগি, কবে বৃষ্টি হবে, তোর কোন মরদকে ধরে আনতে হবে বল, বলে সেই নগ্ন সন্ন্যাসী অথবা কাপালিকের মত চেহারা যে জনার্দন মুখে বড় দাড়ি, নাসিকা লম্বা, আর কোটরাগত চোখ থেকে আগুন ঝরছে, সেই জনার্দন হা হা করে লাঠি তুলে তেড়ে গেল দেবীর কাছে এবং চীৎকার করে উঠল, জল, জল চাই, জল না হলে শালী তোর একদিন কি আমার একদিন। এই দ্যাখ, বলে সে বড় শক্ত বাঁশের লাঠি ঘরের কোণে তুলে রাখল, জল না হলে তোর

মাথা দু'ভাগ করে দেব। তোর ছেইলা কোলে নিয়া বেড়ানোর সখ ভেঙ্গে দেব।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। সুতরাং ভিতরে উত্তাপ কম। প্রায় সারাটা দিন এই মন্দিরে জনার্দন পড়ে থাকে। প্রায় সারাটা দিন জনার্দন দেবীর সঙ্গে বচসা করে, কথা বলে, মার্জনা ভিক্ষা করে, অথবা উপবীতের অহঙ্কার দেখায়। পাথরের দেয়াল বলে এবং জায়গাটা পাহাড়ের গুহার ভিতর বলে ওর চীৎকার অথবা মার্জনা ভিক্ষা কোন কাকপক্ষী পর্যন্ত টের পায় না। কোন লোক চলাচল আর নেই এ অঞ্চলে।

সে মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপরে উঠে দূরে ট্রেনের শব্দ শোনার চেষ্টা করে অথবা কখনও দেবীর গায়ের কাছে পড়ে থেকে মা মা বলে কাঁদতে থাকে — মা, সোনার দেশে ফসল ফলাবি না মা ? কোন পাপে মাগো তোর মাটিতে আর ফসল ফলে না, বৃষ্টি হয় না।

দেবীর মুখ তেমনি নির্বিকার। ছেলের মুখ দেবীর স্তনের কাছে। কালো পাথরের মূর্তি। এক ফুটের মত লম্বা। পায়ে কপালে এত সিঁদুর যে এখন আর মুখ এবং স্তনের প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। নীচে বেদী। বেদীমূলে কিছু ধান-দূর্বা, শুকনো ধান-দূর্বা, শংখ কোষাকুসি, ঢোল ঢাক, বড় কাঁসি আর বাঘের কি হরিণের চামড়া, ব্যবহারে সব লোম উঠে গেছে, সুতরাং বাঘ অথবা হরিণ না অন্য জীবজন্তুর চামড়ায় তৈরি এই আসন বোঝা যায় না। তেল-সিঁদূরের জন্য দেবীর মুখ সব সময়ই চক চক করছে।

জনার্দন তিক্ত হয়ে দেবীর মুখে দুটো বুড়ো আঙ্গুল ঠেসে ধরল। বলল, খা, কাঁচকলা খা। বস্তুত জনার্দন পেটে ক্ষিধে থাকলে এমন করতে থাকে। কোন খাদ্যদ্রব্য নেই। সে গত রাত্রে বনের ভিতর বন-আলুর মত লতার সন্ধানে ছিল, সে কিছু খুঁজে পায় নি। লতার সন্ধান পেলে সে মাটি খুঁড়ে অনেক নীচ থেকে বড় থামের মত আলু তুলে আনতে পারত।

সে সুতরাং সারাদিন উপোসী থেকে দেবীর ওপর তিক্ত হয়ে পড়ছে। নিজের উপবাসই দেবীর উপবাস। নিজের দুঃখই দেবীর দুঃখ। — কি আর খাবি মা। হয়তো কিছু বটফল সংগ্রহ করেছে জনার্দন, তাই মুখে ফেলে বলল, খা মাগো, খা, এই খেয়ে পেট ভরে ফেল। কেমন লাগে মা খেতে! সে নিজে বটফল চিবিয়ে বলত, কেমন লাগে! ভাল লাগে! খা, ভাল লাগলে অমৃত বলে খেয়ে নে। সে কোঁৎ করে একটা ঢোঁক গিলত তারপর। তারপরে দেবীর মুখের দিকে ফ্যাকাসে চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকত কিছুক্ষণ, একসময়ে হা হা করে হেসে উঠত ফের। — কেমন লাগে, অন্ন নেই, জল নেই, মানুষ নেই, জন নেই, ফুল বেলপাতা, দূর্বা-ধান কিছু নেই, কেমন লাগে! ছেইলা কোলে লৈয়া বৈসা থাকতে কেমন লাগে। চেষ্টা নেই, সাধনার ধন মা না দিলে ফসল ফলে না। বলে জনার্দন দরজাটা ফাঁক করে দেখল, বেলা পড়ে গেছে। সূর্য পাহাড়ের অন্য মাথায় নেমে গেছে।

এবার তার ফের বের হবার পালা। এখন বের হলে সব ঘুরে, পাহাড়ময় ঘুরে মাঠময় ছুটে নদীর গর্ত থেকে ভোরের দিকে সামান্য জল নিয়ে ফের সুবচনীর মন্দিরে উঠে আসা যাবে। জল তোলার আগে তেমনি সেই হরিণী তার দুই শিশু নিয়ে এসে বসে থাকতে পারে। জলের জন্য পারে সে বসে থাকত। জনার্দন উঠে আসার মুখে ওদের জল দেবে খেতে। জীবের জন্য মায়া। যেন জীব বলতে সামান্য এই হরিণ, তার দুই শিশু, ক্বচিৎ দুটো একটা পাখি উড়ে যেতে দেখা যায়।

জনার্দন আকাশের দিকে চোখ তুলে অনেকক্ষণ পাখির আকাশে ওড়া দেখে, কোথায় কোন টুকরো মেঘ আকাশের কোলে ভেসে আসছে কিনা দেখে, আর হা-অন্নের জন্য দু'হাত তুলে যেন হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়, একটি ম'ল জলে ডুবে রইল বাকি নয়, জনার্দন ডুবে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া ছেলের মত মাঠময় পাহাড়ময় শুধু নদীর কোথায় জল সঞ্চয় করে রাখলে সম্বৎসর এই অঞ্চল জলে ভরে থাকবে, তাই অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং রাতের বেলায় জনার্দনকে চেনা যায় না। মানুষ বলে চেনা যায় না। এক দৈত্য আলখেল্লা পরে অথবা এক কাপালিক মাথায় পাগড়ী বেঁধে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জল, মাগো জল চাই। এমন এক অঞ্চল মা, জলের ব্যবস্থা থাকলে আর কোনকালে এখানে দুর্ভিক্ষ হবে না, সময়ে জল চাই ফসলের গোড়ায়।

নদীর নীচে জমি, বাঁধ দিলে জল থাকে, এমন কে জায়গায় সন্ধানে ছিল জনার্দন যেখানে অল্প আয়াসে বাঁধ দিলে সব জল বর্ষায় নেমে যাবে না, কিঞ্চিৎ জল থেকে গেলেই এ অঞ্চলের খরা নিভে যাবে। সেজন্য জনার্দন প্রায় পাগলের মত পাহাড়ের ঢালুতে, বাদে এবং নদীর উৎরাইয়ে রাতের অন্ধকারে অথবা যখন জোৎস্না থাকত, চাঁদের মরা আলোতে জনহীন প্রান্তর ভীষণ মনে হত তখন জনার্দন দাগ কেটে আপন উদ্যম, সফল উদ্যম মিলিয়ে নদীর তটে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিত। বটফল, বন আলু এবং ক্বচিৎ কোথও মৃত পাখি অথবা জীব মিলে গেলে তার মাংস জনার্দনের খাদ্যবস্তু ছিল।

জনার্দন মাঠময় ঘুরে পাহাড়ময় ঘুরে বুঝি সেই স্থান সেই সংযোগস্থলের সন্ধানে খুঁজে পেয়েছিল। সে রাত হলেই বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিত, নদী এখানে বড় সরু পথ কেটে নেমে গেছে। দু'ধারে পাহাড়, উঁচু মত পাহাড়, জল নেমে গেলে পাহাড়ের ভিতর হ্রদের মত জল ধরে রাখবে, শুধু খাদে বড় কিছু পাথর ফেলে দিতে হবে, হাজার পাথর, লক্ষ পাথর। জনার্দন শিশু বয়সের কবিতা আওড়াত — উদ্যম — বিহনে কিবা পূরে মনোরথ। শুধু উদ্যম চাই, সফল উদ্যম।

সে একটা পাথর টেনে আনত আর বলত উদ্যম চাই, উদ্যম। মা,

মাগো, শক্তি দে। সে আবার পাহাড়ের মাথায় পাথর দোলাত, তারপর পাথরটা নীচে ফেলে দিত, মাগো উদ্যম চাই, উদ্যম। সে সারারাত এই করে ভোরের দিকে হরিণ শিশুদের জলের ব্যবস্থা করে, নিজের জন্য সামান্য জল তুলে সুবচনীর মন্দিরে উঠে যেত। ওঠার সময় শুনত, মা-ও যেন বলছেন, উদ্যম চাই জনার্দন, আমরা বড় উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি।

টুকুনের ঘরেও সেই এক কথা। ডাক্তারবাবু, নার্স, টুকুনের বাবা এবং মা বসেছিলেন। টুকুন এই সময়টাতে একটু হাত-পা মেলে বসার চেষ্টা করে। মা-বাবাকে দেখলে কেমন যেন মনটা নরম হয়। ডাক্তারবাবু ভালবাসার হাত রাখেন টুকুনের মাথায়।

নার্স, টুকুনের বেণী বেঁধে দেবার সময় নানা রকমের পাখির গল্প করে থাকে। ফুলপরী, জলপরী, স্থলপরী, দেবস্থানে এক রকমের পরী থাকে, ভগবানের কাছে অন্যরকমের পরী, আর ডাক্তারবাবু বলছিলেন, সব পাখির এক কথা টুকুন, উদ্যম চাই, বাঁচার উদ্যম। ডাক্তারবাবু টুকুনের বাবাকে বলেছিলেন, মেয়েটার সব উদ্যম শেষ হয়ে গেছে যেন। বেঁচে থাকার স্পৃহা জন্মানো দরকার ওর ভেতরে। নতুবা একদিন শুকিয়ে মেয়েটা কাঠ হয়ে যাবে। কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

সুতরাং এক বাঁচার উদ্যম এই সংসারকে নিয়ত গতিশীল করে রেখেছে। টুকুনের বাবা বললেন, মা, তোমার জন্য আমরা আর কি কি করতে পারি!

টুকুন বলল, বাবা, আমার জন্য একটি ফুলপরী কিনে আনবে।

বাবা টুকুনকে ফুলপরী এনে দিয়েছিলেন।

টুকুন বলল, বাবা, আমাকে একটা খরগোস কিনে দেবে।

বাবা তাই কিনে দিলেন। আর এভাবেই টুকুনের ঘরটা খেলনায় ভরে গেল। কি নেই এখন টুকুনের ঘরে, জলপরী আছে, ফুলপরী আছে, রাজা আর কুদুমাসী বিড়াল এবং সেই এক বন্দুকধারী সিপাই। টুকুনের বাবা টুকুনের জন্য কোন অভাব রাখে নি। যা চেয়েছে টুকুন, বাবা সব এনে দিয়েছেন। যেন এখন শুধু টুকুনের জন্য এক রাজপুত্র ধরে আনা বাকি। এনে দিলেই টুকুন এই ঘরের ভিতর স্বর্গরাজ্য তৈরী করে ফেলবে। কারণ টুকুন যেন কি করে জেনে ফেলেছিল — সে মরে যাবে। মরে গেলে মানুষ কি হয়। টুকুনের কি হবে অথবা মৃত্যুর পর টুকুন নিশ্চয় এমন কে স্বর্গরাজ্যের ভিতর প্রবেশ করবে যেখানে তার এই জগৎ থাকবে আর কে থাকবে! সেই সুবল নিশ্চয়ই থাকবে, পাখিয়ালা সুবল, কাঁধে পাখি নিয়ে। বড় পাঁচিল থাকবে একটা, কারণ যারা নরকে যায় তাদের জন্য পাঁচিলের ওপাশে যমপুরী। যমপুরীতে ভূতপ্রেত থাকে। সুবল পাঁচিলের ধারে এসে উঁকি মারলে সে হাত ধরে তাকে তুলে নেবে। তখন বাব-মা কিছু বলতে পারবে না। সুবল এলেই প্রায় যেন সবকিছু ওর হয়ে যায়। সে হেঁটে চলতে ফিরতে পারবে। সুবলের জন্য তার ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল।

টুকুন বলল, বাবা, সুবল বলেছিল কলকাতায় আসবে ?

বাবা বললেন, কে সুবল ?

— বা, তুমি দেখ নি, ট্রেনে যখন ফিরছিলাম, সেই সুবল, পাখিয়ালা সুবল, আমাদের সঙ্গে আসছিল। মা ওকে একটা স্টেশনে নামিয়ে দিলেন!

টুকুনের বাবা এতক্ষণে মনে করতে পারল!

ডাক্তারবাবু বললেন, কি ব্যাপার সুরেশবাবু ?

— আরে বলবেন না। আমরা ফিরছিলাম সিমলা থেকে। ট্রেনটা যখন বাংলায় ঢুকছে, রাতের বেলা, কোথাকার সব কতগুলি লোক, কংকালসার চেহারা, আমাদের ট্রেনটাকে আটকে দিল। বলল, জল চাই, জল চাই। বোধহয় খবরটা পত্রিকায়ও পড়ে থাকবেন।

— হ্যাঁ, সেই খরার খবর! জল নেই নাকি দেশটাতে।

— ওরা ট্রেনে উঠে কল খুলে সব জল খেয়ে নিচ্ছিল।

— তারপর!

— তারপর আর কি! ড্রাইভার ভীষণ চালাক। লোকগুলি সব জল যখন চেটে চেটে খাচ্ছিল, সে মশাই জল খাওয়া দেখলে আপনি ভয় পেয়ে যেতেন, জল এভাবে খায় আমার জানা ছিল না, যেন অমৃত পান করছে অসুরেরা। জলের অপর নাম জীবন, সেদিন ট্রেনে প্রথম বুঝেছিলাম। ড্রাইভার দেখল জলের নেশায় পাগল, ড্রাইভার বুদ্ধি করে ট্রেন সহসা ছেড়ে দিল। ব্যস।

— সব নিয়ে রওনা হলেন ?

— হ্যাঁ, প্রায় তাই। দলের মধ্যে সুবল ছিল। সুবল আমাদের কামরায় ছিল! ওর একটা পাখি ছিল সঙ্গে, কিছু কীটপতঙ্গ ছিল, শুকনো বটফল ছিল পুঁটলিতে, সে তার পোষমানা পাখি উড়িয়ে দিয়েছিল, পাখিটা উড়লে টুকুনকে আমরা হাততালি দিতে দেখেছিলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, সে এখন কোথায় ?

— জানি না। ব্যণ্ডেল স্টেশনে দেখি সে নেই।

টুকুন বলল, মা ওকে নামিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনারা দেখেছেন টুকুন হাততালি দিয়েছে ?

— হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনে।

— তুমি সে কথাটা বল। টুকুনের মা টুকুন যে স্বপ্ন দেখেছিল তার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

— হ্যাঁ, আর একটা কথা ডাক্তারবাবু, ট্রেনে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সুবল দরজার এককোণায় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসেছিল। অন্য স্টেশনে ট্রেন এলে পুলিশ তাড়া করেছিল লোকগুলিকে। সুবল আমাদের কামরায় আছে, টুকুন বলছিল, সে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। এটা স্বপ্নের মত ঘটনা, হয়তো টুকুন স্বপ্ন দেখেছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওর সে সময় বাসনা, তীব্র বাসনা, বাঁচার তীব্র বাসনা, জীবনের সুখ-সম্পদে কি কোথায় জীবনের তৃষ্ণা রয়েছে সামান্য সময়ের জন্য বোধহয় ভিতরে ওর সেই তৃষ্ণা জেগেছিল। এই তৃষ্ণা কি করে ফের জাগানো যায়। বেঁচে থাকার তৃষ্ণা, রক্তের ভিতরে তুফান, বুঝলেন সুরেশবাবু, সেই তুফানের কথাই বলছি, রক্তের ভেতরে তুফান তুলে দিতে হবে, ঢেউ, যাকে আমরা তরঙ্গ বলি, বেঁচে থাকার জন্য এই তরঙ্গ তুলে দিতে পারলে আবার টুকুনকে বাঁচাতে পারব। সুবল সেই পাখিয়ালা হয়তো সেই রক্তে সামান্য দোলা দিতে পেরেছিল। ডাক্তারবাবু প্রায় সব কথাই বিশেষ করে রুগী সম্পর্কে কথা এলে ইংরেজিতে বলেছিলেন। সুতরাং টুকুন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল, সে স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না। সে শুধু বলল, মা, আমি জল খাব।

—সেই এক উদ্যমের কথাই বলছি ডাক্তারবাবু। কথাটা বলে ফের কেমন অন্যমনস্ক হলেন। এবং নিজেকেই নিজে বললেন, আমরা বড় উদ্যমবিহীন হয়ে পড়ছি, সুরেশবাবু।

বিকাল মরে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু ওপরে উঠে গেলেন। সুরেশবাবু এবং টুকুনের মা চলে গেল। নার্স সামান্য দুধ গরম করার জন্য কিচেনের দিকে গেছে। বাইরে আলো জ্বলে উঠল। ঘরে হলেদ রঙের আলো, এখন এই ঘরের চারপাশে সব পুতুল, জলপরী, স্থলপরী। আর কেউ থাকবে না এখন সুতরাং পুতুল এবং এইসব পরীরা সন্ধ্যার পর টুকুনের সঙ্গে ঘর-সংসার আরম্ভ করে দেয়। টুকুন আপন মনে কথা বলে চলে, এই রাজ্যে তখন টুকুন রানী অথবা রাজকন্যার মত। সব পরীদের, সে জলপরী অথবা স্থলপরী হোক, সে রাজা অথবা কুদুমাসী বিড়ালই হোক টুকুনের কথায় উঠতে বসতে হবে। এদিক ওদিক হলে রক্ষা থাকবে না। পরদিন ভোরে নার্সকে বলবে, মাসি বেড়ালটাকে ঘরের বার করে দাও। সারারাত ওটা আমাকে ঘুমুতে দেয়নি, কেবল জ্বালাতন করেছে।

সুবল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলল, পাখি তুমি বড় জ্বালাতন করছ। উড়ে গেলে আসতে চাও না।

পাখিটা সুবলের মাথার মুখে ঘুরতে থাকল। যেন পাখিটা সুবলের অভিমান ধরতে পেরেছে। অভিমান ভাঙ্গানোর জন্য নানভাবে সে সুবলকে খুশী করার চেষ্টা করছিল উড়ে উড়ে।

সুবলকে এখন দেখলে প্রায় চেনা যায় না। সে কি করে ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেলেছে। ওর বাঁ হাতে ছোট কাঠের বাক্স, বাক্সের ভিতরে জুতোর ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের কালি, ব্রাস, ক্রিম এবং ছোট একটা তোয়ালে। ওর চুল আর বড় নেই, টিকি এখন আরও ছোট করে ছাঁটা। বড় লম্বা জামা আর শরীরে ঢল ঢল করছে না, সুবল প্যান্ট পরছে একটা, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে সমস্ত সকালে জুতো পালিশ করে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। সে গাছের নীচে শুয়েছিল

পাখিটা ঘাসের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সে কিছু চানা কিনে নিজে খেয়েছে, পাখিটাকে খাইয়েছে।

পথের ওপাশে বড় বড় প্রাসাদের মত বাড়ি। সে ঘাসের উপর শুয়ে বড় সব বাড়ি দেখছিল। জানালায় কত সুন্দর মুখ, সুন্দর মুখ দেখলেই টুকুন দিদিমণির কথা মনে হয়। সে প্রথম ভেবেছিল। কলকাতা গেলেই টুকুনদিদিকে পাওয়া যাবে, সে সেই ডাবয়ালাকে অর্থাৎ সুবল কতদিন সেই ডাবয়ালার ডাব নৌকা থেকে তুলে এনেছে পারে, ডাবয়ালা খুশী হয়ে পয়সা দিয়েছে, তাকে একবার বলেছিল, তুমি জান ডাবয়ালা টুকুনদিদিমণি কোথায় থাকে ? লোকটা রাস্তার নাম এবং নম্বর চাইতেই বুঝেছিল সুবল, টুকুনদিদিমণিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, এত বড় শহরে টুকুনদিদিমণি হারিয়ে গেল।

এত বড় শহর দেখে সুবলের বিস্ময়ের আর সীমা ছিলনা। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন জনার্দন চক্রবর্তী ওদের প্রিয় পুরোহিত, গ্রামের এবং অঞ্চলের বাঞ্ছিত পুরুষ যিনি প্রায় সব ধর্মের নিয়ামক, তেমন কোন অসীম এবং অপরিমেয় শক্তিশালী মানুষ, অথবা সে যাদুকর হতে পারে, পীর পয়গম্বর হতে পারে যিনি এই শহরকে চালাচ্ছেন। মোড়ে মোড়ে পুলিশ, প্রাসাদে উর্দিপরা দারোয়ান, হাওয়াই গাড়ি, ট্রাম এবং স্রোতের মত মানুষের মিছিল। সন্ধ্যা হলে রাস্তার সব আলো জ্বলে উঠছে। গাড়িগুলো মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আবার চলতে সুরু করেছে এতটুকু ফাঁকা জায়গা পড়ে নেই। কেবল বড় বড় অট্টালিকা আর গম্বুজের মত রহস্যজনক মীনার সুবলকে বড় বেশী আবেগধর্মী করে তুলছে।

আর মনে হত এই শহরে টুকুনদিদিমণি আছে। এই শহরের কোথাও না কোথাও টুকুনদিদিমণি আছে। সুতরাং সুবল যখনই সময় পেত, পথ ধরে হেঁটে যেত, গাড়ি দেখলে এবং ফ্রক পরা মেয়ে দেখলে চোখ তুলে তাকাত যদি টুকুনদিদিমণি হয়, যদি টুকুন তার জন্য কোন জানালায় মুখ বার করে রাখে। সে ভোরের দিকে কাজ করত, সুবল একা মানুষ। কোন আত্মীয় নেই, বন্ধু-বান্ধবহীন সুবলের আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় হলে সে বাসে উঠতে পারছে, সে ঘুরে ঘুরে কাজ করছে।

সে কখনও এক জায়গায় বসছে না, প্রায় শহরটাই যখন মেলার মত, প্রায় শহরটাই যখন উৎসবের মত সেজে আছে, এবং যেখানে বসা যায় সেখানেই দু'পয়সা সংগ্রহ হচ্ছে তখন এক জায়গায় বসে কি লাভ। এই ঘোরে, কাজের জন্য ঘোরে এবং টুকুনদিদিমণির জন্য ঘোরে সুবলের একটা বাই হয়ে গেল। শুধু দুপুর হলে সে গড়ের মাঠে চলে আসত। এ সময়ে সুবলের প্রিয় পাখি আকাশে উড়তে চায়। পাখিটা না উড়লে ওর পা স্থবির হয়ে যাবে, পাখি স্থবির হয়ে যাবে ভেবেই সুবল ঠিক দুপুরে, যখন রোদে খা খা করছে সারা মাঠ, যখন দুর্গের উপর কবুতর ওড়ে এবং যখন প্রায় পাখিরা দুপুরের অবসাদে গাছের ডালে অথবা অন্য কোন ছায়ায় চুপটি মেরে ঠোঁট

পালকে গুঁজে পড়ে থাকে তখন সুবল আকাশে পাখিটাকে উড়িয়ে দেয়। পাখিটা উড়তে উড়তে কোথায় যেন চলে যায়। আর দেখা যায় না।

রোদের জন্য আকাশের দিকে বেশীক্ষণ চোখ তুলে তাকাতে পারেনা সুবল। সে পাখিটার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। ওর এক হাতে বাক্সটা তখন খোলা, অন্য হাতের মুঠোয় সে রোদের ভিতর অনেকটা ঠিক অকবর বাদশার মত হাতের মুঠোয় পাখি রাখার জন্য গর্বে আত্মহারা। অথবা পাখী উড়ে উড়ে যখন ক্লান্ত হয়, পাখি যখন সুবলের কাছে ফের ফিরে আসে এবং মুঠোয় বসে চারিদিক তাকায় তখন সুবলের এক প্রশ্ন, টুকুন দিদিমণিকে পেলি ?

পাখি পাখা ঝাপটাল, ফের উড়তে চাইল। সুবল বুঝল, টুকুন দিদিমণিকে পাখিটা খুঁজে পায়নি। সুতরাং সে বলত, বেশ হয়েছে বাপু, এবার চল চুপটি করে আমার কাঁধে বসে থাকবে। এখন আর রোদে রোদে তোমায় ঘুরতে হবে না।

এই পাখি যেন সব বোঝে। সুবলের দুঃখের দিনে এ পাখি ছিল, সুখের দিনেও এই পাখি। সে বলল, টুকুন দিদিমণি কোথায় যে গেল!

পাখি বলল, কিচ কিচ। পাখি সুবলের সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

সুতরাং সুবলের এখন এক কাজ। টুকুনকে খুঁজে বের করতে হবে। কোন ঠিকানা নেই টুকুনের। এত বড় শহর তবু সুবল হার মানল না। সকালের দিকে দুজনের মত রোজগার হয়ে গেলেই সুবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে, পার্কের ভিতর ফ্রক পরা মেয়ে দেখলে টুকুন দিদিমনি যদি হয়, সে প্রায় পাগলের মত এই শহরে টুকুনকে অনুসন্ধান করে বেড়াচেছ, পার্কে, বড় রাজপথ, গঙ্গার ধারে, এবং বড় বড় বাড়িতে উঠে যেত কাজ নিয়ে। সে কাজের ফাঁকে শুধু কিসের প্রত্যাশা করত যেন।

সুবল ওর পাখিকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল অনুসন্ধানের জন্য। যখন ওর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ত, যখন অবসাদে শরীর চলতে চাইত না, সুবল ওর পাখিকে ছেড়ে দিত, দেখ যদি তুই কোথাও টুকুনকে খুঁজে পাস। সুবল এক সরল বালক, পাখি এক অবলা জীব, শহরের মানুষেরা সুবলকে দেখলে এবং ওর পাখি দেখলে কৌতুক বোধ করত। সুতরাং সুবল পাখিটার জন্য একটা দাঁড় কিনে নিয়েছে। পাখিটা চড়ে বসে থাকত। সুবল মাঝে মাঝে যখন হাতে কাজ থাকত না আর ঘুরে ঘুরে আর শরীরও যখন দিচ্ছে না, তখন বলত, পাখি তুই আগে ছিলি কার ?

পাখি বলত, কি বলত— সরল না হলে বোঝা যায় না, পাখি বলত বুঝি রাজার!

সুবল মনে মনে এবার বলত, এখন কার ?

— এখন তোমার।

— হ্যাঁ তবে দেখ উড়ে, সেই দিদিমণি আমাদের কোথায়! তারপর

পাখি উড়তে থাকত। দেওয়ালের পাশে, জানালায়, অথবা সদর পথে এক সোনার পাখি উড়ে যেত। পাখির সরল চোখ জানালায়, ঘরের ভেতর এবং রুগ্ন যুবক যুবতী অথবা ছোট মেয়ে দেখলে শিয়রে বসে দেখত সেই টুকুন কিনা। সুবলের পাখি, ভালবাসার পাখি হয়ে শহরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। পাখি, উড়ে উড়ে কত দৃশ্য দেখতে পেল, শহরের বড় লাল বাড়িতে কারা যেন জড় হয়েছে, রাস্তায় মানুষের কি ভিড়, আর পুলের উপরে সম্রাট সিজার যেন মিশর দেশ জয় করে ফিরছেন। এক অলৌকিক ঘটনার মত, পাখী এসে দাঁড়ে বসে গেল এবং কিচ কিচ করে উঠল।

সুবল বলল, পেলি না।

পাখি কিচ কিচ করে উঠল।

— না পেলে আর কি করবি।

সুবল বলল, টেরিট বাজার থেকে তোর জন্য কীট পতঙ্গ কিনে এনেছি। খা। বলে সুবল দাঁড়ের উপর ছোট পেতলের বাটিতে কীট পতঙ্গ গুলো রেখে দিল।

আর তখনই মনে হল শহরের উপর দিয়ে দলে দলে লোক ছুটছে, ওদের কণ্ঠে চীৎকার, অন্ন চাই বস্ত্র চাই। সুবলের মনে হচ্ছিল ওরা সব বলছে সকলে, শুধু বলছে না, উদ্যম চাই। আমরা কেমন যেন উদ্যমবিহীন হয়ে পড়ছি, একথা কেউ বলছে না।

সুবলের ইচ্ছা হল চীৎকার করতে, বলুন আপনারা উদ্যম চাই। উদ্যম। উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ। পাঠশালায় জানার্দন ঠাকুর ওদের পড়াতো, উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ।

সুবলের এই করে শহরটা প্রায় ঘোরা হয়ে গেল ক্রমশ। শহরের সর্বত্র সে এক উদ্যমবিহীন জীবন দেখতে পেল যেন। অফিসে, কাছারীতে, মাঠে ময়দানে এবং সব নেতা গোছের মানুষদের মুখেও সব কথার উল্লেখ আছে, শুধু উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি, এ-কথা কেউ বলছে না। অফিসে কাছারীতে এবং বড় পার্কের ভিতর মানুষের কথাবার্তা থেকে এ সব ধরতে পারত।

সকলের কথায় কি এক আক্রোশ যেন, কেউ সুখী নয়, এত বড় কলকাতা শহর দেখে সে যা ভেবেছিল, সুখের নগরী, দুঃখ নেই, অভাব নেই, জল, অন্ন-বস্ত্র সব কিছু আছে যখন, যখন আলোময় এই শহর, যখন বড় বড় গীর্জার হলঘরের মত হোটেল ঘর, দেব দেবীর মন্দির রয়েছে, মানুষের দুঃখ তখন থাকার কথা নয়।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এখানে শুধু দুঃখই আছে, ফুটপাতে মানুষের দৈন্য, পাগলের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী শহরে। এই দুঃখের নগরীতে সুবলের যেন আজকাল আর ভাল লাগছে না। ওর মনে হল সেই সব বরিষেব দিন, মাঠে মাঠে ধান, গোয়ালে গরু, সে গরু নিয়ে মোষ নিয়ে বের হয়ে গেছে মাঠে, মাঠে মাঠে ফসলের দিনগুলি অথবা আদিগন্ত সবজ মাঠ শুধু, সে দৌড়ে

বেড়াত, মাঠের ভিতর কেবল কি যেন এক রহস্য। গ্রামের অন্য রাখাল বালকের সঙ্গে গুলি খেলা, কোন বড় অর্জুন গাছের নীচে বসে থাকা, অথবা বুড়ো মানুষ হরিপদর মুখে — অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যাওয়া — হায় সেই দেশে কি করে এমন খরা এসে মরুভূতির মত হয়ে গেল, সুবল চোখ বুজে বলল, মা সুবচনী জল দে। যদি জল হয়, যদি খাদ্য হয়, যদি মাঠে মাঠে গরু মোষ নিয়ে বের হওয়া যায়, কিন্তু কে খবর দেবে, কে বলবে, দেশটাতে ফের বর্ষা নেমেছে, দেশটাতে আবার সোনার ফসল ফলবে — কার এমন উদ্যম আছে — ফের মাঠে সোনার ফসল ফলায়, বরিষের দিনের জল কোথাও ধরে রাখে, অজন্মা অথবা খরা এলে সেই জলে মানুষ স্নানাহার করবে।

।। ছয় ।।

পাখি উড়ছিল আকাশে, সুবল ঘুরছিল পথে পথে। টুকুন বসে রয়েছে নিজের জানালায়, আর জনার্দন মাঠ ভেঙ্গে নেমে আসছে। নদীর চোরা স্রোতের ওপর বন থেকে হরিণী ওর দুই বাচ্চা নিয়ে নিশ্চয়ই এখন অপেক্ষা করছে।

জনার্দন খুব পা চালিয়ে হাঁটছিল। সারারাত পাহাড়ের উপর কাজ গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে বড় বড় পাথর ফেলে যোজকের মত ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিচ্ছে। পাগলের প্রায় কাজ কর্ম। কি হবে, যদি এই অঞ্চলে বৃষ্টি হয়, যদি নদী জলে ভেসে যায়, এবং পাহাড়ে ভিতর হ্রদের মত স্থানটুকু জলে ভেসে যায়, তবে কার সাধ্য, এই জল সামান্য আলগা পাথরে আটকে রাখে।

তবু এক বিশ্বাস, এই উপবীতের অহঙ্কার — এর এই কাজ, উদ্যম এবং আত্মত্যাগ মন্ত্রের মত শুভ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করবে। জল হবে দেশে, ঘরে ঘরে মানুষ-জন ফিরে আসবে, সে এই জল নিয়ে চরণামৃত করবে মা সুবচনীর, এবং মাঠে মাঠে তাই ছড়িয়ে দিয়ে হাঁকবে, শস্য শ্যামলা দেশে আমার সুবচনী মায়, ছেইলা কোলে লৈয়া বাড়ি বাড়ি যায়। দুর্ভিক্ষ এবং খরার দিনেও জনার্দন প্রায় একটা সুখের স্বপ্ন দেখে ফেলল।

সে দেখল যেন সেই পাহাড়ের ওপর বিরাট এক জলাশয় গড়ে উঠেছে। এক হ্রদ, চার পাশে কত গাছপালা, নীচে কত জীবজন্তু বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। আরও নীচে সমতল মাঠ, কোঠা বাড়ি, ছোট ছোট নালার মত খাল সমস্ত অঞ্চলটাকে জালের মত ঘিরে রেখেছে। মানুষ তার প্রয়োজন মত জল নিচ্ছে নালা থেকে, এবং সময়ে শস্য হবে, জলের জন্য শস্য হবে, আর সারা গ্রামময়, অঞ্চলময় কোন বিষাদ থাকছে না, শুধু গাছ পালা পাখি, নদীতে জল, হ্রদে জল, মাঠের মাঝে যে সব খাল হ্রদ থেকে নেমে এসেছে সেখানে জল,

আর জলে কত গাছ, মাঠে কত সোনার ফসল, সুবচনী দেবীর মন্দিরে মেলা বসেছে। দূর দেশ থেকে মানুষ এসেছে সওদা করতে, নটুয়া এসেছে গান গাইতে, কবি এসেছে কবিগান শোনাবে বলে। বাজীকর এসেছে যাদু দেখাবে বলে, ছোট বড় শিশুরা যুবকেরা যুবতীরা মাথায় ফেটি বেধে ছুটছে মেলায়, যুবতীরা হেসে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, কাঁচের চুড়ি কিনছে দু পয়সায় আর মেলার প্রাঙ্গণে বড় নিশান উড়ছে— উদ্যানবিহ্নে কার পূরে মনোরথ।

জনার্দন বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে নীচে সেই সামান্য জলাশয়ের উদ্দেশে হাঁটছে এবং স্বপ্ন দেখছে। হরিণী আর তার দুই শিশু সন্তান প্রতীক্ষারত। জলের জন্য ওরা দূরের কোন সংরক্ষিত বন থেকে নেমে আসে। ওরা জলপানের জন্য ভোর রাতের দিকে নেমে আসে এবং ভোরেই জল পান করে চলে যায়। সুতরাং জনার্দন পা চালিয়ে হাঁটছিল। ওর হাতে একটা ছোট পেতলের বালতি, ফেরার পথে সামান্য জল নিয়ে সুবচনীর মন্দিরে উঠে যাবে।

ভোরে জলপান করানো তার কাজ, সে নেমে এসে কিছুক্ষণ ওদের তিনজনকে দেখল। হরিণী নির্ভয়ে জিব বের করে নাক থেকে কিছু ঘাম চেটে নিল। হরিণী এতক্ষণ শুয়ে ছিল। জনার্দনকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। পাশে তার দুই শিশু হরিণ ঘোরাফেরা করছে। লাফাচ্ছে। ছুটে দূরে চলে যাচ্ছে। মুখ উঁচু করে কি দেখছে। ফের নেমে আসছে নীচে ঠিক মায়ের কাছে, আর পেটের নীচে এসে গুঁতো মারছে। সামান্য স্তন থেকে দুধ খাবার জন্য মুখ বাড়ালে, এখন নয় এখন নয় এমন ভাব হরিণীর চোখে। সে তার পিছনের দুপা দিয়ে ওদের সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর সেই শিশু হরিণেরা মায়ের কাছে বিমুখ হয়ে জনার্দনের পায়ের কাছে দাঁড়াল। জনার্দন ওদের একজনকে তুলে নিল বুকে, অন্যজন মুখ উঁচু করে জনার্দনকে দেখতে থাকল।

—অভিমান! জনার্দন অন্য শিশু হরিণকে বাঁ হাতে তুলে এনে দুগালে দুজনের মুখে লেপ্টে দিল।— কিরে তোদের কি ভয় হয় না। জনার্দন বলল। তোদের মানুষকে এখন ভয় নেই। তোরা এত দূর থেকে চলে আসিস কষ্ট হয় না।

হরিণী তার দুই শিশুর সঙ্গে এই মানুষের ভালবাসাটুকুতে খুব খুশী, সে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। এবার একেবারে শরীর ঘেঁসে দাঁড়াল। জনার্দন বলল, কতক্ষণ লাগে যেতে? বলে তার কোল থেকে ওদের নামিয়ে দিয়ে বলল, এখন আর লাফানো ঝাপানো নয়। এবার জল খেয়ে সূর্য ভাল করে না উঠতে মানুষের এই অঞ্চল ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমার অনেক কাজ আছে, ও দিকে মা আমার প্রত্যাশায় বসে থাকে, কেবল কি খাবে কি খাবে করে সারাদিন! জনার্দন তার কথা নালিশের মত করে যেন ওদের শোনালো, তুই মেয়ে ছেলে খরা এনে দেশটাকে শ্মশান করে দিলি, এখন কেবল খাব খাব করলে চলবে কেন!

ভিতরে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা জনার্দনের। যখন খিদে পায়, যখন পেটের ভিতরটা সামান্য আহারের জন্য ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে তখন পাগলের মত সুবচনী দেবীর উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে থাকে। — খাবি খাবি। সব খেয়ে তবে তোর শান্তি। আমাকেও খাবি। জনার্দন জল খেল। জল খেলে পেটের যন্ত্রনাটা সামান্য সময়ের জন্য কমে যায়।

মন্দিরে আর আহার বলতে কিছু নেই। আলুর লতা এখন পাহাড়ে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জল নিয়ে নদীর পারে সে উঠে এল। হরিণী তার দুই শিশু নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের ওপারে যে সংরক্ষিত বন রয়েছে তার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

সে কিছুক্ষণ অপলক ওদের উঠে যাওয়া দেখল। ভিতরে ক্ষুধার কষ্ট, কোন মৃত পাখি পর্যন্ত সে খুঁজে পেল না, না শুকনো বট ফল। সে ভাবল — দূরে যে সব কুড়ে ঘর রয়েছে, যা এখন শ্মশানপুরীর মত খা খা করছে — সেখানে উঠে গেলে হয়। ঘরের ভিতরে যদি খুঁজে কিছু সংগ্রহ করতে পারে। যদি কেউ দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় রেখে মারা যায়। জনার্দন এবার মা মা বলে দ্রুত হাঁটতে থাকল। এই অঞ্চল লোকালয়বিহীন। সুতরাং এখন সে প্রায় নগ্ন। সে প্রায় বেহুঁশ। সে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, অর বম বম করছিল। মা, তারা শ্মশানীকে বলছিল, তুই মা আর কত কষ্ট দিবি জীবকূলকে এসব বলছিল! মা তারা ব্রহ্মময়ী! ওর চলতে চলতে মনে হল, মা তারা ব্রহ্মময়ী তার সামনে ডাইনীর মত দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জীর্ণ কুটীরের দিকে উঠে যেত বলেছিল। সে, বলল পথ ছাড়। তুই জানিস না জনার্দন কত অহঙ্কারী মা। মা তোর একদিন কি আমার একদিন। আমি মা দেখব তোর সন্তানকে তুই আর কত কাল নিরন্ন রাখবি! দেখব, দেখব, দেখব। জনার্দন দ্রুত হাঁটছিল আর তিন সত্য এই বলে গাল দিচ্ছিল, তুই মা করালবদনী, মুখ ব্যদন করে আছিস, মুখের রক্ত মাটিতে উগলে পড়ছে তবু এক বিন্দু জল দিবি না।

জনার্দন হাঁটতে হাঁটতে ফের বলল, বেশীদিন আর নেই। আমি মরে গেলে মনে করবি না তোকে ওখানে বসিয়ে রাখব। তোকে বুঝলি সুবচনী, তোকে তোর ছেলেকে নিয়ে ঐ যে পাহাড় দেখছিস সেখানে নিয়ে যাবো। পাথরের নীচে রেখে পাষাণের ভার চাপিয়ে দেব। তবু যদি তোর চোখে জল না আসে দুঃখে, তবে তোর মুখে মুতে দেব।

তখন সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে জুতো পালিশ করছিল! পাখিটা দাঁড়ে বড় বেশী ছটফট করছে। বড় বেশী কিচমিচ করছে। পাখিটার তবে বুঝি জল তেষ্টা পেল। সে বাটিতে করে সামান্য জল দিল পাখিটাকে। কিন্তু পাখি জল খেল না। পাখা ঝাপটাতে থাকল। এবং পা দিয়ে বাটির জল উল্টে চি চি করে কাঁদতে থাকল!

পাখিটাতো এমন করে না কোনদিন! সুবল ভাবল। সুবল অস্বস্তি

বোধ করছে। পাখিটা ছটফট করলে ওর বড় কষ্ট হয়। সে ভালভাবে জুতো পালিশে মন দিতে পারছিল না। সুতরাং সে রেগে মেগে পয়সা না দিয়েই চলে গেল।

· সুবল ভাবল, বাঁচা গেল। লোকটি পয়সা দেয়নি বাঁচা গেল। লোকটি চলে গেছে, সুতরাং সুবল এখন পাখিটার দিকে ভাল ভাবে মন দিতে পারবে সে ওর ক্রিমের কৌটার মুখ বন্ধ করে ব্রাস দিয়ে কাঠের বাক্সটাতে একটা বাড়ি মারল, তারপর ব্রাসটা নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, এই সাত সকালে তোর কি হল বাপু।

পাখিটা দাঁড় থেকে উঠে সুবলের হাতে ঠোকরাতে থাকল। সুবল কি ভেবে বলল, আমাকে ভাল লাগছেনা। তবে যা, উড়ে যা। বলে সে পা থেকে শেকল খুলে দিল। আর শেকল খুলে দিতেই পাখিটা সামনের দেবদারু গাছ অতিক্রম করে সামনের ছোট মাঠ পার হয়ে একটা জানালায় গিয়ে বসল। আর সেখানে বসে সেই আগের মত প্রাণপণে চিঁ চিঁ করতে থাকল।

সুবল কিছু একটা ঘটবে, ঘটেছে ভেবে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখল ঘরের ভিতর টুকুন দিদিমণি, সজ্ঞাহীন, বড় বড় ডাক্তার, অনেক খেলনা চার ধারে। পাখিটা কিচ কিচ করছে বলে নার্স ছুটে এসে পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে, সুবল বলল, আমাদের টুকুন দিদিমণি না? টুকুন টুকুন দিদিমণি, সে ক্ষেপা বালকের মত ডাকতে থাকল, সে এত উত্তেজিত যে এইসব বড় বড় ডাক্তারদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ করল না। সে জানালার ওপর উঠে গেল। পাখিটা সুবলের উত্তেজনা যেন ধরতে পারছে, পাখিটা সুবলের চারপাশে এখন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুবল ডাকছে, টুকুন দিদিমণি আমি এসে গেছি। আমি তোমাকে কত খুঁজে খুঁজে ফিরে গেছি। এই দেখ টুকুন দিদিমণি সেই দুষ্টু পাখি, দেখ নীল লাল কুঁচ ফল।

একজন নার্স এগিয়ে এসে বলল তুমি কে বাপু।

— আমি সুবল। সুবল আমি। আমরা ট্রেনে করে আসছিলাম...।

— অঃ তুমি সুবল। নার্সের মনে হল যেন সেই এক গল্প টুকুনের মা বাবা করে গেছে, এক সুবল, পাখিয়ালা সুবলকে দেখে টুকুন দিদিমণি হাতে তালি বাজিয়েছিল। সেই সুবল এসে গেছে। নার্স এবার ধীরে ধীরে বলল, কথা বলল, টুকুন দিদিমণির খুব অসুখ। টুকুন দিদিমণি বাঁচবে না।

সুবল বলল, বাঁচবেনা কেন?

— ওর ভয়ঙ্কর অসুখ।

— কি অসুখ।

নার্স অসুখটার নাম করতে পারত। কিন্তু সাধারণ এক পাখিয়ালা সুবলকে এত ফিরিস্তি দিয়ে কি লাভ। সে বলল, তুমি অতসব বুঝবেনা। তুমি যদি টুকুন দিদিমণিকে দেখতে চাও, ঘুরে সামনের দরজায় এস।

— আমিত এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি টুকুন দিদিমণিকে। দিদিমণি

ঘুমোচ্ছে।

নার্স এবার বিরক্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ ঘুমোচ্ছে।

— জাগলে একবার ডেকে দেবেন। আমি দেবদারুগাছটার নীচে রয়েছি। আমার কথা আছে অনেক। টুকুন দিদিমণি বলেছিল কলকাতায় এলে আমি যেন ওর সঙ্গে দেখা করি।

নার্স বলল, এখন যাও বাপু। ডাক্তার বাবুরা খুব বিরক্ত হচ্ছেন। তুমি গিয়ে চুপচাপ দেবদারু গাছের নীচে বসে থাক।

— দিদিমণির বাবা মাকে দেখছি না?

— ওরা বিকেলে আসবে। তুমি যাও বাপু। কথা বল না। ডাক্তারবাবুরা বিরক্ত হচ্ছেন।

— তবে আমার পাখিটা এখানে থাকল।

— পাখি আবার কেন।

— দিদিমণি জাগলে সে আমাকে ডেকে দেবে।

— না বাপু পাখি টাখি রেখনা! তুমি তোমার পাখি নিয়ে চলে যাও। টুকুন জাগলে তোমায় ডেকে দেব।

— সত্যি ডেকে দেবেন ত?

নার্স বিরক্তি প্রকাশ না করে আর থাকতে পারল না, যাও বলছি।

— যাচ্ছি। সে পাখিটাকে ডাকল, আয়।

পাখিটা নড়ল না। পাখিটা গরাদে বসে ঠোঁট মুছতে লাগল।

সুবল বলল, ও এখন যাবেনা। আমি যাচ্ছি। পাখিটা আপনাদের কোন বিরক্ত করবে না!

— না নিয়ে যাও বলছি।

পাখিটা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, টুকুন চোখ খুলছে। পাখিটা এবারে ভিতরে ঢুকে ফুর ফুর করে উড়তে থাকল। টুকুন ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখল সেই পাখি — সোনার রঙের ঠোঁট, পায়ে সবুজ ঘাসের রঙ, পাখা কালো — গলার নীচে লাল রিবন যেন বাঁধা! টুকুন মনে করতে পারছিল না এই পাখি সে প্রথম কোথায় দেখেছিল। সে পাখিটাকে কোথায় দেখেছে। কবে কখন! এই প্রিয় পাখি কার, কে এই পাখি নিয়ে এসেছিল তার কাছে। যেন স্বপ্নের মত তার কাছে এক পাখি এসে গেছে, লাল রিবন বাঁধা পাখি! সে এই পাখি দেখে কত দীর্ঘদিন পর যেন মনে করতে পারল— এ পাখি সুবলের পাখি। সুবলকে ফেলে তার কাছে চলে এসেছে। পাখি দেখে টুকুন প্রথম জল খেতে চাইল, জল দিলে সে পাখিটাকে ধরার জন্য হাত তুলতে গিয়ে মনে হল শরীরের ভিতর কি যেন কেবল শির শির করছে। সে সামান্য হাসতে পারল, আরামদায়ক এক অনুভূতি! পাখি, সুবলের পাখি, পাখি যখন এসে গেছে তখন সুবলও এসে যাবে। সুবল, পাখিয়ালা সুবল এই সংসারে এলে আর কোন দুঃখ থাকবে না। টুকুন সামান্য

না হেসে যেন থাকতে পারল না।

বিকালের দিকে টুকুনের বাবা সুরেশ বাবু এলেন। ওদের পারিবারিক ডাক্তার এলেন। এবং টুকুনের মা শিয়রে বসেছিল। নার্স, সকালের দিকে টুকুন সংজ্ঞাহীন হয়েছে আজও — খবরটা সুরেশ বাবুকে দিতে গিয়ে সেই পাখিয়ালার গল্পও করে ফেলল।

সুরেশ বাবু বললেন, সে এখন কোথায় ?

নার্স দেবদারু গাছটার দিকে হাত তুলে বলল, ওর নীচে বসে জুতো পালিশ করছে। সকালের দিকে এসেছিল। খুব বিরক্ত করছিল টুকুনকে। তাই তাড়িয়ে দিয়েছি।

— ওর পাখিটা এখনও আছে ?

— পাখিটাকে নিয়েইত সব ঝামেলা। ঘরের ভিতর ঢুকে কেবল ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ছে। আমার কথা শুনছে না, পাখিয়ালার কথা শুনছে না। ডাক্তার বাবুরা খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন। ভয়ে ভয়ে আমি তখন ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। সে পাখি নিয়ে দেবদারু গাছের নীচে বসে আছে।

নার্স ভুলে গেল পাখিটা যখন উড়ছিল তখন টুকুনের মুখে সামান্য সজীবতা লক্ষ্য করা গেছে। নার্স ভুলে গেল বলতে সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে টুকুন পাখির ডাক শুনে জেগে উঠেছে। আর ভুলে গেল বলতে পাখিয়ালা বিশ্বাসই করছিল না, টুকুন বাঁচবে না।

মা টুকুনের কপালে হাত রাখল। টুকুনকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। খেলনাগুলো সব একদিকে জড় করা। নার্স বিকেলের দিকে চুল বেঁধে দিয়েছে। মুখে সামান্য পাউডার। মুখের এনিমিয়া ভাবটা এখন আর তত স্পষ্ট নয়। সকলের মুখই বিষন্ন। বিশেষ করে টুকুনের মা সারাক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন আর আমাদের কিছু করণীয় নেই।

— না কিছু করণীয় নেই।

— সংসারে বুঝলেন সুরেশবাবু, ডাক্তারবাবু কেমন বিচলিত ভাবে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

— আপনি উদ্যমহী··ার কথা বলতে চাইছেন।

— হুঁ আমরা কেমন যেন ক্রমশঃ উদ্যমবিহীন হয়ে পড়ছি সকলে।

— তিনি একটু থামলেন, তারপর টুকুনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। ওর ভিতরের কল কব্জাগুলো ঠিকমত প্রথম থেকেই কাজে লাগে নি।

সুরেশ বাবু বললেন, কিন্তু আমার দিক থেকে ত' কোন ত্রুটি ছিল না ডাক্তার বাবু।

আর তখন কে যেন পথে বনে বনে বলে গেল, কে যেন হেঁকে হেঁকে গেল, পথ দিয়ে মানুষ যায় দেখ, ঘোড়া যায় গাড়ি যায় দেখ, দুঃখ যায় সুখ

যায় দেখ। দেখ দেখ মানুষ কত মানুষ, কত হিসাবের মানুষ পোষ্টার মারছে দেয়ালে — খেতে পায় না, অনাহারে দুর্ভিক্ষে মানুষ সব গ্রামে মাঠে মরে থাকছে।

অথবা যেন পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল শহরটা — জল চাই, অন্ন চাই। শুধু লেখা ছিল না উদ্যমবিহনে কিবা পূরে মনোরথ ! সুরেশ বাবু নিজের চোখে মেয়ের চোখে দেখছিলেন, এক দুরারোগ্যে ব্যধি এই মেয়ের। ঠিক যেন তার কলকারখানার মত। আয় নেই, ব্যয় বাড়াছে, শ্রমিকেরা উৎপাদন বাড়াচ্ছে না। টাকার দাম কমছে, জিনিষপত্র আকরা। এক রোগ তার কলকারখানাকে উৎখাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তিনি সে ক্ষয় থেকে তাকে রক্ষা করতে পারছেন না — ঠিক যেন এই মেয়ে, যে ইচ্ছা করলেই বেঁচে উঠতে পারে ভিতরের উদ্যমহীন এক ক্ষতজাত রক্ত কিছুতেই তাকে সুস্থ হতে দিচ্ছে না।

সুরেশ বাবু যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন, তোরা বল, বুকে হাত দিয়ে বল, যা এখন উৎপাদন করছিস, তোরা মনপ্রাণ দিলে তার দ্বিগুন দিতে পারিস।

এক দৈত্য বোধহয় নিয়মের দৈত্য অথবা আদাইয়ের দৈত্য হু হু করে হেসে উঠল — স্যার আপনি কি জলে ডুবে স্বপ্ন দেখছেন। আমরা কি আর উৎপাদন বাড়াতে পারি।

সুরেশ বাবু মেয়ের মুখ দেখে আঁৎকে উঠলেন। ভিতরে মেয়ের সেই ক্ষতজাত রক্ত কেবল ভিতরে ঘুরে ঘুরে আমরণ পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য লাড়াই। যেন এই মেয়ে তার নিজের ভিতরেই ক্ষয়কে ভালবেসে পুষে রেখেছে। সে বলল, টুকুন তুমি ঐ দেখ পাখিয়ালা সুবল এসে গেছে। তুমি তখন হাতে তালি বাজিয়েছিলে, এখন পার না। ঐ দেখ সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে জুতো পালিশ করছে। তাকে ডাকব ?

টুকুন হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। যেন কোন অমল আনন্দের খবর বয়ে আনার মত মানুষ তার আর নেই।

সে শুধু বলল, বাবা জল খাব। জল।

সুরেশবাবু নার্সকে জল দিতে বলে বের হয়ে গেলেন। যে বাঁচতে চায় না, তাকে বাঁচিয়ে লাভ নেই। সুরেশবাবুর মুখে অবসাদের চিহ্ন। তিনি বড় বড় হাই তুলতে থাকলেন।

সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে ছিল। রাস্তায় আলো জ্বলছে। ফুটপাতে মানুষের ভিড়। কোথায় কি গণ্ডগোল হয়েছে, সহসা শহরের ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল। মানুষেরা পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরছে। কিছু টেম্পো, লরী এবং রিক্সা মানুষ বইছিল, রাস্তা ফাঁকা বলে সব ছোট ছোট ছেলের দল রাস্তার উপর বল খেলছিল, ক্রিকেট খেলছিল এবং হাডুডু খেলছিল।

অথচ দেবদারু গাছটার নীচে বসেছিল সুবল, রাতে সে এই গাছের

নীচে শুয়ে থাকবে। সঙ্গে ওর ছোট এক সতরঞ্চ আছে, অপরিচ্ছন্ন হলে সে সব গঙ্গায় জলে ধুয়ে নেয়। আর এই গাছের নীচ থেকে টুকুন দিদিমণির জানালা স্পষ্ট। এখন মনে হচেছ দিদিমণির ঘরে কেউ নেই! ঘর ফাঁকা। শুধু সেই রাজা, কিছু পরী এবং বিড়াল, কুদুমাসীর মুখ দেখা যাচ্ছিল। সে তার পাখির দিকে মুখ তুলে তাকাল। পাখিটা দাঁড়ে বসে ঝিমোচ্ছে। সে এবার সব গোছগাছ করে কাঁধে ফেলে জানালার দিকে এগুতে থাকল, যখন কেউ নেই, জানালা দিয়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু ঘরে একটা নীল আলো জ্বলছে, তখন সুবল কিছুতেই দেবদারুর নীচে বসে থাকতে পারল না। কি এক অপরিসীম ভালবাসা আছে টুকুন দিদিমণির, টুকুন দিদিমণি ছুটে গিয়েছিল দরজায়, দরজা খুলে বলেছিল, এখানে কেউ নেই, এ কামরায় কেউ ঢোকেনি। বলে পুলিশের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল — সেই থেকে মনে হয়েছে সুবলের এমন ভালবাসা জন আর তার কেউ নেই। এমন আপনার জন তার আর পৃথিবীতে কেউ নেই। টুকুন দিদিমণিকে সে যেন ইচ্ছা করলে সব দিয়ে দিতে পারে। আর এই যে পাখি, যার মূল্য সুবলের কাছে প্রাণের চেয়েও অধিক, ইচ্ছা করলে সুবল টুকুন দিদিমণিকে খুশী করার জন্য সেই অমূল্য ধনও উড়িয়ে দিতে পারে। তার যা কিছু সম্বল, যা কিছু সঞ্চয় সব এই টুকুন দিদিমণিকে দিয়ে দিতে পারে। ঘর ফাঁকা দেখে সে কিছুতেই আর গাছের নীচে বসে থাকতে পারল না — জানালায় এসে কাঁধে থেকে ঝোলাঝুলি নামিয়ে ফিস ফিস করে ডাকল, টুকুন দিদিমণি আমি এসেছি।

জানালার দিকে মুখ ছিল টুকুনের। স্প্রিঙের খাট, শিয়রের দিকটা একটু উঁচু করা। টুকুন দিদিমণির চোখ ঘোলাটে, যেন স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে না। প্রায় অন্ধের মত — অথবা সংজ্ঞাহীনের মত, ঠিক যেন তার সেই খরা অঞ্চল, কোন কালে বৃষ্টি পায় না আর ফসল ফলবে না, সোনার ফসল ঘরে তুলে কেউ আর উৎসব পার্বনে আলো জ্বালবে না। সে ফিস ফিস করে ডাকল, দিদিমণি, দিদিমণি, আমি সুবল, চিনতে পারছ না? আমাকে তুমি চাদর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল, আমাকে তুমি পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে। আমি পাখিয়ালা সুবল।

— কে? সুবল!

— হ্যাঁ আমি সুবল। আমি তোমাকে কুঁচফল দিয়েছি।

— তুমি আমাকে রঙ বেরঙের পাথর দিয়েছ সুবল।

— আমি তোমাকে চন্দনের বীচি দিয়েছি।

— আমার শিয়রে সব আছে।

— কৈ দেখি। সুবল দু পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। কিন্তু অবাক টুকুন তার হাত পা নড়াতে পারল না।

সুবল, বলল, কৈ দেখি। তোমার শিয়রের নীচে কোথায় রেখেছ দেখি।

টুকুন বলল, নার্স এলে বলব। নার্স শিয়রের নীচে থেকে চন্দনের বীচি বের করে দেখাবে।

— কেন তুমি পার না!

— না সুবল। আমি পারি না। আমি হাঁটতে পারিনা সুবল। কতদিন আমি হাঁটিনা। কতদিন আমি মাঠে মাঠে হেঁটে বেড়াইনি। বলে দুঃখী এক মুখ নিয়ে সুবলের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর সামনের মাঠে যে আলো জ্বলছিল, সামনের পার্কের বেঞ্চগুলোতে যে মানুষগুলো বসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, জান সুবল ওরা পর্যন্ত অবিশ্বাস করছে, আমি ট্রেনে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলাম, ওরা তা বিশ্বাস করতে চাইছে না। বলে সে আঙ্গুলে সমস্ত ফুলপরী জলপরী, রাজা এবং অন্যান্য পুতুলদের উদ্দেশ্য করে দেখল।

সুবল বলল, যা তুমি আবার হাঁটতে পারবেনা কেন? তুমি ঠিক হাঁটতে পার।

— আমি হাঁটতে পারি তাই না সুবল? আমি ট্রেনে হেঁটেছিলাম তাই না সুবল! বলে সে খুব উচ্ছ্বল হয়ে উঠল।

— তুমি এখনও হাঁটতে পার।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল টুকুন খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। সে আর সুবলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। কি যেন ভাবছে। সে সুবলকে বলতে চাইল, আমি আর হাঁটতে পারি না। তোমাকে ইচ্ছা হয় বার বার হেঁটে দেখাই। কিন্তু সুবল আমি সত্যি পারি না এখন। গায়ে শক্তি নেই। হাতে পায়ে স্থবির এক ভাব সব সময়।

টুকুনের চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠছিল ফের। ভিতরে লজ্জাকর অনুভূতি। বড় মাঠ সামনে, আর এত সব ট্রাম বাস চোখের উপর দিয়ে ছুটছে, এত সব মানুষজন আর পথ পার হয়ে যাচ্ছে— ওদের দেখে টুকুনের ভিতর সব সময় এক অসহিষ্ণু ভাব। টুকুন ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিল।

সুবল যেই দেখতে পেল, টুকুন দিদিমণির চোখ ফের ঘোলা হয়ে যাচ্ছে— সে বলল, টুকুন দিদিমণি, তুমি হাঁটতে পার। তুমি হেঁটে হেঁটে ইচ্ছা করলে, অনেক দূরে চলে যেতে পার।

আমি হাঁটতে পারি সুবল তুমি ঠিক বলছ?

এই যে পাখি আছে না দিদিমণি, এই পাখি ঠিক তোমার মত শুয়ে থাকতে ভালবাসত। শুয়ে থাকলে মানুষের হাত পা অবশ হয়ে যায়। তুমি হাঁটতে পার, দেখ আমার পাখি কেমন আমার মাথার চার পাশে উড়ছে।

টুকুন এবার তার খেলনাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে রাজা এখন বুঝতে পারছিস, আমি হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলাম। এই দেখ সুবল পাখিয়ালা সুবল, সব দেখেছে। ওদের দেশে খরা বলে ও কলকাতায় চলে এসেছে। ওর সঙ্গে ট্রেনে কত কথা বলেছি। ওর পাখিকে আমি খেতে

দিয়েছি। আমি তোদের মত নেঙ্গু নইরে। তোদের মত এক জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থাকি না।

সুবল বলল, এই যে পাখি দেখছ, ওর কেউ ছিল না। একদিন ফিরে আসার সময় দেখি গাছের নীচে পড়ে ছটফট করছে। ওর মা বাবা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখে বুঝি পালিয়েছিল। পাখিটা নড়ে না, খায় না, পাখির চোখ ঘোলাটে। এই পাখি সকলে বলল মরে যাবে, আমি পাখিকে নিয়ে মাঠে চলে গেলাম, সবুজ কীট পতঙ্গের ছানা খুঁজে বের করলাম। অতল জলের স্বাদ মুখে দিলাম। নদীর জলে স্নান করলাম, সুবচনী দেবীর মন্দিরে গিয়ে মানত করলাম, মা আমার পাখিকে উড়িয়ে দে আকাশে, উড়িয়ে দে সব, পাখির চোখে নদীর জল লেগে পাথরের মত কালো হয়ে গেল। সবুজ কীট পতঙ্গের ছানা খেয়ে পাখা গজাল, অতল জলের স্বাদ পেয়ে পাখি তাজা হল — কিন্তু হায় পাখি আমার আকাশে ওড়েনা, চলে না ফেরে না। পাখিকে নিয়ে কি কষ্ট! মাঠে নেমে পাখিকে বলতাম ঐ দেখ বড় মাঠ, ঐ দেখ বড় গাছ, আপন প্রাণের তেজে পাখি উড়ে যা আকাশে! সে কি দৌড় ঝাপ গেছে। খরা চলেছে গ্রামে মাঠে, মানুষ রোদে বের হতে চায় না, আমি পাখিকে শুধু বললাম, পাখি, আপন প্রাণের তেজে পাখি আকাশে উড়ে যা। একদিন দুদিন গেল মাস গেল এবং মাঝে মাঝে আমরা নদীতে জলের সন্ধানে বের হতাম, পাহাড় চারপাশে, কত গাছ পালা ফুল ফল পাখি ছিল, খরায় সব পুড়ে গিয়েছে। চারিদিকে তাকালে কান্না পায়, জল খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে পাখিকে বলতাম — উড়ে যা। আপন প্রাণের আবেগে উড়ে যা। বলে সুবল নিজের পাখিকে বলল, উড়ে যা, তোর টুকুন দিদিমণি দেখুক — সঙ্গে সঙ্গে পাখি উড়তে থাকল ডিগবাজী খেতে থাকল — কোথাও উড়ে গিয়ে নিমেশে ফিরে এল, রাজার মাথায় বসেছে কিন্তু মলমূত্র ত্যাগ করলে মনে হল চোখের নরচে রাজার পিচুটি। রাজা যেন হাপুস নয়নে কাঁদছে।

তখন সুবল বলল, দেখ দিদিমণি দেখ, তোমায় রাজার চোখে পিচুটি, রাজা কেমন মুখ গোমড়া করে আছে। টুকুন ঘাড় ফিরিয়ে রাজাকে দেখতে পেয়েই হো হো করে হেসে উঠল। — ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। পাখি তোমায় উচিত শাস্তি দিয়েছে। পাখিটার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পাখি আকাশে ওড়ার মত ঘরের ভিতর দোল খেয়ে উড়ছে।

সুবল বলল, দিদিমণি ওর পাখায় কত রাজ্যের স্বপ্ন দেখো।

সুবল বলল, দিদিমণি পাখির পায়ে কত রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখো।

তারপর সুবল কেমন নেচে নেচে বলতে থাকল, আকাশ দেখো, সমুদ্র দেখো, দেখো দেখো মাঠ দেখো, পাহাড় দেখো।

পাখিটা সেই আকাশ দেখার মত ঘরের ভিতর উড়তে থাকল, সমুদ্র দেখার মত বাতাসের উপর ভাসতে থাকল, নদী দেখার মত এঁকে বেঁকে সোজা উপরে নীচে উঠে গেল। টুকুন সব দেখছিল। যাদুকর তার পাখির

খেলা দেখাচ্ছে। যাদুকর এই ঘরে পাখির খেলা দেখিয়ে সকল দুঃখ যেন দূর করে দিচ্ছে।

টুকুন মনপ্রাণ ঢেলে এই পাখির খেলা দেখতে থাকল। ভিতরে সেই শির শির ভাবটা কাজ করছে। ভিতরে, সেই প্রাণের ভিতরে শির শির ভাবটা কাজ করছে। যেন শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে। শরীরের ভিতরে কোথাও এক হীরামন পাখি এতদিন চুপচাপ ঘুমিয়ে ছিল এই পাখির খেলা দেখতে পেয়ে সে-পাখি আকাশে ওড়ার জন্য ডানায় যে সব রাজ্যের ক্লান্তি জমে ছিল এতদিন, তাই উড়িয়ে দিল। প্রাণের ভেতরে এক পাখি আছে, ওড়ার পাখি, সেই পাখির আজ কতদিন পর যেন ওড়ার প্রত্যাশায় চোখে মুখে হাসির আনন্দ, হায় এই হাসির আনন্দ কোথাও থাকে না, মানুষের এই হাসির আনন্দ প্রাণের আনন্দ কখন যেন বড় হতে হতে হারিয়ে ফেলে।

টুকুন ধীরে ধীরে দেখল অনেকক্ষণ ওড়ার পর পাখিটা ক্লান্ত হয়ে সুবলের মাথায় গিয়ে বসেছে। রাত বাড়ছিল। সুবল ধীরে ধীরে জানলা থেকে নেমে ফের দেবদারু গাছের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। টুকুন জোরে চীৎকার করতে চাইল, সুবল তুমি আবার কাল এস। আমি জানলায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। এবং পিছনের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল নার্স দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। টুকুন এতক্ষণে বুঝতে পারল নার্সের ভয়ে সুবল চুপি চুপি না বলে পাখি নিয়ে চলে গেছে।

।। সাত ।।

জনার্দন বুঝতে পারলে, আর রক্ষা নেই। মাটি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। মরুভূমির মত উত্তাপে গাছপালা সব নিশিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য রস সঞ্চিত নেই। এখন এই পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকা। জনার্দন মন্দিরের ভিতর পায়চারী করছিল। হাত পা শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চোখে আর প্রায় দৃষ্টি ছিল না। সে এখন আর পাহাড়ের ওপর উঠে পাথর নিক্ষেপ করতে পারছে না। সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে গেল।

দাবানলের মত জ্বলে সূর্য অস্ত চলে গেল। জনার্দন অভ্যাস মত বের হয়ে পড়ল। চোখের দৃষ্টি কমে আসছে বলে সে ধীরে ধীরে পরিচিত পথ ধরে পাহাড় থেকে নেমে সমতল পথ ধরে হাঁটতে থাকল। আজ প্রায় চারদিন হল জনার্দন শুধু জল খেয়ে আছে। জনার্দন আজও শেষবারের মত বের হয়ে পড়ল। যদি কোন আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতে না পারে, যদি পাহাড়ময় এবং মাঠময় কোন মৃত জীবজন্তু অথবা ঘাস পাতা সংগ্রহ করতে না পারে তবে মনে হচ্ছিল মৃত্যু অবধারিত। এই মৃত্যু ওকে গ্রাস করবে ক্রমশঃ। এখন আর পায়ে শক্তি নেই যে সে দূরের কোন শহরে অথবা গঞ্জে চলে যাবে। ঘাট

সত্তর মাইল হেঁটে যাবার শক্তিটুকু জনার্দনের শেষ হয়ে গেছে। সে হাঁটছিল এবং মাঝে মাঝে আবেগে মা মা বলে ডেকে উঠছিল।

জনার্দনের হাঁটতে হাঁটতে মনে হল সংসারে এক রকমের তেষ্টা আছে যা কোনকালে নিবারণ হয়না। এক রকমের অভাব আছে যা কখনও দূর হয়না। আর একরকমের অহঙ্কার আছে যা কোনকালে শেষ হয় না। জনার্দনের সেই অহঙ্কার। শস্য শ্যামলা এই দেশে প্রথম পিতৃপুরুষেরা আসেনি। পাহাড়ী অঞ্চল ছিল। সেখানে লোকালয় বিশেষ ছিল না। নির্জন এক পাহাড় ঘেরা প্রান্তরে সামান্য ক'ঘর আদিবাসীর ভিতর তার কোন পিতৃপুরুষ এসেছিল সুবচনী দেবীর ভার কাঁধে নিয়ে। সে এসেছিল বলে, দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে, এবং দিনমান এই মাঠের ভিতর উপর হয়ে পড়ে থেকে সব ঘাস বিচালী তুলে নিয়েছিল বলে বর্ষার শেষে কি ফসল, কি ফসল! এত ফসল হয় মাটিতে মানুষের জানা ছিল না। পাহাড়তলি অঞ্চল থেকে মানুষজন ফসলের লোভে চলে এসেছিল — আর যায়নি। তার পূর্বপুরুষ এক বন্ধ্যা মাটিকে উর্বরা ভূমি করে সংসারে প্রায় পীর সেজে গেল। তারপর থেকেই বংশের ভিতর এক নিদারুণ অহঙ্কার। উৎসবে, পালা পার্বনে মানুষের সুখে দুঃখে সব সময় এই দেবীর সেবাইত প্রায় ঈশ্বরের সমতুল্য। জনার্দন হাঁটতে হাঁটতে ফের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, মা মা — মা সুবচনী তুই নিষ্ঠুর হলে চলবে কেন — আমার অহঙ্কার মুছে দে মা। সামান্য বৃষ্টি দে মা। রাগ করে মা কার ঘরে বসে আছিস। বৃষ্টি দে মা মাঠে ঘাস বিচালী গজাক। পাখি পাখালি উড়ে আসুক মা। গাছে গাছে ফুল ফুটুক। ফল হোক মা গাছের শাখা প্রশাখাতে। তোর লীলা মা আর কতকাল চলবে।

কিন্তু হায় কার কথা কে শোনে। শেয়াল ডাকছে না। কুকুরের আর্তনাদ নেই কোথাও। চারিদিকে বীভৎস জ্যোৎস্না! সাদা আলো মাঠময়। সেই মাঠের ভিতর বসে একসঙ্গে কারা যেন নিত্য কেঁদে চলেছে। জনার্দন একটু থমকে দাঁড়াল। কারা কাঁদছে! ঠিক যেখানে নদী সামান্য বাঁক নিয়েছে, যেখানে ক'ঘর মুণ্ডা জাতীয় আদিবাসী ছিল, এবং যেখানে পেটের জ্বালায় ঘরের এক বৌ ফাঁসি দিয়েছিল সেইসব মাঠে এবং গাছের ভিতর একদল মেয়ে যেন হাজার হবে, তার বেশীও হতে পারে বসে বসে কাঁদছে। জনার্দনের প্রায় পা চলছিল না। এমন বীভৎস দৃশ্য জনার্দন কোনকালে যেন দেখেনি। হাজার ঘোড়া ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে সব নারী পুরুষের মুখ ঝুলছে। দেহ নেই। শুধু মুখ। তারপর একটা কালো ঘোড়া যেন ছুটে গেল, সেই ঘোড়ার পিঠে শুধু এক তরবারী। তারপর মনে হল সুবচনী দেবী মাঠের ভিতর ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে। ছোট সুবচনী দেবী হাত পা বিশাল করে, স্তনে সন্তান ঝুলিয়ে ঠিক কোন ভৈরবীর মত দুহাত ওপর তুলে জনার্দনের দিকে এগিয়ে আসছে। আর মনে হল হাজার হাজার কঙ্কাল সেই সুবচনী দেবীর চারপাশে আনন্দে নৃত্য করছিল। জনার্দন এবার বলল, মা আমার আর

কোন অহঙ্কার নেই মা। আমি ক্ষুধার জন্য অন্ধ হয়ে যাচ্ছি মা। মা আমার এই পিতৃপুরুষের দেশকে শ্মশান করে দিলি মা। জনার্দন হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল।

জনার্দন ধীরে ধীরে আরও নীচে নেমে এল। সে এক নাগাড়ে হাঁটতে পারছিল না বলে কোথাও সামান্য সময় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। জলের জন্য সে নেমে যাচ্ছে। খাদ্য অন্বেষণের জন্য সে নেমে যাচ্ছে। যেখানেই সে বসত — চারপাশে শুধু মৃত গাছের ডাল। হাওয়া দিলে মরমর শব্দ করে কিছু গাছপালা ভেঙ্গে পড়ত। জনার্দনের ইচ্ছে যায় তখন, মৃত ডালে, গাছে গাছে এবং সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়। মা সুবচনীকে পুড়িয়ে মারলে কেমন হয়। ভাবতে ভাবেত জনার্দন হা হা করে হেসে উঠল।

আবার জনার্দনের হাঁটা। দক্ষিণের মনি পাহাড়ে উঠে গেলে হয়ত এখন কিছু কাঁটা জাতীয় গাছ মিলতে পারে। কম জল হলে ওরা বেশী গজায়। পাথরের ফাটল থেকে রস চুষে ওরা বড় হয়। কিন্তু শরীর দুর্বল, মণি পাহাড়ে উঠে যাবার সাধ্য যেন একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে জনার্দনের। সে হেঁটে হেঁটে শেষ যে পাহাড়ের মাথায় রোজ উঠে পাথর নিক্ষেপ করত তার নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। জ্যোৎস্না রাত বলে পাহাড়ের শেষ দিকের অংশটুকু একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। সে এবার সেই যোজকের নীচের অংশটুকুতে এসে দাঁড়াল। পাথরে পাথরে জায়গাটা খুব উঁচু হয়ে গেছে। এবার নদীতে জল এলে প্রায় হ্রদের মত জায়গাটা ঘিরে জল ধরে রাখবে। সে জলের আশায় বৃষ্টির আশায় আকুল হতে থাকল। বৈশাখ চলে গেছে, জ্যৈষ্ঠ যাব যাব করছে। অথচ একবিন্দু বৃষ্টি নেই। এবারও মা সুবচনী এ-অঞ্চলে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। রাগে দুঃখে জনার্দন পাথরের ওপরই খামচাতে থাকল।

দুঃস্থ মানুষ জনার্দন অহোরাত্র খাদ্য অন্বেষণের পর ক্লান্ত হয়ে নদীর স্রোতের সামান্য উঁচু অংশটাতে চুপচাপ বসেছিল। ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। হরিণী তার দুই শিশু সন্তান নিয়ে এবার নেমে আসবে। ওদের জলপান করানো হলে জনার্দন পেট পুরে জলপান করবে। তারপর, মন্দিরের ভিতর সারাদিন পড়ে থাকা ক্ষুধার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে মাঝে মাঝে দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়া — হায় জনার্দন প্রায় এখন কিছুই ভাবতে পারছিল না। সামনে যে সব গঞ্জ ছিল সেও মৃতপ্রায়। কোন কোলাহল নেই, ক্রমশঃ এক অন্ধকার এই পাহাড় ঘেরা মাঠে নেমে এসে সব অঞ্চলটাকে ভূত প্রেতের রাজত্ব করে দিল।

জনার্দন মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল, না হয় না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে কোন মই বেয়ে এবার প্রায় আকাশের কাছাকাছি উঠে যাবে, এবং আকাশটাকে মা সুবচনীর খাঁড়া দিয়ে দু ভাগ করে দেবে। দু ভাগ করে দিলেই ঝর ঝর করে জল নামবে। সে এই ক্লান্ত শরীরেও মই বেয়ে ওঠার মত দু হাত তুলে

দিল আকাশের দিকে। তারপর চীৎকার করে বলতে চাইল, জল দে। আমি যদি তোর কাছে পাপ করে থাকি, আমার প্রাণের বিনিময়ে জল দে। বলে সে বালিয়াড়ী ওপর সটান শুয়ে পড়ল, এবং হাত দুটো পিঠের উপর যেন দুটো হাত বাঁধা অবস্থায় ওকে বলি দেওয়া হচ্ছে এমন ভঙ্গি নিয়ে বালির উপর শুয়ে পড়ল।— এবার দে এক কোপ। ভ্যাঁ। জনার্দন বালির ওপর কাটা পাঠার মত ছট ফট করতে থাকল এবং ব্যা ব্যা করে ডাকতে থাকল। যথার্থই যেন ওকে সুবচনী দেবীর মন্দিরে পাঁঠার মত বলি দেওয়া হচ্ছে এখন।

না এ ভাবে পড়ে থেকে লাভ নেই— জনার্দন উঠে পড়ল। নিশুতি রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে মাঠ, গাছ পাহাড় যেন দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে তাকে হত্যা করবে বলে। জনার্দন উলঙ্গ ছিল বলে উপবীত ডানদিকের কোমরের কাছে ঢলঢল করছিল। মনে হচ্ছিল উপবীত ওর শরীরে সুরসুরি দিচ্ছে। সে উপবীতে হাত রেখে হাঁকল, কে আসবি আয়, কার কার হিম্মত আছে আয়, কত লড়বি এই ঠাকুরের সঙ্গে আয়— কারণ জনার্দনের মনে হচ্ছিল শুধু সুবচনী নয় শুধু এই অঞ্চলের মানুষজন নয়, সকলেই যেন, যেন গাছ, ফুল, পাখি, পাহাড় সকলে মিলে ওর সঙ্গে তঞ্চকতা করছে। অথবা রসিকতা করছে— হায় জনার্দন তোদের ফসলের অহঙ্কার ভালবাসার অহঙ্কার এবারে সব মুছে যাবে।

ঠিক তক্ষুণি লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে আসছে হরিণী আর তার দুই শিশু। সোনার হরিণের মত দেখাচ্ছিল প্রায়। ভোর রাতের জ্যোৎস্নায় ওদের চোখগুলো বড় উজ্জ্বল ছিল। বালিতে পায়ের দাগ পড়েছে। ওদের শরীর এত নরম এবং উজ্জ্বল যে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছিল শরীর থেকে পিছলে যাচ্ছে। ওরা নেমে আসছিল এবং পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। জনার্দনের এখন আর মৃত্যুভয় থাকছে না। মাঠ এবং পাহাড়কে এখন দৈত্যের মত মনে হচ্ছে না। এখন যেন জনার্দন আর একা নয়। সে এবং এই তিন বন্য প্রাণী মিলে চারজন। সে প্রায় সুবচনী দেবীর মন্দিরে যেমন একা একা কথা বলে দিন কাটায় অর্থাৎ সেই সুবচনীর সঙ্গে কথা বলে, এবং সুবচনীর হয়ে কথার উত্তর দেয় তেমনি এই নদীর খাতে হরিণদের সঙ্গে প্রায় একা একা কথা বলার স্বভাব।— তা হলে তোরা এলি। তোদের জন্য আমি কখন থেকে বসে রয়েছি। তোরা তো বাপু দ্রুত ছুটতে পারিস, কোথায় কোন বনে দ্রুত ছুটে যাস কে জানে। আহারের কোন অসুবিধা হচ্ছে নাত! জনার্দন ওদের সঙ্গে প্রায় সাধু ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে দিল।

সে ওদের নাম রেখে দিয়েছে এতদিনে।

সে সবচেয়ে ছোটটাকে ডাকল— পলা! এই পলা তুইত বাপু ভারি দুষ্টু। শিঙে মুখ ঘসে সুখ খাচ্ছিস। পলা পা দুটো হঠাৎ এবার পিঠের উপর রেখে প্রায় মাথায় কাছে মুখ নিয়ে এল। ওর মাথার নীচে এবং গা চেটে

দিচ্ছে। বোধহয় ঘাম ছিল শরীরে, এবং ঘাম শুকিয়ে মুখের গন্ধ ছিল শরীরে, পলা মনের সুখে জিভ দিয়ে পিঠ ঘাড় গলা চেটে দিতেই জনার্দন এক ধরণের সুখ পেল — অতীব সুখ, লোভের বশবর্তী সে সুখ আহারের সুখ, এমন সুখ বুঝি কতদিন সে পায়নি — সে ভিতরে আহারের এক সুখ আছে ভাবতেই মনে হল কোথায় যেন আগুন জ্বলছে, কাঠের আগুন, বন্য মানুষেরা সেই কাঠে মাংস পুড়িয়ে চিবুচ্ছে। ওর জিভ স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়, জিভে জল এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে খপ করে পলাকে ধরে বুকের কাছে টেনে আনল, এবং ওদের জলপান করানোর কথা মনে থাকল না। আহারের লোভ, দীর্ঘদিনের অনাহার জনার্দনকে প্রায় পাগলের মত করে ফেলছে। সে পলাকে নিয়ে এবার মন্দিরের দিকে দ্রুত ছোটার জন্য মাঠের দিকে উঠে যেতে থাকল।

সুবলের পাখিও দ্রুত আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে। দ্রুত যেন পাখি সকলকে হারিয়ে দেবে। দেখো হুই আকাশে উড়েছে। জানালার পাশে আর কেউ নেই এখন। সুবল এবং টুকুন।

ভোরবেলা, নার্স এখনও আসেনি ঘরে। সুবলের কেবল গমনের অপেক্ষা। ওর দেবদারু গাছের নীচে থেকে জানালা দিয়ে ঘর স্পষ্ট, নার্স না থাকলেই টুকুন দিদিমণির সঙ্গে কথা, কত কথা, রাজ্যের কথা রাজরাণীদের কথা, রাজা ঘোড়ার চড়ে শিকারে যাচ্ছেন তার কথা — টগবগ করে ঘোড়া ছুটছে। সামনে পাহাড়, পথ উঁচু টগবগ করে উঠে যাচ্ছে, থামছে না, ঘোড়ায় চড়ে যেন রাজা যুদ্ধে যাচ্ছেন। সুবল পায়ে ঠিক ঘোড়ার মত তাল দিতে থাকল। বলল, দেখো আমার পাখি কালো ঘোড়ার মত, পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত রাজার দেশে চলে যেতে পারে। সে যে কত বড় রাজার দেশ! দেশে কোন দুঃখ নেই, কত গাছ, কত ফুল ফল পাখি — রাজার দেশে মানুষের মুখে হাসি আর আনন্দ। সামনে সমুদ্র, রাজার দেশে হায় কোন দুঃখ জাগে না। কোটাল পুত্র, রাজার পুত্র মাণিক্যের আলোতে দুঃখের জন্য জাগে। দিদিমণি দুঃখ না থাকলে কষ্ট না থাকলে, প্রাণে, আপনি বাঁশি বাজে না।

টুকুনকে খুশী রাখার জন্য, সামান্য সুবল আবোল তাবোল যা মনে আসে, যা মুখে আসে বলতে থাকে। টুকুনের সামান্য হাসি দেখার জন্য সে তার পাখি নিয়ে এসে জানালায় দাঁড়ায়। জানালায় দাঁড়ালে টুকুনের মনে হয় সুবল এসেছে পাখি নিয়ে। এই পাখির জন্য সে ট্রেনে হাততালি দিতে পারছিল না, এই পাখির জন্যে সুবলের জন্য সে হেঁটে গিয়েছিল। ওর মনে হয় ওর আর আলস্য থাকার কথা নয়, আর দূরে থাকার কথা নয়। আকাশে পাখি উড়তে থাকলে — অথবা ঘোড়া ছুটছে টগ বগ... তখন ঘোড়ার মত শক্তি যেন পায়ে খেলা করতে থাকে। রাজার হাতে অসি, অসি খেলা হচ্ছে, সুবল দুহাত দিয়ে ছোট্ট একটা তালগাছের মত বাঁশের বাঁট দিয়ে অসি বানিয়ে রাজার মত খেলা দেখাচ্ছে। যেন এক রাজা যুদ্ধে যাবার আগে সেনাপতিদের

অসির নিয়ম কানুন বোঝাচ্ছে।

অথবা ওর হাতে কোন কোন দিন লাঠি থাকত। মেলার দিনে সকলে যেমন লাঠি খেলা দেখায় — দূর থেকে ছুটে এসে লাঠিতে মাথায় বাড়ি মারে অথবা এক দুই তিন, একপা, দু পা, তিন পা সামনে গিয়ে ফের পিছনে — লাঠি ঠিক কোমরের সামনে রেখে ফের এক পা দু পা এগিয়ে যাওয়া — দেখলে মনে হবে সুবল যেন পায়ের ওপর পাইকদের মত নাচানাচি করছে। জানালা থেকে টুকুন ওর সব রকমের নাচন কোঁদন দেখে হাসত। ওর পায়ে কি শক্তি কি শক্তি! পাখির পাখায় কি রাজ্যের স্বপ্ন। মনে হত টুকুনের সমস্ত শরীরে সহসা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে।

তারপর সুবল যখন ক্লান্ত হত অথবা নার্স ঘরে ঢুকলে সে ভাল মানুষের বাচ্চার মত দেবদারুর নীচে গিয়ে বসে বলত, এসে যান বাবু দেখে যান বাবু, জুতো সাফ করে যান — এবং বলত, দু আনা পয়সা দেবেন — সুবল বেশী চায়না, শুধু খেতে পরতে চায়। বলত, আর এই পাখি আছে, পাখির জন্য কিছু সঞ্চয় করে নিচ্ছে। সে মন দিয়ে জুতো সাফ করে। সে পাখিকে টেরিটি বাজার থেকে কিনে আনা কীট পতঙ্গ খাওয়াত। ওর সুখের পাখি সখের পাখির জন্য প্রায় সময় সে স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে টুকুন দিদিমণি খুব সুন্দর এক জরীর টুপি মাথায় দিয়ে কনে বউ সেজে বসে আছে। সুবল লাঠি নিয়ে দু'পাশে নাচানাচি করছে। সুবল রাজার পাইক যেন। সুবল যেন লাঠি নিয়ে কনে বউকে খেলা দেখাচ্ছে লাঠির। পরণে জরীর কাপড়, মালকোঁচা মেরে সে কাপড় পরেছে। মাথায় পাগড়ী সুবলের। পাগড়ীতে পালক আছে। সে রাজার মত অথবা রাজপুত্রের মত কোন কোন সময়, যেন ঘরে কনে বউ ফেলে হরিণ শিকারে যাচ্ছে আর সেই শিকারের গল্প ভোর হলে অথবা বিকাল হলে বলা চাই।

সে বলত — সে এক হরিণ টুকুন দিদিমণি। হরিণের বনে হরিণ আছে। রাজার সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ আছে। বনে ঘন বন আছে। দু'চোখে বনের পথ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সমতল মাট আছে, মাঠে ঘাস আছে! রাজার পিঠে তীর ধনুক। একটি হরিণ জল খাচ্ছিল। মাঠের ভিতরে এত হরিণ অথচ একটা হরিণ জল খাচ্ছে। ছোট হরিণ — শুধু লাফায়, নাচে আর ঘাস খেতে সখ যায়, কিন্তু নরম ঘাস না হলে, কুয়াশায় ভেজা ঘাস না হলে হরিণ শিশু ঘাস খেতে পারে না।

রাজা ছুটছেন। বুঝলে দিদিমণি বনের ভিতর দিয়ে রাজা ছুটছেন। হরিণ ছুটছে। শিকার ধরার জন্য রাজা ছুটছে। কি বেগে ছুটছে! চারদিকে পাহাড়, ওপরে মধ্যিখানে হ্রদের পারে হরিণী ছুটছে। কি বেগে কি তালে তালে পায়ের খুরে আগুন জ্বলছে। পাথরে ঘসা লেগে পায়ের খুর জ্বলছে। হরিণীর বাচ্চা একা একা পথে তখন মাঠের ওপাশে হ্রদের জলে মুখ দিয়ে বসে রয়েছে। মা বুঝি আসছেন।

— বুঝলে দিদিমণি বিপদ বুঝতে পেরেছিল হরিণের বাচ্চারা।

— সে মাকে দৌড়তে দেখে সেও দৌড়াতে থাকল।

— রাজা ধরতে পারল সুবল?

— না! কি করে পারবে। হ্রদের পারে আসতেই রাজা দেখল পাথরের ঘসা খেয়ে ঘোড়ার পায়ে ফোসকা পড়েছে।

— ঘোড়ার পায়ে ফোসকা।

— বাপরে, আগুন জ্বলছিল পাথরে। হরিণের খুরে আগুন লেগেছিল।

— অঃ। টুকুন যেন আবার যথার্থই সবটা বুঝে ফেলেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল টুকুন, সুবল চলে যাচ্ছে। — বড় জ্বালাচ্ছে! নার্স চীৎকার করতে চাইল। কিন্তু অবাক টুকুন খাটের উপর বসে রয়েছে। মুখে কোন অবসাদের চিহ্ন নেই। সব কিছু কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে ডায়াল করে বলল, সুরেশবাবু, সুরেশবাবু আছেন?

— কে।

— আমি সারদা বলছি।

সহসা এই ফোন সুরেশ বাবুকে বিস্মিত করেছে। কোন অঘটনের আশঙ্কা করলেন তিনি। তার বুক কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে আসছে। নার্স সারদার গলা কাঁপছে বলতে — সে ঠিক স্পষ্ট বলতে পারছে না। দুঃসহ খবরের জন্য বুঝি ওর গলা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু একি বলছে! কি বলল! কি বলল!

— টুকুন খাটের উপর বসে দিব্যি সেই সুবল ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা বলছিল।

— ঠিক ঠিক বলছ?

— ঠিক। আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই সুবল পালিয়ে গেল।

— ডাক্তার বাবুকে খবর দিয়েছ?

— না।

— আগে তাকে খবর দেওয়া উচিৎ ছিল।

— এমন আনন্দের খবর আপনাকে আগে না দিয়ে তাকে দিই কি করে?

— শোন আমরা যাচ্ছি এখুনি। বলে ফোন ছেড়ে দিলেন সুরেশবাবু।

তারপর কিছুক্ষণের ভিতরেই ওরা সকলে এসে গেল। ডাক্তার বাবু এলেন। তিনি টুকুনকে দেখে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। টুকুন কিছু কুঁচ ফল এবং চন্দনের বীচি নিয়ে এখন বিছানায় ওপর একা একা আপন মনে খেলা করছে, সে ভিড় প্রায় লক্ষ্যই করল না। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, রাজপুত্রের গল্প অথবা এই যে এক পাখিয়ালা সুবল যার আপন প্রাণে নিরন্তর বেঁচে থাকার উদ্যম, যে কোন এক খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে এই শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই সুবল, বালক সুবল রাজার মত ওকে কেবল উৎসবের

কথা বলে গেল। বেঁচে থাকার কথা বলে গেল। আপন প্রাণের তেজে উড়ে যাবার কথা বলে গেল। সে চন্দনের বীচি কুঁচফল এবং রঙ-বেরঙের পাথরগুলো দেখতে দেখতে কেমন নিবিষ্ট হয়ে পড়ল।

—টুকুন তোমার শরীর ভাল হয়ে যাচ্ছে ! মা মাথায় হাত রেখে বললেন।

—টুকুন একবার মার দিকে তাকাল। কোন কথা বলল না।

ডাক্তার বাবু বললেন, আমার হাত ধর টুকুন।

টুকুন ডাক্তার বাবুর হাত ধরল।

—এবারে উঠে দাঁড়াও।

—আমি পারব না ডাক্তার বাবু।

—সুবলের একটা পাখি আছে টুকুন।

—ওর পাখিটা ভারি দুষ্টু। ও রাজার মাথায়— বলে হো হো করে হেসে উঠল।

—তুমি দাঁড়াও। সুবল আজ আবার কখন আসবে।

—কখন আসে বলে না। ওদিকে একটা দেবদারু গাছ আছে, তারপাশে কোথায় যেন থাকে।

—তুমি দাঁড়াও। এইত উঠতে পারছ।

—আমি পারব না ডাক্তার বাবু।

—এইত হচ্ছে। আচ্ছা শোন তুমি সুবল এলে থাকতে বলবে, ওর সঙ্গে আমি কথা বলব। আচ্ছা শোন, ঠিক আছে, কাল আবার আমরা হাঁটার চেষ্টা করব।

ডাক্তারবাবু টুকুনকে বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং নার্সকে ইসারা করতেই নার্স বারান্দায় বের হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু নার্সের পেছনে পেছনে বের হয়ে ফিস ফিস করে বললেন, সুবল কখন আসে।

—ঠিক থাকে না। আমি না থাকলেই চলে আসে। ও যেন কি করে টের পায় কখন আমি থকি না।

—ঠিক আছে। ও আসবে। ও টুকুনের সঙ্গে কথা বলবে। তবে যেন এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ ও না থাকে। তোমার প্রতি সুবলের যে ভয়টা আছে সেটা সব সময় রাখবে।

—আমি ওকে বেশী আসতে দিই না।

—খুব বেশী না দিলেও তোমাকে মাঝে মাঝে কাজের অছিলায় বাহিরে বেশী সময় থাকতে হবে। সুবল এসে কথা বললে ও প্রাণের ভেতরে এক অশেষ আনন্দ পায়। এক ধরণের উত্তেজনার জন্ম হয়। আমরা সকলে যা পারিনি, সামান্য এক পাখিয়ালা তাই করে দিয়ে গেল।

—তবে ওকে ভিতরে নিয়ে এলে হয় না ?

—না। তা হয়না সারদা। ওর যদি মনে হয় সুবল এখানেই থাকবে,

সুবলের আর যাবার জায়গা কোথাও নেই, তবে ওর প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ এখন সুবল ওর কাছে যাদুকরের মত। স্রেফ অলৌকিক যাদুকর। আসে যায়, কখনও কখনও হারিয়ে যায়। আবার আসে। প্রত্যাশা ওকে বড় এবং ভাল করে তুলবে। বলে ডাক্তারবাবু অন্যমনস্কভাবে কেবল তুড়ি মারতে থাকলেন।

সুরেশবাবু বাইরে এসে বললেন, কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার লাগছে সব!

সুরেশবাবুর স্ত্রী বললেন, ডাক্তারবাবু টুকুন সত্যি হাঁটতে পারবে?

— সব এখন পাখিয়ালা সুবলের উপর নির্ভর করছে।

— কেন কেন।

সুরেশবাবুর স্ত্রীর মুখ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

— টুকুনের কাছে সুবল এক আশ্চর্য এক যাদুকর। ওর পাখি, ওঁর কুঁচ ফল, চন্দনের বীচি, রঙ-বেরঙের পাথর আর সারদা যা বলল, কি সব আজগুবি গল্প বলে সে নাচতে থাকে কেবল। তার অর্ধেকটা বোঝা যায়। অর্ধেকটা বোঝা যায় না। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, বন পাহাড়ের গল্প, এবং পাখির গল্প বলে সে কেবল ছোটার অভিনয় করে। তখন টুকুনের, সুবলের পা দেখতে দেখতে বুঝি মনে হয় — হরিণের মত সেও ছুটছে, মনে হয় ঘোড়ার মত সেও ছুটছে, গল্পের সঙ্গে এই যে ছোটা, ছোটা আর ছোটা — প্রাণের ভিতর এই ছোটা কেবল আবেগের জন্ম দেয়। রক্তে উত্তেজনা আসে। হাতে পায়ে সেই উত্তেজনার রক্ত বইতে থাকে। টুকুনকে তখন খুব স্বাভাবিক দেখায়। এই ছোটার ভিতর সেই উদ্যমের কথাই বলা হচ্চে সুরেশবাবু। আমরা এই উদ্যম হারিয়ে কেমন ক্রমশঃ টুকুনের মত স্থবির হয়ে যাচ্চি। বলে ডাক্তারবাবু কেমন হাসফাঁস করতে থাকলেন! — আমাদের জীবনে এখন সুবলের মত এক পাখিয়ালা চাই। যে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসা দিয়ে আমাদের এই কঠিন রোগ সারিয়ে তুলবে। বলে তিনি ফের অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুড়ি মারতে থাকলেন।

হাতে তুড়ি মারতে থাকলেন ডাক্তারবাবু, জনার্দন ছুটতে থাকল মাঠ দিয়ে। বুকে পলা। হরিণ শিশু পলা জানর্দনের বুকের ভিতর চুপটি করে আছে। কোন ভয় ডর যেন নেই। কান খাড়া করে দেখছে পেছনে ওর মা অপলা, বোন অচলা আসছে। ছুটে ছুটে আসছে না। কারণ জনার্দন ভাবছিল সে খুব দ্রুত ছুটছে, কিন্তু জনার্দনের মনে নেই বোধ হয় — ওর শরীর বড় ক্লিষ্ট, শরীরে কোন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। চোখ মাঝে মাঝে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছে। মনে হয় সব কিছু ঝাপসা। আবার কেমন সামান্য জল খেলে চোখের ভাবটা ফিরে আসে।

জনার্দন ছুটছিল। কারণ সে অন্য দুই হরিণকে ভয় পাচ্ছিল। শুধু ফাঁকা মাঠ। বালি শুধু মাঠে। এখনও রোদ ওঠেনি বলে বালিতে কোন উত্তাপ

জমছে না। পাহাড়ের নীচটা ক্রমশঃ সাদা হয়ে উঠেছে। অন্য পাশে চাঁদের মরা গোল সোনার বাটি সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। দু-একটা শকুন উড়ে যাচ্ছিল কোথাও। কোনদিকে এই শকুনেরা উড়ে যাচ্চে অন্যদিন হলে জনার্দন একটু সময় অপেক্ষা করে দেখত। কিন্তু আজ এই পলা তার বুকে। এই পলার চোখ ওকে ভয় দেখাচ্ছে — জনার্দন ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে ছুটছিল আর মাঝে মাঝে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল। ওরা এখনও জনার্দনকে অনুসরণ করছে। ওরা অর্থাৎ দুই হরিণী। অচলা অপলা। সে এবার নুয়ে একটা পাথর তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। পাথরটা বেশী উঁচুতে উঠল না। কিছুদূরে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। হরিণীরা সেই পাথর নিক্ষেপের জন্য অল্প সময় থমকে দাঁড়াল। পাথরটা গড়িয়ে আসছে। জনার্দন ওদের ভয় দেখানোর জন্য থেমে থেমে পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছিল। আর হাত তুলে — যা আমার সঙ্গে কেন! যা বলছি! ভয়ে কেমন টেঁসে যাচ্ছিল জনার্দন। জনার্দন পিছন ফিরে তাকালে ওরাও থেমে যেত। জনার্দন ছুটতে থাকলে ওরাও ছুটত। জনার্দন পাথর নিক্ষেপ করলে ওরা দু পা তুলে পাথর রোখার চেষ্টা করত। অথবা যেন পাথরটাকে গুঁতো মারতে আসছে তেমনি শিং বাগিয়ে ধরত।

পাহাড়ের ভিতর দূরে সুবচনীর মন্দির দেখা যাচ্ছে। চার পাশে বনের মত। পাতা নেই কোন গাছে। ফলে গাছগুলো যেন মৃত। শুকনো এক ভাব — মনে হয় আগুন লাগলে দাবানল জ্বলবে। চারিদিকে তাকানো যাচ্ছে না। চারিদিক মরুভূমির মত হাহাকার। মাটি, মরুভূমি বুঝি গ্রাস করছে। জনার্দনের আর পা চলছিল না। সুবচনী দেবী কিছুতেই প্রসন্না হচ্ছেন না। তিনি প্রসন্ন হলে সংসারে আর দুঃখ কিসের! ঠিক তক্ষুণি পলা ওর বুকে ডেকে উঠল। ভয়ে ডেকে উঠল। জনার্দনের চোখে লোভ লালসা ভেসে বেড়াচ্ছে। জনার্দন থর থর করে কাঁপছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছে সুবচনী দেবীর মন্দিরের দিকে উঠে যাচ্ছে ঠিক তত সে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছে। এবং মন্দিরের ভিতর ঢুকেই পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ঠিক মন্দির সংলগ্ন একটা মৃত অর্জুন গাছের নীচে দুই হরিণী বসে রয়েছে। ওরা ওদের বাচ্চাকে ফিরিয়ে নিতে চায়।

জনার্দন আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে ভয়ে ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। কারণ জানর্দনের ভর ওর ক্ষীণ শরীর সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়বে। যদি হরিণী ওকে আক্রমণ করে তবে ওর পেট ফুঁড়ে যাবে। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে মনে হল, ওর কোলের ওপর থেকে হরিণ শিশুটা লাফিয়ে নীচে পড়ে গেল আর মনে হল সে ক্রমশঃ যে দৃষ্টিহীনতায় ভুগছিল, এখন সেই দৃষ্টিহীনতা ওকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। সে অন্ধকার দেখল চারিদিকে। সে হরিণ শিশুকে ডাকল, পলা পলা! সে লোভের গলায় ডাকল। গলা মুখে সেই নোনতা স্বাদ, বলে সেই আগুনের ছবি যেন কোন আদিম মানুষের বনের ভিতর হরিণের মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে। পলা সুবচনী

দেবীর পেছনে চলে গিয়ে ঘুপটি মেরে বসে রয়েছে। জনার্দনের চোখের ছবি দেখে বুঝতে পারছিল যেন মানুষটা ওকে এবার চিবিয়ে খাবে। ভয়ে পলা কোন শব্দ পর্যন্ত করল না। একবার উঠে গিয়ে দরজার কাছে মাথা ঠুকল। বের হবার চেষ্টা করল।

জনার্দন— অন্ধ জনার্দন দরজায় শব্দ শুনে ছুটে গেল। কিন্তু কোথায়! অন্যদিকে বোধহয়। সে শব্দ শুনে এবার হরিণ শিশুকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকল। এবং প্রায় অজগর সাপের মত সে মেঝের ওপর শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হরিণের পায়ে হাত রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু হায় হরিণ শিশু লাফাচ্ছিল, নাচছিল — ওর এখন প্রায় খেলার মত হয়ে গেল। চারিদিকে পাথরের দেয়াল। ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য বাতাস আসছে। জনার্দন দরজা বন্ধ করে রেখেছে। জনার্দন অন্ধ। সুবচনী দেবীর খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে। ফুল বেলপাতা শুকনো যেখানেই পলা গিয়ে দাঁড়াক না কেন মনে হয় ঐ দিকে। মনে হয় এখন পলা কাসর ঘন্টার নীচে, মনে হয় পলা এখন ঢাক ঢোলের নীচে, মনে হয় পলা এখন সুবচনী দেবীর মাথার ওপর উঠে বসে আছে। অথবা মনে হয়, পলা ঘরময় হেগে মুতে বেড়াচ্ছে।

জনার্দন সারাদিন ধরে পলাকে ধরার চেষ্টা করল। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ওর রাগে দুঃখে চোখ মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। সামান্য এক হরিণ শিশু ওকে নিয়ে রঙ্গ তামাসা করছে। সে হুংকার দিয়ে উঠল। যেখানে খাঁড়াটা ঝুলছিল তার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর খাঁড়াটা দড়ি থেকে খুলে ছুটে গেল মায়ের পাশে — মা আমার ক্ষুধা পেয়েছে। মা আমি না খেতে পেয়ে অন্ধ হয়ে গেছি। শরীরে শক্তি নেই মা। সে খাঁড়া নিজের মাথায় রেখে কেমন পাগলের মত শুয়ে পড়ল মেঝের উপর। পলাকে পুড়িয়ে মাংস খাবার ক্ষমতা তার আর থাকল না।

কিন্তু হায় সব পাগলের কাণ্ড। আত্মহত্যার ম এই ঘটনা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জনার্দনের মনে হচ্ছিল সে মরে যাচ্ছে। খাঁড়ার ঘায়ে ঘাড়ের কিছুটা অংশ কেটে গেছে। ভোঁতা খাঁড়ার আঘাত ভাল করে লাগেনি। তবু ঘাড়ের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে শান ভেসে যাচ্ছিল। এবং মনে হল এবার জনার্দন সত্যি মরে যাবে। কিন্তু পলার কথা মনে হতেই মনে হল ঘরের ভিতর থেকে এক অবলা পশু মরে যাবে। সে কেঁদে উঠল, মা মাগো। আমাকে আর সামান্য শক্তি দে। আমি মা দরজাটা খুলে দি।

শান ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ওর জিভে সেই রক্তের স্বাদ নোনতা লাগল, সে তাড়াতাড়ি ওপুড় হয়ে সেই রক্ত চাটতে থাকল। আহা আহা খাদ্যবস্তু। এমন খাদ্যবস্তু সে যেন কতকাল আহার করেনি। নিজের রক্ত পানে সে উল্লাসে ফেটে পড়ল। এত স্বাদ। এত স্বাদ এই রক্ত পানে এত স্বাদ। সে উল্লাসে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতে পারল। সে অন্ধ হলেও রক্তটুকু সে চেটে চেটে খেয়ে ফেলল। খেয়ে ফেলতেই ওর মনে হল কতকাল পর আহার

করেছে। সে কতকাল পর আহার করেছে। সে কতকাল পর আহার করে উল্লাসে জয়ঢাক বাজাচ্ছে। জয়ঢাক, ঢাক ঢোল বাজাচ্ছে। সে বাজাচ্ছিল না অন্য কেউ বাজছে।— কৈ রে পলা গেলি কৈ। সে উঠে দাঁড়াতে পারল, সে হেঁটে যেতে পারল। দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারল। টলতে টলতে সে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল। খিল খুলে দিয়ে বলল, যা অবলা হরিণ শিশু চলে যা। যদি কোন কালে বৃষ্টি হয় তবে বলবি — এই সংসারে জনার্দন চক্রবর্তী বলে একটা লোক ছিল, সে তার সব ভালবাসা দিয়ে, মন্ত্র দিয়ে এই দেশের প্রাণ প্রাচুর্যকে রক্ষা করতে চেয়েছিল — পারেনি।

একি! কিসের এত শব্দ! মনে হয় পৃথিবী দুলে উঠছে। মনে হয় পাহাড় টলছে। মনে হয় আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। মনে হয় ঝড়ে দেবীর মন্দির গাত্রে পাথর ছুটে আসছে। যেন এক প্রলয়। জনার্দন দু'হাত তুলে সেই উলঙ্গ রাত্রির ভিতর ডাকল, পলা, অপলা অচলা কোথায় গেলি। ঝড়ে মরে যাবি। তোরা মরে গেলে এই অঞ্চলে আমার চেষ্টার সাক্ষী কেউ থাকল না। তোরা মন্দিরের ভিতর চলে আয়। এই ঝড়ে পড়লে তোরা মরে যাবি।

কিন্তু জনার্দন ওদের কোন শব্দ পেল না। মনে হল অর্জুন গাছটা ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। মনে হল ভিতরে যত ফুল বেল পাতা ছিল সব উড়ে যাচ্ছে, মনে হল সেই হরিণ শিশুরা এখন লাফিয়ে চলছে। আর আর আর মনে হল — এটা কি হচ্ছে। বৃষ্টি। বৃষ্টি! মা, মা, বৃষ্টি হচ্ছে। মা মা, মাগো সুবচনী তোর এত কৃপা, তোর এত কৃপা। মা আমি যে আর কিছু ভাবতে পারছি না।

জনার্দন মন্দিরের ভিতর পর্বত প্রমাণ দৈত্যের মত লুটিয়ে পড়ল।

।। আট ।।

ডাক্তারবাবু ভিতরে ঢুকে বললেন, তুমি আজ বাড়ি যাবে টুকুন।

— সত্যি!

— সত্যি।

টুকুন বলল, আমি সত্যি বাড়ি যাব! ওর চারপাশে যা কিছু আছে — এই ভেবে একবার দেখল সব। তেমনি জানালা খোলা। মা-বাবা আসবেন। কখন আসবেন এই ভেবে টুকুন অধীর হয়ে উঠল। নার্সিং হোমের এদিকটায় একটা সবুজ মাঠ। এবং জানালা খুললেই চোখে পড়ে হাজার মানুষের মিছিল — এই কলকাতা শহরে এত মানুস কেন? কোথায় যায় — কি করে এরা, টুকুন ভেবে পায় না। কিন্তু টুকুন যেজন্য জানালায় বসে আছে এবং খোলা রেখেছে, নার্স এলে বলেছে, সুবল এসেছিল সিস্টার? সুবল কি আমার ঘরের

ভিতর ঘুরে গেছে ?

সিস্টার বলল না।

— সে কেন এল না ! আমি বাড়ি চলে যাব — সে না এলে কি করে আমি বাড়ি যাব ?

সিস্টার বলল, তোমার মা-বাবা এসে নিয়ে যাবে।

— মা-বাবা তো সব সময়ই আসছে, ওরা আমাকে যখন খুশী নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সুবলকে যে আমার বলা হয় নি, আজ আমি চলে যাব। সে এখানে এলে আমার ঠিকানা পাবে কি করে ?

— আমি দেব। তোমার বাড়ির ঠিকানায় চলে যাবে। তোমাদের কত বড় বাড়ি, চিনতে ওর অসুবিধা হবে না

— সে তো বলেছে, টুকুন দিদিমণি, আমি কলকাতার পথ-ঘাট চিনি না। তুমি যখন বাড়ি যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিও।

— সে ঠিক চলে যাবে।

— কিন্তু মা কি ওকে নিতে চাইবে ?

— নেবে না কেন ? এত বড় একটা অসুখ তোমার সে সারিয়ে দিল। আমরা সবাই যা করতে পারিনি, কোথাকার এক পাখিয়ালা এসে সব করে দিল, ভাবা যায় না।

— কোথাকার বলতে নেই সিস্টার ! সুবল খুব ভাল ছেলে। সে আমাকে চন্দনের বীচি কুঁচফল দিয়েছিল।

— খুব ভাল। ঐ যা একটা পাখি রেখেছে বাঁশের চোঙে আর লম্বা আলখেল্লার মত পোশাক। মনে হয় আমরা তিন চারজন ওর ভিতর ঢুকে যাব।

— সিস্টার আমি একটু জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে চাই এখন।

— আমি ধরছি।

— না আমি নিজে হেঁটে যাব। সুবল যে কখন আসবে !

সুবল এলেই যেন টুকুনের সব হয়ে যায়। সে কখনও জানালা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না। সে ক'দিন আগে মাত্র উঠে বসতে পেরেছে। গতকাল তাকে ধরে ধরে হাঁটা শেখানো হচ্ছিল। বার বার হাঁটতে গিয়ে টুকুন পড়ে যাচ্ছিল। পারছিল না। নার্স এবং আয়া মিলে দু পা হাঁটতে সাহায্য করেছে। একে ঠিক হাঁটা বলে না, কিছুটা সান্ত্বনা দেবার মত ব্যাপারটা ছিল — তুমি হাঁটতে পার টুকুন, আর কি, এবারে তোমাকে আমরা অনেক দূরে নিয়ে যাব। কোন বড় পাহাড়ে। সেখানে পাইন গাছ থাকবে, শীত থাকবে, বরফের পাহাড় জমবে। তুমি ফারের কোট গায়ে দিয়ে লম্বা সরু দুটো লাঠি হাতে নিয়ে দু পায়ে স্কেটিং করবে। এ-পাহাড় থেকে সে-পাহাড়। এ-উপত্যকা থেকে সেই অন্য উপত্যকায় — অনেকটা পাখিয়ালা সুবলের মত ভাষা, সুবল যে জানালায় এসে বলত, টুকুন দিদিমণি, দ্যাখো

কেমন পাখি উড়ে যায়, দ্যাখো কেমন ঘোড়া ছোটে, দ্যাখো কেমন নিরিবিলি আকাশে মেঘেরা উড়ে বেড়ায় — তুমি টুকুন দিদিমণি, রাজার মেয়ের মত ঘোড়ায় চড়ে স্ফটিক জলের নীচে রুপোর কৌটা খুঁজতে যাবে না? আমি তোমায় নিয়ে যাব। তখন টুকুন কেমন ছেলেমানুষের মত বড় বড় চোখে তাকায়। হাতের ইশারাতে সুবল যা কিছু দেখায় — টুকুনের মনে হয় সব সত্যি। সে সব পারে। সে রাজার মেয়ের মত রাজ্যের সব দুঃখী রাজপুত্রদের স্বয়ংবর-সভা ডাকতে পারে। সেই সুবই কেন যে এখনই এল না!

টুকুন বলল, কি সুন্দর দিন!

সিস্টার বলল, ভারি সুন্দর।

— সুবল আমাদের ট্রেনে উঠে এলে পুলিস এসেছিল সিস্টার।

— পুলিস।

— হ্যাঁ পুলিস। ওরা তো জল খাবে বলে মাঝ-রাস্তায় ট্রেন আটকে দিয়েছিল।

— ও মা, কি বলে টুকুন!

— হ্যাঁ সত্যি সিস্টার। ওদের দেশে খুব খরা। জল নেই। লঙ্গরখানা বন্ধ। জলের অভাবে চাষবাস হয় না। গাছ পালা পুড়ে গেছে। সারা মাঠ খাঁ খাঁ করছে।

— সত্যি?

— সত্যি সিস্টার। আমাদের ট্রেনটা থামিয়ে দিলে বাবা তো ভয়ে কাঠ। ওদের কি চেহারা! সুবলকে এখন দেখে চেনাই যায় না। ওর শরীরে মাংস ছিল না। লিকলিকে। কাঠির মত হাত-পা। অথচ কি সুন্দর হাসিমুখ সুবলের, কি সুন্দর সরল চোখ!

সিস্টার বলল, গ্রামের মানুষদের এমনই মুখ চোখ হয় টুকুন।

টুকুন বলল, না দিদিমণি, হয় না। আমাদের কামরায় কেবল তো সুবল ওঠেনি, আরও অনেকে। ওদের দেখলে সিস্টার আপনিও ভয় পেতেন। আমি তো ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম, কিন্তু সুবল এসে শিয়রের কাছে দাঁড়াতেই আমার মনে হয়েছিল সিস্টার, একজন বালক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়িয়েছে।

সিস্টার না বলে যেন পারল না, টুকুন তুমি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারছ দেখছি।

— সিস্টার আমি জানি না, কি করে এমন সুন্দর কথা বলতে শিখে গেছি। আগে মা বলত, আমি একটাও কথা বলতাম না। সব তাতেই আমি বিরক্ত হতাম। শুধু চুপচাপ শুয়ে খাকা ছিল আমার কাজ। আমি এখন কেমন উঠে বসতে পারি, হাঁটতে পারি।

সিস্টার জানে — টুকুন ঠিক হাঁটতে জানে না। টুকুনের বয়স কত — এই বারো-চোদ্দ হবে, টুকুনের অসুখ কবে থেকে, সেই কবে থেকে যেন, সাল-তারিখ সবাই ভুলে গেছে — এত লম্বা অসুখ মানুষের কি করে হয় —

কি যে লম্বা অসুখ, ঠিক ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত, রেসের মাঠে যেমন একটা ঘোড়া অনন্তকাল ছুটেও শেষ করতে পরে না, তেমনি মনে হয় টুকুন এক অনন্তকাল ছুটেও শেষ করতে পারে না, তেমনি মনে হয় টুকুন এক অনন্তকালের ঘরে অসুখের দরজায় বার বার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এমন অনেকবার হয়েছে। সে বেশ ভাল হয়ে গেছে। হেসে খেলে বেড়িয়েছে— আবার কি করে যে একটা অসুখের ভিতর পড়ে যায়— সে জানে না কি করে সে রুগ্ন হয়ে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখের নীচটা ফুলে যায়। তখন শরীরের যাবতীয় কিছুতে কড়া পাহারা এবং এই করে কতকাল থেকে মা-বাবা বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভিতর পড়ে গেল টুকুনের। প্রতিযোগিতা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের।

টুকুন বলল, এখনও সুবল আসছে না।

—এসে যাবে।

—আমি জানালায় যাচ্ছি। বলে টুকুন নিজেই উঠে বসার চেষ্টা করল। ওর হাত-পা লম্বা। গায়ে মাংস সামান্য লাগায় মুখটা বেশ ভরা দেখাচ্ছে। সব কিছুর ভিতর আছে কেবল ওর দুটো সুন্দর চোখ। মনে হয় আশ্চর্য নীল চোখ। চোখের মণিতে এখনও ছায়া দেখা যায়। কেউ এসে পাশে দাঁড়ালেই ছায়াটা নড়ে ওঠে। সিস্টার টুকুনকে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে চাইলে হাতটা ঠেলে দিল।— না, সিস্টার, আপনি দেখুন আমি ঠিক ঠিক উঠে যাচ্ছি। আমার উঠতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। বলে সে অনায়াসে উঠে বসলে, বলল, কেমন ঠিক আমি উঠতে পেরেছি।

টুকুনকে আজ সকালেই হলুদ রংয়ের একটা ফ্রক পরানো হয়েছে। নরম সিল্কের। রংটা ভারি উজ্জ্বল। লতাপাতা আঁকা ফ্রক। কোথাও দুটো প্রজাপতি মুখোমুখি বলে— এবং নানা রংয়ের ছবি ফ্রকে। ওর সেই খেলনাগুলোর মত। এই বয়সেও টুকুন খেলনার জগতে থাকতে ভালবাসে। এই খেলনার জগতে সে কখনও রাণী হতে ভালবাসে, অথবা রাজকন্যা। ওর কুদুমাসি বেড়ালটা ভারি বজ্জাত। যখন টুকুন এমন ভাবে, তখন বেড়ালটার গোঁফ নড়ে ওঠে। টুকুনের তখন ইচ্ছে হয় আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে। সে পারে না। কারণ সে উঠতে পারে না, হাঁটতে পারে না। ক'দিন কোন হুঁশ ছিল না। সুবল এসে খুঁজে পেতে ঠিক জানালায় আবিষ্কার করে ফেলে, আবার ওকে উৎসাহ দিল। বাঁচার উৎসাহ। কি এক জাদুকরের মত সুবল হাত-পা নেড়ে কেবল নেচে নেচে গ্রাম্য সঙ্গীত সুর করে বলে যেত।

এখনও সুবল আসছে না। সিস্টার অবাক— আজ এমন প্রতীক্ষা একজন মানুষের জন্য টুকুনের, যে এলেই বলবে তুমি যাবে আমাদের বাড়িতে। এই আমাদের ঠিকানা। দেখবে খুব বড় বাড়ি। সামনে বড় জলাশয়। চারপাশে অনেক দিনের পুরনো পাঁচিল। ভিতরে অজস্র গাছপালা। এবং জলাশয়ের পাশে সুন্দর এক অট্টালিকা। অট্টালিকার ছায়া যখন সেই

জলাশয়ে ভাসতে থাকে তখন মনে হবে সুন্দর এক রাজকন্যার সন্ধানে কোন রাজপ্রাসাদে ঢুকে গেছে।

সিস্টার অবাক, ভারি সুন্দর পা ফেলে ঠিক ওর মনে আছে, সে এমন পা ফেলে হেঁটে গেছে — সেই কবে, এখন ভারি স্বপ্নের মত মনে হয় — সে একজন মানুষের উদ্দেশ্যে এমন পা ফেলে হেঁটে গেছে, বাড়িতে কি সব আলো জ্বালানো হয়েছিল সেদিন, সকাল থেকে শানাই বেজে চলেছে, সে সকাল থেকে হলুদ রংয়ের শাড়ি পরেছিল, এবং পায়ে পায়ে হাঁটা, প্রতীক্ষা, আশ্চর্য প্রতীক্ষা থাকে মানুষের। সে কখনও জানে না কি ভাবে সেইসব প্রতীক্ষার দিনগুলি মরে যায়। এখন টুকুন জানালায় যে ভাবে হেঁটে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে গুণে গুণে পা ফেলে, কেউ যেন দুপাশ থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন তাকে কেউ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পীঁড়িতে বসিয়ে দেবার জন্য, লাল বেনারসী, চুমকি-বসানো ওড়না, মুখে কপালে ঘাম, পা গুণে গুণে হাঁটা, টুকুন ঠিক সেইভাবে জানালায় হেঁটে যাচ্ছে।

টুকুন বলল, সিস্টার আপনি বলেছিলেন আমি হাঁটতে পারি না।

— আমি দেখেনি টুকুন। তুমি ঠিক হাঁটতে পার।

— আজ মা-বাবাকে বলবেন কিন্তু আমি জানালা পর্যন্ত হেঁটে গেছি।

— বলব।

— কি সুন্দর লাগে!

— আমি তোমাকে ধরে থাকব।

টুকুন জানালার গরাদে হাত রেখে বেশ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কষ্ট হচ্ছিল — কষ্ট হোক, পায়ে এভাবে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে, মেয়েটা একদিন ঠিক অশ্বের মত হয়তো দৌড়ে যাবে। কত জায়গায় না গেছে। এই অসুখ নিরাময়ের জন্য মিঃ মজুমদার হিল্লি-দিল্লি কম করেননি। অথচ মেয়েটা সেই যে কী হয়ে থাকল, চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আর ভাল হতে চাইল না। তারপর সেই খরার দেশের ওপর দিয়ে ট্রেন এসে গেল। ট্রেন আটকে দিল মানুষেরা। লুটেপুটে ট্রেনের জল খেয়ে নিল। খেয়ে নিয়ে কেউ নেমে গেল না। ওরা শহরে-গঞ্জে চলে যাবে বলে ট্রেনে বসে থাকল। তারপর অন্য স্টেশনে, পুলিস। কড়া পাহারায় সব মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। টুকুন শুয়ে শুয়ে আশ্চর্য এক মানুষের গল্প করার সময় এমন বলেছে।

— জানেন, সিস্টার, সুবলের একটা বাঁশের চোঙ ছিল। কত যে রাজ্যের কীট-পতঙ্গ ওর পকেটে!

— ও সব দিয়ে ও কি করত?

— ওর পাখির জন্য ধরে এনেছে।

— পাখিটার কি নাম?

— কি যে নাম জানি না।

— ট্রেনে উঠে তোমাদের কামরায় সরাসরি?

— আমি দেখলাম, ওরা এসেই বাথরুমে চলে গলে। জলের কল খুলে দিল। অঞ্জলী পেতে কেবল জল খেতে থাকল।

— তারপর ?

— তারপর অবাক আমরা, কি করে সুবলের কোল থেকে সব পোকা-মাকড় উড়ে গেল। এবং সারাটা কামরা ভরে গেল।

— ও মা, তাই বুঝি ?

— বাবা ভীষণ বিরক্ত। কিন্তু যতসব ক্ষুধার্ত লোক একটু জলের জন্য যখন এমন করতে পারে তখন ভয়ে বাবা কিছু বললেন না। পোকাগুলো সারাটা কামরায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বসতে পারছি। না। আমাদের মুখ-চোখ সব ঢেকে গেছে।

— সত্যি !

— সত্যি সিস্টার ! কিন্তু সুবল নিমেষে সব সাফ করে দিল।

— কি করে ?

— কিছু না। সে তার বাঁশের চোঙ থেকে বলল. যা পাখি উড়ে যা ! পাখি উড়ে গেল। উড়তে থাকল। সব এক দুই করে খেতে থাকল। বড় বড় পোকামাকড় সব ধরে এনে সুবলের কোলের ভিতর পুরে দিতে থাকল পাখিটা।

তারপর টুকুন অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। সে চুপচাপ, চারপাশের মাঠ, রাস্তা, ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি দেখছিল। বেশ চলছে কলকাতা শহর। চলে, যাচ্ছে, কেবল চলে যাচ্ছে। টুকুন বরান্দায় দাঁড়ালে, সে কলকাতা শহর কেবল দেখতে পায় চলে যাচ্ছে। কেবল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দালান কোঠাগুলি আর লাইটপোস্ট, ইলেকট্রিক তার এবং নিরবধি কালের এই আকাশ।

এমন দেখতে দেখতে সে তন্ময় যায়। তখন মনেই হয় না, এই শহরের কোথাও সুবল বলে একজন বালকের নিবাস রয়েছে। যে এসেছিল এদের সঙ্গে, যাকে মা ব্যাণ্ডেলে নামিয়ে দিল। যার কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই। সংসারে সুবল একা এক মানুষ। অথচ আশ্চর্য, তার কোন ভয় নেই। মা-বাবা না থাকলে সংসারে কি যে ভয়। টুকুনের ভয়ে চোখ বুজে এল।

সে চোখ বুজেই বলল, জানেন সিস্টার, সুবলের কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই, কেউ না থাকলে কি কষ্ট না !

— খুব কষ্ট। এবারে এস তোমাকে শুইয়ে দিচ্ছি। একসঙ্গে বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।

— আমার কিন্তু কোন কষ্ট হচ্ছে না।

— তা না হোক। তবু তোমার এখন শুয়ে থাকা উচিত।

সিস্টার জানে বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ওর নেই। এবং যদি দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় তবে কেলেঙ্কারী। সে বলল, আমি

জানলায় আছি, সুবলকে আসতে দেখলেই বলব সুবল আসছে।

—আপনি ঠিক চিনতে পারবেন না!

—না। আমার মনে হয় আপনি ওকে ভুলে গেছেন। সে থাকে জানালার বাইরে। আপনি ভিতরে। আপনি তাকে কতটুকু দেখেছেন!

তা ঠিক। সিস্টার খুব একটা বেশী দেখেনি। ছেলেটা এলেই কেমন বিরক্তিকর ঘটান। সিস্টার দূরে অন্য কাজে মন দিত। কি যে এত কথা এমন একটা সুন্দর বড়ঘরের মেয়ের সঙ্গে—কোথাকার হাভাতে একটা ছোঁড়া, সে এলেই কেমন টুকুন হাতে-পায়ে বল পায়। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, সে এলে তাকে যেন টুকুনের সঙ্গে কথা বলতে অ্যালাউ করা হয়—সুতরাং সিস্টার আর কি করে এবং এখন মনে হল, সুবলকে সে খুব একটা ভাল লক্ষ্য করেনি।

টুকুন এবার ধীরে ধীরে বলল, জানেন সিস্টার কেউ একা এমন ভাবতে আমার কেন জানি ভারি কষ্ট হয়। আমার তখন কিছু ভাল লাগে না।

টুকুন একা—এটা ভাবতে ওর আরও কষ্ট। কখনো কেউ একা থাকলে—কেউ না থাকলে—টুকুনের মনে হয় সে যদি এমন একা হয়ে যায়। কেউ নেই। বাবা নেই, মা নেই। ওর দেখাশোনার মেয়ে শেফালি নেই - কি যে হবে তখন - ওর কি যে কষ্ট, ঠিক সুবলের মত সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। একটা গাছের নীচে বসে থাকলে তার ভেউ ভেউ করে শুধু কান্না পাবে।

এ-জন্যই ওর ভিতর সুবলের জন্য কেমন মায়া পড়ে গেছে। সে জানে ওর যা বয়েস—এ-বয়সে অনেক কিছু হবার কথা। অথচ কি আশ্চর্য, তার শরীরে কোথাও সে সব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। মা-বাবার কথাবার্তা অথবা ডাক্তারের কথাবার্তা থেকে সে ধরতে পারে—জননী হতে গেলে যা যা লাগে এই বয়সে তার কিছু তার ভিতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। সে কেমন দুঃখী গলায় এবার বলল, সিস্টার আমাকে ধরুন। আমি পায়ে হেঁটে আর যেতে পারছি না।

মেয়ের এমনই এক রোগ। হতাশা বুকে। এখন মনে হয় মেয়ের বয়স ষোলর মত। ফ্রক কি খালি রাখলেও কোন ক্ষতি নেই। সে যেন ইচ্ছা করলে একটা সিল্কের গেঞ্জি পরে থাকতে পারে। পুরুষ মানুষের মত হেঁটে বেড়াতে পারে। এবং এ-ভাবেই মেয়ের অসুখ বেড়ে গেল। এখন মনে হয় বয়স আরও বেশী টুকুনের, হিসাব করলে ষোল-সতেরো। ফ্রক গায়ে দিয়ে কচি বালিকা সেজে বসে আছে—এবং ইহজীবনে বুঝি টুকুন আর এ-বয়স পার হবে না। অথচ আশ্চর্য সুন্দর মুখ টুকুনের। মেয়েদের এমন সুন্দর মুখ হয়! আহা আশ্চর্য চোখের তারায় কি যে মায়া। সে সুবলের জন্য এখন বিচানায় শুয়ে কেমন প্রার্থনা করছে। ঈশ্বর, যাদের কেউ নেই, তুমি তাদের আছ। তুমি

তাদের দ্যাখো।

সে শুয়ে আছে। পা দুটো সোজা। একটা সাদা চাদরে ঢাকা। এবং ফের মোমের মত মুখ হয়ে গেছে। চোখ প্রায় স্থির। কেমন কষ্টদায়ক মুখের ছবি। তাকে কোন কফিনের ভিতর রাজকন্যার মমির মত লাগছে এবং এ-ভাবেই সিস্টার দেখে অভ্যস্ত। এই যে একটু সময় জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সেটাই বড় বিস্ময়ের ব্যাপার। টুকুনকে যারা দেখেছে, তাদ্বের কাছে টুকুনের এমন ভঙ্গীতে শুয়ে থাকার ব্যাপারটাই বরং স্বাভাবিক, টুকুন যে জানালায় হেঁটে গিয়ে সেই সুবল নামক বালকের জন্য প্রতীক্ষা করছিল কে বলবে!

টুকুন বলল, জল খাব সিস্টার।

সিস্টার জল দিলে বলল, সে এলে আমায় কিন্তু ডেকে দিও। আমার এখন খুব ঘুম পাচ্ছে।

।। নয় ।।

সুবল সকাল সকাল উঠেই ফুটপাথের কলে স্নান করে নিয়েছে। সে একটা ঘর এখনও পাচ্ছে না। সে যা আয় করছে, বাবুরা ওর ভাজাভুজি কিনে যা দেয়, তাতে ওর দু বেলা ছাতু খেয়ে বেশ চলে যাচ্ছে। আর পয়সা বাঁচে না যা দিয়ে সে একটা ঘর, খুপড়ি ঘর ভাড়া নিতে পারে। এখানে সে দু-একজন লোকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচয় করে ফেলেছে, যেমন অজিত সাহা লোকটি তাকে অন্য ব্যবসা করতে বলছে—এই যেমন মটর কিনে সেদ্ধ করে রং মিশিয়ে মটরশুঁটির মত বাজারে বিক্রি করা। সিনেমার শো ভাঙলে সে অনায়াসে এই সব বিক্রি করতে পারে।

সুবল বলেছিল, রং মেশাতে হবে কেন?

—রং না মেশালে শুকনো মটর মনে হবে, সবুজ মনে হবে না।

—রং তো লোকে খায় না!

—খায় না, খেতেও নেই। ওতে অক্সাইড থাকে, পেটে ঘা করে দেবার পক্ষে ভাল।

—ওতে মানুষের ক্ষতি হয় অজিতদা।

—মানুসের ক্ষতি হলে তোর কি? তোর ক্ষতি না হলেই হল।

—তা হলে এটা তো ভাল না। মানুষের ক্ষতি হলে কিছু আমার ভাল লাগে না। তুমি অন্য ববসার কথা বল।

—তবে যা করছিস তাই কর। ফুটপাতে শুকিয়ে মর।

—আমি তো একা মানুষ, আমার তো চলে যাচ্ছে।

—তোর অসুখে-বিসুখে কোথায় থাকবি?

—গাছের নীচে।

— শালা তবে খরার দেশ থেকে চলে এলি কেন ?

-- ওখানে বর্ষা নামলে আবার চলে যাব। এ-শহরে আমি থাকব না অজিতদা।

— কেন, ভাল লাগে না ? তোকে একদিন সিনেমায় নিয়ে যাব। দেখবি তখন তোর এই শহরটার ওপর মায়া পড়ে যাবে।

— তাই বুঝি ?

— তবে আবার কি !

— আমার পাখীটা এখানে থাকতে চাইছে না।

— রাখ তোর পাখি। কোথাকার কি একটা পুষে রেখেছিস, ছেড়ে দে। চলে যাক। সঙ্গে শুধু শুধু উটকো ঝামেলা রেখেছিস।

— ছেড়ে দিলে চলে গেলে মন্দ হত না। কিন্তু যায় না। আমাকে নিয়ে যাবে বলছে।

— শালা তোর পাখি তবে কথাও বলে !

— বলে, তোমরা ঠিক বুঝতে পার না। বলে সুবল হেসেছিল। তবু সুবল এই অজিত সাহার উপর রাগ করে না। বরং দু-একদিন কিছু কামাতে না পারলে অথবা পয়সা কম পড়লে সে তার কাছ থেকে ধার নেয়। দু-একদিন অজিত সাহা ওর বস্তির খুপরি ঘরে ডেকে দুটো ভাল-মন্দ খাইয়েছে। সুবল অনেকদিন ভাত খায়নি। সে টুকুন দিদিমণিকে বিকেলে দেখতে যায়। একদিন টুকুন দিদিমণির নার্স দেখে কেমন বিরক্ত হয়ে দশটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল, যেন ভিক্ষে চাইছে সুবল, সুবল হেসে বলল, না মা-জননী, আমি ভিখারী নই। টুকুন দিদিমণি আমি ভিখারি! টুকুন দিদিমণি আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আমার কেমন এই টুকুন দিদিমণির জন্য মায়া পড়ে গেছে।

সিস্টার বলেছিল, টুকুনকে তুই দিদিমণি বলিস কেন রে।

— কি বলব মা জননী ?

— মা-জননী, মা-জননী করবি না। কেমন বিরক্ত গলায় টুকুন দিদিমণির নার্স ওকে তাড়া লাগাত। সে যেত পালিয়ে। কিন্তু সেই যে সেদিন সে যেমন বলেছিল, বলে আর যায়নি, সে এক হরিণ টুকুন দিদিমণি! হরিণের বনে হরিণ আছে। রাজার সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ আছে। বনে ঘন বন আছে, দু'চোখে বনের পথ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সমতল মাঠ আছে, মাঠে ঘাস আছে। রাজার পিঠে তীর-ধনুক। একটা হরিণ জল খাচ্ছে। ছোট হরিণ শুধু লাফায়, নাচে আর ঘাস খেতে শখ যায়, কিন্তু নরম ঘাস অথবা কুয়াশায় ভেজা ঘাস না হলে হরিণশিশু ঘাস খেতে পারে না দিদিমণি। এভাবে সে তার গল্প আরম্ভ করেছিল সেদিন।

— রাজা ছুটছেন। বুঝলেন দিদিমণি, বনের ভিতর দিয়ে রাজা ছুটছেন। সে ঠিক এ-ভাবেই বলে যাচ্ছিল। সুবলের ভীষণ স্মৃতিশক্তি। সে

সেদিন কি কি বলেছিল, এবং নার্স তাকে তাড়া লাগালে সে আরও কি কি বলেছিল সব হুবহু মনে করতে পারছে না ফের। কলতলায় চান করতে করতে সব মনে পড়ছে। চান শেষ করে যখন ফুটপাতে করবীগাছটার নীচে গিয়ে বসবে তখনও মনে পড়বে।

— হরিণ ছুটছে। শিকার ধরার জন্য রাজা ছুটছে দিদিমণি। কি বেগে যে ছুটছে! চারিদিকে পাহাড়। মাঝখানে হ্রদ। হ্রদের পাড়ে পাড়ে হরিণ আর রাজা ছুটেছে। কি বেগে দ্রুত যে ছুটছে। হরিণীর খুরে পাথরের ঘষায় মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে উঠছে। হরিণীর বাচ্চাগুলো তখন মাঠের ভিতর। বাচ্চাগুলো মায়ের বুঝি বিপদ ধরতে পেরেছিল। মাকে দৌড়তে দেখে ওরাও তখন দে-দৌড়।

— রাজা ওদের ধরতে পারল সুবল?

— না, কি করে পারবে! হ্রদের পাড়ে আসতেই রাজা দেখল, পাথরের ঘষা খেয়ে ঘোড়ার পায়ে ফোসকা পড়েছে।

— ঘোড়ার পায়ে ফোসকা!

— বাপ রে, আগুন জ্বলছিল পাথরে! হরিণের খুরে আগুন লেগেছিল।

— আঃ। টুকুন যেন যথার্থই সবটা বুঝে ফেলেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে টুকুন নার্সকে দেখেছিল, দেখে ভয়ে সুবল জানালার নীচে প্রায় যেন ডুব মেরেছে। তারপর দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে নিজেকে আড়াল দিয়ে রেখেছে। এবং টুকুন বুঝেছিল নিশ্চয়ই সুবল সিস্টারকে আসতে দেখেছে। চোখ তুলেই দেখেছিল সিস্টার ঢুকছে।

— বড় জ্বালাচ্ছে! সিস্টার চীৎকার করে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সিস্টার অবাক — টুকুন খাটের ওপর বসে রয়েছে। চোখ ঝলমল করছে। ভীষণ সজীব। মুখে কোন অবসাদের চিহ্ন নেই। সব কিছু কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে ডায়াল করে বলেছিল, সুরেশবাবু, সুরেশবাবু আছেন?

— কে?

— আমি সারদা বলছি।

সহসা এই ফোন সুরেশবাবুকে বিচলিত করেছিল। বুঝি শেষ, কোন অঘটনের আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। তাঁর বুক কেঁপেছিল। তিনি বলেছিলেন, খুব স্থির এবং স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন, বল।

— টুকুন খাটের ওপর বসে সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে সত্যি কথা বলছিল।

— ঠিক ঠিক বলছ?

— ঠিক। আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই পালিয়ে গেল।

— দ্যাখো তো আছে কিনা কোথাও?

সারদা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখেছিল, কেউ নেই।—না, নেই। আমাকে খুব ভয় পায়। আমাকে দেখেই পালিয়েছে।

সুরেশবাবু বলেছিলেন, ডাক্তারকে খবরটা দিয়েছ ?

—না।

—আগে তাকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল।

—এমন আনন্দের খবর আপনাকে না দিয়ে থাকি কি করে !

—আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি। ছোঁড়াটা এলে যেতে দেবে না। ওকে আমাদের দরকার আছে।

তারপর কিছুক্ষণের ভেতরই সুরেশবাবুরা এসেছিলেন। ডাক্তার বাবুও সঙ্গে হাজির। টুকুনকে দেখে তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। টুকুন কিছু কুঁচফল এবং চন্দনের বীচি নিয়ে তখন বিছানার ওপর খেলা করছিল। সে তার চারপাশে এত মানুষজন একেবারেই খেয়াল করেনি। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, রাজপুত্রের গল্প, অথবা এই যে এক পাখিয়ালা সুবল, যার আপন প্রাণে নিরন্তর বেঁচে থাকার উদ্যম, যে কোন এক খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে এই শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে, সেই সুবল, বালক সুবল, রাজার মত ওকে কেবল উৎসবের কথা বলে গেল। বেঁচে থাকার কথা বলে গেল। আপন প্রাণের তেজে কেবল উড়ে যাবার কথা বলে গেল। সে চন্দনের বীচি কুঁচফল এবং রংবেরংয়ের পাথরগুলো দেখতে দেখতে কেমন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল !

—টুকুন তোমার শরীর ভাল হয়ে যাচ্ছে। বাবা কপালে হাত রেখে এমন বলেছিলেন।

টুকুন বাবার দিকে তাকিয়েছিল অথচ কোন কথা বলেনি।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, আমার হাত ধর টুকুন।

টুকুন ডাক্তারবাবুর হাত ধরেছিল।

—এবারে উঠে দাঁড়াও।

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু।

—সুবলের একটা পাখী আছে টুকুন।

—সুবল কেন চলে গেল ?

—তুমি দাঁড়াও। সুবল আবার কখন আসবে ?

জানি না। ও কিছু বলে না। ওদিকে একটা একটা দেবদারু গাছের নীচে না কোথায় থাকে।

—তুমি দাঁড়াও। এই তো উঠতে পারছ।

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু।

—এই তো হচ্ছে। আচ্ছা শুনুন সিস্টার, সুবল এলে থাকতে বলবেন। আমার ওর সঙ্গে কথা আছে। তারপর ডাক্তারবাবু টুকুনের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, কাল আবার চেষ্টা করব।

ডাক্তারবাবু টুকুনকে বিছানায় রেখে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সিস্টারকে ইশারায় ডেকেছিলেন। তারপর ফিসফিস গলায় বলেছিলেন, সুবল কখন আসে ?

—ঠিক থাকে না। আমি না থাকলেই চলে আসে। ও যেন কি করে টের টায় আমি কখন থাকিনা।

—ঠিক আছে। ও ঠিক আসবে। ও যখন আসছে তখন ঠিক আসবে। ও টুকুনের সঙ্গে কথা বলবে। তবে দেখবেন একনাগাড়ে যেন বেশীক্ষণ ও না থাকে। আপানর প্রতি যে ভয়টা আছে ওটা যেন ওর থাকে।

—আমি ওকে বেশী আসতে দিই না স্যার।

—খুব বেশী আসতে না দিলেও আপনাকে মাঝে মাঝে কাজের অছিলায় বাইরে বেশী সময় থাকতে হবে। সুবল এসে কথা বললে, টুকুন প্রাণের ভিতর বিশেষ আনন্দ পায়। এক ধরণের উত্তেজনার জন্ম হয়। আমরা সবাই যা পারিনি, যার জন্য এই মেয়েকে নিয়ে আমরা কোথায় না গিয়েছি, কোথাকার এক সমান্য পাখিয়ালা এসে মনে হয় ওকে ক্রমে নিরাময় করে তুলছে। বলে ডাক্তার বাবু একটু থেমেছিলেন, চোখ টেনে শরীরে রক্ত প্রবাহের মাত্রা দেখেছিলেন। এবং কেমন বেশ খুশী খুশী লাগছিল ডাক্তারবাবুকে।

সিস্টার বলেছিল, তবে ওকে কাছে রেখে দিলেই হয়।

—না, তা হয় না। টুকুনের যদি মনে হয় সুবল খুব সুলভ তবে সে আর কোন রোমাঞ্চ পাবে না। ওর শরীরে এবন একটা জিনিসের অভাব হয়ে গেছে, যা আমরা দিতে পারি না। দুর্লভ ব্যাপারটা ওর অভিধানে ছিল না। সুবলকে আমাদের ওর কাছে দুর্লভ সামগ্রী করে তুলতে হবে। বড়লোকদের যা হয়ে থাকে। অভাব-অনটন সামান্য মানুষের দরকার আছে সারদা। না হলে বেঁচে সুখ থাকে না। মেয়েটাকে সুরেশবাবু শিশুবয়েস থেকে এমন করে বড় করে তুলেছিলেন, যেখানে কেবল প্রাচুর্য, সব কিছু হাতের নাগালে থাকলে বেঁচে সুখ নেই। আমার মনে হয়, এই বেঁচে সুখ নেই থেকে মেয়েটার এমন একটা অসুখের সূত্রপাত। বিষণ্নতা। খেতে চায় না। কেবল চুপচাপ বসে থাকতে চায় জানালায়। তারপর ক্রমে কেমন স্থবির হয়ে গেল, শরীর ঢ্যাঙা হয়ে গেল। অথচ বয়সানুযায়ী শরীরে মা হবো লক্ষণগুলো প্রকাশ পেল না।

সারদা বলেছিল, টুকুনের এখন কত বয়স ?

—প্রায় ষোল-সতেরো।

—সতেরো !

—হ্যাঁ, সতেরো।

—কিন্তু কিছুতেই ওকে বারো বছরের বেশী মনে হয় না।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওটাই ওর অসুখ। এখন বুঝতে পারছি সুবলই পারে অসুখটা সারাতে।

—তাহলে স্যার ওকে ভিতরে নিয়ে এলেই হয়।

—না। বলেছি তো ভিতরে নিয়ে এলে হয় না। টুকুনের যদি মনে হয় সুবল এখানেই থাকবে, সুবলের আর যাবার জায়গা কোথাও নেই তবে ওর প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ এখন সুবল ওর কাছে জাদুকরের মত। স্রফ অলৌকিক জাদুকর। আসে যায়, কখনও হারিয়ে যায়। আবার আসে। প্রত্যাশা ওকে বড় এবং ভাল করে তুলবে। বসে ডাক্তারবাবু অন্যমনস্ক ভাবে কেবল হাতে তুড়ি মারছিলেন।

সুরেশবাবু বাইরে গিয়ে বলেছিলেন, কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার লাগছে সব।

সুরেশবাবুর স্ত্রী বলেছিল, টুকুনের জীবনে স্বাভাবিকতা তবে আসবে ডাক্তারবাবু ?

—সব এখন সেই পাখিয়ালার ওপর নির্ভর করছে।

পাখিয়ালার নাম শুনেই টুকুনের মা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তাই বলে একটা রাস্তার ছেলে ! অন্য কেউ হলে হয় না ! কত সুন্দর সুপুরুষ সব তরুণ রয়েছে তাদের চারপাশে। টুকুনের মা আর কোন কথা বলতে পারল না। ছেলেটা তন্ত্র-মন্ত্র জানে। কোথাকার ছেলে, খরা অঞ্চল থেকে উঠে এসে কি করে যে টুকুনকে ট্রেনে নিজের মত করে ফেলল !

অথবা সেই সব দৃশ্য। টুকুনের মা এখনও যেন মনে করতে পারছে— টুকুন জেগে দেখেছিল, সুবল দরজা খুলতে পারছে না। টুকুন বাবাকে দেখেছিল দরজা লক করে দিতে। সুতরাং সুবল দরজা খুলতে পারছিল না। টুকুন সুবলকে কিছু বলার জন্য উঠে বসতেই জানালায় দেখতে পেল একজন পুলিস ওদের কামরায় দিকে ছুটে আসছে। প্ল্যাটফরমে হৈ চৈ। মানুষের ছুটোছুটি এবং কান্না। যারা জল চুরি করে খেয়েছিল অথবা লুঠ করেছিল, তাদের এখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টুকুন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ডেকেছিল, সুবল সুবল, দরজা খুলবে না। দরজা খুললে ওরা ঢুকে পড়বে ঘরে।

সুবল বলেছিল, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে ?

—তাড়াতাড়ি এদিকে এস সুবল, বলে সে বাংকের নীচে সুবলকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর লম্বা চাঁদর দিয়ে পর্দার মত একটা আড়াল সৃষ্টি করে সুবলকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল।

সুবল ট্রেনে তখন সব পোঁটলাগুলো শিয়রের দিকে রেখে দিয়েছিল। বাংকের ওপর টুকুন চুপচাপ শয়ে। চাদরটা দিয়ে বাংকের নীচটা ঢেকে দিয়েছে। ওর ভিতর একটা ছেলে শুয়ে আছে পালিয়ে, কেউ টের পাচ্ছে না। টুকুনের মা-ও জানত না। টুকুনই পরে সব বলেছিল। — জানো মা, আমি দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম !

সে-সব কথা তখন টুকুনের মা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ সে তো কিছু দেখেনি। পাশের বাংকে সে-ঘুমাচ্ছিল। ফার্স্ট ক্লাস কামরা, রিজার্ভ।

জেবের ভিতর ছিল তখন পাখিটা। সুবল একটু আলগা হয়ে শুয়ে ছিল নীচে। পাছে পাখিটা চাপা পড়ে মরে না যায়। পাখিটা তখন জড়পদার্থের মত, যেন শীতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, অথবা পাখিটার ঘুম পাচ্ছিল বোধহয় — খুব জড়সড় হয়ে জেবের একটা দিকে বসে আছে। তারপর মনে হয়েছিল সুবলের, ঘুম এসে গেলে পাখিটা জেবের ভিতর চেপ্টে যেতে পারে, সেজন্য সে শিয়রে রেখে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুম যাবার চেষ্টা করেছিল। পাখিটা শিয়রে জড়সড় হয়ে বসে আছে। নড়ছে না। যেন পাখিটারও ভয়, পুলিস পাখিটাকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি এদের দলে, সুতরাং নিস্তার নেই।

টুকুন রুগ্ন এবং দুর্বল। টুকুন কোনরকমে উঠে বসেছিল এবং চাদরটা ঠিক মেঝের সঙ্গে মিলে আছে কিনা দেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। টুকুন ক্ষীণকায়, লম্বা। সিল্কের দামী ফ্রক গায়ে ঢল ঢল করছিল। শুধু সামান্য মুখে সতেজ সুন্দর চোখ কালো জলের মত গভীর মনে হচ্ছিল। দরজায় তখন ঠক ঠক শব্দ। টুকুন কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা এবং বাবা শেষরাতের ঠাণ্ডা বাতাসটুকু পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সুতরাং টুকুন নিজে ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছিল এবং দরজা খুলে দিয়েছিল — লম্বা একটা পুলিসের মুখ গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টুকুন খুব আস্তে আস্তে বলল, আমাদের কামরায় কেউ জল খেতে আসেনি।

— কেউ ভিতরে পালিয়ে নেই তো ?

— না না, কেউ নেই। কেউ আসে নি। ট্রেন ওরা থামিয়ে দিলেই আমরা দরজা লক করে দিয়েছিলাম।

— বড় জ্বালাতন করছে এই সব দেহাতী মানুষগুলো।

টুকুন কোন জবাব দিতে পারে নি। কারণ সে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার শরীর এত দুর্বল যে মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যাবে। সে পুলিসের কথা প্রায় শুনতে পাচ্ছিল না। এটা প্রথম শ্রেণী, ওরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। পুলিস, গার্ড, এমন কি স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত এসেছিল ওদের কামরাতে — এইসব দেহাতী মানুষগুলো উপদ্রব করে গেছে কি না, অথবা কোন দুর্ঘটনার জন্য এই দেহাতী মানুষগুলো দায়ী কিনা অনুসন্ধানের চেষ্টায় ছিল।

টুকুন তারপর শক্ত গলায় বলেছিল, এ-ঘরে কেউ আসে নি গার্ডসাহেব। বলে সে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর বাংকে কোন ক্রমে ছুটে গিয়ে পড়েছিল। আর অবাক টুকুন, কি বিস্ময় টুকুনের, সেদিন প্রথম কতদিন পরে সে নিজে বিছানা ছেড়ে উঠতে পেরেছে। সে নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পাচ্ছিল না।

টুকুন বলেছিল, সে মা-বাবাকে ডাকেনি, কারণ মা-বাবা হয়তো ঘুম

থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে সব পুলিসকে বলে দিতেন — হ্যাঁ সুবল, তার দলবল নিয়ে এসেছিল। এসে এই কামরার সব জলটুকু নিঃশ্বেষ করে দিয়ে গেছে। মাকে হয়তো টুকুন বুঝাতেই পারত না, সুবল এক পাখিয়ালা এসে টুকুন নামে এক রুগ্ন স্থবির বালিকার পায়ে শক্তি সঞ্চার করতে সাহায্য করেছে। টুকুন মাকে বাবাকে তার এই বিস্ময় দেখানোর জন্য ডেকেছিল, মা! মা !

তারপর মা-র সাড়া না পেয়ে টুকুন ডেকেছিল, বাবা বাবা !

তখন ট্রেন চলছিল। ভোর হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে আবার বড় মাঠ দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের তার দেখা যাচ্ছে। মা ঘুম থেকে উঠলেই টুকুন বলেছিল, জানো না আমি উঠে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছি। দরজা খুলে দিয়েছি।

সুরেশবাবুর স্ত্রী ভেবেছিল, টুকুন হয়তো স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন দেখে ভুলতে পারছে না।

টুকুন বলেছিল, বাবা, পুলিস এসেছিল।

সুরেশবাবুও টুকুনের কথা স্বপ্ন টপ্ন ভেবে বললেন, আচ্ছা মা, তুমি একটু কমলালেবুর রস খাবে ? তারপর তিনি দরজার দিকে চোখ তুলে দেখেছিলেন, দরজা তেমনি লক করা। টুকুন স্বপ্ন দেখেছে, হয়তো কোন মাঠে কিংবা পাড়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, তুমি ঠিক হাঁটতে পারবে টুকুন। তুমি ঠিক দৌড়তে পারবে। অথচ তিনি জানেন, ওগুলো কথার কথা টুকুনের শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শুকিয়ে আসছে। শরীরে ওর কোথাও কোন আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। কেমন ক্রমশঃ টুকুন স্থবির হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোন জায়গা নেই, বড় ডাক্তার নেই, যেখানে তিনি টুকুনকে না নিয়ে গেছেন। হতাশা এখন সম্বল। মেয়েটা ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে যাবে, তারপর সতেজ মুখে কোন আর বিষণ্ণ ছবি ঝুলে থাকবে না। টুকুন মরে যাবে।

সুরেশবাবুর স্ত্রীর মুখ দেখে সারদা বুঝল, ডাক্তারবাবুর কথা ওর পছন্দ হয়নি। পারিবারিক ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে গেলে কি আর থাকে, তখন কোথাকার এক বালক দৈত্যের সামিল হয়ে যায়। সারদা বুঝতে পেরে বলল, টুকুনের কাছে সুবল এক আশ্চর্য জাদুকর। ওর কুঁচফল, চন্দনের বীচি, রংবেরংয়ের পাথর আর টুকুন যা বলল, কি সব আজগুবি গল্প বলে নাচতে থাকে কেবল। তার অর্ধেকটা বোঝা যায়, অর্ধেকটা যায় না। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, বন-পাহাড়ের গল্প বলে সে কেবল ছোটার অভিনয় করে। তখন টুকুনের, সুবলের পা দেখতে দেখতে বুঝি মনে হয় — হরিণের মত সে-ও ছুটছে, মনে হয় ঘোড়ার মত সে-ও ছুটছে। গল্পের সঙ্গে এই যে ছোটা আর ছোটা প্রাণের ভিতর এই ছোটা কেবল আবেগের জন্ম দেয়।

ডাক্তারবাবু সারদাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ-ভাবেই রক্তে উত্তেজনা আসে। হাতে-পায়ে সেই উত্তেজনার রক্ত বইতে থাকে। টুকুনকে তখন খুব

স্বাভাবিক দেখায়। এই ছোটার ভিতর উদ্যমের কথাই বলা হচ্ছে সুরেশবাবু। আমরা সমাজ-জীবনেও এই উদ্যম হারিয়ে কেমন ক্রমশঃ টুকুনের মত স্থবির হয়ে যাচ্ছি। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লোক কাজ করছে না মন দিয়ে। সততার অভাব। জীবন-যাপনে আমরা বড় বেশী অসৎ হয়ে পড়ছি। ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন, কথাগুলো কেমন বক্তৃতার মত হয়ে গেল। সেজন্য পরেরটুকু খুব সহজভাবে বলতে চাইলেন, আমাদের জীবনে এখন সুবলের মত এক পাখীয়ালা চাই, যে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসা দিয়ে আমদের এই কঠিন রোগ সারিয়ে তুলবে।

।। দশ ।।

সিস্টারের ভয়ে সুবল ক'দিন হল নার্সিংহোমের দিকে পা বড়ায় নি। এই শহরে একমাত্র টুকুন দিদিমণিই ওর জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকে। তাকে দেখলে খুব খুশী হয়। এবং কেন জানি এ-ভাবে সুবলের কাছে টুকুন খুব আপন জন হয়ে গেল।

অথচ ভয়, সিস্টার তাকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করেছে। সেদিন সিস্টারের চোখে কি এক কঠিন বিরক্তি দেখে সে আর যেতে সাহস পায়নি। তা ছাড়া অজিদা ওকে অন্য একটা সুন্দর ব্যবসার কথা শিখিয়ে দিয়েছে। সে বড়বাজার থেকে চিনাবাদাম কিনে আনছে। এবং ফুটপাথে সে উনুন জ্বালিয়ে বেশ ভাজাভুজি রেখে বিক্রি করছে। সে এখানে বসে একটা ব্যাপার দেখে খুশী। দেশে থাকতে কি না ওরা অসহায় ছিল। এমন একটা সুন্দর দেশ পর পর ছ'বছর খরাতে শস্যবিহীন দেশ হয়ে গেল। তবু অন্যান্য বছর সামান্য বৃষ্টিপাতের দরুন কিছু ফসল হয়েছিল — এবার যে কি হল! দেশ ছেড়ে মানুষ পালাল। সে আর থাকে কি করে। ওর ইচ্ছা ছিল টুকুন দিদিমণিদের সঙ্গেই চলে যাবে। দিদিমণির মা-টা যেন কেমন। ঠিক সিস্টার যেমন মুখ করে রেখেছিল, দিদিমণির মা-টার তেমনি রাগী রাগী ভাব। সে ভয়ে ব্যাণ্ডেলে নেমে গেল। তারপর এক আশ্চর্য বিকালে এত বড় বাড়ির জানালায় দিদিমণিকে আবিষ্কার করে অবাক।

কিন্তু এখন সে এমন একটা কাজ নিয়ে ফেলেছে যে সে যেতে পারছে না। ওর জুতো-পালিসের সব কিছু অজিতদার বাড়িতে আছে। অজিতদার বৌয়ের খুব সিনেমা দেখার স্বভাব। সে সুবলকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তার এ-সব ভাল লাগে না। সে সময় পেলে বরং টুকুন দিদিমণির কাছে চলে যাবে।

টুকুন দিদিমণির কাছে গেলেই তাকে নানারকম গল্প বলতে হয়। সে আজ যাবে ঠিক করেছে। চার পাঁচদিন হয়ে গেল দিদিমণিকে না দেখে কেমন

সে কিছুটা দুঃখী সুবল বনে গেছে। সকাল সকাল কলের জল থেকে স্নান করেই মনে হয়েছে, দিদিমণির সঙ্গে দেখা না হলে কাজে উৎসাহ পাবে না। সে তাড়াতাড়ি কিছুটা ভাজাভুজি বিক্রি করে নেবে, তারপর বিকেলে হাতে সে কোন কাজ রাখবে না। আগে ওর খুব একটা ঝামেলা ছিল না। যখন খুশী চলে যেয়ে পারত। এখন পারে না। সে আগে হাতে তার জুতোর বাক্সটা রেখে দিত। এখন তার সম্বল একটা উনুন, একটা চট একটা চালুনি, একটা কাঠের ট্রে, একটা ভাঙা কড়াই, কিছু বালি, এতগুলো নিয়ে সে যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে না।

সে আজ ভাবল, সব রেখে দেবে শেফালীবৌদির কাছে। এই শেফালীবৌদির রং কালো। কেবল গুন গুন করে হিন্দী গান গায়। সব সিনেমার গল্প এসে কাউকে না কাউকে বলা চাই। রাতের বেলায় সুবল গেলে তাকে বসিয়ে গল্প। এক কাপ চা খেতে দেয় তখন। কালো রংয়ের শেফালীবৌদির খুব তাজা চেখ মুখ। এবং সবসময় পান খাবার স্বভাব। ছোট দুটো ঘর। তাই যতটা সম্ভব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। কাগজের ফুল তৈরী করে নানা রংয়ে সাজিয়ে রাখার স্বভাব। এবং কারুকাজ করা ডিমের খোলা — কোনটা লাল রংয়ের, কোনটা হলুদ রংয়ের। পাশে একটা বড় পুকুর। জানালা খুললে পুকুরের জলে অনেককে নাইতে দেখা যায়। অজিতদা না থাকলে জানালা খুলে শেফালীবৌদি কার জন্য মনে হয় জানালায় অপেক্ষা করে। সুবলের এটা কেন জানি ভাল লাগে না।

সুতরাং সুবল সব টুকিটাকি কাজ সেরে ফেলার সময় শেফালীবৌদির কথা ভেবে কেমন সামান্য কষ্ট পেল। এই শহরে বড় একটা কষ্ট আছে সবার। যেমন অজিতদার, বৌদির। ওদের কাছে যেন কিছু জিনিস খুব দুর্লভ। সেই দুর্লভ কিছু পাবার জন্য ওরা মেন করছে। ওর কাছে দর্লভ বলতে টুকুন দিদিমণি। দিদিমণিকে দেখলেই ভিতরে সুবল প্রাণ পায়। সুবল দিদিমণির জন্য কি যে সুন্দর একটা খেলা শিখে ফেলেছে, আজ গেলে সেই খেলাটা দেখাতে পারলে খুব আনন্দ পাবে।

সে তার টুকিটাকি মালপত্র সব মাথায় করে এক সময় শেফালীবৌদির ঘরের দিকে রওনা হল। সে যাবার সময় একটা সুন্দর সাজানো পান কিনে নিল। নিজে সে পান-টান কিছু খায় না। অজিতদা ওকে একদিন একটা বিড়ি দিয়েছিল খেতে। সে খেতে গিয়ে খক্ খক্ করে কেসেছে ভীষণ। সেই থেকে বিড়ি ব্যাপারটাকে ভীষণ ভয় পায় সে।

সে হাঁটছিল। তাকে খুব একটা দূরে হেঁটে যেতে হয় না। বড় রাস্তা থেকে কিছুদূর হেঁটে গেলেই গোলাবাগান বস্তি। দুপাশে ছোট ছোট সব খুপরি ঘর, টিনের চাল। একটা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ডিসপেন্সারি। তারপর একটা লোক দুটো লেদ মেসিনের দোকান নিয়ে সারাদিন কাজ চালিয়ে যায় এবং রোয়াকে চায়ের দোকান। একটা ছোট মুদি-দোকান, কলের জল পড়ছে

এবং কলের পাড়ে ভীষণ ভিড়। সে এখানে এলেই সবাই ঝুঁকে পড়ে। সুবল, তোর পাখিটা দেখি। দেখা না রে পাখিটা। কেউ কেউ একটা মাকড় ধরে এনে বলে, নে, এটা খাওয়া। সুবলের সব কথা ঠিক থাকে। সে জানে কোথায় কি বলতে হয়। সে মানুষকে আঘাত করতে জানে না। সে মিথ্যাকথাও বলতে জানে না, সে ইচ্ছা করলে বলতে পারে না, পাখিটা এখন আমার জেবে নেই। বললেই ওরা সরে যায়। কিন্তু বললে মিথ্যাকথা বলা হবে। সে কোনরকমে তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে যায় তখন। চৌকাঠে ঢুকে গেলে কেউ তখন আর বিরক্ত করতে আসে না।

শেফালী অসময়ে সুবলকে দেখে বলল, রাজা, এ-সব নিয়ে অসময়ে?

—একটু কাজ আছে বৌদি।

শেফালী ওর মাথা থেকে এক এক করে টুকিটাকি জিনিস নামাতে নামাতে বলল, কোথায় যে রাখি!

—আজ রাখো, কাল সকালে নিয়ে যাব। তোমার জন্য এক পান নিয়ে এসেছি।

—রাজা তুমি আমাকে ভালোবাসো?

সুবল অবাক। বৌদি তাকে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে। তবু কেমন যেন গা-টা শির শির করে উঠল। এই শহরে এলে মানুষ বুঝি সব কিছু একটু তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে। সে বলল, তুমি পান খেতে ভালোবাসো। অজিতদা কোথায়?

শেফালী ঠোঁট উল্টে বলল, জানি না।

—আজ আসেনি?

—না।

—কেন আসে না?

—একবার জিজ্ঞাসা কর না।

—না, খুব খারাপ বৌদি। আমি ঠিক জিজ্ঞাসা করব। বলেই সুবল হেসে দিল।—তুমি ঠাট্টা করছ বৌদি। দাদা ঠিক এসেছে।

—না রে! তোর সঙ্গে আমি মিথ্যা বলি না।

সুবললের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, কোন খবর নিয়েছ?

—ঠিক চলে আসবে। কোথায় খোঁজ করব বল? কোথায় যায় আমকে বলে যায় না।

সুবল বুঝতে পারল, বৌদি সত্যি কিছু জানে না। সে নিজেই একটা জলচৌকি টেনে নিল। বসতে বসতে বলল একটু জল খাব।

শেফালী জল এনে দিলে বলল, কাল ক'টায় বের হয়েছে?

—রাতে।

—রাত ক'টায়?

— বেশ রাত। যেন শেফালী ইচ্ছা করেই আর বেশী বলতে চাইছে না, যদিও জানে রাজা খুব ভাল ছেলে। রাজার নতুন গোঁফ উঠছে বলে, খুব ভাল লাগে দেখতে। এই নতুন গোঁফ ওঠা ছেলেদের খুব ভাল লাগে। রাজা আগে খুব নোংরা জামাকাপড় পরে থাকত। শেফালী ওকে কিছু কিছু ট্রেনিং দিয়ে বেশ এখন সাফসোফ রাখার ব্যবস্থা করেছে। আগে চুল ছিল বড় বড়। চুল কাটত না। ইদানীং চুল কাটছে। এবং বড় একটা শিখা ছিল মাথায়, সেটাও ছোট করে ফেলেছে। খুব খেয়াল না করলে বোঝা যায় না শিখাটা আছে মাথায়।

শেফালী বলল, সব ফেলে কোথায় যাচ্ছ?

— টুকুন দিদিমণির কাছে।

— তুমি যে বলেছিলে আর যাবে না? সিস্টার পছন্দ করে না।

সুবল বলল, আমায় বৌদি আপনজন বলতে টুকুন দিদিমণি। ভেবেছিলমা যাব না। কিন্তু কাল থেকে মনটা টুকুন দিদিমণির জন্য কেমন করছে।

— কবে যেন গেছিলে?

— গত বুধবার।

— আর মাঝে যাওনি?

— না।

— টুকুন ঠিক জানালায় রোজ দাঁড়িয়ে থাকবে?

— জানি না বৌদি। ওর মা আমাকে দেকতে পারে না। ওদের অসুবিধা হবে বলে একটা বড় স্টেশনে আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল।

— ভীষণ খারাপ। বড়লোক হলে মানুষ ভাল হয় না। বড়লোকেরা খুব স্বার্থপর।

সুবল সে-সব কথায় গেল না। সে বলল, আসতে আসতে দেখলাম, একটা বড় গীর্জার সামনে দুটো ছেলে ফুল বিক্রি করছে। বেশ ভাল কাজ।

— কেন, তুমি ফুল বিক্রি করবে নাকি?

— দাদা এলে জিজ্ঞাসা করব, কোথায় ফুল কিনতে পাওয়া যায়।

এ-কাজটা খুব ভাল হবে। তোমার খুব সুন্দর মুখ রাজা। তুমি যদি ফুল বিক্রি কর তবে লোকে অনেক ফুল কিনবে।

— সত্যি কিনবে?

— সত্যি। প্রথম দিনের একজন খদ্দের তুমি আমাকে পাবে।

— আমি তোমাকে এমনি দেব।

— তবে তোমার ব্যবসা হবে কি করে রাজা।

— একটা ফুল দিলে ব্যবসা নষ্ট হয় না। যখন চিনাবাদাম ভেজে বিক্রি করি, কেউ কেউ দুটো একটা এমনি খায়। খেয়ে পছন্দ হলে নেয়। তুমিও আমার তেমন।

— আমার একটা ফুলে কিছু হবে না রাজা। একটা ফুল দিয়ে মালা

গাঁথা হয় না।

— কত ফুল লাগবে ?

— একগুচ্ছ।

— তাই নেবে !

— না রাজা, আমি এমনি নেব না।

— তাহলে কি করতে হবে ?

— সে পরে বলব। বলেই শেফালী বলল যাও, আপনজনের কাছে যাও।

সুবল এতক্ষণে মনে করতে পারলে সে টুকুন দিদিমণিকে একমাত্র আপনজন বলেছে। সে বৌদির ঠাট্টাটা ধরতে পেরে বলল, তোমার নিজের লোক। অজিতদা কত ভাল লোক।

— ভাল লোক না ছাই।

— তুমি কেবল বৌদি অজিতদার নিন্দা কর। দাদা এলে বলে দেব।

— বলে দ্যাখ না যদি একটু রাগ করে। লোকটার তো রাগ-অভিমান বলতেও কিছু নেই। যা খুশী করবে। মান-সম্মান বুঝবে না। অপমান বলতে কিছু নেই।

সুবল দেখল কথা অন্যদিকে যাচ্ছে। সে উঠে পড়ল। সে একটা বল নিয়েছে হাতে। শেফালীর ইচ্ছা সুবল আর একটু বসুক। এখন এই বিকেলটা শেফালীকে বড় একা একা কাটাতে হবে। এখানে এ-ঘরে কেউ দেখতে পাচ্ছে না সে সুবলকে সামনে নিয়ে বসে রয়েছে। সুবল এলেই মনের ভিতর একটা অদ্ভুত রহস্য খেলা করে বেড়ায়। ওর নরম চুল এবং চোখ দেখলে যেন কোন আর দুঃখ থাকে না। বেশ জড়িয়ে ধরে ছেলেটাকে চুমু খেতে ইচ্ছা হয়। এবং সুন্দর করে সাজানো পুতুলের মত অথবা সে যে-সব সিনেমায় নানারকমের কল্প-কাহিনী দেখে তেমনি সব কল্পকাহিনীর বাসিন্দা হতে ইচ্ছা হয়। সুবলকে না দেখলে তার এমন বুঝি হত না।

শেফালী বলল, পাখিটার খেলা আজ দেখালে না ?

সুবল বুঝতে পারছিল, কিছু না কিছু বলে তাকে আটকে রাখছে। সে বলল, আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। বলে সে বারান্দা থেকে নেমে চৌকাঠ পার হয়ে রাস্তায় দাঁড়াল।

সুবলের বেশ ভাল লাগছিল হাঁটতে। সে সাফসোফ হয়ে যাচ্ছে। জামা পাজামা সব ধবধব করছে। সে কলের পাড়ে এসব গতকাল কেচে নিয়েছিল। পয়সা হলে সে আরও দুটো ঢোলা পাজামা পাঞ্জাবি করে নেবে। একটা টিনের স্যুটকেস কেনার খুব বাসনা। একটা টিনের স্যুটকেশ কিনে ফেলতে পারলেই সে সব কিছু অতি প্রয়োজনীয় যা আছে, স্যুটকেসের ভিতর রেখে দেবে। আর কেন জানি মাঝে মাঝে টুকুন দিদিমণিকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আর মাঝে মাঝে আর একজন মানুষকে তার চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়। সেই যে কাপালিকের মত মানুষ জনার্দন চক্রবর্তী। যিনি তাদের নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন জল আবিষ্কারের। এবং তিনি পাহাড়ের ওপর কোন ঋষি পুরুষের মত দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে একটা লাঠি। নদী পাহাড় খাত ভেঙে উপত্যকার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। যদি নদীগর্ভে চোরা স্রোত থাকে, সেজন্য তিনি সব মানুষদের, যারা আর অবশিষ্ট ছিল, শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিল, তাদের নিয়ে শেষ চেষ্টা। দূরে দূরে সব এক একজন করে মানুষ ক্রমান্বয়ে দিনমান বালি খুঁড়ে চলছিল — জলের আশায় মানুষের এমন মুখ-চোখ হয় সবল এখন চিন্তা করতেই পারে না।

সারাদিন কেটে গিয়েছিল, রাত নেমে এসেছিল, না, কোথাও জল নেই। মানুষটিই তাদের অনেকদূর হাঁটিয়ে, প্রায় ক্রোশ-দশেক হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল — এবং ট্রেন আটকে দিতে বলেছিল। জল লুটে-পুটে খেতে বলেছিল। এখন মানুষটা কেমন আছে কে জানে! চিঠি দিলে সেখানে আর কে যাবে। কে চিঠি পৌঁছে দেবে।

মনের ভিতর মানুষটার মুখ-চোখ, আলখেল্লার মত পোশাক, এবং দিনমানে সে হয়তো অন্নহীন হয়ে সুবচনী দেবীর মন্দিরে পড়ে আছে। এমন মানুষ সে কোথাও দেখেনি। এই একমাত্র মানুষ যার বিশ্বাস ছিল দেবী কখনও না কখনও সবপ্রসন্না হবেন। এবং কোন পাপা মানুষকে এভাবে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সেই পাপের খণ্ডন কি কোন এক আলৌকিক উপায়ে করতে চেয়েছিলেন। এবং মানুষেরও তেমন একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখের ওপর দেখেছেন দেবীর মহিমা কি ভাবে বার বার মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। সংসার অঅর সুজলা সুফলা হচ্ছে না। সুবলের সেই মানুষটার জন্যও মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। ওকে ফেলে চলে এসে সে যেন ঠিক কাজ করে নি। খুব স্বার্থপরের মত ব্যাপারটা হয়ে গেছে।

সুবল দেখল সে ভাবছে বলে খুব একটা এগোতে পারছে না। অন্যমনস্ক হয়ে গেলে সে কেমন ঝিমিয়ে হাঁটে। সেই গীর্জাটা পার হয়ে যাচ্ছে সে। গীর্জায় বাঁশ বেঁধে রং করছে। গেটে একজন লোক বসে রয়েছে। ভিতরে বড় কবরখানা। কাঁচের বাক্স করে নিয়েছে একটা লোক। তার ভিতরে বসে ফুল বিক্রি করছে। লোকটার কাজই সবচেয়ে ভাল। মানুষের শেষদিনে মানুষকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে।

অথবা সুবলের ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে এমন সব গীর্জায় কেবল রং করে বেড়ায়। অথবা মন্দিরে। মসজিদে মসজিদে কারুকাজ করা যে সব পাথর আছে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। মানুষের সুখ দুঃখ ব্যাপারটা সুবলকে খুব ভাবায়!

অথচ এর ভিতর টুকুন দিদিমণির মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। গাছের মাথায় সূর্যের আলো। এবং সব সুন্দর সুন্দর

ছেলেমেয়েরা পার্কে খেলা করে বেড়াচ্ছে। দোকানগুলোতে মানুষের ভিড়। কি পোশাক, কি সুন্দর সব মানুষ! কোন অভাব-অনটন নেই। শেফালীবৌদি খুব সুন্দর পোশাক করে যখন সিনেমায় যায়, তখন ওর তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে। সব মানুষগুলোই সেজে-গুজে কেমন সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে থাকে। এমন পরিপাটি পোশাক, মুখ-চোখ, সে তার গ্রামে স্বপ্নও ভাবতে পারে নি। মানুষ এ-ভাবে সুখে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারে নি। খুশীমত আলো জ্বেলে নেয়, জল তুলে নেয়, রাস্তা পার হয়ে যায়, হুস-হাস গাড়ি চলে যায়, বাজারে বাজারে কি সব শাক-শব্জি মাছ মাংস! ওর একবার মনে আছে গ্রামে মাংস হবে। গোবিন্দ বণিক একটা পাঁঠা কিনে এনেছিল। বাবা কি করে পাঁচসিকা পয়সা সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন দুর্দিনে এলে খরচ করবেন। কিন্তু বণিক সেই পাঁঠাটা কাটলে বাঁশতলায় কি ভিড়! বাবাও লোভে পড়ে পাঁচসিকার মাংস কলাপাতায় কিনে এনেছিলেন। সেবারই শেষ মাংস খাওয়া। তবে বাবা মাঝে মাঝে পাখি ধরে আনতেন। ওরা পাখির মাংস খেত। মা খুব পাখির মাংস খেতে ভালবাসত বলে বাবা অনেকদিন খুব রাত থাকতে পাহাড়ে চড়ে যেতেন। বালিহাঁসের ডিম, ডিম না হয় হাঁস ধরে আনতেন।

সুবলের ধারণা ছিল পাখি ধরা খুব সহাজ কাজ। কিন্তু বাবা প্রায়ই কিছু আনতে পারতেন না। মা রাগ করে কিছুই না খেয়ে থাকত। এমনিতে না খাওয়া ছিল তাদের অভ্যাস, আর একটু চাল ডাল হলেই মা মাংস দিয়ে ভাত খেতে চাইত। বাবার ওপর রাগ করে মা-টা তার মরে গেল।

সুবলের এখন ধারণা হয় বাবা উদ্যমশীল ছিল না। যেমন সে-ও খুব নয়। কোনরকমে দিন চলে গেলেই হল। কিন্তু এখানে এসে সে নানাভাবে দেখচে খুব সহজে দিন চলে গেলে জীবনের কোন মানে থাকে না। চারপাশে এত প্রাচুর্যের ভিতর সে কতদিন আর ফুটপাথে দিন কাটাবে। ওর একটা ঘর না হলে চলছে না। সে ভাবল, বলবে টুকুন দিদিমণিকে, আমি আর গাছতলায় থাকব না। আমাকে একটা ঘর বানিয়ে নিতেই হবে।

সুবল রাস্তায় কত কিছু ভাবতে ভাবতে হাঁটছে। শহর ধরে হাঁটলেই যেন এমন হয়। অথচ খারাপ দিনগুলোতে সে একটা ভাবনাই ভাবত, জল কোথায় পাবে? জল পেলে কখনও পাহাড়ে যা সব লতা মূল ছিল, যেমন পেস্তা আলোয় গাছ, এবং তার মূল অথবা ফল কিছু সিদ্ধ করে খেলে কোনরকমে তাদের দিন চলে যেত। জল যে কি দুর্লভ ছিল! এখন এই শহরে এটা ভাবতে পর্যন্ত হাসি পায়। জলের জন্য তারা প্রাচীন কালের মানুষদের মত নদীগর্ভে এক এক করে মাইলের পর মাইল বালি তুলে মানুষ-সমান গর্ত করেও যখন দেখল নদীর চোরাস্রোতে পর্যন্ত জল নেই, তখন যার যেদিকে চোখ যায় সেদিকে চলে যাওয়া যেন।

অথচ এখানে এসে আর জলের কথা মনে হয় না। সে চারপাশে

দেখে নানা আকর্ষণ। সকাল হলে গাছে তেমন পাখী ডাকে না, অথচ আকাশ নীল, ট্রামলাইনের তার নীল নীল সুতোর মত অজানা রহস্য হয়ে যায়। কত দূরে এই সব ট্রামলাইন চলে গেছে সে জানে না। পয়সা হলে সে একদিন সারাদিন ট্রামে চড়ে ঘুরবে। শহরের বড়রাস্তায় কখনও কখনও গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে হেঁটে যেত। আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এবং দুটো একটা গাড়ি এলে মনে হত এক বড় মাঠের ভিতর দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। কেউ তার পাশে নেই। তাকে ঠিক পথ চিনে মাঠ পার হয়ে যেতে হবে।

এত সব ভাবতে ভাবতে সে দেখল একসময় দূর থেকে টুকুন দিদিমণির জানালাটা দেখা যাচ্ছে। সে এবার প্রায় রাস্তা ধরে ছুটতে চাইল। কারণ সে দেখতে পাচ্ছে, ঠিক স্পষ্ট নয়, এখনও স্টষ্ট নয়, তবু মনে হচ্ছে জানালাটা বন্ধ। এখন শরৎকাল। আকাশে নানা বর্ণের মেঘের খেলা। কখনও বৃষ্টি, কখনও নির্মল আকাশ। অথচ এ-সময় জানালা বন্ধ। টুকুন দিদিমরি কখনও জানালা বন্ধ করে না। ওর মনে হল হয়তো ক'দিন ওকে আসতে না দেখে হতাশায় জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।

ওর খুব খারাপ লাগছিল। সে কেন যে এল না, কেন যে সিস্টারের ওপর অভিমান করে এল না! যদি অন্য কিছু হয়, যদি টুকুন দিদিমণির ছোট্ট পাখির মত আত্মাটা উড়ে চলে যায়! এ-সব মনে হতেই কেমন ওর বালকের মত বুক ভরে কান্না উঠে আসতে চাইল। সে বলল, দিদিমণি, এবার থেকে ফের আগের মত রোজ আসব। আমি এসেছি।

কিন্তু সে গিয়ে যা দেখল — সত্যি অবাক, জানালা বন্ধ। সেখানে কেউ আছে বলেও মনে হয় না।

সুবল পাগলের মত জানালায় শব্দ করতে থাকল।

সহসা জানালা খুলে, প্রায় পাঁচ সাতটা মানুষ ওকে তেড়ে এল। সে ওদের কাউকে চেনে না। ওরা সবাই একসঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে আছে।

তবু এরই ভিতর সে যা দেখল, একজন খুব মোটামত মানুষ বিছানায় বসে আছে। ওর পাশে একটা মোটা নলের মত কি যেন। মাঝে মাঝে দুটো সুর হলুদ রংয়ের নল সে টেনে নিয়ে দরকার হলে নাকে দিচ্ছে আবার খুলে রাখছে। মোটা গোঁফ লোকটার। সুবল ওদের তবু বলল, আমার টুকুন দিদিমণি এ-ঘরে ছিল। আমি ওকে দেখতে এসেছি।

লোকগুলো কোন কথা বলল না। মুখের ওপর জানালা বন্ধ করে দিল।

।। এগারো ।।

এটা একটা বড় বাড়ি। খুব বড়। কলকাতার ওপর এতবড় বাড়ি সচরাচর দেখা যায় না। বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। খুব ছিমছাম, পরিপাটি নরম ঘাসের চাদর বিচানো চারপাশে। সামানে একটা ছোট্ট পাহাড়। দু'দিকে দুটো পথ চলে গেছে। পাঁচিল লম্বা, দু' মানুষ-সমান উঁচু পাঁচিল বাড়িটার চারপাশে। পাঁচিলের পাশে সব ছোট ছোট আউটহাউস। এবং নানা বর্ণের করবীফুলের গাছ। গাছের নীচ দিয়ে হেঁটে গেলে বোঝাই যায় না এ-বাড়ি কোন দুঃখ জেগে আছে।

অথচ একটা মেয়ে, ছোট্ট জানালায় বসে রয়েছে। সে এখন জানালা আর বন্ধই করে না। সে আসবে। ঠিক আসবে। কারণ সুবল না এসে পারে না। ওর পাখিটা যখন সম্বল আছে, সে আজ হোক কাল হোক, জানালায় পাখিটাকে পাঠিয়ে দেবে। টুকুন আছে দোতালায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায়। নীচে মালীরা বড় একটা বাগান করছে। কত সব ফুলের সমারোহ এখন। শেফালীগাছে কত অজস্র ফুল। এবং সকাল হলেই গীতামাসি যখন জানালা খুলে দেয়, সে দেখতে পায় কত সব পাখি এসেছে গাছটায়। সে সুবলের পাখিটাকে তার ভিতর খোঁজার চেষ্টা করে। যদি ওদের সঙ্গে ছদ্মবেশে মিশে থাকে পাখিটা।

আর কি সুন্দর মনে হয় পৃথিবী। ওই যে সকাল হল, কিছুক্ষণ পরই রোদ এসে নামবে, এবং সামান্য শিশিরের টুপটাপ শব্দের মত পাখিরা এসে বসেছে গাছগাছালির ভিতর — তার যে কি ভাল লাগছে!

এই দক্ষিণের বারান্দায় কাঁচের জানালা সব। ভিতরে টুকুনের মনোরঞ্জনের জন্য নানা রকমের খেলনা। এখন এই ক'মাসেই বোজা যায় টুকুনের বয়স আর খেলনার জগতে নেই। সে সুবলের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই শারীরিক কি সব অনুভূতি যেন তাকে ক্রমে গ্রাস করছে। সে এখন সুন্দর সুন্দর বই পড়তে ভালবাসে। দি পপার অ্যাণ্ড দি প্রিন্স গল্পটি বড় ভাল লাগে। কখনও সে আতোয়ান দা [illegible] — একজুপেরির ল্য পতি প্র্যাঁস পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই সাহারা মুরুভূমির বুকে নায়ক, সে বিমান বিকল হয়ে যাওয়ায় ওখানে পড়ে গেছে, সাত-আট দিনের মত মাত্র পানীয় জল আছে — আর আশ্চর্য সেই মানুষটা যখন একাকী, নিঃসঙ্গ মানুষের বসতি থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে, এবং শুধু আকাশ সীমাহীন দেখা যাচ্ছে, কিছু নক্ষত্র, আর কাঁটাগাছ মরুভূমির, তখন কিনা সকাল হলে, সুন্দর এক ছোট্ট রাজপুত্রের কণ্ঠ সে শুনতে পায় — আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চার ছবি এঁকে দাও না!

টুকুন সুবলের যেন সেই ছোট্ট রাজপুত্রের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল পায়। সুবল এখন অপেক্ষায় আছে, তার জন্য কেউ একটা সুন্দর ছবি এঁকে দেবে। টুকুন আজকাল বরং ঘর থেকে খেলনাগুলো সরিয়ে দিতে পারলে

বাঁচে। পরিবর্তে ওর ঘরে এখন আলমারি-ভর্তি বই। এবং সুন্দর সুন্দর সব ভালবাসার কথা সেখানে লেখা আছে।

আবার টুকুন আজকাল নানারকম গ্রহ-নক্ষত্রের বই পড়তে ভালবাসে। বিশাল সৌরমণ্ডলের কথা ভেবে সে কেমন মুহ্যমান হয়ে থাকে। সেখানে সামান্য টুকুন অথবা তার অসুখ, সে বড় হচ্ছে না, তার শরীরের সব লক্ষণগুলো কোথায় যেন আটকে আছে — এসব বড় তুচ্ছ। তখন তার কেন জানি বাব-মা-র ওপর ভীষণ করুণা হয়। মা-বাবা কেন যে মুখ করুণ করে রাখে! মা কিছুতেই কেন যে সুবল এ-বাড়িতে আসুক চায় না! বাবার সঙ্গে ওই নিয়ে মা-র কি ভীষণ মন-কষাকষি! বাবা শেষ পর্যন্ত মা-র কথাতেই রাজী — তাই বলে একটা রাস্তার ছেলে কখনও টুকুনের সঙ্গী হতে পারে না। আমি বরং রণবীরকে বলব ওর ছেলে ইন্দ্রকে যেন পাঠিয়ে দেয়। এখানে থাকবে। কি সুন্দর সুপুরুষ রণবীর। ওর ছেলে বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। এমন কথার পর বাবা আর সিস্টারকে ঠিকানা দিতে পারেননি। সুবল এলে পাঠিয়ে দিতে বলেননি।

তবু টুকুনের ধারণা, সুবল আসবে। কারণ সে কেন জানি সুবলকে এ-গ্রহের বাসিন্দা বলে ভাবতেই পারে না। সেই ছোট রাজপুত্রের মত তার বাড়ি অন্য কোন গ্রহে হবে। সে কোন অলৌকিক যানে চড়ে এখানে নেমে এসেছে। সুবল নিজের সঠিক ঠিকানা জানে না। তার গ্রহটা খুব ছোট। একটা বাড়ির মত গ্রহটা। সে সেখানে এতদিন থাকত বোধহয়।

সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্পের মত মনে হয় সত্যি এই সৌরজগতে কত তো গ্রহ আছে। সংখ্যায় তারা কত কেউ বলতে পারে না। কত সব ছোট্ট গ্রহ আছে যা দূরবীণে পর্যন্ত ধরা পড়ে না। অথবা কখনও কখনও বিন্দর মত ধরা পড়লে জ্যোতির্বিদরা সংখ্যা দিয়ে তার অবস্থান অথবা নাম প্রকাশ করে থাকে। বড়দের তবু নাম আছে একটা — পৃথিবী, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র। কিন্তু ছোটদের জন্য কেউ নাম দেয় না। কোন জ্যোতির্বিদ কোন একটা গ্রহ আবিষ্কার করে বসলে একটা সংখ্যা দিয়ে দেন। গ্রহাণু ৩০৪০৮৩, একটা সংখ্যা দিয়ে হয়তো ঠিক নির্ণয় করা যায় সেই রাজপুত্র তেমন একটা ছোট্ট গ্রহের বাসিন্দা। ছোট্ট রাজপুত্রের কথা ভাবলেই সুবলের আশ্চর্য সুন্দর চোখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সুতরাং সকাল হলেই টুকুন বুঝতে পারে — এই পৃথিবী কত সব ভারি মজার ব্যাপার নিয়ে বেঁচে আছে। এই পৃথিবীর মাটিতেই সাহারা মরুভূমিতে এক ছোট্ট রাজপুত্রের সঙ্গে লেখকের দেখা হয়ে গেছিল। বড়রা এ-সব বিশ্বাস করবে না। যেমন বড়রা বিশ্বাস করবে না, ছোটরা যদি ছবি এঁকে দিয়ে বলে, এই ছবিতে একটা বাঘ এঁকেছি, বাঘের মুখে হরিণ — ওরা বলবে, ধ্যৎ, তা হয় নাকি, এটা তো রহমৎ মিঞার গোঁফ হয়ে গেল। তা হয় কি করে। এই নিয়ে কথাকাটাকাটি করেও বড়দের বিশ্বাস করানো যাবে না — কখনও

কখনও কোন ছোট রাজপুত্র অন্য গ্রহাণু থেকে চলে আসতে পারে। টুকুন ভাবল, এসব কথা শুধু একজনকেই বলা যাবে — সে সুবল, সুবল শুনলে বলবে, হ্যাঁ দিদিমণি আমাদের ছিল একটা নদী, বড় নদী, নদী শুকিয়ে গেল — সে যেমন বলেছিল, দিদিমণি স্বপ্নে দেখেছি, আমরা চলে আসার পর জনার্দন চক্রবর্তী ফিরে গেছে নদীতে। যেখানে দিনমানে আমরা গর্ত করেছিলাম — সেখানে কি নির্মল জল। জলের ভিতর একটা হরিণ শিশু পড়ে গেছে।

সুবল যখন এমন বলে তখন মনে হয় সব কিছু সত্যি হতে পারে। সে এলে গল্পটা বলা যাবে। বলা যাবে ছোট্ট রাজপুত্র বার বার একটা কথা কেবল বলছিল, আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চা এঁকে দাও। মানুষটা কি করে তখন, সে বলেছিল, আমি ছবি আঁকতে জানি না।

ছোট্ট রাজপুত্রের এক কথা, দাও দা আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চা এঁকে!

মানুষটা ভাবল ভারী বিড়ম্বনা। এমনিতে উড়োজাহাজটা বিকল হয়ে গেছে। সাত-আট দিনের মাত্র জল আছে এর মধ্যে, কিছু না করতে পারলে মরে যেতে হবে। তখন এমন কে ছোট্ট রাজপুত্র আমি ছেলেবেলাতে একটা ছবি এঁকেছিলাম।

রাজপুত্র বলেছিল, তাই বুঝি?

— কিন্তু কি জান, আমি যা ভেবে আঁকলাম, তা সত্যি হল না।

— মানে?

— আমি একটা অজগরের মুখে হাতির ছবি এঁকেছিলাম।

— বাবা! বেশ তো!

— না, বেশ নয়।

— কেন নয়?

— কেউ বিশ্বাসই করল না ওটা অজগরের হাতি গেলার ছবি।

— ওরা কি বলল?

— ওরা বলল, ওটা একটা টুপি।

ছোট্ট রাজপুত্র হা হা করে হেসে উঠল। — বড়রা খুব অঙ্ক ভালবাসে। অঙ্কের হিসাবে না মিললে ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। যেমন দ্যাখো, বিশ্বাস করতে চায় না কেউ আমার বাড়ি একটা গ্রহাণুতে। কিন্তু লামারতিন নামে এক জ্যোতির্বিদ আবিষ্কার করেছিল — সেটা সতেরোশো বাইশের জানুয়ারীর আঠাশ তারিখ হবে, আমার গ্রহের নম্বর পর্যন্ত ঠিক করে দিয়েছিল . . .

— কত?

ছোট্ট রাজপুত্র বলল, তিন আট সাত পাঁচ . . . ছোট্ট রাজপুত্র বলতে থাকলে আর শেষ হয় না।

টুকুনের মনে হত সে নিজেই সাহারা মরুভূমিতে একটা ছোট্ট এরোপ্লেন নিয়ে নেমে গেছে এবং যা কিছু কথা সব তার সঙ্গে হচ্ছে।

এমন একটা সকালে যখন সে এসব ভাবছিল, এবং জানালা দিয়ে সব সুন্দর সুন্দর ফুলের সৌরভ ভেসে আসছিল, তখন ইন্দ্র এসে হাজির।

টুকুন বলল, ইন্দ্র, আজও সুবল এল না।

— আসবে।

— তুমি ওকে আমার ঠিকানাটা দিয়ে আসবে ?

— ও কোথায় থাকে ?

— তা জানি না। সে একটা দেবদারু গাছের নীচে শুয়ে থাকে জানি।

ইন্দ্র জানে টুকুনের এমনই কথা বলার ধরন। টুকুনকে আজ শাড়ি পড়িয়েছে গীতামাসি। টুকুনকে খুব স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। কিন্তু টুকুনের ভিতর কোন লজ্জা নই। সে তার শাড়ির আঁচল বুক থেকে ফেলে দিয়েছে। ইন্দ্র যে পুরুষ সেটা মনেই হয় না টুকুনের চোখ দেখে। ইন্দ্র বেশী সময় সঙ্গ দিকে পারে না। সে সুন্দর করে সেজে আসে। সে যতটা পারে সরু প্যান্ট জামা পরে এবং ওর ভিতর কিছু কৃত্রিমতা থাকে বলে টুকুনের ভারি হাসি পায়। সে কিছুতেই টুকুনকে ছুঁতে চায় না। টুকুন সে এলে ঠিক বান্ধবীর মত জড়িয়ে ধরতে চায় — আর ইন্দ্র তখন কেমন করে, টুকুন তো এখনও ভাল করে হাঁটতে পারে না। তখন সবকিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। সে আর নড়তে পারে না খাট থেকে।

টুকুন ডাকল, ইন্দ্র কাছে এস।

ইন্দ্র কাছে গেলে বলল, তুমি আমার হাত ধর।

ইন্দ্র হাত ধরতে সঙ্কোচ করলে বলল, তুমি ইন্দ্র এমন কেন, সুবলকে যদি দেখতে, সে আমার জন্য সব করতে পারে। আমি ভাল হলে সুবলকে ঠিক নিয়ে আসব।

ইন্দ্র বলল, মাসিমা বলেছে আমরা আজ 'চাঁদমামার সংসার' দেখতে যাব।

— কোথায় ?

— ছোটদের নাট্য-সংসদে।

— আমি যাব না।

— তুমি গেলে খুব আনন্দ পাব টুকুন।

— আমার ভাল লাগে না।

মা এসে বললেন, খুব ভাল লাগবে। ইন্দ্র আর তুমি যাবে।

— আমার ভাল লাগে না মা। আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে, আমার এটা ভাল লাগে না।

— ডাক্তার বলেছে তুমি ভাল হয়ে গেছ। এখন শুধু তোমাকে নিয়ে

ইন্দ্র ঘুরে বেড়াবে।

ইন্দ্র বলল, আমি দেখেছি। খুব ভাল।

টুকুন বলল, ওসব বাচ্চাদের বই।

— না, সবাই দেখতে পারে। সবারই ভাল লাগবে।

— আমার এখন রোদ ভাল লাগে। বৃষ্টি অথবা ঝড়। আমার কখনও সূর্য ওঠা দেখতে ভাল লাগে। পাখিরা তখন আশ্চর্যভাবে উড়ে বেড়ায়। আমার কেন জানি মনে হয় সুবল তার দেশে চলে গেছে। সে রোদে বৃষ্টিতে অথবা ঝড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কি সুন্দর যে তাকে লাগছে দেখতে! চোখ বুঝলে আমি সব টের পাই।

তবু ইন্দ্র বার বার চেষ্টা করল। এখন ইন্দ্রের কলেজ বন্ধ। সে এখানেই থাকবে। ইন্দ্রের জন্য নীচে একটা বড় ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রর সকালে একবার বিকেলে একবার আসা কথা। সবই ডাক্তারের পরামর্শ মত হচ্ছে। যখন পাখিয়ালা সুবলকে মিসেস মজুমদার মাঝে মাঝে আসতে দিতে একেবারেই রাজী হলেন না, তখন আর কি করা। তবু তাঁর ধারণা, জীবনের ভিতরে এই বয়সে যে উদ্দামতা দেখা যায়, ইন্দ্রের শরীর থেকে মেয়েটা তার গন্ধ পেলে হয়তো বাছ-বিচার না করে এক আশ্চর্য গন্ধে এই পৃথিবীর কোন এক সকালে সে বড় হয়ে যাবে। এবং পৃথিবীময় তখন সে মনোরম সঙ্গীত শুনতে পাবে — যা সে কোনদিন টের পায়নি, এত ভাল, এভাবে পৃথিবী ক্রমে তার কাচে আরও বড় হয়ে যাবে। সে তখন ছুঁতে পাবে চারপাশটা।

ইন্দ্র বলল, তুমি না গেলে আমি যাচ্ছি না।

টুকুন বলল, আমাকে শাড়ি পরলে বড় দেখায়?

— খুব বড়।

— মা-র মত লাগে?

— মাসিমার মত লাগবে কেন?

— বা রে, শাড়ি পরলে মাসিমার মত না লাগলে তবে শাড়ি পরা কেন?

— তোমাকে টুকুনই লাগছে। যুবতী টুকুন।

— বাঃ, আমি যুবতী হব কি করে, বলেই সে কেমন হতাশ মুখে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভীষণ অভিমান সুবলের ওপর। কি দরকার ছিল ট্রেনে দেখা হওয়ার! কি দরকার ছিল পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দেবার! আমি বেশ তো মরে যাচ্ছিলাম। মরে যেতে আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। সবার আগে মানুষের সব দুঃখ বুঝতে না বুঝতে চলে যেতাম তবে। তুমি কেন যে আমার শরীরে আবার প্রাণের সাড়া এনে দিলে! দিলে তো একেবারে ভাল করে দিলে না। কখনও কখনও এত ভাল লাগে সবকিছু— আবার কখনও কখনও কেমন হতাশা। আমার কি আছে বল? ইন্দ্র আমার

কাছে আসে দায়ে পড়ে। ও তো আমাকে ভালবাসে না। আমার কিছু নেই। আমি এখনও বাচ্চা মেয়ে হয়ে আছি। ওর কেন আকর্ষণ থাকবে বল ?

এভাবে কত সব ভাবনা এসে মাঝে মাঝে টুকুনকে ভীষণ অভিমানী করে রাখে — পাখিটাকে পাঠিয়ে দিতে পারছ না ? সে আমার কত খবর নিয়ে যেত। আমার কত গল্পের বই আছে। সেখানে কতরকম ভাবে সব মানুষ সমস্ত সৌরজগতের খবর নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর তুমি তোমার পাখিটাকে পাঠিয়ে আমার খবরটুকু নিতে পারছ না !

টুকুন এখন দেখল ইন্দ্র আর নেই। এত বড় একটা সম্পত্তির ওপর ইন্দ্রের লোভটা সে কি করে যে টের পায়। ইন্দ্রের বাবা খুব খুশী। আগে এ-বাড়িতে ওদের গলা সে কখনও শুনেছে মনে করতে পারে না। এখন এ-বাড়িতে ইন্দ্রকে নিয়ে আসায় — ওরা খুব আসে। বাবার মুখ দেখলে টের পায় টুকুন, তিনি আর কাজে কোন উৎসাহ পাচ্ছেন না। চারপাশ থেকে বাবাকে কারা যেন অক্টোপাশের মত গিলে খাচ্ছে। কখনও কখনও এমন মনে হয়ে যায় যে টুকুন ইন্দ্রকে একদম সহ্য করতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে টুকুন ভারি মধুর। সে রাগ করে কেন জানি কথা বলতে পারে না। রাগ করে কথা বলতে পারলে সে কবে ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিত।

টুকুন বুঝতে পারে এভাবে একজন তরুণ বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না। সে যখন খুব বিনয় করে বলে, আমি আসি টুকুন, আবার পরে আসব — তখন টুকুনের ভারি হাসি পায়। কেন যে মিথ্যা অভিনয় করছে ইন্দ্র ! ওর বলতে ইচ্ছা হয়, তোমাকে আর কখনও আসতে হবে না। তুমি আমার কাছে এসে কোন উৎসাহ পাও না। উৎসাহ না পেলে কিছুই জমে ওঠে না। যদি সুবলকে দ্যাখো, দেখবে সে যে কোথাকার সব রাজ্যের ফুল ফল পাখির খবর নিয়ে আসছে।

সুতরাং ইন্দ্র চলে গেলে পর ফাঁকা। মা এসে কিছুক্ষণ পাশে বসে থেকে গেছে। গীতামাসি আসবে নানারকমের খাবার নিয়ে। সে একটা দুটো খাবে, বাকিটা খাবে না। তারপর ওর যা কাজ, জানালায় বসে মালিদের বাগানে কাজ দেখা। প্রতিটি গাছ ওর এত চেনা যে, এখন ইচ্ছা করলে সে যেন বলে দিতে পারে কোথায় ক'টা নূতন কুঁড়ি মেলেছে, কখন ফুল ফুটবে, ক'টা ফুল ক'টা গাছে ফুটে রয়েছে। ম্যাগনোলিয়া গাছে দুটো ফুল ফুটেছিল কাল। সাতটা কুঁড়ি। তিনটা ফুটবে ফুটবে ভাব। আগামীকাল তিনটা ফুল ফুটবে। আগে এইসব ভাল জাতের ফুল তুলে এনে ওর ঘরে নীল রংয়ের ভাসে সাজিয়ে রাখত গীতামাসি। কিন্তু সে বারণ করেছে, ফুলেরা গাছে থাকলে বেশী ভাল লাগে। ওরা যে কি ভাবে ফোটে ! কখনও কখনও রাত জেগে দেখতে ইচ্ছা হয়। সে এভাবে আজ পর্যন্ত একটা ফুলের কাছকাছি যেতে পারল না। ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারল না। কান্নায় ওর গলা বুজে আসে তখন।

সুবল এলে বুঝি সত্যি সত্যি সে এবার ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারত। শরীরে তার নানারকমের ঘ্রাণ, সুন্দর সুন্দর সব ইচ্ছারা খেলা করে বেড়াত। সুবল এলে এইসব ইজছা কেন যে জেগে যায়। এবং সে তখন যেন ইচ্ছা করলে ছুটতে পারে।

সে বলল, গীতামাসি আমাকে ছোট্ট রাজপুত্রের বইটা দাও তো।

টুকুন 'বৈমানিকের ডায়রি'টা তুলে নিয়ে সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্পটা পড়তে থাকল।

বৈমানিক লিখেছে, প্রতিদিন আমি তার গ্রহ, সেখান থেকে তার যাত্রা তার ভ্রমণ বিষয়ে খানিকটা করে জেনেছিলাম। এভাবে তৃতীয় দিনে বাওবাব গাছের গল্পটি জেনেছিলাম।

সেটাও আমার সেই ভেড়ার ছবি আঁকার কল্যাণেই জানতে পেরেছি।

কারণ দেখেছিলাম, ওর মুখে ছোট্ট সংশয়ের রেকা। সে যেন কি ভাবছে। কি যে ভাবছে আমি জানি না। চারপাশে বিরাট সাহারা, আমার কাছে আর পাঁচ দিনের মাত্র জল আছে। এর ভিতর উড়োজাহাজটাকে মেরামত করে নিতে না পারলে, আমি আর ফিরতে পারব না। আমার ছোট্ট বন্ধুটির সঙ্গে সারা মাস কাল বোধহয় এই মরুভূমিতেই ঘুরে মরতে হবে। আমি বললাম, কিছু বলবে?

— অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি কিছু বলব, কিন্তু —

— কিন্তু কি?

— তুমি যে-ভাবে কাজ করে যাচ্ছ —

— হ্যাঁ কাজ করছি। না হলে দেশে ফেরা যাবে না।

— কিন্তু তুমি ঠিক জানো তো ভোড়ারা গুল্ম খায়?

— হ্যাঁ খায়।

— যাক বাঁচা গেল। কি যে ভাবনা হচ্ছিল!

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সে এমন বলছে কেন! আবার ছোট্ট রাজপুত্রের ভারি গলায় প্রশ্ন — ওরা বাওবাব খায়?

আমি হেসেছিলাম। এমন একটা প্রাণ-সংশয়ের ভিতর আছি, আর সে কিনা এমন সব প্রশ্ন করছে — ভেবে অবাক, বললাম — বাওবাব তো গুল্মজাতীয় গাছ নয়। তুমি যদি একপাল হাতি নিয়ে যাও এবং তার ওপর তোমার ভেড়াটাকে চাপাও, তবু বাওবাবের পাতার নাগাল পাবে না।

— অঃ। ছোট্ট রাজপুত্রকে খুব যেন চিন্তিত দেখাল। তারপর খুব জোরে হেসে নিল, তুমি একটা কথা জান না, সব গাছই বড় হবার আগে ছোট থাকে। ছোট থেকে বড় হয়।

— তাহলে তুমি বাওবাবের চারাগাছের কথা বলছ?

ছোট্ট রাজপুত্র কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখল। আর একটা সংশয় যেন দানা বাঁধছে। প্রশ্ন করল, ভেড়া যদি গুল্ম খায় তাহলে বলতে হবে

ফুলও খায়।

—ওরা যা পায় তাই খায়। আমাদের দেশে কথাই আছে, ছাগলে কি না খায়, পাগলে কিনা বলে!

—ছাগল ব্যাপারটা কি?

বুঝতে পারলাম ছোট্ট রাজপুত্র ছাগল ব্যাপারটা জানে না। আমি বললাম, সে এক রকমের ভোড়ার মতই দেখতে জীব। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে আবার সংশয় ফুটে উঠছে। সে কিছু আবার প্রশ্ন করবে বুঝতে পারলাম।

—আচ্ছা যে ফুলের কাঁটা আছে—

—যে ফুলের কাঁটা আছে ওরা তাও খেয়ে নেবে।

তখন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম বিমানের কাজে। একটা লোহার ডাণ্ডা ভিতরে ঢুকে গেছে। ওটাকে বের করতে না পারলে শান্তি নেই। জলও ক্রমে আমার কমে আসছে। খুব শঙ্কিত ছিলাম এ-জন্য। পাশে ছোট্ট রাজপুত্রের একের পর এক প্রশ্ন। আর আশ্চর্য, কোন প্রশ্নের যতক্ষণ পর্যন্ত জবাব না পাবে—একনাগাড়ে সে তা জানতে চাইবে। মনে মনে কিছুটা বিরক্ত। যা মনে আসছে তাই আবোল-তাবোল কিছু বলে সান্ত্বনা দেবার মত বললাম, কাঁটা দিয়ে কিছু হয় না। ওগুলো আমার মনে হয় ফুলগুলির দুষ্টুমি।

ছোট্ট রাজপুত্র বলল, ও। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কেমন ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, তোমার কথা মানি না। যা মনে আসছে বলে যাচ্ছ। ফুলের দুর্বল আর সরল বলে কাঁটা না থাকলে চলে না। ও-ভাবে কাঁটা আছে বলেই কারো কারো কাছে ওরা ভয়ানক।

কোন জবাব দিচ্ছিলাম না। এত বড় কেটা মরুভূমির মত জায়গায় ছোট্ট রাজপুত্র আমার সঙ্গী। সে যদি আমাকে ফেলে চলে যায়—ভাবতেই গা-টা ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ডাণ্ডাটা খোলার জন্য খুব জোরে হাতুড়ি মারলাম। একেবারে ওটাকে উপড়ে আনতে চাইছি।

ছোট্ট রাজপুত্র ফের বলল, তুমি কি ভাব ফুলেরা—

—না না, আমি কিছুই ভাবছি না। কেবল আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছি। আমার মাথাটা ঠিক নেই। তা ছাড়া দেখছ না দরকারী কাজে ব্যস্ত।

ছোট্ট রাজপুত্র আমার দিকে ভারি বিস্ময়ের চোখে তাকাল। বলল, দরকারী কাজ! সে কি জিনিস আবার?

আমি কিছু বললাম না। আমার কিছু ভাল লাগছিল না।

হাতের আঙুলে, হাতুড়িতে তেল-কালি মাখা। বেড়া একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে আছি সেই কখন থেকে। ছোট্ট রাজপুত্র আমায় কেবল এখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এবং বুঝতে পারছিলাম ভীষণ রেগে যাচ্ছে। সে ফের বলল, তুমি বড়দের মত কথা বলছ।

আমি কিছু বলছি না। এমন কি তাকাচ্ছিও না।

সে বলল, তুমি সব ভুলে গেছ, গুলিয়ে ফেলছ।

ছোট্ট রাজপুত্র এ-ভাবে চটে যাচ্ছে। সে কোন ছোট গ্রহাণু থেকে পাখিদের ডানার মত এক রকমের কি সব লাগিয়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে এসে সে এমন একটা বেরসিক লোকের দেখা পাবে বোধহয় আশাই করতে পারেনি। ওর সোনালি চুলগুলি কি যে মাখনের মত নরম, ওর চোখ কি যে নীল— সে আর যেন আমার এই অবহেলা মোটেই সহ্য করতে পারছে না।

সে এবার একনাগাড়ে বলে চলল, একটা গ্রহের কথা জানি আমি। সেখানে ঘন লাল রংয়ের একটা লোক থাকে। কখনও একটা ফুলও শুঁকে দেখেনি। সে কোনদিন সাদা জ্যোৎস্নায় হেঁটে বেড়ায়নি, আকাশের তারা দেখেনি, কাউকে সে ভালবাসেনি। সে একটা যোগ অঙ্ক ছাড়া কিছুই করেনি। সারাদিন তোমার মত বলত, আমি ভারি ব্যস্ত মানুষ। আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ত না। একটু থেমে ছোট্ট রাজপুত্র দুহাতে বালি ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, সে কি একটা মানুষ! সে তো একটা ব্যাঙের ছাতা!

—একটা কী? হাতের সব কাজ ফেলে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

—একটা ব্যাঙের ছাতা। রাগে ছোট্ট রাজপুত্র একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

ওর সোনালি চুল ছোট পাখির বাসার মত বাতাসে যেন কাঁপছে।

সে ক্রমান্বয়ে রাগে দুঃখে বলে চলল, লাখ লাখ বছর ধরে ফুলেরা কাঁটা তৈরী করছে। আর লাখ লাখ বছর ধরে ভেড়ারাও ফুল খেয়ে যাচেছ। যে কাঁটা কারুর কোন কাঝে আসে না, ফুলেরা তাই বানাতে গিয়ে এত কষ্ট করে কেন, সেটা জানা কি দরকারী নয়? এই যে লড়াই ফুলের সঙ্গে ফুলের কাঁটার, ভেড়ার সঙ্গে ফুলের— সেটা একটা যো অঙ্কের চেয়ে বেশী দরকার নয় জানার।

আর কথা বলতে পারছিল না ছোট্ট রাজপুত্র। কোনরকমে ধীরে ধীরে বলছিল— কেউ যদি একটা ফুলকে ভালবাসে, যে ফুল লক্ষ লক্ষ তারার ভিতর তাদেরই একটি হয়ে ফুটে আছে, এবং তখন যদি একটা ভেড়া সেই ফুল খেয়ে ফেলে— আর যদি আকাশের তারারা সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় ভয়ে, তখন কি সেটা আমাদের জীবনে বড় সমস্যা নয়?

এবং এ-ভাবে ছোট্ট রাজপুত্র আর কথা বলতে পারছিল না। হঠাৎ কেন যে ফুঁপিয়ে ওঠে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। রাত নেমে এসেছিল। যন্ত্রপাতি ফেলে এবার উঠে দাঁড়ালাম। এই মরুভূমির রুক্ষতা, সীমাহীন বালুরাশি, তৃষ্ণা, মৃত্যুভয়— সবই কেমন তুচ্ছ বলে মনে হল। কেন জানি মনে হল আমার গ্রহ এই পৃথিবীতে এক ছোট্ট রাজপুত্র চলে এসেছে— যার নিয়মকানুন সব আলাদা, যাকে আমায় সান্ত্বনা দিকে হবে। ওকে হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলাম। একটা ফুলের মালার মত হাতের ওপর দোলাতে লাগলাম।

তাকে সান্ত্বনা দিলাম, যে ফুল ভালবাস তুমি, তার কোন বিপদ হয়নি। তোমার ভেড়ার একটা মুখ-ঢাকা এঁকে দেব। আর তোমার ফুলের জন্য একটা বর্ম। আর ভেবে পেলাম না ওর হয়ে আমি আর কি বলব। বুঝতে পারছিলাম না তাকে কি ভাবে আর শান্ত করব। কি করে তার মন পাব। চোখের জলের রাজ্যটি সত্যি বড় রহস্যময়।

টুকুন বুঝতে পারল না এ-ভাবে বইটি পড়তে পড়তে সে-ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন। এ-ধরণের কান্না তার বুক বেয়ে কখনও ওঠে আসেনি। সে নির্বান্ধব ছেলেটি এখানে কোথায়। সে তার কাছে এলে যেন এখন বলতে পাত, আমরা এখানে থাকব না সুবল, সেই ছোট গ্রহাণুতে চলে যাব। তুমি আমি ছোট্ট রাজপুত্র একসঙ্গে থাকব। ওর ফুলকে পাহারা দেব।

এবং এ-ভাবে টুকুন কখনও সন্ধ্যায় অথবা রাতে নিজের বিছানা থেকে বড় জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশ দেখতে থাকে। এবং সব উজ্জ্বল গ্রহ দেখতে দেখতে কোন বিন্দুর মত অনুজ্জ্বল কিছু দেখলেই মনে হয় বুঝি সেই গ্রহাণুতে ছোট্ট রাজপুত্র থাকে। সুবলকে নিয়ে সে যদি সেখানটায় যেতে পারত!

।। বারো ।।

সুবল সেদিন শেফালীবৌদির কাছে ফিরে আসবে ভেবেছিল। সে গিয়ে যখন দেখল টুকুন দিদিমণি হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে, তখন ওর আর কিছু ভাল লাগছিল না। কেউ তাকে আর কোন খবরও দিল না। সে দুবার চেষ্টা করেছে সেই সিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে। কিছুতেই সুবলের সঙ্গে সিস্টার দেখা করতে চায়নি।

তবু যা হয়ে থাকে, মনের ভিতর এক অসীম বিষণ্ণতা। সে যখন তার গ্রাম মাঠ ফেলে চলে আসছিল, তখন কি ভীষণ মায়া তার গ্রাম মাঠের জন্য। সে বার বার বলেছে, আমি আবার ফিরে আসব মা সুবচনী। সুবচনী দেবী ওদের খুব জাগ্রত দেবতা। তার যতদূর মনে আছে, বাবা-মা ওর কি একটা অসুখে একবার সেই দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়েছিল। সে সেই পূজা দেখেছিল, না অন্য মানুষের মুখে শুনে শুনে সে তার বাবা-মা-র সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে রেখেছে, এখন মনে করতে পারে না।

সুবল জানত না এই শহরে এসে সে এক মায়ায় জড়িয়ে পড়বে। এতবড় শহরে কি করে যে টুকুন দিদিমণি তার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেল! এখন নিজের ওপরই তার রাগ হচ্ছে। সে যদি দেবদারু গাছটার নীচেই আস্তানা গেড়ে নিত! কিন্তু ওর কি যে হয়ে গেল, বেশী পয়সার লোভে সে অন্য ব্যবসা করতে গিয়েই মরেছে। সে মসয় কম পেত। আগের

মত খুশীমত দুজোড়া জুতো পালিশ করে গাছের নীচে ঘুম যেতে পারত না। এখন কেন জানি ঘুমিয়ে পড়লেই মনে হয় কেউ তার সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাবে। তার এমন কিছু হয়েছে, যা চুরি যাবার ভয়। তার আর আগের মত কোন স্বাধীনতা নেই। সে বুঝতে পারে, এইসব শহরে এলেই মানুষের স্বাধীনতা চুরি যায়।

সে যখন শেফালীবৌদির ওখানে ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। সে ইচ্ছা করলে ফুটপাথে রাত কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কেন জানি সে আজ খুব পরিষ্কার হয়ে গেছিল, এমন কি সঙ্গে সে পাখিটাকেও নিয়ে যায়নি। তার হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিল, পাখিটাকে খাওয়ানো হয়নি। নানা কারণেই সে ফিরে না এসে পারেনি। আর এমন পরিচ্ছন্ন পোশাকে ফুটপাথে রাত কাটাতেও কেমন খারাপ লাগছিল।

শেফালী সুবলের মুখ দেখেই বুঝল, টুকুনের সঙ্গে সুবলের কিছু একটা হয়েছে।

সে বলল, মুখ গোমড়া কেন রাজা?

— তোমার কাছে থাকব বৌদি আজ। দাদা এখনো ফেরেনি?

— না। একটু থেমে বলল, সিস্টার আবার বুঝি ধমক দিয়েছে?

সে জবাব দিল না কিছু। গলায় সুবলের মাফলার জড়ানো স্বভাব। সে তার গ্রামে দেখেছে, কেউ বাবু বনে গেলে গলায় একটা কমফর্টার জড়িয়ে রাখে। সে-ও আজ গলায় একটা কমফর্টার জড়িয়ে গিয়েছিল। সে সেটা একটা দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুড়ির ভিতর থেকে পাখিটাকে বের করল। সে পাখিটার জন্য ইচ্ছা করলে একটা খাঁচা কিনতে পারে। কিন্তু খাঁচায় পাখি রাখার ইচ্ছা সুবলের হয় না। পাখি সেই যে কবে বাঁশের চোঙে আশ্রয় দিয়েছিল, আর সে অন্য আশ্রয়ে যেতে চায়নি। সে বলল, পাখি তোর টুকুন দিদিমণি চলে গেছে।

পাখি পাখা নাড়ল। যেন বলতে চাইল, কোথায়?

— জানি না।

শেফালীর ঘুম পাচ্ছিল। সুবল কিছু খাবে হয়তো। ওকে জল-নুন দিতে হবে। বাকিটা সুবল নিজের কাছে রাখে। ছোলার ছাতু, লঙ্কা, একটু চাটনি। সে একটা থালায় এসব রেখে শেফালীবৌদিকে হয়তো বলবে, এক গ্লাস জল দাও তো বৌদি, খেয়ে নি।

কিন্তু আজ সে-সব কিছুই করল না সুবল। বরং পাখিটাকে খাওয়াল। তারপর পাখিটাকে সঙ্গে কি যেন ফিস ফিস করে বলল, এবং এক সময় মনে হল, ওর টুকুনদিদিমণিকে খুঁজতে যাওয়া দরকার। সে শেফালীবৌদিকে বলল, বৌদি তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। আমার যা কিছু — এই যেমন কড়াই, চিনেবাদাম, ছোলা মটর সব এখানে কিছু দিনের জন্য থাকল। কবে ফিরব ঠিক নেই। পাখিটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

— দেশে যাচ্ছ নাকি ? অবাক চোখে তাকাল শেফালী।

— দেশে আমার কেউ নেই। আমাদের কেউ নেই। তবে স্বপ্ন দেখেছি একদিন জনার্দন চক্রবর্তী সুবচনী দেবীর মন্দিরের বাইরে একটা হরিণকে ধরার জন্য ছুটছে। কি যে স্বপ্ন ! স্বপ্নটার কোন মানে হয় না।

— কিন্তু এত রাতে ! কিছু খেলে না ! তুমি কি পাগল !

সুবল হাসল। সুবলের লম্বা পাজামা, লম্বা পাঞ্জাবি গেরুয়া রংয়ের এবং সন্ন্যাসীর মত মুখ শেফালীকে কেমন কাতর করছে। সে বলল, খেলে না। টুকুনের কাছে গেলে— দেখা হল কিনা বললে না। সিস্টার কি বলল বললে না। কি হয়েছে তোমার ?

— টুকুন দিদিমণি হাসপাতাল থেকে চলে গেছে।

— তাহলে দেখা হয়নি ?

— না।

এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা ধরা পড়ছে সুবলের চোখে মুখে। অথবা দেখলে মনে হয় সুবল মনে মনে কিছু স্থির করে ফেলেছে। তাকে এখন শেফালী কিছুতেই আটকে রাখতে পারবে না। শেফালী তবু বলল, কিছু খেলে না !

— কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

— তুমি তো দেখছি শহরের মানুষের মত হয়ে যাচ্ছ।

সুবল চোখ তুলে তাকাল।

— তোমার তো এমন হওয়া উচিত না রাজা।

সুবল কিছু বলল না। সুবলের যেমন স্বভাব কথার ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারলে একটু হেসে ফেলা, তেমনি সে হেসে দিল।

এই হাসিটুকু ভারি সুন্দর। এমন ভাবে হাসলে বড় বেশী সরল মনে হয়। তখন ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয়। আদর করতে ইচ্ছা হয়। এত যে মনের ভিতর তার অশান্তি— কেমন নিমেষে উড়ে যায়। তার মানুষ ঘরে থাকে না। মানুষটা সংসার চালাবার নামে কোথায় থাকে কোথায় যায় সে বলতে পারে না। এবং মদ্যপানে মানুষটা কখনও অমানুষ হয়ে গেলে শহরের সব দুঃখ একসঙ্গে ধরা যায়। তখন সুবলের মত একজন সরল গ্রাম্য বালকের সঙ্গ পেতে বড় ভাল লাগে।

শেফালী বলল, তুমি রাজা আজ কোথাও যেতে পারবে না।

সুবল দেখল শেফালীবৌদির চোখে ভীষণ মায়া। ভীষণ এক টান। এবং এই শহর, নির্বান্ধব শহরে সে কেন জানি আর না করতে পারে না।

শেফালী বলল, আমি ক'টা গরম রুটি সেঁকে দিচ্ছি। একটু আলুর তরকারি। বেশ খেতে ভাল লাগবে।

সুবল বলল, তুমি আমার জন্য এত রাতে এসব করবে ?

— বাঃ করব না ! তোমার দাদা এসে যদি জানতে পারে রাজা রাতে না খেয়ে বের হয়ে গেছে, তবে আমাকে আস্ত রাখবে !

সুবল বুঝতে পারে এই শহরের কোথাও নানা ভাবে নানা বর্ণের দুঃখ জেগে আছে। এই সংসারে এমন এক দুঃখ। অভাব-অনটনের সংসারে একটা মানুষ সবসময় কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে। কেমন একটা পালিয়ে বেড়ানোর স্বভাব অজিতদার। কোথায় যে এই মানুষের আস্তানা সে সঠিক জানে না। খুব কম সময় সে অজিতদাকে এখানে দেখেছে। এবং শেফালীবৌদির চোখ দেখে মনে হয়েছে সে-ও সঠিক ঠিকানা অজিতদার জানে না। ওর মনে হল টুকুন দিদিমণির সঙ্গে অজিতদার সঠিক ঠিকানাটাও সে খুঁজে বের করবে। সে বলল, দাও তবে। আজ আর বের হচ্ছি না। যখন বললে, তখন আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক।

সুবল কেমন স্মার্ট গলায় এখন কথাবার্তা বলছে সে দেখল বারান্দায় উনুনে বৌদি আঁচ দিচ্ছে। এবং বৌদিকে দেখে মনে হচ্ছিল কিছুদিন থেকে দাদার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার অভাব হচ্ছে। অথবা বৌদির এমন একটা জায়গা ভাল লাগছে না। কারণ বৌদি খুব পরিপাটি এবং সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে।

অজিতদার খুব ইচ্ছা বৌদির জন্য সে যাবতীয় কিছু করবে। এত সব অট্টালিকা এই শহরে, বৌদির জন্য এমন একটা অট্টালিকা চাই। এবং যখন সে নানাভাবে চেষ্টা করেও কোনরকমে একটু সুন্দর ভাবে বাঁচবার মত ব্যবস্থা করতে পারে না, তখন কেমন হীনমন্যতায় ভোগে। এবং এ-ভাবে সংসারে অশান্তি নেমে এলে মনে হয় শেফালীবৌদিকে অজিতদা কোথা থেকে যেন চুরি করে নিয়ে এসেছে। অনেক কিছুর প্রলোভনে শেফালীবৌদি সব কিছু পিছনে ফেলে চলে এসেছিল। বৌদি কতদিন কতভাবে তাকে নানারকম সব গল্প শুনিয়েছে। এবং আজকের এই রাতে থেকে যাওয়া একটু বেখাপ্পা ঘটনা। ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল।

শেফালী বলল, বেশ গরম পড়েছে। চান করে নাও।

কলতলা খোলা। সেখানে সে পাজামা খুলে চান করতে পারে না। এবং শরীরে সব অস্পষ্ট জলের রেখা চারপাশে ভেসে উঠছে। সে ছুঁলেই বুঝতে পারে নরম, খুব নরম ত্বকে বাবুইয়ের বাসার মত গুচ্ছ গুচ্ছ কি সব ভেসে উঠেছে। এবং এ-ভাবে ওর এক লজ্জা নিবারণের কথা মনে হয়। সে বলল, বৌদি আমি বরং রাস্তার কল থেকে স্নান করে আসি।

শেফালী বলল, এত রাতে রাস্তার কলে চান করলে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে।

পুলিসকে বড় ভয় সুবলের। সে বলল, আমি বরং হাত-মুখ ধুয়েনি।

শেফালী বলল, রাস্তায় গাছের নীচে শুয়ে থাকলে এত গরম লাগে না রাজা।

ঘরে শুলে ভীষণ গরম। চান না করে নিলে ঘুমোতে পারবে না।

—তাহলে আমি যখন চান করব, তুমি কিন্তু তাকাবে না।

— তাকালে কি হবে ? শেফালী হেসে দিল।

সুবল বলল, আমি বড় হয়ে গেছি বৌদি। বলেই সে কেমন ছেলে মানুষের মত লজ্জায় মাথা নীচু করে রাখল।

— আমার বড় তোয়ালে আছে— ওটা পরে নাও।

— তোমাদের অসুবিধা হবে না ? অজিতদা খারাপ ভাবতে পারে।

সুবল আর কিছু না বলে বেশ বড় একটা তোয়ালে নিয়ে নিল। সংসারে অজিতদার যা কিছু রোজগার সব শৌখিনতার জন্য। সুবল এতসব সুন্দরভাবে ভাবতে পারে না। তবু যখন তোয়ালেতে এক মনোরম গন্ধ, সে তোয়ালেটা মুখে নিয়ে কেমন ঘ্রাণ নিতে থাকল। এমন রং-বেরংয়ের তোয়ালে নিশ্চয়ই বৌদির। সে ঠিক টুকুন দিদিমণির মত এক আশ্চর্য সুবাস পায় বৌদির শরীরে। আর কেন জানি সুবলের মনে হয় এই শহরে, সে যতবার যতভাবে যুবতী মেয়েদের অথবা ফ্রক পরা মেয়েদের সান্নিধ্যে এসেছে, কেমন এক ফুলের সুভাস সবার গায়ে। সে ভাবল, সে যখন ফুল বিক্রি করবে তার শরীরেও এমন একটা মিষ্টি গন্ধ থাকবে।

শেফালীবৌদির চটপট সব হয়ে যায়। সুবল গড়িমসি করছিল খুব। ওর তো এমনভাবে বাঁচার স্বভাব নয়। এ যেন আলাদা ব্যাপার। সে একটা আলাদা স্বাদ পাচ্ছে। খুব নিরিবিলি একটা ঘরে, বৌদি, বৌদির রান্না, ঝালের গন্ধ, এবং আলোর ভিতর বৌদির কপালে ঘামের চিহ্ন কেমন এক আকর্ষণ তৈরী করছে। সে সুবল, সংসারের নিয়ম-কানুন সঠিক তার জানা নেই, সে জানে না, এ-ভাবে কোন যুবতী বালককে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতে পারে, সে ভারী এক রহস্যের স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে, সে বলল, বৌদি এখানে এলে আমার আর যেতে ইচ্ছা হয় না। অজিতদা যে কি করে তোমাকে ফেলে এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে বুঝতে পারিনা।

শেফালী বলল, তুমি থেকে যাও না রাজা।

— আমায় যে বৌদি টুকুন দিদিমণির কাছে যেতে হবে।

— কে যে এক টুকুন দিদিমণি তোমার !

— না, খুব ভাল। আমাকে দেখলেই দিদিমণির প্রাণে যেন জল আসে।

— তুমি ঐ ভেবেই সুখে থাক।

সুবল বলল, আমি যখন ফুল বিক্রি করব তখন একটা করে ফুলের গুচ্ছ দিদিমণিকে দিয়ে আসব।

— তুমি ওকে কোথায় পাবে ?

— কেন, এই শহরে।

— সে কি খুব ছোট ব্যাপার ?

— আমি যখন ফুল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করব তখন আমার

ডাক শুনলে ঠিক দিদিমণি টের পাবে। জানালা খুলে দিলে আমাকে চিনতে পারবে।

আমি বলব, দিদিমণি তোমার ফুল।

শেফালী এই সরলতার জন্য কেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। সে বলল, তুমি দাঁড়াও রাজা। ঝালটা হয়ে গেলে তোমাকে জল পাম্প করে দেব।

শেফালী জল পাম্প করে কেমন ছেলেমানুষের মত বলল, রাজা তুমি সাবান মাখ না কেন ?

— সাবান কোথায় পাব ?

— আমি তোমাকে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছি। আমাকে তোমার দাদা পামঅলিভ কিনে দেয়।

— আমার গায়ে মেখে দিলে তোমার শরীরের মত গন্ধটা হবে ?

— হ্যাঁ। ঠিক আমার শরীরে তুমি স্নান করে এলে যেমন গন্ধ পাও ঠিক তেমনি।

— তবে দাও। খুব সুন্দর গন্ধ শরীরে থাকলে আমার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে ভাল লাগে।

শেফালী ছুটে ছুটে কাজ করছিল। ওর যেন এটা একটা খেলা হয়ে গেছে। সুবলকে নিয়ে খেলা। সুবল কলের নীচে বসে আছে। সুবলের পিঠে শেফালী সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে। বড় নরম শরীর সুবলের। ওর ঘন চুল কি কালো। কপাল প্রায় যেন ঢাকা। লম্বা ভুরু। চোখ ভাসা, এবং পদ্মফুলের মত জলের ওপর যেন গাছের ছায়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

কি যে ভাল লাগছিল শেফালীর — এমন ভাবে সাবান মাখিয়ে দিতে ! ওর শরীরের ভিতর এক আশ্চর্য অহঙ্কার আছে, শেফালী কেমন পাগলের মত ওর শরীর নিয়ে, ঠিক একটা ছোট্ট পাখির মত ওর অহঙ্কার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সুবল বলছে, বৌদি ঠিক আছে, এবার বাকিটা আমি ঠিক পারব।

— না তুমি পারবে না রাজা। তুমি কিছু জান না।

— জানি, ঠিক জানি, দাও, দ্যাখো কি করে মাখতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি এমন করছ, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

কিন্তু শেফালী আজও আশা করেছিল, অজিত ফিরে আসবে, কিন্তু যা খবর পাঠিয়েছে ওর মানুস দিয়ে, অজিত কবে আসবে ঠিক নেই, কবে আসতে পারবে সে বলতে পারবে না। কিছু টাকা পাঠিয়েছে। ভীষণ হতাশা ছিল মুখে। এই সুবল এখন সব আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে নতুন বাতির মত। — তোমার শরীরে রাজা কি ময়লা, বলেই সে বগল তুলে ঘষে দিতে গেলে দেখল, কালো মসৃণ ছোট সুন্দর সব চুলের গুচ্ছ — ঠিক কলমি ফুলের মত রং। ঠিক কালো নয়, কিছুটা তামাটে রং। সুবলের কেমন কাতকুতু লাগছিল। সে হো হো করে হাসতে থাকল।

শেফালী বলল, তুমি এমন বড় হয়ে গেছ আগে বলনি কেন রাজা ?

সুবল কোন জবাব দিতে পারল না। একেবারে চুপ মেরে গেল। সত্যি ওর ভীষণ খারাপ লাগছিল। এবং ভয়ে ক্রমে গুটিয়ে যাচ্ছিল।

এ-ভাবে হৃদয়ের কাছাকাছি থাকার যে বাসনা মানুষের, মানুষ যার টানে বড় রকমের কঠিন কিছু করতে পারে না, এবং এভাবে সুবলের ব্যথিত মুখ দেখে শিফালী কেমন থমকে গেল। বলল, সুবল আমি ঠিক করিনি। তুমি এমন দুঃখ পাবে জানতাম না।

সুবলের ভিতর এক পাপবোধ এ-ভাবে জন্ম নিলে — এই শহরের গ্লানিকর সব ছবি তাকে তাড়া করে বেড়াতে থাকে। ওর মনে হল, সকাল হলেই সে ফুলের সন্ধানে চলে যাবে।

সঙ্গে থাকবে পাখিটা। যা সমান্য সম্বল আছে এই দিয়ে সে এই শহরের বড় রকমের পাপখণ্ডনের নিমিত্ত আবার রাস্তায় নেমে গেল। সেই যে এক দেশ, যে দেশে সে জন্মেছে, কি যে পাপ ছিল, টুকুন দিদিমণির এমন অসুখ !

সে নানাভাবে ফুলের সন্ধান করে বেড়াল। বই-পাড়ার কাছে খুব বড় ফুলের দোকান আছে। সেখানে সন্ধান নিয়ে সে জেনেছে, কিছুদূর ট্রেনে গেলে, একজন মানুষ আছে। মাঠে তার কেবল ফুলের চাষ। সে রজনীগন্ধার চাষ করতেই বেশী পছন্দ করে। ওর কেন জানি মনে হল, এই পৃথিবীতে একমাত্র সেই লোকটির সঙ্গেই তার এখন বন্ধুত্ব হতে পারে।

সুবল লোকটার সন্ধানে চলে গেল।

একটা নীল রংয়ের ট্রেনে চড়ে একটা সদারংয়ের স্টেশনে সে নেমে পড়ল। যে লোকটা নীলবাতি নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাক তার কাছেই খবর পেল — লোকটি একটা ভাঙা কুটিরে থাকে। ওর সম্বল একটা লণ্ঠন। সে তার দুই বিঘা জমিতে নানা রকমের ফুলের চাষ করে থাকে। বেল ফুলের জন্য আছে কাঠা চারেক ভুঁই। রজনীগন্ধার জন্য আছে কাঠা দশেক। গাঁদফুল এবং অন্য মরশুমী ফুলের চাষের জন্য সে রেখেছে বাকি জমিটা।

তার বাড়ি যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সে গেলেই একটা ফুলের গুচ্ছ এনে তুলে দেবে। সেখান থেকে তোমার খুশীমত ফুল পছন্দ করে কিনে আনবে। গুচ্ছের ভিতর সে সব সময় তাজা এবং ভাল ফুলগুলো রাখে। ওর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। ভীষণ কালো রং মানুষটা। সে একটা লুঙ্গি পরে। মাথায় তার একটা ফেজ টুপি। মানুষটা ধার্মিক। পাঁচ বেলা নামাজ। আর ফুল ফোটানো তার কাজ। পৃথিবীতে অন্য কাজ আছে বলে সে জানে না।

মানুষটার আবার ভীষণ বাতিক। সে যে জমি থেকে মৃত্যুর জন্য ফুলের তোড়া তৈরী করে, সেই জমি থেকে কখনও ফুলশয্যার মালা গাঁথে না। সুবল লোকটির পরিচয় পেয়ে খুব খুশী। সুবল বলল, আমার খুব ইচ্ছা

ফুলের চাষ করি তোমার মত।

—ফুলের চাষ কোর না। দুঃখ পাবে।

সুবল বলল, দুঃখ মানুষের জন্য। মানুষটার কাছে এসে সুবল তার মত ধার্মিক কথাবার্তা বলতে পেরে আনন্দ পাচ্ছে।

—তা হলে এই বয়সে সুখ-দুঃখ নিয়ে তোমার ভাবনা আছে?

—ভাবনা কি নিয়ে ঠিক জানি না বুড়োকর্তা। তবে এটুকু মনে হয়েছে, তুমি খুব আনন্দে আছ। তুমি শহরে যাও না?

—শহরে কোন দিন যাইনি। আগে ফুলের চাষ করতাম নেশার জন্য। এমন এটা পেশা হয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। শুনেছি আমার ফুলের খুব সুনাম বাজারে। মানুষেরা মরে গেলে শুনেছি আমার ফুল তাদের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা ভাবতে খুব আনন্দ পাই।

—সুন্দর সুন্দর বৌরা শুনেছি বিকেলে ছাদে ঘুরে বেড়ায়। তাদের খোঁপায় আমার এইসব বেলফুলের মালা জড়ানো থাকে। বুড়ো মানুষটি সুবলকে এমনও বলল।

সুবল বলল, তুমি আনন্দেই আছ। ফুল বিক্রি করাও খুব আনন্দের। আমার তো তেমন পয়সা নেই।

বুড়ো লোকটি বলল, আমার কাছে একদিনের ধারে পেতে পার। তার বেশী নয়।

—কিন্তু আমার ঠিকানা নেই।

—ঠিকানা! মানুষটা ঠিকানার কথা বলতেই কেমন চোখ বড় বড় করে ফেলল।—মানুষের কোন আবার ঠিকানা থাকে নাকি?

—থাকে না! এই যে তোমার ঠিকানা, ফুলের মাঠ, একটা সবুজ কুটির এবং নদীর ধারে বড়রাস্তা।

লোকটি বলল, অঃ। এই ঠিকানার কোন দাম নেই। আমি তোমার ঠিকানা চাই না। তুমি তো একদিনের জন্য ধার নেবে। বাকিটা তো আমার ওপর।

যাই হোক, সুবল লোকটির কাছে অনেক বেলফুল চাইল।

লোকটি বলল, এস।

সুবল লোকটির সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

বেলফুলের জমিতে এসে বলল, তুমি এই এই গাছ, বুড়ো এক দুই করে গাছের নম্বর বলে গেল, এগুলো তোমার। তুমি এ-সব গাছ থেকে ফুল নেবে। বলেই সে সুবলের মুখে কি দেখল। বলল, দাম অর্ধেক হয়ে যাবে। গাছের সেবা-যত্নের ভার নিলে, দাম ফুলের কমে যায়।

সুবল অর্ধেক দামেই ফুলের বন্দোবস্ত নিল।

সুবল খুব সকালে আসত। গাছে জল দিত। গাছগুলোর গোঁড়া খুঁচিয়ে নিত নিড়িকাচি দিয়ে। নদীতে সে স্নান করত। জোয়ারে জল থাকত খুব

নদীতে। সে জল বয়ে আনত নদী থেকে। মাটিগুলো টেনে গেলে, অথবা গোড়া শক্ত হয়ে গেলে, সুবলকে খুব চিন্তিত দেখাত। অথবা পোকা লাগলে যে কি করবে ভেবে পেত না। বুড়ো মানুষটা তখন নানারকমের শুকনো পাতা সংগ্রহ করত বন থেকে। শুকনো কলাপাতা অথবা কচুরিপানা সব সে আগুন জ্বেলে এক রকমের ছাই সংগ্রহ করত। ছাই ছড়িয়ে দিত গাছে গাছে পাতায় পাতায়।

আর সকাল হলেই সুবল দেখতে পেত ঝোড়ো হাওয়ায় পাতা থেকে সব ছাই উড়ে গেছে। পোকা-মাকড় সব মরে গাছের নীচে পড়ে গেছে। পাতাগুলো গাছের কেমন সবুজ হয়ে গেছে। আর কি আশ্চর্য সাদা রংয়ের ফুল — চার পাশ গন্ধে ভীষণ আকুল করছে! এমন একটা ফুলের মাঠে দাঁড়ালে কোথাও দুঃখ আছে বোঝা যায় না।

এই কুটিরের পাশেই সুবল আর একটা কুটির বানিয়ে নিয়েছে। সে নদী থেকে মাটি কেটে এনেছে। বুড়ো মানুষটা তাকে সাহায্য করেছে নানাভাবে। এতদিন একা থেকে বুড়ো মানুষটার একরকমের স্বভাব হয়ে গিয়েছিল - মানুষ কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। আর যে সব ফুলের দালালরা আসত, ভারি খারাপ লোক। নানাভাবে তাকে ঠকাত। একমাত্র সুবল এক মানুষ, কেমন সরল, এবং ঠকানো কাকে বলে জানে না। সে আসার পর তার চাষ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এবং সময় মত আজকাল বর্ষা আসে। ভাল ভাল ফুল হয়। গোলাপগুলো কি যে বড় হয়ে ফুটছে। গোলাপ চাষের ভার এখন সুবলের উপর। ছেলেটা ভারি পয়া। যেন সুবল বললে, সব তার নামেই লিখে দেবে।

এই লোকটিকে দেখে সুবলের কখনও কখনও জনার্দন চক্রবর্তীর কথা মনে হয়। খুব দাম্ভিক, কিছুতেই হার- মানবে না প্রকৃতির কাছে। এই মানুষেরও একটা তেমন অহঙ্কার আছে। তার মত ফুলের চাষ এ-তল্লাটে কেউ জানে না। সে ফুলের চাষ করে যা উদ্বৃত্ত হয়েছে, একটা মসজিদ বানিয়েছে। সে সেখানে মাঝে মাঝে গরীব মানুষের জন্য শিরনি দেয়। তার স্বভাব উল্টো। একটা ইঁদারা করে দিয়েছে। সে-এসবের ভিতরেই ধর্মকে খুঁজে বেড়ায়। এবং সুবল এখানে আসার পর সে একটু যেন হাতে সময় পেয়েছে। মাঝে মাঝে চারপাশে যখন তার অজস্র গোলাপ, তখন সে একটা বড় লম্বা মানুষ হয়ে যায়। ওকে একটা ফুলের বনে ফেরাস্তার মত মনে হয়।

একদিন সকালে উঠে বুড়ো মানুষটা দেখল, সুবল ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে আছে। পাখিটা খুব ওকে জ্বালাচ্ছে। সে মাত্র নামাজ পড়ে এদিকটায় এসেছে সুবলকে বলতে, যেন সুবল গোলাপের দালালি করার লোকটা এলে ভাগিয়ে দেয়। এবার থেকে সব ফুল সে সুবলকে দিয়ে দেবে। গরুর গাড়িতে সুন্দর করে স্তবকে স্তবকে কলাপাতায় মোড়া ফুলের

গুচ্ছ। শেষ-রাত থেকে উঠে তুলে ফেলতে হয়। সকাল সকাল স্টেশনে ওগুলো চালান দিতে হয়। রোজ ফুল যায় না। একদিন অন্তর একদিন। কিন্তু সে এসে সুবলকে এমনভাবে বসে থাকতে দেখবে ভাবতে পারেনি।

বুড়ো লোকটা কাছে গিয়ে বলল, তোর আজকাল ফিরতে এত রাত হয় কেন রে ?

সুবল তাকাল। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

বুড়ো মানুষটা এমন একটা মুখ মাঝে মাঝেই সুবলের দেখেছে। চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে, ফুলের কুঁড়ি বেছে নিচ্ছে সুবল, সাতটা কথা বললে একটা কথার জবাব দিচ্ছে। বুড়ো লোকটা এবার কেমন ক্ষেপে গেল, বলল, সুবল ফুলের মাঠে কেউ দুঃখ নিয়ে বাঁচলে আমার ভাল লাগে না।

— দুঃখটা তুমি কর্তা কোথায় দেখলে ?

— সকালে এমন মুখে বসে আছিস কেন ?

— তুমি জান না কর্তা, আমি কতদিন থেকে তাকে খুঁজছি।

বুড়ো লোকটা বুঝতে না পেরে বলল, সে সবাই খোঁজে, কেউ পায় না। আমিও তো তাকে খুঁজছি। পাচ্ছি কোথায় ?

সুবল বলল, তুমি বুড়োকর্তা এমন কোন মেয়ে দেখেছ, কেবল যার অসুখ ? অসুখ ছাড়ে না। দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতে পারে না। কেবল শুয়ে থাকে। মুখটা তার বেলফুলের মত সাদা।

বুড়োকর্তা হা হা করে হেসে উঠল। বলল, মেয়েই দেখিনি জীবনে। তার আবার অসুখ, তার আবার ভাল থাকা! আর তাই নিয়ে তুই মুখ গোমড়া করে রেখেছিস!

সুবল বুড়োকর্তার দুঃখটা কোথায় ধরতে পারে। এমন একজন কুৎসিত মানুষকে, কেউ হয়ত ভালবাসেনি। যখন ঘরে বিবি আনার বয়স ছিল, তার পয়সা ছিল না, তার মুখের চেহারাতে আছে, নৃশংস এক ছবি। নিষ্ঠুর মুখচোখ দেখলে কেউ কাছে আসতে সাহস পায় না।

কেবল সুবল জানে — কি কোমল আর ধর্ম প্রাণ মানুষটি। সে বলল, আমি ভেবেছিলাম, তাকে খুঁজে ঠিক বের করব। তার খুব অসুখ। আমাকে দেখলে ও খুব খুশী হয়।

অথবা তার যেমন ধারণা। সে গেলেই টুকুন দিদিমণি ভাল হয়ে যাবে। এমন এক সরল বিশ্বাস টুকুনের চোখ-মুখ দেখে তার গড়ে উঠেছে বুঝি। সে তো কখনও টেরই পায় না টুকুন দিদিমণি অসুস্থ। সে গেলে জানালা পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারে। কত কথা। টুকুনকে নিয়ে সে কত কথা। টুকুনকে নিয়ে সে সারা বিকেল শুধু গল্প আর গল্প। এবং এ-ভাবেই মানুষের মনে অজান্তে এক অহঙ্কার গড়ে ওঠে। সে জনার্দন চক্রবর্তীর মত রুক্ষ মাঠে বান ডাকাবার চেষ্টা করছে।

বুড়োকর্তা বলল, তুমি পাবে। তাঁকে ঠিক খুঁজে পাবে। ভালমানুষেরা

তাঁকে একদিন খুঁজে পায়।

সুবল বুঝতে পারল বুড়োকর্তা ঈশ্বরের কথা বলছেন। সে আর বুড়োকর্তাকে ঘাঁটাল না! ঈশ্বর-বিশ্বাসেরই মতই ওর ধারণা, সে একদিন না একদিন টুকুন দিদিমণিকে ঠিক জানালায় আবিষ্কার করে ফেলবে।

।। তেরো ।।

টুকুনকে নিয়ে সুরেশবাবু আবার একটা কষ্টের ভিতর পড়ে গেছেন। শুধু এখন শুয়ে থাকে আবার। মাঝে একটু ভাল হলে সুরেশবাবু টুকুনকে নিয়ে একটা স্পেস অডিসি দেখে এসেছেন। টুকুন স্পেস অডিসি দেখার পর কেমন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছে হাজার লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে যখন মহাযানটি ছুটছিল, তখন নিশ্চয়ই তার পাশে ছিল সেই ছোট্টে রাজপুত্রের গ্রহাণু। অথবা সেই যে এক বাতিয়ালা চিল এক ছোট গ্রহাণুতে তার কথাও মনে পড়ছে। তার গ্রহাণুর পাশ দিয়ে যাবার সময় মহাযানটি নিশ্চয়ই উঁকি মেরে দেখেছে, বাতিয়ালা সন্ধ্যা হলেই গ্যাসের একটা বাতি জ্বেলে দিচ্ছে।

সুরেশবাবুও মনে মনে সেই পাখিয়ালাকে খুঁজছেন। তাঁর দৈবে এখনও বিশ্বাস আছে। ডাক্তারবাবু পর্যন্ত মত দিয়েছিলেন। কেবল টুকুনের মা-র জন্য সিস্টারকে ঠিকানা দেওয়া গেল না। তিনি তিন-চার দিন আগে সিস্টারকে ফোন করেছিলেন পাখিয়ালা এসেছিল কিনা আর? সিস্টার বলে দিয়েছিল— না।

টুকুন এখন আর কিছু বলে না। সে ছোট্ট রাজপুত্রের বইটাই বার বার আজকাল পড়ছে। স্পেস অডিসি দেখার পর এই গ্রহ-নক্ষত্র-সৌরজগত অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ধারণা মনের ভিতর গড়ে উঠল— বেঁচে থাকা এই গ্রহে বড় অকিঞ্চিৎকর ঘটনা— অথবা টুকুনের মনে হয় সে কত অপ্রয়োজনীয় এই সৌরমণ্ডলের ভিতর। অন্তত ছোট রাজপুত্রের মত বাঁচারও একটা মানে ছিল। তার ছিল তিনটে আগ্নেয়গিরি, ছ'টা পাহাড়, দুটো নদী, একটা হ্রদ, একটা সমুদ্র। সে আসার আগে সমুদ্রের ওপরটা বাওবাবের পাতায় ঢেকে দিয়েছিল, সে গ্রহাণু থেকে বিদায় নেবার সময় আগ্নেয়গিরির মুখগুলো হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। নদীর জল কলাপাতায় ঢাকা। এবং ক'টা বাওবারের চারা ছিল, সব উপড়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরিজ পাখিদের ডানায় ভর করে গ্রহাণু থেকে নেমে আসার সময় তার মনে হয়েছিল বাওবারের চারা একটা বেঁচে থাকলে, ওর মূল শেকড় এত পাজি যে তার ছোট গ্রহটিকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

টুকুন জানালা দিয়ে নানারকম ফুল ফুটতে দেখলেই রাজপুত্রের কথা

মনে করতে পারে, সুবলের কথা মনে হয়। সে বিমর্ষ হয়ে যায়। খেতে তার ভাল লাগে না, ইন্দ্রকে সে আজকাল একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। মা এসে ইন্দ্রের সম্পর্কে সব গল্প করে যাচ্ছে। ইন্দ্র কলেজের পড়া শেষ হইলেই সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে চলে যাবে। এ-সব ঘটনা টুকুনের কাছে খুবই অকিঞ্চিৎকর। ওর এ-সব কথা শুনলে ভারি হাসি পায়। সে বলতে পারে, আমার কাছে এমন সব ইতিহাস লেখা আছে, যা তুমি আদৌ জান না। কত যে অকিঞ্চিৎকর — এই বিদেশ যাওয়া। মা, তুমি ইন্দ্রকে আমার ঘরে আর পাঠাবে না। ওর মুখ পুতুলের মত। সব সময় মুখটা কি রকমের থাকে। সে একটা কথা শুধু জানে, — টুকুন আজ তোমার কেমন লাগছে? শরীর তোমার কেমন?

অন্য কথা জানে না বলে টুকুনের মনে হয় ইন্দ্র এই দুটো কথাই শুধু সারাজীবন ধরে মুখস্থ করেছে। অন্য কথা সে জানে না। তার আত্মীয়-স্বজনের ছেলেমেয়েরা কেউ বড় আসে না তার ঘরে। ওর অসুখটা যদি অন্য কারো শরীরে সংক্রামিত হয় — এই অসুখ — কি যে অসুখ — কেউ টের পায় না, একটা মেয়ে সবকিছুর ভিতর কেমন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বেঁচে আছে।

সকাল থেকেই আজ এই অঞ্চলে গণ্ডগোল চলেছে। গীতামাসি টুকুনকে এমন বলেছিল। পাঁচিল পার হলে ফুটপাথ। লাইটপোস্টটার নীচে দুটো মানুষের মাথা কারা কেটে রেখে গেছে। সকাল থেকে হৈ-চৈ। পুলিস। কোথায় পাশে গুলি চলছে। তিনজন ধরাশায়ী। বিকেলে একটা বড় মিছিল যাচ্ছিল, সেখানে বোমা।

বোমা মিছিল আর নানারকমের অসুখ নিয়ে বেঁচে আছে এতবড় শহরটা। যেমন একটা অসুখ এই শহরের, সব বড় বড় বাড়ি, প্রাসাদের মত বাড়িগুলো রাতে ফাঁকা থাকে, নীচে ফুটপাথে লোক শুয়ে থাকে — শীতে অথবা ঝড়বৃষ্টিতে কষ্ট পায়। টুকুন বুঝতে পারে না এমন কেন হয়। যখন বাড়িগুলো ফাঁকা, লোকজন কম, ছোট সব মানুষদের সেখানে আশ্রয় দিলে কি যে ভাল হয়। কিংবা কেউ খায়; কেউ খেয়ে হজম করতে পারে না, কেউ না-খেয়ে পেটের জ্বালায় ফুটপাথে পড়ে থাকে। অথবা কি যে সব ধনবাঢ্য পরিবার, তার বাবা তাকে নিয়েও মনে হয় বেশ একটা খেলায় মেতে গেছে, কত বেশী সুখ সে টুকুনের জন্য এনে দিতে পারে এমন খেলা। টুকুনের ঘরটা হলঘরের মত। নানাবর্ণের দেয়াল। ভিতরে চন্দনের মত গন্ধ। এবং সব সময় কি যেন গীতামাসি স্প্রে করে দিয়ে যায়। বড় বাথরুম। শ্বেতপাথরের দেয়াল। বিখ্যাত সব চিত্রকরদের ছবি। একটা ছবি বনের ভিতর একটা বাঘ। পিছনে শিকারী হাতির পিঠে। বাঘের সঙ্গে দুটো বাচ্চা।

আবার ওর খাটটা মেহগিনি কাঠের। নানারকমের কারুকাজ করা। খাটে সে একা শুয়ে থাকে। এত বড় খাট যে, সে একা শুয়ে কতবার এ-পাশ

ও-পাশ করে কতবার যে অন্য প্রান্তে যেতে চায়— কিন্তু পারে না। সে চুপচাপ কাত হয়ে শুয়ে থাকে। তার পায়ে গীতামাসি আলতা পরিয়ে দেয়। চুল বিনুনি করে বেঁধে দেয়। সে সিল্কের লাল-হলুদ ছোপের ফুল-ফল আঁকা কেমন লুঙ্গির মত একটা পোশাক পরে। ফুল-হাতা সাদা রংয়ের জামা। চোখ কেমন নীল নীল— এবং বুকে সে কোন ধুকপুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে না ভালবাসার জন্য। কেবল সেই নির্বান্ধব ছেলেটির জন্য ওর মায়া। সে এলে হয়তো উঠে বসতে পারত।

এবং এখানে চারপাশে নানা রকমের গণ্ডগোল। গণ্ডগোলের শহরে গণ্ডগোল বাদে কি আর থাকবে। এই সন্ধ্যায় যখন একটা গ্রহাণুতে এক বাতিয়ালা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিচ্ছে, তখন কিনা এই গ্রহের সব সৌন্দর্য হরণ করে নেবার জন্য মানুষ মানুষকে অকারণ মেরে ফেলছে। টুকুন জানালায় দাঁড়িয়ে তার দোতলায় ঘর থেকে দেখতে পেল, চারপাশের সব রাস্তার দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ পাঁচিল টপকে ছুটে আসছে।

দারোয়ানদের ঘরগুলোর পাশে যেখানে লম্বা গ্যারেজ, তার পাশে একটা লোক টপকে এসে কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। সে যেন রাস্তা থেকে প্রাণ বাঁচাতে এসে অন্য একটা ট্র্যাপে পড়ে গেল। পুলিসের লোকগুলো ছুটছে। যাকে পারছে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁচিল টপকে একটা লোক এ-বাড়িতে ঢুকে গেছে, পুলিসের নজর এড়ায় নি। পুলিসও বেশ গোঁফে তা মেরে লাফ মেরে পাঁচিলের এ-পাশে এসেই দেখছে ফাঁকা।

টুকুন চুপচাপ শুয়ে দেখছে আর মজা পাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে— সেই পালানো লোকটা একটা বনকরবীর ডালে বসে আছে। নানা-রকমের লতাপাতায় গাছটা ঢাকা। এবং টুকুন একেবারে অবাক, রক্তের ভিতর তার হাজার ঘোড়া সবেগে ছুটছে, ওর মুখ-চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে, এবং সে কেমন অধির হয়ে যাচ্ছে— সে তার ভিতর আশ্চর্য এক তাজা ভাব, অথবা মানুষের যা হয়ে থাকে, সময়ে সংসারের সব নিয়ম-কানুন সহসা পাল্টে যায়, বোঝানো যায় না এমন কেন হয়, টুকুন কেমন হয়ে যাচ্ছে, টুকুন উঠে বসল খাটে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে কেউ নেই। সে পিছনের দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল। ঘোরানো সিঁড়ি বাগানে নেমে গেছে। মালিরা কেউ নেই। এবং সে এ-সময় পাগলের মত ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে যাচ্ছে। সে কিছু দেখে পেলেছে, সে যে নিজের ভিতর এখন নিজে নেই, অথবা তার এটাই নিজের, একদিন সে একটা মেকি ভয়ে খাটে শুয়ে রয়েছে, এ-মুহূর্তে কোনটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। টুকুন পাগলের মত ম্যাগনেলিয়া ফুলের গাছটা পার হয়ে গেল।

এখন যদি সুরেশবাবু দেখতে পেতেন— অথবা গীতামাসি কিংবা মা, কেউ এ-ঘটনা বিশ্বাসই করতে পারত না। ওদের চোখে এটা কোন ভৌতিক

ব্যাপার হয়ে যেত।

টুকুন এবার গোলাপের বন পার হয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছে পুলিসটা চারদিকে তাকাচ্ছে।

টুকুন এবার বনকরবী গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। পুলিসটা তার দিকে আসছে।

এখন সন্ধ্যা। বাগানে নানারকমের ফ্লুরোসেন্ট বাতি। টুকুন পুলিস আসার আগে ডাকল, সুবল!

সুবল এতক্ষণে লতাপাতার ফাঁকে দেকছে— দিদিমণি। সে প্রায় পাগলের মত নেমে আসছে এবং লাফ দিয়ে ঝুপ করে টুকুনের পায়ের কাছে পড়ল।

—দিদিমণি তুমি!

—তাড়াতাড়ি এস। বলে টুকুন আবার সুবলকে নিয়ে বাগানের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবলের হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ। ব্যাগে কিছু রজনীগন্ধা। তার গন্ধ এখন সুবলের গায়ে। সে এখানে যে ভয়ে ছুটে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। এ-ভাবে একদিন টুকুন দিদিমণিকে আবিষ্কার করতে পারবে ভাবতে পারেনি। অনেকটা গল্প-গাথার মত। এমন সব মেলানো গল্প শেফালীবৌদি তাকে বলত। সে এতটা কখনও আশা করেনি। আশা করেনি বলেই সে কেমন আরও গ্রাম্য সরল বালক হয়ে গেল। নিজের এই আনন্দ সে কিছুতেই হৈ চৈ করে প্রকাশ করতে পারছে না।

টুকুন ওকে যে-ভাবে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে— সে সে ভাবে সেদিকে যাচ্ছে।

টুকুনকে দেখে সুবল বিশ্বাসই করতে পারছে না, এই টুকুন দিদিমণি। খুব বেশী একটা হেঁটে এলে জানালা পর্যন্ত আসতে পারত। সে এতটুকুই দেখেছে। এমন ভাবে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে সে কোনদিন টুকুনকে হাঁটতে দেখেনি। কি সহজ সরল ভাবে ওর হাত ধরে নানারকমের গাছের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টুকুনের পরনে কি সুন্দর পোশাক। কেমন সকালের গোলাপের মত তাজা রং পোশাকের রংয়ে। এবং গোলাপের পাপড়ির মত নরম পোশাক। প্রায় ফ্লুরোসেন্ট বাতির আলো যেন পিছনে পিছনে যাচ্ছে।

পুলিসটা এখন পাঁচিলের এদিকটায় একটা মানুষকে খুঁজছে। পুলিসটার মনে হয়েছে, যারা বোমা ছুঁড়েছিল রাস্তায় তাদের একজন কেউ হবে, কারণ লোকটার হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে বোমা ছুঁড়ে মারা সহজ। প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে বলেই পুলিসটা এখনও ওৎ পেতে আছে। সুবল বাগানের ঝোপজঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেই ধরবে। প্লাস্টিকের ব্যাগে যে রজনীগন্ধার গুচ্ছ থাকতে পারে— কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। ***পুলিসেরা ফুলের কথা বিশ্বাস করে না।***

টুকুন বলল, সুবল তুমি এতদিন আসনি কেন ?

সুবল বলল, টুকুন দিদিমণি, এটা রাজবাড়ি ?

— যা, রাজবাড়ি হতে যাবে কেন ? আমাদের বাড়ি।

— তোমাদের বাড়ি ? এতবড় ফুলের বাগান ! এত ফুল ! টুকুন দিদিমণি, আমি রোজ ফুল তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে। তার এসব দেখে এত আনন্দ হচ্ছে যে সে কি কথা বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। তবু কিছু বলতে হয় বলে যেন বলা, টুকুন দিদিমণি আমি তোমাকে রোজ ফুল বিক্রি করতে করতে খুঁজেছি। শেষদিকে কেমন ভেবেছিলাম তোমাকে আর খুঁজে পাব না। তুমি বাদে আমার তো এ শহরে অঅর কেউ নেই।

টুকুন বলল, সুবল তাড়াতাড়ি এস।

সুবল বলল, এটা কি ফুল গাছ ?

— তোমাকে পরে চেনাব। ঐ দ্যাগো পুলিসটা বাগানের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

সুবল দেখল সত্যি। ওকে দেখে ফেলেছে।

টুকুন বুঝতে পারল পুলিসটার চোখে ওরা ধুলো দিতে পারবে না। কিংবা সুবলকে নিয়ে জানাজানি হলে মা আবার সুবলের এখানে আসা বন্ধ করে দেবেন। এটা বাড়ির দক্ষিণ দিক। মা-বাবা থাকেন পুবের মহলাতে। এই মহলে সে থাকে, আর ভিতরের দিকে থাকে গীতামাসি। ও-পাশে দিয়ে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। কেউ ওর ঘরে উঠে আসতে হলেই সে টের পায় কেউ আসছে। কারণ কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হয়। সেই শব্দ এক দুই করে গুণে গুণে কি যে একটা স্বভাব হয়ে গেছে টুকুনের, কোন শব্দে কে আসে টের পায়। মা উঠে আসছেন, না বাবা, না গীতামাসি, না ডাক্তারবাবু না ইন্দ্র — সে সব টের পায়। পায়ের শব্দ কেউ এক রকমের করে না।

সে এবার দাঁড়াল এবং এটা বোধহয় একটা রক্তকরবীর গাছ। সে বাতির আলোতে ঠিক ধরতে পারছে না। গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সে পুলিসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এবং পুলিস হামাগুড়ি দিয়ে কিছু বনঝোপের মত জায়গা পার হয়ে সামনে দাড়াতেই চোখ মেলে তাকাতে পারল না। একটা ফুলপরীর মত মেয়ে। যেন পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখের পলক ফেলতে পারছে না। কোন দেবী মহিমা টহিমা হবে। সুবল ওপাশে একটা বড় পাথরের স্ট্যাচুর নীচে বসে রয়েছে। ওকে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না।

পুলিসটার মনে হল সে কোথাও কিছু গোলমাল করে ফেলেছে। সে বোধহয় ছুটেই পালাত। কিন্তু সুন্দর গলায় যখন টুকুন বলছে, তুমি এখানে কি চাইছ ? কাকে খুঁজছ ?

— আমি কিছু খুঁজছি না মেমসাব।

টুকুন এমন কথাবার্তা আরও শনেছে। সে অবাক হল না। বলল,

কেউ নেই এখানে।

— কেউ আমার মনে হয় এই বাগানেই লুকিয়ে আছে।

— সে আমাদের সুবল। সে খুব ভাল ছেলে।

পুলিস খুব বোকা বোকা মুখ করে রেখেছে। টুকুন বলল, সুবলের একটা পাখি আছে। সে এক আশ্চর্য পাখি। এমন পাখি আমি কোনদিন দেখিনি।

পুলিস বলল, তাই বুঝি?

টুকুন বলল, সে এসেছে এক খরার দেশ থেকে।

পুলিস বলল, তাই বুঝি?

টুকুন বলল, সে এখন শহরে ফুল বিক্রি করে।

এবং এটুকু বলার পর টুকুন সুবলকে ইশারায় ডাকল। সুবল স্ট্যাচুর ওপাশ থেকে খুব একটা অপরাধী মুখ করে উঠে আসছে।

টুকুন বলল, এই আমাদের সুবল।

সুবল বলল, আমার নাম সুবল।

টুকুন বলল ওর একটা পাখি আছে। সুবলের দিকে তাকিয়ে বলল, সুবল তুমি পাখিটা আজ এনেছ?

— না দিদিমরি।

— কাল সুবল পাখিটা নিয়ে আসবে।

— আসব।

— আর এই দ্যাখো, বলে সুবলের প্লাস্টিকের ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। — দ্যাখো শুধু ফুল আছে। ফুল। সুবল এর ভিতরে ফুল নিয়ে আসে।

— ব্যাগের ভিতর আজকাল কেউ ফুল রাখে জানতাম না মেমসাব।

টুকুন বলল, ব্যাগের ভিতর অনেক কিছু রাখতে পারে। শুধু ফুল থাকবে কেন? সন্দেশ থাকতে পারে, বই থাকতে পারে।

— না আজকাল মেমসাব শুধু ব্যাগের ভিতরে বোমা থাকে। আর আমাদেরও শালা এমন বজ্জাতি বুদ্ধি, ব্যাগ দেখলেই পিছনে ধাওয়া করো। কি আছে না আছে। দেখার দরকার নেই।

টুকুন বলল, তবে তুমি যেতে পার।

পুলিস একটা সেলাম ঠুকে বলল, খুব বেঁচে গেছিস সুবল। মেমসাব দেবতা। তোকে বাঁচিয়ে দিল।

টুকুন বলল, এ-সব কেন বলছো?

— মেমসাব আমাকে তো কাউকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। সুবল না হলে সেটা সফল হতে পারে না।

— বিনা দোষে ধরে নিয়ে যাবে?

— আমাদের শুধু ধরার কাজ। বিচারের কাজ সরকারের।

—তার জন্য যাকে তাকে ? টুকুনের আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না। এখন পুলিসটাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কিছুতেই যেন যেতে চাইছে না। সে বলল, বড় আজগুবি ব্যাপার। আমি যাচ্ছি।

পুলিস আর দাঁড়াল না। সে সুবলের দিকে ভীষণ কটমট করে তাকাল। এটা কি করে আজগুবি হয় সে বুঝতে পারে না। না, এরা একটা আজগুবি দেশে বাস করছে, সংসারে কি ঘটছে ঠিক খবর রাখছে না ? পুলিস যাবার সময় বলল, মেমসাব যাচ্ছি। আমার খুব ভুল হয়ে গেছে।

ভুল হয়ে গেছে বলল এজন্য যে সে জানে বড়লোকদের মেয়েরা এমন হয়ে থাকে। কোথাকার একটা ফুলয়ালার জন্য প্রাণে হাহাকার। এখন ওর সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সে কোথায় যে আর একটা লোক পাবে ! একজনকে ধরে না নিয়ে গেলে বড়বাবু তাকে আস্ত রাখবে না। সে এখন কি যে করে। রাস্তায় তিনজন গেছে। অ্যাম্বুলেন্স এসে ওদের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। যারা গণ্ডগোল করল তাদের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে মরার দায়িত্ব নিতে পারছে না। তা ছাড়া এখন রাস্তায় একটাও লোক নেই। শুধু একটা কুষ্ঠরুগী আছে। তাকে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু অসুখটা বড় খারাপ। একটা খারাপ অসুখের লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া ঠিক না।

এইসব নানারকম ভেবে যখন পাঁচিল টপকে পুলিস রাস্তায় নেমে গেল তখন টুকুন কিছুটা যেন হালকা হল। সে বলল, সুবল এস।

সে সুবলকে নিয়ে এবার নরম ঘাস মাড়িয়ে হাঁটছে। সামনে সেই ঘোরানো সিঁড়ি। টুকুন খুব তর তর করে উঠে যাচ্ছে। সুবল ওর পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। কি সুন্দর আর সতেজ মনে হচ্ছে। পায়ে আলতা। সুবলের বার বার কেন জানি মনে হচ্ছে — নীলকমল লালকমল ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে। সে সব রাজপুত্রেরা বুঝি এমন বাড়িতেই থাকত। এমন একটা প্রাসাদের মত বাড়ি এই শহরে আছে, অথবা এখনও থাকতে পারে — সে সব দেখতে দেখতে কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে। সে বলল টুকুন দিদিমণি আমি যাব কি করে ?

— তোমাকে যেতে হবে না সুবল। তুমি এত বড় বাড়িতে থেকে গেলে কেউ টের পাবে না।

সুবল সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এসেই দেখল সাদা রংয়ের কেমন মসৃণ মেঝে। একেবারে সাদা সবটা। দেয়াল, মেঝে, বারান্দা এমন কি পোশাক নানাবর্ণের যে আছে তাও অধিকাংশ সাদা রংয়ের।

সুবল বলল, আমায় এ-ফুলগুলো তোমার পছন্দ হয় টুকুন দিদিমণি ?

— খুব। বলে সে বুকের কাছে ফুলগুলো তুলে নেবার সময়ই মনে হল, সে তো বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। এখন এমন কি করে হচ্ছে ? এটা কি করে হচ্ছে, কি করে সে এটা করে ফেলল। ওর চোখ বুজে আসছে। সে বলল, সুবল, সুবল তুমি আমাকে ধর। আমি পড়ে যাব।

সুবল দেখল আশ্চর্য মায়া চোখে মেয়ের। ধীরে ধীরে চোখ বুজে ফেলছে। দাঁড়াতে পারছে না। বুকের ওপর ফুলগুলো ধরা আছে। বুঝি পড়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলছে এবং সুবল শুনতে পাচ্ছে, সেই নিঃশব্দ এক ভাষা থেকে সুবল টের পাচ্ছে — টুকুন তাকে ফেলে আর কোথাও যেতে বারণ করছে। এবং টুকুন দিদিমণি যেন পড়ে যাচ্ছিল। সব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিজের অক্ষমতার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পায়ে আর শক্তি পাচ্ছে না টুকুন। কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে।

সুবল ধীরে ধীরে টুকুন দিদিমণিকে শুইয়ে দিয়ে। ফুলগুলি পাশে রেখে দিল। সে পায়ের কাছে বসে থাকল। চোখ মেলে না তাকালে সে এখান থেকে চলে যেতে পারে না।

।। চোদ্দ ।।

তারপর একটা খেলা হয়ে গেল। সংসারে এমন খেলা কে কবে খেলেছে জানা নেই। সুবলকে নিয়ে টুকুন নূতন এক জগৎ সৃষ্টি করে ফেলেছে।

সুবল, টুকুন চোখ মেলে তাকালে বলেছিল, টুকুন তুমি ভাল হয়ে গেছ। টুকুনকে খুব অবুঝ বালিকার মত দেখাচ্ছে। সুবলের টুকুনকে আর দিদিমণি বলতে ইচ্ছা হয় না। কারণ টুকুনকে অসহায় এবং কাতর দেখাচ্ছিল। সে যা করেছে এতক্ষণে, সিঁড়ি ধরে যে নীচে নেমে গেছে, গোলাপগাছগুলোর পাশ দিয়ে সে হেঁটে গেছে, সে কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশ্বাস না করতে পারলে যা হয়, ভিতরের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।

সে বলল, টুকুন তোমার কোন অসুখ নেই। তুমি ভাল হয়ে গেছ।

— তুমি সুবল সত্যি বলছ?

— সত্যি টুকুন। তুমি উঠে বোস। আমি নেমে গেলে দরজা বন্ধ করে দেবে। সুবল এই বলে উঠে এসে রাস্তায় গণ্ডগোল কমেছে কিনা, না আবার কারফিউ দিয়ে দিল — এসব জানার জন্য উদগ্রীব হলে টুকুন বলল, সুবল তুমি কোথায় থাকছ?

— অশ্বিনীনগর স্টেশনে নেমে যেতে হয়।

— এত দূরে চলে গেলে কেন?

— খুব দূর না তো। শিয়ালদা থেকে বিশ মিনিট লাগে।

— তবে তো খুব কাছে।

— খুব কাছে। শুয়ে শুয়ে তোমার কথা বলতে ভাল লাগে টুকুন?

— না।

— তবে উঠে বসছ না কেন? এই দ্যাখো বলে সে বলল, তুমি

রেডিওটা চালিয়ে দাও না।

— কি হবে ?

— কারফিউ দিলে বলে দেবে।

— কারফিউ হলে যাবে কি করে ?

— কিন্তু যাওয়া দরকার। আমি না গেলে বুড়ো মানুষটা ভয়ানক ভাববে।

— বুড়ো মানুষটা তোমাকে বুঝি খুব ভালবাসে ?

— ভালবাসে না ছাই ! কেবল কাজ। কাজ করা। কাজ করলে লোকটা সবাইকে ভালবাসে। কাল আমাদের বনে যাবার কথা আছে।

— কি করবে গিয়ে ?

— সব শুকনো পাতা জড় করব। তারপর যখন সন্ধ্যা হবে, সেই সব শুকনো পাতায় খড়ে আগুন দেব।

— কি মজা !

— খুব মজা। শীতের সময় আগুন দিলে বুড়ো লোকটা বলেছে জীব-জন্তুরা পর্যন্ত সব চলে আসে।

— ওরা আসে কেন ?

— আগুন পোহাতে। একটু থেকে সুবল বলল, তুমি রেডিওটা খুলে দাও, আচ্ছা টুকুন, কেউ আবার চলে আসবে না তো ? কত বড় ঘর তোমার। কেউ চলে এলে কি হবে ?

— চলে এলে কি হবে ?

— কেউ এলে কি হবে সুবল ?

— আমাকে আসতে দেবে না। তোমার মা আমাকে যদি পুলিসে দেয় !

টুকুনের মুখটা সত্যি শুকিয়ে গেল। সে এটা ভাবেনি। না বলে না কয়ে পাঁচিল টপকে সে চলে এসেছে, পুলিসে দিয়ে দিলে যা হোক ওদের একটা কাজ মিলে যাবে।

সুবল বলল, আমি আর আসব না। আমি এতটা ভাবিনি।

টুকুন বলল, আমার পাশের ঘরটায় গীতামাসি থাকে। বিকেলের খাবার দিয়ে সে নীচে নেমে যায়। উঠে এলে টের পাব সুবল। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হবে।

— গীতামাসি তোমার দেখা-শোনা করে ?

— হ্যাঁ। ওকে, দ্যাখো, ঠিক হাত করে নিতে পারব।

— কিন্তু তোমার মাকে টুকুন ?

টুকুন উঠে বসল। যেন একটা পরামর্শ না করলেই নয়। সে বলল, এদিকে এস। সুবলকে নিয়ে ওর বাথরুমের দিকে চলে গেল। ওর দু-পাশে দুটো জলের কল। বড় বড় দুটো থাম। এবং কিছু জালালি কবুতর একসময় কার্নিশে ছাদের অলিন্দে বসবাস করত, তারা এখন কেউ নেই। টুকুনের অসুখ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নাকি উড়ে গেছে। সুবলকে এসব দেখাল টুকুন, বলল সুবল, মা এলে আমরা টের পাব। কোনটা গীতামাসির, কোনটা ডাক্তারবাবুর, সব আমি জানি। ওরা এলে তোমাকে আমি ঠিক লুকিয়ে ফেলব। সে দোতলার অলিন্দে নিয়ে গেল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। সুবলের কাছে এটা প্রায় রাজার দেশ। টুকুন কে রজকন্যার মত। সে যেন এক রাখাল বালক। তার কাছে আছে মৃত-সঞ্জিবনী সুধা। সুধা রসে মেয়েটা এখন নির্ভাবনায় হাঁটছে। সুবলের আছে এক ভালবাসার জাদুমন্ত্র, অথবা সুবলকে নিয়ে হেঁটে এই যে ঘরে পর ঘর, নানাবর্ণের ছবি, এবং সব বিচিত্রবর্ণের কারুকাজ করা খাট-পালঙ্ক পার হয়ে যাচ্ছে— এ যেন তার কাছে ভারি মজার। যেন হাজার হাজার দৈত্য আসবে সুবলকে তুলে নিতে। টুকুনের কাছে আছে দৈত্যের প্রাণ। কোথায় ওরা দাঁড়িয়ে পাখিটার পাখিটার পাখা পা এবং গলা ছিঁড়বে তার যেন একটা পরামর্শ চলেছে।

এসব হলেই মেয়ের মনে হয় না তার কোন অসুখ আছে। এসব হলেই মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে অনেক সুখ। এক অপার অভাববোধ এই বালকের জন্য। সংসারে ছেলেটি যত অপাংক্তেয়, তত টুকুনের কাছে সে মহার্ঘ্য। টুকুন আনন্দে, কারণ যখন প্রায় সব ঠিক হয়ে গেল তখন আনন্দে প্রায় ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। বলল সুবল তোমাকে এখানে আসার একটা সুন্দর রাস্তা দেখিয়ে দেব। তুমি ফুল বিক্রি করে রোজ এখানে আসবে। আমি কি সুন্দর ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প পড়ে রেখেছি। তুমি আসবে বলে বসেছিলাম। তুমি না এলে কাকে আর আমার গল্প শোনাব।

কাঠের সিঁড়ির মুখের দরজাটা টুকুন বন্ধ কর দিল। কি বড় বড় শার্সির নীল রংয়ের দরজা। টুকুন অনায়াসে টেনে টেনে বন্ধ করে দিচ্ছে। সুবল ওকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে সাহায্য করলে সে বলল, আমি পারব সুবল। বলে হাসল।

সুবল যেতে যেতে বলল, এটা কি ?

— এটা পিয়ানো। বলেই টুকুন দুহাতে ঝম ঝম করে বাজাতে থাকল। কতদিন থেকে পিয়ানোটা কেউ বাজায় না। না, ইন্দ্র মাঝে দু'একদিন বাজিয়েছে। যখন টুকুন শুয়ে থাকে মা কখনও বাজান। লম্বা একটা খাতা পিয়ানোর ওপর। সুবল দেখল, কেমন গোটা ঘরটা ঝম ঝম করে উঠছে। এবং ক'টা চড়াইপাখি ঝাড়-লণ্ঠনে বসেছিল, পিয়ানো বাজালে পাখিগুলো উড়ে উড়ে বাগানের ভিতর চলে গেল।

সুবল দেখছে— কি সুন্দর বাজাচ্ছে। এমন একটা সুন্দর বাজনা পৃথিবীতে আছে তার যেন জানা ছিল না। চুলগুলো বব্ করা টুকুনের। বিনুনি বাঁধা নয়। হাতের আঙুলগুলো চাঁপা ফুলের মত। পায়ে আলতা আছে বলে খুব সুন্দর লাগছে। এবং সে পাজামার মত একটা নরম পাপড়ির মত কোমল পোশাক পরে আছে, আর লম্বা, টুকুন প্রায় তার মত লম্বা। সে বয়সানুপাতে

লম্বা হয়ে যাচ্ছে। সে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেল। কারণ বড় বড় দুটো আয়না, পৃথিবীতে এত বড় আয়না দিয়ে কি হয় সে জানে না। গোটা ঘরের প্রতিবিম্ব এখন এই আয়নার ভিতর। সে তন্ময় হয়ে টুকুন দিদিমণির পিয়ানো বাজনা শুনছে।

আর তখন কাঠের সিঁড়ির মুখে কারা উঠে আসছে যেন। ওরা দুজনে এত বেশী গভীরে ডুবে আছে যে কেউ টের পায়নি, অথবা শুনতে পাচ্ছে না সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির সবাই ছুটে আসছে এদিকে। কারণ অসময়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

আশ্চর্য এক মেলডি ভেসে বেড়াচ্ছে বাড়িময়।

সুবলেরই প্রথম মনে হল দরজায় কারা আঘাত করছে। সে টুকুনকে ঠেলে দিয়ে বলল, টুকুন কারা দরজায় ধাক্কা মারছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত ব্যাপারটা হয়ে গেল। টুকুন বাজানো বন্ধ করে দিল। সুবল লুকিয়ে পড়ল টুকুনের খাটের নীচে। তারপর খুব সহাস্যে দরজা খুলে দিলে দেখল সবাই, টুকুন দরজা খুলে দিচ্ছে। ওরা হাসবে না কাঁদবে স্থির করতে পারছে না। মা বললে টুকুন তুমি পিয়ানো বাজাচ্ছিলে?

— হ্যাঁ মা।

— সত্যি?

— হ্যাঁ মা।

টুকুনের মা টুকুনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। সে বলল, তুমি আর একবার বাজাবে?

— এক্ষুনি?

— তোমার বাবা এলে তাকে বাজিয়ে শোনাও না। তিনি খুব আনন্দ পাবেন।

— বাবা আসুক।

— আমি জানি টুকুন ঠিক একদিন ভাল হয়ে যাবে।

গীতামাসি বলল, কোথাকার একটা রাস্তার ছেলেকে ধরে আনতে যাচ্ছিলেন বড়বাবু।

মা বলল, আজকালকার ডাক্তারও হয়েছে তেমন। তারপর কি ভেবে বলল, একবার ইন্দ্রকে ডাকো না?

— সে তো নেই দিদিমণি!

— কোথায় গেল?

— সে তো এসময়ে ক্লাবে রোয়িং করতে যায়।

মার এবার মনে হল সত্যি ইন্দ্র রোয়িং করতে যায়। ইন্দ্রকে খুশী রাখার জন্য মা-র যে কি করার ইচ্ছা। কারণ এখানে বসে থাকতে চায় না ইন্দ্র। আজ ইন্দ্র এলে খুব খুশী হবে।

টুকুন এখন চাইছে সবাই চলে যাক। কিন্তু সে যে কেন পিয়ানো

বাজাতে গেল! সবাই এখন এটা গল্প-গাথার মত ব্যবহার করবে। সবাই ছুটে আসবে। এখন যে-ভাবে হোক সুবলকে বের করে দিতে হবে। ওর ভিতরে সুবলের জন্য একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে। এবং নানাভাবে সে চিন্তা করছে। কি করলে যে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সবাই এসে টুকুনকে দেখে যাচ্ছে। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে এখন আবার সাদা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে ভাবল। কেবল সুবলের জন্য সে শুয়ে পড়তে পারছে না। খাটের নীচে একবার উঁকি দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ওদিকে কেউ গেলে পা দেখে ফেলবে। এবং এইসব সমস্যা অথবা তাড়না তাকে এখন বড় বেশী স্বাভাবিক করে রেখেছে।

সে বলল, মা আমার আবার ভাল লাগছে না কেন জানি। আমার ঘুম পাচ্ছে।

গীতামাসি যারা সবাই চাকর এবং অন্যান্য সব পরিজন এসেছিল তাদের চলে যেতে বলল। গীতামাসির কাজ এখন কত বেড়ে গেছে এমন ভাব। সে বলল, দিদিমণি, টুকুন এবার ঠিক বড় হয়ে যাবে।

এ-ছাড়া টুকুনের মার কত সব পরিকল্পানা এবং মনের ভিতর এখনও ভয়টা কাটছে না। টুকুন এ-ভাবে আরও দু'একবার খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছিল। অবশ্য প্রতিবারই পাখিয়ালা সুবল ছিল কাছে। এবার সে নেই। কিন্তু এমন ম্যাজিকের মত ব্যাপারটা ঘটবে আশা করতে পারেনি।

মা বলল, টুকুন আমি তোমার জন্য একজন পিয়ানো শিক্ষক দেব।

টুকুন বলল, আমি শোব মা। আর বসে থাকতে পারছি না।

গীতামাসি টুকুনকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিচ্ছেন।

মা বলল, এটা কি করছ গীতা?

গীতামাসি বলল, টুকুন আবার আগের টুকুন হয়ে যাচ্ছে।

খাটের নীচে যেই না শুনতে পেল সুবল, টুকুন আবার আগের টুকুন হয়ে যাচ্ছে, সে বোধহয় জোরজার করে উঠেই আসত — কেবল টুকুন চাদরটা একটু ফেলে দিয়ে ওকে একদিকে ভাল করে আড়াল করে দিচ্ছে। অন্যদিকে ওর আগের মত চোখ-মুখ হলে কেউ আর বেশীক্ষণ এখানে থাকতে চাইবে না।

টুকুন শুয়ে পড়লে মা বলল, তুমি যে বলেছিলে, বাবা এলে বাজাবে?

— কাল বাজাব মা। খুব দুর্বল লাগছে।

— তা ঠিক। একদিনে বেশী ভাল না। তুমি বরং একটু শুয়ে থাক। বাবা এলে আমরা আসব।

মা চলে গেলে গীতামাসি বলল, টুকুন এখন তোমার দুধ, একটা আপেল, দুটো সন্দেশ খাবার সময়। বের করে দিচ্ছি।

— কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। তুমি মাসি দরজাটা ভেজিয়ে দাও না।

দরজা ভেজানো কথা উঠলেই মাসি উঠে পড়বে। কারণ একা কথা না বলে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। নিজের ঘরে গিয়ে বেশ পান-দোক্তা খেয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে গেলে, নীচ থেকে যারা উঠে আসে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা যায়।

গীতামসি বলল, কিন্তু এখন, তো তোমার এ-সব খাবার সময়।

টুকুন বুঝতে পারল, না-খাইয়ে ছাড়বে না। সে বলল, তুমি রেখে যাও, আমি ঠিক খেয়ে নেব।

— অন্যদিন আমার সামনে তুমি খাও। আজ কেন এমন বলছ?

— আজ তোমার সামনে খাব না। কিছুতেই না।

টুকুনের জিদ উঠলে একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। সেজন্য ভয়ে ভয়ে গীতামাসি বাইরে বের হয়ে এলে সে নিজে উঠে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। ডাকল, সুবল বাইরে এস। ওরা সবাই চলে গেছে।

সুবল বের হয়ে এলে টুকুন বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস।

সুবল বলল, আমার ফুলের থলেটা দেখছি না।

— ওটা আমি ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছি। তুমি যে কি বোকা না! ওটা দেখলে ওরা বলত না, এই থলেটা কার, কি করে এমন একটা বিশ্রী থলে এখানে আসতে পারে। দরকার পড়লে ডিটেকটিভ লাগিয়ে দিত।

সুবল শহরের অনেক ব্যাপার যেমন ঠিক বোঝে না, তেমনি ডিটেকটিভ কথাটাও বুঝতে পারল না। সে বলল, ডিটেকটিভ কি টুকুন?

— ওরা চোর গুণ্ডা বদমাস ধরে বেড়ায়। কেউ যদি খুন হয়, কে খুনটা করেছে তাকে খুঁজে বের করে।

— আমার সামান্য থলেটার জন্য এতবড় একটা ব্যাপার তবে ঘটে যেতে পারে।

— সুবল তুমি জান না, এটা যে কি অসামান্য অপরাধ! আমার মা-র চোখ দেখলে সব টের পাই সুবল।

ওরা বাথরুমে ঢুকলেই সুবল বলল, জল দেখলেই চান করতে ইচ্ছা হয় টুকুন। বাঃ কি মজা! পাতাল থেকে ফোয়ারার মত জল উঠে আসে কি মজা প্রথম প্রথম ভাবতাম। খরা অঞ্চল থেকে আসার পর, দিনে কতবার যে রাস্তার কলে চান করতাম।

— তুমি চান করে নেবে?

— তোমার চানের ঘরটায় কি সুন্দর গন্ধ। মারবেল পাথরে কারুকাজ করা সব পাথরের দেয়াল — কি মসৃণ! সুবল দেয়ালের গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে কি যেন দেখছে। ভীষণ মসৃণ। হাত পিছলে পিছলে যাচ্ছে। নানারকম গন্ধ সাবান। তেল। স্যামপু সব। এসব সে ঠিক চেনে না, কি দিয়ে কি হয়, এবং মনে হয় সবলের শরীরে ঘামের গন্ধ টুকুন সুবলকে হাত ধোয়ার জন্য বাথরুমে নিয়ে এসেছিল। যা খাবার আছে সে সুবলকে খেতে দেবে। কিন্তু

এখানে এসে সুবলের যে কি হয়ে গেল — সে চান না করে খাচ্ছে না। সে খুব পরিশ্রম করে — তার চোখে মুখে আশ্চর্য দৃঢ়তা। টুকুন এসব দেখে ভাবল, চান করে নিলে তাকে আরও বেশী তাজা দেখাবে।

টুকুন বলল, সুবল তুমি চান করবে?

— মন্দ হয় না, টুকুন।

টুকুন শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে এভাবে জল পড়বে। বাথরুমের সব বুঝিয়ে দিয়ে বলল, তুমি চান করে নাও। বাইরে আমি দাঁড়াচ্ছি। সুবল বলল, টুকুন, আমি দরজা বন্ধ করে দেব।

টুকুন দরজা বন্ধ করার কারণ খুঁজে পেল না। সুবল তো তার কাছে ছোট্ট এক বালক বাদে আর কিছু না। সে তো সেই যেন দুই শিশু নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে কোন জামাকাপড় নেই। কেবল ওরা ছুটছে।

টুকুন বলল, আমাকে তোমার লজ্জা কি?

সুবল বুঝতে পারল টুকুন দিদিমরি এখনও স্বাভাবিক নয়। সে বাথরুমের দরজাটা খোলাই রাখল। সে একটা তোয়ালে পরে নিয়ে জামা পাজামা পাশের ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখল।

টুকুন বেশ মনোরম চোখে দেখছে। সুবলের কি সুন্দর হাত। পুষ্ট বাহু। এবং পিঠের শক্ত কাঁধ খুব মজবুত। সে কলের নীচে বসে গায়ে মাথায় সাবান মাখছে। বস্তুত সুবলেরও একটা অসুখ হয়ে গিয়েছিল — সে খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে এখন কলকাতা নগরীতে এত প্রাচুর্য বিশেষ করে জলের — ভাবা যায় না। সে এখনও ফাঁক পেলে যেখানে সেখানে চান করে নেয়। শরীরে ওর কি যে গরম বেঁধেছে কিছুতেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না। সে এখানে এসেও এই লোভ সামলাতে পারেনি।

টুকুন বলল, আমি তোমাকে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছি।

সুবল জানে, টুকুনের কোন ইচ্ছাকে অবহেলা করতে নেই। টুকুন কত বড়, কত বড় বাড়ির মেয়ে, টুকুন যা বলবে তাকে এখন তাই করতে হবে। সে এভাবেই বুঝে ফেলেছে, এর ভিতর কে নতুন প্রাণের সাড়া দেখা দিচ্ছে। এখন কিছুতেই সেখানে ভাঁটার টান আনলে চলবে না। সে বলল, টুকুন তুমি করতে পারবে?

— বা রে পারব না কেন?

— আমার বিশ্বাস হয় না টুকুন — সেই রাজার ঘোড়ার চড়ে যাবার কথা মনে আছে? হরিণ ধরতে যাচ্ছে রাজা। হরিণ প্রাণের ভয়ে ছুটছে। রাজা, ঘোড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে দিচেছ। পাথরে পাথরে ঘসা লেগে ঘোড়ার খুরে আগুন লেগে গেছে।

— সত্যি কি সুন্দর হরিণ না। টুকুন সুবলের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কি সুন্দর মজবুত সুবল। টুকুন জল ঢেলে বলল, আমিও চান করব। সে বলল, আমাকে সাবানটা দাও। সে একেবারে শিশুর মত জলের

নীচে খেলা করতে থাকল। সুবলও কখন এমন হয়ে গেছে। ওরা দুজনে গল্প করছিল— পাশের ওদিকটায় যে দরজা বন্ধ আছে এবং কেউ আর এদিকটায় আসতে পারবে না ওরা জানে।

এবং এভাবে কি হয়ে যায়। সুবল স্নানের সময় শরীর থেকে সব জল শুষে নিতে গিয়ে দেখল, তোয়ালেটা কি করে কখন শরীর থেকে খসে পড়ে গেছে। সে তোয়ালে ব্যবহারের নিয়মকানুন ঠিক জানে না। আর টুকুন ওকে অপলক দেখছে। স্থির। চোখে বিস্ময়ে। সে, টুকুনের এমন চেহারা দেখে একেবারে ফ্রিজ হয়ে গেছে। দুজনেই দুদিকে একটা ফ্রিজ শটের মত। সুবলের যেন মুহূর্তের জন্য কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

।। পনেরো ।।

সুবল চলে যাবার পর গোটা ব্যাপারটা টুকুনের মাথায় কেমন একটা অদ্ভুত নেশা ধরিয়ে দিল। সে ভিতরে ভিতরে ভীষণ একটা অভাবের কথা ধরতে পারছে। সে সংসারে খুব একা— পৃথিবীতে যে মৃত্যু এবং গ্রহাণুতে চলে যাওয়া বাদে অন্য কিছু আছে তার জানা ছিল না। সে এটা যে কি দেখে ফেলল। ওর চোখ বুজে আসছে। সুবল আবার কখন আসবে— শুধু প্রতীক্ষা।

ওর চোখে এখন কিছুটা স্বপ্নের মত ঘটনাটা ঝুলে আছে। এক আশ্চর্য মহিমাময় শরীর সুবলের। এবং শরীরের সর্বত্র এক কঠিন মানুষ, কি শক্ত, অথচ ভারি কোমল, লাবণ্যে ভরা, লম্বা সুবল, যার শিশুর মত সরল মুখ এখন আরও সুন্দর মনে হচ্ছে। সে একটা মানুষের শরীর, এবং শরীরের সবটা একসঙ্গে এভাবে কখনও দেখতে পায়নি।

ওর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বাবা এঘরে কিছুক্ষণ এসে বসে থেকে গেছেন। নানারকম প্রশ্ন করেছেন। বলেছেন, টুকুন তুমি আমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে না ? ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনিও শুনতে চান।

টুকুন কেবল বলছিল, বাবা আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। সে ইচ্ছা করেই হাই তুলছে। বলছে, আমাকে তোমরা আর কষ্ট দিও না।

রাতে গীতামাসি একটা কম আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আলোটার রং কেমন তামাটে। এবং এই আলোটা না জ্বালালে, অন্যদিন টুকুনের ঘুম আসতে না। আজ অন্যরকমের। সে গীতামাসিকে বলেছে— সবুজ আলোটা জ্বালিয়ে দেবে ?

—সবুজ আলো জ্বালালে তুমি তো ঘুমাতে পার না।

—তুমি দাও গীতামাসি। তামাটে রং আমার আজ ভাল লাগবে না।

টুকুন গীতামাসিকে আরও বলেছিল, এই দ্যাখ আমার বালিশের নীচে

কিছু রজনীগন্ধা আছে। ওগুলো রূপোর ফুলদানিতে রেখে আমার মাথার কাছে রেখে দাও। আমার চারপাশে আরও কিছু রাখ, যাতে আমাকে আরও সুন্দর দেখায়। শেষপর্যন্ত 'আমাকে সুন্দর দেখায়' সে বলতে পারেনি। কেমন লজ্জা এসে গেছিল। তার এমন একটা অনুভূতি এতদিন কোথায় যে ছিল! ওর শির শির করছে শরীরটা। এবং চাদর দিয়ে গোটা শরীরটা ঢেকে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে। এটা যে কি হয়ে যাচ্ছে ভিতরে। ওর জল-তেষ্টা পাচ্ছে। সে টিপয় থেকে হাতির দাঁতের মিনা করা জলদানি তুলে জল খেল। তার হাত কাঁপছে। ঠোঁট কাঁপছে। ভিতরে কিসের যেন ঝড়। যেন কোথাও বাদলা দিনে সে বৃষ্টি-ভিজে এক মড় মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। ওর পায়ে সবুজ ঘাসের চিহ্ন। ওর চোখে-মুখে বৃষ্টির ছাট। পরনে সাদা সিল্ক লতা-পাতা আঁকা নীল রংয়ের পালিশ। নখগুলো কিছুটা লম্বা, কিছুটা উজ্জ্বল, সে হাতের ওপর হাত রেখে নিজের সুন্দর হাত পা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। সে আর টুকুন থাকছে না। সে কল্যাণী হয়ে যাচ্ছে। সে কল্যাণী মজুমদার হয়ে যাচ্ছে। সে তার ভাল নামটা অথবা বড় হয়ে যে নামটা ব্যবহার করার কথা, কতদিন পরে মনে করতে পারছে।

টুকুন পাশ ফিরে শুলো। সেই গ্রহাণুর ছোট্ট রাজপুত্রের কথা কিছুতেই মনে আসছে না। অথবা সেই মরুভূমির কথা। মরুভূমিতে যদি সেই মানুষটা এখনও তার উড়ো জাহাজটা ঠিক করে উঠতে না পারে — তার খুব কষ্ট। তার বাড়ি-ঘর, যদি তার স্ত্রী থাকে — খুব একটা কষ্টের ব্যাপার — সে এখন কেবল এসব মনে করতে পারছে।

ওর আঙুলে রক্তের তাজা একটা ভাব জেগে যাচ্ছে। সে এই শরীরে মনোরম এক স্বপ্ন নিয়ে শুয়ে আছে।

সুবল আর তার কাছে এখন শুধু পাখিয়ালা নয়। সে একজন মানুষ। ওর শরীরে এক সুন্দর রাজপুত্রের বাস। সে টের পেয়েছে — এই শরীরে ঈশ্বর এমন কিছু দিয়েছেন যার সৌরভ মানুষকে বড় করে তোলে। মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়। তার কাছে এই অর্থটার মানে জানা ছিল না। সুবল আজ তাকে কি যে করে দিয়ে গেল।

সুবল, সুবল এক মানুষ, লম্বা, কালো চুল, চোখ লম্বা, নাক সামান্য চাপা। ওর ঘাড় শক্ত। পিঠ চওড়া। বুকের পাশের দুভাগ এবং দুই হাতের নীচে সামান্য বনরাজি নীলা। সে যখন স্নান করছিল — সেইসব কারুকাজ করা সুন্দর সুদৃশ্য এক শরীরে কি যে সব আকর্ষণের খাঁজ রেখে দিয়েছে।

সে একটা তাজা সিংহের ছবি একবার তুলেছিল ক্যামেরাতে। ছবিটা তার দেখতে খুব ভাল লাগত। সেই তাজা সিংহের সঙ্গে সুবলের শরীরের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

টুকুনের চুল জামা, পাজামা ভিজা। টুকুনকে কোথাও মেয়ে মনে হয় না। শুধু মুখে মেয়ের মত নরম এক ছবি। যা খুব কষ্টের আর দুঃখের মনে

হচ্ছিল।

কোথাও ঘন্টা বাজছে। রাত এখন বারোটা। কোথাও রেলগাড়ির শব্দ। না, সে নিজেই ভিতরই এক রেলগাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। গাড়িটা তাকে নিয়ে ছুটছে। গাড়িতে সে এবং সুবল। এক সাদা জ্যোৎস্নায় তার সুবলের হাত ধরে বেড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রর কথা মনে হল। কাল ইন্দ্র এলে সে আর ঠিকমত বুঝি কথা বলতে পারবে না।

গীতামাসি এসে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি শোও।

— তুমি শুয়ে পড়োগে ?

— বড় বাবু কি বললেন ?

বাবা বললেন, টুকুন এবার তুমি সত্যি ভাল হয়ে গেছ।

ওরা কেউ বেশীক্ষণ ছিল না। এমন একটা উত্তেজনার ভিতর বেশী সময় টুকুনকে বিরক্ত করা ঠিক না। বাড়ি থেকে চারপাশে সব মানুষের কাছে খবর পেঁছে যাচ্চে টুকুন ভাল হয়ে গেছে। টুকুন কতকাল পরে পিয়ানো বাজিয়েছে। টুকুনের রক্তকণিকারা আবার উদ্যমশীল হচ্ছে।

এইভাবে এই সংসারে কোথাও কখন কি-ভাবে যে খরা লেগে যায়। সেটা কখনও মানুষের শরীরে, প্রকৃতির ভিতর এবং কলকারখানায় হতে পারে। সুরেশবাবু জানেন, চারপাশে যে এত ঘেরাও লকআউট এবং শ্রমিকেরা নিজেদের দাবী সম্পর্কে সচেতন — অথচ কাজ হচ্ছে না, উদ্যমশীল না হলে যা হয়ে থাকে, একটা জাতি মরে যাচ্ছে।

তিনি বেশীক্ষণ ছিলেন না। মা-মাসিরা কি যে কলরব করে গেছে! গীতামাসি বলেছে, ওর শরীর খারাপ করবে। টুকুন এত ভিড় সহ্য করতে পারবে না। আবার কেউ কেউ ভাবছে, টুকুনের তো এমন নাকি আরো দুবার তিনবার হয়েছে। সুতরাং খুব একটা আশা করা ভাল না।

গীতামাসি বলল, টুকুন না ঘুমালে শরীর আবার খারাপ করবে।

— আমার ঘুম আসছে না গীতামাসি। সে দেখল পায়ের হাঁটুর ওপর ওর ফ্রক উঠে গেছে। সে তাড়াতাড়ি শরীর ঢেকে দিতে গেল। এই হাটু এই বয়সে বের হয়ে থাকা কেমন সঙ্কোচের। সে বলল, আমি শাড়ি পরব গীতামাসি।

— কাল থেকে পরবে।

— না। আমি এখন পরব।

জিদ ঠিক আছে। গীতামাসি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। তবু কিছু বলার উপায় নেই। শাড়ি এলে টুকুন বলল, দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। তুমি যাও গীতামাসি। সে গীতামাসিকে যেন জোরজার করেই বের করে দিল। রেডিওটা খুলে দিল। ছায়াছবির গান হচ্ছে। সে প্রতিটি গানের সঙ্গে এখন গলা মেলাচ্ছে। সে ঘরেই আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার কোন কষ্ট হচ্ছে না হাঁটতে। সে যে কি করে শরীরে এমন শকিত পাচ্ছে! এবং কখনও কখনও

যেন মনে হয় সে একটা হালকা পাখির মত এখন এই ঘরে গানের সুরের সঙ্গে ভেসে বেড়াতে পারে।

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখল। কতদিন পর সে আয়নার সামনে যেন দাঁড়াল। এতবড় আয়নায় সে কবে থেকে নিজের মুখ দেখতে ভুলে গেছিল। সহসা যেন মনে পড়ছে— মুখ না দেখলে, আয়নায় মুখ না দেখলে, কি করে বড় হয়ে যাচ্ছে বোঝা যাবে না।

সে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখল। ধীরে ধীরে সবুজ হালকা ফ্রকটা খুলে ফেলতে থাকল। শরীরে মাংস লাগতে চায় না। তবু সে বুকে হাত রাখল। ধীরে ধীরে হাত বুলাল। ওর কেন জানি কান্না পাচ্ছে। কেন জানি শরীরের ভিতর আশ্চর্য যে চেতনা নিয়ে বড় হবে স্বপ্ন দেখছে, সেখানে তার কিছু জন্ম নিচ্ছে না। যেন এখন থেকে সে প্রতিদিন এ-ভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেবল অপেক্ষা করা এবং স্মৃতি, কি যে স্মৃতি মানুষের— সুবল তার কাছে একটা প্রথম আদিম মানুষ, যে মানুষের আদিমতা নিয়ে সোজা সহজভাবে তাকিয়েছিল। এবং দৃশ্যটা ভাবতে কি যে ভাল লাগছে! সে যেন এমন একটা দৃশ্য ভেবে ভেবে সারারাত ভোর করে দেবে। হয়তো সকালে ফুল ফোটার মত দেখবে, সে—ও শরীরের ভিতর ক্রমে ফুটে উঠছে। ওর ভীষণ ভাল লাগছে এভাবে ভাবতে!

এবং এসব ভাবনাই মেয়েকে এক সকালে সত্যি সত্যি বড় করে দিল। সে আয়নায় দাঁড়িয়ে এ-সব কি দেখছে! সে যে বড় হচ্ছে তার প্রমাণ শরীরে ভেসে উঠছে। কতকালের রাত জাগা, অথবা সুবল এলে ওকে নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে এই হলঘরের মত ঘরে অথবা দক্ষিণের বারান্দায় এবং কথা আছে সে যখন গান গাইবে, অথবা পিয়ানো বাজাবে, কিংবা রেডিওর গানের সঙ্গে গলা মেলাবে— তখন এই ঘরে কেউ থাকবে না। সে ওর খুশী মত সুবলকে নিয়ে এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ তৈরী করেছে— যা সে কোনদিন ভুলে যেতে পারবে না। ইন্দ্র আসে ঠিক, তবু ইন্দ্র এলে সে কেমন উদাসীন হয়ে যায়। কারণ ইন্দ্রের স্বভাবটা কিছুটা কেন জানি আজকাল মেয়েলী মনে হচ্ছে। বরং এই সুবল যার কিছুটা সন্ন্যাসী তরুণের মত মুখ, যে খুব সৎ এবং যে সব সময় নিজের মত করে ভাবে— যে ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প শুনে হেসেছিল, বলেছিল— সে আর তার গ্রহাণুতে ফিরে যেতে পারবে না। পৃথিবীর গাছ পাখি ফুল ফল এমন সে আর পাবে কোথায়। কেউ এখানে এলে আর কোথাও যেতে চায় না। বড় মায়া আর ভালোবাসায় পৃথিবী মানুষকে আটকে রাখে। টুকুনের মনে হয়েছিল, সুবলই তার সেই ছোট্ট রাজপুত্র। তাকে বাদ দিয়ে সে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। সুবল তার ছোট্ট গ্রহাণুতে আর ফিরে যেতে পারবে না।

।। ষোল ।।

একটা বাওবাব গাছের বড় দরকার সুবলের, এমন মনে হ'লে — চারপাশে যা কিছু, যেমন একটা নদী আছে, নদীর পারে বন আছে আর এ পারে আছে ফুলের উপত্যকা, এর ভিতর বাওবাবের চারা লাগিয়ে দিলে বেশ একটা সুন্দর পৃথিবী সে গড়ে তুলতে পারত, এবং এমন উপত্যকায় একদিন ওর ভারি ইচ্ছা টুকুনকে নিয়ে আসবে। সে আর টুকুন। বুড়ো মানুষটা আজকাল আর ঘর থেকে বের হতে পারে না। সুবল তার জন্য সুন্দর টালির ঘর করে দিয়েছে। লাল টালি, মাটির দেয়াল, দেয়ালে নানা রকমের কারুকাজ, ফুলফল লতাপাতা সব ছবিতে আঁকা।

বুড়ো মানুষটা চলাফেরা তেমন আজকাল করতে পারে না বলে, সে তার জন্য আর বুড়ো মানুষটার জন্য রান্না করে। নামাজের সময় হলে সে মনে করিয়ে দেয় — এখন তোমার কর্তা জহোরের নামাজ। বুড়ো মানুষটা চোখে আজকাল ভাল দেখতে পায় না। কোথাকার কে সুবল এসে এখন এই ফুলের উপত্যকায় রাজা হয়ে গেল প্রায়। সে সুবলকে সব দিয়ে যাচ্ছে। কারণ বুড়ো মানুষটার তো কেউ নেি। সে সুবলকে সব দিয়ে যেতে পেরেছে বলে ভীষণ খুশী। এমন ভাবে সে হাল্কা হতে পারবে কখনও ভাবতেই পারেনি। বড় চিন্তা ছিল তার, এমন সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা কাকে দিয়ে যাবে। ওর তো কেউ নেই। যারা আছে তারা সব ফুলের দালাল। কি লোভ বেটাদের। এসেই একটা বড় রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলত — তা মিঞা, তুমি এমন একটা কাজ করলে কি করে!

— কি করে আবার? পরিশ্রম করে?

— শুধু পরিশ্রমে হয়?

— কেন হবে না?

— হয় না মিঞা।

তারপর সে থেমে একটু কি ভাবত, তারপর বলত, হ্যাঁ, আর আছে অহঙ্কার। আমার হাতের অহঙ্কার। আল্লা আমার সঙ্গে আমার অহঙ্কারের জন্ম দিয়েছেন।

সে ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলে বুড়ো মানুষটা বলত, আমি চাই আমার মত এমন ফুলের চাষ কেউ আর করতে পারবে না। দিনমান খেটে, রাতে নদী থেকে জল এনে, রাতে কখনও বনে পাহাড়ে সব পাতা পুড়িয়ে এমন সব সার তৈরী করতাম — ভেবে অবাক হবে, সে সার না দিলে — ফুল কখনও এমন বড় হয় না। একটু থেমে সে ফুলের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। তারপর বলত, আমি চাই না দুনিয়ায় আমার চেয়ে কেউ বেশী ফুলের চাষ ভাল জানুক।

সুবলের সঙ্গে সুখে দুঃখে ইমানদার মানুষটা এমন বলত। — আমার

একটা লোভই আছে সুবল, কেবল জমি কিনে ফুলের চাষ বাড়িয়ে যাওয়া।

বুড়ো লোকটা আরও সব গল্প করত ওর সঙ্গে। সে ফিরে যখন বন থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে রাতের আহার তৈরী করত— তখন বুড়ো মানুষটার গল্প আরম্ভ হত। কারণ সে চোখে দেখতে পায় না বলে, রাজ্যের সব গল্প মনে করতে পারে। সুবলকে সে সব দিয়ে দেবার পরই কেমন আরও বেশী বুড়ো হয়ে গেল। সুবল যাদের নিয়ে চাষবাস বাড়াচ্ছে তাদের সন্ধ্যা হলেই ছুটি দিয়ে দেয় বলে, জায়গাটা কেমন আরও বেশী নির্জন হয়ে যায়। নদীতে কখনও নৌকার লগির শব্দ কানে আসে । বৈঠা মেরে কেউ হয়ত গান গেয়ে চলে যায়। আর সূর্যাস্ত হলে যখন হাতপা ধোবার জল এনে দেয় টিউকল থেকে বুড়ো মানুষটা কেমন আন্দাজে গল্প আরম্ভ করে দেয়। নীচে যে সব ঘাসের চটান আছে তার একপাশে সুবল রান্না আরম্ভ করে দেয়। খুব সোজা রান্না। নদী থেকে মাছ আসে। বুড়ো মানুষটা চাপিলা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। বিকেলে সেই মানুষটা এসে বেশ কটা বড় মাছ রেখে দিলে আন্দাজে হাত দিয়ে টের পায় মাছগুলো খেতে খুব ভাল লাগবে।

বুড়ো মানুষটার সামনে একটা হ্যারিকেন জ্বালা থাকে। মাদুরে সে বসে থাকে। পা দুটো তার ভাঁজ করা। মাথায় সাদা কাপড়ের টুপি। নানা রকমের কারুকাজ করা আছে টুপিতে। খুব সূক্ষ্ম সূতোর কাজ। সুবল ওর লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, টুপি, রোজ ধুয়ে রাখে। খুব সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার সখ এই মানুষটার, যেমন সে ভাবে এই সরল পৃথিবীতে আল্লা অথবা ভগবান যেই হোক না সব কিছু রেখে দিয়েছেন মানুষের জন্য। মানুষ সেটা পরিশ্রম করে পাবে। ওর খুব ভাবতে কষ্ট হয়, সে কিছু এখন আর করতে পারে না। কাজ না করলে ঈশ্বর চিন্তা হয়। মাঝে মাঝে সে যখন এমন ভাবে তখন তার হাই ওঠে। সুবলের মাছের ঝোল টগবগ করে ফুটছে। সে সুন্দর কালোজিরে সান্তরে বেগুন দিয়ে জিরে লঙ্কার কেমন সব সুস্বাদু খাবার করে। অথবা সে যখন মাছ সাতলায় তার ঝাঁঝ নাকে লাগলে বেশ খিদেটা বেড়ে যায়। তখন আর বুড়ো মানুষটা বসে থাকতে পারে না। সে বারান্দা থেকে নেমে সুবলের কাছে চলে গেলে, মনে হয় বেশ একটা নির্জন পৃথিবীতে তারা বেঁচে আছে। অনেক দূরে বন থেকে কিছু জীবজন্তুর ডাক, অথবা পাখপাখালির আওয়াজ এবং সে চুপ করে থাকলে পৃথিবীর যাবতীয় কীটপতঙ্গের আওয়াজ টের পায়। সে তখন চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কিছুটা যেন গল্প করে সময় পার করে দেওয়া অথবা গল্প করে খিদের কথা ভুলে থাকা। তাই ওর গল্পে এমন সব কথা থাকে— বুঝলি, আল্লা আমাদের খুব সরল।

সুবলের স্বভাব অন্য রকমের। — তুমি আবার কেন চাচা বাইরে এলে। ঠাণ্ডা না লাগলে বুঝি চলে না! সুবলের মাঝে মাঝে সখ হলে বুড়ো মানুষটাকে চাচা বলে ডাকে। এমন একটা ডাক খোঁজ সে চায়! সে ভালবাসে সুবল তাকে চাচা বলে ডাকুক।

সে উনুনের পারে বসে কেমন কিছুটা তাপ নেবার মতো হাত বাড়িয়ে বলল, তোর উনুনের আঁচটা ভাল লাগছে। তারপর কেমন যেন সরল মানুষের মতো বলা, আমার খুব খিদে লেগেছে সুবল। তুই আমাকে খেতে দে। তোর কেবল কাজ আর কাজ।

— তুমি না বললে চাচা, আল্লা মানুষের জন্য পৃথিবীতে সব কিছু রেখে দিয়েছেন। পরিশ্রম করে তাকে সেটা পেতে হবে।

— খিদে লাগলে সব ভুলে যাই।

— আমি তো তোমার জন্য তাড়াতাড়ি করছি। সারাদিন পর দুটো খাবে —

— আমি কাঠ ঠেলে দিচ্ছি। তুই যা! কলাপাতা কেটে আন।

— রাতে কেউ গাছ থেকে পাতা কাটে!

— ওরা মানে যারা কাজ করে। কাজের শেষে ফিরে যাবার সময় বুড়ো মানুষটার কাছে এসে ওরা দাঁড়ায়। বলে, চাচা যাচ্ছি।

— যা। একটু থেমে বলে সুবল তোদের টাকা পয়সা দিয়েছে?

— দিয়েছে চাচা।

— আমাদের জন্য দু জোড়া কলাপাতা কেটে রেখে যাস। নিত্য এটা কেমন বলার স্বভাব মানুষটার।

ওরা বলল, সুবল বলেছে কেটে রাখবে। আমাদের কাজ সারতে সারতে একটু দেরি হয়ে গেল চাচা।

— ও কি করছে?

— আসছে। নলচিতা গাছের দুটো বেড়া কার গরু ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। আজ সারাদিন আমরা ওটাই করলাম। ও ঘুরে ঘুরে দেখছে আরও কোথাও এমন হয়েছে কি না!

— আমাকে ও আজকাল কিছু বলে না।

— বললে তুমি কষ্ট পাবে।

— আমি কষ্ট পাব কেন?

— তোমার এমন সুন্দর বাগান কেউ নষ্ট করলে কষ্ট পাবে না?

— সে তো শুনছি খুব চাষবাস বাড়াচ্ছে।

— ওর জন্য আমাদের এখন আর সহরে যেতে হয় না চাচা। সুবল আমাদের শহরের চেয়ে বেশী পয়সা দিচ্ছে।

এমন বললেই বুড়ো মানুষের যা হয় — সেই ঈশ্বরপ্রীতির কথা, অর্থাৎ আল্লা আমাদের খুব সরল। তিনি পৃথিবীতে চান সরল এবং ভাল মানুষেরা বাঁচুক। তারপরই তিনি সেই মহামহিমের জন্য কিছুক্ষণ চোক বন্ধ করে রাখেন, যেন বুঝতে পারেন, আছেন, চারপাশেই আছেন তিনি। সব লতাপাতার ভিতর, ফুলফলের ভিতর এবং সব গ্রহনক্ষত্র আর সৌরলোক, যা কিছু আছে চারপাশে — তিনি আছেন। কোন উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তিনি রাজার

রাজা। তিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ। যা কিছু আছে আকাশে, আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁর। তিনি জানেন সব কিছু — । সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁর অন্তর্লোকের রহস্য। তিনিই জানেন একমাত্র কি আছে সামানে আর কি আছে পিছনে। তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর ওপরে বিস্তৃত আর এই দুইয়ের তিনি নিশিদিন রক্ষাকারী। তিনি তার জন্য এতটুকু ক্লান্ত বোধ করেন না। আর সেজন্য তিনি মহীয়ান, মহামহিম।

সুবল তখন এসে বলল, চাচা তুমি খাবে।

মানুষটার চোখমুখ কেমন উদাসীন দেখায় তখন। চুপচাপ বসে থাকে। খাবার কথা সে ভুলে যায়। তাকে যে খেয়ে নামাজ পড়তে হবে সে যেন তা আর মনে রাখতে পারে না। সেই থেকে, অর্থাৎ সেই যখন পরিশ্রমী মানুষেরা চলে গেল, এবং সে বসে থাকল একা মাদুরে — তারপর সুবলের ফুলের চাষবাস দেখে ফেরা, এবং এসব কেমন যেন তার উদাসীনতার ভিতর পার হয়ে গেছে। সে যে উত্তাপ নেবার জন্য উনুনের পাশে বসেছিল, সেও কিছুটা বোধ হয় সেই অর্ন্তযামীর ইচছা, সে যে খিদে লেগেছে বলেছে, সেও বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা। এবং এই বুড়ো মানুষের যা স্বভাব খেতে খেতে কেমন আনমনে বসে থাকা তাও।

সুবলেরও স্বভাব হয়ে গেছে, খাও চাচা। তোমার মাছ বেছে দিচ্ছি। এই বলে সে বেশ ডেলার ওপর মাছ রেখে দিলে হাত টিপে টিপে টের পায় মানুষটা — সুবল বড় যত্নে সব কিছু করে যাচ্ছে।

সে তখন বলবে, সুবল তুই তোর ধর্ম মানিস?

— ঠিক বুঝি না চাচা। ধর্মের কথা মনে হলেই সেই জনার্দন চক্রবর্তীর কথা মনে হত। আর আমাদের ছিল সুবচনী দেবীর মন্দির। ওর ভীষণ বিশ্বাস ছিল, দেবীর ক্রোধে আমাদের দেশটায় খরা এসে গেল।

বুড়ো মানুষটা বলল, তোরা সবাই চলে এলি, সে থেকে গেল।

— ওর ছিল প্রচণ্ড অহঙ্কার। ও ছিল ঠিক তোমাদের মুসার মত।

রাতে যখন ওরা শোয়, ঘরের দু পাসে দুটো বাঁশের মাচান, মাচানে নক্‌শি কাঁথার বিছানা, তার পাশে ফুল, বেল ফুল, রজনীগন্ধা, অথবা গন্ধরাজ ফুল এবং কখনও সব নীল অপরাজিতা, জবা ফুল, চামেলি, চাঁপা কত যে ফুল নিয়ে বেঁচে আছে এই উপত্যকা আর তার ভিতর আছে একটা লাল টালির ঘর, সেখানে সুবল আর চাচা রাতে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে কেবল নানারকম গল্প করে যাওয়া। বুড়ো মানুষটা খুব বেশী মুসার গল্প বলতে ভালবাসত। সেই থেকে সুবল একটা মানুষের সঙ্গে কেবল জনার্দন চক্রবর্তীর মিল পায়, তার নাম মুসা। মুসার মত আত্মবিশ্বাস ছিল মানুষটার। কেবল লাঠিটা ছিল না হাতে। অথবা যে লাঠি ছিল, সেটা বুঝি ঈশ্বরপ্রদত্ত ছিল না। না হলে মুসা সেই যে তাঁর লোকদের জন্য জল চাইলেন, আর তখনই দৈববাণী, তোমার আসা (লাঠি) দিয়ে পাথরে মারো। যেই মুসা তার লাঠি

দিয়ে পাথরের ছুঁড়ে গেল, আশ্চর্য, নীল পর্বত-মালার নীচে, শুকনো মরুভূমিতে বারোটি জলের প্রস্রবণ। জলপান করো মনুষ্যগণ। আল্লাহ্ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো। অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ করো না।

যখন সেই উপত্যকায় সাদা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে থাকত, আর ফুলেরা ফুটতে থাকত, এবং সব ফুলেদের ফোটার ভিতর আশ্চর্য উল্লাস থাকত, বুড়ো মানুষটা শুয়ে শুয়ে তা টের পেত। সে বলত, সুবল আমাকে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াবি। আমাকে নিয়ে একটু গোলাপের বাগানে নিয়ে যাবি। অথবা চামেলি গাছটার নীচে তুই আর আমি কিছুক্ষণ বসে থাকব।

ছেলেমানুষ সুবল। সারাদিন খাটাখাটনি করে তার ঘুম পায়। সে এখন সপ্তাহান্তে যায় বড় শহরে। টুকুন এখন কত বড় আর লম্বা হয়েছে। সে যায় সদর দরজা দিয়ে। টুকুন আরও সুন্দর করে সাজে তখন। এবং যে দিনটাতে সে শুনেছে ইন্দ্র আসে না। টুকুনের ভয় কেন যে ইন্দ্রকে নিয়ে। সেতো কোন পাপ কাজ করে নি। টুকুন দিদিমণির মুখ চোখ, এবং যখন সেই পিয়ানোতে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে চোখ বুজে গান গায়, ওর ববকরা চুল ঘাড়ে রেশমের মতো উড়তে থাকে তখন সে কেমন এক আশ্চর্য সুষমা টের পায় টুকুনের শরীরে। ঈশ্বর টুকুনকে যেন এতদিন অপবিত্র করে রেখেছিল। টুকুনের। টুকুনের শরীর দেখে অর্থাৎ টুকুনের সবকিছু মা হবার জন্য যখন উন্মুখ, টুকুনকে কি করে আর ঈশ্বর অপবিত্র রাখেন। পবিত্র মুখে সুবলের জন্য ভীষণ মায়া। সুবলও যখন আসে বেশ সুন্দর পোশাকে আসে। সে তার ঘাড়ে একটা রঙ বেরঙের ব্যাগ রাখে। ব্যাগে থাকে যাবতীয় সব কেয়া ফুল। সুবল এলেই সব মানুষেরা টের পায় সুন্দর সুগন্ধে গোটা বাড়িটা ম ম করছে। অথচ কেউ টের পায়, না, একজন মানুষ গ্রাম থেকে চলে আসছে, সদর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, ঘোরানো সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে, এবং এ-সময় টুকুন ঠিক থাকবে। অন্য দিকের দরজা ঠিক বন্ধ থাকবে — কিন্তু রোজ এখন এটা করতে পারে না। টুকুন ভাল হয়ে গেছে বলে তাকে ইন্দ্রের সঙ্গে পার্টিতে যেতে হয়, সে ভাল হয়ে গেছে বলে তাকে ইন্দ্রের কাছে গাড়ী চালানো শিখতে হয়। ভাল হয়ে গেছে বলে আত্মীয়স্বজনরা, বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ঘিরে থাকতে ভালবাসে। অথচ সুবল টের পায় — বড় অস্বস্তি টুকুনের। সে এখন যা ভাবছে, একটা বাওবাব গাছের চারা পেলেই টুকুন দিদিমণিকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে। এবং এত সব ভাবনায় সে রাতে বড় ক্লান্ত থাকে। ওর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বুড়ো মানুষটা টের পেয়েছে ফুলেরা ফুটছে। সে সাদা জ্যোৎস্নায় বসে চুপি চুপি ফুলেদের ফুটতে দেখবে। এবং মনে হয় যে তখন মহামহিম আল্লাহ্‌র করুণা সব ফুলে ফুলে আশ্চর্যভাবে টের পায়। বুড়ো মানুষটা চুপচাপ তখন কেবল গাছের নীচে বসে থাকতে ভালবাসে।

সেও বসে থাকে চাচার সঙ্গে। সামনের জমিটা বেল ফুলের। হেমন্তের শেষাশেষি এটা। শীতকাল আবার আসবে। এখন সাদা জ্যোৎস্নায় শীতটা ওদের বেশ লাগছিল। একটা পাতলা কাঁথা বুড়োর গায়ে দিয়েছে সুবল। এমন জবুথবু হয়ে বুড়ো মানুষটা এখন ফুলের সৌরভ নিচ্ছে।

এখন দেখলেই সুবলের বলতে ইচ্ছা হয়, চাচা তুমিতো অনেক জানো, এখানে কোথায় বাওবাব গাছ পাওয়া যায় বলতে পার?

অনেকক্ষণ পর বুড়ো মানুষটা সুবলের দিকে তাকায়। — কিরে আমাকে কিছু বলছিস!

— একটা বাওবাবের চারা না হলে যে চলছে না।

— এটা এখানে পাবি কোথায়? সেতো ছোট্ট রাজপুত্রের দেশের গাছ।

এমনি হয়, কারণ ওদের কথা কিছুই সংগোপনে থাকে না। সুবল যে সব গল্প টুকুনের কাছে শুনে আসত, সব এসে হুবহু বুড়ো মানুষটাকে বলত। ইদানীং তো সুবলের সন্ধ্যার পর কথা বলার আর কেউ থাকে না। কেবল বুড়ো মানুষটার সঙ্গে যত কথা। সে উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধর সময় অথবা যখন ডাল সেদ্ধ হয় উনুনে এবং আগুনের তাপে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায় — তখন নিবিষ্ট মনে যত রাজ্যের গল্প সে চাচার সঙ্গে জুড়ে দেয়।

— ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে যদি আগ্নেয়গিরি থাকে, যদি নদী থাকে, এবং সমুদ্র থাকে তবে আমাদের পৃথিবীতে একটা বাওবাব থাকবে না।

— তা বটে। বলে কেমন একটা হাই তুলল।

— তোমার ঘুম পাচ্ছে চাচা। এবারে ওঠো।

— তোর ঘরে শুয়ে থাকতে এখন ভাল লাগবে!

— খুব।

— তুই তবে মানুষ না।

— তা যা খুশি বলতে পার।

কেমন আসমান, তারা, চাঁদ, আর দ্যাখ যেদিকে চোখ যায় তোর মনে হবে একটা ফুলের জগতে বসে আছিস। দূরের জ্যোৎস্নায় কেমন ফুলের সৌরভ ভেসে যাচ্ছে দ্যাখ।

বুড়ো হলে কিছু এমন ধরনের কথা বলেই থাকে। সুবল সেজন্য মনে কিছু করে না। কেবল মাঝে মাঝে কথায় সায় দিয়ে যায়। এবং কথা না থাকলে টুকুনের কথা ঘুরে ফিরে আসে।

— জানো চাচা, টুকুন দিদিমণি এখন গাড়ি চালাতে শিখছে।

টুকুনের জন্য তোর খুব কষ্ট সুবল। কারো জন্য কোন কষ্ট মনে মনে পুষে রাখবি না। তবে দুঃখ পাবি।

— তুমি বুড়ো হয়ে গেছ বলে এমন কথা বলছ।

বুড়ো হলে মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারে সুবল।

সুবল এবার বলল আমার কোন কষ্ট নেই। আমি গাঁ থেকে এসেছি। জলের জন্য এসেছিলাম। এখন ফুল বেচে খাই! তুমি আছ, এমন একটা ফুলের উপত্যকা আছে আর কিছুদূর গেলে নদী, তার পরে বড় আছে, আমার দুঃখ কি চাচা।

— তোর কথা শুনলে আমি সব বুঝি। তোর কতটা কষ্ট আমি ধরতে পারি।

ওরা এ-ভাবে কখনও সকাল করে দেয়। এবং যখন ফুলের দালালেরা আসে, সুবল ফুল তুলে দেয় তাদের। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো মানুষকে খাইয়ে এবং নামাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে সুবল চলে যায় নদীতে। সে নদীর পারে সব ছেড়ে জলে নেমে যায়। তার এ-ভাবে নদীর জলে সাঁতার কাটতে ভীষণ ভাল লাগে। ও-পাশে বন, বনে নানারকম গাছ, সে সব গাছের নাম জানে না, বুড়ো মানুষটা জানে। সে আগে মাঝে মাঝে বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে বনে আগুন জ্বালতে গেলে কখনও কখনও সে কিছু গাছের নাম জেনে নিয়েছে। বাকিগুলো জানা হয়নি। জানতে জানতে কখন বুড়ো মানুষটা চোখে কম দেখতে থাকল। তাকে আর রোজ নিয়ে সে নদীর ওপারে যেতে পারত না। তাকে একা একা বনের শুকনো পাতা ঘাস কুড়িয়ে আনতে হত সারের জন্য। এবং এই সার তৈরী করা সে বুড়োর কাছেই জেনেছে। তিনি বলেছেন, তোমায় এই দুনিয়াতে আল্লা সব দিয়ে দিয়েছেন, তুমি বাপু করে কম্মে খাও। এমন কিছু নেই যা সংসারে অবহেলার। গাছ তার অতিরিক্ত সব কিছু অর্থাৎ পাতা ডাল, সময় হলে পরিত্যাগ করে, তুমি তা থেকেই অমূল্য সব মস্ত্র নির্মাণ করে নিতে পার। বুড়ো মানুষটা আল্লার কথায় এলেই কেমন সাধুভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে।

সুতরাং সাঁতার কাটতে কাটতে সে কখনও নদীর ওপারে ওঠে বনে ঢুকে যায়। বনে কোন মানুষের ছায়া থাকে না। বড় শহর থেকে গন্টা খানেকের পথ ট্রেনে এলে, এবং একটা ড় মাঠ পার হয়ে গেলে এমন কেটা নদী, এমন একটা ফুলের উপত্যকা, এমন একটা ছোট্ট বন, সবুজ লতাপাত ঘাস নিয়ে ক্রমে ঈশ্বরের পৃথিবীতে বড় হচ্ছে টের পাওয়া যায় না।

সুবল বেশ হেঁটে যাচ্ছিল। তার একা একা এই বনের ভিতর একজন আদিম মানুষের মত হেঁটে যেতে ভাল লাগছিল। সেই যে সে মুসার গল্প শুনেছে, সেই যে সে আদম ইভের গল্প শুনেছে, অর্থাৎ প্রাচীনকালে মানুষেরা বনে পাহাড়ে থাকত, অথবা প্রথম মানুষ আদম ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল চুরি করে খাওয়া সব তার একসঙ্গে মনে পড়ছে। এবং মনে হয় সে বেশ ছিল, ভাল ছিল, যেন সে ট্রেনে চড়ে শহরে চলে এসেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছে। কেমন তার উচ্চাশা, এবং আকাঙ্ক্ষা তাকে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে খুব ছোট করে দিচ্ছে। এমন মনে হলেই চুপচাপ একটা গাছের কাণ্ডে হেলান

দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টুকুন দিদিমণির কথা মনে হয়। দিদিমণির সেই রুগ্ণ মুখ, বিবর্ণ ছবি চোখে ভেসে ওঠে— তারপর সে কি করে যে আশ্চর্য এক পাখির খেলা দেখিয়ে দিদিমণিকে নিরাময় করে তোলার সময় তার জানা ছিল না, এক আশ্চর্য যাদুকরের খেলায় সে দিদিমণির ভিতরে ভালবাসা সঞ্চার করেছে। পৃথিবীতে বুড়ো মানুষটাই কেবল মাত্র তার কষ্টটা বুঝতে পারে। সে যে নিশিদিন ফুল ফুটিয়ে বেড়ায় কেউ জানে না তার দুঃখটা কোথায়। টুকুন দিদিমণির সঙ্গে সে এখন একা একা কথা বলেতে পারে। সে সেজন্য এখন বনে ঢুকে গেলে দেখতে পায় যেন সে ছোট্ট রাজপুত্র হয়ে গেছে। একটা বাওবারের নীচে সে আর টুকুন দিদিমণি দাঁড়িয়ে। বুড়ো মানুষটা যাচ্চে হেঁটে! ফুলের সৌরভ তখন কেবল ভেসে আসছিল। বুড়ো মানুষটা তখন লাঠি তুলে যেন বলছে, সুবল তোর ঈশ্বর তোকে অহঙ্কার দিক, তুই ভালভাবে বেঁচে থাকতে শিখ। ঈশ্বরের পৃথিবীতে ভালবাসার দাম সবছেয়ে বেশী। তাকে হেলা ফেলা করতে নেই।

।। সতেরো ।।

ইন্দ্র বলল, বেশ হাত দেখছি।

— বেশ বলছ?

— এমন একটা জ্যামের ভিতর থেকে বেশ কায়দা করে গাড়িটা বের করে দিলে।

— তাহলে আমি একা একা চালাতে পারব বলছ?

— সেতো কবে থেকে তুমি চালাত পার।

— তবে মা দিচ্ছে না কেন?

— মাসিমার ভীষণ ভয়।

টুকুনের বলতে ইচ্ছা হল ভয় না হাতি। মা একা ছেড়ে দিচ্ছেন না, পাশে সেই যে যুবক বড় হচ্ছে ফুলের উপত্যকায়, সেখানে সে না চলে যায়। মা টের পেলে বলেছিল একদিন, টুকুন এটা তোমকে মানায় না।

টুকুন যেন বুঝতে পারছে না, এমনভাবে বলেছিল, কি মানায় না মা?

— তুমি তা ভাল করেই বোঝ।

টুকুনের মনে হল, সেটা সে আজও ঠিক বোঝে না। সে আসত পালিয়ে পালিয়ে। পাঁচিল টপকে আসত। তার এমন নিত্য আসার সময় একদিন ধরা পড়ে গেলে— বাড়িতে হৈ চৈ। মা, বাবা, সব মানুষেরা ওকে বলেছিল, ছিঃ ছিঃ টুকুন, তুমি কত বড় বংশের মেয়ে।

টুকুনের বলার ইচ্ছা হয়েছিল, সে এসে আমি মা, আমার ভিতর থাকি না। কি সুন্দর এক জগতের সে বাসিন্দা মা। সে তার ফুলের উপত্যকায়

নিয়ে যাবে মা, সেখানে গেলে মানুষের বুঝি কোন দুঃখ থাকে না !

মা বলেছিল, আমাদের দিকটা একবার ভেবো।

সুবল কিছু বলছিল না। সে সত্যি অপরাধ করে ফেলেছে। তার আসা উচিৎ হয়নি এ-ভাবে। সে কিছুটা মাথা নীচু করে রেখেছিল। কেবল মজুমদার সাহেব পাইপ টানতে টানতে কেমন একটা মজা অনুভব করেছিলেন। এবং সে যে একেবারে ভীষর কিছু করে ফেলেনি সেটা যেন মুজমদার সাহেব হ্যাঁ বা নার ভিতর কিছুটা প্রাকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমনভাবে কথা বলেছিলেন যে, দ্যাখো সুবল, তুমি এভাবে না এসে দরজা দিয়ে এলেই পার। তুমি তো সুবল ফুল বিক্রি করে খাও। তোমার তো মানুষের ভালো দেখাই স্বভাব। তুমি কেন তবে এভাবে আসবে।

সুবলও ভেবেছিল, তা ঠিক, এ-ভাবে না এসে সে সদর দিয়েই আসবে। সে বলেছিল, আমি সদর দিয়েই তবে আসব।

টুকুনের মার চোখ মুখ ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছে। কি নির্লজ্জ বেহায়া দ্যাখো। মান অপমান বোধটুকুও নেই। টুকুনের মা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তবে একদিন নচ্ছার ছোঁড়াটা এভাবে পালিয়ে এসে কিনা করেছে। সে বলল, তুমি আসবে না। এলে তোমাকে পুলিশে দেব।

টুকুন বলল, পুলিশে দেবে কেন মা ? সে চোর না মিথ্যাবাদী !

— দেখছো মেয়ের সাহস ! বলেই টুকুনের মা ভীষণ জেদী মেয়ের মত দুপদাপ কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এল। এবং মজুমদার সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, সব তোমার আস্কারাতে। তুমিই এ-জন্য দায়ী।

— রাগ করছে কেন ? ব্যাপারটা একবার ভেবে দ্যাখো না !

— ভাববার কি আছে ! তুমি বরং ভাবো। তোমাদের যা খুশি করবে। আমি কিচ্ছু বলব না। টুকুনের মার এটুকু বলেই যেন কেমন মনে হল, সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে সবাই আরও জাহান্নমে যাবে। বরং সে রাগটুকু প্রবল রেখে দুঃখী মেয়ের মত মুখ করে বলল, এতবড় বাড়ি, তুমি এতবড় মানুষ, তার মেয়ে এমন হলে মান সম্মান আমাদের থাকবে।

আর তখনই মজুমদার সাহেব দেখলেন, পার্লারে বেশ লোকজন জমে গেছে। সদর থেকে দারোয়ান হাজির। আমলা কর্মচারিরা হাজির। তিনি বললেন আপনারা যান। এবং এই যান বলতেই যান — একেবারে কথাই কেমন নাটকের কুশীলবের মত যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন মাত্র আছেন, তিনি, টুকুনের মা, টুকুন আর সুবল। মজুমদার সাহেব বললেন, সুবল বোস। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের সুবলের চোখ দুটো ভারি সুন্দর।

টুকুন বলল, ওর মুখটাও ভারি সুন্দর। আর সুবল কি লম্বা, না বাবা !

টুকুনের বাবা বললেন, সুবল তুমি ভীষণ সুপুরুষ হতে পারতে। কেবল

নাকটা তোমাকে বেইমানি করেছে।

সুবল এসব বুঝতে পারছে না। ওর চেহারার প্রশংসা হচ্ছে। সে সাদা পায়জামা পরেছে। ঝোলা গেরুয়া পাঞ্জাবী। সে রংবেরঙের ব্যাগ রেখেছে বগলে। ভিতরে নানা বর্ণের ফুল। এবং আশ্চর্য গন্ধের ফুল। এই ঘরে এমন ফুলের সৌরভ যে বেশিক্ষণ রাগ নিয়ে বসে থাকা যায় না। ফুলের সৌরভে মন প্রসন্ন হয়ে যায়। এবং সবারই যখন মন প্রসন্ন হয়ে যাচ্ছিল, বাড়ির সবারই অর্থাৎ দাসী-বাঁদিদের পর্যন্ত তখনও কিনা টুকুনের মা মন ভীষণ অপ্রসন্ন রেখেছে। সেই ছোঁড়া তিন চার বছর যেতে না যেতে কি হয়ে গেল। ট্রেনের সুবল আর এ-সুবল একেবারে আলাদা মানুষ। আর বেশ জালটি পেতেছে। অসুখ ভাল করার নামে সেই যে ছারপোকার মত লেগে থাকল আর যাবার নাম নেই। সে বলল, বাপু তুমি এখানে আসবে না। আমি সোজা কথার মানুষ, সোজা ভাবে বুঝি। টুকুন এখন বড় হয়েছে। সুবলেও যে বড় হয়েছে। সুবলও যে বড় হয়েছে সেটা বলল না।—খুব খারাপ এভাবে আসা।

—আর আসব না। সুবল এমন বলে উঠতে চাইলে, মজুমদার সাহেব লক্ষ্য করলেন টুকুনের চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

তিনি কি বুঝতে পেরে বললেন, না না, তুমি আসবে বৈকি!

টুকুনের মুখ চোখ ফের এটুকু বলে লক্ষ্য করতেই বুঝলেন, যে রক্তশূন্যতা সহসা তিনি দেখতে পেয়ে ছিলেন, একথার পর তা আবার কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি এবার বললেন, রোজ আসবে না। ওর তো এখন অনেক কাজ। পড়াশোনাটা আবার আরম্ভ করতে হচ্ছে। সকালে ইন্দ্র আসে। বিকেলে ওকে ইন্দ্র গাড়ি চালানো শেখায়। বুধবার সন্ধ্যায় টুকুন ক্লাবে সাঁতার শিখতে যায়। সোমবার রাতে গীটার বাজান শিখছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ খুব ব্যস্ত টুকুন। টুকুনের ভাল তো তুমি চাও। তুমি বরং এক কাজ করো। রবিবার বিকেলে তুমি আসবে। টুকুন সেদিন ফ্রি থাকার চেষ্টা করবে। কি বলিস টুকুন!

এসব শুনে টুকুনের মা কি যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মানুষটা যে দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে। কোথাকার কে একটা ছেলে— তাকে মুখের ওপর বলতে পারছে না, না তুমি আসবে না। কি অসহায় চোখ মুখ মানুষটার। টুকুনের মার এসব ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন গরম হয়ে যাচ্ছে। ওর নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল। মেয়েটাকে এভাবে একটা অপোগণ্ড মানুষের সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছে! মান সম্ভ্রম বলে কিছু নেই আর কি আশ্চর্য মানুষটা, সুবলের সংগে কথা বলছে ঠিক সমকক্ষ মানুষের মত।—তুমি সুবল এখন কি করছ? আহা ঢং! সে নিজের কাপড়ের আঁচল অস্থির বলে একবার আঙ্গুলে জড়াচ্ছে আবার খুলছে। ওপরের সিলিং ফ্যানটা পর্যন্ত তাকে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। ঘড়িতে সব বিচিত্র ছবি। নানা রঙের ছবি। কোথাও

বাঘ হরিণের পেছনে ছুটছে। কোথাও শিকারী, টুপি খুলে গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার কোন ছবিতে সূর্যের রং চড়া। আর সূর্য ওঠার নাম নেই অথচ একদল রাজহাঁস জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। এবং ঝাড় লণ্ঠনে একটা চড়ুই পাখি, আলো আঁধারের খেলায় এসময়ে বেশ মেতে গেছে। ঠিক নীচে জেরার মুখে সুবল, সে এসেছিল টুকুন দিদিমণির কাছে এবং এভাবে এক পবিত্র মুখ মহিমময় হয়ে দেখা দিলে চড়াই পাখিটা ডাকতে ডাকতে কার্ণিশে গিয়ে বসল।

এটা চড়াই পাখি না সুবলের পাখি রাতের বেলায় টের পাওয়া কঠিন। এবং কঠিন বলেই পাখিটা নিজের খুসীমত কার্ণিশে বসে বেশ ডেকে চলেছে। সে বুঝতে পারছিল বুঝি বেচারা টুকুনের মা বেশ বিপাকে পড়েছে। এই বিপাক থেকে রক্ষা পাবার কি যে উপায় স্থির করতে না পেরে খুব অস্থির-চিত্ত হয়ে গেছে।

এবং এভাবে টুকুনের সঙ্গে মাত্র রবিবার এক বিকেল, একটা বিকেলই মাত্র সুবল থাকে তার সঙ্গে। সপ্তাহে এসময়টা টুকুনের খুব মনোরম। সে যেন এসময়টার জন্য সারাটা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকে। আজ শনিবার ইন্দ্র ওকে রেড রোডে নিয়ে এসেছে। রেড রোডে ইন্দ্র গাড়ির ষ্টিয়ারিং টুকুনের হাতে দিয়ে বেশ চুপচাপ বসে আছে। টুকুন নানাভাবে বেশ অনায়াসে গাড়ি চালাতে পারছে বলে ইন্দ্রের ভাবনা কম। আর টুকুন সেই স্ল্যাকস এবং ঢোলা ফুলহাতা সার্ট অর্থাৎ ফুলফল আঁকা সিল্কের পাতলা পোষাক পরে বেশ অনায়াসে গাড়ি চালিয়ে মাঠের চারপাশে, কখনও গঙ্গার ধারে ধারে আবার এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসের পাশ দিয়ে এসে মেডিকেল কলেজ ঘুরে সোজা ফুলবাগান পার হয়ে ভি-অই-পি। তারপর আরও সোজা লেক টাউন, কৃষ্টপুর এবং দমদম বিমান ঘাঁটি ডাইনে ফেলে কোন গ্রামেরর ভিতর গাছের ছায়ায় সহসা গাড়ি থামিয়ে দিলে মনেই হয়না কিছু কাল আগেও এ মেয়ের কথা ছিল মরে যাব। আগামী শীতে অথবা বসন্তে মরে যাবে। সুবল এসে ঠিক এক যাদুকরের মত তাকে কি করে যে ভাল করে তুলেছে ?

এভাবে টুকুন আজ বিশ্বাসই করতে পারে না, তার একটা অসুখ ছিল। সে যে শুয়ে থাকত সব সময় এবং হেঁটে যেতে পারত না, এমন কি দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না, কিছুতেই সে তা বিশ্বাসই করতে পারে না। সে যেন এমনই ছিল। তার কথা ছিল অনেক দূর যাবার। ঠিক মানুষের খোঁজে সে আছে। ইন্দ্র চেষ্টা করেছে ওর পাশে পাশে থাকার। কিন্তু ইন্দ্রকে সে এখনও তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। ইন্দ্রকে পাত্তা দিলে মা খুব খুশী হবে— অথচ সে কেন যে পারে না। বেশ এই যে গাছের নীচে সে এবং ইন্দ্র বসে আছে, ইন্দ্র ফ্ল্যাকস থেকে টুকুনকে চা ঢেলে দিচ্ছে, সবটাই কেমন আলগা মানুষের মত ব্যবহার। এবং চা ঢেলে দেবার সময় ইন্দ্র দেখল, কি সুন্দর আঙ্গুল, চাঁপার ফুলের মত ছুঁয়ে দিলেই কেমন মলিন হয়ে যাবে— আর বাহুতে কি লাবণ্য

— এবং টুকুনকে তে বেশি ঐশ্বর্যময়ী মনে হয় যে, একটু ছুঁতে পেলেই — সব হয়ে যায় — সে এই ভেবে টুকুনের পাশে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলে, টুকুন বলল, তুমি আমাকে একজায়গায় নিয়ে যাবে ?

— কোথায় ?

এমন একটা জায়গা, যেখানে কেবল ফুল ফোটে।

— জায়গাটা কোথায় আমার চেনা নেই।

সুবল সেখানে থাকে।

— সেই ফুলয়ালা সুবল !

সেই ফুলয়ালা সুবল, কথাটা তার ভাল লাগে না ! সুবল সম্পর্কে সে আরও কিছু বলতে পারত, কিন্তু ইন্দ্র এই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবে। মাকে গিয়ে বলবে। সুবলকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা তার ভাল লাগে না। মার কাছে সুবল ভীষণ একটা শয়তানের মত। সুবলকে কি ভাবে জব্দ করা যায়, অথবা একটা উইচ্, সে মন্ত্রের দ্বারা বশ করেছে টুকুনকে, এসব গ্রাম্য লোকেরা নানারকমের তুকতাক জানে, এমন এক সুন্দর রূপবতী কন্যা আর ধন দৌলত দেখে টুকুনকে সুবল বশীকরণ করেছে, এসব মা সব সময় ভেবে থাকে। আত্মীয় স্বজনের কাছে মা এসব বলে না। কেবল ইন্দ্রের বাবা এলে মা সব বলে। কি যে করা এখন ! কারণ মার ইচ্ছা কোন শুভ দিনে ইন্দ্র এসে ওর হাত ধরুক এবং এই যে কলকাতা শহর, রাস্তা ঘাট, অথবা মেমরিয়েল — কখনও কখনও উটকামাণ্ড একটা বড় নীল উপত্যকায় ইন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, এসব হলেই মা ভাবে টুকুন নিরাময় হয়ে যাবে। টুকুনের একটা অসুখ ছেড়ে আর কেটা অসুখ এবং এটা মার কাছে ভীষণ অসুখ। বরং মার ইচ্ছা টুকুন আবার শুয়ে থাকুক, সে আর উঠতে না পারলে কোন কষ্টই যেন নেই তার, তবু যে পারিবারিক সম্ভ্রম বজায় থাকে। মেয়েটা যা করছে, কিছুতেই পারিবারিক সম্ভ্রম আর রাখা যাচ্ছে না। মার হতাশ মুখ দেখলে টুকুন তা টের পায়।

টুকুন দেখল, বেশ একটা জায়গা, এমন নিরিবিলি জায়গায় তার বসে থাকতে ভাল লাগে। কাল সুবল আসবে। সুবল বলেছে, একটা বাওবাবের চারা পেলেই লাগিয়ে দেবে তার উপত্যকায়। এবং গাছটা ডাল পালা মেলে ধরলে টুকুনকে নিয়ে যাবে। টুকুনকে এসেই যা সব গল্প করে তার ভিতর থাকে, কেবল বুড়ো মানুষটা। নদীতে যে সে সাঁতার কাটে তাও বলে থাকে এবং কখনও তার কিছু ভাল না লাগলে নদীর ওপারে যে বন আছে, বনের ভিতর সে একা একা হেঁটে বেড়ায় — সে সব কথাও বলে।

অথবা টুকুনের ভারি সুন্দর লাগে যখন সুবল বলে, মাঠের ভিতর শীতের জ্যোৎস্নায় ভাত ডাল রান্না ও মাছের ঝোল রান্না। জ্যোৎস্নায় কলাপাতা বিছিয়ে ঘাসের ওপর খাওয়া ভারি মনোরম। এসব বললে, টুকুনের সেই ছোট্ট রাজপুত্রের মতই মনে হয়, সুবল এমন একটা দেশের বাসিন্দা হয়ে

যাচ্ছে যেখানে তাকে আজ হোক কাল হোক চলেই যেতে হবে। সুবল কলাপাতা কেটে আনবে গাছ থেকে, সে ডাল ভাত রান্না করবে। রান্না করতে সে ঠিক জানে না। সুবল তাকে ঠিক শিখিয়ে নেবে। সে যা জানে না সুবলের কাছে জেনে নেবে বিকেল হলে সে এবং সুবল যাবে নদীতে। কোন মানুষ-জন না থাকলে নদীর অতলে ডুবে ডুবে লুকোচুরি খেলতে তার ভীষণ ভাল লাগবে।

ইন্দ্র দেখছে, টুকুন অনেকক্ষণ কিছু কথা বলছে না। কেমন চোখ বুজে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে।

ইন্দ্র বলল, কি ভাবছ টুকুন ?

— ভাবছি, সুবল এখানে কোথায় বাওবাব পাবে ?

— ইন্দ্র বলল, বাওবাব মানে ?

— বা তুমি জান না, বাওবাব এক রকমের গাছ, খুব পাতা, ওর শেকড় অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায়।

এমন গাছের নাম তো আমি জীবনে শুনিনি বাবা।

— টুকুন কেমন অবাক হল, বলল, বলছ কি, তুমি বাওবাব গাছের নাম জান না! সে কি!

ইন্দ্র বলল, সুবল তোমার মাথাটি বেশ ভাল ভাবে খেয়েছে।

— তুমি ইন্দ্র যা জান না, তা বলবে না।

— তবে কে এসব খবর দিচ্ছে তোমাকে।

— কে দেবে ? বইয়ে এসব লেখা আছে।

— কোন বইয়ে ?

টুকুন ওর সেই বইটার নাম করলে ইন্দ্র বলল, ওগুলো রূপকথা।

টুকুন বলল, মানুষের জীবনটাতো রূপকথার মত। তাই না! এই যে সুবল কে কোথাকার মানুষ, এখন ফুলের গাছ কেবল লাগায়। কতরকমের সে ফুল নিয়ে আসে।

ইন্দ্র কেমন ক্ষেপে গেল এসব শুনে। মাসিমা ঠিকই বলছেন, তোমার একটা অসুখ সেরে আর একটা হয়েছে।

টুকুন লাফ দিয়ে উঠে বলল— সেটা কি ?

— এই যে তুমি সব রূপকথা বিশ্বাস করছ।

— তোমরা বুঝি কর না ?

— আমরা কি করি আবার ?

— অনেক কিছু কর। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছে মা।

ইন্দ্র এবার কেমন মিউ মিউ করে জবাব দিল, সেটার সঙ্গে রূপকথার কি মিল আছে ?

— মায়ের কাছে এটা রূপকথার সামিল। মা তোমাকে নিয়ে খুব স্বপ্ন

দেখছে। অথচ জানো, মা জানে না, আমি বিয়ে থা করছি না।

— সেটা তোমার ইচ্ছায় হবে বুঝি ;

— কার ইচ্ছায় তবে ?

মাসিমা মেসোমশাইয়ের।

টুকুন উঠে দাঁড়াল কি যেন খুঁজছে মত। সে বলল কোথায় সে সুবল বাওবাব পাবে ! নদীটা ওর ফুলের জমি ভেঙ্গে নিচ্ছে। বাওবাবের চারা নদীর পাড়ে পাড়ে লাগিয়ে দিতে পারলে খুব ভাল হত। ওর শেকড় অনেক দূর চলে যায়। ছোট্ট গ্রহাণুর পক্ষে যা খুব খারাপ পৃথিবীর পক্ষে তা খুব দরকারী।

।। আঠেরো ।।

রাত থাকতেই সুবলের ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। তখন আরও চার পাঁচ জন লোক আসে। ওরা একসঙ্গে কাচি দিয়ে চার পাশ থেকে, যে সব ফুল ঠিকমত ফুটে গেছে, আর বড় হবে না, সে-সব ফুল তুলে নেয় প্রত্যেকের সঙ্গে বেতের ঝুড়ি থাকে। ফুলটা রেখে দেবার সময় খুব যত্নের দরকার হয়। রাস্তায় চার পাঁচটা ছোট গাড়ি থাকে। গাড়িগুলো ছোট রেলগাড়ির মত দেখতে। গাড়িতে বেশ নানাভাবে চৌকা মত ঘর। এবং এক একটা ঘরে ছোট ছোট ফুলের চুবড়ি সাজানো। কেবল রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলো সে আঁটি করে বেঁধে রাখে। মাঝে মাঝে ফুলের ওপর জল ছিটিয়ে দিতে পারে। সে অন্ধকারেই বুঝতে পারে কোথায় কে কি করছে। বেশ বড় এই ফুলের উপত্যকা। নদী ঢালুতে নেমে গেছে। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে লাল ইটের দেয়াল এবং টালির ছাদের ঘরটা আশ্চর্য মায়াবি মনে হয়। সে অন্ধকারেও টের পায় জল তুলে আনছে সবুর মিঞা। সে ভাড়ে জল আনছে। নিতাই তোলা ফুলে জল দিয়ে যাচ্ছে। কালু এখন তৈরি, যাবে স্টেশনে ফুল নিয়ে। সে অবশ্য ইচ্ছা করলে গাড়ি নিয়ে শহরে চলে যেতে পারে। কখনও কখনও দেরি হয়ে যায়, তখন অন্য জায়গা থেকে ফুল চলে আসে, ফুলের দাম ঠিক ঠাক পাওয়া যান না। ভোর রাতে যে গাড়িটা যায়, এবং যে গাড়িতে এ অঞ্চল থেকে ডাব, মুরগি, হাঁস ডিম যায় শহরে, সেই গাড়িতে সুবল তার সব ফুল তুলে দেয়। দালালদের ফুল দিলে সে ঠিক পড়তা করতে পারে না। মোটামুটি ফুলের কারবারে অনেক মানুষ জন খাটছে। এবং মাইল দুই গেলে, কে জনপদ গড়ে উঠছে। ফুল সব মানুষদের — এ অঞ্চলের, এমন কি যারা শহরে গেছিল — তারা পর্যন্ত পিরে এলে তাদের নিয়ে বেশ একটা ফুলের চাষ বাস করে দিলে বুড়ো মানুষটা খুব খুশী।

সে বুড়ো মানুষটার জন্য একটা বড় কাঞ্চন গাছের নীচে বেদি বাঁধিয়ে

দিয়েছে। দিনের নামাজ বুড়ো সেখানে করে নেয়। রাতেও সেখানে মানুষটা নামাজ পড়ে। এবং চার পাশে থাকে তখন সাদা কাঞ্চন ফুল। বিকেলে কোন কোন দিন গাড়িতে ফুল যায়। তখন সুবল বেশ সুন্দর একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পায়ে সাদা কেড্‌স এবং হাতে কিছু রজনীগন্ধা নিয়ে যখন গাড়ির মাথার বসে থাকে, বুড়ো মানুষটার মনে হয়, সুবল যাচ্ছে ফুলের গাড়ি নিয়ে — সুবল না হলে এমন একটা ফুলের গাড়ি কে যে চালায়। যখন দু পাশের মাঠ এবং ঘাস মারিয়ে গাড়ি যায়, সাদা কাঞ্চন গাছটার নীচে সে দাঁড়িয়ে থাকে। ভীষণ এক উজ্জ্বল রোদ খেলা করে বেড়ায়। নদী থেকে হাওয়া উঠে আসে। এবং সুন্দর এক জীবন। এ-ভাবে যখন মানুষেরা টের পায় ফুলের জমিটা ওদের — কি আপ্রাণ উৎসাহ তাঁদের তখন পরিশ্রম করায়।

কোনো কোনোদিন সে ফুল নিয়ে ষ্টেশনে যায় না। দুপুরের খাবার অথবা রাতের খাবার এখন কালু তৈরি করে দেয়। সে যতটা সময় এ-সব করবে, ততটা সময় তার নষ্ট। সে চাষাবাসের কথা তখন ভাল করে ভাবতে পারে না। সেজন্য সে যখন বিকেলে চুপচাপ ফুলের উপত্যকা ধরে হেঁটে যায় তখন চারপাশের সব কিছু কেমন মহিমময় হয়ে যায়। সে এ-ভাবে একটা নিজের পৃথিবী গড়ে তুলেছে। সবাই চায় তার নিজের একটা পৃথিবী থাক। সবাই চায় সেই পৃথিবীর সে রাজা হয়ে থাকবে। যেমন বুড়ো মানুষটা ফুলের চাষ সম্পর্কে প্রায় রাজার মত, যেমন জনার্দন চক্রবর্তী তার বিশ্বাস সম্পর্কে প্রায় ঈশ্বরের সামিল — সুবল যেমন একসময় ভাবত, টুকুন দিদিমণি মরে যেতে পারে, এমন মেয়ে অসময়ে মরে গেলে ভীষণ কষ্টের।

এবং এ ভাবে সে যখন চার পাশে তাকায় — দেখতে পায় সব রাস্তার ধারে ধারে গন্ধরাজ ফুল। গ্রীষ্মকাল চলে যাচ্ছে। বর্ষা আসছে। ক'দিন আগে খুব বৃষ্টি হয়েছে। ফল ফুলের গাছগুলো ভীষণ তাজা। সে নতুন কলম করছে গোলাপের। গোলাপের ডাল কেটে সে মাথায় গোবর ঠেসে দিয়ে কাদামাটিতে পুতে রেখেছে। সামান্য বৃষ্টি পেয়ে কাটা ডালগুলো কুঁড়ি মেলেছে। সে এ-সব দেখতে দেখতে যায়। এখানে রাস্তায় দুপাশে সব বড় বড় গন্ধরাজ ফুলের গাছ। গাছের পাতা কি আশ্চর্য সবুজ! এবং চারপাশে গাছের সাদা ফুল। নীচে নুড়ি বিছানো পথ। বৃষ্টিতে এতটুকু কাদা হয় না। সবুজ ঘাস রাস্তার ওপর। এবং হেঁটে টের পাওয়া যায় বুড়ো মানুষটার টালির বাড়িটা অথবা ওর ঘরটা এবং এই চাষবাস মিলে জায়গাটা যেন একটা পুরানো কুঠিবাড়ি হয়ে গেছে। কত সব আশ্চর্য কীট পতঙ্গ উড়ে এসে বাসা বেঁধেছে। কিছু সোনা পোকা। পর্যন্ত সে এই ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছগুলোর চারপাশে আবিষ্কার করেছিল। এবং এখানে উড়ে এসেছে নানাবর্ণের পাখি। আর এসেছে ছোট্ট সব খরগোস, কাঠবিড়ালি। এখানে এসে যেই সবাই জেনে ফেলেছে — সুবলের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা খুব আনন্দের।

আর এভাবেই সুবল তার এই পৃথিবীতে ছোট্ট রাজপুত্রের মতো বেঁচে

থাকতে চায়। সে আর যায় না, টুকুন দিদিমণির বাড়িতে। সে টের পায় তাকে নিয়ে ভীষণ একটা ঝড় উঠেছে টুকুন দিদিমণির বাড়িতে। সে টের পেয়েই গত দু রোববার একেবারে ডুব মেরেছে। এমন কি বড় শহরে ফুল নিয়ে গেলে পাছে তার লোভ হয় একবার টুকুন দিদিমণির সঙ্গে দেখা করার, সেজন্য সে নিজে আর শহরে যাচ্ছে না। স্টেশন পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসে। ফুলের সব বিক্রি-বাট্টা, যারা কাজ করে তাদের ওপর। ওর যেন কেবল ইচ্ছা সে কত বড় ফুল আর কত বেশী ফুল চাষবাস করে তুলতে পারছে, এবং এ-ভাবে সে সবার জন্য এবং নিজের জন্য অর্থাৎ এই যে ঈশ্বর পরিশ্রমী হতে বলছে, সে কতটা পরিশ্রমী হতে পারে তার যেন একটা প্রতিযোগিতা। বস্তুত সে চাইছিল কাজের ভিতর ডুবে গিয়ে টুকুন দিদিমণির কথা ভুলে যেতে।

সুতরাং বিকেল হলেই যখন তার লোকেরা গাছে গাছে জল দিয়ে যায়, যখন জমির আগাছা বেছে নবীন উঠে দাঁড়ায় এবং বুড়ো মানুষটার ছবি কাঞ্চন ফুলের গাছটায় ছায়ায় ভেসে ওঠে— তখন সে গাছের পাতায় পাতায়, ফুলের পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে জীবনের সৌরভ খুঁজে বেড়ায়। ভাবতে অবাক লাগে টুকুন দিদিমণির ওপর তার ভীষণ একটা লোভ আছে। ঠিক সেই অজিতদার স্ত্রীয় মত যেন। এবং এ-ভাবে সে মাঝে মাঝে নিজেকে ভীষণ অপরাধী ভেবে ফেলে। যত তার বয়স বাড়ছে, টুকুন দিদিমণির ওপর তত তার লোভ বাড়ছে। এবং এটা টের পেলেই সে আর এইসব ফুলেরা যে সৌরভ নিয়ে বেঁচে থাকে তা মনে করতে পারে না। এবং শেষটায় সে দিশেহারা হয়ে গেলে কঠিন অসুখের ভিতর যেন সেও পড়ে যাবে। সে বলল, যেন নিজেকে শুনিয়ে বলল— আমি খুব খারাপ মানুষ টুকুন দিদিমণি। এতদিনে আমি এটা টের পেয়েছি।

আর তখনই সেই উপত্যকার ওপাশে যে একটা বড় রাস্তা চলে গেছে, মনে হল সেই রাস্তায় একটা গাড়ি এসে থেমেছে। এখন বিকেল। সূর্যাস্তের সময় গাছ পালার ভিতর দিয়ে রোদ লম্বা হয়ে পড়েছে। গাড়িটা নীল রঙের। ভীষণ ঝকঝকে। আর সূর্যাস্তের বেশী দেরি নেই। ফলে সূর্য তার আশ্চর্য লাল রং নিয়ে এক্ষুনি গাছপালার ওপর ছড়িয়ে যাবে। এবং এমন একটা সৌন্দর্যের ভিতর হাল্‌কা সিল্‌কের পোশাক পরে যদি কেউ ফুলের উপত্যকায় নেমে আসে— যেখানে কেউ নেই, আছে সুবল, আর বুড়ো মানুষটা, তার যত রাজ্যের নানাবর্ণের ফুল, নদীর নির্মল জল। ওপারে বন। বনের গাছপালা যখন ভীষণ নিবিড় তখন সুবল অপলক না তাকিয়ে থাকে কি করে। ক্রমে অনেকটা হেলে দুলে সে যেন চলে আসছে। সুবল দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছেনা। তার কাছে কিছুটা স্বপ্নের মত লাগছে। সে চোখ মুছে ভাল করে দেখছে সব। সে মুগা রঙের পাঞ্জাবী পরেছে। পায়ে তার ঘাসের চটি, এবং সে আজ ধুতি পরেছে। বিকেল হলেই স্নান করার

স্বভাব সুবলের। সে বেশ পরিপাটি সেঁজেগুজে যখন নদীর ঢালুতে একটু চুপচাপ বসে থাকবে ভাবছিল, যখন ফুলের গাড়িটা টংলিং টংলিং শব্দ তুলে মাঠের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তখন কিনা আশ্চর্য সুন্দর এক মেয়ে, প্রায় যেন রাজকন্যার সামিল, পায়ের গোঁড়ালির ওপর সামান্য শাড়ি তুলে প্রায় যেন ধীরে ধীরে উড়ে আসছে।

সুবল কাছে এলেই বুঝতে পারল, টুকুন দিদিমণি।

সুবল এবার হাত তুলে গন্ধরাজের ডাল ফাঁক করে ডাকল টুকুন দিদিমণি।

টুকুন,, চারপাশে তাকাল সে সুবলকে দেখতে পাচ্ছে না। সুবল যে গন্ধরাজ ফুলের গাছগুলোর ভিতর চুপচাপ অদৃশ্য হয়ে আছে টুকুন টের পাচ্ছেনা। সে চিৎকার করে বলল, সুবল তুমি কোথায়?

—আমি এখানে টুকুন দিদিমণি।

—আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা সুবল।

—তুমি আমাকে দেখতে না পেলে হবে কেন। কাছে এস। কাছে এলেই টের পাবে আমি ঠিক এখানে আছি।

কি ভীষণ প্রতীক্ষায় মগ্ন চোখ মুখ টুকুনের। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেবল ফুল আর ফুল। কত যে ফুল ফুটিয়ে রেখেছে সুবল। সুবল যে গন্ধরাজের গাছগুলোর পাশে পাশে হাঁটছে টুকুন টের পাবে কি করে। সেতো কেবল দেখছে, ফুল আর ফুল। আর দেখছে, বড় একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ। সাদা ফুলে ছেয়ে আছে। নীচে পরিপাটি করে কিছু বিছানো। এবং বুড়ো মত একজন মানুষ বসে আচে। বরফের মত সাদা দাড়ি, পরিপাটি সাদারঙ গায়ে লম্বা আলখেল্লা, পরনে খোপকাটা লুঙ্গি মাথায় সাদা টুপি। হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। মুখ কি প্রসন্ন! হাত সামনে রেখে সে আছে মাথা নীচু করে। চুল এত সাদা যে দূর থেকে একটা বড় কদম ফুলের মত লাগছে। আর আশ্চর্য মানুষটা ওর গলায় স্বরে এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না। মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। নিবিষ্ট মনে বুঝি ঈশ্বর চিন্তা করছে। এমন ঈশ্বর চিন্তা মানুষের এখন থাকে সে যেন টুকুনের জানা ছিল না। সে বুঝতে পারল — এই সেই বুড়ো মানুষ। সুবল যার গল্প কতবার করেছে। বলেছে, টুকুন দিদিমণি আমার দেশটা তোমার রাজপুত্রের ছোট্ট গ্রহাণুর চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়।

টুকুন দেখল, সত্যি এটা একটা আলাদা দেশ। যেন দুঃখ দৈন্য বলে এখানে কিছু নেই। কেবল ফুলের আশ্চর্য সৌরভ। এবং এই সৌরভের বিতর বসে আছে এক বৃদ্ধ মানুষ। টুকুন মুখে আঙ্গুল রেখে ইসারা করল অর্থাৎ যেন বলছে এটা ঠিক হবে না সুবল, মানুষটা প্রার্থনায় মগ্ন তখন এস তুমি আমি বসে ওকে চুপচাপ দেখি।

আর তখন সুবল এসে পাশে বসে বেশ সুন্দর দৃশ্য তৈরি হয়ে যায়।

এক বুড়ো মানুষ, বয়স যে কত, কে জানে তার সঠিক বয়স কি, সে নিজেও হয়ত জানে না, তার বয়স বলে কিছু আছে, এই পৃথিবীর যেন সে আদিমতম মানুষ, সুন্দর করে এই পৃথিবীর শেষ রস গন্ধ শুষে নিচ্ছে। এখন তাকে দেখলে এমন মনে হয়।

কিছু কাঞ্চন ফুলের পাঁপড়ি তখন ঝরে পড়ছিল ওদের ওপর। হাওয়ায় দুটো একটা পাঁপড়ি বেশ উড়ে উড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। কেমন একটা বাতাসের হিল্লোল। ক-দিন আগে বৃষ্টিপাতের দরুন দারুণ সবুজ আভা, এবং তার ভিতর অজস্র সুবাস এসে যেন যথার্থ এক অন্য গ্রহাণু সৃষ্টি করছে!

আর তখন সেই মানুষ যদি চোখে দেখতে পেত তবে দেখত একটা ছবির মত মেয়ে ঘাসের ওপর বসে আছে। স্থির। নিশ্চল। এতটুকু নড়ছে না। সুবলকে পর্যন্ত চেনা যাচ্ছে না। সুবল যে সত্যি সুমগ্ন তবে বুড়োমানুষটা তা বুঝতে পারত। অথচ আশ্চর্য বুড়ো মানুষটা বুঝতে পারছে সামনে সুবল এবং একটা মেয়ে বসে আছে। চাষবাসের এই যে ফুল ফল, এবং পাশের সবুজ গন্ধ, সব মিলে এই মেয়ে কি যে মহিমময় মনে হচ্ছে। সে যেন তার ঈশ্বর চিন্তায় এমন এক জগৎ আবিষ্কার করে ফেলে তন্ময় হয়ে যায়। কোন দুঃখ থাকেনা সেখানে কোন জড়তা নেই। তার কাছে মানুষের ছোট খাট সুখ দুঃখেরও মানে বড় বেশী। সে সেই নিরাকার অবরণহীন অস্তিত্বের কথা যত বারই ভাবুক না কেন-কি জানি, কেন যেন সে বার বার সেখানে তার এই ফুলের উপত্যকাকেই আবিষ্কার করে ফেলে। এবং সে এ-ভাবে বুঝতে পারে তার কাছে সব চেয়ে সুন্দরতম জায়গা, এই ফুল, ফলের উপত্যকা। যা কিছু সুখ, যা কিছু আকাঙ্ক্ষা সব সে এর ভিতর ঈশ্বর প্রাপ্তির মত টের পায়। সে কিছুটা অনুমানের ওপর বলল, তোরা।

—আমরা চাচা।

—এই তোর সেই মেয়েটা।

সুবল হাসল।—কোন মেয়েটা?

—যে মেয়েটা ভাবত, আর বাঁচবে না।

—হ্যাঁ চাচা সেই মেয়ে।

—এখন কি ভাবছ মেয়ে?

—আমি আপনাকে দেখছি। কিছু ভাবছি না।

টুকুন দুষ্টুমেয়ের মত কথা বলল।

—আমাকে। আমিতো বুড়ো মানুষ।

—বুড়ো মানুষ এমন সুন্দর হয় জানতাম না।

সুবল বলল, চাচা কিন্তু দেখতে পায়না।

টুকুন বলল, যাঃ।

—হ্যাঁ।

—তবে আমাদের যে বলল, তোরা!

— ওর আর একটা ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছে। সে টের পেয়ে যায়। তার এই নিজের হাতে তৈরি ফুলের উপত্যকাতে কে এল কে গেল। কোন গাছে কি ফুল ফুটেছে সে এই কাঞ্চন ফুল গাছটার নীচে বসে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে।

টুকুন বলল, আমার অসুখ, আমি বাঁচবনা, আপনাকে এমন কে বলেছে।

বুড়ো মানুষটার যা স্বভাব, দাড়িতে হাত বোলানো এবং যেন এ-ভাবে বলে যাওয়া — টুকুন সুবলতো কাজের ফাঁকে জল আনার সময়, অথবা সব আগাছা বেছে দেবার সময় কেবল একজনের কথাই বলে থাকে — সেতো তুমি। তোমার নাম টুকুন দিদিমণি। তুমি বিছানাতে একটা মমির মত শুয়ে থাকতে। সুবলের মুখ দেখলে তখন বুঝতে পারতাম — সে নানাভাবে তোমাকে ভালো করার চেষ্টা করছে। ঠিক সে যেমন এই ফুলের উপত্যকায় এসে চারপাশে যা কিছু আছে, সব কিছু নিয়ে মগ্ন হয়ে গেল, তেমনি সে মগ্ন ছিল, তুমি কি কি করলে আনন্দ পাবে — সুবল কতভাবে যে তখন এই সব মাঠে বড় বড় নানা বর্ণের ফুল ফোটাবার চেষ্টা করেছে। সুবল তোমার জন্য সব চেয়ে দামী ফুলের গুচ্ছ নিয়ে যেত। এ-ভাবে আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। ঈশ্বরের পৃথিবীতে তুমি একটা অসুখে ভুগছিলে। অসুখটা ছিল তোমার মনের। তোমার বড় বেশী ছিল বিশ্বাসের অভাব। তোমার সব আকাঙ্ক্ষা মরে যাচ্ছিল। সুবল আবার তোমাকে আকাঙ্ক্ষার জগতে ফিরিয়ে এনেছে। এখন তোমার ভাবনা, মানুষ এমন আশ্চর্য পৃথিবী ছেড়ে চয়ে যায় কি করে। সে কেন মরে যায় — কেমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে কেউ কোথাও এক দণ্ড থাকতে পারে তোমার বিশ্বাস হয় না। এ-ভাবে আমি টের পেতাম — যে মানুষ তোমাকে আকাঙ্ক্ষার জগতে ফিরিয়ে অনল — তার কাছে তুমি একদিন না একদিন আসবেই। কতদিন বলেছি তোর টুকুন দিদিমণিকে আসতে বলিস এখানে। দেখে যাক — পৃথিবীর আর একটা ছোট জায়গা আছে — যেখানে মানুষেরা কেবল ফুল ফোটায়। মানুষ তার নিজের স্বভাবেই সুন্দর পৃথিবী গড়তে ভালবাসে।

টুকুন বলল, চাচা তুমি সত্যি দেখতে পাওনা।

— যাঃ দেখতে পারব না কেন! এখন আমি সব চেয়ে ভাল দেখি। এতদিন যা আমার চোখের আয়ত্তে ছিল তাই দেখতাম। এখন তো আরও অনেক দূরের জিনিস এই ধর হাজার লক্ষ মাইল দূরে এই সৌরলোকের কোথায় কি আছে সব যেন নিমেষে দেখে ফেলি। সুবল আমাকে যে ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প শুনিয়েছিল আমি এখন তার মত এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে নিমেষে চলে যেতে পারি। কোন কষ্ট হয় না। না দেখলে কি করে টের পেতাম তুমি আজ আমার বাগানে এসেছ।

এ-ভাবে এক বুড়ো মানুষ তার ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে এখন সব কিছু

দেখতে পায়। আগে সুবল ওর কোরান শারিফ পাঠের জন্য একটা ছোট্ট মত কাঠের র‍্যাক করে দিয়েছিল। বিকেল হলেই বুড়ো মানুষটা কাঞ্চন ফুলের গাছটার নীচে গিয়ে বসত। চোখে ভারি কাচের চশমা লাগিয়ে সে নিবিষ্ট মনে পড়ে যেত সুর দরে। তার সে নানা রকম ব্যাখ্যা শোনাতো সুবলকে। সুবল বসে বসে শুনত সব। একটু মনোযোগের অভাব দেখলেই ধমক লাগাত। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকবে না কেন ঃ আল্লা ঈশ্বর তো আলাদা নন। সে সুর ধরে পড়ে গেলে ওর চোখে মুখে আশ্চর্য সুষমা ভেসে উঠত। এবং এ-ভাবেই এক এক করে সুবল যেন গোটা বইটার মানে জেনে ফেলেছিল। যেমন সে দেখেছিল জনার্দন চক্রবর্তী চণ্ডিপাঠ অথবা গীতাপাঠ করে সবাইকে তার ব্যখ্যা শোনাতো এখানেও তেমনি কিছু হচ্ছে অথচ আশ্চর্য সব বাদ দিয়ে যা মনে থেকে যায় সবটাই যেন মানুষের ভালোর জন্য বড় বড় মানুষেরা সব কাব্য রচনা করে গেছেন।

সুবল বলল, এখন সময় পাই না। এখন শুক্রবারে চাচার জন্য নীলপুর থেকে আসে আক্রম খাঁ। সে সারাটা দিন নামাজের ফাঁকে ফঁকে চাচাকে কোরান পাঠ করে শোনায়।

টুকুন বলল, আর কি ভাবে দিন কাটে তোমার?

—আমার এ-ভাবেই দিন কেটে যায়।

সুবল কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। পাশে টুকুন হাঁটছে। ফুলের সৌরভের কাছে টুকুন দিদিমণির দামী প্রসাধন কেমন ফিঁকে হয়ে গেছে। সে বলল, এটা শ্বেত করবী। বলে সে কটা ফুল হাতে তুলে নিলে টুকুন বলল, আমাকে দাও।

এবং টুকুন ফুল কটা নিয়ে খোঁপায় গুজে দিল। ববকাট চুলে আজ নকল চুল বেঁধে খোঁপা করেছে দিদিমণি। এবং খোপার ফুল গুজে দিলে টুকুন দিদিমণিকে আর শহরের মেয়ে মনে হয় না, কেমন কে বনের দেবী হয়ে যায়। ওর বড় ইচ্ছা একদিন সে টুকুন দিদিমণিকে নিয়ে ও-পারের বনে যায়। এবং সারাদিন বনের ভিতর চুপচাপ বসে থাকা, অথবা গল্প, দিদিমণি আর কি কি নূতন বই পড়েছে, সুবল তো বই পড়তে পারে না, টুকুন দিদিমণির সঙ্গে দেখা হলেই নানা রকম গল্প শোনার ইচ্ছা এবং টুকুন দিদিমণি কি যে সব সুন্দর সুন্দর পৃথিবীর খবর নিয়ে আসে। তার ইচ্ছা বনের দেবীকে ঠিক একদিন বনে নিয়ে যাবে। এবং বনের ভিতর ছেড়ে দিয়ে সেই যে সে একজন কাঠুরের গল্প শুনেছিল, কাঠুরে রোজ কাঠ কাটতে যেত বনে, এবং দেখতে পেত এক ছোট্ট মেয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, সে মেয়েকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে যেত, ফলে তার কাঠ কাটা হত না, সে কাঠ না কেটেই চলে আসত এবং এভাবে সংসারে তার ভারি অভাব— অথচ সে দেখে বনের ভিতর রোজই মেয়েটা রাস্তা হারিয়ে ফেলে, এবং তাকে গ্রামের পথ ধরিয়ে দিতে হয়। কাঠুরিয়ার কাঠ কাটা হয় না। এবং এভাবে কাঠুরিয়া জানে

না, এক বনের দেবী তাকে নিয়ে খেলা করছে। তারপর সে অভাবের তাড়নায় আর বাড়ি ফিরে না গেলে একটা ফুলের গাছ দেখিয়ে বলেছিল ছোট্ট মেয়েটা একটা চাঁপা ফুল রোজ এ-বনে ফুটবে। সেটা তুই নিয়ে যাবি। সে কথামত চাঁপা ফুল বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখেছিল — চাঁপা ফুল স্বর্ণচাঁপা হয়ে গেছে। একটা ফুল বিক্রি করলে তার অনেক টাকা হয়ে যায়। সে রোজ বনে এসে সেই ফুলটা কখন ফুটবে সেজন্য বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই বনের কোথায় যেন এক শ্রীহীন রূপ ফুটে উঠছে। সেই মেয়েটি, যে তাকে নিয়ে খেলা করে বেড়াতো তাকে না দেখতে পেলে বুঝি ভাল লাগে না, এই চাঁপা ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে সে রোজ রোজ কি করবে! সেই মেয়েটা তাকে যে এ-ভাবে বেল্লিক করে দেবে সে ভাবতেই পারে না। সে দেবীর দেখা পেয়েও পেল না। সে বলত, বনের দেবী তুমি আমার কাছে এমন ছোট্ট হয়ে থাকলে কেন! বনের দেবী তুমি আমাকে এমন লোভে ফেলে গেলে কেন। আমার যে এখন হাজার অভাব। বেশ ছিলাম মা জননী, কাঠ কাটা, কাটা কাঠ বেঁচে পয়সা, স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে মিলে আহার — তারপর সন্ধ্যা হলে আমার বউ পিঁদিম জ্বালাত। আমার সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল, এখন মা জননী এত টাকা আমার, অথচ দ্যাখো বউটার রেলগাড়ি না হলে চলে না। এবং সেই গল্প মনে হলে সুবলের মনে হয় টুকুন দিদিমণি বনের দেবী হবে ঠিক, কিন্তু ছোট্ট মেয়ে সেজে তার লোভ বাড়াবে না। সে বলল, দিদিমণি ওপারে একটা সুন্দর বন আছে। যখন কিছু ভাল লাগে না, নদী সাঁতারে আমি ওপারের বনে উঠে যাই। চুপচাপ গাছের নীচে বসে থাকি।

এভাবে ওরা কথা বলতে বলতে অনেকদূর চলে এসেছে। সামনে সেই ছোট্ট নদী। যেমন ছোট্ট উপত্যকা নিয়ে সুবলের ফুলের চাষ তেমনি ছোট্ট নদী নিয়ে, ছোট্ট একটা বন নিয়ে সুবল বেশ আছে। আর কি নির্মল জল নদীতে। টুকুন নেমে যাবার সময় দুপাশের জমিতে দেখল অজস্র অপরাজিতা ফুটে আছে। নানা রকম বাঁশের মাচান ছোট ছোট। সেখানে ফুলের লতা বেয়ে বড় হচ্ছে, সজীম হচ্ছে। একেবারে সমুজ রঙ, ফুলের রঙ নীল, ভিতরটা শঙ্খের মত সাদা। এবং টুকুনের ইচ্ছা হল এ-ফুলের একটা লম্বা মালা গাঁথে। ফুলের সৌরভ নেই কোন। অথচ কি সুন্দর নরম ফুলের মালা! এমন মালা হাতে গলায় পরে, সর্বত্র ঠিক নূপুরের মত বেঁধে রেখে কেমন সেই যেন শকুন্তলা প্রায় তপোবনে তার ঘুরে বেড়ানো। টুকুন বলল, আমি নীদতে সাঁতার কাটব।

— এত অবেলায় সাঁতার কাটলে অসুখ হবে।

টুকুন বলল, আমি তুমি সাঁতার কেটে সুবল ওপারে উঠে যাব। বনের ভিতর হারিয়ে গিয়ে দেখব, কি কি গাছ আছে। তুমি গাছের নাম বলে যাবে, আমি গাছ চিনে রাখব। কত বড় হয়েছি, অথচ দ্যাখো কোনটা কি গাছ ঠিক চিনি না।

সুবল বলল, বনের ভিতর গেলে আমার কেবল ভয় হয় তুমি বনদেবী হয়ে যাবে।

—তা হলে কি হবে ?

—তুমি আমাকে লোভে ফেলে দেবে।

—সে আবার কি !

—সে একটা লোভ। সোনার চাঁপা ফুল। পেলে আর ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় না। তখন অসুখটা বাড়ে।

টুকুন দেখেছে, সুবল চিরদিন এ-ভাবেই কথা বলেছে। কথায় কেমন হেঁয়ালি থাকে, সে কখনও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অথচ মনে হয়, সুবল যা বলে তা সত্যি। সে সঠিক মানে না বুঝলেও সুবলের কথা শুনতে তার চিরদিন ভাল লাগে। সে বলল, সোনার চাঁপা ফুলটা কি ?

—সে একটা লোভ দিদিমণি।

—সেটা কি ?

—সেটা একটা কাঠুরিয়ার গল্প।

—কে বলেছে ?

—আমাদের বুড়া কর্তা।

—তবে শুনতে হয়। বলে সে শাড়ি সামান্য তুলে নদীর জলে সামান্য নেমে গেল। বালির জন্য পা দেবে যাচ্ছে না। কি সুন্দর আলতা পরেছে টুকুন দিদিমণি। জলের নীচে পায়ের পাতা মাছরাঙ্গার মত দেখাচ্ছে। সুবল এমন দেখলেই কেমন লোভে পড়ে যায়। ওর শরীর ফুলের সৌরভের মত কাঁপে। সে টের পায় চোখ মুখ কেমন জ্বালা করছে। কিন্তু টুকুন দিদিমণিকে সে কেন জানি ছুঁতে ভয় পায়। কি সব আশ্চর্য সুবাস শরীরে মেখে রাখে। কি নরম সিল্‌ক পরে থাকে, আর কি রঙবেরঙের লতাপাতা আঁকা পোশাক ! সবটা এমন যে সে ভাল করে চোখ তুলে কখনও কখনও দেখতে ভয় পায়। এবং এমন হলেই সে বলে, বেশ ছিল কাঠুরিয়া। টুকুন একটু জল অঞ্জলীতে নিয়ে কি দেখে ফেলে দেবার সময় বলল, কি দেখছিল ?

—এই তোমার বেশ ছিল। সে পরিশ্রমী মানুষ ছিল। কাঠ কাটত। কাঠ বিক্রি করত। কাঠ বিক্রির পয়সায় চাল ডাল এবং সবাই রাতে বেশ পেট ভরে খেত। তারপর কি ঘুম এল। কোন হুঁস থাকত না। সকাল হলে সে শরীরে ভীষণ জোর পেত। তার কোন রোগভোগ ছিল না।

টুকুন বলল, সে তবে সুখী লোক ছিল ?

—খুব। সে নদী পার হত সাঁতরে। গায়ে তার অসুরের মত শক্তি। সে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে খাদ্য পোশাক এবং আশ্রয় পেত। একটু থেমে সে বনের দিকে চোখ তুলি কি খুঁজল। তারপর বলল, বুড়ো কর্তা বলেছে, এটাই নাকি ঈশ্বরের বিধান। তার পবিত্র পুস্তকে বুঝি এমনই লেখা আছে। সে এখানে একটু সাধু ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল। কাঠুরিয়া

ঈশ্বরের নিয়ম থেকে সরে গেল। বনদেবী তাকে লোভে ফেলে নিরুদ্দেশে গেল।

টুকুন দেখল কেমন উদাসীন চোখে সুবল ওকে দেখছে।

— কি দেখছ সুবল ?

— তোমাকে দেখছি টুকুন দিদিমণি। কাঠুরিয়া তারপর থেকে ফুলটার জন্য রাতে ঘুম যেতে পারত না।

— আমাকে দেখে সেটা তোমার মনে হল ?

— তোমাকে দেখে কিনা জানি না, আজকাল আমার মাঝে মাঝেই এমন হয়।

— সেজন্য আমাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছো !

— ছেড়ে ঠিক দিইনি। যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার মা এ-জন্য ভীষণ কষ্ট পায়। কেউ কষ্ট পেলেই আমার খারাপ লাগে। বলে সে বালির চরের দিকে হেঁটে যেতে থাকল। ওপারের বনের ছায়া ক্রমে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ওদের দুজনের ছায়াও বেশ লম্বা হয়ে নদী চর পার হয়ে যাচ্ছে। ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। একজনের শরীরে সব সহরের সুগন্ধ। অন্য জন ফুলের সৌরভ শরীরে মেখে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতেই বলা, কাঠুরিয়ার তখন বড় ভয়, সেই চাপা ফুলটা কে না কে চুরি করে নিয়ে যায় !

— কার আবার দায় পড়েছে — কে জানে যে বনে সোনার চাঁপা ফুটে থাকে।

— জানতে কতক্ষণ। সেতো ততদিনে লোভে পড়ে গেছে। সে শহরে যায় — স্যাকরার দোকানে ফুলটা বিক্রি করে, ওরা লোক লাগাতে পারে — দ্যাখো তো রোজ মানুষটা ফুল পায় কোথায় ? সেজন্য সে রোজ এক দোকানে চাঁপা ফুল বিক্রি করে না আজ শহরের উত্তরে গেলে, কাল দক্ষিণে। এভাবে সে চিন্তা ভাবনায় বড় উদবিগ্ন থাকে। সে একদিন দেখতে পায় আয়নায়, সব চুল পেকে যাচ্ছে, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। সে কেমন অল্প বয়সে বুড়ো মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আর যা হয় সে চাঁপা ফুলটা চুরি যাবে বলে, রাত না পোহাতে বনে চলে যায়। তারপর বনের পাতালতার ভিতর নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকে। চারপাশের পোকামাকড়েরা ওকে কামড়ায়। সে এটুকু ভ্রূক্ষেপ করে না। সেতো জানে না এভাবে লোভের কীটেরা তাকে দংশন করে ক্রমে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

সুবল এবার বালির চরে বসে পড়ল। এখন ওদের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে নেই। বরং ছায়াহীন এক মাঠ, দূরাগত পাকির ডাকের মত তাদের কেমন নির্জন পৃথিবীতে যেন নিয়ে এসেছে। সুবলের যা হয়, এমন এক রিরিবিলি নির্জন পৃথিবীতে বসে থাকলেই বুঝি তার ভাল ভাল কথা বলতে ভাল লাগে। সেজন্য বোধহয় সাধু ভাষায় ক্রমে কথা বলতে পারলে ভীষণ খুসী হয়। সে বলল, টুকুন দিদিমণি কাঠুরিয়া দিন রাতের বেশী সময়টাই

বাড়ির বাহিরে থাকত। সে যখন ফিরত শহর থেকে গাড়িতে তাকে বড় ক্লান্ত দেখাত। ফিরে এসে দেখত, বৌ তার রেল গাড়িতে চড়ে কোথায় গেচে। ছেলেরা বলত, মায়ের ফিরতে রাত হবে বলে গেছে বাবা।

টুকুন বলল, এভাবে সুখী মানুষটা পরিশ্রম ছেড়ে দিয়ে দুঃখী মানুষ হয়ে গেল।

—এভাবে টুকুন দিদিমণি মানুষটা কষ্টের ভিতর পড়ে গেল।

এবং এ-ভাবেই টুকুনের মনে হয় তার বাবাও একটা ভীষণ কষ্টের ভিতর পড়ে গেছে। বাবার জীবনের সঙ্গে কাঠুরিয়া জীবনের কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে। টুকুন বলল, জানো বাবার জন্য আমার ভারি কষ্ট লাগে। কাঠুরিয়ার মত বাবাও আমার দুঃখী মানুষ। বাবাও আমার আরও কত গাড়ি, কত বাড়ি বানানো যায়— সেই আশায় একটা বড় রেলগাড়িতে চড়ে বসে আছে। কিছুতেই নামতে চাইছে না।

সুবল সহসা অন্য কথায় চলে এল। বলল, কোথায় যে একটা চারা পাই। ওটা পেলেই আমার এ-ফুলের উপত্যকা ভরে যাবে। আমার আর কিছু লাগবে না।

টুকুন বলল, আমিও গাছটা খুঁজছি। বাবাও খুঁজছেন।

কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ গাছটা আসলে পৃথিবীতেই নেই।

তারপর ওরা আর কোন কথা বলল না। চুপ চাপ বসে থেকে এই সব বন উপবনের নানারকম বর্ণাঢ্য শোভার ভিতর ডুবে গেল। ওরা শুনতে পাচ্ছে— পীটপতঙ্গেরা সব ডাকছে। পাখির নদী পার হয়ে যাচ্ছে। খরগোসেরা দল বেঁধে শস্যদানা খাবার লোভে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আরও কত কি—কি যে আশ্চর্য মহিমময় এই পৃথিবী। অথচ কখন সোনার চাঁপা ফুটবে, সেই আশায় একটা গিরগিটির মত গাছের ডাল দেখছে কাঠুরিয়া। চারপাশে তার এত বড় পৃথিবী, আর এমন সুন্দর দিন গাছ পালার ভিতর বর্ণাঢ্য সব শোভা নিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে জানতেও পারছে না। লোভ তাকে সব কিছু থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।

টুকুনের আজ এখানে এসে কেন মনে হল, মানুষেরা ক্রমে গিরগিটি হয়ে যাচ্ছে। সুন্দর দিনগুলি তারা আর ঠিক ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। কাঠুরিয়ার মত বনে জঙ্গলে শুয়ে আছে, কখন সোনার চাঁপা ফুটবে গাছে, আর খপ করে তুলে নেবে। তারা কিছুতেই পরিশ্রমী হবে না। পরিশ্রমী না হলে সুন্দর দিনেরা মানুষের কাছ থেকে ক্রমে সরে যায়।

এই ফুলের জগতে সুবলকে দেখে কেবল টুকুন কেমন এখনও সাহস পায়। সুন্দর দিনেরা ঠিক ঠিক কোথাও একদিন আবার এ-ভাবে ফিরে আসে। এবং এ-ভাবে মানুষেরা পৃথিবীতে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকে।

।। উনিশ ।।

তখন শহরে মিছিল যাচ্ছে। মিছিলে স্লোগান — ঘোরাও চলছে, চলবে। স্লোগান আমাদের দাবি মানতে হবে।

বড় বড় লাল শালুতে দাবির ঘোষণা। বেশ বড় বড় করে লেখা — বেতনের একটা নিম্নতম হার।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে মিছিলের দিকে চেয়ে এক ভিখারিনী, পাগলিনী-প্রায়, ভীষণ হাসছিল। আর হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছিল — দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।

মজুমদার সাহেবের ড্রাইভার বলল — স্যার, আর এগুনো ঠিক উচিত হবে না।

মজুমদার সাহেবের ড্রাইভার খুব পুরানো লোক। এবং কি হবে না হবে সেটা তার মেন করিয়ে দেবার স্বভাব। সে বলল — মিছিল শেষ হলেই গাড়ি জ্যামে পড়ে যাবে।

মজুমদার সাহেব টুবাকো টানেন। পাইপে ধোঁয়া উঠছে না। তিনি বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে ফের কটা টান দিয়েও যকন দেখলেন ধোঁয়া উঠছে না, তখন কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ক্লাবে আজ একটা বড় রকমের লাইসেন্সের লেনদেনের ব্যাপার আছে। ট্যাণ্ডন সাব আসবেন। তাঁকে খুশি করার ব্যাপারও একটা আছে। মিস ললিতাকে সেজন্য তিনি ফোনে বলে রেখেছিলেন, আর রাস্তায় নেমে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের ভিতর আটকে যাওয়া! তিনি কেমন বিরক্ত মুখে বললেন — দিন দিন এসব কি যে হচ্ছে বুঝি না।

ড্রাইভার বলল — স্যার বরং গাড়ি বাড়িতে নিয়ে যাই।

কোনো উপায় নেই বুঝতে পারলেন। কেবল তারা যাচ্ছে। আর চারপাশে গাড়ির হর্ন। এভাবে ক্রমে এই রাস্তা একটা গাড়ির পিঁজরাপোল হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভিতর। তিনি যে এখন কি করেন! তাঁর হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে। অথবা এই সব মিছিলের মানুষদের ধরে শহরের বাইরে বের করে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি বললেন — দ্যাখো ব্যাক্ করতে পারো কিনা।

এবং তখনই পাগলিনী হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে — দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। হাতে তার লাঠি। লাঠির মাথায় পালক। পাগলিনীকে ভীষণ দাম্ভিক মনে হচ্ছে। মজুমদার সাহেব বললেন — দ্যাখো পাশ কাটাতে পারো কিনা!

তারপর ফিরে এসে ফোন। প্রোগ্রাম ক্যানসেল। ভিতর বাড়িতে এ-সময় কারো থাকার কথা না। টুকুনের যাবার কথা আছে একাডেমিতে। ইন্দ্রকে নিয়ে যাবে। এখন টুকুন ভীষণ ভালো গাড়ি চালাতে পারে। ওঁর ইচ্ছা

হাতের সব কাজ হয়ে গেলে একবার গাড়িতে স্বামী-স্ত্রী-টুকুন সবাই কাশ্মীর যাবেন। খুব জমবে। টুকুনের মা নিশ্চয়ই দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের চাঁদা আদায়ের জন্য মিঃ তরফদারের কাছে গেছে। সেখান থেকে ফিরতে ওর রাত হবার কথা।

অথচ এমন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে মনটা খচ্ খচ্ করছিল। তবে তিনি ট্যাণ্ডন সাবকে জানেন, ভীষণ লোভী মানুষ। আশ্চর্য সৎ টাকা-পয়সার ব্যাপারে। এক পয়সা ঘুষ তিনি নেন না কথিত আছে। তবে যে দেবতা যাতে খুশি। ললিতা সম্পর্কে এমন একটা ছবি তৈরি করে রেখেছেন ট্যাণ্ডন সাবের মনে যে তাঁর আর সূর্যাস্ত না দেখে উপায় নেই। নদীর পাড়ে খোলামেলা বাতাসের ভিতর কেটা নিরিবিলি গাছের ছায়ায় ট্যাণ্ডন সব আর ললিতা। সব ব্যবস্থা মুজমদার সাহেব নিপুণভাবে করে রেখেছেন। অথচ সেই সময়টার কিনা মিছিলের লোকগুলি— কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে পয়সা কামাতে চায়! কি যে স্বভাব মানুষের এবং এটা বাঙালিদের ভিতর খুব বেশি এমন মনে হলে তাঁর কেন জানি মনে হয় আর এ-জাতিটাকে বাঁচানো গেল না। খুব যে আপসোস চোখমুখে। বিরক্ত ভাবে তিনি তাঁর নিচের ঘরটাতে ঢুকে গেলেন।

রামনাথ তেওয়ারি, ব্যক্তিগত খানসামার কাজও করে, এ সময়ে সাহেবের ফাইফরমাশ খাটার সে মানুষ, মুখ লম্বা করে দঁড়িয়েছিল— কি যে আদেশ করবেন তিনি।

এবং রামনাথ তেওয়ারি ভাবতেই পারে নি, এমন অসময়ে সাহেব তার কুটিরে ফিরে আসতে পারেন! তার পোশাক আশাক ভারি বিশ্রী— সে তাড়াতড়ি প্যন্টের বোতাম আঁটতে ভুলে গেছে। সে দঁড়িয়ে ছিল অ্যাটেনশান হয়ে। পাগড়ি তার ঠিক ছিল না। স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ হতেই তার মনে হলো কি যেন দেখছেন, মজুমদার সাব।

সে একটু হকচকিয়ে কেমন বোকার মতো হেসে দিল।

তারপর যে হয়, তাঁর আঙ্গলি সংকেতই যথেষ্ট। রামানাথ দেখল ওর প্যান্টের বোতাম আলগা। নিচে কিছু পরার স্বভাব নেই বলে এমনটা হয়। সে জানে আরও ক-বার তা এমন হয়েছে। এবং মুজমদার সাবেব লাস্ট ওয়ার্নিং ছিল। রামনাথ এখন ভীষণ কুপোকাত। সে বলল— সাব আর হবে না।

মজুমদার সাহেবের মনটা ভালো না। তিনি তাঁর অ্যাটাচড বাথরুমে এখন ঢুকে বেশ ঠাণ্ডা জলে স্নান করবেন। তাঁর বাঁধানো দাঁত এখন টেবিলে একটা মোমের বাটিতে ভেজানো থাকবে। এবং তখন কিনা রামনাথ হাতজোড় করে দাঁড়াল! সাহেব কেমন অবাক চোখে তাকালেন। এ-ব্যাপারে যে তিনি একটা লাস্ট ওয়ার্নিং ওকে দিয়ে রেখেছিলে, বেমালুম ভুলে গেছেন। টুকুনের মা-র ফিরতে অনেক রাত হবে। মিছিল টিছিলের ব্যাপার দেখিয়ে একটা বেশ

অজুহাত তৈরির সুবিধা পেয়ে যাবে।

কারণ এই শহরে মিছিলের পরই জ্যাম আরম্ভ হয়। এবং জ্যাম ভাঙতে ভাঙতে রাত যে কত হয় কত হতে পারে কেউ যেন জানে না। এবং এ-ভাবে টুকুনের মা যত রাত করেই ফিরুক মজুমদার সাহেব কিছু বলতে পারেন না। রাত তাঁরও হয়। তবে তিনি একটা ব্যাপারে ভীষণ ভালো মানুষ, টুকুনের মাকে খুব ভালোবাসেন। ললিতার মতো মেয়েরা ট্যাগুন সাবদের মতো মানুষের ভোগে লাগে— মজুমদার সাব সেখানে সামান্য কৌশলী ব্যাণ্ড-মাস্টার মাত্র।

এবং এভাবে আজকের ব্যাণ্ড-মাস্টার মজুমদার সাহেব নিজে হয়ে যাচ্ছেন। বাথরুমে স্নান করার সময় তাঁর কথাটা মনে পড়ল। মাথায় শাওয়ারের জল। হাতে নানা রঙের পাথর সব — দামী, ভাগ্য ফেরানোর ব্যাপারে সেই যৌবন কাল থেকে পরে আসছেন। এখন দু-আঙ্গুলে দশটা — ক্রমে বয়েস বাড়লে বিশটা হয়ে যাবে। বাথরুমের আলোটা সাদা মতো দেখাচ্ছে। পেটে চর্বি, এবং লোমশ শরীর থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে টুকুনের মা-র কাছে নিজেকে কেমন একটা মনমানুষ মনে হলো। ভাবল, টুকুনের মা-র আসতে দেরি হওয়া স্বাভাবিক। মুখে চোখের ভয়ঙ্কর ঈর্ষা কেমন এক উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গেলে আয়না থেকে চোখ তুলে নেন তিনি। খুব সুগন্ধযুক্ত সামানের ফেনার ভিতর লম্বা টবে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা জলে কি যে ভালো লাগে পাইপ টানতে। এবং অনেক টুকিটাকি কাজ তিনি এভাবে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা জলের ভিতর সেরে ফেলতে পারেন। রামনাথ তখন তাঁর অনেক কাছের মানুষ হয়ে যায়। দরজায় পাহারা — আভি কোই মাত ঢোকনা। সাব নাহানে মে গিয়া।

— রামনা-থ।

রামনাথ বুঝল, বাবুর নকল দাঁত এবার তাকে দিয়ে আসতে হবে। অথচ কি যে বয়স! এমন সামান্য বয়সে দাঁত কেন পড়ে যায় সব সে ভাবতে পারে না। সব না এক পাটির কিছু অংশ সে জানে না। এমন একটা মোমের পাত্রে তা ঢাকা থাকে, এবং সে যখন ভিতরে দিয়ে আসে তখন সাহেবের মুখে এমন একটা ফুলো ভাব থাকে যে দেখলে মনে হবে তাঁর একটা দাঁতও পড়ে নি এবং রামনাথ জানে না, মেমসাব আজও জানে কিনা, দাঁত নকল না আসল। কনফিডেনসিয়াল সব। সে এ-ঘরের টু শব্দটি দরজার বাইরে বের হতে দেয় না। এখানে এই স্নানের সময়টুকু ঘরে ঢুকলেই তাঁর বের হতে হতে দু-ঘন্টা — রামনাথের মনে হয় ঠাণ্ডা জলে কি সব গন্ধদ্রব্য একটার পর একটা ঢেলে তিনি আশ্চর্য এক নীল সমুদ্রের বাসিন্দা হয়ে যেতে চান। সে তখন যেই খোঁজ করুক না — সাব নাহানে মে হ্যায়। বাস তার এক কথা। এমনকি তখন মেমসাব কেমন সন্তর্পণে চলাফেরা করেন। তিনি পর্যন্ত ঢুকে বলতে সাহস পান না, আমি দেখব, দাঁত আসল না নকল।

তারপর যা হয়ে থাকে... নকল দাঁতের শৌখিনতা মানুষের মনে কীরকম থাকে যেন। সে জানে বোঝে নকল দাঁতেরা খুব উজ্জল হয়। পুরানো দাঁত পরে থাকতে বুঝি ভালো লাগে না মানুষের। উজ্জ্বল দাঁত পরে, হাসিটুকু উজ্জ্বল রেখে, সব সময় মানুষ তার নিজের গোড়ালি উঁচু রাখতে হয়। এবং এর ভিতরই থেকে যোয় অসুখটা। টুকুনের ছিল — কিন্তু মজুমদার সব অথবা মেমসাহেবের কোন অসুখ নেই কে বলবে। প্রাচুর্য অনায়াস হলে মানুষের নকল দাঁতের দরকার হয়। মজুমদার সব এটা যে বোঝেন না তা না। খুব বোঝেন। উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ — উদ্যমই সব। অথচ কোথায় যে মানুষেরা উদ্যম বিহনে ভুগে ভুগে অনায়াস প্রাচুর্যের লোভে কখনও মিছিলের ভিতর, কখনও কারখানার ভিতর, আবার কখনও বড় বাড়ির সদরে এক কঠিন অসুখ — আর এ-ভাবে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বের মতো ঘটনাটা আবিষ্কার করে কেমন তিনি উৎফুল্ল হলে দরজার ও-পাশে ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল।

তিনি রামানাথের গলা পাবেন আশা করে বসে আছেন — কে রে? তিনি রামানথকে উদ্দেশ্য করে বাথরুম থেকে বললেন।

— সাব ইন্দ্র দাদাবাবু।

— ইন্দ্র দাদাবাবু।

— হ্যাঁ সাব।

— ছোঁড়াটা জ্যামে পড়ে গেল বুঝি!

— তা কিছু বলছে না।

— তবে কি বলছে?

— মেমসামকে চাইছে।

— ধর। আসছি।

তিনি একটা নীল রঙের তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বেশ ছুটে এসে ফোনটা ধরলেন — হ্যালো কে?

— আমি ইন্দ্র বলছি মেসোমশাই!

— কি ব্যাপার!

— ব্যাপার খুব ভীষণ।

— রাস্তায় আটকা পড়েছ?

— রাস্তায় না, একাডেমিতে। পাশের একটা দোকান থেকে ফোন করছি।

— আটকা পড়েছ মানে?

— টুকুন আমাকে না বলে না কয়ে কখন বের হয়ে গেছে গাড়ি নিয়ে।

— কোথায় গেছে?

— জানি না।

— কখন গেছে ?

— অনেকক্ষণ।

— গেছে যখন, ঠিক ফিরে আসবে। মজুমদার সব এইটুকু বলে ফোন ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র মনে হচ্ছে আরও কিছু বলবে। কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন সে কিছু বলতে ইতস্তত করছে।

— টুকুন আমাকে বলল, একটু বোসো। আমি আসছি।

— আসছি যখন বলেছে, ঠিকই চলে আসবে।

— সে বাড়ি ফিরে যায় নি তো ?

— তোমাকে না নিয়ে বাড়ি ফিরবে কি করে !

— কি জানি, ওর যা মেজাজ।

— কতক্ষণ হলো গেছে ?

— ঘন্টা দুইয়ে ওপর হবে।

মজুমদার সাবের মুখ সামান্য সময়ের জন্য খুব উদ্বিগ্ন দেখাল তারপর ভাবলেন কোনো জ্যামে পড়ে গেছে। তিনি বললেন — আজ তোমাদের বের হওয়া উচিত হয় নি। কি করে যে ফিরবে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার তো যাবার কথা ছিল ওদিকে, কিন্তু কিছুতেই যেতে পারলাম না। রাত দশটার আগে জ্যাম ছাড়বে বলে মনে হয় না।

— এদিকে তো শুনছি মাঠে ভীষণ গণ্ডগোল। পুলিশ আর জনতার খুব মারধর হচ্ছে। যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

— তোমার তো দোকানে থাকা উচিত হবে না এ-সময়। টুকুন ফিরে এসে তোমকে না পেলে ভাববে।

— কিন্তু এমন হওয়া তো উচিত না। কেমন গেপরোয়া। হুশ করে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। সোজা রবীন্দ্র সদন পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল।

— কোথায় যেতে পারে তোমার মনে হয়।

— কি করে বলব। তবে কদিন থেকেই বলছিল ওর বাওবাব গাছের খুব একটা দরকার।

— বাওবাব গাছ ! সে আবার কি !

— সে আমিও জানি না। সুবল একটা বাওবাবের চারা খুঁজছে।

— কত রকমের যে গাছ আছে পৃথিবীতে।

ইন্দ্র মনে মনে হাসল। মেয়ের মতো বাপেরও বুঝি একটা রোগ আছে। মেয়েটা কোথায় গেল, এতটুকু চিন্তা করছে না। সে এবার বলল — মাসিমা কোথায় ?

— এ সময় তো তুমি জানো ও বাড়ি থাকে না। আমিই কেবল অসময়ে বাড়িতে। একটু থেমে বললেন — শোনো, তুমি দেরি করো না। ও এসে তোমাকে জায়গামতো না দেখলে খুব চিন্তায় পড়ে যাবে।

ইন্দ্র এবার হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। সে বলল — ঠিক আছে, যাচ্ছি। সে মজুমদার সাবকে কিছু বলে চটাতে ভয় পায়। টুকুনের সায় নেই, মেসোমশাইরও সায় না থাকলে ওর হিসাব উল্টে যাবে। সে ভয়ে বলতে পারল না — টুকুন আমাকে এসে না দেখলে ভীষণ খুশি হবে, সে এতটুকু ঘাবড়ে যাবে না। বললেই যেন সে ধরা পড়ে যাবে — সে খুব অক্ষম, টুকুনকে সে এতদিনেও হাত করতে পারে নি। এবং অন্য যুবকেরা তো বেশ গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়েই আছে — এক ফাঁকে এই সাম্রাজ্যের ভিতর কি করে লাফিয়ে পড়া যায়। টুকুনের এক মাস্টারমশাই পর্যন্ত — ছোঁড়া খুব দামী গাড়িতে আসে পড়াতে। মেসোমশাইর কাছে ওর খুব সুনাম। আর আশ্চর্য যে একজন পেটি শিক্ষক কি-ভাবেই বা আশা করে টুকুনের মতো মেয়েকে পাবার — তবে যে টুকুনের অসুখ। অসুখ না থাকলে এমনভাবে সে একটা পাখিয়ালার জন্য বাওবাবের চারা খুঁজে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ ইন্দ্রর খেয়াল হলো, যে, মেসোমশাই ফোন ছেড়ে দিয়েছে! সে হঠাৎ কি ভাবতে গিয়ে বলতে পারল না, আমি ঠিক জানি ও কোথায় গেছে! কিন্তু ওটা যে আর বলা হলো না! মেসোমশাই ফোন ছেড়ে দিয়েছে। সে আবার ভাবল ডায়াল ঘুরিয়ে বলবে — কিন্তু তক্ষুনি মনে হলো টুকুন যদি চলে আসে। সে সত্যি যদি ওকে না দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যায়! এমন ভাবতে ইন্দ্রের ভীষণ ভালো লাগে এবং ভালো লাগাটা সে কখনও সত্যি সত্যি মনে মনে মেনে নেয়। কি হবে সব ।নিয়ে — মেয়েটার অসুখ, বড় কঠিক অসুক এক — যা সে নিত্যদিন দেখে দেখে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। কোথাকার এক পাখিয়ালা, কোথাকার এক পেটি শিক্ষক — যারা সহবত জানে না। তারা পর্যন্ত টুকুনের কাছে খুব দামী মানুষ।

ইন্দ্র সুতরাং রাস্তা পার হয়ে যায়। সেই গাছটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। এবং গাড়িগুলোর যাওয়া-আসার পথে সে কেবল ভাবে — এই বুঝি টুকুন এল। ক্রমে রাত বাড়ে এভাবে। ওর ভালো লাগে না। মাকে ফোন করে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলবে ভাবল। মা জিজ্ঞাসা করবে — কি হলো, তোকে তো টুকুন পৌঁছে দিয়ে যায়। আজ তোর এমন কথা কেন! সে কেন জানি তার মাকেও বলতে ভয় পায় — মা, টুকুনের অসুখে আমাকে জড়াচ্ছ কেন। মেয়েটা আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। তারপরই মনে মনে ভীষণ রাগ, এবং এক কঠিন মুখ, এ-মুখ যে তার নিচের সে ঠিক তখন বুঝতে পারে না। কেমন নৃশংস মুখ হয়ে যায়। পেটি শিক্ষকের কথা সে ছেড়ে দিতে পারে, তার ওপর সে ভরসা রাকতে পারে; কিন্তু মনে হয় বার বার সে হেরে যাবে একজনের কাছে — তার নাম সুবল — এক পাখিয়ালা। ফুলের রাজ্য তৈরি করে সে এক স্বপ্নের দেশের মানুষ হয়ে গেছে টুকুনের কাছে। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, টুকুনের স্বপ্নটাকে সে যে ভাবে পারে ভেঙে দেবে। এবং তার আজই ইচ্ছা হলো, একবার গোপনে সে সুবলের দেশটা দেখে

আসবে — কিসের আকর্ষণ, এমনভাবে তাকে ফেলে পালিয়ে যাবার কি এমন আকর্ষণ। তারপরই কেন জানি সে জোর করে হেসে দেয় — কি যে সব আজেবাজে সে ভাবছে! টুকুন না বলে গাড়ি নিয়ে গেছে বলে অভিমানে যত সব বাজে সন্দেহ। হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে। কোথাও জ্যামে-ট্যামে আটকে গেছে। তা ছাড়া যদি... যদি... একটা অ্যাক্সিডেন্ট! ওর কেমন ভয় ধরে গেল। এভাবে বসে থাকা হচ্ছে না। সব খুলে বলা দরকার। একটা ট্যাক্সি — এই ট্যাক্সি। এ-ভাবে দুবার তিনবার ট্যাক্সি ডেকে শেষবার পেয়ে গেলে — সোজা টুকুনদের বাড়িতে। সে এসেই বলল — টুকুন ফেরে নি মাসিমা?

মাসিমার মুখ ভীষণ ভার। জ্যামে তিনিও আটকে গিয়ে অসময় বাড়ি ফিরে এসেছেন। হাতের এতটা সময় কি যে করেন! মিঃ তরফদারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তাঁর খুব খারাপ লাগছে। এবং তখন যেন হাসতে হাসতে বলা — শুনছ, টুকুন ইন্দ্রকে গাছতলায় বসিয়ে গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে গেছে।

— ভালো করেছে।

মেজাজ ভালো না থাকার ব্যাপারটা মজুমদার সাব বেশ ধরতে পেরে মনে মনে হাসছিলেন।

এবং ঠিক পরে পরেই ইন্দ্র এসে যখন বলল — মাসিমা টুকুন ফেরে নি! কেমন হুঁশ ফেরার মতো তিনি ঘড়ি দেখলেন — মেয়েটার জন্য কেমন প্রাণ কেঁদে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার — তুমি কি। মজুমদার সাবকে ভীষণ গালাগাল — তুমি এত বড় নিষ্ঠুর। আমার একটা মাত্র মেয়ে তাও তুমি এমনভাবে চুপচাপ আছ।

— আরে ঠিক চলে আসবে। মনে হয় সুবলের কাছে গেছে।

— সেই পাখিয়ালাটা! ছিঃ ছিঃ। তুমি এখনও চুপচাপ বসে আছ? ইন্দ্র, তুমি পরিমলকে ধরো তো।

— আরে করছ কি! পুলিশ কমিশনার-টমিশনার আবার ডাকছ কেন? আমি তো আন্দাজে বললাম।

টুকুনের মা ঘড়ি দেখছে কেবল। নটা বেজে গেছে। যখন পাখিয়ালার কাছে যায় নি, হয়তো মীনাদের বাড়ি গেছে, মীনার কথা মনে হতেই জোনার কথাও মনে হলো। যা খামখেয়ালী মেয়ে। টুকুনের মা সব ওর বান্ধবীদের এক এক করে যখন ফোন শেষ করে উঠবে তখন সবার চোখে অন্ধকার। এবার বোধ হয় পুলিশ কমিশনার-টমিশনার দরকার আছে। কিন্তু এত বড় বাড়ির একটা ব্যাপার, স্ক্যাণ্ডাল হতে কতক্ষণ — আরও কিছু সময় দেখা দরকার। হয়তো কিছুই হয়নি। পুলিশে ছুঁলেই আঠারো ঘা। সুতরাং ইন্দ্র, মজুমদার সাব, টুকুনের মা এবন মজুমদার সাবের পার্সোনাল সেক্রেটারি চুপচাপ কি করা যায় ভাবছিলেন — তখন মনে হলো কেউ বলতে বলতে

আসছে — টুকুন দিদিমণি আসছে।

ওরাও দেখল টুকুন দিদিমণি আসছে। ভীষণ সজীব। পেছনে ধীরে পায়ে আসছে সুবল। কত লম্বা দেখাচ্ছে ওকে। খুব হাসিখুশি। বাড়ির ভিতর যে এতটা ব্যাপার ঘটবে সুবল যেন বুঝতে পেরেছে। তবু সে এতটুকু আমল না দিয়ে বলল — টুকুন দিদিমণি একাই ফিরতে চেয়েছিল, এতটা রাস্তা একা আসবে — ঠিক সাহস পেলাম না।

মজুমদার সাব খুব সংযত গলায় বললেন — এভাবে টুকুন তোমার যাওয়া উচিত হয় নি। আমরা খুব ভাবছিলাম।

ইন্দ্র বলল — আর একটু হলেই পরিমল মামাকে ফোন করব ভেবেছিলাম।

টুকুনের মা বলল — তুমি আর বাড়ি থেকে কোথাও বের হবে না।

সুবল বলল — আমি যাচ্ছি টুকুন দিদিমণি।

মজুমদার সাব বললেন — না, বোসো।

টুকুনের মা বলল — না, তুমি যাও সুবল। অনেক রাত হয়েছে।

সুবল বলল — সেই ভালো।

টুকুন বলল — একটু দেরি করে গেলে কিছু হবে না। এগারোটার লাস্ট ট্রেন পেয়ে যাবে। একটু কফি করে দাও মা।

মা যে কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। মেয়েটা এত বেহায়া। ইন্দ্র বলল — এটাও একটা অসুখ।

টুকুন বলল — কি অসুখ!

— এই অসুখ!

মজুমদার সাব খুব বিব্রত বোধ করছেন। তিনি বললেন — তুমি আর এসো না সুবল। তোমাকে নিয়ে সংসারে খুব অশান্তি।

টুকুন ভাবল, সবাই তবে তোমরা শান্তিতে আছ! সুবল এলেই যত অশান্তি। ঠিক আছে। সে বলল — সুবল, আমি কাল যাব।

টুকুনের মা থ, মেয়ের এত সাহস! লোকটা তুকতাক করে একেবারে মাথাটা খেয়েছে। এবং সুবল যখন চলে গেল, তখন টুকুনের মা-র ভীষণ মাথা ধরেছে। কি যে হবে। কবে একবার ওর বাবা একটা বেয়াড়া চাকরকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, কেন যে বাবা এমন করেছিলেন, সে জানত না। কেবল সে দেখেছে ঐ চাকরটার মৃত্যুর পর মা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং চোখ উদাস। এখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বাবা বেশি বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সে শেষ পক্ষের মেয়ে। বাবার সঙ্গে মা-র বয়সের তফাৎ কত যে বেশী ছিল, সে যেন সেটা এখনও অনুমান করতে পারে না। মা-র চোখ বুখ কি পবিত্র ছিল, মা বড় করে সিঁদুরের টিপ কপালে দিতেন। খুব মোটা করে আলতা পরতে ভালোবাসতেন, মা-র চোখে মুখে

ছিল অসীম লাবণ্য। মা কখনও কঠিন কথা বলতে জানতেন না। ঝি-চাকরদের কাছে মা ছিলেন দেবীর মতো, অথচ বাবার সংশয় ভীষণ এবং এই সংশয় থেকে সংসারে ভীষণ ঝড় উঠেছিল।

এসব কথা মনে হলে মাথা ধরাটা আরও বেড়ে যায়। টুকুনের জন্য তার এমন একটা কিছু মনে হয়েছে। এবং সে যেতে যেতে দেখল বড় বড় আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব পড়ছে। সে নিজের মুখের দিকে নিজেই তাকাতে পারছে না। ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখ। সমাজে সে মুখ দেখাবে কি রে! মিঃ তরফদার এ-নিয়ে বেশ রসিকতা করবেন। কান গরম হয়ে যাবে। পায়ের রক্ত মাথায় উঠে আসবে। সে তার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখতে পেল— দেয়ালের সব বড় বড় ছবি ওর দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে। অথবা সব ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে। এবং ওর পিছনে ছুটে আসছে। আর ঘড়িতে তখন সাড়ে দশ। রেল স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার শব্দ। কেমন বেহুঁশের মতো সে তার ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। আর একটু বাদে এ-ঘরে সেই কাপুরুষ মানুষটা ঢুকবে। মুখে লাগানো তার নকল দাঁত। ওকে চেটেপুটে খাবার জন্য আসবে। সে এসে যাতে ওকে চেটেপুটে না খেতে পারে সেজন্য দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ দেখলে মানুষটা ফিরে যাবে এবং সারা রাত ছটফট করবে বিছানায়। ওর ঘুম আসবে না। সকাল হলে সে মানুষটার কাছে যা চাইবে ঠিক পেয়ে যাবে। সে জানে সারা দিন পর শরীর চেটেপুটে খেতে না দিলে মানুষটার কামনা-বাসনা মরে না। সে তার মেয়ে টুকুনকে সুস্থ করে তোলার জন্য আবার কি করা যায় ভেবে যা স্থির করল সে বড় নৃশংস। ভাবতেও ভয় হয়।

।। কুড়ি ।।

আর তখন টুকুন দরজা টরজা পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। প্রায় সে ছুটে ছুটে সিঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেছে। কি যে মহার্ঘ বস্তু তার শরীরে আছে— যা সুবলের কাছে গেলেই ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। নদীতে স্নানের দৃশ্য মনে হলে সে কেমন লজ্জায় গুটিয়ে আসে। ওর চোখ মুখ তখন বড় সুষমামণ্ডিত মনে হয়। তার কাছে সুবল এক আশ্চর্য মানুষ। সে এতক্ষণ সুবলের ফুলের উপত্যকায় জ্যোৎস্না রাতে চুপচাপ বসেছিল পাশাপশি। ফুলেরা সব ওর শরীরের চারপাশে বাতাসে দুলেছে। আর সেই বুড়ো মানুষের সুর ধুয়ে পড়ে যাওয়া সব সুরা বাতাসে এক সুন্দর সজীবতা গড়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সুবল সেই সব সুরার অর্থ করে দিলে— মনে হত আশ্চর্য এই জীবন— সে আছে মানুষের পাশাপাশি— যার শরীরে আছে নানা বর্ণের ফুলের সৌরভ।

সে এ-ভাবে এমন একটা মুগ্ধতার ভিতর আছে যা ভাবা যায় না। ঘরে ঢুকেই সে পিয়ানোর রিডে ঝম ঝম শব্দ তুলে হাত চালাতে থাকল। এবং আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে তুলতে চাইছে সেই সব শব্দের ভিতর। যেমন যেমন সে সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যা এবং রাতের প্রথম দিকে সারা জ্যোৎস্নায় ঘোরাঘুরি করেছে সে ঠিক তেমনি রিডের ওপর হাত চালাতে থাকল।

প্রথমে সে গোটা রিডের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে দু' হাতের আঙ্গুল চালিয়ে গেল। যেন সে সুবলের কাছে যাবে বলে মোটরে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে। তার রাস্তাটা ঠিক জানা নেই। রিডে যে জন্য মাঝে মাঝে টুকুনের হাত কাঁপছে। হাত কাঁপলেই মনে হয় ইতস্তত মোটরটা রাস্তা ভুলে করে ফেলছে। ভুল করেই ফের শুধরে নিচ্ছে — তখন আবার দু' হাতের সমস্ত আঙ্গুল কোমল লতার মত দুলে দুলে যেন সুতার বাঁধা সরু সরু সব পুতুলের হাল্কা পা রিডগুলোতে কখনও অল্প, ক্খনও বেশী এবং কখনও ছোট ছোট অক্ষরে লিখে যাবার মত তার মনের উদবিগ্ন ভাব এবং আকুতি ফুটিয়ে তুলতে চাইছে।

এ-ভাবে একটি মেয়ে এমন সব সুর তুলে ফেলছে এমন সব সুন্দর ঝংকার তুলছে পিয়ানোতে যে সমস্ত বাড়িটা যেন সুরের ঝংকারে ভাসছে। কখনও হাল্কা মেঘের ওপর — কখনও জলে গলে যাবার মত, আবার মনে হয় স্থির হয়ে আছে বাড়িটা — সাদা জ্যোৎস্নায় সব কেমন করুণ হয়ে আছে।

ঘরে ঘরে কেউ আর ঘুমোচ্ছে না এখন। সুরের ইন্দ্রজালের ভিতর সবাই ডুবে যাচ্ছে। এমন ঝংকার যে — মনে হয় কোথাও দু'জন পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে, কোথাও ওরা দুজন পাশাপাশি সাঁতার কাটছে নির্মল জলে। আবার মনে হচ্ছে বনের ভিতর দাপাদাপি। একজন আগে ছুটে যাচ্ছে আর একজন পিছনে। পাতা পড়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। বনের মর্মর শোনা যাচ্ছে আবার শোঁ শোঁ ঝড়ের বেগে গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ! আর খুব কান পাতলে বোঝা যায় এখন টুকুন যে ঝংকার তুলছে রিডে, সবই নদীতে নেমে যাবার আঘের দৃশ্য। প্রথমে দু'জনে ধীরে পায়ে জলে নামছে। খস খস শব্দ। শাড়ি হাঁটুর ওপর উঠে আসছে। তারপর ঝুপঝাপ — দু'জনে নেমে যাচ্ছে। জলে সাঁতার কাটছে। খুব লঘুপক্ষ হয়ে জলে ভেসে যাচ্ছে। এত আস্তে এখন পিয়নোতে আঙ্গুলগুলো নড়ছে টুকুনের যে মনে হয় আঙ্গুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। টুকুন চোখ বুজে বাজাচ্ছে। এবং সেই দৃশ্যের ভিতর জলের নীচে ডুব দেবার শব্দ, অথবা পা দুটো ঠিক মাছের মত যে খেলছে জলের নীচে তার শব্দ, অথবা লুকোচুরি খেলার জন্য গভীর জলে ক্রমে ডুবে যাওয়া, ডুবতে ডুবতে গভীরে ডুবে যাওয়া আরও তলায় এবং শেষে কিছু জলের ওপর ফুটকরি তোলার আওয়াজ — সবটাই এখন নিপুণভাবে টুকুন রিডের ওপর বিস্তার করার চেষ্টা করেছে।

আর চার পাশে ওপরে নীচে যত কামরা আছে, যত মানুষ আছে এই প্রাসাদের মত বাড়ীতে তারা ভেবে অবাক হচ্ছে, টুকুন প্রায় যাদুকরের মত এক আবিশ্বাস্য সিমফনি একের পর এক বাজিয়ে যাচ্ছে। একটা বাজাচ্ছে— শেষ করছে বাজনা, মিনিটের মত বিরতি, তারপর আবার, ঝমঝম শব্দ। যেন ভীষণ বেগে প্রপাতের জল নেমে আসছে। বাড়িটা জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে। আর নিঃশ্বাস বন্ধ করে একের পর এক সবাই এসে এবার পার্লারে জড় হচ্ছে। পার্লারে সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সবাই মুখোমুখি বসে। কেউ ওপরে যেতে পাচ্ছে না। কেমন এক মুগ্ধতায় সবাই বসে রয়েছে মুখোমুখি। ঝাড়-লণ্ঠনে সব আলো জ্বলছে। দেয়ালের পুরানো পেন্টিঙ পর্যন্ত সজীব দেখাচ্ছে।

এবং মেয়েটা বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। সে তার ঘরে খুব অল্প আলো জ্বেলে রেখেছে। একটা মোম জ্বাললে যতটা হয় ঠিক ততটা। সে সেই সিল্কের শাড়িটাই পরে আছে। ওর কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়েছে। ওর চুল উড়ছিল পাখাব হাওয়ায়। আর ও ভীষণ ঘামছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাস ক্রমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সে এবার বাজিয়ে গেল— একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। মেষ পালকেরা ঘরে ফিরছে। গরু-বাছুরের ডাক ভেসে আসছে। বাতাসে নদীর জলে ঢেউ। কেউ যেন সেই জলে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে তার শব্দ। তারপর চুপচাপ বসে থাকলে যে এক নিরিবিলি ভাব থাকে তেমনি এক ভাব। কত অনায়াসে যে মেয়েটা এমনভাবে সামান্য কটা রিডে আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে যাচ্ছে।

এবং সব শেষে ওরা শুনছে ক্রমে বাজনা দ্রুত লয়ে উঠতে উঠতে ঝম-ঝম শব্দ। বুঝি যুবক-যুবতী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে। এবং নরম ঘাস মাড়িয়ে ছুটছে। তারপর বনের ভিতর আদম ইভের মত ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে জ্ঞান বৃক্ষের ফল থেকে যা হয় এক আশ্চর্য মাদকতা, অথবা মুগ্ধতা এবং অপার বিস্ময়বোধ শরীর সম্পর্কে... কি যে ভাল লাগে, ভাল লাগার যেন শেষ থাকে মা— অন্তহীন ঈশ্বরের অপার ইচ্ছা শরীরে খেলে বেড়ালে কেমন আবেগে বলার ইচ্ছা— তুমি আমায় দ্যাখো, সবকিছু দ্যাখো, আমাকে তোমার ভিতর নিঃশেষ করে দাও। এইভাবে সব কিছু নিঃশেষে হরণ করে নিলে মনে আছে টুকুন সুবলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। টুকুন কত সহজে সে-সবও বাজিয়ে যাচ্ছে!

তারপর এক সময় টুকুন পাশের টুলটাতে বলে পড়ল। এবং পিয়ানোর রিডে মাথা রেখে চোখ বুজে থাকল। তার এখন আর উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। দরজায় বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ডাকছেন, টুকুন। এটা কি হচ্ছে! এত রাতে তুমি এমনভাবে বাজালে আমাদের ভয় লাগে। তুমি দরজা খোল।

ইন্দ্রও বলছে, টুকুন দরজা খোল।

টুকুনের মা বলল এক অসুখ সেরে অন্য অসুখে মেয়েটা ভুগছে।

আমার কি যে হবে !

— কি হবে আবার ! টুকুনের বাবা ধমক দিতে গিয়েও ইন্দ্রকে দেখে কিছু বলতে পারলেন না।

— কিছু হবে না বলছ ! মানুষ এভাবে কখনও পিয়ানো বাজাতে পারে ?

— পারে না ?

— টুকুন কতটুকু বাজনা শিখেছে ! যে এতেই সে এমন একটা আশ্চর্য লয় তান শিখে ফেলবে।

— এটা তো মনের ব্যাপার। তুমি সব তাতেই এত ভয় পাও কেন বুঝি না।

না, ভয় পাব না, একটা ডাইন এসে আমার মেয়েটাকে কি করে ফেলল। বলে, দরজায় নিজের কপাল ঠুকতে থাকল।

টুকুন আর বসে থাকতে পারল না ; দরজা খুলে বলল, তোমরা এখানে কেন ? মার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা তুমি কি করছ !

— না এখানে থাকব না। এটা কি বাড়ি না ভূতের বাসা !

— পিয়ানো বাজালে ভূতের বাসা হয়।

মজুমদার সাহেব বাধা দিলেন কথায়। টুকুন মা লক্ষ্মী। তুমি এবার খেয়ে শুয়ে পড়। বাজাতে ইচ্ছা হয় সকালে উঠে বাজিও।

গীতা মাসি বলল, আমি সব গরম করে রেখেছি।

টুকুন আর কথা বাড়াল না। মাথরুমে ঢুকে সে সব খুলে ফেলল। শরীর কেন যে এত পবিত্র লাগছে। কেন যে এত হাল্কা লাগছে। শরীরে যা কিছু মুক্তাবিন্দু সব সে ধীরে ধীরে সামানের ফেনায় তুলে ফেলল। সুবল এভাবে একটা ফুলের উপত্যকায় কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে যাবে কখনও যেন টুকুন জানত না। ওর ফুলের গাড়িগুলোর টংলিং টংলিং শব্দ টুকুন এখনও যেন শুনতে পাচ্ছে। এবং ওর চুপচাপ থাকা, বড় লম্বা শরীর, কালো গভীর চোখ, ঢোলা পাঞ্জাবী সব কিছু আর সে ফুলের জগতে আছে বলেই ওর ভিতর এক অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব যেন জেগে উঠেছে। সুবল বলেছে — যা কিছু এখানে দেখছ — আমার বলতে কিছু নেই। যারা কাজ করে তাদের। যা কিছু লাভ অলাভ তাদের। ওরা না থাকলে — এভাবে একটা ফুলের উপত্যকা গড়া যায় না।

টুকুন ভেবেছিল, এটা খুব সত্যি। এবং টুকুনের কাছে এটাই ভীষণ বিস্ময়ের ব্যাপার যে সে এভাবে সবকিছু কবে বিশ্বাস করতে শিখল।

সুবল বলেছিল — এটা একটা আমার অহঙ্কার টুকুন দিদিমণি — মানুষের ভালোর জন্য কতটা দূরে যাওয়া যায় দেখা।

এ-কথাটাও টুকুনের খুব ভাল লেগেছিল। এবং মনে হয়েছিল — একটা বিরাট অসুখের শিকার তার মা-বাবা। কখনও সে মা-বাবাকে শান্তিতে

বসবাস করতে দেখেনি। ওর ইচ্ছা হয়েছিল বলতে, আমাদের বাড়িতে এমন একটা সুন্দর ফুলের উপত্যকা গড়তে পার না! কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কারণ সে তার মায়ের ভীষণ দুটো চোখ তখন সামনে ভাসতে দেখেছিল।

আর তখন টুকুনের মা এবং বাবা ইন্দ্রকে গাড়ি বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসছিল। মনে হল ঝি চাকর পাশে কেউ নেই। দু-পাশের ঘরগুলো ফাঁকা। ফরাসে যারা কাঝ করে তারা বারান্দায়— মেমসাব ঢুকে গেলেই ওরা সব এদিককার আলো নিভিয়ে দেবে। কেবল বড় একটা আলো জ্বলবে গাড়ি বারান্দায়। এবং নিয়নের আলো জ্বালিয়ে রাখা হবে লম্বা করিডোরে।

একটু ফাঁকা পেয়ে আর সবুর সইছে না, টুকুনের মা কঠিন গলায় ডাকল।— শোন।

মজুমদার সাব দাঁড়ালেন।

— কাল আমি ইন্দ্রের বাবাকে কথা দেব।

— কি কথা!

— আগামী আষাঢ়েই বিয়ে। আমি আর একদণ্ড নষ্ট করতে চাইছি না।

— সে তো ভাল কথা।

— কাল থেকে টুকুনের বাইরে বের হাওয়া বারণ।

— আবার যদি পুরোনো অসুখটা দেখা দেয়।

— সে অনেক ভাল।

— মন খারাপ থাকলে যা হয়, পুরণো দুঃখ ফের ফিরে আসতে পারে।

— এটা হলে আমি বেঁচে যাই।

— মা হয়ে তুমি এমন কথা বলছ!

— আমি আমার মান সম্মানটা বুঝি। তুমি তোমার কারখানা কারখানা করে সেটা পর্যন্ত হারিয়েছে।

— আর কারখানা থাকছে না।

টুকুনের মার মুখ কেমন ছোট হয়ে গেল।

— সত্যি আর থাকছে না। আমি লকআউট করব ভাবছি। ওরা স্টে-ইন-স্ট্রাইক করছে। আমি লক-আউটের কথা ভাবছি। দরকার হলে ক্লোজার।

— কিন্তু এ-সব করলে তুমি খাবে কি, আমরা খাব কি!

— সে দেখা যাবে।

ওরা এভাবে কথা বলতে বলতে ওদের শোবার ঘরের দরজায় চলে এসেছে। দুটো ঘর আলাদা। ওরা এক ঘরে শোয় না। ভিতরের দিকে একটা দরজা আছে— যা ইচ্ছা করলে দুজনেই দুদিক থেকে খুলে ফেলতে পারে।

মজুমদার সাব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব ভাবনা হচ্ছে।

টুকুনের মা এখনও যুবতী — লম্বা, চুল কোমর পর্যন্ত এবং চোখে ভীষণ মায়া। আবার এই চোখ কখনও কখনও খুব খারাপ দেখায়। মনেই হয় না টুকুনের মার স্নেহ মমতা বলে পৃথিবীতে কিছু আছে। এবং যা হয়ে থাকে, দুঃখী মুখ করে রাখলে মায়াবী এক ছবি চারপাশে দেখা যায়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে দরজাতেই বুকের কাছে টেনে নিলেন। তারপর যা হয় দরজা খোলার তর সয় না। ওরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যায়। মজুমদার সাব নানাভাবে অভয় দেন — আমি তো আছি, আমার লাইসেন্স আছে। উদ্যম বিহনে পুরে কিবা মনোরথ। মাঝে মাঝে যেমন যেমন কবিতাটা আবৃত্তি করতে ভালবাসেন, তেমনি এটা আবৃত্তি করতে ভালবাসেন, তেমনি এটা আবৃত্তি করে স্ত্রীকে নরম বিছানায় কিছুক্ষণের জন্য উদাসীন করে রাখলেন।

এবং এই উদাসীনতার ফাঁকে শরীরের সব কিছুর ভিতর আছে এক অহমিকা, ঠিক ঠিক জায়গায় হাত দিলে তিনি তা ধরতে পারেন। এবং এভাবে তিনি বেশ কিছু সময় স্ত্রীর শরীরে পার্থিব সুখ-দুঃখ খুঁজে যখন ক্লান্ত, তখন মনে হল চারপাশে কেমন একটা দমবন্ধ ভাব। রামানথ ওপাশের দরজায় বসে ঝিমোচ্ছে। তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেবার আগে বললেন, আমার ঘরের সব জানালাগুলো খুলে দে তো।

দরজা জানালা খুলে দিলেও ভিতরের কষ্টটা যাচ্ছে না। তিনি টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে জল খেলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। লম্বা সিল্কের শ্লিপিং গাউনের ফাঁকে শরীরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে। পেটে তিনি এই বয়সেও চর্বি জমতে দেননি। খুব মিতাহারি। এবং শরীরের প্রতি অধিক যত্নের দরুণ নকল দাঁত থাকলেও তাঁকে এখন যুবা লাগে। খুব যুবা। তিনি অনায়াসে নিজেকে কমবয়সী বলে চালিয়ে যেতে পারেন। যৌবন ধরে রাখার কি প্রাণান্তকর ইচ্ছা। এবার তিনি প্রথম কেমন নিরালম্ব মানুষের মত শুয়ে পড়লেন তিনি ছোট বয়সের কথা ভাবলেন। তাঁর ছোট বয়সে মা তাঁকে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি থাকবেন। পড়াশোনা করবেন। এবং বড় দুঃখের দিন — অনেক দূরে ছিল স্কুল। গ্রাম, মাঠ, কিছু ফলের বাগান পার হয়ে যেতে হত। টিফিনের পয়সা থাকত না। রাস্তায় শীতে অথবা বসন্তে পড়ত খিরাইর জমি, তিনি এবং অন্য সব ছেলেরা মিলে খিরাই চুরি করে স্কুলের টিফিন, অথবা বর্ষার দিনে ছিল শালুক আর শাপলা, গীষ্মে নানারকম ফলপাকুড় — যেমন আম, জাম, জমরুল — এভাবে একটা সময় কেটে গেছে তাঁর। এখন কেন জানি মনে হয় বড় আরামের দিন ছিল সেগুলো। আত্মীয়াটি খুব নিগ্রহ করত তাঁকে। সে-সব এখন তাঁর মনেই হয় না। বরং কি যেন একটা জাঁতাকলে পড়ে সব সবয় ভীতু মানুষের মত মুখ করে রাখার স্বভাব এখন। ভালভাবে হাসতে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা এ-থেকে নিষ্কৃতি পেতে।

নিজেই একটা নিজের গোলকধাঁধা বানিয়ে এখন যে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সেই অভিমন্যুর মত ভিতরে ঢোকার পথটা বুঝি কেবল জানা আছে। বাইয়ে বের হবার রাস্তা তাঁর জানা নেই।

তারপর গভীর রাতে ঘুম এলে তিনি একটা ভীষণ জড়বৎ মানুষের পৃথিবীতে কিছু অস্থির ছবি একের পর এক দেখে গেলেন। ছবিগুলো তাঁর চোখের ওপর লম্বা হাত-পাওয়ালা কংকাল সদৃশ চেহারায় নাচছে। কেউ হয়ত হাত-পা বাড়িয়ে কোমর দুলিয়ে নাচছে। এবং সুন্দর এক মেয়ের চেহারা, সে এসেছে তাদের ভিতর নাচবে বলে। কেমন বায়ুহীন, অন্নহীন জগতে সে এসেছে দেবীর মত। তারপর কি যে মোহে সেই সব লম্বা হাতপাওয়ালা মানুষের ভিতর সে মিশে গেলে দেখতে পেল, ওরও হাত-পা ক্রমে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কেমন আগুনের মত ঝড়ো হাওয়ায় ওর সব মাংস খসে পড়ছে। এখানে এলে বুঝি কেউ সঠিক চেহারায় ফিরে যেতে পারবে না। সেও নাচছে কোমর দুলিয়ে, মাঝে মাঝে হাত এত বেশী লম্বা করে দিচ্ছে যে সে ইচ্ছা করলে আকাশের সব গ্রহ-নক্ষত্র পেড়ে আনতে পারে। এবং আকাশের সবকটা নক্ষত্র হেলেদুলে যেন এটা একটা খেলা, ওরা বেশ সুন্দর মেয়ে হয়ে যাচ্ছে কখনও এবং অন্নহীন, বায়ুহীন পৃথিবীতে ওরা আকাশের সব গ্রহ-নক্ষত্র ফুলের মত পেড়ে পৃথিবীকে শ্রীহীন করে দিচ্ছে। তিনি তাঁর স্ত্রীর মুখও সহসা এদের ভিতর দেখে ফেললেন।

স্ত্রীর মুখ দেখতে পেয়েই মনে হল স্বপ্নটা খুব কুৎসিত। তিনি আরও সুন্দর স্বপ্ন পছন্দ করেন। তবে কিভাবে যে সেই সুন্দর দেখা যায়। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল — এই বাড়িটা আরও বড় হয়ে যাক। গেটে টুপি পরা দারোয়ান থাকুক। অনেক দাসদাসী, কর্মচারী, পঁচিশ-ত্রিশটা কারখানার মালিক তিনি হতে চান। আজ কলকাতা, কাল সানফ্রান্সিসকো এভাবে বিদেশিনীদের নিয়ে স্ট্যাচু অব লিবার্টির নীচে বসে থাকা। অথবা চোখের ওপর কেন যে সেই একশ আটতলা বাড়িটা ভেসে উঠছে না। অথচ স্বপ্নের ভিতর তিনি দেখলেন একটা কাচের বোয়েম। বোয়েমটা এক দুই করে অনেক তলা। এত ছোট বোয়েমে এত তলা থাকে কি করে! স্বপ্নের ভিতর গুনতে সময় লাগে না। সেই বোয়েমে তিনি বুঝতে পারলেন একশ আটতলাই আছে। এবং হাজার, দু'হাজার তারও বেশী হবে ফ্ল্যাট। লক্ষের ওপর মানুষের চিড়িয়াখানা। বোয়েমটা একটা দণ্ডের ওপর বসানো। কেমন কেবল চোখের ওপর ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আর যা দেখা গেল আশ্চর্য পৃথিবীটা এই একটা বোয়েমের ভিতর আশ্রয় করেছে। এবং তিনি দেখতে পেলেন সেখানে পঞ্চানন দাসের স্ত্রী সুমতির গলায় দড়ি। এটা বোধহয় আত্মহত্যা। তিনি যেহেতু পঞ্চাননকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন যদিও এখন পঞ্চানন ইউনিয়ন করে লিডার বনে গেছে, তবু চাকরির সুবাদে তাকে তুই-তুকারি করতে বাঁধে না।

— এটা তোর বৌ ?

— আজ্ঞে স্যার ।
— আত্মহত্যা ?
— আজ্ঞে . . . ।
— কেন ?
— ঠিক জানি না স্যার । দুপুরের শিফটে খেয়ে কারখানায় গেছি — বৌ সুন্দর করে রেঁধেবেড়ে খাইয়েছে । কারখানায় খবর পেলাম যে গলায় দড়ি দিয়েছে ।
— নিশ্চয়ই বকেছিলি ।
— না স্যার । ইদানীং আমি ওকে কিছু বলতাম না ।
— আগে বলতিস ।
— আগে কথায় কথায় মারধোর করেছি । অভাব-অনটনে মাথা ঠিক থাকত না । তবে আমাদের খুব মিল ছিল ।
— এখন ।
— এখন তো আপনার দয়ায় সে-সবের কিছু নেই ।
— তবে স্টে-ইন-স্ট্রাইক করেছিস কেন ।
— হুকুম স্যার ।
— কার হুকুম ?
— ইউনিয়নের ।
— কত মাইনেতে ঢুকেছিলি ?
— ত্রিশ টাকা ।
— এখন কত ?
— তিন'শ টাকা ।
— ক' বছরে ?
— ছ' বছরে ।
— প্রডাকসান কত বেড়েছে ?
— কিছু না ।
— কতটা করতে পারিস ইচ্ছা করলে ?
— কত দ্বিগুণ । মন দিয়ে কাজ করলে আমরা স্যার কি না করতে পারি ?
— মন দিতে কুণ্ঠা কেন ?
— যখন হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে ।
— এভাবে বেশীদিন চলে না । আমি ক্লোজার করব ।
— ক্লেজার ?
— কিন্তু কি কথায় কি কথা এসে গেল । তার বৌটা আত্মহত্যা কেন করল !
— স্যার বলেছি তো জানি না ।

— ঠিক জানিস। তিনি এক ধমক লাগালেন। স্বপ্নে বোধহয় তিনি জানেন, ধমক লাগালে পঞ্চানন তেড়ে আসবে না। অথবা ঘেরাও-র ভয় দেখাতে পারবে না। আর বাছাধন তো বেশ কাটকে গেছে কাচের বোয়মে। এখান থেকে বের হবার আর উপায় নেই।

তিনি বললেন, সব জানিস। পুলিশের ভয়ে এখন মুখে কুলুপ দিয়েছিস।

পঞ্চানন চুপ করে থাকল। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তারপর লাস, পুলিশ নিয়ে গেলে মিনমিনে গলায় বলল, স্যার পয়সা হলে ফস্টিনস্টি করার বাসনা হয়।

— সেটা কার ?

— বৌর।

— তোর হয় না ?

— হয়। তবে কাজ করে সময় পাই না। কারখানার কাজ, ইউনিয়নের কাজ করে ফিরতে বেশ রাত হত। বাড়ি ফিরলে সুমতি খুব সতীসাধ্বী মুখ করে রাখত। মুখ দেখলে কেউ তাকে অবশ্বিাস করতে পারবে না। অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, তলে তলে সে বেশ একজন নাটকের লোককে ভালবেসে' ফেলেছে। টের পেলে কত বললুম — তুই ভুল করছিস। তোর ছেলেপুলেদের কথা ভাব। তখন স্যার কি বলব, সুমতি কোন জবাব দিত না। চুপচাপ সংসারের কাজ করে যেত। যেন আমি মিথ্যা মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলছি। সতীসাধ্বী বলে ওর কিছু আসে যায় না।

এবং যখন ফের আত্মহত্যার কথায় এল মজুমদার সাব, তখন পঞ্চানন দাঁত বের করে হেসে দিল। — হ্যাঁ স্যার, এমন একটা করে ফেলেছি। এবং এভাবেই সংসারে টাকা-পয়সা বাড়তি ঝঞ্ঝাট বয়ে আনে। কে যেন এমন বলে যাচ্ছিল। পঞ্চাননের এটা সঠিক টাকা রোজগার নয়। সে নানাভাবে ফাঁকি দিয়ে প্রাপ্যের ঢের বেশী আদায় করেছে। সংসারে এখন এসব টাকায় একটা বাড়তি খরচা তৈরি হয়। এবং এভাবেই পাপ এসে সংসারে বাসা বাঁধে।

পঞ্চানন বলল, স্যার আমরা উদ্যমশীল হলে আমাদের এমন অবস্থা হত না।

খুব ভাল লাগল এমন কথা শুনতে। যাক লোকটার ক্রমে চৈতন্যোদয় হচ্ছে। এবং সেই যে লাঠির ওপর অথবা মনুমেন্টের মত একটা উঁচু লম্বা মঠের ওপর বোয়েমটা ঘুরছে এবং নাটক হচ্ছে প্রতি ঘরে, নাটকের কুশীলবদের চাউনি প্রেতাত্মার মত দেখাচ্ছে — ওরা সবাই হাড়গোড় বের করা মানুষ, মজুমদার সাব এসব দেখে ঢোক গিললেন। মনে হল বুকে কষ্ট হচ্ছে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে অন্ধকারে দেখলেন, কেউ তাঁর ঘর থেকে সরে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, জল।

তারপর যা হয় ডাকাডাকি, লোকজন উঠে এলে, সবারই মুখে এক কথা, কি করে এ-ঘরে কেউ ঢুকতে পারে। তিনি বলে চলেছেন, জানো আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার গলা টিপে ধরেছে।

এভাবে স্বপ্নের ভিতর একটা ভীষণ অবিশ্বাস দানা বেঁধে যায় মানুষের মনে। মজুমদার সাবকে সকাল বেলাতে কেমন যেন খুব বিমর্ষ দেখাতে থাকল। তিনি আর রাতে ঘুমোতে পারেননি। স্ত্রীকে বলেছেন ডেকে, সে যেন তাঁর পাশে শোয়। পাশে শুলেও ভয়টা কিছুতে গেল না। কেমন সারারাত চোখ বুজে পড়ে থাকলেন। লাইসেন্সের জন্য মনটা খুব উদ্বিগ্ন ছিল। এবং কারখানার লক-আউটের ব্যাপারেও একটা ভয়াবহ টেনসান যাচ্ছে। এসব মিলে তিনি রাতের ঘটনার কার্যকারণ মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারলেন — হিসাব ঠিক মিলছে না। তাঁর ভয়টা ক্রমে আরও বেড়ে গেল। সকালে খবর এল, সত্যি গত রাতে গলায় দড়ি দিয়ে পঞ্চাননের বৌ আত্মহত্যা করেছে।

এবং এমন খবরেই মজুমদার সাবের আবার কেমন দম বন্ধ হবার উপক্রম। তিনি বুকে এবার ব্যথা অনুভব করলেন। আবার মনে হচ্ছে গলায় শ্বাসকষ্ট। ঠিক রাতের মত অবস্থা। ডাক্তার এসে বলল, আপনাকে এবার কেবল শুয়ে থাকতে হবে। বিছানা থেকে একদম উঠবেন না। নড়াচড়া একেবারে বারণ।

মজমদার সাব বুঝতে পারছিলেন, ওপরে আবার কেউ নানারকম ঝংকার তুলে নানাভাবে আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে তুলছে। তাঁর ভীষণ ভাল লাগছিল শুনতে। মানুষেরা সব সময় সুন্দর সব সিমফনি গড়তে চায়। গড়ায় স্বপ্ন থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পারে না। কেন যে সে একটা অসুখে পড়ে যায়!

।। একুশ ।।

সকাল বেলা যখন এমন অবস্থা, যখন টুকুন বাবার পাশে বসে আছে এবং টুকুনের মা ভীষণ বিশ্বস্ত মুখে কাজ কর্ম করে যাচ্ছে, তখন মনেই হল না, সংসারে স্বামী স্ত্রীতে এতটুকু অবিশ্বাস আছে। বরং অসুখটা যেন দুজনকে সহসা বারমুখী থেকে ঘরমুখী করে দিল। এবং এমন একটা অসুখ নিয়ে মজুমদার সাবকে চিরদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, টুকুনের মা চিরদিন এবার নীরবে মানুষটাকে সেবা শুশ্রূষার সুযোগ পাবে। এত মছর গেছে, এমন একটা সুযোগ যেন তার এই প্রথম। ফলে সে খুব যত্ন নিয়ে দেখা শোনা করে যাচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যে দুজন নার্সের কথা উঠেছে, এবং ওদের নিয়োগের ব্যাপারে বাইরের ঘরে কথাবার্তা চলছে তখন টুকুনের মা ভাবছে — এসব নার্স-টার্স কি দরকার, সে নিজেই যখন আছে তখন অনর্থক, নিজের মানুষটাকে

পরের হাতে ছেড়ে দেওয়া কেন ! তারপরই মনে হল হাতের কাছে কাজের লোক থাকলে মন্দ হয় না। সুতরাং সকাল বেলাতে যে একটা জরুরী কথা ছিল টুকুনকে বলার, সেটা বুঝি আর বলা হল না। ইন্দ্রের বাবাকেও যে বলার ছিল কিছু, এখন এই অসময়ে আর কি হবে বলে, বরং তিনি ভাল হয়ে উঠুক, তারপর সব করা যাবে।

কিন্তু মজুমদার সাব কথাটা ভোলেন নি। তিনি দেখলেন খুব বিষণ্ণ মুখে বসে আছে টুকুন। সকাল বেলাতে টুকুনের এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। নাকে মুখে এসে চুল উড়ে পড়ছে। এবং রাতে একেবারে মেয়েটার ঘুম হয়নি বোঝা যাচ্ছে। চোখ ভীষণ ভিতরে ঢুকে গেছে। হয়ত টুকুন ওর মার চেঁচামেচি থেকে টের পেয়েছে, এ-বাড়ি থেকে তাকে আর একা বের হতে দেওয়া হবে না। এমন কি, গাড়িতে ড্রাইভার থাকবে। সে আর একা ইচ্ছামত ঘুরতে পারবে না। মেয়েটার জন্য ভীষণ কষ্ট হয় মজুমদার সাবের। অথচ কেন যে মেয়েটা এ-ভাবে একটা ফুলের উপত্যকায় হেঁটে যাবার আকর্ষণে পড়ে গেল। চার পাশে টুকুনের কত সুন্দর সুন্দর ছেলেরা আছে, কত বড় বড় পার্টিতে তিনি মেয়েকে নিয়ে গেছেন অথচ, একেবারে উদাসীন টুকুন। কিছুতেই টুকুন তার বন্য স্বভাব ছাড়তে পারছে না।

মজুমদার সাব বললেন, তুমি এত চুপচাপ কেন টুকুন ?

টুকুন বোকার মত এক গাল হেসে দিল। অর্থাৎ বাবাকে সে অভয় দিতে চাইল যেন— কোথায় ! আমি তো বেশ হৈ চৈ করে আছি বাবা।

মজুমদার সাব এবার হেসে বললেন, আমি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠব টুকুন।

— তোমার কিচ্ছু হয়নি বাবা। ডাক্তার বাবু অনর্থক তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

ওমা, একি কথা ! এ যে দেখছি টুকুন একেবারে সুবলের মত কথা বলছে।

টুকুন ফের বলল, তুমি বাজে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দাও, দেখবে ভাল হয়ে যাবে।

এখানে যেন টুকুন কোথায় প্রায় ডাক্তারসুলভ কথা বলে ফেলল। সেতো এ-বাড়ির মেয়ে। সে টের পায় সংসারের জন্য বাবাকে অনেক পাপ কাজ করতে হয়। এমন একটি স্ট্যাটাসের ভিতর বাবা উঠে এসেছেন যে তার জন্য তিনি সারাটা দিন কি না করছেন। বাবা কোথায় কিভাবে কি করছেন সে জানে না, কিন্তু বাবার মুখ দেখে সে টের পায়, উদ্বিগ্ন চোখে মুখে বাবার এক অতীব ভয়। সব সময় যেন তিনি জীবনে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। সব কিছু ঠিকঠাক রেখে যাবার জন্য বাবার এই সব পাপ কাজ, বাবাকে খুব সহসা প্রাণহীন করে দিল।

টুকুন বলল, বাবা তুমি একটু ভাল হয়ে ওঠো। ভাল হলে তোমাকে

রোজ বিকেলে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে গেলে তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।

টুকুন 'ভাল হয়ে উঠবে' না বলে 'নিরাময়' কথাটা ব্যবহার করল। নিরাময় কথাটা বলতে তার কেন জানি এ-সময় ভাল লাগল।

অর্থাৎ একদিনেই টুকুনের আশ্চর্য বিশ্বাস জন্মে গেছে, মানুষ নিজেই পারে এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ তৈরি করতে — যেখানে মানুষ এতটুকু নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে না। সেখানে সবাই সবার জন্য ভাববে। এবং এমন একটা জগৎ এ-ভাবে তৈরি হয়ে যাবে একদিন। অহেতুক ভয় থাকবে না। ভয় থেকে কোন অসুখ জন্মাবে না। বাবার অসুখটা সে বুঝতে পেরেছে, ভয় থেকে হয়েছে। সব সময় কে ভয়, যা কিছু আছে মানুষেরা লুটেপুটে নিয়ে যাবে।

আবার সে বলল, বাবা ওখানে গেলে সত্যি তুমি ভাল হয়ে যাবে।

টুকুনের মার যেন এতক্ষণে মনে পড়ল কথাটা। সে বলল, টুকুন তুমি বড় হয়েছ। এখন আর একা কোথাও যাবে না। বাড়ি থেকে বের হবে না।

টুকুন বুঝতে পারল মা তাকে সেই ফুলের উপত্যকায় যেতে বারণ করছে। কিন্তু সেই ফুলের উপত্যকার কথা মনে হলেই কেমন তার চোখ বুজে আসে। সে যদি যায়, মা ভীষণ অশান্তি করবে। এবং এই অশান্তি বাবার পক্ষে আরও ক্ষতিকারক। সে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা না বললে আমি আর কোথাও যাবো না।

সে বাবার জন্য এই সংসারে কোন অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না।

এবার টুকুন উঠে ওপরে চলে গেল। সকালে মুখ ধুয়ে সে এক গ্লাস ফলের রস খায়। ঘরে গিয়ে দেখল, গীতা মাসি সব ঠিক করে রেখেছে। ফলের রস খেতে তার ভীষণ বিস্বাদ লাগল। সে এখন এ বাড়িতে প্রায় বন্দী জীবন যাপন করবে কোথাও গেলেই মার ধারণা হবে, সেই ফুলের উপত্যকার সে চলে গেছে।

এ-ভাবে বাড়িতে সে কিছুদিন আটকা পড়ে গেল। হেমন্তের শেষাশেষি বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন কারখানা ক্লোজারের পর খুবই বাড়াবড়ি গেছিল ক'দিন, এখন বোধ হয় ওটা সামলে উঠেছেন। ইউনিয়নের তরফের লোক এসে দেখা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ডাক্তারের দোহাই পেড়ে ওঁর সেক্রেটারি তা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

যেমন টুকুনকে নিয়ে বাবা মা একদিন সব পাহাড়ী জায়গায় শরীর ভালো করবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি টুকুন তার বাবাকে নিয়ে নানা জায়গায় ক'মাস থেকে এল। যেমন কিছুদিন ওরা ছিল নৈনিতালে। দেরাদুনেও গেছে। অর্থাৎ, এ-ভাবে যাবতীয় পাহাড়ী জায়গায় আশ্রয় নিয়েও যখন দেখেছে বাবার শরীরে সম্পূর্ণ নিরাময়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তখন ফের

ফিরে আসা।

মাঝে মাঝে টুকুন বাবার পায়ের কাছে বসে থাকত। বাবা বুঝতে পারতেন, টুকুন কেমন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে ফের। বাবার রুগ্ন মুখে টুকুন তা ধরতে পরেলেই হেসে দিত। বলত, বাবা আমি কত যে চেষ্টা করছি, চুপচাপ আগের মত শুয়ে থাকলে কেমন হয়, সেই আগের মত নিঃসাড় পড়ে থাকতে গিয়ে দেখেছি একেবারেই ভালো লাগে না শুয়ে থাকতে। তোমাকে বলিনি বাবা, বললে কষ্ট পাবে, ভেবেছি, কম খেয়ে, না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেললেই আগের অসুখটা ফের আমাকে আশ্রয় করবে। কিন্তু বাবা তোমাকে কি বলব, একবেলা না খেলেই চোখে অন্ধকার দেখেছি। তখন গীতা মাসিই হেসে বাঁচে না।

একটু হেসে টুকুন আবার বলল, আমার আর অসুখেরে ভিতর ফিরে যাওয়া হবে না। এভাবে সারা মাস ঘরে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে আমার অসুখের ভিতর ফিয়ে যাওয়া ভাল ছিল বাবা। তোমরা আমাকে আর সেখানে যেতে দাও না।

মজুমদার সাব বুঝতে পারেন টুকুন মায়ের উপর অভিমান করে এমন একটা অসুখের ভিতর ফের ফিরে যেতে চাইছে। তিনি বললেন, তুই ভারি বোকা মেয়ে। বিয়ে হলে দেখবি, এ-সব অভিমান আর থাকবে না।

টুকুন বলল, বাবা আমার বিয়ের জন্য তোমরা এত ভাবছ কেন। যাকে আমার পছন্দ নয়, তার সঙ্গে কেন তোমরা আমাকে জুড়ে দিকে চাইছ?

কেমন মনটা খারাপ হয়ে যায় এমন কথা শুনলে। কিন্তু মেয়ের জেদ। মজুমদার সাব চুপ করে থাকেন।

টুকুন বুঝতে পারে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। সে বলল, ঠিক আছে, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই হবে।

মজুমদার সাব সেই বিকেলেই বললেন, তুই যে বলেছিলি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি। সেখানে গেলে আমি ভাল হয়ে যাব।

— তুমি যাবে বাবা?

— যাবো। কিন্তু তোর মা যদি জানে!

—তবে তুমি জানো কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে?

— জানব না!

— কি করে বুঝলে আমি তোমকে আমাদের সেই ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যাব?

— পৃথিবীতে মা তুই তো একটা জায়গার কথাই ঠিক জানিস।

— টুকুন কেমন মাথা নীচু করে রাখল।

— একটু যা মিথ্যে কথা বলতে হবে।

— কি মিথ্যা!

— বলবি, আমাকে নিয়ে তুই হাওয়া খেতে যাচ্ছিস মাঠে।

— বলব।

— বলবি আমরা গ্রাম মাঠ দেখে বেড়াচ্ছি।

— বলব।

— বলবি গ্রাম মাঠের ভিতর দিয়ে গেলে নির্মল বাতাস বুক ভরে নেওয়া যায়।

— বলব বাবা।

— আর বলবি ডাক্তারের পরামর্শ মত সব হচ্ছে।

— বলব।

ডাক্তার এলে মজুমদার সাব ফিস ফিস করে বললেন, এক ভাবে শুয়ে বসে থাকতে ভাল লাগছে না হে ডাক্তার। সকাল বিকেল গাড়িতে ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়। এই যেমন ধর, বেহালার ভিতর দিয়ে গিয়ে যদি ডায়মণ্ডহারবার রোডে পড়ি। অথবা ফুলবাগান হয়ে কাঁকুরগাছি পার হয়ে সোজা সল্ট লেক, লেক টাউন পিছনে ফেলে এরোড্রাম পার হয়ে বারাসাতের রাস্তায় চলে যাই।

— খুব ভাল। ঘুরে বেড়ান না। এতে যদি মন ভাল থাকে ক্ষতির তো কিছু দেখছি না।

— তুমি একবার তোমার বৌদিকে বুঝিয়ে বল। ও তো বিছানা থেকে উঠতেই দিতে চায় না।

ডাক্তার হেসে বলল, বলব।

— আমার টুকুন মা আছে, ভারি সুন্দর গাড়ি চালায়। কাজেই বুঝতে পারছ, আজে বাজে ড্রাইভিং হবে না।

ডাক্তার বলল, ঠিক আছে। আপনার এখন ক্ষিধে কেমন ?

— কিছু না। এখন মনে হয় ডাক্তার হাওয়া খেয়ে পেট যে ভরে প্রবাদটা একেবারে মিথ্যা না।

ডাক্তার কিছু ওষুধ পাল্টে দিল। টুকুনের মা এসে বলল, বৌদি, দাদার একটু বেড়ানো দরকার। বাড়িতে বসে থাকলে মন মেজাজ দুই খারাপ হবার কথা। টুকুন ওঁকে নিয়ে সকাল বিকেল গ্রাম মাঠ দেখে এলে মনটা প্রফুল্ল থাকবে। দেখা গেছে অসুখ অনেক সময় এ-ভাবে সেরে যায়।

টুকুনের মা বলল, আমার সঙ্গে থাকা দরকার। ঝি চাকর দিয়ে কি সব হয়! টুকুন কি সব বোঝে।

মজুমদার সাব হেসে ফেললেন, তুমি সেই সেকেলে আছ। এখানকার মেয়েরা অনেক কম বয়সেই সব শিখে ফেলে। কি বল হে ডাক্তার ? টুকুন তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে। সে না পারলে আর কে পারবে।

এভাবেই ঠিক হয়ে যায় টুকুন যাবে। আর যাবে মজুমদার সাব। সঙ্গে থাকবে পুরানো চাকর রামনাথ। ইন্দ্র ঘ্যান ঘ্যান করছিল — সেও যাবে।

কিন্তু মজুমদার সাব সব জানেন বলে বললেন, ইন্দ্র তোমাদের ক্লাব এবার সেমিফাইনালে উঠেছে। সবটা তোমার কৃতিত্ব। ফাইনালে ওঠা চাই। আমাদের সঙ্গে বিকেল কাটিয়ে দিলে দেখবে— ঐ পর্যন্ত। এবার যে শীলড্ ঘরে তোলা চাই।

মজুমদার সাব এভাবে বেশ ম্যানেজ করে এক বিকেলে বের হয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর করে তিনি গাড়ি-বারান্দায় এলেন। টুকুন এবং রামনাথ দুপাশে দাঁড়ালে তিনি ওদের কাঁধে ভর করে সিঁড়ি ভাঙলেন! দুপাশে সব বাড়ির এবং অফিসের কিছু আমলা কর্মচারী, ফরাসের লোক, খাস খানসামা রামনাথ সবাই মিলে বড় কর্তা বিকেলে যে বের হচ্ছেন এবং মানুষটির অসুখে ভুগলে কি যেন একটা ভয়— এত বড়ো বাড়ির বৈভব আর থাকবে না, সামনে কৃত্রিম পাহাড়ের পাশে ছোট্ট হ্রদ, হ্রদে কিছু পাখপাখালি— এমন সৌখিন বাড়ি এ-তল্লাটে হয়, না অথচ এখন কেমন বাড়িটা ধীরে ধীরে শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। দুবছরের ওপর কারখানা ক্লোজার, দু বছরের ওপর এ-ভাবে সাব বাড়িতে শুয়ে আছেন, দু বছরের ওপর, কারখানার শ্রমিকেরা স্টেশনে স্টেশনে কৌটো ফুটো করে পয়সা মাগছে— এসব দৃশ্য সবার মনে পড়ে গেলে ভারি খারাপ লাগে।

গাড়িতে মজুমদার সাব সামনে বসেছেন। পাশে টুকুন। টুকুনের চুল স্যাম্পু করা। ঘাড় পর্যন্ত চুল পরিপাটি বিছানো। মনে হয় দেবদেবীর চুলের মত— কি কোমল আর মিহি, হাত দিলে যেন ছোঁয়া যায় অথবা চুল স্যাম্পু করা থাকলে আকাশের মত ভারি দেখায় মুখ। চুলের ভিতর আছে আশ্চর্য এক গন্ধ। টুকুন পরেছে হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি। শাড়িতে লতাপাতা আঁকা এবং নানা রকমের বর্ণাঢ্য শোভা— এমন একটা শাড়ির সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এবং মজুমদার সাব বেশ লক্ষ্য করে বুঝেছেন, মেয়ের খুব পছন্দ আছে— কী রমে ওকে মানায় সে যেন জানে। আশ্চর্য স্নিগ্ধ স্বভাবরে মনে হচ্ছে টুকুনকে। এবং শাড়ির এমন রঙের সঙ্গে ওর শরীরের কোমল আভা অথবা বলা যায় লাবণ্য একেবারে মির্লে মিশে গেছে। হালাক প্রসাধন পর্যন্ত। ঠোঁটে যে সামান্য রঙ তাও এত স্বাভাবিক যে মনেই হয় না টুকুন ঠোঁটে রঙ লাগিয়েছে। বরং এটুকু না লাগালেই ওকে যেন হৈ পোশাকের ভিতর সামান্য শ্রীহীন করে রাখত।

আর এ-ভাবে এক মেয়ে— বোধ হয় এটা হেমন্তকাল— বেশ গাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছে। সে দোকান থেকে ফুল আনার সময় সুবলের কিছু খোঁজ খবর রেখেছে। কারণ শহরের সব ফুলের দোকানগুলো বলে দিকে পারে সুবলের কথা, সুবলের ফুল একদিন এই শহরে না এলে সব অন্ধকার দ্যাখে, সেই সুবলের খোঁজ খবর সব তার কাছে থাকবে সে আর বেশি কি— এবং এ-ভাবে সেও তার খোঁজ খবর সুবলকে দিয়ে গেছে। সুবলের ঐটুকুই

লাভ। সে টুকুন দিদিমণির চিঠি অতি যত্নে রেখে দিয়েছে। সে তার জন্য তপোবনের মত আলাদা একটা আশ্রম করে দিয়েছে। বুড়ো মানুষটা মারা গেছে গত শীতে।

কাঞ্চন ফুলের চারপাশে সবুজ ঘাসের কাঠা চারেকের মাঠ। সেখানে ঘাসের ছায়ায় কাঞ্চন ফুলের সৌরভে বুড়ো মানুষটা বেশ আছে। তার কবর শান বাঁধানো। কাঞ্চন ফুল দিন-রাত পাঁপড়ি ফেলছে সেখানে। বিকেলে যখন হাতে কোন কাজ থাকে না, সুবল সেই ঘাসের ভিতর কাঞ্চন গাছটার নীচে চুপচাপ বসে থাকে। এ-সব খবর টুকুন দিদিমণিকে সে তার লোক মারফত জানিয়েছে। সে চিঠি লিখতে আজকাল পারে। কিন্তু হাতের লেখা এত খারাপ যে দিদিমণিকে চিঠি লিখতে লজ্জা পায়। টুকুন দিদিমণির সঙ্গে কত দিন দেখা নেই— বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না, সে যেন বুঝতে পারে টুকুন দিদিমণি বারান্দায় অথবা রেলিঙে কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারলেই ওর ভীষণ কষ্ট হয়— সব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছা হয়— কি এক আকর্ষণ শরীরে তার— কিন্তু টুকুন দিদিমণির অপমান ওর কাছে আরও কষ্টকর। এখন তো সে আর আগের মত পাঁচিল টপকে যেতে পারে না। সে কেমন যেন ক্রমে স্বভাবে শহরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। গাড়িগুলো শহরে ফুল নিয়ে যাচ্ছে— তাদের টংলিং টংলিং শব্দ কানে এলে চোখ বুজে পৃথিবীর যাবতীয় সুষমা সে শুষে নিতে পারে। এবং টুকুন দিদিমণির আশ্চর্য ভালবাসা সে তখন ভিতরে ভিতরে বড় বেশী অনুভব করতে পারে।

মজুমদার সাব বললেন, তোর সুবল বাওবাব গাছ দিয়ে কি করবে রে টুকুন?

টুকুন এমন কথায় ভীষণ লজ্জা পেল। বলল, বাওবাব গাছের কথা তুমি কি করে জানলে?

—সে জেনেছি।

—ওটাতো বাবা একটা গল্পের গাচ।

—মানে।

—মানে ছোট্ট রাজপুত্রের একটা দেশ আছে। সেটা একটা ছোট্ট গ্রহাণু। শিশুদের জন্য লেখা গল্প। সেখানে বাওবাব গাছের কথা আছে।

—তুই জানিস না, বাওবাব বলে সত্যিকারের গাছ আছে। জায়গায় জায়গায় নামটা পাল্টে যায়।

এখানে রাস্তাটা একটা বড় পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে বলে টুকুনকে খুব ধীরে ধীরে টার্ণ নিতে হল। এখন হেমন্তকাল বলে বেশ শীত শীত ভাব। চারপাশে ধানের জমি। কাঁচা পাকা ধানের মাঠ। চাষীরা মাঠের আলে আলে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করছে। কারণ বোঝাই যায়— ধান তোলার সময় হয়ে আসছে। খুব খুশী ওরা, ফসল ভাল, এবং এভাবে এই মাঠের সব জমি, চাষীদের মুখ, আকাশের নীলিমা এবং কিছু পাখীর কলরব টুকুনকে

ভীষণভাবে আপ্লুত করছে। সে বাবার শেষ কথাটা ঠিক মন দিয়ে শুনতে পায় নি।

মজুমদার সাব ফের বলে যাচ্ছেন— আমি একটা বইয়ে পড়েছি, কেনিয়াতে কাণ্ডুরার জঙ্গলে এই গাছ আছে। ছবিতে যা দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে ঠিক আমাদের দেশের বাবলা গাছের মত। আমার মনে হয় সুবল সেজন্য বাওবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

— আমি ঠিক জানি না বাবা। সুবলকে জিজ্ঞাসা করে দেখব।

— তোর মনে আছে যখন প্রথম সুবল গাড়িতে উঠে এসেছিল ?

— মনে আছে বাবা।

— খুব হাসি পেত দেখলে। ওর পাখিটার খবর কিরে ?

— সে ওটা ছেড়ে দিয়েছে বাবা।

তারপর ওরা সেই ফুলের উপত্যকাতে ধীরে ধীরে গাড়ি এগিয়ে নিল। বড় রাস্তা। তারপরই উঁচু নিচু মাঠ, চন্দনের গাছ, এবং নানারকম লতাগুল্মের বন। বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা নেমে গেছে, একটু বন থেকে বের হলেই সামনে এক বিস্ময়কর দেশ। নানা জায়গায় নানা ফুল। ওরা দূর থেকেই ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। এত সব ফুলের গন্ধ মিলে, যেমন গোলাপ, রজনী গন্ধা, গন্ধরাজ, চামেলি, চাঁপা বেল ফুল এবং টগর, যুঁই— কত যে সব ফুল এবং ফুলের বাস—

মজুমদার বলল, না বাবা, সে রাজা নয়। সে বলে, সে এর কিছু নয়। যারা কাজ করে তারাই সব। এবং সে দেখেশুনে বেড়ায় বলে তার একটু থাকবার জায়গা ওরা দিয়েছে। ঐ যে দূরে দেখছ, উঁচু জায়গায় আশ্রমের মতো ঘর, ওখানে সুবল থাকে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না, টংলিং টংলিং শব্দ, দেখতে পাচ্ছ না, তুমি দেখতে পাবে না, ওপাশের রাস্তা দিয়ে একটা ফুলের গাড়ি চলে যাচ্ছে। তোমার কষ্ট হচ্ছে নাতো হাঁটতে ? আমি তোমাকে ধরব ?

মজুমদার সাবের এই প্রথম মনে হল তাঁর শরীর ভাল নেই। এ-ভাবে হেঁটে যাওয়া ঠিক না, কিন্তু আশ্চর্য, তার কষ্ট হচ্ছে না, তিনি বেশ হেঁটে যেতে পারছেন।

মজুমদার সাব বললেন, টুকুন আমি বেশ হেঁটে যেতে পারছি রে।

— আমি তোমাকে ধরব !

— কি বললি !

— তুমি যদি পড়ে টড়ে যাও ?

— সুবলটা কোথায় ?

— এখন সূর্য অস্ত যাবার সময়। সে হয়তো যারা খাটে তাদের এখন আগামী কালের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওদের টাক পয়সা, সে এখানে নতুন দেশ গড়েছে বাবা। মানুষের জন্য একটা ভালো আবাস তৈরি করেছে।

মজুমদার সাব হেঁটে যাচ্ছিলেন। যেন ভিতরে থাকে মানুষের এক দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছা, সেই শৈশব থেকে স্বপ্ন, বড় হওয়ার স্বপ্ন। মানুষের মতো মাথা উঁচু করে হেঁটে যাবার স্বপ্ন, সব তাঁর হয়েছে, অথচ কোথায় যেন তিনি মানুষের চিরটা কাল অনিষ্ট করে বেড়িয়েছেন। সুবলের মত তার জীবনেও ছিল অসীম দুঃখ দারিদ্র — তিনি তা জয় করতে গিয়ে এটা কি করে ফেলেছেন! বড় হতে যাওয়ার মানে কেমন বদলে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সুবলকে দেখে, সুবলের উপত্যকা দেখে তাঁর মনে হল, পৃথিবীতে এভাবে বড় হলে অনেক পাপ থেকে মানুষ বেঁচে যায়। তিনি কেমন এবার দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। সেই কুটীরে ওঁর যাওয়া চাই। সেখানে গেলেই বুঝি তিনি আশ্চর্যভাবে ঠিক ঠিক নিরাময় হয়ে যাবেন।

।। বাইশ ।।

এ ভাবেই এখানে প্রতিদিন সূর্য ডোবে। ও-পাশে বনের ভিতর মনে হয়, সূর্য হারিয়ে যায়। কখনও হলুদ রঙ নিয়ে, কখনও বেগুনি অথবা নীল নীলিমাতে আগুন ছড়িয়ে সূর্য রোজ ও-পাশের কাটায় হারিয়ে যায়। বনের পাখিরা ডাকে। নদীতে বড় বড় গাছের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসে এবং এ-ভাবে পৃথিবী ক্রমে অন্ধকার হয়ে ওঠে।

সুবল লোকজনদের বিদায় করে নিজের আশ্রমের মতো ঘরের বরান্দায় বসে থাকে। সে দেখতে পায় পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে, নদীর জলে অন্ধকার নেমে আসছে। এ-সময়টাতে ওর এভাবে চুপচাপ নিরিবিলি বসে থাকতে ভাল লাগে। আর এ-সময় মনে হয় কেউ আসবে, ঠিক পালিয়ে চলে আসবে, সে তাকে বেশি দিন না দেখে থাকতে পারে না। এমন একটা আশ্চর্য ফুলের উপত্যকা আর কোথাও নেই সে জানে। আর তখনই মনে হয়, দূরে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠছে টুকুন দিদিমণি। এমন ফুলের উপত্যকা পেয়ে টুকুন দিদিমণি প্রায় যেন ভেসে ভেসে চলে আসছে। সে চোখ মুছে ফের উঠে দাঁড়াল। না, সে অলীক কিছু দেখছে না, ওর ভিতরটা কি যে করছে! টুকুন, হালকা বাদামী রঙের প্রায় ফুলের গাছগুলো মাড়িতে ছুটে আসছে। সঙ্গে কেউ আছে, বয়সী মানুষ, তিনিও যুবকের মতো হেঁটে আসছেন। সুবল বুঝতে পারছে না, টুকুনের সঙ্গে কে আসছে! তার বারান্দা ফুলের ডালপালায় ঢাকা। ওর ভিতর থেকেই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, টুকুন দিদিমণি, আমি এখানে।

এখন হেমন্তের সময়। হেমন্তে ফুলের চাষ তেমন জমে না। মানুষজন যারা আছে, খেটে খেটে হয়রান, পামপে জল তুলে আনছে, নদী থেকে জল এনে অসময়ে সে যা চাষাবাদ করছে ফুলের, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে

না। দূরে দূরে সব সাদা কোঠাবাড়ি, ছবির মতো উজ্জ্বল এক ছোট্ট ছিমছাম শহর যেন। পাকা রাস্তা চলে গেছে উপত্যকার ভিতর দিয়ে। নানা জায়গায় সব জলের ফোয়ারা এবং অসময়ে সব ফুলেরা ফুটে আছে। শীতে সে মাইলের পর মাইল গোলাপের চাষ করে থাকে, কে কত বড় গোলাপ ফোটাতে পারে — সুবলের কাছে কে কত বড় মানুষ তার দ্বারা প্রমাণ হবে। আমি এক মানুষ, আমার আছে এক বড় অহঙ্কার, ফুলের মতো ফুল দ্যাকো কি করে চাষাবাদ করে গড়ে তুলেছি। সুবলের মনে হল তখন, টুকুনের কেউ এসেছে সঙ্গে। ওরা চাঁপা ফুলের যে সব সারি সারি গাছ আছে তার নীচ দিয়ে হাঁটছে। মেহেদী পাতার গাছ চারপাশে সবুজ হয়ে থাকে বলে কি যে সুন্দর লাগে সুবল যখন হেঁটে যায়। লম্বা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, ঢোলা সাদা রঙের পাজামা আর ঘাসের চটি, সুবলকে তখন কেমন বনের দেবতা টেবতা মনে হয়।

সুবল কাঞ্চন গাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দুটো একটা কাঞ্চন ফুল এখনও ফুটছে। সাদা পাঁপড়ি বুড়োমানুষটার সমাধিতে পড়ছে। আর চারপাশে কি সবুজ ঘাস, ঘাসে এখন সব সাদা ফুল, সব ফুলগুলোই যেন বলছে, আমরা বুড়োমানুষটার হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব। ফুলগুলো দেখলে সুবলের এমনই মনে হয়। সে আর সেখান থেকে বেরতে পারে না।

সুবল কাঞ্চনের ডাল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে ফলেতেই দেখল, ও আর কেউ নয়, টুকুনের মামা। সে প্রথমে অবাক, তারপর কেমন অস্বস্তি, তারপর মনে হল বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার সামিল, বোধ হয় এক্ষুনি তিনি তাকে তাড়া করবেন, অথবা যেমন তিনি মানুষের সূর্য বগলদাবা করে পালাচ্ছিলেন, এখানেও তিনি তেমন কিছু করে ফেলবেন। দূরে, নদীর পাড়ে তার দামী গাড়িটা। ডিমের মতো ঘাসের ওপর ভেসে আছে গাড়িটা। সূর্যাস্ত, বনের ছায়া, নদীর জল, সব মিলে সাদা রঙের গাড়িটাকে অতিকায় রাজহাঁসের ডিম ছাড়া ভাবতে পারছে না সুবল। টুকুনের বাবাকে দেখে সে সত্যি ঘাবড়ে গেছে। সে আর পালাতে পর্যন্ত পারল না। ফুলের উপত্যকায় সে একজন বনবাসী মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

অথচ তিনি কাছে এসে বললেন, বাওবাব গাছ এনেছি হে।

সুবল ভেবে পেল না এমন কথা কেন! বলল, বাওবাব গাছ!

— কেন টুকুন যে বলল, তোমার এমন সুন্দর ফুলের উপত্যকাতে একটা বাওবাব গাছ না থাকলে মানাচ্ছে না।

সুবল কেমন সহজ হয়ে গেল। ওর আর টুকুনের বাবাকে ভয় থাকল না। সে ভেবেছিল, আবার কি ঘটেছে, টুকুনকে নিয়ে কি অশান্তি দেখা দিয়েছে সংসারে যে, টুকুনের বাবা এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। সে তো আর যায় না। টুকুনের মা ওর যাওয়া পছন্দ করেন না, এ-নিয়ে বড় অশান্তি গেছে, সে

টুকুনকে যেহেতু টুকুন দিদিমণি ডাকে, সে-জন্য তার কোন অশান্তি ভাল লাগে না। সে দেখল তখন টুকুনও কেমন সহজ হয়ে গেছে। পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে বলছে, তুমি আমাকে বলতে না, একটা বাওবাব গাছ পেলে এই উপত্যকাতে লাগিয়ে দিতে।

— কিন্তু সে তো রূপকথার গাছ। ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে পাওয়া যায়।

টুকুনের বাবা বলেলেন, ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে যা পাওয়া যায়, এখানে তা থাকবে না সে কি করে হয়!

সুবল বলল, আজ্ঞে তা ঠিক। আমার খুব ইচ্ছা — পেলে লাগাই। তবে রূপকথার গাছ তো, পাওয়া যায় না। যা কিছু ভাল, এই ফুলগাছ, লতাপাতা সব এনে লাগতে ইচ্ছা হয়। তবে গল্পের গাছ তো পাওয়া যায় না। টুকুন দিদিমরি জানে সব। ওটা একটা অনয গ্রহের গল্প।

— এস। বলে তিনি সুবলের আশ্রমের মতো ঘরটার দিকে হাঁটতে থাকলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, সব গ্রহের গল্পই আমরা বানিয়েছি। ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহটাতে একজনের মতো থাকার জায়াগা আছে।

— তা আছে।

— ওর একটা ভেড়ার বাচ্চা আছে।

— তাও আছে।

— ওর গ্রহের সমুদ্র শুকিয়ে যাবে ভয়ে পাতায় ঢেকে রাখে!

— তা রাখে।

— আসলে আমরা চাই যে গ্রহেই মানুষ থাকুক, ঈশ্বর তার থাকা খাওয়ার নিরাপত্তা রাখবেন। রাজপুত্রেরও তা ছিল।

সুবল ভেবে পাচ্ছে না এমন সুন্দর সুন্দর কথা টুকুনের বাবা কি করে বলছেন! সে তো জানো টুকুনের বাবার খুব অসুখ। স্ট্রাইক, লক-আউট, ক্লোজার নানা রকমের হাঙ্গামায় মানুষটা হৃদরোগে ভুগছেন। অথচ এখানে একেবারে অন্য মানুষ। যদিও এই মানুষটা তার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেননি। টুকুনের জন্য ভীষণ মমতা তাঁর। টুকুন যা ভালবাসে, তিনিও তা ভালবাসেন। টুকুনের জন্য সুবল যখন ফুল নিয়ে যেত, দেয়াল টপকে, টুকুনের ঘরে পালিয়ে ফুল দিয়ে আসত, তখন সে জানত না ধরা পড়লে খুব সহজভাবে তিনি বলবেন, বড় বাড়িতে এ-ভাবে আসতে নেই। সদর দিয়ে আসবে। টুকুনের তো সময় থাকে না। রোববারে আসবে। বিকেলে সে তোমার সঙ্গে গল্প তরতে পারবে। রোববারের বিকেলে টুকুনের কোন কাজ থাকে না।

টুকুনের বাবা বললেন, এসে খুব ভাল লাগছে। এমন একটা ফুলের উপত্যকা কোথাও থাকেত পারে জানা ছিল না। আমি তো বেশ হেঁটে যাচ্ছি, হাত তুলে তিনি বললেন, ডাক্তারদের কথা আর শুনছি না। বেশ আছি হে।

তা তুমি কেমন লাভ টাব কর।

— লাভ !

— এই ফুল বেছে ! টুকুন বলল, তোমার নাকি লাখ টাকার ফুল বিক্রি হয় মাসে ! তারও বেশি। এত টাকার ফুল বিক্রি করে খুব লাভ হওয়ার কথা।

— লাভ টাব বলে তো কিছু নেই।

— তবে কি আছে ?

— যা আছে তাকে আরও বাড়ানো।

— সেটা কার জন্য ?

— যারা কাজ করে, যারা এখানে থাকে খায়...

— তবে তুমি কে ?

— আমিও কাজ করি।

— কিন্তু বুড়ো মানুষটা তোমাকে দানপত্র করেছে না।

— তা করেছে।,

— তবে তুমি মালিক। তোমার এখানে লেবার আনরেস্ট নেই শুনেছি !

সুবল বুঝতে পারল, বিষয়ী মানুষ, তিনি বিষয় আশয় ছাড়া বোঝেন না। সে তাঁকে বলল, বসুন।

তিনি এমন বড় উপত্যকার বিচিত্র বর্ণের সব ফুল এবং মানুষেরা এখনও কেউ কেউ কাজ করছে দেখে কেমন অবাক। — এরা বুঝি ওভার-টাইম খাটছে।

সুবল বলল, না। কাজ বোধ হয় শেষ করে উঠতে পারেনি।

— তোমার ফুলের গাড়ি কখন যায় ?

— ভোর রাতে।

— কতজন লোক এখানে কাজ করে ?

— তা অনেক হবে। তার হিসাবটা...

— তুমি কি হে। কোন হিসেবপত্র রাখ না।

— না, মানে কি জানেন সবাই কাজ করে না তো। সবাই...।

— ওরা কোথায় থাকে ?

তিনি বললেন, এ-পাশের ছোট্ট একটা ছিমছাম শহরের মতো চোখে পড়ল। ওখানে কারা থাকে ?

— এরা থাকে।

— এ-সব তুমি ওদের করে দিয়েছ।

— আমি করিনি। ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে।

— তা হলে তোমার এখানে সত্যি গোলমাল হয় না।

সুবল হেসে বলল, কিসের গোলমাল ?

—এই বোনাস নিয়ে, ইনক্রিমেন্ট নিয়ে।

সুবল ভেবে অবাক হয়ে যায়, এ-সব কথা সে শোনেনি। যখন সবই ওদের, ওরা যৌথভাবে খেটে এমন একটা উপত্যকা বানিয়ে ফেলেছে, তখন কেন যে ওরা গোলমাল করবে, বুঝতে পারে না।

টুকুনের বাবা বললেন, সুবল তোমাকে আর চেনা যায় না। টুকুন তোর মনে আছে আমরা ট্রেনে আসছিলাম, তখন বিহারে পূর্ণিয়া অঞ্চলে কি খরা। নীল রঙের বেতের চেয়ারে বসে তিনি কথা বলছিলেন। একটা নীল রঙের লন্ঠন কেউ জ্বেলে দিয়ে গেছে। তিনি ফের বললেন তোমার পাখিটার কথা খুব মনে হয়।

সে অনেকদিন আগের কথা। ওরা তিনজনই মনে করতে পারে— কোথায় কবে এক প্রচণ্ড খরায় সব জ্বলে যাচ্ছিল, একদল তৃষ্ণার্ত লোক ট্রেন আটকে জল লুট করেছিল, এবং সুবল, সেও এসেছিল জল খেতে। জল খেতে এসে অবাক, এক মেয়ে কি সুন্দর, মোমের পুতুলের মতো বাংকে শুয়ে আছে, উঠতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কেবল চেয়ে থাকে, আর কি সুন্দর মুখ তার, দেখতে দেখতে সুবল অবাক হয়ে যায়। জল পান করতে হবে, অথবা সে তার তেষ্টায় কথা ভুলে, কেমন ভেবে পায় না, কোথাও এমন সুন্দর মোমের মতো নরম চোখ অথবা কুচফলের মতো নাক থাকতে পারে। সে মেয়েটিকে তার জ্যাবের পাখির খেলা দেখেছিলেন, টুকুন সুবলকে বাংকের নীচে লুকিয়ে রেখেছে, পুলিস এলে বলেছে না নেই, এ-কামরায় কেউ আসেনি। যে মেয়ের মরে যাবার কথা, যার কঠিন অসুখ, যে ক্রমে স্থবির হয়ে যাচ্ছে তার এমন স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে তিনি চোখ বড় করে ফেলেছিলেন। অথচ টুকুনের মা-র কি যে স্বভাব, কোথাকার এক নচ্ছার ছেলে উএঠ এসেছে, তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, চাল নেই, চুলো নেই, হয়তো মন্ত্র-টন্ত্রও জানে, মেয়েটাকে বশ করার তালে আছে, প্রায় জোরজার করে ব্যাণ্ডেলে গাড়ী এলে তিনি সুবলকে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

অথচ সুবল মনে করতে পারে, এক হাসপাতালে আবার দেখা টুকুনের সঙ্গে। সে তার পাখিটাকে নিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ডাব কেটে বিক্রি করত। সে ভেবেছিল, তখন শহরে এটাই সবচেয়ে ভাল কাজ। সে প্রায় নিজের মতো করে একটা জলছত্রও দিয়েছিল। আরও অনেক কাজ, এবং কাজের ভিতরই সে ফের হাসপাতালের জানালায় আবিষ্কার করেছিল টুকুন দিদিমণিকে। সে তখন প্রাণপণ, সেই জানালায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর নানা রকম আশ্চর্য গল্প, রূপকথার গল্প, যাদুকরের দেশে মুণ্ডমালার গল্প বলে টুকুন দিদিমণিকে সাহস দিত। বেঁচে থাকতে বলত। কারণ সে বিশ্বাস করতে পারত না, পৃথিবীতে সুন্দর মেয়েরা কখনও মরে যায়।

সুবলের এমন প্রাণপণ খেলা দেখে টুকুনেরও ভারি ছুটতে ইচ্ছা হত। টুকুন এই যে এখন বসে আছে, সুবল বসে রয়েছে সামনে, বাবা পাশে,

বাবা সন্দেশ দুধ খাচ্ছেন, সুবল চা খাচ্ছে, সে চা ডিম ভাজা খাচ্ছে, এরই ভিতর যেন এক আশ্চর্য সৌরভ সে পায় সুবলের শরীরে, সুবলের কথা মনে হলেই সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে হয় — এবং সুবলই পৃথিবীতে একমাত্র বাওবাব গাছ খুঁজে আনতে পারে — তার বিশ্বাস হয়। সে ভাবতে থাকে, সুবল না থাকলে, সে বুঝতে পারত না, ছোট্ট রাজপুত্রের কোন গ্রহাণু থাকতে পারে, আর সেখানে আগ্নেয়গিরির মুখ ঢেকে রাখার জন্য বাওবাব গাছের পাতা লাগে।

তারপর আরও কি সব দিন গেছে টুকুনের। সুবল একবার এল ফুল নিয়ে। সব দামী দামী গোলাপ, তখন সুবলকে চেনা যেত না। সে পালিয়ে আসত, আর কি রোমাঞ্চ, সে এলেই মনে হত শরীরের যাবতীয় অসুখ কেমন সেরে গেছে। টুকুন তখন নাচতে পারত, সে জোরে পিয়ানোতে নানা বর্ণের স্বর তুলতে পারত। যেন কবিতার মতো এক ঘ্রাণ আছে সুবলের চোখে মুখে, সুবল এলেই শরীরের সব কষ্ট এক মায়াবী সৌরভে মুছে যেত। ঘরের সাদা অথবা হলুদ রঙের দেয়ালে টুকুন মাঝে মাঝে তখন বনের দেবী হয়ে যেত।

এবং এ-ভাবে এক শাহান-সা মানুষ, সব অহঙ্কার মুছে আজ এখানে চলে এসেছেন। সুবলের ভারি ভাল লাগছে। তিনি বললেন, তোমার বুড়ো মানুষটা কোথায় থাকত ?

— এ-ঘরেই।

— তোমাকে খুব ভালবাসতেন তিনি ;

টুকুন বলল, বাবাকে দেখাবে না ! অর্থাৎ টুকুন বাবাকে সেই বুড়ো মানুষটার সমাধি দেখাতে চায়। কতদিন টুকুন পালিয়ে এসে সবুজ ঘাসে কাঞ্চনের ছায়ায় চুপচাপ বসে রয়েছে। কতদিন পালিয়ে এসে বেশ রাত করে ফিরেছে। টুকুনের মা শেষ দিকে নানাদিক ভেবে ওর বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরিবারের মান-সম্মানের কথা ভেবে, তা ছাড়া টুকুনের এটা পাগলামি ছাড়া কি, কোথাকার এক ফুলয়ালা, যার চাল নেই চুলো নেই, শহরে এখন ফুল বিক্রি করে খায়, তেমন এক মানুষের সঙ্গে টুকুনের এ-সব ঘটনা বড় পীড়াদায়ক। তিনি টুকুনকে আর বের হতে দিতেন না।

আর বিকেলে কি মনে হয়েছিল টুকুনের বাবার, হঠাৎ এ-সব মনে হতেই বুঝি ভিতরে একটা গোলমাল দেখা দেয়। যা এতদিন সত্য জেনেছেন, সব মনে হয় অহমিকার কথা। সেই ফুলয়ালার কাছে যেতে মনে হয়। টুকুন নিশিদিন যায়, গল্প করতে ভালবাসে। — বাবা, সুবল তো তোমার মতো ভাবে না, সে তো তোমার মতো দুঃখ পায় না। সেখানে তো তোমার মানুষদের মতো মানুষরা কাজ করছে। নদী থেকে জল আনছে। লতাপাতা থেকে সার বানাচ্ছে। চারপাশে নানা রকম পাম্প সেট, যখন যেখানে জল দরকার চলে যাচ্ছে। কারো নালিশ নেই, কারো তেমন ব্যক্তিগত উচ্চাশা

নেই, বেশ তো আছে ওরা। সারা উপত্যকাময় কি সব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে।

এবং এ-ভাবেই তিনি মেয়েকে নিয়ে এসেছেন এখানে। স্ত্রী জানেন না। মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। যেন দেখতে চান, যথার্থই পৃথিবীতে কোন ফুলের উপত্যকা গড়ে উঠতে পারে কি না। তিনি বললেন, চল, কাঞ্চন গাছগুলোর নীচে গিয়ে বসি।

সুবল বুঝতে পারল, তিনি সেই বুড়ো মানুষটার সমাধির পাশে বসে থাকতে চান। সুবল যেতে যেতে বলল, বুড়ো মানুষটার একমাত্র অহঙ্কার ছিল, কেউ ওর মতো ফুলের চাষ জানে না। ফুলের দালালরা ঠকিয়ে ফুল নিয়ে যেত, কিছু মনে করতেন না। কেবল বললেই হতো, মিঞাসাব আপনার ফুলের মতো ফুল আর কার আছে। তিনি তার পরিশ্রমের পয়সা পেতেন না। একটু থেকে বলল, ফুলের দালালী করতে এসে এখানে থেকে গেলাম। কেমন বুড়োমানুষটার জন্য মায়া হল। এর কাজ করতে কষ্ট হলে কাজ করে দিতাম। বন থেকে পাতা এনে দিতাম। পাতা পুড়িয়ে তিনি জমির সার বানাতেন! তাঁর কাছে আশ্চর্য সব খবর জেনে নিলাম। তার ফুলের চাষ এত কেন ভাল, বনের কোন্ গাছ, কি পাতা কোন্ সময়ে পোড়ালে কোন্ ফুলের উপকারে আসে, পৃথিবীতে কেউ বোধ হয় ওঁর চেয়ে তা ভাল জানতেন না। তখন বুড়োমানুষটার আমি বাদে আর কেউ ছিল না।

বাবা বললেন, সুবল তোমার অহঙ্কার হয় না? এত বড় একটা ফুলের উপত্যকা তুমি গড়ে তুলেছ এখানে সব মানুষের জন্য রেখেছ সমান দায়িত্ব, বড় শহরে সকালে যার সারি সারি ফুলের গাড়ি, তোমার মনে হয় না, রাজার মতো বেঁচে আছ?

সে বলল, আজ্ঞে না। আমার তখন বুড়োমানুটার কথা মনে হয়।

— কি বলেন তিনি?

ওরা সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে বসে রয়েছে। টুকুন এখন নানা বর্ণের ফুলের ভিতর ঘুরেফিরে কেমন মজা পেয়ে গেছে, সামান্য জ্যোৎস্নায় ওর ছুটতে পর্যন্ত ইচ্ছা করছে। তখন সুবল বলছে বুড়োমানুষটার কথা। সে বলল, তিনি বলতেন, আল্লা খুব সরল। তিনি চান পৃথিবীতে সরল এবং ভালমানুষরা সুখে থাকুক। তারপরই সুবল কেমন চুপ হয়ে যায়। একটু পরে থেমে থেমে সুবল বলল, তিনি বলতেন, সব লতাপাতার ভিতর, ফুলফলের ভিতর এবং সব গ্রহ-নক্ষত্র, অথবা এই যে সৌরলোক, যা কিছু আছে চারপাশে, সবার ভিতর তিনি আছেন। কোন উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তিনি রাজার রাজা। তিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ। যা কিছু আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে— সব তাঁর। তিনি জানেন সব কিছু। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁর অন্তলোকের রহস্য। তিনিই জানেন একমাত্র কি আছে সামনে আর কি আছে পেছনে। তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর ওপরে বিস্তৃত। আর এ-দুয়ের তিনি নিশিদিন রক্ষাকারী।

তার জন্য তিনি ক্লান্ত বোধ করেন না।

সুবল কি দেখল এবার। সে দেখল টুকুন ঘাসের ভিতর কাঞ্চন ফুলের পাঁপড়ি সংগ্রহ করছে। কি সুন্দরভাবে উবু হয়ে বসেছে। কি মায়ায় ভরা মুখ। সে কিছুতেই বেশি আশা করতে পারে না। সে বলল বুড়োমানুষটার কথা মনে হলে নিজেকে কিছুই ভাবতে ভাল লাগে না। এমন কথা শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে কি না জানি না।

টুকুনের ভারি আশ্চর্য লাগে সেই সুবল, ফুটপাতে যে ঘুরে বেড়াত যার কোন ঠিকানা ছিল না, নিজের বলতে কিছু ছিল না, কি করে সেই মানুষ এমন সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা যা মাইলব্যাপী কি তারও বেশি হবে, কতদুর গেছে সে ঠিক জানে না, কিভাবে গড়ে তুলেছে।

সুবল ফের বলল, তিনি প্রায়ই মুসার কথা বলতেন। বলতেন বারোটি প্রস্রবণের কথা। লোকদের জন্য তিনি জল চাইলেন। মরুভূমিতে কোথায় জল। অথচ দৈববাণী, মুসা তার লাঠি দিয়ে বারোটা পাথরে বাড়ি মারলেন। জল উপছে উঠল। ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ। মুসা বললেন, জল পান করো মনুষ্যগণ। আল্লাহ্ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো। অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ করো না।

সামান্য জ্যোৎস্নায় টুকুন বুঝতে পারল, বাবার মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। আসলে কি সুবল বাবাকে অন্যায়কারী ভাবছে। অন্যায়কারী ভেবে গল্পটা বলছে! বাবাও কি ভেবে ফেলেছেন তিনি অন্যায়কারী। সংসারের জন্য তিনি অনেক অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। রাতে এ জন্য তিনি ঘুমোতে পারেন না। মনে হয় কেউ তাকে গলা টিপে মারতে আসছে।

তারপরই বাবার মুখ ফের কেমন সরল সহজ হয়ে যায়। তিনি বলতে থাকেন তোমার এখন শুধু দেখছি একটি বাওবাব গাছ হলেই হয়ে যায়।

সুবল কেমন বোকার মতো বলে ফেলল হয়ে যায়।

টুকুন হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছে না। কারণ সুবল বাবার কথা ঠিক ধরতে পারছে না।

আর এ-ভাবেই জীবনের কোন সুসময়ে কিছু ভাল কাজ করে ফেলতে ইচ্ছা হয়। টুকুন সুবলকে ভীষণ ভালবাসে। টুকুনের জন্য পৃথিবীর সব দামী অথবা মহার্ঘ যুবকেরা অপেক্ষা করছে। অথছ টুকুন সেই শৈশব থেকে এক পাখিয়ালার প্রেমে পাগল। মানুষের স্বভাবে কি যে থাকে। বাড়ির সবাই যখন ভেবেছে সাময়িক খেয়াল, তখন বাবা বুঝতে পারেন, টুকুন এমন একজন সৎমানুষকেই সারাজীমন ধরে চেয়েছে। সে এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারে না। তিনি তো দেখছেন যে-সব যুবকেরা টুকুনের পাশে ঘোরাফেরা করে, এই যেমন ইন্দ্র সে টুকুনকে না পেলে রুমপাকে বিয়ে করবে। ওতে ওর আসে যায় না। কিন্তু এই ফুলের উপত্যকাতে এসে বুঝতে পেরেছেন, সুবল পৃথিবীর চারপাশে নিরন্তর খুঁজে যাবে একটি বাওবাব গাছ। না পেলে

সে একা একা হেঁটে যাবে। কারণ ওর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, গল্পের গাছটা ওর খুব দরকার। গল্পের গাছটা এই উপত্যকাতে না লাগাতে পারলে ওর ভারি দুঃখ থেকে যাবে। সারাদিন পরিশ্রমের পর মানুষের এমন একটি গাছের ছায়া দরকার। আজীবন তিনিও তা চেয়েছেন। সঠিক গাছের ছায়া পেলে হয়তো তিনি এমন অন্যায়কারী হয়ে যেতেন না।

এবং এ-ভাবেই টুকুন এখন প্রায় সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, সুবলের পাশে হাঁটতে পারলে পৃথিবীতে সে আর কিছু চায় না এবং ভেবে ফেলেছে, সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহাণুর মতো এটা সুবলের গ্রহাণু এখানে মানুষের কোন কষ্ট নেই, এখানে মানুষেরা খেটে খায়, পরিশ্রমের বিনিময়ে বাঁচে। সুবলকে খুব বড় মনে হয় তখন। আর রাগ হলে ভাবে ভীষণ অহঙ্কারী।

বাবা বললেন বুঝলে হে সুবল, দেখেশুনে মনে হল খুবই দরকার বাওবাব গাছের।

সুবল বোকার মতো যেই বললে খুবই দরকার। তখন টুকুন ফিস ফিস করে বলল, এই কি যা-তা বলছ।

তিনি গাড়ীর কাছে গিয়ে বললেন, বাড়ীতে আছে। বড় হচ্ছে। যখন সময় হবে নিয়ে আসবে। বুঝতে পারছি, গাছটা না হলে তোমার এমন সুন্দর ফুলের উপত্যকা সত্যি শ্রী-হীন হয়ে থাকবে। মনে হয় তোমার এই উপত্যকাতে বাওবাব গাছ লাগিয়ে দিতে পারলেই আমার ঘুম আসবে। আমি ভাল হয়ে যাব।

— — —

সুমদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ

আশঙ্কা সত্যি হলে যা হয়—সবাই মুষড়ে পড়ল। সবাই বলতে ডিনা ব্যাঙ্কের সব জাহাজিরা।

এস. এম. ডিনা ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক লাইনের লজ্ঝড়ে জাহাজ। জাহাজটার অপবাদেরও শেষ নেই। নানা গুজব। ফলে নানা অশুভ আতঙ্ক জাহাজিদের মনে ওড়াওড়ি করতেই পারে। কলকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়লেই সোরগোল—এসে গেছে! মাস্তারে কেউ দাঁড়ায় না। জাহাজটা শয়তান, মাথা খারাপ—কোথায় কোন সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে থাকবে কেউ বলতে পারে না। তখন কাপ্তান, চিফ অফিসার, রেডিও অফিসার পর্যন্ত বেকুফ। সবই তো ঠিক আছে—চার্ট, কোর্স-লে, কম্পাসের কাঁটা—তবু এত বড় গোলমাল! মাথায় হাত।

সেই জাহাজ যাচ্ছে মাটি টানার কাজে। কোথায় কোন অজানা সমুদ্রে যাচ্ছে জাহাজিরা ঠিক জানে না। মাটি টানার কাজে জাহাজটা কোন সমুদ্রে যাবে তারা সঠিক কিছু বুঝতে পারছে না।

আশা ছিল, তারা এবার দেশে ফিরতে পারবে। বিশ বাইশ মাসের সফর—খুবই লম্বা সফর, জাহাজ দেশে ফিরে যাবারই কথা। অথচ কি যে হল, জাহাজ আবার মাটি টানার কাজ নিয়ে বসল। মন খারাপ হতেই পারে।

সুহাস পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে খবরটা পেল। ইদানীং চার্লিকে নিয়ে জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই সে জেটিতে নেমে যায়। চার্লিকে নিয়ে পিকাকোরা পার্কে বেড়াতে গেছে—ফিরতে একটু রাতই হয়েছে—জাহাজে উঠেই খবরটা শুনে সেও বেশ দমে গেল।

আসলে চার্লির যে কি হয়েছে সে ঠিক বোঝে না। এক দণ্ড তার কাছ ছাড়া হতে চায় না। চার পাঁচ মাস ধরেই সে এটা লক্ষ্য করছে। চার্লির তাড়াতেই তাকে বের হতে হয়।

এক সময় তো চার্লি ছিল দুরন্ত এবং খুবই চঞ্চল। ইদানীং চার্লি এত শান্ত স্বভাবেরই বা হয়ে যাচ্ছে কেন সুহাস ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। খুবই অনুগত তার। বিশ বাইশ মাসে চার্লি জাহাজেই অনেক লম্বা হয়ে গেছে। কাপ্তানের পুত্র চার্লিকে বালকই বলা চলে। সুহাসও জাহাজে উঠে এসেছে, দাড়ি গোঁফের আভাস ফুটে ওঠার মুখে। চার্লির সঙ্গে বন্ধুত্ব—খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রায় সমবয়সী ছেলেটি তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেই পারে।

জাহাজে একসঙ্গে থাকার ফলে চার্লির কিছু বাজে স্বভাবও গড়ে উঠেছে। যখন তখন তাকে দাঁড়াতে বলবে। চার্লি কতটা লম্বা হয়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে মাপবে। দাঁড়াতে বললে, না দাঁড়িয়েও উপায় থাকে না। শত হলেও কাপ্তানের পুত্র। আগে ছিল এক ধরনের উপদ্রব, এখন আর এক ধরনের। সবই সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। পিকাকোরা পার্কে এক দু-দিন যাওয়া যায়—তাই বলে রোজ রোজ জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কার ভাল লাগে।

কিন্তু চার্লি নাছোড়বান্দা। কত রকমের বুনো ফুলের নাম যে সে জানে। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজে দেখার বাতিক। সঙ্গে না গিয়েও উপায় থাকে না। বারবার বুঝিয়েছে, দ্যাখ চার্লি, আমি একজন সামান্য নাবিক, তোমার এটা উচিত কাজ হচ্ছে না। তার উপর নেটিভদের খুব যে ভাল চোখে দেখা হয় না, তাও বুঝতে চেষ্টা কর। অফিসার ইঞ্জিনিয়ারদের চোখে লাগতেই পারে। তোমার বাবা পছন্দ নাও করতে পারে।

কে শোনে কার কথা।

দেখা মাত্র, চিৎকার, হাই।

সে হাই করতে পারে না। খুব সতর্ক পায়ে হেঁটে যাবার স্বভাব সুহাসের।

ইঞ্জিন সারেঙও বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, বাপু তোমার বয়েসটা ভাল না। কেন যে মরতে এলে জাহাজে। তিন নম্বর সুখানি, মুখার্জিদা তো চটে লাল। আবার গেলি। মরবি বলে দিলাম। বড়লোকের বাচ্চা বাঁদর হয় জানিস। ডাকলেই যেতে হবে! কোথায় যাস? কিছু বলে যাস না!

তা তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারেন। ভাল করে দাড়ি গোঁফ না গজাতেই জাহাজে উঠে এলে তো ভয়ের। নাবালক না হোক, সাবালক হয়ে গেছে বলেই কি সবাইকে অগ্রাহ্য করা যায়। নতুন সফর—জাহাজ তো ভাল জায়গা না, কিনার আরও খারাপ জায়গা। চার্লির সঙ্গে সুহাসের মেলামেশার ব্যাপারে তারা আগে বেশ ত্রাসে পড়ে যেতেন। ইদানীং আর যেন তাঁরাও কিছু মনে করেন না। কাপ্তানেরও সায় থাকতে পারে। সে যাই হোক, জাহাজ অজানা সমুদ্রে যাচ্ছে শুনে চার্লিও কেমন যেন বিপাকে পড়ে গেল।

ইঞ্জিন-স্যারেঙ কলকাতার ঘাটে জাহাজে ওঠার সময় বারবার বলেছেন, দ্যাখ পারবি তো! শেষে কোথাও ভেগে যাবি না তো। সে বলেছে, পারবে। বলেছে, কোথাও ভেগে যাবার তার ইচ্ছে নেই। তার মাসোহারা পেলে, বাবা মা ভাই বোনদের অন্নজলের সংস্থান হবে। এবং সে যে কাজকর্ম ভালই পারছে সারেঙ সাবের বুঝতে সময় লাগেনি। বিশ বাইশ মাসে সারেঙ সাব তা ভালই টের পেয়েছেন। তাকে না হলে তো এখন ফাইভারের এক দণ্ড চলে না। উইনচ মেরামতে সে ওস্তাদ হয়ে গেছে।

আজ পিকাকোরা পার্ক থেকে ফেরার সময়ই সুহাস কেমন যেন বিপদের সংকেত পেয়েছিল। সিম্যান মিশন থেকে কিছুটা এগোলেই জেটি। পর পর চার পাঁচটা জাহাজ ভিড়ে আছে। জেটির আলো বেশ ম্রিয়মান। চিমনির রং দেখে কোন কোম্পানির জাহাজ চিনতে অসুবিধা হয় না। সে আর চার্লি পাশাপাশি হাঁটছিল। ছায়া তাদের ক্রমে লম্বা হয়ে আবার কখনও খাটো হয়ে কখনও মিলিয়ে যাচ্ছিল। চার্লির মন ভাল নেই। কি দেখে চার্লি এতটা ত্রাসে পড়ে গেছে সে বুঝতে পারছে না।

সে তো তেমন কিছু দেখেনি। অথচ চার্লির আর্ত চিৎকারে সে পিকাকোরা পার্কে কিছুটা বিভ্রমে পড়ে গেছিল। চার্লির যে মাঝে মাঝে কি হয়!

গোটা জেটি খাঁ খাঁ করছে। ডিনা ব্যাঙ্ক একটা বিশাল তিমি মাছের মতো ভেসে আছে জেটির পাশে। জাহাজটার দীর্ঘশ্বাসও যেন সুহাস শুনতে পেয়েছে। মাল টেনে টেনে আর পারছে না। ক্লান্ত। জেটিতে পড়ে থেকে যেন হাঁসফাঁস করছে। তার এত গা ঘেঁষে হাঁটছিল যে মনে হয় সেই অদৃশ্য আতঙ্ক চার্লিকে তখনও অনুসরণ করছে। তারা কেউ কোনও

কথা বলতে পারছিল না। জাহাজের সিঁড়ির কাছে প্রায় তারা দৌড়ে গেছে। জাহাজে উঠে হাঁপাচ্ছিল চার্লি।

অবশ্য আর্ত চিৎকারে সুহাস লক্ষ্য করেছিল, দূরে গাছের আড়ালে একটা ছায়া অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন পিকাকোরা পার্কে ভ্রমণার্থীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও জটলা, কোথাও ছবি তোলার হিড়িক। বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব মহীরূহ। যত্রতত্র আলোর ভিতর জঙ্গলে মায়া কাননের আভাস। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে কিছুটা ছিল অন্যমনস্ক।

'কি হল? কি হল চার্লি? পালাচ্ছ কেন?'

'দেখছ না! দেখতে পেলে না! লোকটা ফের আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'আরে কত লোক বেড়াতে আসে! আড়াল থেকে আমাদের অনুসরণ করার কি আছে বুঝি না!'

'তুমি বুঝবে না সুহাস। তোমাকে বলেও লাভ নেই। চল উঠি।'

প্রায় তার হাত টেনে বনজঙ্গলের ভিতর ছুটতে চেয়েছিল চার্লি।

সুহাস না বলে পারেনি, 'কেউ আমাদের অনুসরণ করছে ভাবছ?'

'জানি না। যাবে, না দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'এই তোমার মন্দ স্বভাব চার্লি। মাথায় কিছু ঢুকলেই হল। আরে এখানে কে আমাদের অনুসরণ করতে পারে। আমরা বেড়াতে আসি। আমাদের কাছে গুচ্ছের টাকা পয়সাও নেই—আর লোক পেল না তোমাকে অনুসরণ করছে।'

'জান লোকটির লম্বা গোঁফ দাড়ি বাবরি চুল, আর পাথরের মতো হিমশীতল মুখ। দূর থেকে আবছা মতো—তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।'

'কচু ঘুরছে।'

সুহাস ফের বলেছিল, 'গোঁফ থাকলে, পাকা বাবরি চুল থাকলে বুঝি বেড়াবার শখ থাকে না!'

'সুহাস!' সেই এক আর্ত চোখ চার্লির। সুহাস কেন যে আর না উঠে পারেনি।

চার্লি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল সুহাসের কথা শুনে। সে ঠিক বুঝিয়ে বলতেও পারছে না। সুহাস তাকে পাত্তা দিতে না-ই পারে। সুহাস জানেই না, এই লোকটাই পার্লহারবারে, পোর্ট অফ সালফার-এ তাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে। শরীর দেখা যায় না। শুধু কোনও কিছুর আড়ালে মুখটা বের করে রাখে। আগে সে এতটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পর পর তিনবার তিন বন্দরে লোকটাকে সে আবছা অন্ধকারে লক্ষ্য করেছে যেন। চকিতে মুখটা ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেছে।

কৌরিপাইন গাছ এত দীর্ঘজীবী হয় আগে সুহাস জানত না। এই দুর্লভ গাছ দেখার জন্য দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটকও আসে। তাদের কেউ হতে পারে। তারাও এই গাছ দেখার লোভে পিকাকোরা পার্কে আসে। তা ছাড়া বিশ বাইশ দিন হল তাদের জাহাজ নিউপ্লিমাউথ বন্দরে নোঙর ফেলেছে।

সালফার বোঝাই জাহাজ, খালি করতে সময় একটু বেশি লাগে। সালফারের উগ্র ঝাঁজে নাক চোখ জ্বালা করত। সারা ডেকময় সালফার উড়েছে। প্রায় কুয়াশার মতো বাতাসে ঝুলে থাকত সালফারের গুঁড়ো। এ-জন্যও চার্লি সুহাসকে নিয়ে কিনারায় নেমে

যেত। কাজ কাম শেষ হলেই চার্লি সুহাসকে নিয়ে কিনারায় নেমে যাবার জন্য ছটফট করত।

সব সাফসোফ করে জাহাজ তকতকে এখন। আবার নোঙর তোলার সময়—যে কোনওদিন ২৪ ঘণ্টার ফ্ল্যাগ উড়তে পারে। জাহাজ কোথায় ভেসে পড়বে কেউ জানে না। কাপ্তানও না। এজেন্ট অফিস থেকেই নোটিস আসবে—সুতরাং জাহাজ কোথায় যাবে কাপ্তান না-ই জানতে পারেন। জানতে পারলে চার্লিই খবরটা আগে পেত। সে দু একবার যে চার্লিকে বলেনি তাও নয়। চার্লির সাফ কথা, সে কিছুই জানে না। সারেঙ থেকে কোলবয়—সবাই সুহাসকে ধরত। তাদের ধারণা, চার্লির সঙ্গে যখন এত ভাব, তখন সে-ই সবার আগে খবরটা দিতে পারবে। কারণ সবারই ওই এক আতঙ্ক, জাহাজটাকে কোম্পানি না আবার দক্ষিণ সমুদ্রেই ফেলে রাখে।

দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে রাখলে, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা কেন যে এত স্বস্তি পায়, সুহাস ঠিক ভাল জানে না—উড়ো খবর যে কিছু তার কাছে না আছে তা নয়—জাহাজটার অশুভ প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যই দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে রাখা। সুহাসের তখন হাসি পেত। জাহাজের আবার কোনও অশুভ প্রভাব থাকে সে বিশ্বাস করতে পারত না। গুজব আসলে। গুজবে সে কান দেয়নি—এই যে গুজব, জাহাজটাকে কিছুতেই হোমের দিকে উঠতে দেবে না, দক্ষিণ সমুদ্রেই ফেলে রাখা হবে, যে কোন উপায়ে—মাটি টানার কাজ তাই সই। ফসফেট বোঝাই করে অস্ট্রেলিয়ার নানা বন্দর খালাস করার কাজ—সেটা ক'মাসের জন্য তাও সে ঠিক জানে না। সিঁড়ি ভেঙে জাহাজে ওঠার মুখে সুখানিই খবরটা দিয়েছে।

'কে বাপজান? সুহাস!'

চার্লি তার সঙ্গে। চার্লিকে দেখে সুখানি উঠে দাঁড়িয়েছে। সালাম জানিয়েছে। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আল্লা মেহেরবান। জাহাজ মাটি টানতে যাচ্ছে। হয়ে গেল!' কেমন হতাশ গলায় সুখানি আমজাদ কথাটা বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

চার্লি এদের কথা বুঝতে পারে না। সে সুহাসের দিকে তাকিয়ে আছে। কি বলছে সুখানি। জাহাজের কি কোনও খারাপ খবর আছে? সুখানির মুখে কেমন আতঙ্ক—চার্লিও টের পেয়েছিল।

টের পেতেই পারে। চার্লিও ভাল নেই। চার্লি গুম মেরে আছে সেই কখন থেকে। চার্লি আগেও গুম মেরে যেত। পার্ল হারবারে, পোর্ট অফ সালফারে সে তা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু তাকে কখনও বলেনি, দ্যাখো দ্যাখো—ওই দ্যাখো—তারপর চার্লির কথাবার্তা কেমন অসংলগ্ন ঠেকছিল।

কৌরিপাইনের ছায়ায় তারা বসে। সেই হাজার হাজার বছর আগের কোনও সভ্যতার কথা ভাবা, যেমন, তিন চার হাজার বছর আগেকার গাছ হলে মনে তো হবেই, তখন কুন্তী-দময়ন্তী মন্দোদরীরা যুবতী ছিল—তখনকার সেই সব মানুষ, রথ, ঘোড়া, অশ্বমেধ-যজ্ঞ, সত্যবতীর কথাও মনে হত। প্রাচীন গাছের বয়সের সঙ্গে তার নিজের দেশের কথা মনে হত—গাছটা তখন চারা গাছ, এবং কোনও নদীতে ধীবরের নৌকায় সম্রাটের উপগত হবার বাসনা জাগছে এসব মনে হত তার। কারণ এই গাছ যেন রামায়ণ-মহাভারতের

সময়কার গাছ। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে থাকার মধ্যেও মজা। সে গাছগুলির কাণ্ডে হাত বুলিয়ে দিত—গাছগুলোর এত বয়েস হয় কি করে এমনও মনে হত—তবে যা বিশাল, আর এই মহীরূহ এত সব ডালপালা মেলে এগ্‌মন্ট পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে যে অবিশ্বাসও করতে পারত না।

গাছের বয়েস কীভাবে নিরূপণ করা যায় তাও সে জানে না। অবিশ্বাস করবে কিসের ভিত্তিতে! এক একটা শেকড় তিমি মাছের পিঠের মতো উঁচু হয়ে আছে। গাছের কাণ্ডে প্লেট ঝোলানো—গাছ একটা প্রাণ, সেখানেই সে এটা টের পেয়েছিল। নিউজিলেন্ডারদের গাছের প্রতি বোধহয় মায়া মমতা একটু বেশি। কি যত্ন গাছের। পিকাকোরা পার্কের কৃত্রিম খালে নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চার্লির সঙ্গে গাছের নীচে বসে থাকা ছিল অধিব মনোরম। চার্লিও চুপচাপ বসে থাকত। কখনও সে তার দেশবাড়ির গল্প করত। তাদের বাড়িটার পাশে যে নানা বুনো ফুল ফুটে থাকে তাও সে বলত। অথচ আজ চার্লি লোকটাকে দেখার পরই বলেছে, জাহাজে চল সুহাস। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

পিকাকোরা পার্কে তারা রোজই বেড়াতে যায়। কাজ কাম হয়ে গেলে ছুটি। জাহাজ বন্দর ধরলে, কাম কাজের চাপও কম থাকে। সমুদ্রেই মেরামতির কাজগুলো সেরে ফেলতে হয়। বিশেষ করে উইনচ্ মেসিন—জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই উইনচ্‌গুলির উপর বেশি চাপ পড়ে। পুরনো জাহাজ, আর তার উইনচ্ মেসিন কতটা ভাল হতে পারে। ঝড়ের সমুদ্রে ঢেউ আছড়ে পড়লে নোনাজলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডেক—স্টিম-পাইপ থেকে স্ট্র্যাপার নোনা জলে ক্ষতবিক্ষত। নাটবল্টু জ্যাম হয়ে থাকে। কাজেই উইনচে মেরামতির কাজ সারা সফর লেগেই থাকে—এই কাজটা করে করে এত হাত পেকে গেছে যে সে নিজেও ইচ্ছে করলে একাই পারে উইনচ্ মেরামতির কাজ সামলাতে। ঘাটে জাহাজ ভিড়লে শুধু দেখা, কোনও মেসিন গড়বড় করছে কি না। এবারে তার কপাল ভালই বলতে হবে, ডেরিকে মাল নামানোর সময় একটা উইনচ্‌ও গড়বড় করেনি। সে কাজ থেকে বেশ তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে যেত। আর সব লক্ষ্য রাখত চার্লি। কাজ শেষ হলেই সে হাজির। তার তাড়াতেই স্নানটান সেরে সেজেগুজে বের হয়ে যেত। বেশ শীত, সকালের দিকে কখনও কুয়াশা থাকে। বিকেলের দিকে আকাশ পরিস্কার—এবং পাহাড়ি শহরটার নানা উপত্যকায় যেমন কাঠের লাল নীল রঙের বাড়ি আছে, তেমনি আছে অজস্র আপেলের বাগান। তারা কখনও পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হয়ে আপেল বাগানেও গিয়ে বসে থাকত।

সুহাস দেখল, চার্লি দাঁড়িয়েই আছে। যাচ্ছে না। সুখানির মুখ ব্যাজার। কি কারণ মুখ ব্যাজার করে থাকার। সে অগত্যা বলল, 'জাহাজ দক্ষিণ সমুদ্রেই শেষে মাটি টানার কাজ নিল। কালই জাহাজ ছাড়ছে?'

চার্লি যেন অন্য কোনও দুঃসংবাদের আশা করেছিল। হোমে ফেরার জন্য চার্লি যে উদগ্রীব হয়ে নেই বোঝা যায়। তার তো বাবা ছাড়া কেউ নেই। সে জাহাজে ভেসে বেড়ালেও যা, হোমে ফিরলেও তাই। জাহাজটাকে দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে রাখা হবে—এতে এত বিচলিত হবার কি আছে চার্লি বুঝতে পারছে না। অথবা এও হতে পারে, সেই ত্রাস তাকে তাড়া করছে—'দ্যাখো দ্যাখো সুহাস' সে তো দেখেছে,

উঁচু ঢিবির আড়ালে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

চার্লির কেবিন ঠিক অ্যাকমডেশান ল্যাডারের নীচে। ব্রিজে ওঠার মুখে উইংসের তলায়। পর পর দুটো কেবিন—একটায় সে থাকে। পাশেরটায় তার বাবা বুড়ো কাপ্তান মিলার থাকেন। তিনি হয়তো ব্রিজ থেকেই দেখেছেন—চার্লি ফিরছে। সঙ্গে সেই ভারতীয় নাবিকটি। প্রায় তারা সমবয়সী বলে, তিনি তার সঙ্গে চার্লির ঘোরাফেরা মেনে নিয়েছেন। তাকে তিনি মাঝে মাঝে লক্ষ্যও করেন—কিংবা সারেঙসাবই হয়তো বলেছে, ছেলেমানুষ সাব, চার্লির সঙ্গে না আবার মারামারি শুরু হয়ে যায়! চার্লি নিজেও তো সুবোধ বালক নয়। যখন তখন এর ওর পেছনে লাগার স্বভাব। যদি কিছু হয়ে যায়, নিজগুণে ছেলেটাকে ক্ষমা করে দেবেন।

চার্লি যাচ্ছে না দেখে সুহাস বলল, 'যাও। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? মনে হয় তোমার বাবা উপরে অপেক্ষা করছেন।'

চার্লি ইতস্তত করছিল—তারপর কি ভেবে সুহাসের দিকে তাকাল। শেষে বলল, 'কেবিনে পৌঁছে দাও সুহাস।'

আরে বলছে কি!

পোর্ট-সাইড ধরে কয়েক গজ গেলে অফিসার্স গ্যালি। গ্যালির মুখেই এলিওয়ে। ওতে ঢুকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলেই চার্লির কেবিন। এটুকু রাস্তা একা যেতে ভয় পাচ্ছে চার্লি! এমন কি হল! এর আগেও দু-একবার যে চার্লিকে কেবিনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়নি তা নয়। যেমন পার্লহারবারে এবং লস এঞ্জেলসেও চার্লিকে দু-একবার পৌঁছে দিয়েছে। অবশ্য তখন চার্লি তাকে কখনও বলেনি, লোকটা আমার পিছু নিয়েছে। মরতে একটা লোক চার্লির পেছনে লাগবে কেন। চার্লি তো কারও পাকা ধানে মই দেয়নি—অবশ্য জাহাজে উঠে চার্লি তাকে বিপাকে ফেলার যে চেষ্টা করেনি তাও নয়। উইনচের গোড়ায় তেলজুট রেখে সে কাজে ঝুঁকে পড়েছে, আর তখনই দেখেছে, তার যে সামান দরকার সেটাই টবে নেই। হাতুড়ি বাটালি উধাও। আরে গেল কোথায়! হারালে কশপ তার মাথা ভাঙবে। সে হন্যে হয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, বোট ডেকে দাঁড়িয়ে চার্লি তার দিকে তাকিয়ে মজা উপভোগ করছে। চার্লির সঙ্গে তখন তার কথা বলারই সাহস ছিল না, অথচ গায়ে পড়ে ভাব। ছেলেটা তার এটা-ওটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলছে! চার্লি অবশ্য পরে বলত, 'তুমি আমাকে দেখলে পালাও কেন বলত!'

পালাত কি আর সাধে। ইঞ্জিনসারেঙ পই পই করে বলেছেন, সাবধান, কাপ্তানের ব্যাটার পাল্লায় পড়ে যাস না। যান খতড়া করে দেবে। তা যে পারে জাহাজে উঠেই টের পেয়েছিল। জাহাজেই যেন চার্লি লম্বা হয়ে গেল। বড় হয়ে গেল। অনায়াসে বোট ডেক থেকে দড়ি দড়ায় ঝুলে ফল্কায় লাফিয়ে নেমে যেত চার্লি। অনায়াসে দক্ষ জাহাজির মতো দড়ি দড়ায় ঝুলে মাস্তুলের ডগায় উঠে যেতে পারত। একবার তো দড়ি দড়ায় ঝুলে পলকে তার কাঁধে পা রেখে উড়ে গেল সামনে। তারপর রেলিং টপকে কোথায় যে পালাল। চার্লির উপর রাগ করতেও পারে না। সামান্য জাহাজির কোনও রাগ অভিমান থাকলে চলবে কেন। তাই যতটা পারত এড়িয়ে চলত। ঝড়ের সমুদ্রে একদিন তো দেখল হ্যিবিংলাইনের উপর দিয়ে তারের খেলা দেখাবার মতো হেঁটে যাচ্ছে। তাকে দেখলেই

সাপের পাঁচ পা যেন দেখত চার্লি। মাস্তুলের ডগায় উঠে ক্রোজনেস্টে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে। যেন এ-সব দেখিয়ে চার্লি বাহ্‌বা পেতে চাইত। কিন্তু সুহাস সাড়া দিতে পারত না। সামান্য একজন জাহাজির পক্ষে চার্লিকে বাহ্‌বা দিলেও অপমান করা হতে পারে। সেই চার্লি ইদানীং এত শান্ত স্বভাবের হয়ে যায় কি করে সুহাস বুঝতে পারে না।

চার্লি প্রায়ই এখন বোট ডেকে অবসর সময়ে হয় আপন মনে ইজেলে ছবি আঁকে, নয় ডেকচেয়ারে বসে বই পড়ে। কখনও এত গম্ভীর হয়ে যায় যে সুহাস কাছে ভিড়তেই সাহস পায় না।

কখনও তার মনে হয় দুরন্ত ছেলেটা চোখের সামনে কত দ্রুত নির্জীব হয়ে গেল! তার আফসোস—এই তো সিঁড়ি ধরে বোট ডেকে উঠে গেলেই চার্লির কেবিন। রাতও খুব একটা বেশি হয়নি, তা ছাড়া জাহাজে উঠে আসার পর তো কোনও ভয় থাকারও কথা না। অথচ কেবিনের দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে না দিলে সে যেতে পারছে না। এখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ধুস ভাল লাগে।

অগত্যা সুহাস আর কি করে। ভাবল কেবিনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সে পিছিয়ে চলে যাবে।

তারপরই সে টের পেল, ডেকে একমাত্র সুখানি ছাড়া আর কেউ নেই। জাহাজিরা যে যার মতো ফোকসালে ঘাপটি মেরে আছে। একজনও উপরে নেই। জাহাজ মাটি টানার কাজে যাচ্ছে বলে যেন গোটা জাহাজটার মাথায় বাজ পড়েছে।

সুহাস কিছুটা বিচলিত গলায় বলল, 'সুখানিসাব, আমরা তো দক্ষিণ সমুদ্রেই আছি।'

সুখানিসাব কেমন ক্ষোভের গলায় বললেন, 'আরে বাপজান, দক্ষিণ সমুদ্র কি এতটুকুনি জায়গা—পুকুর ডোবা! দুনিয়ার কোনাখামচিতে কত কিসিমের দরিয়া ঘাপটি মেরে আছে তার খবর রাখ?'

সে সত্যি খবর রাখে না। জাহাজের পয়লা সফরে এত খবর রাখাও যায় না, জায়গায় জায়গায় সমুদ্রের নানা কিসিমের নাম! নাম না জানা থাকলে অজানা সমুদ্র হয়ে যায়। অবশ্য জাহাজিদেরও এই আশঙ্কা ছিল, জাহাজ দেশে না ফিরে মাটি টানার কাজে লেগে যেতে পারে। মাটি টানার কাজ থেকে নিষ্কৃতি কবে মিলবে তাও কেউ জানে না। ইচ্ছে করলেই বিদ্রোহ করা যায় না। জাহাজে সাইন করার পর, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কাপ্তানের মর্জি, কোম্পানীর মর্জি। কোম্পানি ইচ্ছে করলে সব পারে, সমুদ্রে ফেলে রাখতে পারে, দেশে ফিরিয়ে নিতে পারে। জোর জুলুম করবে! করলেই সি ডি সি চৌপাট—লাল দাগ পড়ে যাবে। ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজ তো মিলবেই না—অন্য কোম্পানিগুলিও সি ডি সি দেখলে আঁতকে উঠবে। হুজ্জোতি করে জাহাজ থেকে নেমে গেছে—আর কেউ নেয়! যা পরিস্থিতি, জাহাজ এমনিতেই পাওয়া কঠিন—দেশে ফিরলে পাঁচ সাত মাস লেগে যায় ফের জাহাজ পেতে। জাহাজে বিদ্রোহ করলে রক্ষা আছে! মেজাজ যে ভাল নেই কারও ডেক খালি দেখেই সুহাস টের পেল। চার্লিও গ্যাংওয়ে থেকে নড়ছে না। তাকে কেবিনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে কিছুতেই যাবে না! কি যে বিপাকে পড়া গেল! সে খেপে গিয়ে বলল, 'আরে কেবল দক্ষিণ সমুদ্র বলছেন, সেটা কোথায় জানেন না!

জাহাজে সফর করতে করতে চুল পেকে গেল! কেমন অধৈর্য হয়ে পড়েছে সুহাস।

'বলে তো বিশমার্ক সি। নেরুদ্বীপে জাহাজ যাচ্ছে।'

সুহাস বিশমার্ক সি কোথায় জানে না। সেখানে যেতে কতদিন লাগবে তাও জানে না। জাহাজিরা দেশে ফেরার জন্য আকুল। নিজের অভিজ্ঞতায় সে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। তবে জাহাজে চার্লি থাকায় তার সময় কেটে যায়। খুবই দরাজ দিল। মুখ ব্যাজার করে রাখলে এখনও চার্লি তাকে নানা মজার খেলা দেখায়। মাস্তুলের ডগায় উঠে ভয় দেখায়—দেব ঝাঁপ! সে ক্রোজনেস্টে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেবার অঙ্গভঙ্গি করে। এটা চার্লির কাছে খেলা হতে পারে, তবে তার কাছে এটা কোনও জীবন সংশয়ের ব্যাপার মনে হয়। অগত্যা বলতেই হয় চিৎকার করে, 'ঠিক আছে, যাব! তোমার সঙ্গেই কিনারায় নামব। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো নেমে এসে তো!'

চার্লিও টের পায় তার জন্য সুহাসের টান গড়ে উঠেছে। সে নেমে এলে সত্যি দেখতে পায় ফল্কায় বসে সুহাস সমুদ্র দেখছে। সমুদ্র আর তার অনন্ত জলরাশি সুহাসকে কেমন অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।

চার্লির দুষ্টুমি তখন, 'গার্ল ফ্রেন্ডের জন্য মন খারাপ।'

'আমার কোনও গার্ল ফ্রেন্ড নেই চার্লি।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি। তোমাকে মিথ্যা কথা বলে আমার কি লাভ!'

এতে চার্লি কেমন খুশি হয়। চার্লি, তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেও। নীলচোখ ছেলেটার চুল ছোট করে ছাঁটা, মোটা টুইলের অদ্ভুত ঢোলা শার্ট ঢোলা প্যান্ট পরনে। পায়ে কেডস্ জুতো। মোজা সাদা রঙের। লম্বা ঢ্যাঙা, আর একটু মাংস লাগলে চার্লিকে বড় সুন্দর মানাত।

সেই চার্লি দাঁড়িয়ে আছে। সে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে কেবিনে কিছুতেই ঢুকবে না। কেমন আতঙ্ক চোখে মুখে। কি যে ব্যাপার সে বুঝছে না। চিফ অফিসার এদিকে আসছেন। বোধহয় চার্লির দেরি দেখে, চিফ অফিসারকে কাপ্তান নীচে পাঠিয়েছেন। তা জাহাজে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে আসতে হলে ট্রামে ফিরে আসতে হয়। কোথায় ট্রাম বেলাইন হয়ে যাওয়ায় ঘন্টাখানেক প্রায় তাদের দেরি হয়ে গেছে। বাপের মন মানবে কেন!

চিফ অফিসার এসে বললেন, 'এত দেরি ফিরতে?'

চার্লি বলল. 'তা একটু দেরি হয়েছে।'

আর কিছু বলল না চার্লি।

চার্লি ইচ্ছে করলে চিফ অফিসারের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে যেতে পারে। তাছাড়া চিফ অফিসার সুহাসকে পাত্তা দেন না। চার্লির সঙ্গে এত লেগে থাকাও তিনি বোধহয় পছন্দ করেন না। একজন নেটিভ ছেলেকে কে আর পছন্দ করে। চার্লি যে করছে, কিংবা চার্লি যে তার সঙ্গে মেলামেশা করছে—একসঙ্গে জাহাজঘাটায় নামছে, উঠে আসছে এই নিয়েও অফিসার মহলে, ইঞ্জিনিয়ার মহলে কথা উঠতে পারে—তবে বোধহয় চার্লির এ ব্যাপারে নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ আছে। কাপ্তান মিলারও জানেন, চার্লিকে খেপিয়ে দিলে রক্ষা নেই—

জাহাজে তো কাজের শেষ নেই, তার উপর ছেলের নানা হুজ্জোতির বিড়ম্বনায় জড়িয়ে পড়তে কে চায়। শাসনও করে থাকতে পারেন। তবে চার্লি যদি বলে, জাহাজের এই ছেলেটি আমার কাছে সব চেয়ে বিশ্বস্ত। আমার কোনও ক্ষতি হয় সে এমন কাজ কখনই করতে পারে না। তাকে তোমরা অযথা হেনস্থা করলে জাহাজ ছেড়ে চলে যাব।

এ-সব অবশ্য সুহাসের নিজস্ব ধারণা। চার্লি তার সঙ্গে জাহাজ ঘাটে লাগলে কিনারায় ঘুরে বেড়ায়—এটাই তার কাছে বড় অহঙ্কার। আর এর জন্য সব জাহাজীরাই তাকে সমীহ করে। সে পড়াশোনায়ালা আদমি। তার রুচিবোধ আছে, জাহাজিরা এমন ভাবতেই পারে। তার সহকর্মীরা কিংবা তার ওপরয়ালা সারেঙ টিন্ডালও প্রায় সময়ই তার ফোকসালে হাজির হয়।— 'দে বাপজান, খতটা লিখে দে। দে বাপজান, খতটা পড়ে দে।' দেশ থেকে চিঠির বান্ডিল জাহাজঘাটায় এলে সে নাম ধরে সবাইকে ডাকে। 'রহমতুল্লা খান—এই নিন আপনার চিঠি।' এই করে চিঠি বিলি থেকে, পড়ে দেওয়ার কাজটা তার। চিঠির জবাবও সে লিখে দেয়। তার জাতভাই হরেকিষ্ট, অধীর, সুরঞ্জনরা অবশ্য তার এতটা প্রভাবে ক্ষুব্ধ হতে পারত—তবে সে চার্লির প্রিয়জন। ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই। তারাও তাকে এ-জন্য হয়তো পছন্দ করে।

সুহাস বলল, 'চার্লি তুমি বড়মালোমের সঙ্গে চলে যাও। আমি যাচ্ছি।'

'না।'

রাগে ক্ষোভে সুহাসের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কি ছেলে রে বাবা। জাহাজে উঠেও আতঙ্ক! আতঙ্ক না জেদ! তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে, চার্লি যেন গ্যাঙওয়েতেই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে। মাথা গরম হয়ে যায় না!

সে অগত্যা চার্লিকে তার কেবিনের দরজায় পৌঁছে দিল। চার্লি লক খুলে দরজা ঠেলে দিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। উঁকি দিয়ে কি দেখল। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কি ভেবে চোখ তুলে বলল, 'যাও!'

চার্লির চোখে যেন কি আছে। স্বাভাবিক মনে হয় না। টানা টানা চোখ। চোখে ধার আছে। কুহকও বলা যায়। কি যে আকর্ষণ চোখের চাউনিতে—সুহাস স্থির থাকতে পারে না। কিছুটা করুণ মুখ করে তাকিয়ে থাকলে কার না খারাপ লাগে। বড় ধূসর দূরবর্তী ছবি ভেসে ওঠে চোখে। সুহাস তখন কিছুটা চার্লির জন্য অস্থির বোধ করতে থাকে।

সুহাস বোটডেক পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নামল। টুইন ডেক পার হয়ে পিছলে উঠে দেখল, দূরে কেবিনের দরজায় চার্লি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিঘ্নে ডেক পার হয়ে আসতে পারল কি না সুহাস, যেন, দূরে দাঁড়িয়ে চার্লি তাই লক্ষ্য করছে।

এটা সুহাসের নিজস্ব এলাকা। ডেকের নীচে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল, পর পর সব ফোকসাল। সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে পোর্ট-সাইডের ফোকসালগুলিতে থাকে ইঞ্জিন-জাহাজিরা। স্টারবোর্ড-সাইডের ফোকসালগুলিতে থাকে ডেক-জাহাজিরা। পিছিলে উঠে এলে সুহাস নিরাপদ, এমন ভাবতেই পারে চার্লি এখানেই সুহাসের জাতভাইরা থাকে, তার দেশের জাহাজিরা থাকে—এই এলাকায় সুহাসের কেউ ক্ষতি করতে সাহস পাবে না ভেবেই বোধহয় চার্লি কেবিনের ভিতর ঢুকে গেল। চার্লি কি জাহাজে কোনও খুন-খারাপি হতে পারে এমন আশঙ্কা করছে। তার কেমন ভয় ধরে গেল। সে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নীচে নামার

সময় দেখল—প্রায় সব ফোকসালের দরজা বন্ধ। কেমন একটা দম বন্ধ অন্ধকার—কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচণ্ড শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যও দরজা বন্ধ করে রাখতে পারে। ফোকসালের সিঁড়িতেই টের পেল শীতে সে নিজেও ঠক ঠক করে কাঁপছে। শীতে না আতঙ্কে বুঝতে পারছে না। আর তখনই দেখল একটা ছায়া মতো লম্বা মানুষ ওভারকোট গায়ে সিঁড়ি ধরে ডেক-জাহাজিদের ফোকসালের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত রাতে কে ফিরল কিনার থেকে সে বুঝতে পারল না।

দুই

রাতে সুহাসের ভাল ঘুম হল না। সারাটা রাতই সে বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছে। জাহাজ বিশমার্ক সি-তে যাচ্ছে বলে, সবাই ক্ষুব্ধ। হতাশ। বংশীকে নিয়ে সব চেয়ে বেশি ভাবনা। সুহাস রাতে ফিরে টের পেয়েছিল, পিছিলে বেশ একটা খন্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়ির রেলিঙ ভেঙে ফেলেছে কেউ। লাথি মেরে ইনজিন সারেঙের দরজা আলগা করে দিয়েছে। জংলি উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। রতে দু-একজন জাহাজি চুপি চুপি তার সঙ্গে দেখাও করে গেছে। সে হুঁ হাঁ কিচ্ছু বলেনি। কেবল তাদের অভিযোগ শুনেছে। আসলে চার্লির সঙ্গে তার বেশ দহরম মহরম আছে ভেবেই তারা এসেছিল। সে তাদের সঠিক খবর দিতে পারবে। চার্লি তাকে যে কোনও খবর দেয়নি তারা তা বিশ্বাস করতে পারেনি। নেরু দ্বীপ কোথায় এটাও তারা সঠিক জানে না। বিশমার্ক সি-তে অসংখ্য প্রবাল দ্বীপের ছড়াছড়ি। একমাত্র নিউগিনি নিউব্রিটেন, সলোমনদ্বীপপুঞ্জ ছাড়া তারা অন্য কোনও দ্বীপের নামও জানে না। তারই কাছাকাছি কোনও দ্বীপ-টিপ নেরু দ্বীপ হবে এমনই তারা ভেবেছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে জিরো ডিগ্রি থেকে বিশ ডিগ্রির মধ্যে অসংখ্য এমন দ্বীপ আছে। ডেক টিন্ডাল বলে গেছে, সে গত সফরে রাবাউল এবং গ্রিন আয়র্ল্যান্ডে গেছে। বিশমার্ক সি-তেই যে এই দ্বীপগুলি আছে তারা না বললে সুহাস জানতে পারত না। কিন্তু তারা কেউ নেরু দ্বীপের নাম শোনেনি। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও দ্বীপ-টিপ হবে। প্রায় বিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিশমার্ক সমুদ্র। এত অসংখ্য দ্বীপ যে অধিকাংশ মানচিত্রেই তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। নিউগিনি দ্বীপটা অবশ্য বিশাল। ডেক টিন্ডাল বলেছে—প্রায় বোর্নিও সুমাত্রা দ্বীপের সমগোত্র।

সুহাস সমুদ্রের প্রায় কিছুই জানে না। তবে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও দ্বীপের নাম সে জানে। থাইল্যান্ডের কাছাকাছি দ্বীপগুলি। সে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ টাস করে জাহাজে উঠেছে বলে নামগুলি তার চেনা। নিউপ্লিমাউথ থেকে কত দূরে এই দ্বীপগুলি তার জানা নেই। এক দু হপ্তা কিংবা তার বেশি—তবে জাহাজ সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত বলা যাবে না কত দিনের রাস্তা। কেউ বলছে দশ বারোদিন লেগে যাবে। আবার কেউ বলছে, জাহাজের মর্জি—তেনার মর্জি না হলে সেখানে যাওয়া খুবই কঠিন। তিনি যেতে পারেন। নাও যেতে পারেন। বিশমার্ক সিতে ঘুরিয়েও মারতে পারেন। অজানা সমুদ্র পেলে জাহাজটা নাকি দুরন্ত স্বভাবের হয়ে যায়। মজা পেয়ে যায়। তার এই স্বভাবের কথা কম বেশি সব জাহাজিরাই বিশ্বাস করে। ডিনা ব্যাঙ্ক আবার খেপে গেছে এমনও রব উঠে যায় জাহাজে।

কাজেই জাহাজ দেশে না ফিরে অজানা সমুদ্রে ভেসে গেলে কে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে! বংশী উন্মাদের মতো আচরণ করতেই পারে। তা ছাড়া জাহাজিরা দেশে ফেরার জন্য উন্মুখ। বন্দরে কেউ কেউ চিঠিও লিখেছে, সম্ভবত ফ্রিম্যান্টাল থেকে গম বোঝাই হয়ে জাহাজ দেশে ফিরবে। মানুষের বাড়িঘর কত প্রিয়, চিঠি লিখে দেবার সময় সুহাস হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। এত দীর্ঘ সফর, মনে হয় কেন অতীতে তারা জাহাজে উঠে এসেছিল, কোন অতীতে তারা পরিবার পরিজনের সান্নিধ্য পেয়েছে—আবার কবে পাবে, কিংবা কে জানে জাহাজটা আর আদৌ ফিরবে কি না, জাহাজটা সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। লোহা-লক্কড়ের দামে জাহাজ বিক্রি করা গেল না—জাহাজ স্ক্র্যাপ করা গেল না—জাহাজটাকে স্ক্র্যাপ করাব কথা উঠলেই বিপাকে পড়ে যেতে হয়। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বিপাকে পড়ে যায়—এমনকি দু দু-বার দৈব দুর্ঘটনারও শিকার হয়েছে তারা। অপমৃত্যু থেকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিছুই বাদ যায় না।

সুহাস বাঙ্ক থেকে উঠে পড়ল। অধীর কখন থেকে ডাকছে, 'এই ওঠ। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কি পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস।'

অধীর, বংশীদা আর সে একই ফোকসালে থাকে। বিশ বাইশ মাস একসঙ্গে থাকলে মায়া জন্মে যায়। বংশীদার কথা ভেবে তার খারাপ লাগছিল। সবে বিয়ে করে সফর করতে বের হয়েছে। বউয়ের কথা ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তার দোষও দেওয়া যায় না।

রাতে সে দু একবার যে বংশীদাকে লক্ষ্য না করেছে তা নয়। কিন্তু বংশীদা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে চিত হয়ে। মুখ মাথাও কম্বলে ঢাকা। জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বালা। অস্পষ্ট হয়ে আছে সব। এমনও মনে হয়েছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে তো! মরার মতো কেউ এ-ভাবে পড়ে থাকলে ভয় হবার কথা। সে সতর্ক পা ফেলে বাঙ্কের কাছে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে অবাক। ঠিক টের পেয়েছে। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে বলেছে, কি হল, কি দেখছিস!

সে কিছু বলতে পারেনি। এ-ভাবে সামান্য কারণেই কেন যে সে আতঙ্কে পড়ে যায় কে জানে, যদি বংশীদা তার নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে কিছু করে বসে! যেমন সে চার্লিকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময়ও আতঙ্কে টেরই পায়নি শীতের কামড় কত তীব্র।

এত ঠাণ্ডা যে কম্বল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু সে উঠে দেখল, বংশীদার বাঙ্ক খালি। না উঠেও উপায় নেই। ডেকে মেলা কাজ। অধীর চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার সময় বলল, রাতে আর কোনও গণ্ডগোল করেনি। তুই তো ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমাচ্ছিলি। সারেঙ সাব দরজা ফাঁক করে একবার দেখে গেছেন। তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস ভেবে ডাকেননি।

সুহাস তাড়াতাড়ি চাটুকু শেষ করে বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। নীচের বাঙ্কে পা রেখে পায়ে চটি গলাল। একটা কম্বল টেনে গায়ে দিল—তারপর সারেঙের ফোকসালে উঠে গেল। কেন তিনি এসেছিলেন জানা দরকার। কে জানে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে তিনি যদি কাপ্তানের কাছে চলে যান, তবে আর এক কেলেঙ্কারি। বংশীদাকে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে

পড়তে হবে। বংশীদা লাথি মেরে সারেঙের দরজা আলগা করে দিয়েছে। অজানা সমুদ্রে জাহাজ যাচ্ছে শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। তোয়াজ করলে তিনি তুষ্ট হন। দরকারে বংশীদাকে ধরে নিয়ে যাবে। বংশীদা বললেই হল, মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, আর হবে না। বংশীদাই বা কোথায়। সারেঙ সাবের ফোকসালের দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ। স্টাবোর্ড-সাইডের ফোকসালগুলিতে থাকে ডেকসারেঙ এবং ডেকজাহাজিরা। যদি ডেকসারেঙের ঘরে থাকেন। উঁকি দিয়ে দেখল, না ডেকসারেঙ, না ইনজিনসারেঙ। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। আবার বচসা শুরু হয়েছে। সারেঙসাব চুপচাপ বসে আছেন। কোনও কথার জবাব দিচ্ছেন না। শুধু বলছেন, 'আমি কি করব। আমি কি বাড়িয়ালা? সব বাড়িয়ালার মর্জি। মাস্তার দিতে হয় তাঁর কাছে দাও।'

একই ভাঙা রেকর্ড শুধু বাজছে।

কেউ বলছে, 'আপনি জানেন, জাহাজটা নিজের কারখানায় যাচ্ছে?'

তিনি চুপ।

'আপনি জানেন, বিশমার্ক সি-তে কত জাহাজের কঙ্কাল সমুদ্রের তলায় পড়ে আছে?'

তিনি চুপ।

'আপনি বলুন, জাহাজে মেয়েমানুষ আসে কোত্থেকে!'

'এই তো সুহাস, ওকে বলুন না, সেও দেখেছে, মধ্যরাতে বোট-ডেকে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।'

সুহাস সারেঙের পক্ষ নিয়ে বলল, 'বাজে কথা। আমি কিচ্ছু দেখিনি।'

'আবার মিছে কথা।' গ্যালি থেকে ভান্ডারি চিৎকার করতে করতে ছুটে এল।

সারেঙ সাব খুবই একা পড়ে গেছেন। সব জাহাজিরাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। একা বংশীদাকে দায়ী করতে পারবেন না। সে কিছুটা যেন আশ্বস্ত গলায় বলল, 'চোখের ভুলও তো হতে পারে।'

'এখন চোখের ভুল বলছিস সুহাস! তুই ভয়ে বোট-ডেক থেকে নেমে এসেছিলি না, হাঁপাচ্ছিলি না।'

সে বলল, 'আসলে. মাথা ঠিক ছিল না। কি ঝড়। দাঁড়াতে পারছিলাম না। বোটডেক পর্যন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঢেউ না আবার ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই ত্রাসে ছুটছি। গভীর রাতে কত শুনশান থাকে বোটডেক তোমরা তো জানই। চোখের ভুলে দেখতেই পারি। আর দেখলেই দোষের কি আছ। তার জন্য চাচাকে দুষছ কেন?'

'জাহাজটা ভাল না।' লতু মিঞা হাত তুলে চেঁচাচ্ছে। 'জাহাজটা ইবলিশ, জাহাজটা জিন পরীর আখড়া। ভাগাড়ে যাবার আগে মিঞাবিবি তামাসা দেখাচ্ছে। মিঞা এতদিন একলা জাহাজিদের তাড়া করেছে এবারে বিবি হাজির। হয়ে গেল!'

সুহাস লতু মিঞাকে বলল, 'কি আজে বাজে বকছ চাচা। তোমার কি মাথা খারাপ।'

'মাথা খারাপ না হলে শালা কোন বেজন্মার বাচ্চা এ-জাহাজে সফর দেয়। ডেককশপ লতু মিঞা বেশি কথা বললে, থুথু ছিটায়। কাছে দাঁড়ানো যায় না। সুহাসের মুখেও এসে পড়েছে। সে বাথরুমে ঢুকে মুখে জল দিল। বংশীদা কোথায়। জাহাজের এক নম্বর গ্রিজার বংশীদা কি সুরঞ্জনের ফোকসালে গিয়ে বসে আছে। কিংবা সুরঞ্জন মাথা ঠান্ডা

রাখার পরামর্শ দেওয়ায় উপরে উঠে আসেনি।

গ্যালি থেকে হাতে দা নিয়ে বের হয়ে এল ভাণ্ডারি ইমতাজ। যা মাথা গরম কি না করে বসে। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল, কাঠও বের করছে ভাণ্ডারি। ডেকে গোস্ত কাটতে বসবে। সে হাঁড়িতে সবজি বসিয়ে হাতের কাজ সেরে নিচ্ছে। আর গজ গজ করছে। সুহাস বুঝতে পারছে, রাতের জের এখনও মেটেনি। সে লতু মিএগ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিএগ্রা বিবিকে এত ভয় কেন চাচা? সবাইকে গোরে যেতে হয়।'

লতু মিএগ্রা কেমন মিইয়ে গেল কথাটাতে। বলল, আরে বাবু জিন ফেরেস্তা বলে কথা। ভাঙা জাহাজে ফেরেস্তা আসে না—জিনেরাই ঘোরাফেরা করে। বরফ ঘরে গরু বাছুরের গোস্ত ঝুলছে। দু-ফালা করে রেখেছে গরু ভেড়া। সেখানে মরা মেয়েমানুষ আসে কোত্থেকে বল।

সুহাস কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেল। মরা মানুষ তো গরু ভেড়ার সঙ্গে ঝোলে না। ঘোরে না পড়লে এমন দেখাও যায় না। ঘোরে পড়েই দেখেছে কিছুতেই বোঝানো গেল না। বাটলার আহামদ ডারবানের ঘাটে পালাল। ঠিক পালাল বলা চলে না, কি যে দেখল বরফ ঘরে সেই জানে, রসদ নিতে গেলেই আহামদ বলে, 'ওরে বাপজান, ওদিকে যাস না। মরা মেয়েমানুষ ঝুলতাছে।' সে নিজেও যায় না। কাউকে ঢুকতেও দেয় না। তারপর কাপ্তানের ধমক খেয়ে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল—'সাহাব, আমার কসুর নাই। মেমসাব বরফ ঘরে উলঙ্গ হয়ে ঝুলতাছে। দু-পায়ে হুক গেঁথে গেছে। মাথাটা নীচে, পা উপরে। হুকে উনি মেহেরবানি করে ঝুলতাছেন। আমারে কয়, কি কেন আছ, মিএগ্রা? ডর নাই, গোস্ত যা লাগে নাও—আমি তো থাকলাম।'

আসলে জাহাজে থাকলে নানা কুসংস্কারে এমনিতেই ভুগতে হয়। লজঝরে জাহাজ হলে তো কথাই নেই। কাপ্তান পর্যন্ত খেপে গিয়ে নীচে নেমে এসেছিলেন। রসদ ঘরের চারপাশে সবাই হামলে পড়েছিল। সুহাসও উইনচ মেসিন ফেলে ছুটে গিয়েছিল—কিছুতেই বরফ ঘরের চাবি আহামদ কাউকে দেবে না। রসদ ঘরের নীচে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে হয় বরফ ঘরে—উপরের ঘরটায় নানা কিসিমের র‍্যাক—র‍্যাকে জ্যাম জেলি আপেল কলা টমেটো সস থরে থরে সাজানো। চাল ডাল ময়দার বস্তা। তেলের টিন—চা চিনি টোবাকো আর নীচে নেমে গেলে সবজির পাহাড়—বাঁধাকপি ফুলকপি—ভ্যাপসা পচা গন্ধ—ডাঁই মেরে ফেলে রাখা হয়েছে। তার সামনে বরফ ঘরের লম্বা দরজা। সাদা রং বার্নিসে চকচক করছে। খুললে ছালচামড়া ছাড়ানো গরু ভেড়ার লাশ।

সুহাসও দেখেছিল। গরুভেড়ার লাশ ছাড়া কিছু সে দেখতে পায়নি। কাপ্তান সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, 'কোথায় কে ঝুলছে। আহামদকে ডাক।'

সবাই একে একে উঠে আসছিল—বরফ ঘরে ছালচামড়া ছাড়ানো ঝুলন্ত সব গরু ভেড়া মুরগি দেখে সুহাসের মাথা ঘুরে গিয়েছিল—তবু সে দেখেনি কোনও নারীর সাদা পাণ্ডুর লাশ সেখানে ঝুলছে। আহামদ ডারবানের ঘাটে সত্যি পাগল হয়ে গেল। সে কিছুতেই আর বরফঘরে নামত না। কাউকে রেশনের গোস্ত বিলি করত না। অগত্যা চিফ কুকের উপর ভার। চিফ কুক কাজটা করত ঠিক—তবে সে একা বরফ ঘরে ঢুকত না। গণ্ডায় গণ্ডায় ছাল চামড়া ছাড়ানো আস্ত গরু ভেড়া ঝুলতে থাকলে কে না অস্বস্তিতে পড়ে

যায়! সেকেন্ড কুককে সঙ্গে নিত। আর জাহাজ দুলতে থাকলে সমুদ্রে তারাও বেশ দোল খায়। শক্ত আংটায় গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কপিকলে টেনে তোলা হয়েছে! ওজন মেপে রেশন দেওয়ার কাজটা চিফ কুকের উপরই বর্তে গেল। আহামদকে কিছুতেই আর বরফ ঘরে পাঠানো গেল না। সে গেলেই নাকি দেখতে পায় কোনও নগ্ন নারীর সাদা পাণ্ডুর শরীর গরু ভেড়ার সঙ্গে ঝুলছে। চুল সোনালী, মাথা নীচের দিকে। এ-সব খুব কাছে না গেলে নাকি বোঝা যায় না। এমনিতে চোখে পড়ার কথা না। কারও দেখারও কথা না। এত ছাল চামড়া ছাড়ানো গরু ভেড়ার মধ্যে একজন উলঙ্গ মেমসাবকে আবিষ্কারও করা যায় না। মাংসের রং এক রকমের। এমনকি নিতম্ব এবং পা সবই মুরগির পেটের মতো অথবা ঠ্যাং-এর কাছাকাছি। এ-সব বর্ণনা আহামদেরই। আর কেউ তো কিছু দেখেনি।

সুহাস ডেক ধরে ছুটে আসছিল, এমন আজগুবি কথা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। সবাই তো গেছে বরফ ঘরে, কেউ তো উঠে এসে বলেনি, না আছে। থাকবে কোত্থেকে। কার দায় পড়েছে, গরু ভেড়ার সঙ্গে নারীর লাশ ঢুকিয়ে দেবার। সেও বলেছে, আহামদ পাগল হয়ে গেছে। সে ডেক ধরে ছুটে যাবার সময় বলেছে, শিগগির যাও, দেখোগে বাটলার পাগল হয়ে গেছে। বরফ ঘরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। কাপ্তান জোরজার করে ওর কেবিনে আটকে রেখেছে।

আর তখনই শুনেছিল, কেউ ডাকে।

কে?

সে দেখল এক নম্বর ফল্কায় বসে বসে দাঁত খুঁটছে তিন নম্বর সুখানি। সুহাস মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে—কারণ জাহাজে সুখানির কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিজে কাপ্তান, চিফ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ডিউটি। তিন নম্বর সুখানিই বলতে গেলে মুরুব্বি তাদের। তিনি তাকে ডাকছেন, সুহাস শোন।

সুখানি অর্থাৎ মুখার্জিদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সবাই নেমে বরফ ঘর দেখে এলেও তিনি নামেননি। যেন এটা তাঁর কাছে কোনও খবরই নয়। এই জাহাজ ছাড়া তিনি অন্য জাহাজে সফরও করেন না। জাহাজের পুরো হাল হকিকত দু-জন জানে—একজন ইনজিন সারেঙ, অন্যজন তার এই মুখার্জিদা।

সে কাছে গেলে বলেছিলেন, 'কে পাগল হয়ে গেছে?'

'আহামদ বাটলার। নীচে গেলে না! কাপ্তান তো সবাইকে বলেছেন, দেখে এস বরফ ঘরে কি আছে? কে কিং আবিষ্কার করতে পারো চেষ্টা করে দেখ। বাটলার বললেই বিশ্বাস করতে হবে কেন। তোমাদের নিজেদের চোখ আছে, দৃষ্টি আছে, অনুভূতি আছে—দেখ যদি আহামদ সত্যি ঠিক কিছু বলে থাকে।'

মুখার্জিদা বললেন, 'তিনি প্রাজ্ঞ মানুষ, বলতেই পারেন।' তারপর সহসা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুই কি দেখলি!'

'ধুস। দেখা যায়! আমার তো মাথা ঘুরছিল। বরফ ঘরে উঁকি দিয়েই দৌড়।'

মুখার্জিদা ফের প্রশ্ন করেছিলেন, 'তবে বুঝলি কি করে আহামদ বাটলার পাগল হয়ে গেছে। সে মিছে কথা বলেছে।'

'কাপ্তান যে বললেন।'

'তিনি বলতেই পারেন। তাঁকে তো জাহাজটা নিয়ে সমুদ্রে চষে বেড়াতে হবে। বাটলারের কথা সত্য হলে কেউ বরফ ঘরের মাংস খাবে! মেয়েছেলে লাশ হয়ে থাকলে বরফ ঘরের গোস্ত কেউ খেতে পারে!'

'কি বকছ মুখার্জিদা! ওখানে মেয়েমানুষ আসতে পারে বল! লাশ হয়ে মাথা নীচু রেখে ঝুলে থাকতে পারে! কেউ তো দেখল না। কার মুরোদ আছে মেয়েমানুষের লাশ ওখান গুঁজে দেয়।'

'কেন দেখল না বুঝিস না। ভিতরে ঢুকতে কারও সাহসই হয়নি।'

তা নাও হতে পারে, দরজায় উঁকি দিলেই দেখা যাবে তাও ঠিক না। প্রায় দশ বারো গন্ডা গরু ভেড়া ঘরটায় গোস্ত হয়ে ঝুলছে। মাসখানেকের রসদ একসঙ্গে তোলা হয়েছে—মাসখানেক বাদে আবার রসদ উঠবে। বরফ ঘরের বাসি গোস্ত সবার জন্য বরাদ্দ। যে যা খায়। মটন খেলে মটন। বিফ খেলে বিফ। এত লাশের মধ্যে আর একটা লাশ খুঁজে পাওয়া যে সহজ না তাও সে বিশ্বাস করে। কিন্তু কাপ্তান ছাড়ার পাত্র নন। তিনি সব গরু ভেড়া মুরগি বরফ ঘর থেকে টেনে বাইরে এনে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—'কোথায় লাশ বলো?' বলেছিলেন সবাইকে। আহামদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তিনি এমনও বলেছিলেন।

সব শুনে মুখার্জিদা বলেছিলেন, 'সে সত্যি তবে জাহাজে আছে। ভাবতে ভালই লাগছে। জাহাজ ছেড়ে যেতে চাইছে না। কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না। কি মজা।'

কেমন বালকের মতো মুখার্জিদা হাসিছলেন। মুখার্জিদার কথাবার্তায় সে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

'কি বলছ। মুখার্জিদা তুমি হাসছ। এসব বিশ্বাস কর।'

'দেখ সুহাস, জাহাজে সবে সফরে বের হয়েছিস। জাহাজ বড় খারাপ জায়গা। কিনার আরও খারাপ জায়গা। কোথায় কে কি দেখে ফেলবে কেউ বলতে পারে না। আহামদ যা দেখেছে—আজগুবি বলে উড়িয়ে দিস না। আহামদ দেখতেই পারে। এককালে বরফ ঘরে একটা মেয়ের লাশ সত্যিই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি তো আজকের না। এই জাহাজেই আমার বারো চোদ্দ সফর হয়ে গেল। আমি জানি বলেই বললাম।'

সে কেমন বিচলিত বোধ করছিল। মুখার্জিদা টোবাকো জড়াচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে। এত বড় একটা কান্ড হয়ে গেল, তিনি সেখানে গেলেনই না। তিনি তাঁর মতো মনোযোগ দিয়ে সাদা কাগজে টোবাকো জড়িয়ে জিভে লেপ্টে দিলেন। তারপর দু আঙুলে টিপে টিপে সোজা সরল সিগারেট মুখে পুরে লাইটারে আগুন ধরালেন। হুস করে টেনে চোখ বুজে ফেললেন।

'তুমি জান, বরফ ঘরে লাশ ছিল কখনও।'

'ছিল। আমি জানি বলেই বললাম।'

'কি করে সম্ভব!'

'অসম্ভবই বা কি করেক হতে পারে বুঝি না। টানা দেড় মাস সমুদ্রে। মন্ট্রিলে জাহাজ। তুষার ঝড়। জাহাজের চিফ ইনজিনিয়ার হন্যে হয়ে আছেন, তাঁর বান্ধবী এলেই শরীর গরম করা যাবে। তুষার ঝড়ে পাইন গাছের একটা পাতাও ছিল না। সে অনেক কথা।

যা এখন। কিছুই অবিশ্বাস করতে নেই—জাহাজে উঠেছিস, জাহাজির মতো অদৃষ্টকে মেনে নে। আহামদের এটা অদৃষ্ট। পাঁচ সাত বছর বাদে সেই লাশকে আহামদ ঠিক আবিস্কার করে ফেলেছে। আমরা তো ভেবেছিলাম, যাক, সমুদ্রে যখন গোপনে ফেলে দেওয়া গেল, তখন আর ভাবনার কি! অথচ দ্যাখ সে ফিরে ফিরে জাহাজে আসে। ঠিক জায়গায় ঝুলে থাকে। বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়া আছে তোর? বিক্রমাদিত্য রাজার কথা মনে আছে। ঐ আর কি! গল্প তো এমনিতেই তৈরি হয় না। কিছু না কিছু সত্য থেকেই যায়।'

লতু মিঞার মুখে বরফ ঘরে লাশের কথা শুনে সেই মুখার্জিদাও উপরে উঠে এসেছেন। তাঁকে সেদিন বেশ তাজা লাগছিল, তিনি ভিড়ের মধ্যে থাকেন না, গণ্ডগোলেও থাকেন না। ডারবানের ঘাটেই তাঁকে দেখে এটা সুহাস টের পেয়েছিল! বরফ ঘরে গিয়ে সবাই উঁকি দিলেও তিনি উঁকি দেননি। তাঁর বিশ্বাস—আহামদ দেখতেই পারে। লতু মিঞার কথায়ও তাঁর সায় আছে। তবে সায় থাকলেও এসব নিয়ে কোনও উত্তেজনা তিনি পছন্দ করেন না।

তিনি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বললেন, 'একদম গণ্ডগোল না। সারেঙকে ভাল মানুষ পেয়ে কাল থেকে হুজ্জোতি চলছে। মিঞাবিবিকে নিয়ে পড়লে লতু মিঞা! কাজ কাম নেই! সারেঙ সাব, আপনি ওদের কাজে যেতে বলুন। ঘোট পাকাচ্ছে। এই সুহাস, তুই সত্যি বোটডেকে মেয়েমানুষ দেখেছিস?'

সে বলল, 'না আমি কিছু দেখিনি।'

'দেখলেই দোষ কোথায়। যে যার মতো থাকে। কেউ তো ক্ষতি করেনি।'

এত দিন জাহাজে লুকেনারের প্রেতাত্মা একাই বিরাজ করত। জাহাজে উঠলে নানা গুজব এমনিতেই ওড়াউড়ি করে। জাহাজটা প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার। লুকেনার সাহেবের জাহাজ—তাঁর নৌবহরের তিনটি জাহাজের এটি একটি। তিনি জলদস্যু ছিলেন, এবং লুণ্ঠন গৃহদাহ ধর্ষণ কিছুই বাদ ছিল না তাঁর। দরকারে কোরাল সি-তে আত্মগোপন করে থাকতেন। পর্তুগিজরা যা করত একসময়। তাঁর দাপটে কোরাল সি কিংবা বিশমার্ক সি-তে কোনও জাহাজ ঢুকতে সাহস পেত না।

জাহাজিদের বিশ্বাস, সেই জলদস্যু লুকেনার সাহেবের হাড় প্রোথিত আছে এই জাহাজে। মাঝে মাঝে তাঁকে গভীর রাতে ফরোয়ার্ড পিকে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা গেছে। প্রাচীন নাবিকেরা লুকেনাার সাবের প্রেতাত্মার কবলে পড়লে কারও যে রক্ষা থাকে না, এমন গুজবও ছড়াতে কসুর করে না। তিনি এতদিন একা ছিলেন, কেউ কেউ এবারকার সফরে মধ্যরাতে কোনও নারীকে দেখে ফেলায়—তিনি আর একা নন এমন ভাবতেই পারে। লতু মিঞা ভাবতেই পারে এবারে মিঞাবিবি একসঙ্গে সফর করছেন।

মুখার্জিদা উপরে উঠে আসায় লতু মিঞা কিঞ্চিৎ মিইয়ে গেছে। কারণ মানুষটা একটু ভিন্ন গোত্রের। সবাই মিলে মিশেই থাকে। মানুষ থাকবে, ভূত থাকবে না তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। বেঁচে থাকার এই একটা মজা। গোরে গেলে মানুষও থাকে না ভূতও থাকে না। তা আছে যখন থাক। তাই নিয়ে এত হুজ্জোতির কি আছে। জাহাজ তো একদিন ঘাটে লাগবেই—তখন যে যার মতো নেমে পড়বে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হাতে যখন আসবে, কেউ কি সারেঙ সাবকে ভাগ দেবে!

মুখার্জিদা বললেন, 'বংশীকে দেখছি না!'

কে যেন বলল, 'ও নীচে শুয়ে আছে।'

'কাজে যাবে না?'

'কে জানে!'

তখনই বংশীর গলা পাওয়া গেল—'এই যে আমি। কিছু দরকার আছে?'

মুখার্জিদা বললেন, 'মাথা গরম করিস না। যা কাজে যা। সারেঙ সাবকে নিয়ে পড়েছিস কেন! তিনি কি করবেন। কাপ্তানেরও কিছু করার নেই। আমরা কোম্পানির গোলাম। সাইন করার সময় সেটা তো ভাবনি। ব্যাঙ্ক লাইনের সফর, লম্বা সফর, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কত কিছু তো জাহাজে ওঠার সময় মনে হয়েছে। এখন জাহাজের নামে অপবাদ ছড়াচ্ছ, লজ্জা করে না!'

আরে বলে কি!

'অপবাদ ছড়াবার কি হল!'

মুখার্জিদার মুখে এমন কথা শুনে সুহাস তাজ্জব। যেন বরফ ঘরে মেয়েছেলের লাশ ঝুলে থাকতেই পারে, বোটডেকে মধ্যরাতে তিনি একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য উঠেও আসতে পারেন, লুকেনার সাব মাঝে মাঝে জাহাজের মায়া কাটাতে না পেরে জ্যোৎস্না রাতে ফরোয়ার্ড পিকে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারেন—সে জন্য জাহাজটার নামে অপবাদ ছড়ানো কেন! জাহাজেরও মেজাজ মর্জি বুঝতে হবে। তবে তো একজন পাক্কা জাহাজি।

নাও হয়ে গেল।

কেউ আর কথা বলতে পারছে না।

ভাণ্ডারি দা দিয়ে গোস্ত কোপাচ্ছে। সে শুনছিল সব। সে বোধ হয় আর পারল না, সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মুখার্জিবাবু, জাহাজ তার নিজের গোরে যাচ্ছে—দেখে নেবেন।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'জাহাজটা তো ওখানেই বিচরণ করত। সরকার বাহাদুর লুকেনার সাবকে আটক করার চেষ্টা করলে, ঐ দরিয়াতে আত্মগোপন করে থাকত—এটা কি জানেন!'

মুখার্জি বললেন, 'জানি!'

'তবে!'

ভাণ্ডারি ফের বসে পড়ল। গ্যালিতে দুটো উনুন জ্বলছে। জাহাজিরা যে যার রেশন থেকে চা চিনি কনডেনস মিল্ক বের করে চা বানিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। কেউ কেউ কাজে যাবার জন্য পোশাক পাল্টে উঠে আসছে। তারা জানে, কিছু করার নেই। সুরঞ্জন জাহাজের ফায়ারম্যান। সে চা করে দু কাপ চা মুখার্জি এবং সুহাসকে দিল। হিমেল ঠান্ডা উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। কম্বলেও শীত যাচ্ছে না সুহাসের। চায়ের কাপ কম্বলের তলায় নিয়ে শরীর গরম করছে। একটু বেশি শীতকাতুরে হলে যা হয়। তারও যে বাড়িঘরে ফেরার জন্য মন খারাপ বুঝতে দিচ্ছে না। জাহাজটা গোরে যাচ্ছে বলায়, শীতটা যেন আরও বেশি কামড় বসাচ্ছে শরীরে। জাহাজ যাচ্ছে সেই সমুদ্রে, যেখানে ভয়ংকর জলদস্যু লুকেনার আত্মগোপন করে থাকতেন।

মুখার্জিদা ফের বললেন, 'যেখানেই যাক আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

আর অদৃষ্টে থাকলেই দেশে ফিরে গোরে যেতে পার মিঞা। শেষ পর্যন্ত গোরে যেতে হয় না এমন কেউ আছে! আসলে তোমরা দেশে ফেরার জন্য নানা অজুহাত সৃষ্টি করছ। পয়গম্বরের মতো কথা বলছ মিঞা। সব জেনে বসে আছ।'

ভাণ্ডারি চুপ।

সে গ্যালিতে ঢুকে গেল। জাহাজিরা কাজ সেরে আটটায় ফিরে আসবে। চর্বি ভাজা রুটি খাবে। সে ময়দা গুলতে বসে গেল।

মুখার্জিদার কথায় কাজ হয়েছে।

এত উচাটনে থাকা ঠিক না। মনমেজাজ খারাপ হতেই পারে। তাই বলে, ডিনা ব্যাঙ্ক গোরে রওনা হয়েছে কথাটা কারও ভাল লাগল না। কেউ বলতেও পারে না, জাহাজের পরিণতির কথা। অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আহামদ বাটলার আতঙ্কে দেখে থাকতে পারে লাশ, এবং সে যে দেশে পালাবার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করেনি তাই বা কে বলতে পারে। কার কি পরিণতি কেউ বলতে পারে না। পিছিলে ধীরে ধীরে গুঞ্জন থেমে গেল। সুহাস কাজের পোশাক পরে উঠে দেখল যে যার কাজে বের হয়ে যাচ্ছে। তার উইনচে কাজ। কশপের ঘরে তেল জুট হাতুড়ি বাটালি নিতে চলে গেল।

জাহাজে জল মারা হচ্ছে। ডেক ধোয়া-মোছার কাজ চলছে। ফল্কার কাঠ তুলে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপলে ঢেকে কিল্ এঁটে দেওয়া হচ্ছে। বড় টিন্ডাল ওয়াচে নেমে গেলেন। সঙ্গে তিনজন ফায়ারম্যান, দু'জন কোলবয়।

জাহাজের দুটো বয়লারে নতুন করে আগুন দিতে হবে। স্টিম তুলতে হবে। তাদের ব্যস্ততার শেষ নেই।

সুহাস দেখল, ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন কাপ্তান। সঙ্গে চিফ-অফিসার। তাঁরা সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছেন। সারা জাহাজ ঘুরে দেখবেন। ডেরিক ফল্কা, হাসিল ঠিকঠাক আছে কিনা, বাঁধাছাদার কাজে কোনও ত্রুটি থাকল কিনা—কিংবা ডেকে কোনও ময়লা জমে আছে কিনা, দেয়ালে কোথায় রং চটে গেছে, সব দেখে উঠে যাবেন।

সুহাস তাড়াতাড়ি উইনচে ঝুঁকে পড়ল। পাঁচ নম্বর সাব তার কাছে নাট খোলার জন্য হাতুড়ি বাটালি চাইছেন। সে ঝুঁকে হাতুড়ি এগিয়ে দেবার সময় শুনতে পেল, ফাইভার বলছে, 'তোমাদের ওদিকটাতে শুনলাম খুব গণ্ডগোল। এক নম্বর গ্রিজার নাকি সারেঙকে মারতে গিয়েছিল!'

সে বলল, 'বাজে কথা।'

'বাজে কথা! হতে পারে। বাজে কথা হলেই ভাল। শুনলাম, তুমি নাকি মধ্যরাতে জাহাজে মেয়েমানুষ দেখতে পাও! তা দেখতেই পার। সবাই দেখে। সমুদ্রে এলে রোগটা বাড়ে। যখন তখন মাথায় মেয়েমানুষ পেরেক পুঁতে দেয়। যা জাহাজ—'

সুহাস কি যে বলে! তা দেখেছে, একবারই—তখন জাহাজ লৌহ আকরিক বোঝাই হয়ে ক্যারেবিয়ান সি-তে। সাইক্লোন—ডেক ধরে ফোকসালে যাওয়া মানা। টানেল পথ খুলে দেওয়া হয়েছে—তখন, সেই একবার, বোটডেক ধরে নামতে গিয়ে প্রায় ঢেউয়ের তোড়ে উড়ে যাচ্ছিল। তখনই মনে হয়েছিল, অন্ধকারে বজ্রপাত। কোনও নারী বোটডেকে ছুটে বের হয়ে এসেছে। কড় কড় করে আকাশ চিরে ফালা ফালা বিদ্যুতের ফণা।

সে ঢোক গিলে বলল, 'আচ্ছা ফাইভার, লুকেনারকে তুমি কখনও দেখেছ? তোমারও তো তিন চার সফর।'

'লুকেনার! মানে, সি-ডেভিল লুকেনার! সে-তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। সে তো প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ গেল, তোমরা এখন স্বাধীন—সে এখনও আছে নাকি!'

'জাহাজিরা যে বলে অনেকেই তাকে দেখতে পায়।'

'তা পেতে পারে। লুকেনারের গুপ্তধনও পেয়ে যেতে পারে তারা। যে যেমন ভাবে। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা এই গুপ্তধনের লোভেই তো জাহাজটা কিনেছিল।'

'কি বলছ?'

'তাই তো গুজব।'

'কোথায় সেই গুপ্তধন?'

'তোমাকে বলব কেন?'

'না মানে!'

'আরে বোঝো না, জাহাজের খোলে কত রিপিটি মারা! ইস্পাতের চাদর কত জায়গায় কাটা দেখেছ, কাটে আর জোড়া লাগায়। রিপিট মেরে দেওয়া হয়। গ্যাস কাটার দিয়ে কেবল কাটা ছেঁড়া করা হচ্ছে। কিসের খোঁজে?'

'কে করছে?'

'কে করছে জানব কি করে! খোলে নামলে বুঝতে পার না কত তাপ্পি মারা। তাপ্পি মারতে মারতে আসল জাহাজটা আর নেই। হাড় ক'খানা আছে। হাড়ের ভিতর যদি গুপ্তধন থাকে। তা থাকতেই পারে! তিনি এবং তাঁর গুপ্তধন—ভাবা যায় না।'

সুহাস জানে, ইস্পাতের চাদরে জং ধরে যায়। সমুদ্রের নোনাজলে চাদর খয়ে যায়। ফুটো ফাটা হয়ে যেতে পারে। ড্রাইডকে মেরামতির কাজ চলে। ইস্পাতের চাদর নতুন বসিয়ে দেওয়া হয়, রিপিট করা হয়। জাহাজ পুরনো হয়ে গেলে এসব করতেই হয়—তবে এই লক্করমার্কা জাহাজ এত পুরনো যে মেরামত করতে গিয়ে তাপ্পিমারা ছাড়া আর উপায় কি। জাহাজটা বড় বন্দরও ধরতে পারে না। ধরতে পারে না, না ধরতে দেওয়া হয় না। যেন পালিয়ে পালিয়ে ঢোকে, পালিয়ে পালিয়ে বের হয়ে যায়। জাহাজি আইনে এমন পুরনো জাহাজ তো কবেই বাতিলের পর্যায়ে পড়ে যাবার কথা—কেন যে বাতিল হচ্ছে না, তাও বোঝে না। বড় রহস্য।

আর তখনই দেখল, চার্লি বোটডেক থেকে তরতর করে নেমে আসছে। এখন আর তাকে অবাক করে দেবার জন্য জাহাজের দড়িদড়া ধরে একেবারে বোটডেক থেকে লাফিয়ে ফক্কায় নেমে আসে না। চার্লি এখন সিঁড়ি ধরেই নেমে আসে। তাকে উইনচে দেখতে পেয়েই হয়তো ছুটে এসেছে। পরনে সেই বয়লার সুট, হাতে দস্তানা চামড়ার। পায়ে কেডস জুতো এবং তার সর্বাঙ্গ বড় বেশি ঢাকা। এই ঠান্ডায় সে কাবু হলেও চার্লি বিন্দুমাত্র কাবু নয়। সাদা টুইলের বয়লার সুট চামড়ার মতো ঘাড় গলা শরীর ঢাকা।

সে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জানো কাল না, আর এক কান্ড। ম্যাককে কে সিঁড়ির মুখে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ভাগ্যিস লাগেনি। কিছু একটা হলে কি যে হত!'

'কখন।'

'রাতে।'

'কে ঠেলে ফেলে দিল!'

'সেই তো, কে যে ঠেলে ফেলে দিল!'

ম্যাক চুপচাপ। সে হাঁ হুঁ কিছু বলছে না। সে উইনচের ভিতর মাথা গলিয়ে দিচ্ছে। উইনচের আড়ালে ফাইভার অর্থাৎ ম্যাক যে আড়ালে লুকিয়ে শুনছে চার্লি বিন্দুমাত্র তা টের পেল না।

তিন

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সাঁঝ লেগে যাবে।

নিউপ্লিমাউথ বন্দরে চার পাঁচটি জাহাজ জেটিতে ভিড়তে পারে, জেটি না পেলে বয়াতে বাঁধা থাকে জাহাজ। জেটি খালি হলেই বয়াতে বাঁধা জাহাজটা জেটিতে ভিড়বে।

বন্দরটা দেখতে কিছুটা হ্রদের মতো, দু-দিকে তার বালিয়াড়ি এবং পাহাড়—পিছনের দিকে বড় বড় বোলডার ফেলে সমুদ্র থেকে আলগা করে নেওয়া হয়েছে—সমুদ্রের ঢেউ সেই সব বোলডারে এসে আছড়ে পড়ছে—ভিতরে ঢেউয়ের কোনও তাণ্ডব নেই। আসলে বোলডার ফেলে কৃত্রিম বাঁধের সৃষ্টি করে এই বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে। ডেকে দাঁড়ালে সামনে জেটি। জেটি পার হয়ে একদিকে নির্জন বালিয়াড়ি, জেটি ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলে সিম্যান মিশন। মিশন পার হয়ে ট্রাম ডিপো। শহরটা পাহাড়ের উপত্যকাতে—অধিকাংশই কাঠের বাড়ি লাল নীল রঙের। সামনে ফুলের বাগান। বড় বড় গোলাপ এবং তুচ্ছ করার মতো ডেইজি ফুল।

চার্লির খুব ইচ্ছে ছিল, বুনো ডেইজি ফুল সুহাসকে দেখায়। বুনো ফুল যে এই সব দামি গোলাপ কিংবা ডেইজি ফুলের চেয়ে অনেক বেশি মহার্ঘ সুহাসকে না দেখাতে পারলে শান্তি পাচ্ছিল না। সে জাহাজে উঠে এসে সুহাসকে নানা বর্ণের বুনো ফুলের খবর দিয়েছে। চার্লির এই সব বুনো ফুলের প্রতি কেন যে এত আগ্রহ সুহাস বুঝতে পারে না। পিকাকোরা পার্কে নানা কিসিমের বুনো ফুলও আছে—যেমন গ্রেপেডেড কৌরি ফুলের খোঁজ পেয়েছে এখানে। রাফ ব্রেজিং স্টার দেখে তো সুহাস সত্যি অবাক। গাছগুলি পাট গাছের মতো তবে বেশ লম্বা পাতা, ঠিক সবুজ রঙের নয়, নীল রঙের। ফুল হলুদ রঙের। সূর্যমুখী ফুলের মতো দেখতে। তবে সূর্যমুখীর অনেক পাপড়ি—এতে এত পাপড়ি নেই—কিছুটা হাল্কা আর নরম—সুহাস হাত দিয়ে দেখতে গেলেই হা হা করে উঠেছে চার্লি—'আরে করছ কি। হাত দিলেই পাপড়ি সব ঝরে যাবে। বড় সোহাগি ফুল। ধোরো না। ফুল দেখতে হয়, ছোঁওয়ার যে এত কি দরকার তোমার বুঝি না বাপু।'

পিকাকোরা পার্কে ঢুকলেই জঙ্গল এবং রাস্তা। দু-পাশে রাজ্যের সব বুনো ফুলের চাষ, মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের চত্বর—সবুজ ঘাস—তবে চার্লি বলেছে, 'এগুলি ঘাস মনে করার কোনও কারণ নেই, এও এক ধরনের বুনো ফুল। বোতাম ফুলের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ—এবং চত্বর জুড়ে তার চাষ। সহজেই গিয়ে বসা যায়—মখমলের গদির মতো বসলে দেবে যেতে হয়। সে দেখেছে চার্লি তাকে নিয়ে পার্কের এ-মাথা ও-মাথা ঘুরেছে,

কতরকমের বুনো ফুল আছে তাও বলেছে—দু হাজার রকমের তো বটেই। তার ঠাকুরদা সামান্য একজন চাষি থেকে এই বুনো ফুলের ব্যবসা করে প্রায় ছোটখাটো ধনকুবের হয়ে গিয়েছিলেন তাও সুযোগ পেলে বলেছে।

একদিন তো অবাক। আরে সামনে যেন আগুন ধরে গেছে এমন মনে হয়েছিল—অন্তত কাছে না গেলে সে টেরই পেত না, আগুন নয়, ফুল।

চার্লি বলেছিল, 'টল ব্লেজিং স্টার।' কিছুটা ঝুলঝাড়ার বাঁশের মতো লম্বা। তবে বাঁশের শুধ ডগায় নয়, গোটা গায়েই গুচ্ছ গুচ্ছ পাটের লাছি রং করে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। হাওয়া দিলে নুয়ে পড়ে। তিন চার একর জুড়ে এই ফুলের সমারোহ দেখলে প্রথমে মনে হতেই পারে সারা মাঠ জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

চার্লি নানা বন্দরে পাহাড়-টাহাড় পেলেই উঠে যেত তাকে নিয়ে। বুনো ফুল দেখাবার এত আগ্রহ কেন চার্লির সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চার্লি কি মনে করে সে যা ভালবাসে, সে যাতে আগ্রহ বোধ করে সুহাসও তাই ভালবাসবে, আগ্রহ বোধ করবে। সে কোনও বুনো ফুল দেখে আগ্রহ প্রকাশ করলে চার্লি বাচ্চার মতো তার হাত টেনে বলবে, 'আরে তোমাকে বুনো ডেইজি দেখাতেই পারলাম না। কি যে খারাপ লাগছে।'

তারা কৌরিপাইন গাছগুলির নীচে বসে ঠিক করত—কোনদিন যাওয়া যাবে—অর্থাৎ পার্কটার নানা পাথর, এবং গভীর বনজঙ্গলে যেন ফুলটা লুকিয়ে আছে। ফুলটা ফুটে আছে কোথাও, তবে কোথায়, তারা ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না। চার্লি বিশ্বাসই করতে পারত না, এত বুনো ফুলের সংগ্রহ আছে পার্কটায় অথচ ডেইজি নেই কেন। চারপাশে আলোর ছড়াছড়ি—মানুষজনেরও ভিড়। ইতস্তত সব রেস্তোরাঁ পাব, ফল বিক্রির দোকান, জুয়া খেলার ব্যবস্থা সবই আছে। ডেইজি ফুল খুঁজতে গিয়ে একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল। বাবা জানেন, সুহাস সঙ্গে আছে। সুহাস সম্পর্কে বাবার কি ধারণা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। নেটিভ ছেলেটির তিনি খোঁজখবরও নিয়েছেন। এমনকি ফাইভারকে ডেকেও সুহাস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সারেঙও বলেছে, খুবই মাথাঠান্ডা ছেলে। কাজকর্মে আগ্রহ আছে খুব। তবে মনে হয় ভীতু স্বভাবের। একা বন্দরে নেমে যেতে সাহস পায় না। তা ছেলেমানুষ, সাহস না পেতেই পারে।

চার্লি যে খুব শান্তস্বভাবের নয়, এবং পারিবারিক রুচিবোধ চার্লিকে কিছুটা অহংকারী করে রেখেছে বাবা ভালই জানেন। দেরি হয়ে যাওয়ায় খুব চিন্তার কারণ হতে পারে চার্লির মনেই হয়নি। কিন্তু কে যে তাকে অনুসরণ করছে তাই সে বুঝতে পারছে না। কেন এই অনুসরণ—যদি তার ছদ্মবেশ কেউ খুলে দিতে পারে এ জন্য যে তার পরিবারের লোকজন কোনও ষড়যন্ত্র করছে না, তাও সে সঠিক জানে না! সে সারারাত এ-সবই ভাবছিল। অনুসরণকারী কখনই খুব কাছে আসে না, দূরে থাকে। এবং রাত হয়ে গেলেই তাকে দেখতে পায়, অস্পষ্ট আলো আঁধারে সে উঁকি দেয়, এবং সুযোগ বুঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজতে গিয়ে এটা তার মনে হয়েছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসা উচিত ছিল জাহাজে। কিন্তু সময় পাবে না, তারপর তারা কোথায় যাবে তাও জানে না। পিকাকোরা পার্কের গাছগাছালি সম্পর্কে একটি বইও সে কিনেছে, তাতে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে সব। বুনো ডেইজি ফুলও দেখা যায়—তবে খুব কালেভদ্রে।

এখানকার জল হাওয়া ঠিক সহ্য হয় না বলে গাছ বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

আসলে সেই বন্দর শৈশব এবং পারিবারিক গির্জা এবং সমাধিক্ষেত্রটি তার খুবই প্রিয়। বিশাল এক পাহাড় এলাকা কিনে ঠাকুরদা নিজের পছন্দমতো বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন। সকালে বিকেলে—সেই বনভূমিতেই অধিকাংশ সময় তার কেটে গেছে। সে লাফিয়ে পার হয়ে যেত বৃষ্টির জমা জল কিংবা কাঁটা গাছ। সে ফুল তুলতেও ভালবাসত। বেটসি দূরে বসে তাকে সব সময় পাহারা দিতেন। বেটসি ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরিচারিকা।

রাফ ব্লেজিং স্টার ফুলের সঙ্গে টল ব্লেজিং স্টার ফুলের তফাত কত তাও সে বুঝিয়েছে সুহাসকে। সুহাসের মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি যে না ঘটত তা নয়—বিরক্ত হত। ভাবত হয়ত বুনো ফুলের নামে পাগল, শহরটার কোথাও ঘুরে দেখাই হল না। বংশীদা, মুখার্জিদারা সিম্যান মিশনেই পড়ে থাকত। কাঁড়ি কাঁড়ি বিয়ার গিলত, আর যে যেমন পারে—যেমন মুখার্জিদা ভাল মাউথ অর্গান বাজায়, সুরঞ্জন বাউল গান গাইতে পারে, তারা দু'জন তো ডায়াসে উঠে নেচে গেয়ে নাবিকদের আমোদ-আহ্লাদেরও সঙ্গী হয়েছে। চার্লিকে নিয়ে একদিনই গিয়েছিল মিশনে। চার্লির একদম ইচ্ছে নেই, তবু সুহাস জোরজার করলে না গিয়ে পারেনি। সেদিন একটা লোক অদ্ভুত সব ভেল্কি দেখাচ্ছিল—সে বলছে, আর কে আসতে চান। আসুন, উঠে আসুন। বোধহয় চার্লি এবং সে দুজনই প্রায় বলতে গেলে বাচ্চা নাবিক জাহাজের। নজর এড়ানো কঠিন। লোকটার ভেল্কি দেখানো শেষ, সে কখনও রুমাল থেকে আট দশটা কবুতর উড়িয়ে দিচ্ছে, কখনও দু-জগ জল খেয়ে সবটা আবার উগরে দিচ্ছে—এই সব খেলা থেকে একসময় একজন নাবিককে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যা নাস্তানুবুদ করল—এতে চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পেতে পারে—চার্লি বলেছিল, লোকটা হিপনোটাইজ করতে পারে। তোমাকে ডাকলে কিন্তু যাবে না।

সুহাস যাবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু যখন একজন নাবিককে যা খুশি তাই করাচ্ছে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললে তাই করছে, শিস দিতে বললে শিস দিচ্ছে, নিলডাউন হতে বললে নিলডাউন হচ্ছে, তখন সুহাসের মনে হয়েছিল, নাবিকটি আসলে লোকটিরই কোনও সাকরেদ হবে। একই জাহাজে কাজ করে হয়তো। শিখিয়ে পড়িয়ে না নিলে কেউ এমন তামাসা দেখাতে পারে বিশ্বাস হয় না। কান ধরে জিভ বার করে ডায়াস থেকে নেমে দর্শক আসনগুলি পার হয়ে আবার উঠে এলে হাসির ফোয়ারা! এতে সুহাস অপমান বোধ করেছিল, এবং সেও উত্তেজিত হয়ে ডায়াসে উঠে যাবার সময় দেখেছিল চার্লি তার হাত চেপে ধরেছে। বলেছে, 'একদম যাবে না। চল বলছি। হাসির খোরাক হতে খুব ভাল লাগে বুঝি।' সেই একদিনই মিশনে, আর তার যাওয়া হয়নি।

চার্লি রাস্তায় বলেছিল, লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি?'

'কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছ না। তোমার কি হয়েছে বল তো। কেমন মাঝে মাঝে চুপসে যাও। সিম্যান মিশন থেকে বের হয়ে কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছ না।'

'আরে না, ভাবছিলাম, ভাগ্যিস লোকটার পাল্লায় পড়িনি।'

'পড়লে কি হত?'

'পড়লে কান ধরে নিলডাউন হতে হত। তোমার সত্তাকে গিলে ফেলত। হিপনোটাইজ সাংঘাতিক কিছু তা জান। দেখলে না, লোকটাকে যেই বলল, গায়ে জামা কেন?'

সুহাস বলল, 'দিলে না তো যেতে। আসলে লোকটাকে সে জাহাজ থেকেই ধরে এনেছে। শিখিয়ে পড়িয়ে তামাসা দেখিয়ে গেল। সবাইকে বোকা বানিয়ে গেল। কাল একবার আসবে নাকি?'

'না। আমার ভাল লাগছে না। দেখলে না, জামা গায়ে কেন, কি গরম। জামা গায়ে রাখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখলে না নাবিকটি জামা খুলে ফেলে ওর পায়ের কাছে রেখে দিল। হিপনোটাইজড না হলে এই প্রচন্ড ঠান্ডায় কেউ জামা খুলে ফেলতে পারে!'

সুহাস ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটছিল। কিন্তু চার্লি আর এগুতে সাহস পায়নি। বলেছিল, 'চল জাহাজে ফিরে যাই।'

সুহাস বাধ্য হয়েছিল বলতে, 'তুমি না হয় ছবি আঁকতে বসবে। তোমার অকুপেশান যে কতরকমের ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন ছবি এঁকেই সময় কাটিয়ে দিতে পার। আমি কি করব।'

'দেখবে বসে বসে।'

অগত্যা সে শেষে চার্লির সঙ্গে জাহাজেই ফিরে এসেছিল আর আসার সময় রাস্তায় সহসা চার্লি যে কেন এমন বিদঘুটে কথা বলল, সে বুঝল না।

'সুহাস জামা খুলতে বললে তুমি খুলতে?'

'কেন খুলতে যাব। জামা খুলে ফেললে আমার ওস্তাদি থাকল কোথায়। তবে তো আমিও তার অনুগত দাস হয়ে যেতাম। হিপনোটাইজড হয়ে যেতাম। অত সোজা না বুঝলে।'

'ঠিক খুলিয়ে ছাড়ত! ভাগ্যিস যেতে দিইনি। কে জানে—তোমার হেনস্থা দেখে আমিও না ডায়াসে উঠে যেতাম।'

চার্লির মুখে আশ্চর্য হতাশা ফুটে উঠেছে কথাগুলি বলতে গিয়ে।

'কি হত তা হলে। চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যেত।'

'কি হত তোমাকে বোঝাব কি করে। কি হত না তাই বল।'

'কি করবে জাহাজে ফিরে। চল বেলাভূমিতে গিয়ে বসি। কাছেই তো জাহাজ। এত ভয় পাও কেন বুঝি না।'

'আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

চার্লি হাঁটছিল জাহাজের দিকে। সিম্যান মিশন থেকে বের হবার সময় তারা দুটো আপেল কিনেছিল। সুহাস দাঁতে কামড়ে আপেল ভেঙে নিচ্ছে। চার্লির যেন খেয়ালই নেই—সে আপেল খাচ্ছে না, এক হাত পকেটে। চার্লির মিষ্টি মুখ ব্যাজার হয়ে গেলে বড় খারাপ লাগে। তার দিকে মাঝে মাঝে চার্লি এমন অপলক তাকিয়ে থাকে যে কেমন বিব্রত বোধ করে সুহাস। লোকটাকে খুবই চেনা লাগছে চার্লির। কেন লাগছে, লাগলে চিনতে পারছে না কেন। জাহাজের নাবিকরা বিকেল হলেই নেমে যায়। জাহাজ আসছে, ভিড়ছে, মাল খালাস করছে, জাহাজ আবার চলে যাচ্ছে। জেটিতে নামলে তো লোকারণ্য। রাস্তায় দেখা কোনও লোক হতে পারে—আর এই নিয়ে এত দুশ্চিন্তারই বা কি আছে। সেও মনে

করার চেষ্টা করল, কোনও গুঁফো লোকের কথা মনে করতে পারে কি না। গোঁফ-জোড়া এত বিশাল যে দু-দিকে দুটো সরীসৃপের লেজ যেন ঝুলে পড়েছে। সে শত চেষ্টা করেও কারও সঙ্গে লোকটার মিল খুঁজে পেল না। পিকাকোরা পার্কের ক'জন প্রহরী গোঁফ রাখে—জাহাজের মেসরুম মেট গোঁফ রাখে, মাউরি উপজাতীয় দুজন যুবক, এই জেটি থেকে মাছ ধরতে যায়, তাদেরও লম্বা গোঁফ আছে। তা গোঁফ থাকলেই চেনা চেনা মনে হবে কেন?—চেনা চেনা মনে হলে চিনতে পারছে না কেন, এ-ভাবে কাঁহাতক চুপচাপ হাঁটা যায়। সে রেগে গিয়ে বলেছিল, 'চার্লি, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না।'

সেদিনই কেবিনে চার্লি বলেছিল, 'এস, তোমাকে বুনো ডেইজি ফুল দেখতে কেমন, ছবি এঁকে দেখাই।' চার্লির ছবি আঁকার হাত সত্যি ভাল। কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে সে সেই ওস্তাদ গুঁফো লোকটির মুখ এঁকে ফেলল। হুবহু এক। তারপর গোঁফের উপর সাদা রং বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'চিনতে পারছ?'

'এ তো তোমার বাবার মুখ মনে হচ্ছে!'

চার্লি খেপে গেল।

'আমার বাবার মুখ!'

'না মানে কপালের দিকটা তোমার বাবার মতো, চোখের নীচেটা সেকেন্ড ইনজিনিয়ার ববের মতো।'

চার্লি কেবিনের দরজা ঠাস করে খুলে চিৎকার করে উঠেছিল, 'বের হয়ে যাও। বের হয়ে যাও বলছি। ইয়ারকি মারা হচ্ছে।'

সুহাস দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে যাচ্ছি। আমি নীচে নেমে গেলাম। দেখি কাউকে যদি সঙ্গে পাই—জাহাজে বসে থেকে কি হবে? আমার খোঁজে কিন্তু আবার ফোকসালে ছুটবে না। গেলে পাবে না। সারেঙ শুনলে গোলমালে পড়ে যাবেন, ছেলেটা একা একা কোথায় বের হয়ে গেল। তুমি বা অন্য কেউ সঙ্গে না থাকলে তার ধারণা, রাস্তা চিনে ফিরতে পারব না। বুড়ো মানুষটাকে চিন্তায় ফেলে দেবে না।'

'নামবে না। জাহাজ থেকে নামবে না।' কড়া হুকুম চার্লির।

সে যে কি করে। আসলে সে চার্লির মর্জি না হলে জাহাজ থেকে নেমেও যেতে পারবে না। ফোকসালে গিয়ে কি করবে! একা একা কাঁহাতক ভাল লাগে।

সে খেপে গিয়ে বলেছিল, 'আঁকতে গেলে বুনো ডেইজি ফুল, এঁকে ফেললে একটা গুঁফো লোক। চমৎকার হাত তোমার মাইরি।'

চার্লি কেন যে রাগে ফুঁসছে বুঝতে পারছে না। সে তো চার্লির বাবাকে অপমান করতে চায়নি। যা মনে এসেছে, অকপটে বলেছে। তবে থুতনির দিকটা না ববের মতো না কাপ্তানের মতো। সে শুধু বলল, 'কোথাও গোঁজামিল আছে তোমার ছবিটাতে। সে যাই হোক আমি ইচ্ছে করে তোমার বাবাকে অপমান করিনি। অকপটে বলছি, আমার মনে হয়েছে কোথায় যেন কপালের দিকটা তোমার বাবার মতো। ম্যাককে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পার—সবার চোখ সমান নয়, কে কি দেখে ফেলবে, আবিষ্কার করে ফেলবে বলা কঠিন। চোখের দোষও হতে পারে। আমি ঠিক নাও বলতে পারি।'

তারপরই সুহাস বলেছিল, 'দেখি ম্যাক, আছে কি না।'

চার্লি আর পারল না। রেগে মেগে সুহাসকে কেবিনের ভিতর টেনে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে থাকল।

'আমাকে নিয়ে সবাই মজা করতে চায়। আমাকে কেউ মানুষ ভাবে না। আমি মরে যাব দেখো।'

আরে এসব আবোল-তাবোল কি বকছে। সুহাস পড়ে গেল মহাফাঁপরে। সে মজা করবে কেন। ম্যাক মানে ফাইভারকে ডেকে দেখালে, সে বলে দিতে পারত হয়তো আঁকা ছবির মুখটা কার মতো দেখতে। সে মজাও করেনি, ইয়ার্কিও মারেনি। তারপরেই মনে হল, অসময়ে ম্যাক তার কেবিনে থাকবে কেন। তার বুক পকেটে যতই গির্জার ছবি থাকুক, তার স্ত্রীর ছবি থাকুক, সে তার বন্দরের বান্ধবীকে নিয়ে যে মজা লুটতে বের হয়ে গেছে তাতে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। সে অগত্যা বসে থাকল।

চার্লি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদল কিছুক্ষণ। তার অনুযোগ, তাকে কেউ বুঝতে চায় না। কেউ তাকে ঠিক বোঝে না। সে ডেইজি ফুল এঁকে দেখাতে পারত, কিন্তু লোকটাকে চেনা চেনা মনে হওয়ায় একবার এঁকে দেখল, সে কে, হুবহু এই এঁকে ফেলার যে জন্মগত প্রতিভা চার্লির আছে ছবিটা দেখলে অবিশ্বাস করার কারণ নেই। তারপর গোঁফ জোড়া মুছে দিতেই, মুখটা এমন গোঁজামিল হয়ে যেতে পারে সুহাসও ভাবতে পারেনি। আসলে কিছুক্ষণের দেখা কোনও মানুষকে হুবহু মনে রাখারও কারণ নেই। আর এই নিয়ে এত অশান্তি হবে জানলে, কিছুতেই চার্লির কেবিনে ঢুকত না।

চার্লি নিজেই পরে উঠে গেছিল। বেসিনে মুখ ধুয়ে তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছেছিল। বড় সন্তর্পণে সে তার তোয়ালে দিয়ে কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিল—ভিতরে চার্লির এত কি কষ্ট সুহাস বুঝতে পারে না। পলকে হাসতে পারে, কাঁদতে পারে এটা সে আগেও টের পেয়েছে। কিন্তু লোকটাকে নিয়ে এত মাথা খারাপ করার কি হেতু থাকতে পারে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না।

তোয়ালেটা মুখ থেকে সরাতেই সুহাস দেখল, চার্লি হেসে ফেলেছে। তবে কি এই কান্না তার মায়া কান্না। এও তো আর এক বিভ্রম।

সে বলল, 'আমি উঠছি চার্লি।'

'বোস না।'

'না যাই।'

চার্লি সার্ভিস রুমে রিঙ করছে। তার মানে এখুনি কাপ্তানবয় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে। এলও।

চার্লি বলেছিল, 'দু-কাপ কফি।' তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কিছু খাবে?'

সে ঘাড় নেড়েছে।

চার্লি রং তুলি দিয়ে ছবিটা মুছে দিল। বলল, 'আমার যে কি হয়। লোকটাকে কেন এত ভয় পেলাম—সে তো সত্যি খেলা দেখাতে পারে। সত্যি হিপনোটাইজ করতে পারে। মজার খেলা। অথচ লোকটাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। নির্দোষও হতে পারে। তোমাকেও কষ্ট দিলাম।'

'এই দ্যাখ', বলে সে আর একটা কাগজ লকার থেকে বের করে ইজেলে লটকে দিল।

পিন পুঁতে দিল—তারপর বলল, 'বুনো ডেইজি ফুল আঁকছি না। মাথাটা পরিস্কার নেই। ঠিক আঁকতে না পারলে ফুলটাকে অসম্মান করা হবে। বরং দেখ,' বলে সে কয়েকটা আঁচড় বুলিয়ে দিল তুলিতে। জল রং। বড় সবুজ একটা গোল কুমড়োর মতো কি আঁকছে। কুমড়োর গায়ে শুঁয়ো পোকার মতো লোম এঁকে দিচ্ছে—সবুজ নীল এবং ব্রাউন কালার দিয়ে সে যে একটা ক্যাকটাস আঁকছে সুহাসের বুঝতে কষ্ট হল না। তারপর তুলি জলে ভিজিয়ে লাল রং দিয়ে কুমড়োটার মাথায় লাল হলুদ মেশানো একটা পদ্ম ফুল এঁকে ফেলল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যারেল ক্যাকটাস।'

'বাঃ দারুণ তো দেখতে।' সুহাস সত্যি অবাক হয়ে গেছে ক্যাকটাসটা দেখে।

চার্লি বলল, 'বড় দুর্লভ জাতের ক্যাকটাস। বড়লোকদের কাছে আমার ঠাকুরদা শুধু এই ক্যাকটাস বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন।' আন্তরিকতা থাকলে জানো সুহাস, মানুষ সব পারে। সামান্য খামার তার—গরু মোষ ভেড়া খামারে, কিছু টিলার মালিক তিনি—এলাকাটা উষর বলে শুধু ঘাস জন্মায়। ফসল ফলে না—টিবিগুলো বছরের অধিকাংশ সময় পাথর আর বুনো লতাপাতায় ঢাকা। তাঁর কি মনে হত কে জানে, ঘোড়ায় চড়ে কখনও তিনি দূর দূর পাহাড় অঞ্চলে চলে যেতেন—যেখানে যে দুর্লভ ফুল খুঁজে পেয়েছেন, সংগ্রহ করেছেন। ফুল ফুটিয়েছেন—ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, টিবিগুলিতে সেই বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এমন এক আশ্চর্য বনভূমি গড়ে তুলেছিলেন, দেখলে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে না যাওয়ার উপায় নেই। এবং এই করে তাঁর বুনো ফুল আর ক্যাকটাসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন জানো, যুদ্ধ চলছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করছে। মিত্রপক্ষের সেনারা হটছে। মার খাচ্ছে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জ থেকে নিউগিনির সব দ্বীপগুলি জাপানিরা দখল করে নিয়েছে। আর আমার ঠাকুরদা খুঁজে বেড়াচ্ছেন—কোথায় স্নো বাটার কাপ ফুল পাওয়া যেতে পারে। কোথায় স্মুদ অ্যাসটার জন্মায়—কোথায় পাওয়া যাবে প্রেইরি ওয়াইলড রোজ, কোথায় পাওয়া যাবে ডেজার্ট স্পুন। আরিজোনা অঞ্চলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষটা যখন তাঁর পাহাড়, টিলাকে সাজিয়ে ফেলছেন—যুদ্ধ তখন টোকা মারছে ঘরের দরজায়। মানুষটার হুঁশ নেই।'

সুহাস অবাক হয়ে শুনছিল। এই এক স্বভাব চার্লির, কথা বলতে শুরু করলে থামতে জানে না। কে বলবে চার্লি পলকে কাঁদতে পারে হাসতে পারে। তাকে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তার ঠাকুরদার গল্প বলার সময় সে কি যে ভাবত, বোধ হয় আরও কিছু মনে করার চেষ্টা করত।

'বেটসি আমাকে ঠাকুরদার গল্প বলত, কত গল্প তাঁর। একবার আলপাইন অঞ্চলের দুর্লভ জাতের কচ্ছপ সংগ্রহ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। মানুষ এই করে একজন ছোটখাটো ধনকুবের হয়ে যেতে পারে ভাবা যায় না। দুর্লভ জাতের এই বুনো ফুলের চাষ তুমি আমাদের দেশের উষর অঞ্চলগুলি ঘুরে বেড়ালেই টের পাবে সুহাস। গাড়ি ছুটিয়ে টেকসাসের গ্রামাঞ্চল পার হয়ে যাবার সময় দেখতে পাবে ব্ল্যাক-আইড সুসান ফুলের ছড়াছড়ি। তোমাকে তারা দুলে দুলে অভিবাদন জানাচ্ছে। কী যে মজা লাগে না। ঠাকুরদার কথা ভেবে তখন আমার চোখে কেন যে জল চলে আসে। আমি কি বোকা না, সুহাস! কত অকারণে কাঁদতে পারি।'

'না না, অকারণে কারও কান্না পায় না। আমি তা ভাবি না। তোমার ঠাকুরদা সত্যি গ্রেটম্যান বলব।'

চার্লি তুলি জলে ভিজিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে শুকিয়ে নিচ্ছে। সে তার ইজেল ভাঁজ করে দেয়ালের হুকে সেঁটে দিচ্ছে। কাজগুলি এত যত্নের সঙ্গে করে যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে ঠাকুরদার গল্প করছিল। গ্রেটম্যান বলায় সে খুবই খুশী। আর জাহাজে কে আছে, চার্লির এত কথা মন দিয়ে শুনবে! সুহাস টের পায়. এ-জন্যই চার্লি তাকে এত পছন্দ করে। নিজের সুবিধা অসুবিধার কথাও বলে ফেলে। জাহাজে কাকে পছন্দ করে, কাকে করে না তাও অনায়াসে বলে ফেলতে পারে।

সেই চার্লি ঠাকুরদার গল্প বলতে শুরু করলে থামতে চায় না।

'তোমার ঠাকুরদার তখন কত বয়েস?'

'তা অনেক, আমি ঠিক জানি না।'

'তোমার বাবা তখন কোথায়?'

'বাবা কাকাকে ঠাকুরদা একদম পছন্দ করতেন না।' তারপর চার্লি কি ভাবল কে জানে! তার দিকে এক পলক তাকিয়ে কি বুঝল কে জানে। পারিবারিক কথা একজন নেটিভ ছোকরাকে বলা ঠিক হবে কি না তাও ভাবতে পারে। কিন্তু সুহাস জানে, চার্লির কোনও দ্বিধা থাকার কথা না। বিশ বাইশ মাসে তার অনেক প্রমাণ সে পেয়েছে। অত্যাচারও কম করেনি। সে কথা বলত না বলে রাগে ফুঁসত। একজন সাহেব ছোকরার সঙ্গে সে কি কথা বলবে! তা ছাড়া কাপ্তানের পুত্র—এমনিতেই নানা আতঙ্ক—পান থেকে চুন খসলেও বিপদ—কে চায় আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনতে।

'জান আমার বাবা কাকা ঠাকুরদার দুঃখ বুঝল না। ক্যাথলিকরা একটু বেশি পিউরিটান হয়। তাঁর নিজস্ব গির্জা, সমাধিক্ষেত্র সব কলুষিত হোক চাইতেন না।'

'ধর্মস্থান কেউ কখনও কলুষিত করতে পারে! কি জানি, কি-ভাবে করতে পারে জানি না। ঈশ্বরকে কেউ ছোট করতে পারে!'

চার্লি মাথা নিচু করে বলেছিল,—'বাবা কাকা দু'জনেই ডিভোর্সি বিয়ে করেন। তোমাকে বলা ঠিক হল কি না জানি না। কিন্তু সুহাস, তোমাকে ছাড়া কাউকে বলতেও পারব না।'

'আরে না না।' সুহাস উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'চল বাইরে গিয়ে বসি। গুঁফো লোকটাকে দেখে তোমার মন ভাল নেই।'

'বাবা কাকাকে ঠাকুরদা অধার্মিক ভাবতেন।'

সুহাস দরজা খুলে বের হবার মুখে বলল, 'ডিভোর্সি বিয়ে করলে ভাবতেই পারেন। পিউরিটানদের এই একটা দোষ বুঝলে! তাঁরা সহজে কিছু মেনে নিতে পারেন না। আমার পিসিকেও দেখেছি—কিছুতেই স্বপাক ছাড়া খাবেন না। বিধবা মানুষ। অসুস্থ। তবু তিনি তিনবার স্নান করবেন। সব সময় অশুচিভাব। দরজার বাইরে যেন তাঁকে অশুচি করার জন্য সব মানুষজন উঠে পড়ে লেগেছে।'

চার্লি বোধ হয় এতে কিছুটা মর্মাহত। সে যে ঠাকুরদাকে কিছুতেই ছোট করতে চায় না। সে হঠাৎ বলে বসল, 'তাই বলে এক গাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে হাজির হলে ঠাকুরদার

মনে হবে না, তার সুপুত্র দুটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে!'

'তোমার ঠাকুরদা তাই বুঝি ভাবতেন!'

'ভাববেন না, তাঁর এত যত্নে গড়ে তোলা স্বপ্ন—দুটি ছেলেই তছনছ করে দিলেন! বাবা তো রেগে চলেই গেলেন ওয়েলসে! বউ ছেলেপিলে পড়ে থাকল দেশে।'

'তুমি তখন কোথায়?'

আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, 'বোধহয় ওখানে।'

সুহাস বোটডেকে এসে পা ছড়িয়ে বসেছিল। বোটের আড়ালে বসায় সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া সরাসরি তার গায়ে লাগছে না! চার্লি তার পাশে বসে আকাশ দেখছে। একটাও কথা বলছিল না। আকাশে নক্ষত্রমালা। আর শহরের বাড়িঘরের আলো দুজনকেই বড় বেশি অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল।

চার্লি সহসা নির্জনতা ভেঙে দিয়ে বলেছিল, আমার কেউ নেই সুহাস। রেগে মেগে কিছু বলে ফেললে তুমি কিন্তু রাগ কোরো না।'

'কেন তোমার মা!'

'না, তিনি বেঁচে নেই। জন্মাবার দু-বছরের মধ্যেই তাঁকে হারিয়েছি। বাবা কার্ডিফে এলেন, মা আসতে রাজি হলেন না। তিনি ইস্ট টেকসাসে ক্যাডো লেকের এক বাগানবাড়িতে থেকে গেলেন। সেখানে বেটসি আমি আর মা। আমার বৈমাত্রেয় দিদিরা দাদারা নিজের দিদিরা কোথায় যে কে ছিটকে পড়ল—কিছুই জানি না সুহাস!'

ধীরে ধীরে সুহাস টের পাচ্ছিল, চার্লির মধ্যে গোপন কষ্টের শেষ নেই। এবং এই সব দুঃখ কষ্ট সে একদম সহ্য করতে পারে না। যার এত প্রভূত সম্পত্তি সে কেন জাহাজে ঘুরে বেড়ায় তাও মাথায় আসে না। কিংবা কাপ্তান কেন দু-সফরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে উঠেছেন তাও সে জানে না। চার্লির তো এখন লেখাপড়ার সময়—স্কুল, খেলাধুলা, ঘোড়ায় চড়া, গাড়ি করে হুসহাস বের হয়ে পড়া কত কিছুই যে চার্লির শোভা পেত— সে তা না করে জলে জলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শেষে যা বলল, তাতে সুহাস স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

চার্লি অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় বলল, 'নিজের বলতে বেটসিকে জানতাম। জাহাজে আসার আগে তিনিও মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তবে দুর্ঘটনা না খুন এটা এখনও আমার মাথায় আসছে না।'

সুহাস বলতে পারল না, খুন যদি হয়, কে খুন করেছে। তোমাদের দেশের আইন তো খুব জোরালো—পুলিশও খুব বিশ্বস্ত। তারা এই দুর্ঘটনার কোনও কিনারা করতে পারেনি।

কিন্তু সে কিছুই বলতে পারেনি!

আজ আবার তাকে ডেকে নিয়ে চার্লি বলছে, ম্যাককে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

সুহাস যে কি করবে! সে তো একা এই জাহাজে। এমনিতেই কত উপদ্রব। তার উপর চার্লির বাড়তি সংশয় তাকে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তবু কেন যে, ভাবল, ম্যাকের কেবিনে তার যাওয়া দরকার।

চার

সকালে ম্যাকের কেবিন খালি। ম্যাক নেই। বাইরে থেকে দরজা লক করা। ম্যাক নাও থাকতে পারে। তবে চার্লির ধারণা ছিল, ম্যাক সকালে উঠে হাঁটতে পারবে না। পায়ে জোর লেগেছে। হয়তো কেবিনেই শুয়ে আছে। সে যে পড়ে গেছে সিঁড়ি ধরে কেউ জানে না। সুহাসের ধারণা, তার পড়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। মদ খেলে হুঁশ থাকে না। রোজই তো প্রায় ধরতে গেলে এক কান্ড। সেজেগুজে বিকেলে নেমে যায়। ফেরে অনেক রাতে। এসেই জাহাজের সিঁড়ির নীচে চিল্লাতে থাকবে—হাই কোয়ার্টার মাস্টার। হাই সুখানি।

কোয়ার্টার মাস্টার অর্থাৎ সুখানি যিনিই গ্যাঙওয়েতে পাহারায় থাকুন, ঠিক টের পান মক্কেল হাজির। তাকে তখন ধরে তুলে আনতে হবে। ধরে তুলে না আনলে সিঁড়ির নীচে জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। নয় ঘুরঘুর করবে। সিগারেট খাবে। আর যত জাহাজি খিস্তি আছে আওড়াবে। আর মাঝে মাঝেই হল্লা, হাই সুখানি। হাই কোয়ার্টার মাস্টার। তারপর যখন তাকে হাত ধরে তুলে আনা হবে, টলতে টলতে হ্যান্ডসেক করবে। বলবে, থ্যাঙ্ক ইয়ো গুডম্যান। ভেরি গুডম্যান। কিছুক্ষণ আগে সুখানির বাপ মা উদ্ধার করেছে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কে বলবে। তারপর কেবিনের দেয়াল ধরে ধরে দরজাটি খুলে ইঁদুরের মতো নিজের গর্তে লুকিয়ে পড়বে। এত গেলে যে সিঁড়ি ধরে উঠে আসার ক্ষমতা থাকে না। ইচ্ছে করলে যে পারে না তাও নয়, তবে আতঙ্কিত। যদি পড়ে যায়। সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলে জাহাজের তলায়। যতই আষ্টেপৃষ্ঠে গিলুক—সে খেয়ালটি বাবুর ষোল আনা। সুহাস সকালে কাজে বের হয়ে এমন সাত পাঁচ ভাবছিল। ম্যাককে কেবিনে পাওয়া গেল না। সুহাস কি ভেবে বলল, মাতাল লোক পড়ে যেতেই পারে।

ম্যাকের কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে সুহাসের আরও মনে হল, ম্যাক হয়তো ফিরেই চার্লির কেবিনে ঢুকতে চেয়েছিল—মাতালদের স্বভাব সে জাহাজে উঠে ভালই টের পেয়েছে। তাকে ঠেলে কেউ ফেলে দিয়েছে খুবই অবান্তর কথা। চার্লিরও এটা বোঝা উচিত ছিল। থার্ড কিংবা ফোর্থ ইনজিনিয়ারের ঘরে ঢুকেও মাতলামি করতে পারত। দরজা বন্ধ দেখে হয়তো বোটডেকে উঠে গেছে।

সে বলল, 'ম্যাক সুস্থ ছিল তো।'

চার্লি পকেট থেকে চিপিং করার হাতুড়ি বের করে নীচে ঠুকছিল। হাতুড়িটা একটু তার আলগা হয়ে গেছে। সে সুহাসের কথা যেন বুঝতে পারেনি।

'না, বলছিলাম, সুস্থ ছিল তো?'

'সুস্থ থাকবে না কেন।'

'তুমি দেখছি চার্লি জাহাজে থাক না। কিচ্ছু জান না মতো কথা বলছ।'

'আরে কাল ম্যাকের জন্মদিন গেছে। জন্মদিনে সে কিছু খায় না। সকালেই তো বলল, আজ আর বের হচ্ছি না। সারাদিন বাইবেল পড়ব। কত সুন্দর সুন্দর কথা বলল। বলল, গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট। দেখবে আমরা শিগগিরই হোমে ফিরে যাব।'

'তা হলে বলছ, কাল ম্যাক জাহাজ থেকে নামেনি!'

'তাইতো মনে হচ্ছে। মুখে গন্ধ টন্ধ পেতাম না।'

'যা চিজ, নেশা না করে থাকার পাত্র।'

চার্লির এই এক দোষ, তার কথায় সায় না দিলেই গুম হয়ে যায়। ম্যাক জন্মদিন পালন করেছে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে। সারাদিন ঘরে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ছবি সামনে রেখে বসে ছিল। সে জাহাজে, জন্মদিন এ-ভাবেই পালন করে থাকে। দেশেও। সেদিন সে সব ব্যাপারেই সাত্ত্বিক, সুহাসকে বিশ্বাস করতেই হবে।

'আর কি বলল?'

'বলল, লুক আপ দেয়ার ইনটু দ্য স্কাই, হাই এভাব ইয়ো। বলল, গড ইজ অলমাইটি অ্যান্ড ইয়েট ডাজ নট ডেসপাইজ এনিওয়ান।'

'ম্যাক তো দেখছি সাধু সন্ন্যাসীদের মতো কথা বলছে। তাকে আমরা অপছন্দ করব কেন! একটু বেশি মাতাল ছিল না তো!'

'তার মানে!'

'মানুষ বেশি হতাশ হলে এ-সব কথা বলে। তখন মাথায় ঈশ্বরচিন্তা আসে। কিছু তো করার থাকে না। কিন্তু গেল কোথায়!'

'জানি না!'

'রাগ করছ কেন? এলে তাকে দেখতে, সেই নেই। নীচে নেমে যায়নি তো!'

তারপরই মনে হল, ওয়াচ ভাগ হয়ে গেছে। যে যার ওয়াচে হয়তো নেমে গেছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়। জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে ওয়াচ শুরু হয়। অন্তত ইনজিন-জাহাজিদের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। আটটা-বারোটায় ওয়াচ দিতে যদি নেমে যায় ইনজিন-রুমে! সে পোর্ট-সাইডের দরজা খুলে সিঁড়ির মুখে ইনজিন-রুমে ঝুঁকে দেখল। ম্যাককে দেখতে পেল না। সিঁড়ির নীচে বিশাল এলাকা জুড়ে ইনজিন সিলিন্ডার। অতিকায় দানবের মতো সিলিন্ডার। তার পেটের ভিতর থেকে থামের মতো বিশাল তিনটা পিস্টন রড নেমে গেছে। গ্রিজার রহমত তেল দিচ্ছে। কিন্তু ম্যাককে দেখা গেল না। সে সিঁড়ির আর দু-ধাপ নীচে ঝুঁকে দেখল, সিলিন্ডার কলামে হেলান দিয়ে ম্যাক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপরই মনে হল, ম্যাকের তো ইনজিন রুমে নামার কথা নয়। ওয়াচ ভাগ হলেও নীচে তার ডিউটি পড়ে না। তবে কারও হয়ে যদি ওয়াচ দেয়। সুহাস দৌড়ে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ম্যাক এখনও ভগবত চিন্তা করছে। ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক হবে না। আমি যাচ্ছি।'

চার্লি দাঁড়িয়ে থাকল।

এটা চার্লির স্বভাব। চার্লি তার কথা ঠিক বুঝতে পারে না, নাকি, ঠিকই সব বোঝে। সে যে বিদ্রূপ করছে ম্যাকের ঈশ্বরচিন্তার ব্যাপারে ঠিকই টের পেয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি দুর্বলতা কম বেশি সবারই থাকে। চার্লিরও আছে। জাহাজ যাচ্ছে মাটি টানার কাজে। মাটি মানে ফসফেট। অজস্র পাহাড়, দ্বীপ এবং লেগুনের ছড়াছড়ি কোরাল সি-তে। সমুদ্রটা নাকি কত জাহাজের কবরভূমি—অন্তত বিশাল এই এলাকায়, অর্থাৎ বিশমার্ক সি এবং কোরাল সি-তে শত শত জাহাজ সমুদ্রের অতলে হারিয়ে গেছে। নিখোঁজ হয়ে গেছে। হাড়গোড় ছাড়া তাদের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সামুদ্রিক মাছেরা ঘোরাফেরা করছে চারপাশে। নানা জাতের মাছেরা দাঁত সাফসোফ করছে—মাছেদের ক্লিনিং সেন্টার হয়ে

গেছে জাহাজগুলি। অতিকায় বান মাছের আড্ডা। কুমিরের মতো মুখ দেখতে সব হাজার হাজার বান মাছ কিলবিল করছে, জাহাজের ফস্কায় কিংবা ইনজিন-রুমে। আর তখন কি না, ঈশ্বর নিয়ে ঠাট্টা। বিশমার্ক সি-কে তো জাহাজের গণকবর বলা হয়। অবশ্য গণকবর বলা যাবে কি করে। তা বলাও যেতে পারে। জাহাজ ডুবলে মানুষও ডুববে। পাঁচ সাত হাজার করে সেনা জাহাজে—মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। সুতরাং গণকবরও বলা যায়। নিষ্ঠুর যুদ্ধ এই রকমেরই হয়ে থাকে। দ্বীপের দখল নিয়ে লড়াই—ফ্লাইংবোট থেকে এয়ার ক্যারিয়ার—কি না ডুবেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান গোঁত্তা খেয়ে পড়েছে সমুদ্রে—তারপর বুড়বুড়ি তুলে ডুবে গেছে। এত কথা সুহাসের জানার কথা নয়—রাতে এই নিয়েই বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল জাহাজিরা। ছোটখাটো বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—তবে দমন করা গেছে। ইনজিন সারেঙ খুবই ঠান্ডা মাথার লোক। তিনি বেইজ্জত হয়েও মাথা গরম করেননি। জাহাজ যাচ্ছে বিশমার্ক সি-তে জনকবরে কিংবা গণকবরে। জাহাজের কবরভূমিকে জনকবর আর লোকজনের কবরভূমিকে গণকবর বলাই সমীচীন ভাবল। অন্তত জাহাজিদের মাথা ব্যথার কারণ এটাই। তখন ঈশ্বরই একমাত্র রক্ষাকর্তা। সেই ঈশ্বর নিয়ে ঠাট্টা চার্লি সহ্য করবে কেন! তা ছাড়া চার্লির ত্রাসও কম না—কেন এই ত্রাস সে জানে না। কে তাকে অনুসরণ করতে পারে সুহাস বোঝে না। চার্লি চুপি চুপি তাকে ডেকে এনেছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি জানা যায়, ম্যাক কোনো অনুসরণকারীকে দেখেছে কি না। কিংবা সেই অনুসরণকারী যদি হয়। পিকাকোরা পার্ক দেখা লোকটা সেই কি না! কিংবা সিম্যান মিশনের সেই গোঁফওয়ালা লোকটা কে, সে যদি চেনে।

অবশ্য চার্লি তাকে কিছুই খুলে বলেনি। ম্যাক পড়ে যেতেই পারে, পা ফসকেও পড়ে যেতে পারে—কিন্তু এত নিশ্চিত কি করে, যে সে পা ফসকে পড়ে যায়নি—কেউ তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কার এত দায় পড়েছে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য। জাহাজ নিজেই যখন ডুবতে যাচ্ছে—অন্তত জাহাজিদের কথাবার্তায় এমনই মনে হয়েছে তার—তখন আগ বাড়িয়ে একজনকে ঠেলে ফেলে দেবার কি দরকার—জাহাজ তো যাচ্ছে বিশমার্ক সি-তে—তার জনকবরে। এমনিতেই ডুববে।

গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট—এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ত্রাসের কি থাকতে পারে। সুহাস অবশ্য প্রবলভাবে ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস করে না। তাই বলে এই নয় যে সে রাতে একা বরফ-ঘরে নেমে যেতে পারবে। কারণ ওটাও একটা জীবজন্তুর কবরখানা। কিংবা মানুষের ক্ষুধা কত প্রবল। হাজার লক্ষ গরু বাছুর মুরগি হজম করে দিচ্ছে প্রতিদিন—এই শরীরের দিকে তাকালেও মনে হয় জীবজন্তুর কবরখানা। তা সে বিশ বাইশ মাসে গোটা দশেক আস্ত ছাগল তো হজম করেছেই। দৈনিক রেশনে এক পোয়া মটন পেলে, বিশ বাইশ মাসে কটা ছাগল লাগতে পারে। অন্তত সে চার্লিকে এটুকু বোঝাতে পারলেও আশ্বস্ত হতে পারত। গণকবর বল, জনকবর বল সব জায়গাতেই আছে। পিছু ধাওয়া করলেও শেষ পর্যন্ত কবরের দিকেই মানুষ ধাওয়া করে। ঘাবড়াবার কি আছে?

চার্লি কথাই বলছে না।

ধুস ভাল লাগে।

সে হাঁটা দিল।

'যাবে না বলছি।'

সুহাস ফিরে তাকাল।

আর তখনই দেখল সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব এদিকটায় আসছেন। খুবই কড়া ধাতের মানুষ। এক ধমকে ফাইভার পামা প্যান্ট খারাপ করে ফেলে। চোখ ভাটার মতো—বেঁটেখাটো মানুষ, সব সময় তেলে বেগুনে ফুটছে। একজন সাধারণ নেটিভ জাহাজির ঔদ্ধত্য তিনি পছন্দ নাও করতে পারে। অফিসার্স কেবিনের এলিওয়েতে কেন। বেয়াদপির সীমা থাকা উচিত। তাঁকে দেখলে কেন যে সুহাসেরও হৃদকম্প উপস্থিত হয় সে জানে না। চুরুট নিভে গেছে বলে তিনি দাঁড়ালেন, চুরুট ধরিয়ে নেবার জন্য লাইটার জ্বাললেন না, কাজকর্ম ফেলে চার্লির সঙ্গে বেয়াদপ ছোকরা কি করছে, করতে পারে দু দন্ড দাঁড়িয়ে তা আঁচ করতে চাইলেন। সে কিছুই বুঝল না। মানুষটি সারেঙের প্রায় ধর্মাবতার। সারেঙ তার ধর্মাবতার। সুতরাং ফল ভোগ করতে হতে পারে ভেবেই সে আরও দ্রুত হেঁটে উইনচে যাবার জন্য পা বাড়াল। আর তখনই চার্লি যা করে—ছুটে এসে হাত টেনে ধরল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ।'

সে এলিওয়ের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'উইনচে।' তবু হাত ছাড়ছে না চার্লি। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'সেকেন্ড দেখছে।'

কি ভেবে হাত ছেড়ে দিল চার্লি। সুহাস দেখল, সেকেন্ড ইনজিন রুমে নেমে যাচ্ছেন! এলিওয়েতে কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু চার্লির উপস্থিতি ছাড়া আর কিছু নেই। মাথা দেয়ালে কাত করে দিয়েছে। ভঙ্গিটা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ ছবির মতো। চার্লি এত সুন্দর দেখতে, আরও বড় হলে সোনালি দাড়ি গোঁফ গজিয়ে গেলে যিশুর প্রায় যেন প্রতিচ্ছবি হয়ে যবে। সে ওয়ারপিনড্রামে ঝুঁকে পড়ল।

জাহাজ ছেড়ে দেবে। তীর্থযাত্রীর মতো সবাই যে যার সামান ঠিক করে নিচ্ছে। কত দূরের যাত্রা। কারপেন্টার ঘুরছে ডেকে। হাতে পেতলের জল মাপার স্টিক। সে নোট নিচ্ছে, কতটা আর জলের প্রয়োজন। জলের ট্যাঙ্কগুলি সবই প্রায় ইনজিন-রুমের খোলের ভিতর। সে জলের পরিমাপ টুকে নিচ্ছে।

কেউ বসে নেই। ডেরিক নামানো হয়ে গেছে। ডেকজাহাজিরা মাস্তুলে উঠে গেছে। কেউ ফলগুণা বেঁধে জাহাজের কিনারায় ঝুলে পড়েছে। বারোটা-চারটা ওয়াচেই জাহাজ ছাড়বে। চারটা বাজতে না বাজতেই সাঁজ লেগে যাবে। সেকেন্ড নেমে গেল ইনজিন-রুমে। চিফ ইনজিনিয়ারও নেমে যেতে পারেন। জাহাজ ছাড়ার আগে সব একবার ভাল করে দেখে নেওয়া। জল এবং জ্বালানি দুটোই জাহাজের প্রাণ! সুহাস বিশ বাইশ মাসের সফরে এটা বেশ টের পেয়েছে। মাঝদরিয়ায় জল নেই, কয়লা নেই ভাবাই যায় না।

খালি জাহাজ। ফল্কা স্টিক ক্রম দিয়ে সাফ করে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ঝকঝকে তকতকে জাহাজ। যেখানটায় রং চটে গেছে, সেখানে রং লাগানোর কাজ থেকে যায়। সারা সফরে সে দেখেছে, ডেকজাহাজিরা রং করেই যাচ্ছে, একদিকে করছে অন্যদিকে রং চটে যাচ্ছে। নোনা হাওয়ায় রং বড় তাড়াতাড়ি খেয়ে যায়। সারাদিন চিপিং চলছে, তেলজুট দিয়ে লোহার পাত মোছা হচ্ছে। কেরোসিন তেলে সিরিশ কাগজ ডুবিয়ে রেলিং ঘষা হচ্ছে। দু চার হপ্তা যেতে না যেতেই রেলিং নোনা হাওয়ায় জং ধরে যায়। জাহাজে কাজের

অন্ত থাকে না।

এই এক মুশকিল। বন্দর ছেড়ে যাবার আগে জাহাজিরা চায়, আর একবার ডাঙায় নেমে যদি ঘুরে আসা যেত। ডাঙা যে কত প্রিয় নাবিকদের। বন্দর ছেড়ে যাবার সময় প্রায় সবাই উঠে আসবে ডেকে। যতক্ষণ বন্দর দেখা যাবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। ক'দিনেই ডাঙার মানুষজনের সঙ্গে দোস্তি হয়ে যায়। কোথায় কতদূরে এই সব দেশ, মানুষজন, পাহাড়, সমতল ভূমি এবং কত সব বিচিত্র গাছপালা, ফুল ফল পাখি, মানুষের কাছে কত প্রিয় ডাঙা ছেড়ে না গেলে বোঝা যায় না। যে যার মতো সামান্য আশ্রয় খোঁজে। ঘরবাড়ির মতো বাঁচতে চায়। ফুলফলের দোকানে ঢুকলে সুন্দরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। শারীরিক সম্পর্কই বড় কথা নয়, একটুখানি বসে যাওয়া, একটু অন্তরঙ্গ আলাপ, এবং মানুষজন যদি কেউ দেশবাড়ির খবর নিতে চায় অকপটে তারা সব বলে ফেলে। কখনও উপহার দেয়, কখনও উপহার তারাও পায়। ম্যাক তো বন্ধুত্ব হলেই একটি মুখোস উপহার দেয়। কেউ ভাল টোবাকো দেয়। কিছু স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আসা, কিছু রেখে আসা।

সুহাস টের পেল, সেও এই টানে উপরে উঠে এসেছে। প্রপেলার নড়ে উঠলেই সে ফোকসাল থেকে দৌড়ে উপরে উঠে এসেছিল। জাহাজের নোঙর তোলা হচ্ছে—জাহাজের আগিলে চিফ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। পিছিলে সেকেন্ড অফিসার। জাহাজ বাঁধাছাদার কাজ যেমন কঠিন, জাহাজ নোঙর তুলে ফের ভেসে পড়ার কাজটাও কম কঠিন না। ডেক-জাহাজিরা দুটো দল হয়ে গেছে। ডেকসারেঙ পিছিলে, ডেকটিন্ডাল আগিলে। বন্দর থেকে হাসিল আলগা করে দেওয়া হচ্ছে—সব সাংকেতিক কথাবার্তা। হাত তুলে দিলে হাসিল ঢিল দেওয়া হচ্ছে। নামিয়ে নিলে হাসিল গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইস্পাতের কাছিগুলিও গুটিয়ে রাখা হল। প্রপেলার ঘুরছে। স্টিয়ারিঙ ইনজিনের কক কক শব্দ। জাহাজটা ভেসে পড়ল। জাহাজটা ক্রমে দূরত্ব সৃষ্টি করছে। লায়ন রকের পাশ দিয়ে জাহাজ যখন গভীর সমুদ্রে নেমে এল, তখনও দূরের শহরটা মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে। দিগন্তে অজস্র নক্ষত্র ফুটে আছে। মনে হয় আশ্চর্য এক দেশ পেছনে ফেলে তারা সমুদ্রে নেমে গেল। সহসা সজাগ হয়ে যাওয়ার মতো, সুহাস টের পেল, চার্লি চুপচাপ তার পাশে জাহাজের একটা বিটে বসে আছে। কখন এসে সে বসল টেরই পায়নি। চার্লি কথা না বলে থাকার পাত্র না। এতক্ষণ চুপচাপ তার পাশে বসে আছে, সে খেয়ালও করেনি। সবার মতো বন্দরের জন্য যে টান গড়ে ওঠে, বন্দর ছেড়ে গেলে, যে বিচ্ছেদ গড়ে ওঠে তারই তাড়নাতে, সেও কেমন মগ্ন ছিল। এ-ভাবে সে কত বন্দর ফেলে এসেছে পিছনে—সামনে আরও কত বন্দর পাবে—কিংবা মাটি টানার কাজে সেখকানেই সে যাক, ডাঙার খোঁজ পাবেই। চার্লি কি তার উপর এখনও রাগ পুষে রেখেছে। অথবা রাগ দেখাবার জন্যেই তার পাশে এসে বসেছে, অথচ একবারও বলেনি, সুহাস তোমার ঠান্ডা লাগছে না! কনকনে শীতে একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবার কথা। সে এটা ভালই বোঝে। আসলে সে ঠাণ্ডায় উপরে উঠলে, সবসময় কম্বল গায়ে দেয়। শুধু কাজের সময় সে জাহাজি পোশাক পরে বের হয়। কিনারায় গেলে সে গরম কোট-প্যান্ট পরে। তার মাত্র একটাই গরম প্যান্ট গরম কোট। তাও কার্ডিফের সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। খুব সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল। তাকে নাকি কোট প্যান্ট পরলে খুব সুন্দর লাগে

দেখতে।

এত শীত যে, চার্লিও গরম পুলওভার, তার উপর জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে। পায়ে গরম মোজা এবং শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে আজ যথেষ্ট জামাকাপড় গায়ে রেখেছে। রাগ যে পুষে রেখেছে, এতেই সে আরও বেশি টের পায়। সুহাস শীতে কষ্ট পেলেও তার কিছু যেন আসে যায় না। রাগ না থাকলে, ঠিক বলত, আরে তুমি মানুষ না! এই ঠাণ্ডায় গায়ে কিছু না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ ডেকে। যখন তখন তার উপর এত অভিমান কেন পুষে রাখে চার্লি সুহাস কিছুতেই ভেবে যায় না।

এত ঠাণ্ডা যে সামান্য সোয়েটারে শীত যাবার কথা না। সেও চার্লিকে দেখে না দেখার ভান করল। ডেকের সর্বত্র আলো জ্বালা। মাস্তুলের দু-দিকে দুটো বড় আলো জ্বলছে। চিফ কুকের গ্যালির মুখে আলো। বোটডেকে, উইংস, এলিওয়েতে আলো। পোর্ট-সাইডের ছাদের নীচে সার সার আলো। অন্ধকার নয় যে সে চার্লিকে দেখতে পাবে না। অন্ধকার নয় যে চার্লি সুহাসকে দেখতে পাবে না। দু'জনই দেখেছে দু'জনকে। অথচ নিরুত্তাপ।

শহর আর দেখা যাচ্ছে না।

জাহাজ দুলছে। জাহাজ ধেয়ে চলেছে। উপর নীচে যেদিকে চোখ যায়—কিছুই দেখা যায় না। কেমন আচ্ছন্ন এক আধিভৌতিক সমুদ্রে তারা যেন যাত্রা করেছে। আকাশ কিছু নক্ষত্র নিয়ে বিরাজ করছে ঠিক, মাস্তুলের মাথা পার হয়ে অনেক উপরে সেই সব নক্ষত্র নড়াচড়া করছে তাও ঠিক। তবু মনে হয় না তখন জাহাজে পিচিং শুরু হয়েছে বলে, এই আকাশ এবং নক্ষত্রমালা স্থির থাকতে পারছে না। চার্লি উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে থাকল। সে বোধহয় তার কেবিনে উঠে যাচ্ছে। চার্লির এই অবোধ অভিমানে মাঝে মাঝে সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়—তার কি দোষ, সেকেন্ড তাকে পছন্দ করে না। সেকেন্ড, সারেঙকে ডেকে অভিযোগ করলে, তখন কি হত! অভিযোগ করতেই পারেন, কাজ ফেলে চার্লির সঙ্গে আড্ডা—জাহাজে কি এ-জন্য রাখা হয়েছে। চার্লির পক্ষে যা শোভন তার পক্ষে তা কত অশোভন বুঝতে শিখবে না। রাগ করলেই হল!

সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

তারপর ভাবল, শত হলেও চার্লি কাপ্তানের পুত্র। তার ঠাকুরদা ছোটখাটো ধনকুবের। সে একজন সামান্য মাইনের ইনজিন-রুমের কর্মী। তার কথা ছিল কয়লা টানার। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে, তাকে উইনচ মেরামতের কাজে রাখা হত না। ফাইভারের হেল্পার। এখন তো সে নিজেই উইনচের যন্ত্রপাতি খুলে মেরামত করতে পারে। দরকারে ফাইভার তাকে দিয়ে আরও সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করায়। সফর শেষে কাপ্তান যদি কোনও প্রশংসাপত্র দেন, তবে সে অন্য জাহাজেও কাজটা পেয়ে যেতে পারে। বছর পাঁচেকের অভিজ্ঞতার পর সে পরীক্ষায় বসলে, জাহাজে সে ফাইভার-এ যোগ দিতে পারবে তাও জানে। অন্তত নিজের আখেরের কথা ভেবেই তোয়াজ করছে চার্লিকে। চার্লি না থাকলে, তাকে সারা সফর কয়লা টেনেই মরতে হত। কোনও অদৃশ্য হাত অন্তরালে কাজ করছে—এবং সে যে চার্লি ছাড়া কেউ নয় এটাও সে বোঝে! নিজের গরজেই চার্লিকে তোষামোদ করে চলা দরকার। সুযোগ জীবনে বেশি আসে না এও সে বোঝে।

চার্লিকে ধরার জন্যে সে ছুটে গেল। হালকা পাতলা চার্লি যেন বাতাসে ভর করে

হেঁটে যাচ্ছিল। তাকে দেখলে মনে হয়, সে ভাল নেই। কোনও অশুভ আত্মার প্রকোপে পড়ে গেছে। অন্তত হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হয়। কাকে দেখে সে এত ভয় পায় বোঝে না। কত লোকই তো পিকাকোরা পার্কে বেড়াতে আসে। তাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে টের পায় কি করে! না কি কোনও মানসিক বিকার—চার্লির হাঁটার ধরন একদম পছন্দ হচ্ছিল না। ভাগ্যিস চিফ কুকের গলা পাওয়া যাচ্ছে। চিফকুকের গ্যালির পাশে সিঁড়ি। সিঁড়ি ধরে বোটডেকে উঠে যাওয়া যায় আবার নীচে এলিওয়েতে ঢুকেও কিছুটা হেঁটে ওপরে ওঠার সিঁড়ি পাওয়া যায়। চার্লি এলিওয়েতে ঢুকে যাবে, না চিফকুকের গ্যালি পার হয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবে বুঝতে পারল না।

সে ডাকল, 'চার্লি।'

চার্লি যেন ঘোরে পড়ে হাঁটছে।

সে ফের ডাকল, 'চার্লি।'

হুঁশ ফিরে আসার মতো তার দিকে চার্লি ঘুরে দাঁড়াল।

'কিছু বলবে?' সুহাস বলল।

'না।'

সুহাস এবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কখন এসে বিটে বসে থাকলে টেরই পাইনি।'

'পাওনি ভাল।'

চার্লি আর কথা বলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না।

সুহাস বলল, 'সত্যি তোমাকে আমি দেখতে পাইনি। ম্যাক কিছু বলল?'

'কি বলবে?'

'সে দেখেছে কি না, কে তাকে ঠেলে ফেলে দিল! সে মনে করতে পারছে কি না? সেকেন্ড তাড়া না করলে আমি যেতাম। তুমি তো তার সঙ্গে দেখা করতে পারতে! ওর কি পা ভেঙেছে?'

'জানি না।'

'দেখা হয়নি তার সঙ্গে?'

'না!'

কাটা কাটা কথা শুনতে কাঁহাতক ভাল লাগে। চার্লির এই স্বভাব। সে যে তার উপর ক্ষোভ পুষে রেখেছে কথাবার্তার ধরন দেখেই টের পাচ্ছে। তবু আখেরের কথা ভেবে যতটা পারা যায় তোয়াজ করা।

'যাবে ম্যাকের কেবিনে!'

'বাবা পছন্দ করেন না, যখন তখন যার তার কেবিনে ঢুকি।'

'অঃ।' সে আর কি বলবে।

'আমি যাব! জিজ্ঞেস করব? কে তাকে ফেলে দিল, সে দেখেছে কি না, মনে করতে পারছে কি না?'

'না। তোমাকে আর জড়াতে চাই না।'

'...আমাকে জড়াতে চাও না মানে! কিছু বুঝছি না।'

চার্লি এই বাচ্চা নাবিকটির চোখমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে কিছুটা যেন ঠাণ্ডা মেরে গেল। বলল, 'ভাল গরম পোশাকও নেই তোমার। কী যে খারাপ লাগে! ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখে পড়লে কে দেখবে! ডেকে দাঁড়াবে না। কী শীত!' বলে চার্লি সিঁড়িতে উঠে গেলে সে বোকার মতো নীচে দাঁড়িয়ে থাকল।

চার্লি বোটডেকে উঠে তার জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল নীচে। বলল, এটা পরবে। কখনও যদি দেখি ঠাণ্ডায় ডেকে উঠে এসেছ কম্বল গায়ে দিয়ে রক্ষা থাকবে না কিন্তু। কি বিশ্রী লাগে! গায়ে আজ তাও নেই।'

সে যেন সাহস পেয়ে গেল। কিন্তু মুশকিল, বোটডেকে উঠলেই ব্রিজ থেকে সব দেখা যায়। সেখানে যে কাচের ঘরে সুখানি কিংবা চিফঅফিসারের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে নেই কে বলবে! রাত খুব একটা হয়নি, তবু কাপ্তান কিছু মনে করতে পারেন। ডাইনিং হলে নিশ্চয় মিউজিক শুরু হয়ে গেছে। মিউজিক বেজে উঠলেই যে যার মতো ডাইনিং হলে রাতের আহার পর্ব সারতে যায়। চার্লিও যাবে। তাকে এ-সময় বিরক্ত করা আর ঠিক হবে না হয়তো। সে নীচে থেকেই জ্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়েই বলল, আর কটা তো দিন। তারপর তো গরম পড়ে যাবে। ইকুয়েডরের কাছাকাছি জাহাজ ঘোরাঘুরি করবে। দরকারে না হয় কিনে নেব।

চার্লি আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ পুষে রাখতে পারল না। সে নীচে নেমে এল। এই নাবিকটির এত আত্মমর্যাদা সে যেন কখনও টের পায়নি। তার গুচ্ছের পোশাক। দুটো একটা কাউকে দিলে বাবা খুশিই হবেন। তার মায়া-দয়া আছে ভাবতে পারেন। মানুষের মায়া-দয়া থাকা দরকার—অন্তত বাবা তাকে তাঁর ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে এমনই বলেন—তিনি নির্যাতীতদের কথা বলতে গিয়েও তাই বলেন। কিন্তু সুহাস যে জ্যাকেটটা ফিরিয়ে দিল তাকে!

তারপর মনে হল চার্লির, জ্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে সত্যি অপমান করেছে সুহাসকে। আসলে ক্ষোভ থেকে। তুমি সুহাস টানা সেই থেকে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ, বোধগম্যি বলে কিছু কি নেই! এও হতে পারে, ঠাণ্ডা সম্পর্কে সুহাসের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার জানাবার জন্যেই জ্যাকেট খুলে ছুঁড়ে দিয়েছে। তারপর খেয়াল হয়েছে, কাউকে এ-ভাবে অপমান করা যায় না। না কি সে সকালের ক্ষোভ এই রাতে সুযোগ পেয়ে মিটিয়ে নিল! আর চুপ করে থাকতে পারে!

চার্লি ফের সিঁড়ি ধরে নেমে এল। সুহাস বুঝতে পারল না, চার্লি নেমে আসছে কেন। তার তো কেবিনে ফিরে যাওয়ার কথা। ডাইনিং হলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে তার সামনে লাফ দিয়ে নামল। তারপর কেন যে বলল, প্লিজ আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও সুহাস। আমার ভয় করে।

বোটডেক এলাকাটা ক্রমে বিভীষিকাময় হয়ে উঠছে। রাতে তারও বোটডেকে উঠলে গা শির শির করে। বোটডেকে একা সে ঘুরে বেড়াতে সাহস পায় না। আসলে, এখানেই কেউ কেউ গভীর রাতে দেখেছে, এক নারী চুপচাপ বোটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। সেও দেখেছে ঝড়ের রাতে। বরফঘরে আহামদ বাটলার তাকে ঝুলতে দ্যাখে। কেউ দেখেছে, ডেকে তাকে রাখা হয়েছে। মাথায় এবং পায়ের কাছে লাল গুচ্ছ ফুল। কফিনে সে শুয়ে

আছে। বয়লার রুমে কেউ আর একা নেমে যায় না। রাতে দল বেঁধে নামে। বোটডেক পার হয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে চিমনি নেমে গেছে। কেউ একা চিমনির গোড়ায় উঠে বসে থাকে না। বয়লার রুম থেকে সবাই উঠে না এলে বোটডেক পার হয়ে যায় না। চার্লি ভয় পেতেই পারে। অশরীরী আত্মার ঘোরাফেরাকে সবাই ভয় পায়।

সে বলল, 'চল।'

উপরে উঠে চার্লি হেঁটে গেল। সেও হেঁটে গেল। চার্লি দরজা খুলে প্রথমে উঁকি দিয়ে কি দেখল। যেন কেউ বসে থাকতে পারে ভিতরে।

সুহাস বাহবা নেবার জন্য বলল, 'আরে কেউ নেই। ঢুকতে ভয় পাচ্ছ কেন? এই দ্যাখ। এস, এস না। কই কোথায় কি আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের কেবিন এ-ভাবে কেউ দ্যাখে! তুমি যে কি! যেন চোর টোর ভিতরে লুকিয়ে আছে।'

চার্লি আর পারল না, বলল, 'সুহাস, লোকটা জাহাজে উঠে এসেছে।'

'কোন লোকটা?'

'সেই অনুসরণকারী।'

'কোথায় দেখলে?'

'পোর্ট-হোলে। আবছা অন্ধকারে দেখলাম। ধারালো হিংস্র চোখ। সাদা বাবরি চুল। দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা। সেই একরকম। শুধু মুখটাই দেখা যায়।' কেমন হতাশ গলায় কথাগুলি বলতে গিয়ে চার্লি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পাঁচ

মেসরুমে খেতে বসে, সুহাস খেতে পারল না। মুখার্জিদা, বংশী, অধীর, সুরঞ্জন আর সে মিলে এক 'বিশু'। যদিও জাহাজে সে কোনও ওয়াচ দেয় না, যে যার ওয়াচ মতো 'বিশু' ভাগ করে নেয়—বাঙালি-বাবুদের এক 'বিশু' হবে, জানা কথা—ওয়াচ আলাদা হলেও। 'বিশুর' গোস্ত ডাল ভাত সবৃজি ভাণ্ডারি আলাদা ভাগ করে রাখে। বাঙালিবাবুরা এক সঙ্গে খেতে উপরে উঠলেই 'বিশুর' ভাগ করা খাবার গ্যালি থেকে ভাণ্ডারি ঠেলে দেবে। মুখার্জিদা সবার ডিসে ভাত ডাল সবৃজি এবং মাংস যা লাগে দেন। নিজেরটাও নেন। তারপর মেসরুমে খাবার পর্ব শুরু হয়ে যায়। সুহাস না খেয়ে উঠে যাওয়ায় মুখার্জিদা বললেন, 'কিরে খেলি না? কি হয়েছে তোর?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

মুখার্জিদা বললেন, 'কি হয়েছে বলবি তো!'

সুহাস সবার সামনে কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। সে কি ভেবে বলল, 'তুমি কি এখনি নীচে গিয়ে শুয়ে পড়বে?'

'শুয়ে পড়ব। কেন!'

'না এমনি!'

মুখার্জিদা বললেন, 'তোর শরীর কি খারাপ!'

'না, ঠিকই আছে। খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা খাও। বলে সে আর ডিস ধুয়ে নীচে নেমে গেল। তাড়াতাড়ি কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। আহমদ খাটিয়ায় বসে[illegible]

কেন যে দেখল একটা মেয়েমানুষের লাশ ঝুলছে! সেই থেকেই তো জাহাজে যত ঝামেলা। বোট ডেকে সেও দেখে ফেলে, এক নারী দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ঘোর থেকে দেখেছে। সব সময় ভৌতিক আতঙ্ক তাড়া করলে, রাতে সে কোনও ঘোরে পড়ে দেখে ফেলতেই পারে। মুখার্জিদা তো বললেন, তুষারঝড়ে কোন এক নারী বন্দর এলাকায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। গাছের পাতা ঝরে গেছে। শীতের কামড়ে নারী একা নির্জন বন্দরে খোঁজাখুজি করেছে কোনও নাবিকের। নাবিকেরা যে যার জাহাজে উঠে গেছে। তুষার ঝড়ে বন্দর এলাকা মৃতপ্রায়। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সুখানিও ফিরছে জাহাজে। ডিনা ব্যাঙ্কের সুখানি।

সেই সুখ্যানি কি মুখার্জিদা নিজে। না অন্য কেউ।

মুখার্জিদাকে সে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে। এত দীর্ঘ সফরেও বিন্দুমাত্র বেচাল হননি। জাহাজ থেকে নেমে দরকারে কেনাকাটা করেছেন, আবার জাহাজে উঠে এসেছেন। তিনি তাদের অভিভাবকের মতো। কেউ বেচাল হলেও তিনি তাকে রেয়াত করেন না। জাহাজি বলে কি তোদের ইজ্জত নেই। যা খুশি তাই করে বেড়াবি। দেশের ইজ্জত নেই। তোরা তো দেশের নাম ডোবাবি দেখছি।

ডারবানের ঘাটে মুখার্জিদা তবে কেন বললেন, না আহামদ ঠিকই দেখেছে। বরফ ঘরে লাশ দেখা বিচিত্র নয়। আহামদ পাগল হবে কেন। সে যদি দেখে ফেলে কি করতে পারে। আহামদ ভীতু স্বভাবেরও নয়।

মুখার্জিদাকে শুধু বলবে, সত্যি করে বল, কেন দেখে ফেলতে পারে। যা নেই, তা নিয়ে আমরা ভাবি না। ভূতটুতও দেখি না। শ্মশানে গেলে ভয়, কারণ শ্মশানে মানুষ পোড়ানো হয়। গাছের নীচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে রাতে, কারণ গাছে কেউ ঝুলে পড়েছিল বলে। সব ভূতেরই একটা পূর্ব ইতিহাস থাকে। বরফ-ঘরে লাশ আহামদ বাটলার দেখে কি করে। সে কি জানে, লাশ সেখানে কোনও কালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। না জানলে দেখবে কেন। দেখতেই পারে বলছ। তুষার ঝড়, বন্দর এলাকা নির্জন, জাহাজিরা দীর্ঘ সফরের পর বন্দর পেয়েছে! বেচাল হতেই পারে। বন্দরে মেয়েমানুষ না পেলে, নিঃস্ব বোধ করতেই পারে। সুখানির কপাল ভাল—তুষার ঝড়েও সে টের পেয়েছিল, লোহালক্কড়ের গুদাম পার হয়ে সেডের নীচে এক নারী শীতে কাঁপছে। বাড়ি ফেরার কোনও সুযোগ নেই তার। তারপর···

তারপর ধরা যাক, মুখার্জিদা তাকে আর নিজের কেবিনে এনে ওম দিয়েছে। তারপর ধরা যাক, মেয়েটির খবর পেয়ে জাহাজের বড় মিস্ত্রিও হাজির। আর কে? আর কে ঢুকেছিল। মুখার্জিদা সেই যে চুপ মেরে গেল আর রা করছে না।

সেটা কে?

সে কি বাটলার নিজে। বরফঘর, রসদঘর, বাটলারের এক্তিয়ারে। বাটলার সঙ্গে না থাকলে লাশ বরফঘরে ফেলে রাখা মুশকিল। সুহাস নিজের সঙ্গেই বকাবকি করছে।

আমি কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না মুখার্জিদা। চার্লিকে কে অনুসরণ করছে, সে কে। চার্লির চোখ মুখ হতাশ। সে তো তার বাবাকে সব খুলে বলতে পারে। বলছে না কেন বুঝছি না। চার্লি কতটা ভেঙে পড়েছে, জান না। কিছু বলাও গেল না? সে কেবল বলছে, তুমি যাও; আমার জন্য তোমার কোনও বিপদ হয় চাই না! যাও বলছি।

তারপর আর থাকা যায়।

এ-সব সাত পাঁচ চিন্তায় সে ঘুমাতে পারছিল না। চালু জাহাজে শুধু প্রপেলারের শব্দ ভেসে থাকে। কেমন গুম গুম আওয়াজ। জাহাজ ওঠা-নামা করছে। এবং সে জানে উপরে উঠলে ধূসর এক অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। সে যদি গভীর রাতে ডেকে উঠে যায়, তবে কি অনুসরণকারী টের পাবে, চার্লির কেবিন পাহারা দিতে যাচ্ছে। এটা কি ঠিক হবে। তার তা ছাড়া কি করণীয়। চার্লির ঠাকুরদা তার বাবা-কাকাকে বছন্দ করত না। এটুকু জানে। চার্লির মা নেই। বেটসি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে! দুর্ঘটনা না খুন। চার্লির সন্দেহ খুন। বেটসিকে খুন করে আততায়ীর কি লাভ। সে জাহাজেই বা উঠে আসবে কেন। ভূতুড়ে আতঙ্ক থেকেও চার্লি যে ঘোরে পড়ে যায়নি কে বলবে। একের পর এক সব গুজব জাহাজটায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মালবাহী জাহাজে বোট-ডেকে মেয়ে উঠে আসবে কি করে?

তারপর কখন চোখ লেগে আসছিল, টের পায়নি সুহাস। সহসা মনে হল বাঙ্কে কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে দিচ্ছে। সে আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে দেখল, মুখার্জিদা ফোকসালে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। ইশারায় তাকে উপরে যেতে বলছেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। চোখ ঘষে কম্বল টেনে নীচে নেমে গেল। তারপর সিঁড়ি ধরে অনুসরণ। মুখার্জিদা আগে। সে পেছনে। গভীর রাত। বারোটা-চারটার ওয়াচ দিতে যাবেন মুখার্জিদা। গ্যালির পাশে পিছিলের বেঞ্চিতে বসে বললেন, তোর কি হয়েছে বল তো?

সে তার সংশয়ের কথা বলল।

'তুমিই বল, আহামদ বাটলার বরফঘরে লাশ কি করে দেখতে পায়। সেখানে কোনও লাশ দেখা গেছে, কিংবা ছিল এমন গুজবের শিকার হতে পারে সে। ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই মুখার্জিদা। মানুষ মরে গেলে কিছুই থাকে না। তাই বলে, আমি তেমন সাহসীও নই। ভূতের ভয় আমারও আছে। বোট-ডেকে এত রাতে একা যেতে বললে, হাত পা আমার অসাড় হয়ে যাবে। তুমি তো বোট-ডেক ধরেই যাবে। তোমার ভয় করে না?

'না।'

'তবে তুমি কেন বললে, দেখতেই পারে।'

'শোন সুহাস, জাহাজে কাজ করতে উঠলে, নানা সংস্কারে ভুগতে হয়। প্রাচীন নাবিকেরা একটু বেশিই সংস্কারে ভোগে। এটাই তাদের রোগ বলতে পারিস। তুই হঠাৎ এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন বুঝি না। ভয় করলে, রাতে একা ওদিকটায় যাবি না। তোর তো ওয়াচও নেই যে বয়লার রুমে নেমে যেতে হবে কিংবা ব্রিজে উঠে যেতে হবে। রাতে ফোকসাল ছেড়ে যাবারই বা কি দরকার। তুস এত ঘাবড়ে গেলি কেন বুঝি না।'

'না, তুমি বল, কেন আহামদ বাটলার দেখতেই পারে বললে। তুমি কেন এ-কথা বললে।'

মুখার্জিদা শেষে যা বললেন, তাতে সুহাসের মনে হল মানুষটিকে সে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছে। বললেন, আমিই সেই সুখানি। আমিই খবর দিয়েছিলাম বড় মিস্ত্রিকে। বড় মিস্ত্রির বান্ধবী না আসায় মুষড়ে পড়েছিলেন। বার বার খবর নিচ্ছিলেন তাঁর বান্ধবী

এসেছিল কি না। এলে যেন তাঁর কেবিন দেখিয়ে দেওয়া হয়। বার বার খবর নিচ্ছিলেন, অন্য কারও কেবিনে কেউ এসেছে কি না।

'বলেছিলাম, সাব বাটলারের ঘরে একজন এসেছে।'

'আহামদ বাটলার।' সুহাস না বলে পারল না।

'না আহামদ নয়। অন্য বাটলার। নামটা নাই জানলি। বড় মিস্ত্রি ছিলেন অবনীভূষণ। বাঙালি। বাঙালি বড় মিস্ত্রির সঙ্গে সেই প্রথম এবং শেষ সফর। বাঙালি বড় মিস্ত্রি জাহাজে ক'টা আছে বল। বাঙালি বলেই তার সঙ্গে আমাদের দোস্তি ছিল।'

বড় মিস্ত্রি বললেন, 'চল তো দেখি, বাটলার কেমন মাল তুলে এনেছে। বললাম, সাব, রোগা, শীতে কাতর। চোখমুখ বসা। খদ্দের পায়নি। বন্দরে বোধ হয় আটকা পড়ে গেছে। আমি তুলে আনি নি। বাটলার তুলে এনেছে। দেখার কি দরকার আছে?'

'তুমি মানুষ না সুখানি। বসে থাকতে পারছ। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না! তোমার কি মাথা খারাপ আছে? আমাকে এক ধমক বড় মিস্ত্রির। এরপর আর থাকা যায় বল। সঙ্গে গেলাম। তুষার ঝড় বইছে বলে, এলিওয়ের সব দরজা বন্ধ। যে যার কেবিনে পড়ে ঘুমাচ্ছে। নয় মদ খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পোর্টহোল খুলে বাইরের তুষার ঝড় দেখার চেষ্টা করছে। এলিওয়ের ভিতর কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। প্রায় বলতে পারিস ভূতুড়ে নৈঃশব্দ। জাহাজে আমরা ছাড়া কেউ জেগে নেই। ইঞ্জিন রুমে শুধু একজন ফায়ারম্যান। আর কেউ না। বয়লার একটা চালু রাখতেই হয়। জেনারেটর চালু রাখতে গেলে বয়লার চালু না রেখে উপায়ই বা কি। কেবিনগুলো না হলে গরম থাকবে কি করে। ডাইনিং হল পার হয়ে গেলাম। একটা টুলে উঠে বাটলারের পোর্টহোলে উঁকি দিলাম।'

মুখার্জিদা থামলেন। একটা সিগারেট ধরালেন—'আসলে মানুষ কখন কি করে বসবে এক দণ্ড আগেও সে তা জানে না। তা না হলে আমার কি দরকার ছিল একটা ঘুলঘুলি খোঁজার। ছিলাম বেশ—গ্যাংওয়েতে বসেছিলাম—মাথায় গরম টুপি—ওভারকোট গায়ে বসেছিলাম। কেন মরণ হবে বল, বড় মিস্ত্রি বলল, আর উঠে চলে গেলাম? বড় মিস্ত্রি পাগলের মতো বলছেন কি দেখতে পাচ্ছ সুখানি?'

'শুধু কম্বল সার।'

'আর কিছু না?'

না।'

'মেয়েটা কি করছে?'

'কম্বলের নীচে শুয়ে আছে।'

'বাটলার কি করছে?'

'বাটলার মেয়েটাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। ওম দিচ্ছে।'

'এখনও ওম দিচ্ছে। ডিম ফুটবে কখন?'

'শীতের রাত সাব। ডিম ফুটতে সময় তো লাগবেই।'

'ইয়ারকি। আমরা জলে ভেসে এসেছি। ডাক শুয়োরের বাচ্চাকে। বল, বড় মিস্ত্রি এসেছে।'

'সাব এটা কি ভাল দেখাবে!'

'আরে তুমি তো ডাঙার মানুষের মতো কথা বলছ। তুমি মানুষ না সুখানি। সর।'

'কি বলব সুহাস, প্রায় পা টেনে বড়মিস্ত্রি আমাকে নামিয়ে আনলেন। আমি আর কি করি। টুলের উপর উঠে তিনি ঘুলঘুলিতে কি দেখলেন, না দেখতে পেলেন না জানি না, বেঁটেখাটো মানুষ, তার উপর বিরাট বপু, কিছু না দেখারই সম্ভাবনা—তারপর প্রায় টলতে টলতে নেমে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুখানি, ডাক বাটলারকে। শালা ছোটলোক।'

'সাব এটা কি ঠিক হবে। আপনি বড় মিস্ত্রি বলে যা খুশি করতে পারেন না। আসলে জানিস সুহাস বড় মিস্ত্রিরও হুঁশ ছিল না। মাতাল হয়ে আছে। বান্ধবী না আসায় খেপে আছে ষাঁড়ের মতো। কথা নেই বার্তা নেই দরজায় লাথি। এবং বিশাল বপু নিয়ে ঢুকে গেল। চোরের মতো আমি পেছনে। বাটলার আমতা আমতা করছে। মেয়েটা অসুস্থ বলছে। কে শোনে কার কথা। কাতর প্রার্থনা মেয়েটার, ম্যান আমি সকালেই চলে যাব। আমাকে টানাহ্যাঁচড়া করবেন না। বাটলারও বলল, স্যার ওর শরীর সত্যি ভাল নেই। চোখ মুখ দেখছেন না!'

সুহাসের দিকে তাকিয়ে মুখার্জি বললেন, 'ডিম ফোটা পাখির বাচ্চার মতো। রোঁয়া ওঠা। চিঁ চিঁ করছে।'

'বড় মিস্ত্রি তারপর আমি। আমরা তিনজন—তারপর সব চুপ। মেয়েটার মুখ থেকে লালা ঝরছে। তোকে বললাম, বড় কষ্ট আছে ভিতরে। দেখছিস তো আমি জাহাজ থেকে নেমে যেতে পারি না। নামলেও বেশিক্ষণ বন্দরে ঘুরতে পারি না। রাতে সে আমাকে আজও তাড়া করে। তবে কাউকে বলতে যাস না। বললে, আমি স্বীকার করব না। যদি বলিস, এটাও তো খুন। এটা তো ধর্ষণ। সব স্বীকার করব। জাহাজে উঠে যারা উল্কি পরে তাদের ধারণা জাহাজের ভূতপ্রেত তাদের তাড়া করে না। আমার ধারণা একটু অন্য রকম। বলতে পারলে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয় এমন ভাবি। মন হাল্কা হয়। ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না।'

'ভূতপ্রেতের ভয় না থাকতে পারে। মানুষের ভয় তো থেকেই যায়। ধরা পড়লে না। লাশ গায়েব করলে কি করে?' সুহাস প্রশ্ন করল।

'সে এক ঝামেলা।'

'যাই রে সময় হয়ে গেছে।'

বলেই তিনি উঠলেন।

ডেকে নেমে গেলেন। সুহাস পারে। সে বলল, 'খুন জখম করে রক্ষা পেলে কি করে।'

'আমরা কি খুন করতে চেয়েছি বল। তুই আসছিস কেন।'

'বলবে তো কি করলে?'

মুখার্জিদা হাঁটছেন ডেক ধরে। এত রাতে ডেকে হেঁটে গেলে বুটের শব্দ ওঠে। কিন্তু ইঞ্জিন রুমের ঝকর ঝকর শব্দে সব ঢেকে গেছে। সুহাস বোট-ডেকে ওঠার মুখে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে গেল। বোট-ডেকে উঠতে চায় না। কারণ, এত রাতে বোট-ডেক পার হয়ে একা টুইন ডেকে নেমে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন।

মুখার্জিদা বললেন, 'জানতাম ধরা পড়ব। হুঁশ ফিরে এসেছে। আমরা কি আর করি।

কী যে এক বিপদে পড়ে গেলাম। আমরা ভাগতে চেয়েছিলাম। বাটলার বুঝুক। সে ছাড়বে কেন। যেখানেই ফেলে রাখি ধরা পড়ে যাব।'

'দাঁতের কামড়!'

'কার দাঁতের কামড়?'

'নখের আঁচড়! কার নখের আঁচড়! টের পেলাম কেউ রক্ষা পাব না। জলে ফেলে দিলে দু-দিন বাদে ভেসে উঠবে। কি করি! বাটলারকেই বললাম, তোমার বরফঘরে ঝুলিয়ে রাখ। আমরা সাহায্য করলাম। লাশ রসদঘরে টেনে নিয়ে গেলাম। তারপর বরফঘরে হুকে পা গেঁথে ঝুলিয়ে দিলাম। গরু ভেড়ারা লাশের মধ্যে মেয়েটা হারিয়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। বরফঘর খুললে, কি কুয়াশা ভিতরে জানিস তো। বাটলারকে দেখালাম, দ্যাখ সব কবন্ধ। মেয়েটাও কবন্ধ হয়ে গেছে। জীবনে এত নিষ্ঠুর কাজ করেছে তোর মুখার্জিদাকে দেখে মনে হয়। ভাল-মন্দ জানি না, যা মাথায় এসেছিল তাই করেছি। জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে মধ্য রাতে কফিনে পুরে, কিনার থেকে ফুল কিনে একেবারে সাজিয়ে তিনজনে কফিনটা ঠেলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলাম।'

সুহাস বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মুখার্জিদা কত অকারণে বকাঝকা করেন, তারা কিছু মনে করে না। অকপট স্বভাবের। তাই বলে জীবনের এমন গোপন খবর ফাঁস করে দেয়। না কি বানানো গল্প। এমনও হতে পারে গল্পটা তার শোনা—নিজের নামে চালিয়ে দিলেন। এতে তো বাহবা দেওয়া যায় না—না কি তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভাববার কি আছে, তোর মুখার্জিদা তো থাকলই। সুবিধা অসুবিধার কথা বলবি। মুখার্জিদাকে খুব ভাল মানুষ ভাববার কারণ নেই।

মুখার্জিদা বললেন, 'কি রে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? যা। একা যেতে পারবি? না পিছিলে দিয়ে আসব।'

'তুমি কি আহামদকে বলেছিলে?' সুহাস সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে জানতে চাইল।

'কি বলেছিলাম।'

'এই মানে মেয়েটার কথা।'

'আর বলিস না, আহামদ জাহাজে উঠে এত রোয়াবি করত, কি বলব রাগ ধরে গেল। জিন পরি আবার কি। সব নাকি গুজব। সে এ-সব নাকি বিশ্বাসই করে না। লুকেন্নারের কথাও না। জাহাজটার যে কখনও কখনও মাথা খারাপ হয়ে যায় তাও বিশ্বাস করে না। সি-ডেভিল লুকেন্নারকে সে পাত্তাই দিল না। আরে যার যা, ভাবলে অপবাদ, না ভাবলে অলঙ্কার। ডিনা ব্যাঙ্কের নাম শুনলে কার না কলজে চমকায়? ডিনা ব্যাঙ্কের জাহাজি। সোজা কথা। ডিনা ব্যাঙ্কে সফর করেছ। তা হলে তো আর আটকানো যাবে না। 'নলি যত খারাপ হোক, নিয়ে নেবে। এটা জাহাজের যশ বলতে পারিস। জাহাজ নিজের মর্জিমতো চলে বলতেই আহামদ খেপে গেল। হাতে উলকি আমার—হরে কৃষ্ণ লেখা, উলকি নিয়ে রসিকতা করল। আমাকে কি বলল জানিস, না হলে সুখানি। সারা জীবন হুইল ঘুরিয়ে মাথাটা নাকি আমার খারাপ হয়ে গেছে। দিলাম ডোজ।'

'কি বললে তাকে।'

'বললাম, আহামদ, রোয়াবি দেখাবে না। তোমার কেবিনে মেয়েমানুষের লাশ পড়েছিল।

বরফঘরে লাশ গায়েব করে রাখা হয়েছিল। বেশি রোয়াবি করলে ডিনা ব্যাঙ্ক সহ্য করবে না। সে তোমার ঘরে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে পারে, বরফঘরে ঝুলেও থাকতে পারে। ঘাড় যখন মটকাবে বুঝতে পারবে। হয়ে গেল।'

'মুখার্জিদা!'

'বল।'

'জাহাজে তবে কিছু একটা আছে বলছ।'

'থাকতে পারে, নাও পারে। মনে করলে আছে, মনে করলে নেই। যে যেমন বিশ্বাস করে। যা, দাঁড়িয়ে থাকিস না। ভয়ের কিচ্ছু নেই, আমি গেলাম। আতঙ্কে মানুষের কি হয় আহামদকে দিয়ে বুঝেছিস! অযথা আতঙ্কে পড়ে যাস না।'

সে আর না বলে পারল না, 'জান চার্লিকে কে অনুসরণ করছে। পোর্টহোলে লোকটা নাকি দাড়িয়েছিল।'

'চার্লি!'

'আরে কাপ্তানের পুত্র!' চার্লি নামটা তার কাছে যত চেনা, মুখার্জিদার কাছে তত চেনা নয়। সবাই কাপ্তানের ব্যাটা বলে, কেউ কেউ ছোটসাব বলে। জাহাজে নামে কেউ কাউকে বড় চেনে না। যে যা কাজ করে সেই নামে চেনে। কাপ্তান, সেকেন্ডমেট, চিফমেট, ডেক সারেঙ, ইঞ্জিন সারেঙ এমন কত কিসিমের কাজ যে জাহাজে থাকে। মুখার্জিদা জাহাজের তিন নম্বর সুখানি। তারাই ক'জন হিন্দু নাবিক মুখার্জিদা, মুখার্জিদা করে। চার্লি বলায় মুখার্জিদা প্রথমে ধরতে পারেননি, কার কথা বলছে। কাপ্তানের পুত্র বলায় নামটা মনে পড়ে থাকতে পারে। তিনি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি গলায় বললেন, 'তা চার্লিকে অনুসরণ করতে জাহাজে উঠে এল। তুই জানলি কি করে। জাহাজে আমরা ছাড়া আর কে আছে? গোনাগুনতি লোক, সবাই সবাইকে চেনে—বাইরের লোক জাহাজে উঠে আসবে কি করে! কোথায় লুকিয়ে থাকবে?'

'চার্লি তো বলল।'

'চোখের ভুল।'

'জান পিকাকোরা পার্কে একদিন চার্লি লোকটাকে দেখেছে।'

'ধুস যত্ত আজগুবি কথা। যা, কেন যে মরতে এরা জাহাজে উঠে আসে। চার্লি আর লোক পেল না, তোকে বলতে গেল। জাহাজে ওর বাবা আছেন, তাঁকে বলুক, কে তাকে অনুসরণ করছে তিনি খোঁজ করুন। তোর কি দায়। আর তোকে বলে কি লাভ। ওটা ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে তাও বুঝি না। মেয়েদের মতো চিঁ চিঁ করে কথা বলে। কেন যে ওটার পেছনে ঘুর ঘুর করিস তাও বুঝি না!'

সুহাস বুঝল, এতে তো হিতে বিপরীত হয়ে গেল। চার্লিকে মেয়েছেলে বলতেও মুখে আটকাল না। তার ঘুর ঘুর করাও মুখার্জিদার পছন্দ নয়। সে যে কি করে! চার্লি যদি জানতে পারে মেয়েছেলে বলে তাকে মুখার্জি ঠাট্টা করেছে, তবে আর রক্ষা আছে! চার্লি ক্ষেপে গেলে সব করতে পারে। মুখার্জিদা না আবার সকালে ঝামেলা পাকান। আরে শুনছ মিঞারা, ওরে শুনছিস বাঙালিবাবুরা, জাহাজে নতুন মেমান হাজির। চার্লি দেখেছে, মেমান ঘোরাফেরা করছে। রাত হলেই মেমান হাজির হবে। আহামদ বাটলারের পর চার্লির

পালা। তার পোর্টহোলে নাকি মেমান উঁকি দিয়েছে।

সুহাস কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, 'কাউকে কিন্তু বোলো না।'

'বললে কি হবে।'

'উপহাসের পাত্র হয়ে যাবে চার্লি। কি দেখতে কি দেখেছে—আর সে খবর জাহাজে ওড়াউড়ি শুরু করলে, কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারবে! ডিনা ব্যাঙ্কে আবার গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে না! মাঝ সমুদ্রে জাহাজিরা বেগড়বাই করলে কাপ্তান খেপে যাবেন না!'

'তা অবশ্য ঠিক।' বলে মাথা নাড়লেন মুখার্জিদা। মুখার্জিদাকে কিছুটা এখন সন্ত মানুষের মতো মনে হচ্ছে। নীল কম্বলের গরম প্যান্ট, হাতে উলের দস্তানা, গায়ে লম্বা কম্বলের ওভারকোট, মাথায় ফ্লানেলের টুপি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় উঠে আসছে সমুদ্র থেকে—এবং অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা যায় সমুদ্র তার অজস্র ঢেউয়ের ফণা নিয়ে পাক খাচ্ছে। গোঙাচ্ছে। যেন অতলে, অসীম অনন্ত জলরাশি দ্রুত পাক খেতে খেতে উপরে উঠে আসছে—আবার তলিয়ে যাচ্ছে। টোপ গেলার মতো জাহাজটাকে অনায়াসে গিলে ফেলতে পারে। কিন্তু পারছে না, রুচিতে বাধছে বলে। পুরনো লঝঝড়ে জাহাজ, তার সঙ্গে এত সব অপদেবতা জাহাজে, গিলে কতটা হজম করতে পারবে, সেই ভয়ও থাকতে পারে।

অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা কেন যে সুহাসের মগজে কামড় বসায় বোঝে না। হওয়ায় জলকণা উড়ে আসছে। দিগন্তে কিংবা মাথার উপর নীল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। সমুদ্রে বিচরণকারী এই নিঃসঙ্গ জাহাজটির জন্যও তার মায়া হয় কেন বোঝে না। সমুদ্রের সঙ্গে জাহাজটার লড়ালড়ি চলছে সেই কবে থেকে। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্র। গভীর সমুদ্রে এলে সুহাস এটা বেশি টের পায়। অনন্ত এক বিশ্বের মতো নানা রহস্যে এই জাহাজ এখন টালমাটাল। কি হবে কে জানে!

'আমি যাই দাদা।'

'যা।'

সুহাস হাঁটা দিলে ফের ডাকলেন মুখার্জিদা।

'শোন।'

সে দাঁড়াল।

মুখার্জিদাই তার কাছে এগিয়ে এলেন।

বললেন, 'লোকটাকে চার্লি দেখেছে! তুই দেখিসনি তো?'

'না।'

'তবে এমন আতঙ্কে পড়ে গেলি কেন। কিছু খেলি না!'

সুহাস কি করেক বোঝাবে, চার্লি হতাশায় কতটা ভেঙে পড়েছে! চার্লি তাকে প্রায় ঠেলে কেবিন থেকে বের করে দিয়েছে। চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে, এবং তা কেন সে কিছু জানে না। সে জড়িয়ে পড়ুক চার্লি এটাও চায় না। বিশ বাইশ মাসে চার্লির গভীর এক টান জন্মে গেছে তার প্রতি সে বোঝে। নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা যত সহজে তাকে বলতে পারে, চার্লি তার নিজের বাবাকেও তত সহজে বলতে পারে না। ম্যাককে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? সে কে? কেন ম্যাককে ঠেলে ফেলে দিল! ম্যাকের কি অপরাধ! গভীর কোনও ষড়যন্ত্র হচ্ছে না সে বুঝবে কি করে। ম্যাকের উপর

ষড়যন্ত্রকারী এত হিংস্র হয়ে উঠছে কেন। নির্বিরোধ নির্ভেজাল মানুষ। অবসর সময়ে সে ছাঁচ বানায়, কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোস বানায়। জীবজন্তু থেকে মানুষের মুখ কিছুই বাদ যায় না। বন্দরে বন্দরে সে মুখোস বিক্রি করে। কখনও উপহার দেয়। তাকে সবাই যেন মনে রাখে এটা সে চায়। এমন কি সে তার বান্ধবীদের ঘরেও একটা করে মুখোস রেখে আসে। উপহার দেয়। আর অবসর সময়ে বোট-ডেকে বসে সে চার্লির সঙ্গে দাবা খেলে। তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আততায়ী খুন করতে চায়নি, কে বলবে!

সুহাস জানে ম্যাকের কথা বলে লাভ নেই। মুখার্জিদা সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন তার সংশয়ের কথা। কারণ ম্যাক বন্দর থেকে ঘোর মাতাল হয়ে ফেরে। সে পা ফসকে পড়ে যেতেই পারে। এই নিয়ে তার সংশয়ের কথা শুনলে মুখার্জিদা হাসাহাসি করতে পারেন। সে ফের বলল, 'আমি যাই।'

'যা।'

সুহাস পিছিলে উঠে এল। আর তার কেবলই মনে হচ্ছিল, অন্ধকারে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে দু-বার পেছনে তাকাল। দেখছে, মুখার্জিদা দূরে বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্য রাখছেন সে ঠিকমতো পিছিলে উঠে যেতে পারছে কি না। পিছনে তাকিয়ে কোনও অনুসরণকারীকে খোঁজার সে চেষ্টা করছে মুখার্জিদা না আবার টের পান। তার কোনও ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু কি ভেবে তিনি বোটডেকে দাঁড়িয়ে আছেন! কেউ নেই। শুধু মাস্তুলের আলো, গ্যালির আলো ওঠানামা করা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এমন কি ফল্কার উপরেও কেউ দাঁড়িয়ে নেই। তবে মনে হয় কেন, অদৃশ্য সেই শত্রুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরও শব্দ যেন গায়ে লাগছে। এটা যে আতঙ্ক থেকে হচ্ছে টের পেতেই গা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল পিছিলে।

আর তখনই মনে হল উইন্ডসহোলের আড়ালে কে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। জাহাজের এখানে সেখানে উইন্ডসহোলগুলো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার যে কোনও একটার আড়ালে একজন মানুষ অনায়াসে লুকিয়ে পড়তে পারে। যদি ইনজিন-রুম কিংবা বয়লার রুম থেকে কেউ উঠে আসে—আসতেই পারে, গ্যালি থেকে চা বানিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এবং সে কেন এ-ভাবে উইন্ডসহোলের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে! কে সে! কি যে হয়, তার দেখার বাসনা কে সে?'

সে ফল্কার উপর দিয়ে যমুনাবাজুর দিকে ছুটে গেল। যেন যে কোনও উপায়ে দেখা দরকার, কেউ সত্যি সেখানে গোপনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে কি না। অবাক, কেউ নেই। তার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ওঠা নামা করছে। কেউ নেই। শুধু কোনও জাহাজির পরিত্যক্ত একটি রঙের টব দেখতে পেল। চোখের ভুল কি না, বোঝার জন্য আগের জায়গায় সে ফিরে এসে বুঝল খুবই ঠকে গেছে। ঢেউয়ে জাহাজ দুলছে, জাহাজ দুললে সবই দোদুল্যমান। ছায়া লম্বা হয়ে যায়। ছায়া অদৃশ্যও হয়। রঙের টবটি সেই কুহক সৃষ্টি করছে। টবটি সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র রেখে দিল সুহাস। ছায়া লম্বা হয়ে গেলে জেগে ওঠে, কিংবা ছায়া অদৃশ্য হলে যে ভূতুড়ে ব্যাপার সৃষ্টি হতে পারে এটা সে ভালই টের পেল। নিজের এই বোকামির জন্য কিছুটা লজ্জিত। আর তখনই মুখার্জিদা হাজির—'হ্যাঁরে, তুই ছুটে গেলি কেন? কি খুঁজছিস।' সে বলল, 'না কিছু না। রঙের টবটা কে যে রেখে গেল।

অন্ধকারে হোঁচট খেলে কি যে হত? ফল্কার দুটো কাঠই খোলা।'

ছয়

সকালে চার্লি তার বয়লার সুট পরে ডেকে বের হয়ে এল। হাতে আপেল। কামড়ে খাচ্ছে। লোকটাকে খোঁজা দরকার। সে এলিওয়েতে নেমে এল। যার সঙ্গে দেখা, তাকেই গুডমর্নিং বলে লাফিয়ে ডেকে নেমে গেল। এবং সে জানে সুহাস উইনচে চলে আসবে—সে এ-জন্য কশপের ঘরে ঢুকে গেল। তার কাজ-কাম বিশেষ ভাগ করা থাকে না। সে খুশিমতো কাজ করে, তাকে কিছু করতে দেখলে সবাই খুশি হয়। সে উইনচে চলে যাবে, এবং সেখানে সে সুহাসকে পাবে।

তা-ছাড়া রাতে তাকে যে অবস্থায় দেখে গেছে তাতে সুহাসের দুশ্চিন্তা হবারই কথা। এখন দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না, রাতে সে এত ভেঙে পড়েছিল। তার কেন যে মনে হল, সুহাসকে সব খুলে বলা দরকার। কিন্তু সুহাস কি-ভাবে নেবে কে জানে! এমনিতেই সেই হিমশীতল কঠিন মুখের কথা শুনে সুহাস কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। দু-দিন হল সুহাসকেও সে স্বাভাবিক দেখছে না। কেমন গুম মেরে গেছে। শুধু যে সুহাস একা গুম মেরে গেছে তাও নয়—প্রায় সব জাহাজিরা। বিশমার্ক সি-র নামেও কম অপবাদ নেই। 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' জাহাজও সেই সমুদ্রে ডুবে গেছে। এমন সুরক্ষিত জাহাজ ভুল করে মিত্রপক্ষের মাইন ফিল্ডের উপর গিয়ে পড়বে কেউ ভাবেইনি। কারণ প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটা তো মিত্রপক্ষের সেনা নিয়ে লস এনজেলস থেকে যাত্রা করে ছিল। তারিখটাও তার মনে আছে। বিশমার্ক সি-র সে কিছু মানচিত্র দেখেছে চার্টরুমে। প্রেসিডেন্ট কলিজের নাড়ি-নক্ষত্রও লেখা আছে। আসলে জাহাজটা ছিল লাক্সারি জাহাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাহাজটাকে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়। জাহাজটা রওনা হয়েছিল ২৬ অক্টোবর ১৯৪২। নিউ হেব্রিডস দ্বীপপুঞ্জ মালার এসপিরিতো সান্ত দ্বীপের সামরিক বন্দরে ভিড়বার কথা। জাহাজটা ঘায়েল হল মার্কিন সেনাদের পুঁতে রাখা মাইনসে। কি করে এটা হল, মার্কিন সেনাধ্যক্ষরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না—কারণ তাদের নির্দেশেই জাহাজ তার গতিপথ স্থির করে নিচ্ছিল। এটা অন্তর্ঘাতমূলক কাজও নয়—কোথায় কি আত্মরক্ষার্থে পেতে রাখা হয়েছে তাও তাদের নখদর্পণে। কোনও অদৃশ্য অশুভ প্রভাবেই জাহাজটা ডুবে গেল সমুদ্রে। মার্কিন সেনাধ্যক্ষরাও এমন বিশ্বাস করতেন সে সময়ে।

সেই সমুদ্রে তারা মাটি টানার কাজে যাচ্ছে। জাহাজিদের মন ভাল না থাকারই কথা। প্রেসিডেন্ট কলিজ জলের তলায় ডুবে আছে তারা জানে না। তবে তারা জানে অসংখ্য জাহাজ এবং সামরিক বিমানের কবরভূমি সেই সমুদ্র। কলিজ তো হারবার থেকে বেশি দূরেও ছিল না। যে ক'জন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের সাক্ষাৎকারের বিবরণও দেওয়া আছে। এঁদের মধ্যে ফার্স্টলেফটেন্যান্ট ওয়েব থমপসনও ছিলেন। তিনি বলেছেন—সহসা তীরের কাছে ছোট্ট আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম। আমাদের সংকেত পাঠানো হচ্ছে—ডেনজার অ্যাহেড। অর্থাৎ আমরা বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে যাচ্ছি। ভাল করে সংকেত বুঝতে না বুঝতেই মনে হল সমুদ্র আমাদের সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রুদের কিছু করণীয় ছিল না। জাহাজ যেন নিজের খুশিমতো ধেয়ে যাচ্ছে। ওটা যে মিত্রপক্ষের

মাইনফিল্ড আমাদেরও জানা ছিল। তবু জাহাজের উপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। প্রায় পাঁচ হাজার সেনা নিয়ে জাহাজটা সমুদ্রের অতলে চোখের সামনে ডুবে গেল। লাইফ জ্যাকেটও পরার সময় পাওয়া যায়নি। বাবার ডাইরিতে খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা মানচিত্র থেকেই সে এ-তথ্য উদ্ধার করেছে। ডাইরিটা বাবা চার্টরুমে নিজের লকারে রেখেছেন। কেন রেখেছেন সে অবশ্য তার কিছুই জানে না। এত যত্ন কেন তাও জানে না।

জাহাজ মাটি টানার কাজে যাচ্ছে শুনে জাহাজিরা ভাল নাই থাকতে পারে। সুহাসকে সে কলিজের খবর দেয়নি। কে জানে সে যদি জাহাজিদের কলিজ নিয়ে গল্প করে তবে নিশ্চিত যে তারা আরও বেশি ভেঙে পড়বে। জাহাজে একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে। ফলে জাহাজিরা খুবই নিষ্প্রাণ। সে ডেকে নেমে এটা আজ আরও বেশি টের পেল। এত উৎপাত কার ভাল লাগে।

কশপের ঘর থেকে সে চিজেল নিল। ছোট্ট হাতুড়ি নিল। কিছুটা রং বার্নিশ। সে চিপিং করবে কোথাও। বসে গেলেই হল। জাহাজের ছাল চামড়া নোনা হাওয়ায় নোনা ঢেউয়ে অনবরত ছাড়িয়ে নিচ্ছে—চিপিং করে যেখানে খুশি রং বার্নিশ লাগানো যায়। কশপ তাকে দেখলে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। রাশি রাশি চিজেল হাতুড়ি র‍্যাক থেকে টেনে নামাতে থাকে। তখন তার খুব হাসি পায়। এরা বড়ই ভীতু স্বভাবের। না হলে এভাবে জাহাজ মাটি টানার কাজেও যেতে পারত না। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরাও খুশিমতো জাহাজটাকে আঘাটায় ফেলে রাখতে পারত না। এরা আছে বলেই পারছে।

সহসা কোথা থেকে ঘন কুয়াশা ধেয়ে এল। আবছামতো হয়ে আছে সব। এটা হয়—সে মাঝে মাঝে শীতের সমুদ্রে এমন হতে দেখেছে। চারপাশে জলরাশি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। দু তিন জোড়া অ্যালবাট্রস পাখি জাহাজের পেছনে উড়ছে। জাহাজ বন্দর ছাড়লেই পাখিগুলি উড়তে শুরু করে। জাহাজের সঙ্গে পাখির যেন কোনও যোগসূত্র আছে। কুয়াশায় ঢেকে যাওয়ায় পাখি এবং নীল জলরাশি আর দেখা গেল না। সব অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে! চার্লি কশপের ঘর থেকে উঠে ইনজিন রুম পার হয়ে চলে গেল উপরে। কোথায় কোন উইনচে সুহাসের কাজ সে জানে না। বোট-ডেকে উঠে গেলে বোঝা যাবে। ফরোয়ার্ড ডেকেও থাকতে পারে আবার আফটার ডেকেও থাকতে পারে। চার্লি বোট-ডেকে উঠে দেখল সামনে পেছনে কেউ নেই। ঘড়ি দেখে বুঝল, সে আজ খুব সকাল সকাল কাজে বের হয়ে গেছে। পিছিলে নাবিকদের জটলার মধ্যে দেখল সুহাস বসে আছে। নীল জামা, নীল প্যান্ট পরনে। শীতের কামড় কমে আসছে বোঝা যায়। জাহাজ যাচ্ছে নর্থ নর্থ ওয়েসটে। যত উপরে উঠে যাবে জাহাজ তত শীত কমে আসবে। আর চার পাঁচদিন, বেশি হলে এক হপ্তা শীত থাকবে—তারপর উষ্ণ সমুদ্রে জাহাজ ঢুকে গেলেই হাই ফাই করতে শুরু করবে সবাই। রোদে ডেক তেতে থাকবে, কখনও ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে যাবে জাহাজ—অথবা জ্যোৎস্নারাতে দেখতে পাবে, ফল্কায় নাবিকরা মাদুর পেতে বসে আছে। রঙের টব বাজিয়ে কেউ নেচে নেচে গান করছে।

চার্লি নাবিকদের ভিড়ে দৌড়ে যেতে পারত। কিন্তু আজ কেমন তার সংকোচ হল। সুহাসটা যে কি, সে তো দেখতে পাচ্ছে বোট-ডেকে সে দাঁড়িয়ে আছে। সুহাসের তো

উচিত, তাকে দেখেই ছুটে চলে আসা। কেন যে আসছে না। সে হাই করে আজ ডাকতেও পারল না।

সুহাস এদিকেই উঠে আসছে। চা-চাপাটি খেয়ে কাজে বের হয়ে পড়ারই সময় এটা। ছুটি সেই বারোটায়। জামার আস্তিনে মুখ মুছতে মুছতে বোট-ডেকের নীচে এসে হাত তুলে দিল। তারপর বলল, 'জান সুহাস, আমি ভাবছি লোকটাকে খুঁজে দেখব। আমার সঙ্গে আসবে। লোকটা এই জাহাজেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে মনে হয়।'

'চোখের ভুল চার্লি, কাল এটা টের পেলাম।'

'চোখের ভুল বলছ! তার মানে! তুমি আমাকে কি খুব বোকা ভাবছ!

'মনে হয়। না হলে উইন্ডসহোলের পাশে কে অদৃশ্য হয়ে গেল দেখতে পাব কেন। গিয়ে দেখি রঙের টব। তারপর কেমন উত্তেজিত হয়ে বলল, মাথায় তোমার পোকা ঢুকে গেছে চার্লি। তোমাকে কেউ অনুসরণ করছে। ডাঙায় তবু বিশ্বাস করা যায়—জাহাজে উঠে আসতে পারে কখনও। ধরা পড়বে না!'

চার্লি বলল, 'আমাদের কেউ নয় তো!'

সুহাস কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, 'কার দায় পড়েছে, বুঝি না। কেন করবে বল। আমরা জাহাজে কাজ করতে এসেছি—কেউ তো গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি। যদি ধর উঠেই আসত—সে কেন এতদিন গোয়েন্দাগিরি করল না। তা-ছাড়া আমি বুঝিও না, তোমার পেছনে লেগে কি লাভ। সব কিছুর তো যুক্তি থাকবে। মুখার্জিদা তো বলল, মানুষ ভয় পেলে অনেক কিছু দেখে ফেলে। বনের বাঘে খায় না জান, মনের বাঘেই খায়। আহামদ বাটলার না হলে দেখে ফেলে, বরফঘরে লাশ ঝুলছে! লোকটা তো ত্রাসে পড়ে উন্মাদই হয়ে গেল।

চার্লি সুহাসের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ওরা ফরোয়ার্ড ডেকে নেমে গেল। সুহাস জানে মুখার্জিদা জাহাজে অনেক সফর দিয়েছেন। অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর কথার দাম আছে। তা ছাড়া আহামদ বাটলারকে ভয় না পাইয়ে দিলে বরফঘরে লাশ ঝুলছে কখনই দেখতে পেত না।

সুহাস ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি উল্কি পরলে পারতে।'

'উল্কি!' চার্লি সহসা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল।

'বারে দেখছ না, জাহাজে বুকে পিঠে হাতে উল্কি নিয়ে কত জাহাজি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের মুখার্জিদার হাতেও উল্কি আছে জান। হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হাতে লিখে রেখেছে। তিনি কখনই বিশ্বাস করেন না, কোনও অপদেবতা তাকে কাবু করতে পারে। ছুঁতেই তাকে ভয় পায়। তাকে দেখলে ত্রিসীমানায় অপদেবতারা আসে না। আমার আর কোনও ভয় নেই।'

'তোমার কোনও ভয় নেই!'

'না।'

হাত ঝেড়ে সুহাস যেন সাফসুফ হয়ে গেল!

চার্লি পকেটে হাত দিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে আছে। সুহাসের কথা বোঝার চেষ্টা করছে। সে কি বলতে চায়, আসলে ঘোরে পড়ে দেখে একটা হিমশীতল পাথরের মতো

মুখ তাকে অনুসরণ করছে। তাকে কি সাহস জোগাচ্ছে। মন থেকে হাবিজাবি চিন্তা দূর করে দিতে বলছে।

'মুখার্জি জানে?'

'কি জানে!'

'এই জাহাজেও সে উঠে এসেছে!'

'জানে।'

'ম্যাককে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে জানে?'

'না, জানে না। কেউ উঠে এসেছে শুনেই এমন মজা করতে শুরু করলেন, আর বলি। আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই! সবার সামনে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা শুরু করবে। জান মুখার্জিদাই কিন্তু ডারবান বন্দরে বলেছিল পারে, আহামদ বাটলার লাশ দেখতেই পারে। আবার সেই মানুষটাই বলছে, সব ঘোরে পড়ে হয়। কি যে কখন বলে! তবে উইন্ডসহোলের পাশে ছুটে না গেলে বুঝতে পারতাম না, ভয় মানুষকে কতটা কাবু করে রাখে। গভীর রাতে বোট-ডেক থেকে নেমে আসার সময় মনে হচ্ছিল, অনুসরণকারী আমাকেও অনুসরণ করছে। কি আতঙ্ক, ভাগ্যিস মুখার্জিদা বোট-ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাগ্যিস আমাকে ছুটে যেতে দেখে তিনিও ছুটে এসেছিলেন। না হলে কি যে হত!'

চার্লি বলল, 'উল্কি পরলেও রেহাই পাব না। আমি জানি সে আছে। সে জাহাজেই উঠে এসেছে। আচ্ছা সুহাস তুমিই বল, জাহাজ ছেড়ে দেবার আগে দেখলেও না হয় কথা ছিল। লায়ন রকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে জাহাজ। পোর্টহোল খুলে রকটা দেখছি। সমুদ্রের শেষ ডাঙা। তুমিও নিশ্চয় দেখছিলে। সবারই তো শেষ ডাঙা দেখার কৌতূহল থাকে। কি থাকে কি না বল!'

'থাকে।'

'ডাঙা দেখা কি অপরাধ?'

'অপরাধ হবে কেন?'

'অপরাধ নয় যখন চুরি করে দেখছিলাম না! মানে আমি বলতে চাইছি, লুকোচুরি খেলছি না। মনে কোনও আতঙ্কও ছিল না। আতঙ্কে কোনও ঘোরেও পড়ে যাবার কথা না। মগজ আমার যথেষ্ট তাজা ছিল। চোখ খারাপ না। তখন যদি দেখি পোর্টহোলে পাথরের মতো নিষ্ঠুর চোখ তুমি স্থির থাকতে পারতে!'

'না পারতাম না। দেখলে সত্যি পারতাম না। আচ্ছা চার্লি সে ব্যাটা জাহাজে থাকবে কি করে? কোথায় পালিয়ে থাকবে?'

'আমিও তো তাই ভাবছি।'

'আমাদের কেউ হলে চিনতে পারতে!'

'সেই তো! মাথায় আসছে না। দাড়ি গোঁফ বাবরি চুল কার আছে? সারেঙের দাড়ি-গোঁফ আছে। পাকা দাড়ি-গোঁফ। চুলও সাদা। তিনি কেন আমার পোর্টহোলে উঁকি দেবেন। তা ছাড়া তাঁর তো বাবরি চুল নেই। দাড়িও কোঁকড়ানো নয়। লোকটা যে কে? মুখ দেখে লোকটা কে বুঝতে পারছি না। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝাও কঠিন।'

মালবাহী জাহাজে বাইরের কোনও লোক থাকার কথা না। সেই ডেকসারেঙ, ইনজিন

সারেঙ, ডেকটিন্ডাল, ইনজিনটিন্ডাল সুখানি, গ্রিজার, আর সব সাধারণ জাহাজি। আর আছে বাটলার, মেসরুমবয়, মেসরুমমেট, কাপ্তানবয়, চিফকুক। এ-ছাড়া রেডিও অফিসার, কার্পেন্টার চিফমেট সেকেন্ডমেট থার্ডমেট, পাঁচজন ইনজিনিয়ার। ফাইভার ম্যাক আর সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার কিছুটা কমবয়সী। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের তারা। আর তো জাহাজে সব বুড়ো হাবড়ার দল।

ফাইভার উইনচে চলে এসেছে। সুহাসও উইনচের নীচে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি করি বল তো?'

'আমার সঙ্গে এস।'

'ফাইভারকে বলে নাও। রাগ করতে পারে।'

চার্লি ছুটে ফাইভারের কাছে চলে গেল। বলল, 'সুহাসকে নিয়ে নীচে যাচ্ছি। যদি ছেড়ে দাও।'

ফাইভারের বিগলিত মুখ! সে বলল, 'নিশ্চয় যাবে। কেন যেতে চাইছে না?'

'তুমি না বললে যাবে না বলছে।'

ফাইভার হেসে দিল। বলল, 'খুব অনুগত দেখছি আমার। এই ছোকরা, যাও। চার্লি কি বলছে, শোনো।'

তারপর তারা দুজনেই ছুটে কয়লার বাঙ্কারে নেমে গেল। সিঁড়িতে লাফিয়ে নামছে, লাফিয়ে উঠে আসছে। কয়লার বাঙ্কারে কয়লা টানছে হাফিজ। পোর্টসাইড বাঙ্কারে কয়লা টানছে আবেদালি।

তারা লম্ফ তুলে ক্রস বাঙ্কারও খুঁজল। কয়লার পাহাড়। নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়লার বেলচা এবং হাতে ঠেলা গাড়ি। কেউ নেই। হাফিজ আবেদালি দুজনই অবাক, সুহাস কাপ্তানের ব্যাটাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে কেন? সিঁড়িতে ওঠার সময় সুহাস বলল, 'নেই। আমার মনে হয়—লায়ন রকে নেমে গেছে। তোমাকে শেষবারের মতো দেখে গেল।'

'ঠাট্টা করছ!'

'ঠাট্টার কি হল!'

'জাহাজ থেকে লাফিয়ে সমুদ্রে কেউ পড়তে পারে? পড়লে প্রপেলার টেনে নেবে না।'

'শোনো আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না, সত্যি তুমি বল, কেন একটা অচেনা ভুতুড়ে লোক তোমার পোর্টহোলে উঁকি দেবে। কি কারণ থাকতে পারে। জাহাজে এত লোক থাকতে বেছে বেছে তোমার পোর্টহোলেই দাঁড়াল! পিকাকোরা পার্কে তোমাকেই দেখল! কি জানি মাথায় আমার কিছু আসছে না।'

'সুহাস, লোকটা আমাকে লস এনজেলস থেকে অনুসরণ করছে। আবছা অন্ধকারে ভেসে ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়! কেন যায় বল!'

'লস এনজেলস থেকে বলছ! কই আগে তো বলনি!'

চার্লি কেমন আর জোর পাচ্ছে না। সে বলল, 'ফক্কার ভিতর বসে থাকতে পারে। টানেল-পথে যদি থাকে। যেন আছেই। অন্তত যে-ভাবে হাঁটছে চার্লি এবং খুঁজছে তাতে

সংশয়েরও কারণ থাকতে পারে না। অগত্যা সে না বলে পারল না, তোমার বাবাকে বলছ না কেন? তিনি তো এক দন্ডে সব ফয়সালা করে দিতে পারেন, আছে কি নেই দেখতে পারেন। সবাইকে মাস্তারে দাঁড়াতে বলতে পারেন। খুঁজে দেখতে ও বলতে পারেন। তাঁকে তুমি কেন যে বলছ না, বুঝছি না।'

চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বলল, 'যাও, যাও বলছি। তোমাকে খুঁজতে হবে না। একাই খুঁজব, একাই খুঁজে বের করব। বাবাকে কেন বলছি না. কৈফিয়ত দিতে হবে!'

সে চলে যাচ্ছিল। ফের ডাকল চার্লি—'ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ জানতে না পারে আমরা তাকে খুঁজছি।'

আর তখনই ডেকে হল্লা। কে ডেরিক চাপা পড়ে থেঁতলে গেছে। বংশী চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে। 'সব ভাঙবে। সব যাবে। আমাদের রেহাই নেই। বাঁচতে চাও তো, জাহাজে আগুন ধরিয়ে দাও। পুড়িয়ে দাও, নইলে কেউ রক্ষা পাবে না। জাহাজ আমাদের শেষ করে দেবে। ঝড় নেই ঝাপটা নেই, ডেরিক কে ভাঙে! বোঝো না মিঞারা। মরবে, সব শালারা মরবে। জাহাজে কাউকে রেহাই দেবে না। সমুদ্রের শয়তান জাহাজে উঠে এসেছে।'

পাগলের মতো ফল্কার উপর দাঁড়িয়ে বংশী চিৎকার করছে। মুখার্জিদা ছুটে গেছেন তাকে সামলাতে। আর সবাই ছুটে যাচ্ছে ফরোয়ার্ড পিকে। ডেরিক কি ফাইভারের মাথায় ভেঙে পড়ল। সুহাসও ছুটতে থাকল।

সাত

দেখা যায় না।

ডেরিক, ওয়ারপিন ড্রামের উপর ভেঙে পড়েছে। ফাইভার থেঁতলে গেছে পুরোপুরি। ড্রামটার উপর ফাইভার ঝুলে আছে। হাত পা অসাড়। মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

কাপ্তান থেকে সব অফিসার ইঞ্জিনিয়াররা ঘিরে রেখেছেন জায়গাটা। ডেকসারেঙ ইনজিনসারেঙ অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁদের তলব হবে।

কাপ্তান, ডেরিক খসে পড়ল কি করে, বোধ হয় ভেবে পাচ্ছেন না। তাঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছে।

জটলার মধ্যে সুহাস দাঁড়িয়েছিল। মর্মান্তিক দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। একবারই উঁকি দিয়ে দেখেছে—তারপর আর পারেনি। শরীর গোলাচ্ছে। সে চার্লিকে খুঁজল। চার্লি কোথাও নেই। যদি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকে—সেখানেও দেখল নেই। চার্লি কি তার নিজের কেবিনে হতাশ হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল! মাত্র কিছুক্ষণ আগে তারা এখানে ছিল। সে ওয়ারপিন ড্রামের উপর ঝুঁকে ফাইভারের কাছে অনুমতি নিয়েছে। তখন ডেরিক ভেঙে পড়লে—ফাইভারের মতো তার অবস্থা হত। অথবা চার্লি যদি তাকে ডেকে নিয়ে না যেত, তার কি হত ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার মতো অবস্থা। যেন অল্পের জন্য সে প্রাণে বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস চার্লি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল—সে আর চার্লি জাহাজের সর্বত্র লোকটাকে খুঁজছে। ইঞ্জিন-রুমে সেকেন্ডের ওয়াচ—চার্লির সঙ্গে নীচে নেমে আসায় তিনি খুবই বিরক্ত। ভয়ে ভয়ে ইঞ্জিন-রুম সে পার হয়ে গেছে। চার্লি পকেটে টর্চও নিয়েছিল। এমনকি যা মাথা খারাপ অবস্থা চার্লির তাতে চার্লি যদি বিল্‌জে নেমে যেত, জলের

ট্যাঙ্কগুলির ভিতর ঢুকে যেত তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। মাঝে মাঝে সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তোমার মাথা খারাপ চার্লি। জাহাজে এ-ভাবে কেউ পালিয়ে থাকতে পারে—না, সাহস পায়।

এখন মনে হচ্ছে, চার্লি তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। সে ডেকে না নিলে খতম। চার্লির প্রতি এ-কারণে কৃতজ্ঞতাও কম নেই।

'দেখলি।' মুখার্জিদা ফিরে এসে বললেন।

'দেখলাম।' কেমন হতাশ গলায় সুহাস উত্তর দিল।

ব্রয়লার রুম থেকেও লোকজন ছুটে চলে এসেছে। কাজ ফেলে আসা খুবই অনুচিত কাজ। ইনজিনসারেঙ ধমক দিলেন, ছোট টিন্ডালকে। 'যাও মিঞা, নীচে যাও। কাজ কাম ফেলে উঠে এলে! সব নসিব।'

মুখার্জিদা বললেন, 'বেচারা।' তারপর কেমন আর্ত গলায় বললেন, 'আমি তো ভাবলাম তুই থেঁতলে গেছিস! ওখানে তো তোরই কাজ করার কথা!'

সুহাসের ভাল লাগছে না। তার মাথা ঘুরছে। সে বসে পড়ল। তার বাবা মার মুখ মনে পড়ল। গত জন্মের পুণ্যফল এমনও সে ভাবল।

এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা তারা ভাবতেই পারছে না। সবাই বিচলিত। কেউ কেউ সর্ষেফুল দেখছে। বংশীদাকে দেখেই মনে হয়েছে এটা। সুহাস ফক্কার কাঠে হেলান দিয়ে বসে আছে। টোপাস হাজির। ডেক-জাহাজিরা দড়িদড়া বেঁধে ফাইভারের উপর থেকে বিশাল থামের মতো পড়ে থাকা লোহার ডেরিক উইনচ চালিয়ে তুলে নিচ্ছে। জাহাজ ওঠানামা করছে বলে ফাইভারের হাত দোল খাচ্ছিল। মাথাও। তাকালেই চোখে পড়ছে। চিফকুক সেকেন্ডকুক থেকে কারপেন্টার কেউ বাদ নেই। কেউ কথা বলছে না।

আর এ-সময় সেকেন্ড ইনজিনিয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন। ওয়াচ ছেড়ে আসতে পারছিলেন না। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন—এবং চিৎকার 'কে ডেরিক উপরে তুলল!'

এতক্ষণ কেউ ভাবেইনি, চালু জাহাজে কখনও ডেরিক তোলা থাকে না।

সত্যি তো। কে তুলল!

কিন্তু এ সব প্রশ্ন নিয়ে এ মুহূর্তে কারও মাথা ঘামাবার সময় নেই। কত তাড়াতাড়ি ফাইভারকে জলে ফেলে দেওয়া যাবে—অন্তত সবার ব্যস্ততা দেখে সুহাসের তাই মনে হল। দু'জন ডেকজাহাজি ছোট্ট একটা ট্রলিতে কাঠের বাক্স, কিছু ভারী পাথর এবং বস্তা নিয়ে হাজির। বোধ হয় কাপ্তানের নির্দেশেই ডেকসারেঙ সব বের করে এনেছেন। সুহাসের ইচ্ছেই করছে না, একবার উঠে গিয়ে সামনে থেকে দেখে।

ডেরিক যেখানে ভেঙে পড়েছে—কাপ্তান তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। খুঁটিয়ে দেখলেন। আপাতত তাঁর যে অনেক কাজ বুঝতেও কষ্ট হল না সুহাসের। কারণ তিনি বার বার চার্ট-রুমে ঢুকে যাচ্ছেন—তিনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে চিফমেট সেকেন্ডমেট। লগবুকে সব নোট করার কাজ চিফমেট করছেন। কখন, কটায়, কোথায় যাবার সময় দুর্ঘটনা ঘটল, তার উল্লেখ—কত তারিখ, কে ছিল পাশে এবং জাহাজিদের সাক্ষ্য প্রমাণসহ তিনি তাঁর লগবুক সম্পূর্ণ করে ফিরতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় নিলেন। ট্রেচারে আপাতত তুলে রাখা হয়েছে ফাইভারকে। ওর সোনালী চুলে রক্তের দাগ। মুখ থেকেও রক্ত উগরে দিয়েছে।

চক্ষু স্থির এবং খোলা।

সুহাসের একবার ইচ্ছে হয়েছিল, উঠে গিয়ে দেখে, ফাইভারের বুকপকেটে তার স্ত্রীর ছবি আছে কি না? সে তো সব সময় কাজে কিংবা কিনারায় বের হবার সময় বুকপকেটে স্ত্রীর এবং ছেলেমেয়েদের ছবি রাখত। এতে নাকি তার দিন ভাল যায়। কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। সে মনে করত, তার কোনও বিপদ ঘটবে না। আজ কাজে বের হবার সময় তা তার মনে ছিল কি না? কিন্তু তার পক্ষে ফাইভারের পকেট খুঁজে দেখা এ-সময় খুবই ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। সামান্য একজন জাহাজির এতটা ঔদ্ধত্য অফিসাররা ভাল চোখে দেখবেন না। কাপ্তানেরও মন মেজাজ ভাল নেই। কারই বা আছে। তার পক্ষেও দেখা সম্ভব নয় বলেই সে বসে থাকল। উঠল না। একমাত্র চার্লি পারত। চার্লি গেল কোথায়। একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল! একবার এসে দেখল না পর্যন্ত। এটা যে খুব খারাপ দেখায় চার্লি কি বুঝছে না! চার্লি এতটা নির্বোধ হতে পারে সে কল্পনাই করতে পারছে না।

ফাইভারকে কফিনে ভরার আগে সে দেখল, চিফমেট তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছেন। পকেট হাতড়াচ্ছেন। বুক পকেট থেকে টোবাকো এবং পাইপ বের হল। নীচের পকেট থেকে দুটো ছোট চিজেল এবং হাতুড়ি—না আর কিছু না। টোবাকোর পাউচে থাকতে পারে। কাপ্তানকে একবার বললে হয়, সার খুঁজে যদি দেখতেন। অবশ্য পরে সবই জানতে পারবে। তবে চার্লির এভাবে আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। তার একবার এখানে এসে দাঁড়ানো উচিত। ফাইভার তো তার সঙ্গে দাবা খেলত। একজন বান্ধব ছিল জাহাজে তার।

সে মনে মনে বলল, এটা কি উচিত কাজ! তোমার মন খারাপ হতেই পারে। আমরা কি খুব ভাল আছি। দাবা খেলার সময় তো তোমার পাশে বসলে ক্ষেপে যেত। তোমার পাশে বসি—ফাইভার পছন্দ করত না। কই আমি তো না এসে পারিনি! সে আর না পেরে উঠে দাঁড়াল। যদি কেবিনে থাকে—সে এসে দেখল, কেবিনের দরজা বন্ধ। তা সবার কেবিনই ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। সে খুটখুট করে আওয়াজ করল দরজায়। তারপর বলল, আমি সুহাস। তুমি কি চার্লি! একবার ফাইভারকে দেখলে না! সে কফিনে শুয়ে আছে।

ভিতর থেকে কোনও সাড়া নেই। তা হলে কি চার্লি ভিতরে নেই। আশ্চর্য, গেল কোথায়।

আর ফেরার সময় দেখল, চার্লি ব্রিজে ওঠার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখছে অপলক। মুখ কেমন রক্তশূন্য। চার্লি তা হলে ব্রিজে ছিল! কাচের ঘেরাটোপ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল! ব্রিজ থেকে সামনের মেনমাস্ট এবং চারটে উইনচই দেখা যায়। মাস্তুলের তলা আরও স্পষ্ট। এমনকি কে কে সেখানে ছুটে গেছে, তাও সে দেখতে পেয়েছে। চার্লি তাকে দেখে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। রেলিং ধরে কিছুটা নেমে থমকে দাঁড়াল।

'আমাকে খুঁজছিলে?'

'ভাবলাম তুমি কোথায়?'

'ব্রিজে ছিলাম।'

'একবার যাবে না ম্যাককে দেখতে?'

'না।'

স্পষ্ট উত্তর।

'যাওয়া উচিত।'

'তুমি আমাকে যেতে বলছ?'

এমন ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছে যে সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে বলার কে? সে বললে যাবে, না বললে যাবে না—এটাও যেন কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুহাসের পক্ষে। তা ছাড়া চার্লিকে তার ধন্যবাদ জানানো দরকার। কিন্তু এটা খুবই স্বার্থপরের মতো আচরণ করা হবে। চার্লি এতে ক্ষুব্ধ হতে পারে—সুহাস তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ, বলতেই পারে। মাস্ক আমাদের মধ্যে আর নেই। শোক করার সময়। শোক করার সময়ে কেউ নিজের কথা ভাবে না। এমন বলতেই পারে। অবশ্য চার্লি হয়তো জানে না, শোকের সময়ই মানুষ নিজের কথা বেশি ভাবে, নিয়তির কথা বেশি ভাবে—যাই হোক, চার্লিকে এ-সব কথা বলার কোনও অর্থ হয় না। চার্লি নিজে না গেলে তার বলাও উচিত হবে না, তোমার কিন্তু ম্যাকের পাশে একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত!

তারপরই মনে হল, সে তো চার্লিকে খুঁজছিল, ম্যাকের পকেটে তার স্ত্রীর সেই প্রিয় ছবিটি আছে কি নেই। ম্যাক আর তার স্ত্রী গির্জার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটা তাকেও দেখিয়েছে। এই নিয়ে হাসাহাসি কত। তার সরল বিশ্বাসের প্রতি সুহাসের কিছুটা অবজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ কেন যে মনে হল, ওটা পকেটে থাকলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হত না ম্যাক। না হলে সে ভাববে কেন, ওটা পকেটে আছে কি নেই। ম্যাককে রাতে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—সে কে? উইনচে কাজ করতে এসে তাও সে ভুলে গিয়েছিল—তার বলাই হয়নি, ম্যাক তুমি তাকে দেখেছ? তুমি জান কে তোমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ইস সে এতটা লঘু করে দেখবে বিষয়টা ভাবিইনি। অথচ রাতে এই নিয়ে তার কি না ত্রাস গেছে।

এটাই তার দোষ। তার কেন, সব মানুষের। দিনের বেলায় যেন কোনও ত্রাস থাকার কথা না। সারা জাহাজে কাজকর্মের ব্যস্ততা, কেউ একদণ্ড চুপচাপ বসে নেই। যে যার মতো কাজে ব্যস্ত। ডেকজাহাজিরা কেউ চিপিং করছে, কেউ রং করছে, কেউ জল মারছে। মাস্তুলের উপরে উঠে গেছে কেউ, দড়িদড়া গোছাতে কেউ ব্যস্ত। বাটলার ডাইনিং হল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে—গ্যালিতে রান্নার ঝাঁঝ। মনেই হয় না জাহাজে কোনও অশুভ প্রভাব থাকতে পারে। সকাল হলেই সে হাল্কা হয়ে গিয়েছিল—ম্যাককে একবার জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল, যে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, না সে পা ফসকে সত্যি পড়ে গেছে!

জাহাজে এটা অশুভ প্রভাব থেকে হচ্ছে, না, কোনও আত্মগোপনকারী আততায়ীর কাজ!

চার্লি বলল, 'চলো নীচে।'

চার্লি নীচে নামার সময় বলল, 'আমাকে খুঁজছিলে কেন?'

'ম্যাকের পকেটে ছবিটা আছে কি না যদি দেখতে!'

'কি হবে?'

'কি হবে জানি না। আমার তো মনে হয় ম্যাক আঁচ করতে পেরেছিল!'

'আঁচ করতে পেরেছিল, আঁচ করতে পারলে কি উইনচে মরতে যাবে স্ত্রীর ছবি পকেটে নিয়ে!'

সুহাস বুঝল, বুঝিয়ে লাভ নেই। চার্লি বুঝছে না, সত্যি যদি ত্রাসে পড়ে গিয়ে থাকে ম্যাক, তবে স্বাভাবিক কাজকর্মগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠবে। সাধারণত জাহাজে কাজ করার সময়, কিংবা জাহাজে ঘুরে বেড়াবার সময় সে স্ত্রীর ছবি সঙ্গে রাখে না। জাহাজটা তো তাদের কাছে বাড়িঘরের মতো। কিনারায় নামলেই, সে ছবিটা সঙ্গে রাখত। তার মাও তো সঙ্গে ঠাকুরের বেলপাতা দিয়েছে। কাজে নামার সময় কি সঙ্গে নেয়। নেয় না। সে ঠাকুরের বেলপাতা কিনারায় নেমে যাবার সময়ও সঙ্গে নেয় না। কারণ বালিশের নীচে আছে—বালিশের নীচে থাকলেই সে বেশি নিরাপদ। সারাদিন সে যেখানেই থাকুক, রাতে ঠাকুরদেবতার বেলপাতা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতে পারে। ঠাকুরদেবতার প্রতি তার তেমন আগ্রহ না থাকলেও ঠাকুরের ফুল বেলপাতাকে কেন যে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তার কোনও ভয় থাকার কথা না। এও আর এক উল্কি পরে থাকার মতো। ম্যাকের হাতে কিংবা বুকে, অথবা পিঠে কোথাও কোনও উল্কি আঁকা ছিল না। কাপ্তানের হাতে মা মেরির ছবি আছে। সেকেন্ড ইনজিনিয়ারের হাতে সে গির্জার ছবি দেখেছে। কেউ যিশুর মুখ উল্কিতে এঁকে নিয়েছে বুকে—যে যেমন বিশ্বাস করে থাকে। ম্যাক যদি রাতে টের পায়, কেউ তার পিছু নিয়েছে, তবে সে পকেটে স্ত্রী ছবি রেখে দিতে পারে। জাহাজও নিরাপদ নয় ভাবলে কাজের সময়ও পকেটে রেখে দিতে পারে। তবে সুহাস এ-সব ভেঙে বলতে চায় না। একবার দেখা দরকার, ম্যাকের কেবিনে যদি কিছু পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটা নিছকই দুর্ঘটনা, না কোনও পরিকল্পিত হত্যা, না জাহাজের অশুভ প্রভাবে এটা হয়েছে তার বোঝা দরকার। কারণ সে আঁচ করতে পারছে যদি পরিকল্পিত হত্যা হয়, তবে সেও জড়িয়ে আছে। একা ম্যাক নয়—অথবা ম্যাক অকারণে শিকার হয়েছে, সে বেঁচে গেছে। কিংবা দুজনকেই সরিয়ে দেবার তালে আছে অদৃশ্য ঘাতক।

কফিনে তখন পেরেক পোঁতা হচ্ছিল। তার শব্দ কানে আসছে। বড় বিশ্রী লাগছে। সারা জাহাজ কাঁপিয়ে দিচ্ছে হাতুড়ির শব্দ। কারপেন্টার দাঁতে চেপে রেখেছে কফিনের কাঠ মাপার দড়ি। সবাই ইতস্তত দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কেবল ইনজিনরুমে যারা আছে তারা উঠে আসেনি। কোনও নাবিককে সলিল সমাধি দেবার কি প্রক্রিয়া সে ঠিকঠাক জানে না। জাহাজটা সত্যি অজানা সমুদ্রের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে না থেমে আছে। বোঝা যায় না, ঠিক সামনে অথবা জাহাজের কিনারায় গিয়ে না দাঁড়ালে। প্রপেলারের শব্দে টের পায় সে, জাহাজ যাচ্ছে। পিছিলে দাঁড়ালে টের পাওয়া যায় প্রপেলার নীল জলের নীচে পাক খেতে খেতে অস্থির। এমনিতে চারপাশে তাকালে মনে হয় শুধু অসীম অনন্ত জলরাশি—আর কিছু না। মনেই হয় না জাহাজটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে। যেন থেমে আছে। জাহাজটা তার একজন নাবিককে সলিল সমাধি দেবার জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছে। কিছু উড়ন্ত মাছের ঝাঁক চোখে পড়ে যায়। তীব্র বর্শা ফলকের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে আবার জলের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিছু ডলফিনের ঝাঁক দূরে অদূরে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর মনে হয় আজ সমুদ্র বড়ই শান্ত। তার কোনও শোকতাপ নেই। এমন কি জলপায়রার

ঝাঁকও আর চোখে পড়ছে না—তারা তীরের কাছাকাছি কোথাও আবার ফিরে গেছে। শুধু বিশাল দু জোড়া অ্যালবাট্রস পাখি উড়ে আসছে। মানুষের অন্তিম সময় কি ভাবে কাটে দেখার জন্য এক জোড়া পাখি মাস্তুলের ডগায় এসেও বসেছে। তারা পাখায় ঠোঁট গুঁজে বিশ্রাম নিচ্ছে দেখলে এমন মনে হতেই পারে।

সুহাস দেখল চার্লি তার বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে। কারণ সে ম্যাকের টোবাকোর পাউচ হাতে নিয়ে কিছু যে খুঁজছে বুঝতে অসুবিধা হল না। যাক জানা যাবে, স্ত্রীর ছবি ওতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কি না ম্যাক।

ম্যাকের গায়ে নতুন কাপড় পরাবার আগে টোপাজ শরীরের রক্ত নোনা জলে ধুয়ে দিল। ডেকের রক্তও সে নোনা জলে সাফ করেছে। অন্তত ডেকের কোথাও আর রক্তের দাগ নেই। রক্ত কি কখনও খুনের গোপন রহস্য তুলে ধরতে পারে। এত পরিষ্কারই বা করা হচ্ছে কেন! থাক না, কাঠে কিছু রক্তের দাগ লেগে থাকলেও ম্যাক জাহাজে আছে এমন ভাবা যেতে পারত। তাও রাখা হবে না। টোপাজ নিখুঁতভাবে ডেক পরিচ্ছন্ন করে তুলছে।

টোপাজ কাজ দেখাচ্ছে এমনও মনে হল সুহাসের। আর তখনই চার্লি এসে খবর দিল, 'আছে।'

সুহাস বলল, 'ওটা তোমার কাছে রেখে দিয়ো।'

চার্লি টোবাকোর পাউচটা সামান্য আলগাভাবে ধরে আছে। কারণ এটা যে কোনও মৃত মানুষের পকেট থেকে কিছুক্ষণ আগে উদ্ধার করা হয়েছে চার্লির পাউচটি ধরে রাখার কায়দাতেই তা টের পেল সুহাস। খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছে না। এতেও হয়তো রক্তের দাগ লেগে আছে। এটা যে সে তার কেবিনে নিয়ে যেতে পারবে না, নিয়ে গেলেও রাতে ঘুমাতে পারবে না, চার্লির ভাবভঙ্গিতেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

চার্লি কি ভেবে বলল, 'না রাখা যাবে না। আমার ঘরে রাখতে পারব না। তা ছাড়া দেবে কেন রাখতে?'

'কার কাছে থাকবে?'

'ওর কেবিনে রেখে দেওয়া হবে। যা ম্যাকের ছিল, সব কিছুই তার কেবিনে রেখে দেওয়া হবে।'

ম্যাকের কেবিনে থাকলেও সুহাসের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি এটি পরিকল্পিত হত্যা হয়ে থাকে—তবে ম্যাকের কেবিন থেকে ছবিটা চুরি যাওয়াও বিন্দুমাত্র অসম্ভব না। তা ছাড়া ছবিটার সঙ্গে দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে এমনই বা ভাবছে কেন। তবে ম্যাক স্বাভাবিক ছিল না এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। হয়তো কিছু আঁচ করেছিল।

সুহাস বলল, 'চাবি কার কাছে থাকবে?'

'যেমন থাকে, চার্টরুমে থাকবে।'

সব চাবিগুলি চিফমেটের এক্তিয়ারে। কেউ চাবির গোছা ঝুলিয়ে রাখে। ডুপ্লিকেট চাবির সবগুলিই কেবিনের নম্বর অনুযায়ী বোর্ডে রেখে দেওয়া হয়। এখন থেকে সব কেবিনেরই একটি মাত্র চাবি বোর্ডে ঝুলে থাকলেও ম্যাকের থাকবে দুটো চাবিই। কারণ চাবিটা কোথায় ম্যাক রেখেছে তা নিয়ে খোঁজাখুঁজি হবে। ম্যাকের কেবিনেও ঢোকা হবে। কেবিনে তার

কি কি আছে তারও তালিকা করা হবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে চাবিটার। চাবিটা খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি।

সহসা জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল।

জাহাজ সত্যি থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র তিন নম্বর সুখানি ছাড়া কেউ এখন জাহাজে কর্তব্যরত নয়। এমনকি ইনজিন-রুম থেকেও সবাই উঠে এসেছে। সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। বয়লার রুমেও কেউ নেই। কয়লার বাঙ্কারও খালি।

চিফমেট ডেকসারেঙকে ডেকে কি বললেন। সুহাস শুনতে পায়নি। জাহাজে ডিউটির সময় অফিসারদের ইউনিফরম পরে থাকতেই হয়, যাঁরা ডিউটি দিচ্ছেন না, তাঁরাও যে যার ইউনিফর্ম পরে নেমে এসেছেন। সেই ব্যস্ততা আর যেন কারও মধ্যে নেই। কারণ সুহাস যখনই দেখে, দেখতে পায় গট গট করে এক একজন অফিসার অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন উঠে যাচ্ছেন। কেউ সুস্থিয়ালা নয়। চলাফেরায় অত্যন্ত মেজাজি সবাই। তারা কেউ নেমে এলেই বুটের খটাখট শব্দ শুনতে পায়। নেভি ব্লু সার্জের তৈরি ঝকঝকে দামি পোশাক। মাথায় সাদা অ্যাঙ্কারের টুপি, পায়ে সাদা বুট পদমর্যাদা অনুসারে কারও কোটে একটা দুটো তিনটে সোনালি স্ট্রাইপ। সাধারণ জাহাজিদের পোশাক বলতে, নীল রঙের কম্বলের প্যান্ট আর সোয়েটার। তবে আজ সবাইকে নীল রঙের টুপি পরতে হয়েছে। সেও পরে এসেছে। আর সবাই কেমন সুস্থিয়ালা—সহসা সবাই যেন মিইয়ে গেছে।

কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে গেল। ডেকসারেঙ মুসলমান জাহাজিদের নামাজ পড়ার ইঙ্গিত দিলেন। তারা সবাই একদিকে। মুখার্জিদা তিন নম্বর সুখানি বলে ব্রিজ থেকে নেমে আসতে পারেননি। সে দেখল, মুখার্জিদা তাকে হাতের ইশারায় কি যেন বলতে চাইছেন। সুরঞ্জন অধীরও তাকাল। তারা জাহাজের বাঙালিবাবু। অর্থাৎ হিন্দু জাহাজিরা সবেমাত্র জাহাজের লাইনে আসছে—তাদের সারেঙ থেকে টোপাজ ডাক খোঁজ করার সময় বাঙালিবাবু বলেই ডাকে। মুখার্জিদা হয়তো বাঙালিবাবুদেরও এই সময় কিছু করণীয় থাকে এমন বোঝাতে চাইছেন। বংশীদাও চায় না ম্যাকের অন্ত্যেষ্টিতে কোনো খুঁত থাকুক।

এমনিতেই বংশীদার ধারণা, জাহাজটা বিশমার্ক সি-তে আসলে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অজানা সমুদ্রে। তার আতঙ্কে খুবই ফাঁপরে পড়ে গিয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করছে বংশীদা। তার কাছে মানুষ মরে গেলে আর জাত থাকে না। সুতরাং অন্ত্যেষ্টির সময় তার ধর্মমতে কিছু না করলে বাঙ্গালি নাবিকেরা বিপাকে পড়ে যেতে পারে। অশুভ প্রভাবে তারা পড়ে যেতে পারে। ছিল লুকেনার, আর ছিল বরফঘরের সেই লাশ, এবারে ম্যাকও তাদের প্রভাবে চলে গেল। অন্তত তার অন্ত্যেষ্টিতে হিন্দু ধর্মমতে কিছু না করতে পারলে খুবই ঝামেলার আশঙ্কা। কি ভেবে যে বংশীদা একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে কফিনের কাঠে রাখার সময় বলল, ম্যাক এই আমাদের রীতি। আমরা শবদাহ করি। মুখাগ্নি করি। আমরা যা জানি, সেইমতো সবার হয়ে তোমার মুখাগ্নি করলাম, তোমার আত্মার মুক্তি হোক। শান্তি হোক।

সবশেষে ডেক—অফিসাররা, ইনজিনিয়াররা ম্যাকের কফিনের পাশে দাঁড়ালেন। কাপ্তান প্রার্থনা করলেন, মে গড আওয়ার ফাদার শোয়ার ইউ উইথ ব্লেসিং অ্যান্ড ফিল ইউ উইথ হিজ গ্রেট পিস্। ভারী সব পাথরে ভর্তি কফিনটি এবার অফিসাররা কাঁধে তুলে

নিলেন।

তাঁরা হাঁটছেন।

তারাও হাঁটছে পিছু পিছু।

ফরোয়ার্ড পিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ম্যাককে। শেষে ধীরে ধীরে রশি বেঁধে কফিনটি জলে ছেড়ে দেওয়া হল। সবাই শেষবারের মতো দেখল অনন্ত সমুদ্রের গর্ভে ম্যাক অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে।

চার্লি দৌড়ে চলে আসছে।

সুহাস দেখল, মুখার্জিদাও নেমে এসেছেন। তাঁর ডিউটি শেষ। তিনি নেমে বললেন, 'যাক, ম্যাককে যে বুদ্ধি করে আগুনে ছুঁইয়ে দেওয়া গেল। বংশী কোথায়?'

সুহাস বলল, আসছে।

বংশীদা কাছে এলে মুখার্জিদা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'যাক একটা কাজের কাজ করেছিস। আমার তো মাথায় আসছিল না কি করা যায়। ম্যাক অপঘাতে মারা গেল। তার আত্মার সদ্গতির বড়ই দরকার ছিল। তুই যে বুদ্ধি করে আগুনে ছুঁইয়ে দিয়েছিস—তুই না থাকলে হত না। আমি তো ইশারায় বললাম, আমাদের পক্ষে কিছু একটা করা দরকার। কেউ বুঝতেই পারছে না। যাক তোমরা সবাই সোজা বাথরুমে চলে যাও। আমিও যাচ্ছি। আগুনে হাত সেঁকে ফোকসালে ঢুকবে। জাহাজে আছ বলে নিজেদের দিগগজ ভাববে না। যা খুশি তাই করে পরে পস্তাবে না।'

কাজেই স্নানটান করা দরকার। ম্যাকের কেবিনে যাওয়া দরকার। চার্লি যদি ম্যানেজ করতে পারে। চার্লিকে ডেকে সুহাস বলল, 'একটা কাজ করতে পারবে?'

চার্লি বুঝতে পারছে না, কি কাজ।

চার্লিকে বলাও যায় না—কাজটা কিছুই না—তবে কেবিনে ঢুকে দেখা দরকার। সে তার স্ত্রীর ছবি জাহাজে কাজের সময় পকেটে রাখত না। আজ কাজে আসার আগে সেটা নিল কেন? এতে তার মতিভ্রম প্রমাণিত হয়। তুমি কিছু বুঝতে পারছ, কি বলতে চাইছি। মতিভ্রম বলা বোধহয় ঠিক হল না—সে ভেবেছে, জাহাজেও সে নিরাপদ নয়। কিনারায় নিরাপদ নয় বলেই তো পকেটে ছবিটা রাখত! কিন্তু জাহাজে কেন!

আসলে ছবির সঙ্গে কেবিনের এই একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। ম্যাক ছবিটার কথা সবাইকে বলেছে—যদি জাহাজের কেউ হয়ে থাকে, তবে সেও জানে ছবিটা সম্পর্কে তার বিশেষ দুর্বলতা আছে। এবং এই ছবিটা পকেটে থাকা মানে, সে তবে সত্যি কিছু আঁচ করেছিল। জাহাজে সে নিরাপদ নয় বলেই সঙ্গে ছবিটা নিয়েছিল। ছবিটা সবাইকে দেখিয়েছিল। গির্জার ছায়ায় দুই নারী পুরুষ এবং ছবির মতো সব ফুল পাখিরাও রয়েছে। মুখে নারীর পবিত্র হাসি। গির্জার মতোই তারা পবিত্র। তার শিশুরাও বাদ নেই। তারাও সঙ্গে আছে। অন্তত শিশুদের কথা ভেবে ঈশ্বর তাকে সব দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবেন এমন সে ভাবতেই পারে। তারা তো কোনও দোষ করেনি। যদি কখনও এই মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন ছবিটা রাখা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জাহাজে তবে ম্যাক নিরাপদ ছিল না। ছবিটা চুরি হয়ে গেলে কোনও প্রমাণ থাকবে না। কারণ ছবিটার মধ্যে ম্যাকের ঈশ্বর-বিশ্বাসের এবং দৈব থেকে আত্মরক্ষার এক সবিশেষ কৌতূহল থেকে গেছে।

সুতরাং চাবিটা যাতে হস্তান্তর না হয়, চুরি না যায় সেটা দেখা দরকার।

চার্লি বলল, 'কি কাজ করতে বলছ? বলে আর কথা বলছ না। চুপ করে আছ। কি ভাবছ কেবল!'

'না মানে বলছিলাম, কাপ্তান ম্যাকের কেবিনে কখন ঢুকবেন বলতে পার!'

'জিজ্ঞেস করব।'

'আমাকে খবর দিতে পারবে?'

'কি হবে খবর দিয়ে!'

যেতাম একবার। যদি সঙ্গে থাকি তিনি কি রাগ করবেন?'

'রাগ করাই তো স্বাভাবিক।'

'তা হলে তো মুশকিল।'

'শোনো সুহাস আমার মন মেজাজ ভাল নেই। তোমরা ভাবছ আমি ঘোরে পড়ে দেখি। তোমার মুখার্জিদা আমাকে নিয়ে তামাসা করেন। তবে বলে রাখছি, আমি ভাল বুঝছি না।'

'আরে মুখার্জিদার কথা বাদ দাও। বললাম, লোকটার চুল সাদা, বললাম, গোঁফ সাদা অথচ লোকটার শরীর অত্যন্ত মজবুত। অন্তত আবছা অন্ধকারে দেখলে তাই মনে হয়। তিনি কি বললেন জানো, জাহাজে সবাই নানা কিসিমের লোক দেখে বেড়াচ্ছে, চার্লি শেষে একজন গোঁফয়ালা বাবরি চুলয়ালা জোয়ান মানুষকে দেখছে! কেন তোর মতো বোটডেকে কোনো সুন্দরীকে দেখতে পারে না! চার্লিটা সত্যি অপদার্থ।

চার্লি গুম মেরে গিয়ে বলল, দাঁড়াও কোয়ার্টার মাস্টারকে দেখাচ্ছি মজা। এবার চার্লি কেন যে মুখার্জিদা বলল না, কোয়ার্টার মাস্টার বলল বুঝতে অসুবিধা হল না। সে যে কাপ্তানের পুত্র এটাই যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে। তা মজা দেখাতে পারে। চার পাঁচ মাস আগেও সে মজা দেখাতে পারত। ল্যাঙ মেরে ফেলে দিতে পারত। সহসা দড়িতে ঝুলে সুখানির কাঁধে পা রেখে রেলিঙ ধরে ফেলতে পারত। এখন যে ইচ্ছে করলে পারবে না, তা কে বলবে। নিমেষে কাজটা করে ফেলে সে। বুঝতেই দেয় না কাঁধে পা রেখে রেলিং টপকে মেসরুম পার হয়ে দ্রুত ছুটে গেল কে!

চার্লি রেগে গেলে পারে। মুখার্জিদার উপর খেপে গেলে সে মজা দেখাতেই পারে। এমনিতেই জাহাজে নানা জটিলতা, চার্লিও ভাল নেই। খেপে গিয়ে আবার কি ঝামেলা পাকাবে ভেবেই বলা, 'আরে মুখার্জিদার কথা ধরতে নেই। কখন কি মুড বোঝা মুশকিল। কখনও অপদেবতায় বিশ্বাস থাকে না, কখনও অপদেবতার ভয়ে আগুনে হাত সেঁকে ফোকসালে ঢুকতে বলে। মুখার্জিদাকে কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

চার্লি বলল, 'তুমি কখন বললে তাকে—আমি লোকটাকে দেখতে পাই?'

'সকালে কাজে যাবার সময় বললাম।'

'এ-সব কথা কেন বলতে যাও বুঝি না সুহাস! সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়বে।'

'না। মুখার্জিদা বলেছেন, কাউকে বলবেন না। তিনি শুধু বললেন, ম্যাকের মুখোসগুলি দেখা দরকার।'

'কি বলছ? মুখোস দেখে কি হবে?'

আমিও বুঝছি না। মুখোস দেখে কি হবে? ম্যাক তো চলেই গেল। দ্যাখো যদি মুখোস পাও—ম্যাকের মুখোসগুলি তাকে দেখাতে পারো কি না। ওতে কি হতে পারে আমিও বুঝছি না। মুখার্জিদা আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় আছেন কেন তাও বুঝছি না। বললেন, আমি তো ভাবলাম তুই থেঁতলে গেছিস।

আট

রাতেই মুখার্জিদার মাথায় কি পোকা ঢুকে গেল কে জানে! বিছানাপত্র নিয়ে পাশের একটা পরিত্যক্ত ফোকসালে উঠে এলেন। একটা মজবুত ব্যাঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই। আর আছে একটা লকার। পোর্টহোলের কাচ ভাঙা। ঝড় ঝাপটায় জল পর্যন্ত ঢুকে যায় ঘরে। এমন একটা ফোকসালে কেউ থাকতে পারে! মুখার্জিদা লকারটা সাফসোফ করছেন। সারেঙের কাছে গেলেন একবার। যদি লকারটার চাবি থাকে। সারেঙ বলেছেন, খুঁজে দেখতে হবে।

তিনি ফিরে এসেছেন। লকারটা খোলা পড়ে থাকে। নোংরা জামাকাপড়ও পড়ে আছে কার—তিনি জামাকাপড় তুলে বললেন, এগুলি কার? নিয়ে যেতে বল।

সুহাসকেই বলা, কারণ সুহাস সেই থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে না বলে পারল না, এভাবে এক কথায় সুরঞ্জনের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসার কোনও মানে হয়। জানোইতো ওর চ্যাংড়ামি স্বভাব। ফোকসালে আছেটা কি, থাকবে!'

মুখার্জিদা কোনও কথারই জবাব দিচ্ছেন না। শুধু বললেন, 'বকর বকর করবি না। যা বলছি কর। দ্যাখ কোন বাবু তার নোংরা জামাকাপড় এতে রেখে দিয়েছেন। নিয়ে যেতে বল!'

সুরঞ্জন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। সুহাস সুরঞ্জনের দরজায় গিয়ে বলল, 'তোর জামা প্যান্ট নিয়ে আয়। যা খেপে আছে, সব না পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়। কি হয়েছে, মুখার্জিদা তোমার ফোকসাল থেকে চলে গেল!'

'জিজ্ঞেস কর না কি হয়েছে! কি বলেছি আমি। শুধু বললাম তুমি সবই বেশী বোঝ। তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ব্যস খেপে লাল।'

এত সামান্য কথায় খেপে যাবার মানুষ নন মুখার্জিদা। সারেঙ টিন্ডেল কেউ বাদ যায়নি, সবাই এসে অনুরোধ করেছে, আরে একসঙ্গে থাকলে কথা কাটাকাটি হবে, ঠোকাঠুকি হবে, আবার মিলমিশও থাকবে। অযথা মাথা গরম করবেন না সুখানি। ন্যাড়া বাঙ্কে শোবেন কি করে। ম্যাট্রেস নেই, ঝুলকালিতে কি হয়ে আছে। পাশের দুটো বাঙ্কই নড়বড়ে। বুড়ো মানুষের নড়া দাঁতের মতো কেবল খটর খটর করছে। অসুবিধা হলে সুহাসের ফোকসালে চলে যান। ওদের তো একটা বাঙ্ক খালি।

সারেঙসাব বুঝিয়েছেন, টিন্ডাল, ভাণ্ডারি কেউ বাদ যায়নি। কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ, ভাঙবেন তো মচকাবেন না। তাঁর এক কথা, 'মানুষ না বুঝলেন, সেদিনের যোগী ভাতেরে কয় অন্ন। আমি নাকি ডগ-ওয়াচ মিড-ওয়াচও বুঝি না।'

'ওরা বোঝে। এই সুরঞ্জন তুই তিন নম্বর সুখানিকে কি বলেছিস।' সারেঙ তেড়ে গিয়েছিলেন সুরঞ্জনদের ফোকসালে। অধীরই সুরঞ্জনের হয়ে বলল, 'দেখুন সারেঙসাব এমন কিছু হয়নি, যাতে মুখার্জিদা হড়বড় করে সব নামিয়ে বলতে পারেন ব্যাটারা থাক,

আমি চললাম।'

ডগ-ওয়াচ মিড-ওয়াচ নিয়ে কি কথা কাটাকাটি হতে পারে। অবশ্য এখন কিছু বললে, মুখার্জিদা আরও তেতে উঠবেন। অবসরমতো অধীরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে। সে সুরঞ্জনকে বলল, দেরি করিস না, শিগগির তোর জামাকাপড় নিয়ে যা। তোরই মনে হয়।

সুরঞ্জন সোজা ঢুকে লকার থেকে জামাকাপড় নিয়ে গেল। যেন মুখার্জিদাকে চেনেই না। মুখার্জিদাও কোনও কথা বললেন না। সুরঞ্জন চলে গেলেবললেন, 'তোফা—বেশ জব্দ। চ্যাংড়ামি আমার সঙ্গে। থাক তোরা। জাহাজে জায়গার অভাব।' বলেই সুহাসের দিকে তাকালেন—'যা তো একবার। ওদের বলগে লকার থেকে আমার রেশনের চা চিনি যেন বের করে দেয়। আমার দুটো হ্যাঙ্গার আছে। ও দুটোও নিয়ে আসবি।'

এমন করছে মুখার্জিদা যেন সুরঞ্জনদের ফোকসালে তাঁর ঢোকাও পাপ। কিছুতেই ঢুকবেন না। বিশাল লেদার সুটকেসটা লকারের মাথায় রেখে দিয়েছেন আগেই। সুহাস হ্যাঙ্গার দুটো নিয়ে আসার সময় কেষ্ট বলল, 'দাদার গামছা। গামছা ফেলে গেছে।'

'তোমার গামছা দাদা।'

'হ্যাঁ গামছাটা ফেলে এসেছি। দে।' গামছাটা নিয়ে মুখার্জিদা বললেন, 'দ্যাখ তো আমার আর কিছু পড়ে থাকল কি না।' বলে তিনি সুটকেস নামিয়ে খুলে কি দেখলেন, আর যেন মনে মনে কি অঙ্ক কষছেন। সুহাস বলল, 'তোমার এক জোড়া মোজা পড়ে আছে।'

'রেখে দে।'

'আচ্ছা কি হয়েছে বলবে তো?'

'কিচ্ছু হয়নি। তুই কি বলেছিলি!'

'কি বলব?'

'কি বলব! খুব আনন্দে আছ দেখছি। সব ভুলে যাও। বলেছিলাম না, ম্যাকের ডুপ্লিকেট চাবিটা যদি হাত করতে পারিস?'

'কখন বললে? আর বললেই পাওয়া যাবে কেন? চাবিটা তোমাকে দেবে কেন। চাবি দিয়ে কি করবে?'

সত্যি তো চাবি দিয়ে কি হবে। খুবই যেন বোকার মতো কথা বলে ফেলেছেন। কি ভেবে বললেন, 'যা উপরে—পারিস তো এক কাপ চা খাইয়ে যেতে পারিস। এখন আমি শুয়ে পড়ব। যা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামবে বলে মনে হয় না!'

আর তখনই ছলাত করে এক ঝটকা সমুদ্রের জল পোর্টহোল দিয়ে ভিতরে এসে পড়ল। মেঝের কিছুটা ভিজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তড়ক করে মুখার্জিদা উঠে পড়লেন। ছেঁড়া জামা প্যান্ট দলা পাকিয়ে ঠেসে দিলেন পোর্টহোলে। উপস্থিত বুদ্ধি এত প্রখর দাদার যে সুহাস কিছুটা অবাকই হয়ে গেল। আরও অবাক হল দেখে, নিশ্চিন্তে দাদা শুয়ে পড়েছেন বাঙ্কে। বুকের কাছে হাত জড়ো করে রেখেছেন আর পা নাচাচ্ছেন। দু-হাতের আঙুল নাচাচ্ছেন। এই সব মুদ্রাদোষ দাদার আছে। সে তা ভালাই জানে। কোনও পরিকল্পনা মাথায় এলে তার মধ্যে এই মুদ্রাদোষগুলি দেখা দেয়। হঠাৎ উঠে বসে বললেন, 'শোন, চার্লি আর কি বলল। চার্লি যা বলবে সব বলবি। কিছু গোপন করতে যাস না। ডগ-ওয়াচ দিয়ে

ফেরার সময়ও দেখেনি ডেরিক তোলা আছে।'

ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফিরে আসার সময়ও দেখেনি? কে দেখেনি। কি দেখেনি। ডগ-ওয়াচের কথা উঠছে কেন। সুহাস পাশের বাঙ্কটায় বসতে গেলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সুহাস উঠে পড়ল। বাঙ্কটা ঠেলে তুলল কিছুটা। নীচে সামান্য সাপোর্ট দিতে পারলে বাঙ্কটা ব্যবহার করা যেত। ঘরে কিচ্ছু নেই, সাপোর্ট দেবার প্রশ্নই আসছে না। সে মুখার্জিদার পায়ের দিকে গিয়ে বলল, পা ওঠাও। বসব।

মুখার্জিদা পা তুলে নিলেন।

জাহাজ খুবই ওঠানামা করছে। ঝড়ের দাপট রাত যত গভীর হবে তত বাড়বে মনে হল। সুরঞ্জন হঠাৎ দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় খটাস করে বালতি মগ রেখে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বালতি ফোকসালের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। ঝড় প্রবল হচ্ছে বোঝা যায়। কারণ মাথার উপরে ছাদের মতো জায়গাটায় তাদের গ্যালি। গ্যালিতে হুড়মুড় করে কি পড়ল।

মুখার্জিদা উঠে পড়লেন।

বললেন, 'দেখলি তো।'

সুহাস বালতি মগ দুটো ধরে ফেলল। কি কর্কশ শব্দ। আর স্টিয়ারিঙ ইনজিনের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। কক্ কক্। সব পেনিয়ান জোড়াতালি দিয়ে হালটাকে ধরে রেখেছে যেন। যে কোনও মুহূর্তে পেনিয়ান চুরমার করে দিতে পারে ঝড়ের দাপট। সে মগটা বালতির ভিতর রেখে লকারের এক কোণায় রেখে দিল। কিছুটা ঢালু বলে, বালতিটা জাহাজের দুলুনিতে একটু আধটু নড়ল, তবে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেল না।

সুহাস বলল, 'ডগ-ওয়াচ নিয়ে পড়লে কেন বুঝি না। কার ওয়াচ ছিল?'

'আরাফতের ওয়াচ গেছে।'

ডেক জাহাজি আরাফত ডগ-ওয়াচ থেকে ফেরার সময় তবে দেখেছে, ডেরিক নামানোই ছিল। এত রাতে ওয়াচ দিয়ে ফেরার সময় কারও কি খেয়াল থাকারা কথা ডেরিক তোলা আছে, না নামানো আছে? কি জানি।

সুহাস বলল, 'ঠিক দেখেছে তো?'

'তাই তো বলল।'

এত দুলছে জাহাজটা যে লকারের উপর লেদার সুটকেসটা পর্যন্ত নড়ানড়ি শুরু করে দিয়েছে। ভাঙা বাঙ্কগুলির রড, রেলিংও দোল খাচ্ছে। মাথার উপর না পড়ে। সুটকেসটা নামিয়ে রাখা দরকার। মেঝেতে জল গড়াগড়ি খাচ্ছে, রাখবে কোথায়। এমন একটা বসবাসের অযোগ্য ফোকসালে মুখার্জিদা থাকবেন কি করে সে বুঝতে পারছে না। গলা বাড়িয়ে ডাকল, 'মগড়া আছিস!'

টোপাজ মগড়া পাশের একটা ফোকসালে একা থাকে। গাঁজা খায় রাতে। তার গন্ধ এত তীব্র যে ফোকসালের ভিতর ঢোকে কার সাধ্য। সঙ্গে দুজন মহাবীরের ছবি। সাধুসন্ত সে বলে না। বলে মহাবীর। সে রোজ স্নানটান সেরে দুটো ফটোতেই সিঁদুর লেপে দেয়। এটাই তার পূজা আর্চার ঢং। তার ফোকসালে ঢুকলেও সে রাগ করে। ঘরেই থাকে তার ঝাঁটা বালতি। সারাদিন কনুইয়ে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাজ করুক না করুক, ঝাঁটা বালতি

যতক্ষণ তার হাতে আছে ততক্ষণই সে ডিউটি দিচ্ছে।

নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে সাড়া দেবে না, সুহাস ভালই জানে। অথচ মেঝের জল মুছে না নিলে ফোকসালে পা দেয়া যাবে না। সে তার চটি যেদিকটায় জল গড়ায়নি সেদিকে ঠেলে দিয়েছে। মুখার্জিদার জুতো এবং চটি জোড়াও সে সরিয়ে রেখেছে। অবাক মগড়া এক ডাকেই সাড়া দিয়েছে। সে এসে কি দেখল, তারপর ছুটে গেল তার ফোকসালে। শুকনো কাপড় দিয়ে মেঝেটা মুছে দেবার সময় বলল, 'গতিক ভাল বুঝছি না দাদা। পাঁচ নম্বর সাব বেঘোরে জানটা খতরা করে দিল। ডেরিক মাথা টুটে গেল সাহেবের। ডেরিক তো তোলা থাকে না।'

মুখার্জিদা বললেন, 'ভর ধরেছে, বেটা নেশা করতে ভুলে গেছিস। ভাল মানুষ সেজে বসে আছিস।' তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝলি টোপাজও বোঝে। কোথাও গোলমাল আছে।'

কোথাও যে গোলমাল আছে সেও বোঝে। না বুঝলে চার্লিকে বলবে কেন, ম্যাকের কেবিনে একবার যেতে পারলে ভাল হত। অথচ সে ভেবে পায় না, কেবিনে কি খোঁজাখুঁজি করবে। ছবিটা নিয়ে শিরঃপীড়ারও কি কারণ থাকতে পারে—তাও সে সঠিক বুঝল না। আসলে ছবিটা পকেটে রাখায় তার মনে হয়েছে ম্যাক হয়তো জানত, কে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—কিন্তু আতঙ্কে বলতে পারেনি। দৈবনির্ভর জীবন। এমন পাকা হিসাবই যত গন্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। সফরে বের হলে ছবিটা সঙ্গে নিয়ে বের হয়। জাহাজিদের দুর্যোগের শেষ থাকে না। হয়তো ভেবেছিল, ভয় কি, সে তো তার বিশ্বাসমতো কাজ করে যাচ্ছে। দেখাই যাক না, উৎপীড়নকারী কতটা বাড়তে পারে।

সে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। ঝড়ের দাপটে জাহাজ যেন সত্যি বেঘোরে পড়ে গেছে। বিদ্যুতের ঝলকানিও টের পাচ্ছে। মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো। মুহুর্মুহু কড়কড় করছে বজ্রবিদ্যুতের আর্তনাদ। সে রেলিং চেপে বসে আছে। কারণ সব সময় জাহাজের উথাল পাতালে ব্যাঙের মতো লাফাতে কার ভাল লাগে। জাহাজ সমুদ্রে নেমে এলেই মদো মাতালের মতো হাঁটতে হয়। সব সময় মনে হয় একটা দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটা যায় না। আর দুর্যোগ দেখা দিলে তো আরও কঠিন ডেক ধরে হেঁটে যাওয়া।

মুখার্জিদা চুপ। কি যেন ভাবছেন। সুরঞ্জন খবর দিয়ে গেল, খানা রেডি। ওদের 'বিশু' নীচে পঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখার্জিদা এবং সুহাস যেন খেয়ে নেয়।

সুহাসের দিকে মুখার্জিদা তাকিয়ে বললেন, 'যাতো', বলে তাঁর ডিস এবং গ্লাস লকার থেকে বের করে দিলেন। সুরঞ্জনদের সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ। বেশ চলছে যা হোক।

সে বলল, 'এসো, খেয়ে নেবে।'

'নিয়ে আয় না।'

'যাওয়া যায় বলো! কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়লে সব যাবে। এসো না।'

কোনওরকমে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে মুখার্জিদা বললেন, 'চার্লিকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন বুঝি না। তুই ওর সঙ্গে বেড়তে যাস কেন। গোরারা ভাল হয় না জানিস। চার্লি তোর এত প্রাণের বন্ধু হয় কি করে।'

চার্লিকে নিয়ে তার মাথা ব্যথা না থাকারই কথা। তবু চার্লি তাকেই সব বলে, চার্লি তার বিপদ আপদের কথাও ভাবে। কেউ যদি বলে, থাক তোমাকে আর জড়াতে চাই না, খারাপ লাগে না। সে জড়াবে কেন? তার সঙ্গে কারও শত্রুতাও থাকার কথা না। তার ঠাকুরদাও ধনকুবের নন, তাছাড়া সে কোনও পাহাড়ি এলাকায় বুনো ফুলের উপত্যকাতেও একা মানুষ হয়নি। বেটসি বলে তার কোনও পিসিও ছিল না। মোটর দুর্ঘটনায় সে মারাও যায়নি। চার্লি তো বলল, মোটর দুর্ঘটনা না খুন সে বুঝতে পারছে না।

সে থালা গ্লাস ধুয়ে এনে তার লকারে রেখে দিতে গেল।

মুখার্জিদার থালা গেলাসও ধুয়ে এনেছে। সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠাও ঝকমারি। কেবল ঝাঁকাচ্ছে। পড়ে যেতেই পারে। তবু সে খুব সন্তর্পণে সব কাজ সেরেছে। মুখার্জিদার বারোটা-চারটা ওয়াচ। সে ঘড়িতে দেখল নটা বাজে। রাত নটায় ঝড় না থাকলে জাহাজিরা ডেকে বসে এখন চিল্লাচিল্লি করত। তাস পেটাত। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না বলে সবাই শুয়ে পড়েছে। ঠিক সাড়ে এগারটায় 'টান্টু'। দু নম্বর সুখানি নেমে আসবে ব্রিজ থেকে, যাদের ওয়াচ আছে, তাদের জাগিয়ে দেবে। মুখার্জিদার এখন শুয়ে পড়ার কথা। ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু উঠতে গেলেই এক কথা, বোস না। সে চলে যেতে পারছে না। বসতে বলছেন, অথচ চুপ করে আছেন।

হঠাৎ মুখার্জিদা পাশ ফিরে শুলেন। তার দিকে তাকালেন। 'তোর কি মনে হয় তুই টার্গেট?'

'একথা বলছ কেন?'

'না, যেভাবে ভেঙে পড়ছিলি! তুই তো লোকটাকে দেখিসনি?'

'না।'

'তুই না দেখলে ঘাবড়ালি কেন?'

'জাহাজে কোনও অজ্ঞাত লোক উঠে এসেছে শুনলে ভয় লাগে না।'

'জাহাজে উঠে এসেছে! উঠুক না।'

সে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, 'চার্লি তো তাই বলল। কাকে সে খুঁজছে। লোকটা তাকে অনুসরণ করছে। তোমাকে তো বলেছি।'

মুখার্জিদা উঠে বসলেন, 'তোর পোর্টহোলে কেউ উঁকি মারছে কি?'

'না, তা অবশ্য মারেনি।'

'তবে তুই এত ঘাবড়ে গেলি কেন?'

যেন কথা বের করতে চাইছেন। সুহাস বলল, 'তুমিই তো বলছ, ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফিরে আসার সময়ও পরিদার দেখেনি, ডেরিক তোলা আছে। তোমার হলে বুঝতে।'

'ধুস কিচ্ছু বুঝছিস না। সে ভোর রাতের ব্যাপার। তুই তো ঘাবড়ে গেছিস, লোকটা চার্লির পোর্টহোলে অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছিল তাই শুনে। সে তো গেল রাতে।'

'গেল রাতেই তো সব একের পর এক কান্ড জাহাজে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কত কিছু ঘটে গেল।'

'দ্যাখ সুহাস আমি এত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই। সোজাসুজি বল, পোর্টহোলে চার্লি

দেখেছে তুই দেখিসনি!'

'না, বললাম তো!'

'তোর খেতে ইচ্ছে হল না কেন!'

'চার্লি বিপদে পড়ে গেলে আমি ঘাবড়ে যাব না! কাপ্তানের ব্যাটারই যদি এত আতঙ্ক থাকতে পারে, আমারও যে থাকবে না, হয় কি করে। আমিও তাকে দেখে ফেলতে পারি। সে কেন উঠে এল তাই বুঝছি না।'

'চার্লি আর কিছু বলেছে?'

'বলেছে।'

'কি বলেছে বল?'

'চার্লির ঠাকুরদা একজন ধনকুবের।'

'ধনকুবের মানেই তো পাপ আছে বংশে। জানিস না, দেয়ার ইজ ক্রাইম বিহাইন্ড এভরি ফরচুন। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। চার্লিকে ছাড়বে কেন।'

'ধুস তোমার গোয়েন্দাগিরি আমার ভাল লাগছে না। কি জানতে চাও বল তো। ধনকুবের হলেই পাপ আছে ধরে ফেললে। ওর ঠাকুরদা তেমন মানুষই নন। মানুষটা অদ্ভুত প্রকৃতির। কোথায় মার্কিন মুলুকের উষর অঞ্চলে চার্লির ঠাকুরদা বুনো ফুলের চাষ করে বড়লোক হয়ে গেল। পাপ থাকবে কেন?'

'বুনো ফুল!'

'তাই তো বলল।'

কত রকমের ক্যাকটাস। সব দুর্লভ জাতের ক্যাকটাস। রমরমা ব্যবসা। মুখার্জিদা কেন যে এই অনুসরণকারীর সঙ্গে কোনও পাপের সম্পর্ক খুঁজছেন। তার ভাল লাগল না।

সে বলল, 'জানো, যখন যুদ্ধ ওদের দরজায় করাঘাত করছে, তখন মানুষটা তার সব পাহাড়ি এলাকায় বুনো ফুলের চাষ করে যাচ্ছে। সারা আমেরিকায় এখন বড়লোকদের শৌখিন ক্যাকটাস বলতে ব্যারেল ক্যাকটাস। ওর ঠাকুরদা ফুল ভালবাসত। বুনো ফুলের চাষ করেই বড়লোক হওয়া যায়, ওর ঠাকুরদা তার প্রমাণ। তারপর থেমে বলল, চার্লি তার মা-র কথা মনে করতে পারে না। যে নিগ্রো রমণীর কাছে মানুষ তিনিও বেঁচে নেই। মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। চার্লির বাবা ছাড়া কেউ নেই।'

'থাম থাম!'

'মোটর দুর্ঘটনা বলছিস। বুঝতে দে।'

মুখার্জিদা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। সে কথা বলতে গেলেই থামিয়ে দিচ্ছেন হাত তুলে। সে মুখার্জিদার এই গাম্ভীর্যে হেসেই ফেলল। আর এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে ভাবল।

'আমি উঠব।'

'উঠবে ভাবছ, ডেরিক ভেঙে মাথায় পড়বে না! বোস। উঠলে তো চলবে না। তুমিও জড়িয়ে গেছ বুঝতে পারছি। আমরা থাকতে তোমার কিছু হলে দেশে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে!'

'আমি জড়িয়ে গেছি বলছ!'

'আলবত জড়িয়ে গেছ। তুমি আর বাচ্চা গোরাটার সঙ্গে ঘুর ঘুর করবে না। ধনকুবের মানেই রহস্য বুঝলে। চার্লির আর কে কে আছে জানিস।'

'বলল তো।'

'কি বলল, আরে চুপ করে থাকলি কেন! এবারে হাসতে পারছ না কেন। যা উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দে। কে আবার কান পেতে থাকবে।'

সুহাস দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। ওর সত্যি গা শির শির করছে। অনুসরণকারী যদি এখানেও অন্ধকারে নেমে আসে। সে বলল, 'ধুস, দিলে সব মাটি করে। রাতে ঘুমাতে পারব না।'

'সবে শুরু। কত রাত না ঘুমিয়ে থাকতে হয় দ্যাখ। একদম ঝেড়ে কাশছিস না। আমি তোর কোনও ক্ষতি করব ভাবছিস। আমার দায় পড়েছে। ডগ-ওয়াচেও ডেরিক তোলা ছিল না। তার মানে তার পরের ওয়াচে কাজটা কেউ করেছে। কবে দেখেছিস সমুদ্রে অকারণে ডেরিক তোলা থাকে। বন্দরে ঢোকার আগেও ডেরিক তোলা হয় না। বন্দরে ভিড়লে মাল তোলার জন্য ডেরিক তোলা হয়। কম ওজনের মাল নামানোর জন্য কে আর কোম্পানির পয়সা খরচ করে। শালা খচ্চর কোম্পানি, দেখছিস একবারও বন্দরের ক্রেন ব্যবহার করেছে! কুনজুস। ডেরিকেই সব মাল হারিয়া করে দিতে পারলে কোম্পানির পয়সাও বাঁচে কাজেরও সুনাম হয়। হাবড়া কাপ্তান সব বোঝে, বুঝলি! কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিরা খুশী হলে আরও দু-চার সফর। দু-হাতে টাকা রোজগার।'

তারপরই মুখার্জিদা কেমন চুপসে গেলেন। কি খুঁজছেন। 'কোথায় রাখলাম।'

'কি খুঁজছ!'

'টোবাকোর প্যাকেট।'

'ও-ঘরে পড়ে নেইতো!'

'না। দেখ তো জামার পকেটে আছে কিনা।'

সুহাস উঠে গিয়ে জামার পকেট খুঁজল। পেল না। বালিশের পাশে খুঁজল নেই।

'কোথায় রাখলাম! বোস, আসছি।' বলেই মুখার্জিদা দ্রুত নেমে গেলেন বাঙ্ক থেকে। কম্বল জড়িয়ে গায়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন।

'কোথায় যাচ্ছ।'

জবাব দিচ্ছেন না।

সে দরজায় মখ বাড়িয়ে বলল, 'আরে উপরে যাচ্ছ কেন?'

'বলছি না বসে থাকতে! আসছি।'

সে বসে থাকল। ঝড়ের মধ্যে কোথায় উঠে গেলেন। উপরে তো এখন ধুন্ধুমার কান্ড চলছে। টোবাকোর প্যাকেট খুঁজতে কেন যে এই দুর্মতি। রাতে তাঁকে ওয়াচে যেতেই হবে। তখন বর্ষাতি গায়ে যাবেন। এখন গেলে তো ভিজে, চুপসে যাবেন। অথচ সে নড়তে পারল না। যেন সিঁড়ি ধরে উপরে গেলেই অনুসরণকারীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। ফোকসালে বসে থাকতে বলে গেছেন। সে উঠতেও পারছে না। একবার অধীর কিংবা সুরঞ্জনকে ডেকে বললে হত, ঝড়ের মধ্যে কোথায় যে বের হয়ে গেল! এত রাতে বলতেও বাধছে। দরজা বন্ধ করা। কারণ ঝড়ের জন্য দরজা খোলা রাখা যাচ্ছে

না। দরজা লক করে দিতে হচ্ছে। ডাকাডাকি করলে সবাই জেগে যাবে। বারোটা-চারটার পরিদাররা বিরক্ত হতে পারে। তারা পরি অর্থাৎ ওয়াচ দিতে যাবে বলে যে যতটা পারছে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

সে বুঝতে পারে ভয় বড় সংক্রামক ব্যাধি। সে এই ফোকসালে বসেও থাকতে আর সাহস পাচ্ছে না। উপরে উঠে যেতেও ভয় পাচ্ছে। সারেঙ-এর দরজাও বন্ধ। এবং তার ফোকসালের দরজা খুলে ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু এই অসময়ে মুখার্জিদা টোবাকোর প্যাকেট খোঁজার জন্য যে কেন উপরে উঠে গেলেন, সে বুঝতে পারল না।

নিজের ফোকসালে ঢুকে শুয়েও পড়তে পারছে না। ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা। সে যে কি করে।

আর তখনই মুখার্জিদা নেমে এলেন।

'কোথায় গেছিলে?' সে না বলে পারল না।

হাতের টোবাকো প্যাকেট দেখিয়ে বললেন, 'পেয়েছি।'

তারপর সহসা প্রশ্ন, 'বুনো ফুল তোকে দেখছি ছবি এঁকে দেখিয়েছে চার্লি!'

কেউ তো জানে না! সে তো একাই ছিল ঘরে। আর কেউ তো ছিল না। সুহাস অবাক।

সে বলল, 'জানলে কি করে।'

মুখার্জিদা একটা কাগজে মেলে ধরলেন।

'কোথায় পেলে!'

'তা দিয়ে কাজ কি? এটা কি ফুল?'

'ব্লেজিং স্টার!'

'তোর মনে আছে দেখছি?'

কোথায় পেলে বলছ না কেন। ইস, এর জন্য উঠে গেলে! আমাকে বললেই পারতে। আমার লকারে আরও আছে।'

'তোর লকার আমি খুলিনি। যাকগে, খুবই সুন্দর দেখতে। কি লম্বা আর সুন্দর ফুলগুলি!'

'বুনোফুল দেখতে সত্যি সুন্দর।'

বুনোফুলের বোটকা গন্ধও আছে।'

'কে বলল?'

'বলবে কে! বোঝা যায়। একটু বেশি মাখামাখি থাকলে বুনো ফুলের গন্ধও পাওয়া যায়। মেয়ে মানুষের গন্ধ!'

'মিছে কথা! একটা ফুলেরও গন্ধ নেই।'

'আছে আছে। টের পাস না। জাহাজে এই ফুল মনে হয় উড়ছে। যাকগে, আন্দাজে ঢিল মেরে লাভ নেই। বুনো ফুলের গন্ধ কেউ কেউ পায়। তুই পাস না বলে কি সবাইকে ভেড়া ভাবিস! যা শুয়ে পড়গে।'

সুহাস ভেবে পেল না, মুখার্জিদা কি তাকে নিয়ে তামাসায় মেতেছেন, না সত্যি আঁচ করেছেন, বেঘোরে পড়ে তার জানও খতরা হয়ে যেতে পারে। সে কেমন শুকনো মুখে বলল, 'জানো চার্লির সংশয় বেট্‌সকে কেউ খুন করেছে।'

'তোফা! এতক্ষণ ঝেড়ে কাশছিলি না কেন? তাই বল।'

নয়

খুবই রহস্যজনক—অথচ গত সফরে মনেই হয়নি চার্লির জাহাজে উঠে আসার পেছনে কোনও রহস্য থাকতে পারে। রাতের ওয়াচে মুখার্জি স্টিয়ারিং হুইলের পাশে দাঁড়িয়ে এমনই ভাবলেন। কাপ্তানের আদুরে ছেলে উঠে আসতেই পারে। আর বজ্জাতের ধাড়ি। এমন দুরন্ত ছেলেকে কিনারায় রেখে এসে কাজে কর্মে স্বস্তি পাওয়া কঠিন। চার্লির কে আছে, কে নেই তাও জানার কোনও সুযোগ ছিল না। পর পর দুটো সফরেই চার্লি জাহাজে আছে। পর পর দুটো সফর একই জাহাজে তিনিও আছেন।

গত সফরে ইনজিনসারেঙ নিয়াজিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। চার্লি জাহাজে উঠে আসার পর নানা উপদ্রবে পড়ে যেতে হয়—কারণ কার পেছনে লাগবে ঠিক কি—যতটা পারা যায় চার্লি সম্পর্কে নানা হুঁশিয়ারির শেষ ছিল না। বাপের আদরে মাথাটি গেছে। মা নেই, কোন এক দূরসম্পর্কের পিসির কাছে মানুষ—সেই পিসিও গত হওয়ায় কাপ্তান নিরুপায় হয়ে সঙ্গেই নিয়ে এসেছেন। তাঁর কেন সবারই কাছে চার্লির জাহাজে উঠে আসার কারণ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।

সুহাস জাহাজে না থাকলে এই নিয়ে তাঁর মাথা ঘামাবারও কারণ ছিল না।

তারা আছে এখন ওশিয়ানিয়া অঞ্চলে। এই অঞ্চলে হাজার হাজার দ্বীপের ছড়াছড়ি। অস্ট্রেলিয়াকে বলা যেতে পারে সব চেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ। তারা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ফসফেট আমদানি করবে। বেশ ছিল—আর ক'মাস পরই হয়তো মাটি টানার কাজ শেষ হয়ে যেত। দেশে ফিরে যেতে পারত নির্বিঘ্নে। কিন্তু ফাইভারের আকস্মিক মৃত্যুর পেছনে যেমন রহস্য দানা বাঁধছে, তেমনি চার্লির অনুসরণকারীও কম রহস্যময় নয়। বেট্সি খুন হয়েছে, বেট্সি মানে চার্লির পরিচারিকা—মা নেই আগেই জানা ছিল, বেট্সির খুন হওয়া অবশ্য সংশয়ের পর্যায়ে আছে, কারণ চার্লি ঠিক জানে না, দুর্ঘটনা না খুন। যেমন ম্যাকের মর্মান্তিক মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত না কোনও পরিকল্পিত হত্যা—কারণ ডেরিক যেই তুলে রাখুক—তার যে মতলব ভাল ছিল না, বুঝতে পারছেন মুখার্জি।

উইনচ চালিয়ে ডেরিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নানা কপিকলের সাহায্যে কাজগুলি হয়ে থাকে। একজন লোকের পক্ষে এ-ভাবে ডেরিক তুলে ফসকা গেরোয় রেখে দেওয়া অসম্ভব। ডেরিক যার নির্দেশেই তোলা হোক, তারা ছিল দু'জন। এবং কোনও দূর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখা হয়েছিল। কার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব।

ডেকটিন্ডাল লতু মিঞা এবং কিছু ডেক জাহাজি উইনচ চালাতে জানে। ডেরিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেকেন্ডমেট কিংবা চিফমেটের নির্দেশ ছাড়া এ-কাজে কেউ হাতও দিতে পারে না। সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব নিজেও উইনচ চালিয়ে দেখে নেন, ডেরিক ঠিকমতো কাজ করছে কি না! যদি ভুলবশত ডেরিক তোলা থাকত, তবে কারও চোখে পড়বে না হয় কি করে!

মুখার্জি টের পাচ্ছেন খুবই জটিল অঙ্ক। ম্যাককে হত্যা করে কার কি উপকার হল! সুহাস কেন এই জটিলতায় জড়িয়ে পড়বে! সুহাস সাধারণ জাহাজি, সে ধনকুবেরের

নাতিও নয়, যে খুন-টুন করে ঠাকুরদার বিশাল সম্পত্তি গ্রাসটাস করা যাবে।

ঝড়বৃষ্টির দাপট চলছে। এত ঝাপসা—সামনে কিছুই দেখা যায় না। থার্ডমেট মাঝে মাঝে কম্পাসের রিডিং দেখছেন। থার্ডমেট পায়চারি করছিলেন। কারণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা টানা চার ঘন্টা খুবই কঠিন। দু'বার চা খেয়েছেন। মুখার্জিই চা করে এনেছেন গ্যালি থেকে। ঝড় প্রবল হওয়ায় সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ডেকে। বাতিগুলো জাহাজের তেমন জোরালো নয়। ইনজিন-রুমের সঙ্গে মাঝে মাঝে থার্ডমেটের সাংকেতিক কথাবার্তা চলছে। কত নট বেগে ঝড়ের দাপট চলছে, লগবুকে নোট করছেন। নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে বোঝাই যায়।

পাশেই চার্ট-রুম। চা করে নিয়ে আসার সময় চার্ট-রুমের দরজা যে খোলা নয় লক্ষ্য করেছেন মুখার্জি। চার্ট-রুমেই চাবি থাকে সব কেবিনের। কি যে অজুহাত সৃষ্টি করা যায় ভেবে পাচ্ছিলেন না মুখার্জি। কি করে চার্ট-রুমে ঢুকে ম্যাকের কেবিনের চাবিটি হস্তগত করা যায়; কারণ ম্যাকের কেবিনে ঢুকে মুখোশগুলো দেখতে পারলে ভাল হত। জাহাজে ম্যাক কাকে কাকে মুখোশ উপহার দিয়েছে, এটাও জানা দরকার।

এ-সব কাজে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। রহস্যের জট খোলা চাট্টিখানি কথা নয়। কিছু ক্রাইম থ্রিলার পড়ে এটা তিনি টের পেয়েছেন। কম কথা, সহসা উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দেওয়া। কোনও সুযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো—বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না, সব গুজবের পেছনেই কোনও না কোনও ঠাণ্ডা মাথার আকস্মিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে। গুজবের মাথাও কেটে দেওয়া যায় না। প্রায় রক্তবীজের বংশধর—একটা থিতিয়ে এলে আর একটা গজিয়ে ওঠে। লুকেনার থেকে মেয়েমানুষের লাশ এবং বোটডেকে কখনও কখনও আবছা অন্ধকারে নারীর চলাফেরার কোনও হেতু থেকে নানা গুজব যে সৃষ্টি করা হচ্ছে না কে বলবে!

তবে গুজব লুকেনার এ-জাহাজে শুধু নয় তাঁর তিনটি জাহাজেই মাঝে মাঝে দেখা দেন। সিওল ব্যাঙ্ক, টিবিড ব্যাঙ্ক এবং এই ডিনা ব্যাঙ্কের এককালের অধীশ্বর এ-ভাবে গুজবের মধ্যেই বেঁচে আছেন, তিনি তাও বুঝতে পারেন। লাশ দেখে আহামদ পাগল হয়ে যায়নি—আতঙ্কে ব্যাটা পাগল হয়েছে।

এটা তো হতেই পারে, সারাক্ষণ কেবিনে মরা লাশ আছে ভাবলে, কার না ত্রাস সৃষ্টি হয়! কেবিনের পোর্টহোল দিয়ে যে বাইরের সমুদ্র দেখা যায় তখন তাও মনে থাকে না। লাশ বরফ-ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল—এমন খবরে আহামদ সারাক্ষণ শুধু লাশের কথাই ভেবেছে।

চার্লিও যে আতঙ্কে পড়ে যায়নি মুখোসের কে বলবে। সে কি কোনও বুড়ো মানুষকে শৈশবে দেখলে ভয় পেত! কিন্তু মুশকিল চার্লির সঙ্গে এ-সব নিয়ে কথাবার্তা বলা মেলা ঝঞ্ঝাট। একমাত্র সহায় হতে পারে সুহাস। সুহাসকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করা যাবে এই ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হতেই তিনি দেখলেন, ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। তিনি দ্রুত হুইলের জিম্মায় থার্ডমেটকে রেখে সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন। এখন তার কাজ সেকেন্ডমেটকে জাগিয়ে দেওয়া। তার কেবিনের দরজায় টোকা মেরে বলা, উঠুন, আপনার ওয়াচের সময় হয়ে গেছে। তারপর দ্রুত ডেক পার হয়ে ফোকসালে ফোকসালে খবর

দেওয়া—বলা, 'টাণ্টু'। একনম্বর ওয়াচের পরিদাররা এবারে উঠে পড়ো। জাগো।

একনম্বর পরিদারদের জাগিয়ে ফের ব্রিজে উঠে গেলেন তিনি। এবং ওয়াচ শেষে নেমে এলেন বোটডেকে।

মুখার্জি বোটডেকে নেমে কেন যে চার্লির কেবিনের পেছনে চলে এলেন নিজেও বুঝলেন না। মাথায় কি কোনও চিন্তাভাবনা কাজ করছিল—সহসা সব যেন ভুলে গেছেন, এই ভেবে থতমত খেয়ে গেলেন! তারপরই মনে হল, আসলে পোর্টহোলের পাশ দিয়ে তিনি হেঁটে যেতে চান। ঝড়-ঝাপটায় টলে টলে হাঁটতে হয়।

দু'নম্বর বোটের পাশ দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিতে থাকলেন। চার্লির কেবিনের পেছনটায় চলে গেলেন তিনি। ফুট চার পাঁচ দূরে লোহার রেলিং বুক সমান উঁচু। দাঁড়াতে গেলে, এক ঝটকায় ঢেউ ভাসিয়ে নিতে পারে। ঢেউ এত প্রবল। তা-ছাড়া জাহাজ যেভাবে ওঠানামা করছে, তাতে করে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। উইংসের আলো ঠিকমতো পড়ছে না। কেবিনের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। হাতড়েও কিছুর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। তবু কোনও রকমে দেয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হচ্ছে না বুঝেও, মনে হল তাঁর সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এই ঝড়-ঝাপটায় কেউ চার্লির কেবিনের পেছনে হাঁটা-চলা করতে পারে—অবিশ্বাস্য! তবু তিনি রেলিঙ ধরে হাঁটছেন। একবার দেখা দরকার পোর্টহোলের সামনে দাঁড়িয়ে। চার্লি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ভোর রাতের ঘুম সবারই কম বেশি প্রিয়।

তিনি এবার সোজা কিছুটা এগোতে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। রেলিঙ ধরে ফেলে আত্মরক্ষা করা গেল। ফের এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পারছেন না। পোর্টহোলে মুখ রেখে দেখতে চান, যে মানুষটা অনুসরণকারী সে দীর্ঘকায় কি না! কিংবা কত দূরত্বে দাঁড়ালে কেবিন থেকে চার্লি সেই মুখ দেখতে পারে—এ-সব দেখার কৌতূহলেই আসা। এদিকটায় তাঁর আসার দরকার হয় না। আসেনও না।

তিনি দেখতে পেলেন পোর্টহোলে পর্দা ঝুলছে এবং ভিতরে আলো জ্বালা। আসলে চার্লি কি জেগে আছে—না ভয়ে কেবিনের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে! পোর্টহোলে পর্দা টানানো, এটা মুখার্জির অনুমানের বাইরে। পর্দা ফেলা থাকলে সেই হিমশীতল মুখ সে দেখতে পায় কি করে! তা ছাড়া কারও পোর্টহোলেই পর্দা ঝোলে না। এটা তো মালবাহী জাহাজ। যাত্রী-জাহাজ হলে তবু না হয় কথা ছিল। শালীনতা রক্ষার্থে যাত্রী-জাহাজে পর্দা ঝুলতেই পারে। মালবাহী জাহাজে এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।

মালবাহী জাহাজে এ ধরনের শালীনতার প্রশ্নই আসে না। সাধারণত পোর্টহোলগুলি উঁচুতেই থাকে। কেবিনের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ভিতরে কি আছে না আছে দেখার কথা না। দেখতে হলে একটা টুলের দরকার। কিন্তু আশ্চর্য চার্লির কেবিনের পোর্টহোল বেশ নিচুতেই বলা যায়। যাওয়া আসার পথে নীল কাচের ভেতরে কেবিনের সব কিছুই আবছা দেখা যেতে পারে। ভিতরে আলো জ্বালা থাকলে তো কথাই নেই।

তবে এদিকটায় কারও আসার কথা না। একেবারে বোটডেকের একপাশে পর পর দুটো কেবিন। কেবিনের পেছনে কয়েক ফুট মাত্র, কাঠের পাটাতন। জাহাজে কাঠের পাটাতনে মাঝে মাঝে হলিস্টোন মারা হয়ে থাকে। ঝড় জলে বৃষ্টিপাতে কাঠের পাটাতনে শ্যাওলা

পড়ে যায়। হলিস্টোন মেরে পাটাতন ঘষে ঘষে মসৃণ রাখার কাজগুলি ডেকজাহাজিরাই করে থাকে। এদিকটায় যে বেশ কিছুকাল কাঠের ডেক বালি আর পাথরে ঘষা হয়নি বুঝতে মুখার্জির অসুবিধা হল না। পা পিছলে যাচ্ছিল—খুব সতর্ক পায়ে হাঁটাহাঁটি করে তিনি কিছু মাপজোক নিতে ব্যস্ত।

আসলে লোকটা লম্বা না বেঁটে, লোকটা যদি চার্লির পোর্টহোলে এসে দাঁড়ায় তবে সে কতটা দীর্ঘকায় হতে পারে এমন কিছু চিন্তাভাবনা মাথায় কাজ করছিল বলেই একবার যেন দেখে যাওয়া।

কিছুটা গা-ঢাকা দেবার মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। অঝোরে বর্ষণ চলছে। সমুদ্রের অন্ধকারে পাতলা বিবর্ণ ছাই রঙের নীলাভ জলরাশি পাক খাচ্ছে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক হবে না। বুনো ফুলের ঘ্রাণ তো আর এভাবে পাওয়া যায় না! যদি তাই হয়, তিনি কেমন কিছুটা বেকুফই হয়ে গেলেন ভেবে।

মাঝে মাঝে তাঁর কেন যে মনে হয়, চার্লির গায়ে বুনো ফুলের গন্ধও লেগে আছে। ঘ্রাণশক্তি তাঁর একটু প্রবল। তবে মনে হয়েছে, সাহেবের বাচ্চা চার্লি, চানটান করে না, নোংরা থাকার স্বভাব এবং সহসা এই সেদিনও তিনি চার্লির শরীরে উত্তেজক গন্ধ পেয়ে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। চার্লির শরীর থেকে গন্ধটা উঠছে, না অন্য কোথাও থেকে—চার্লি প্রায় তার নাকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন ব্রিজে। জাহাজে নানা কিসিমের পতাকা ওড়ে। পাতাকাগুলি ভাঁজ করছিলেন। চার্লি তার নাক ঘেঁষে হেঁটে যাবার সময়ই বুনো ফুলের গন্ধ। নারীর শরীরে কোথায় কি ঘ্রাণ থাকে তাঁর তো জানতে বাকি নেই। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে নানা কিসিমের ঘ্রাণ। চার্লির শরীরে বুনো ফুলের গন্ধ পেয়ে কিছুটা তিনি হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। জাহাজে শেষে সত্যি মেয়েমানুষ উঠে এল! চালি জাহাজেই বেড়ে উঠছে। যত বড় হচ্ছে তত বেশি যেন গন্ধ ছড়াচ্ছে।

জাহাজিদের অবশ্য এই এক দোষ! শরীরে মেয়েমানুষের গন্ধ শোঁকার স্বভাব। পুরুষ হলেও! সুন্দর বালক কিংবা যুবা হলে তো কথাই নেই। কারণ সমকামিতা জাহাজে সংক্রামক ব্যাধি। সেই ব্যাধিতে তিনি কি আক্রান্ত হচ্ছিলেন! এখন ঠিক আর তা অনুমান করতে পারছেন না। তা না হলে গন্ধে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন কেন! নারীর মধ্যে ঘ্রাণের সুবাসের চেয়েও এই উত্তেজক গন্ধ জাহাজিদের শুধু প্রিয় নয়, দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে যায়। আজ কেন জানি তিনি পর্দা ঝুলতে দেখে এটা আরও বেশি অনুমান করতে পারছেন। সারা মাসকাল সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় বসবাসের ফল। খ্যাপা কুকুরের মতো ছুটে মরা। রং বার্নিশের গন্ধ ছাপিয়ে বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে ওঠে। বিকৃত রুচি থেকে হতে পারে—কি যে কারণ এটা এখনও তাঁর কাছে অনুমান-সাপেক্ষ। আবার ভাবলেন, তিনি সেই গন্ধে পাগল হয়ে আছেন!

তিনি আর দাঁড়ালেন না। পূব আকাশ ফরসা হয়ে উঠছে। ভিজে জবজবে এবং জুতো মোজা সব ভিজে গেছে তাঁর। বোটডেক থেকে লাফিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন। ছুটতে ছুটতে টুইন ডেক পার হয়ে আসছেন। পিছিলের ছাদের নীচে এসে রেনকোট টুপি খুলে গ্যালিতে উঁকি দিলেন। শীতে কাঁপছেন। যদিও ঠাণ্ডা কমে আসছিল, তবু ঝোড়ো হাওয়ায়

শীতের কামড় আবার বেড়ে গেছে। এত সকালে কারও ওঠার কথা না। গ্যালিতে ভান্ডারি থাকতে পারে। এ-সময়টায় ভাণ্ডারি উনুনে আঁচ দেয়। একটু চা হলে খাসা হত। কে করবে!

ভাণ্ডারি, মুখার্জিবাবুকে দেখে অবাক! চারটায় ডিউটি শেষ। এখন বাজে পাঁচটা। জামা কামড় ছাড়েননি। ভিজে জামাকাপড়ে বেঞ্চিতে বসে আছেন। একে একে জাহাজিরা সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে। গোসলখানায় ঢুকছে। কেউ কেউ গ্যালিতে ঢুকে হাতের তালুতে ছাই নিয়ে দাঁত মাজছে। ভাণ্ডারি খুব ব্যস্ত। উনুনে আঁচ উঠলে গরম জলের কেতলি বসিয়ে দিতে হবে। গ্যালি ধোওয়া মোছার কাজ শেষ। বাসি পরিত্যক্ত আনাজ তরকারি, সব টিনের মধ্যে মজুত করা। টিন তুলে নিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল অভুক্ত অবশিষ্ট খাবার। দুটো অ্যালবাট্রস পাখি কোথা থেকে সাঁ সাঁ করে উড়ে আসছে। পাখা মেলে ভেসে যাচ্ছে। তারপর জলে ঝাঁপিয়ে অভুক্ত খাবার ঠোঁটে নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের জলে।

মুখার্জি সোজা সিঁড়ি ধরে তাঁর নিজের ফোকসালে নেমে যেতে পারতেন। তিনি গেলেন না। তাঁর পক্ষে অবশ্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক হচ্ছে না। তাঁর তো এখন শুয়ে পড়ার কথা। ভোরের ঘুম আজ ইচ্ছে করেই মাটি করে দিলেন। ঝড়ের দাপট কমে আসছে। তবু তাঁর কেন যে মনে হল এক কাপ চা খেতে পেলে ভাল হত। কাকে বলবেন, ভান্ডারিকে বললে হয়। ভাণ্ডারি কি তাঁর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে চা-এর ব্যবস্থা করবে! তারপরই মনে হল, আঁচ উঠতে সময় লাগবে। বলেও লাভ নেই। নীচে নেমে গিয়ে পোশাক ছেড়ে ফেলাই ভাল।

আসলে বুনো ফুলের গন্ধ জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই রহস্যটাই বা কি করে ফাঁস করা যায়। বুনো ফুলের গন্ধেই তিনি ছুটে গেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি নিজের মধ্যে ছিলেন না। ভান্ডারিই বলল, আরে মুখার্জিবাবু দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন! সব তো ভিজে জবজবে। ঠান্ডায় যে কাবু!

এই রে। ধরা পড়ে গেলেন বুঝি। চারটায় ওয়াচ শেষ। চারটায় ফোকসালে নেমে যাবার কথা। বাথরুমে ঢুকে হাতে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়ার কথা, তা না, তিনি কোথা থেকে অসময়ে, এই সংশয় ভাণ্ডারির মনেও উঁকি দিচ্ছে।

তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে নীচে নেমে গেলেন। সুহাসের সামনে পড়ে গেলে আর এক কেলেঙ্কারি।—দাদা তোমার এত দেরি! কোথায় ছিলে!

জাহান্নামে ছিলাম, বুঝলি! কোথায় ছিলে! দ্যাখ তোর কপালে কি আছে! যেন সুহাসের উপরই সব তিক্ততা গিয়ে পড়ল! কি দরকার বুঝি না, চার্লির সঙ্গে ঘোরার। বাবু তুমি বোঝ না কি চিজের পাল্লায় পড়ে গেছ! তুই কি আহাম্মক। আমি গন্ধে টের পাই, আর তোর সঙ্গে এত মাখামাখি, কিছু টের পাস না! তোর নাকে গন্ধ লেগে থাকে না! নোনাজলে ঘুরলে এমন গন্ধে তো পাগল হয়ে যাবার কথা!

না, এখন আর এ-সব নিয়ে ভাবনা নয়। লম্বা টানা ঘুম। জামা প্যান্ট খুলে এক কোনায় ফেলে রাখলেন সব। রেনকোট হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর গামছায় শরীর মুছে, পাতলুন আর জামা গলিয়ে কম্বলের নীচে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। উঠে

ফের দরজা বন্ধ করলেন। শরীর টাল হয়ে গেছে। শুয়ে পড়তেই তাঁর এটা মনে হল। মুখে শরীরে কম্বল চাপা দিয়ে চোখ বুজলেন। কিন্তু ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করছেন—কাউকে কিছু বলা যাবে না। এই বুনো ফুলের গন্ধ কেবল তিনিই টের পেয়েছেন, এমন ভাবলে ভুল করা হবে। অনুসরণকারী যে আগেই টের পায়নি কে বলবে। অনুসরণকারী জাহাজের কেউ হবে। সে কে?

ফোর্থ ইনজিনিয়ার?

থার্ড!

না সেকেন্ড!

সেকেন্ড তো খুব রাশভারি মানুষ। চার্লির অভিভাবক গোছের। কারণ চার্লিকে মাঝে মাঝে তিনি শাসনও করে থাকেন। কার্পেন্টার, কাপ্তান মেসরুমমেট বুড়ো মানুষ। কাপ্তানবয়ই একমাত্র চার্লির ঘরে যখন তখন ঢুকতে পারে। বুড়োকে কিছু বলাও মুশকিল। কাপ্তানের কানে গেলে সেও সুহাসের মতো জালে জড়িয়ে যেতে পারে। তা-ছাড়া কিছুই তো নিশ্চিত নয়। দুইয়ে দুইয়ে চার হয়—এই যোগফলের উপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হওয়া। বুনো ফুলের গন্ধ, পোর্টহোলে পর্দা, অনুসরণকারী কেউ আছে আছে না আতঙ্কে চার্লি সেই এক বুড়োর মুখ দেখতে পায়! তিনি কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন না।

সত্যি যদি বুনো ফুলের গন্ধ চার্লির গায়ে লেগে থাকে, সবসময় না হলেও মাঝে মাঝে যে গন্ধটা পাওয়া যায় এমন ভাবলেও তাঁর আর এক সিদ্ধান্তে ভুল থেকে যাচ্ছে। কাপ্তান চার্লিকে যত্রতত্র যেতে দেবেন কেন! সুহাসের সঙ্গে ঘুরতে দেবেন কেন! কাপ্তান যদি নেহাত দায়ে না পড়েন—দায়টা কিসের। ডেরিক তুলে রেখে তিনি কি সুহাসকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। অথচ তার কিছুই করছেন না। চার্লি জাহাজে আছে, বড় হয়ে উঠছে এ-সব কি কাপ্তানকে বিন্দুমাত্র ভাবায় না!

চার্লি তার অনুসরণকারীর কথা একমাত্র সুহাসকেই জানিয়েছে! সুহাস কি করবে! সে ছেলেমানুষ। চার্লি আর নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজে পেল না! বাপ তো তার জাহাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি না পারলে কে পারবেন! সুহাস কে? চার্লি সুহাসকেই কেন বলে! সুহাস কি, তাকে সব ভেঙে বলছে না—আরে বুঝছিস না গাধা—যত সরল অঙ্ক ভাবছিস, পর্দা ঝুলতে দেখে মনে হল অঙ্কটা তত সরল নয়। তুই তো সোজা বলে দিতে পারতিস, তোমার বাবাকে বলছ না কেন! আমি কি করতে পারি। খুব ভুল করছ চার্লি—বলতে পারতিস! ভয়ে আতঙ্কে কাবু। রাতে আলো না জ্বালিয়ে ঘুমাতেও ভয় পাও—তখন কি না একজন সামান্য জাহাজিকে বলছে, আর কেউ যেন না জানে!

না, কিছুই মাথায় আসছে না।

অনুসরণকারী কাছে থাকে না।

অনুসরণকারী দূরে থাকে।

কাছে থাকলেও আবছামতো অন্ধকার থেকে উঁকি মারে।

প্রথমে দেখা দরকার, সত্যি উঁকি মারে, না ভূতগ্রস্ত চার্লি।

যাকগে। জাহাজের পরিণতি খুব যে ভাল না তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। জাহাজে আরও কোন বড় ধরনের নাটক হতে পারে। শুধু চেষ্টা করে যাওয়া।

দুপুরে মেসরুমে খেতে বসে মুখার্জি দেখলেন, সুহাস খুবই অন্যমনস্ক। এই সময়টায় সবার সঙ্গে দেখা হয়। বারোটা থেকে একটা—এক ঘণ্টা ছুটি। সবাই খেতে আসে মেসরুমে। বেশ গ্যাঞ্জাম চলে। যারা বারোটা-চারটার ওয়াচ দিতে যায় স্টোকহোলডে কেবল তারাই হাজির থাকে না। এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে তারা ধীরে সুস্থে নীচে নামে। সুরঞ্জনের দেখা পাওয়া গেল না। অধীর হরেকেষ্ট, মুখার্জি, সুহাস পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। সুহাস কিছু বলছে না।

মুখার্জি বললেন, 'আর একটু ডাল নে। এত শুকনো খাচ্ছিস! গলায় আটকে যাবে যে।' বলে তিনি ডেকচি থেকে এক চামচ ডাল দিলেন সুহাসকে।

'ইস কি করছ! এত আমি খেতে পারি না। তোমার লাগলে নাও না।'

আরা তখনই সুহাস বিষম খেল।

'জল খা।'

বেশ জোরে বিষম খেয়েছে। কাসছে। কথা বলতে পারছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অধীর জলের গ্লাস এগিয়ে দিল মুখের কাছে। জল খেয়ে যেন স্বস্তি পেল সুহাস। মুখার্জি বললেন, 'বাড়ির জন্য মন খারাপ!'

সুহাস বলল, 'হ্যাঁ মন খারাপ। আর কি জানতে চাও বল!'

সুহাস মুখার্জিদার উপর যেন খুবই বিরক্ত। মুখার্জি বুঝলেন না হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন সুহাস! খারাপ কিছু বলেননি! বাড়ির জন্য মন খারাপ হতেই পারে। কতকাল হয়ে গেল, জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরবাড়ি, মা-বাবা এবং নদী থাকলে—নদীর জন্য মন খারাপ হতেই পারে। তবে কেন সুহাস খেপে গেল তাঁর উপর।

সুহাস কোনও রকমে খাওয়া শেষ করে নেমে গেলে মুখার্জিও পিছু নিলেন। হাত ধরে টেনে বললেন, 'কি হয়েছে বল তো!'

'কি হবে আবার। তুমি শেষে এই! তুমি চার্লিকে ভয় দেখাচ্ছ! বেচারা ভয়ে কাবু। তুমি চার্লির পোর্টহোলে ঘোরাঘুরি করছ! চার্লি টের পেয়েছে।'

'টের পেয়েছে! কি করে টের পেল।'

'বলল তো, ভোররাতে সে আবার এসেছিল।'

'দ্যাখ সুহাস!' বলেই বোধহয় চিৎকার করে উঠতেন। কি ভেবে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, 'বুঝে শুনে কথা বলবি। চার্লি বলেছে, আমি ঘোরাঘুরি করছি!'

'চার্লি দেখলে তো বলবে।'

মুখার্জি কেমন মিইয়ে গেলেন।

'কে দেখেছে?'

'আমি।'

'তুই দেখেছিস?'

'হ্যাঁ দেখেছি। না দেখলে বলব কেন! ঝড়ের রাতেও কামাই নেই। পোর্টহোলে পর্দা ফেলা ছিল বলে রক্ষা। পর্দা তুললেই তোমাকে দেখতে পেত। কি করছিলে বল তো! কেন বেচারাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। তুমি জান, আতঙ্কে মানুষের কি হয়! আহাম্মদ বাটলারকে

ভাগালে। চার্লিকে ভাগাতে চাইছ। কি করছিলে—বল! চুপ করে আছ কেন। বেচারা কাঁদো কাঁদো মুখে হাজির—জানো সুহাস সে এসেছিল। ভয়ে কাঠ।'

মুখার্জি বুঝল এতটা বোকামি না করলেই পারতেন। পায়ে বুটজুতো—ঠক ঠক শব্দ হতেই পারে চলাফেরার সময়। আসলে গোয়েন্দাগিরি কাজটা যে সোজা না এতে তিনি টের পেয়ে গেলেন। কাঠের ডেকে জুতোর শব্দ উঠতেই পারে। চার্লি টের পেয়ে আলো জ্বেলে বসেছিল। শৌখিন গোয়েন্দারা কি করে যে এত তৎপর হয় তাঁর মাথায় আসে না।

মুখার্জি এবার আলটপকা বলে ফেললেন, 'বাজে একদম বকবি না। আমি মরতে যাব কেন ওখানে!'

সুহাস বলল, 'আমি তো দেখলাম, ঝাপসা অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে তুমি বোটডেক থেকে নেমে আসছ। কি করছিলে! পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে অন্ধকারে সিঁড়ি ধরে, নামার সময়ও দেখেছিলাম, কেউ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির মুখে। আতঙ্কে তোমার কথা মনেই হয়নি। ওভারকোট পরে এত রাতে জাহাজে সিঁড়ি ধরে কে আর নামতে পারে। তুমি ছাড়া।'

'তুই বললি, কোয়ার্টার মাস্টার মুখার্জি ঘোরাঘুরি করছে।'

'আমার দায় পড়েছে। শুধু বললাম, ও কিছু না। মনের ভুল। কেউ আসেনি। তুমি প্লিজ চার্লির পেছনে লাগতে যেয়ো না। বেচারার মা নেই। এত খারাপ লাগে ভাবলে। তোমার মায়াদয়া নেই। ধরা পড়লে কি হবে বল তো!'

'গাধা কি আর গায়ে লেখা থাকে। যা, যা পারিস করবি। যখন লেগেছি, দেখব চার্লি কত জলের মাছ! আর তোকেও বলেদিচ্ছি, যদি ফাঁস করে দিস সব, তোর নিস্তার নেই। যা করছি, তোমার ভালর জন্য করছি মনে রেখ। জাহাজে আর একটি ডেরিক ভেঙে পড়ুক চাই না! মনে রাখিস চার্লি আর যাই হোক ছেলে নয়। এত কাছে থাকিস গন্ধেও টের পাস না মেয়ে না ছেলে! দেখতে দেখতে জাহাজে তো বিশবাইশ মাস হয়ে গেল।

দশ

আনাড়ি আর কাকে বলে! ফোকসালে ঢুকে নিজের উপরই খেপে গেলেন মুখার্জি।—তুই শেষে আমার পেছনে লাগলি! কার জন্য করছি! আর রাগের মাথায় আবোল তাবোল বকে গেলেন। 'চার্লি, কত জলের মাছ, চার্লি ছেলে না মেয়ে, গন্ধ শুঁকে টের পাস না,' বলাটা খুবই কি অযৌক্তিক।

তা ছাড়া তাঁর তো দাড়ি গোঁফ নেই, পাকা চুলও নয় তাঁর—চোখ পাথরের মতো হিমশীতলও নয়, তবে কেন সুহাস তাঁকে সন্দেহ করছে! কি যে বিশ্রী ব্যাপার—গাধাটাকে বুঝিয়েও লাভ নেই—একবার ডেকে বললে পারত, আরে চার্লিকে নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই, তাকে তাড়াতেও চাই না—আমার কেন যে মনে হয়েছে, চার্লির শারীরিক গঠনে এতটুকু পুরুষালি ভাব নেই। ওর হাঁটা চলা দেখে আগেই সংশয় ছিল, এখনও সংশয় আছে—তবে তাই বলে নির্ঘাত সে মেয়ে এটা বলাও সম্ভব না। আর কেউ টের পায়নি, কে বলবে! নিশীথে বোটডেকে গভীর অন্ধকারে কে সে নারী! ভয়ে আতঙ্কে,

ঘোরে পড়ে—না, মানি না। বোটডেকে তুই তো নিজেই একবার দেখেছিলি—দেখে দৌড়ে পালিয়েছিলি—গন্ধটাও কম রহস্যজনক নয়—তবে এখনও কিছু ঠিক জানি না। ফুল ফুটলে গন্ধ বের হবেই। বুনো ফুলের গন্ধ বড় উত্তেজক।

তাঁর এখন ওয়াচ। তিনি ওয়াচে যাননি। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে জুড়িদার সোলেমান মিঞাকে বলেছেন, বদলি দিতে পরে দরকারে তিনিও বদলি খাটবেন। প্রায় অখণ্ড অবসর। কিন্তু খেতে বসে এমন একটা গণ্ডগোলে পড়ে যাবেন ভাবতেও পারেননি। হয়তো কাজে উঠে গেছে সুহাস। তবু একবার দরজা খুলে সিঁড়ির মুখে উঁকি দিলেন—সুরঞ্জন নেমে আসছে। ইশারায় ডাকলেন—সুরঞ্জনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, কেউ দেখে ফেললে ভাববে এই তোমার বাক্যালাপ বন্ধ! বিশেষ করে সুহাস টের পেলে আরও সংশয়ে পড়ে যাবে। এ সব নাটকের অর্থ কি জানতে চাইবে। সুরঞ্জনের ফোকসাল থেকে রাগারাগি করে তবে বের হয়ে এলে কেন! দিব্যি তো ভাব দু'জনে!

সুরঞ্জন নিচু গলায় বলল, 'বাবু কাজে যাননি। শুয়ে পড়েছেন। সারেঙ ডাকতে এসেছিলেন, সাফ জবাব, শরীর ভাল নেই।'

মুখার্জি আর কি করেন! সুরঞ্জনকে পাশ কাটিয়ে সুহাসের ফোকসালে উঁকি মারলেন। সুহাস কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সত্যি নির্বাসনে আছে যেন ছেলেটা। সমবয়সী প্রাণের বন্ধুটির ভিতরেই আসল রহস্য এমন শুনে ঘাবড়ে যেতেই পারে। রহস্যের উৎস চার্লি নিজেই জানতে পারলে বেকুফ হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি। সূত্রটি ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন গোলমাল পাকিয়ে ফেলবেন বুঝতেই পারেননি। সখের গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে নিজেই এখন অথৈ জলে। কম কথা, পর্যবেক্ষণ উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে ফেলা, এবং একসময় সঠিক সূত্রের সন্ধান! একেবারে অঙ্ক কষার সামিল—সব নিজই গুবলেট করে দিলেন। বরং সুহাসকে সত্যি কথা বলে ফেলাই ভাল। তিনি ডাকলেন, 'সুহাস কাজে গেলি না।'

সুহাস মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে মাথা তুলে দেখল। আবার শুয়ে পড়ল।

ফোকসালে কেউ নেই। দরজা বন্ধ করে সব খুলে বললেন।

হঠাৎ সুহাস উঠে বসল।

'তাই বলে প্রাণ হাতে করে এমন কাজ কেউ করে!'

'সময় নেই। তুই চিন্তা করিস না। আমার ধারণা, চার্লির খুবই বিপদ সামনে। অনুসরণকারী জাহাজেই আছে—তোর কথায় এটাও টের পেলাম। কিন্তু কেন? ধর চার্লি যদি মেয়ে হয়—হতেই পারে—কারণ চার্লি বড় হয়ে উঠছে। চার্লির চোখ মুখ দেখে টের পাই, শরীর দেখে বোঝার উপায় থাকে না—কিন্তু চার্লির চুল একটু বড় হলেই দেখেছিস, কাপ্তান নিজেই কেটে দেন—কদম ছাঁট। চুল ছাঁটা নিয়ে কাপ্তানকে কি হুজ্জোতি পোহাতে হয়, তাও তো দেখেছিস। চার্লিকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। কয়লার বাঙ্কারে গিয়ে পর্যন্ত পালিয়ে থাকে। তুই চার্লিকে কিন্তু কিছু বলতে যাস না। চার্লি ঠিকই দেখেছে। পোর্টহোলে কেউ দাঁড়িয়েছিল—লোকটাকে না দেখতে পেলে, টেরই পেত না, শেষ রাতের অন্ধকারে কেউ তার পোর্টহোলের পাশে ঘোরাফেরা করছে। কোনও ঘোর কিংবা আতঙ্ক থেকে নয়—সত্যি সে দেখেছে। দেখেছে বলেই আমার হাঁটাহাঁটিও টের পেয়েছে। রহস্যটা তবে

খুবই দুর্ভেদ্য।

সুহাস বলল, 'জানো, ম্যাকের কেবিনে সাতটা মুখোস পাওয়া গেছে।'

মুখার্জিদা শুনে হাসলেন। 'সাতটা নয়, আটটা মুখোস। একটা মুখোসের সে হিসাব রাখেনি। সেই মুখোসটাই খুঁজে বের করা দরকার।'

সুহাস অবাক।

'তুমি জানলে কি করে।'

'জানি। এখন চেপে যা।'

'জাহাজে উঠে ম্যাক একুশটা মুখোস বানিয়েছে। কাকে কাকে দিয়েছে ডাইরিতে তাও লেখা আছে। কিন্তু একটা মুখোসের হিসাব নেই। কাকে দিয়েছে মুখোসটা। তার নাম লেখা নেই।'

'হিসাব ঠিকই আছে। তবে মুশকিল, জাহাজে সে কাকে কাকে মুখোস বিলিয়েছে তার হিসাব থাকলেও একটা মুখোসের হিসাব নেই। কেন, কাকে দিয়েছে তার নাম লেখা নেই কেন বোঝা দরকার। মুখোসটা এমন কাউকে দিয়েছে যাকে সে প্রকৃতই ভয় পায়।'

'আচ্ছা মুখোস নিয়ে পড়লে কেন বলো তো?'

'পোর্টহোলে যেই দাঁড়াক সে মুখোস পরে দাঁড়িয়েছিল। মানুষটা মাঝারি হাইটের। সন্দেহ করতে গেলে অনেককেই করতে হয়। মুখোস না পরলে ধরা পড়ে যেত।'

'মুখোস পরে কেন? ওকে দেখার জন্য মুখোস পরতে হবে কেন?'

'কেন পরতে হয় জানতে পারলে তো হয়েই যেত। সারাদিন যাকে ডেকে দেখা যায়, রাতে তাকে কেবিনে দেখার এত আগ্রহ কার হতে পারে! তা ছাড়া এমন কোনও কারণ আছে—চার্লির পোর্টহোলে উঁকি না দিলে বোঝা যাবে না বলেই উঁকি দিয়েছিল। তোদের অনুসরণ করেছে কিনারায়। সাঁজ লাগলে কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছে। ঝাপসা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখেছে, চার্লি তোকে নিয়ে কি করে। তা না হলে আর অন্য কি কৌতূহল থাকতে পারে। সেও হয়তো গন্ধ শুঁকে টের পেয়ে গেছে কিছু।'

সুহাস কেমন ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। মুখার্জিদার কথা শুনে আবিষ্ট হয়ে গেছে। অযথা রাগারাগি করেছে। মুখার্জিদাকে অত্যন্ত নীচমনের ভেবেছে। কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করেছে। আর এখন সত্যি যেন মুখার্জিদা চার্লির পরিত্রাতা। তারও। ম্যাকের কেবিনে কখন গেল, কখন ঘাঁটাঘাটি করল! কখন এত হিসাব মাথায় নিয়ে বের হয়ে এল! রাতে কি তবে হুইলের কাজে ফেলে এই করে বেড়িয়েছেন। থার্ডমেট মানুষটি কড়া ধাতের নন। সুখানিদের সঙ্গে তার কথাবার্তাও হয়। দেশবাড়ির গল্প পর্যন্ত করেন। চুরুট মুখে থাকলে, প্রসন্ন থাকেন। আর মাঝে মাঝে নৈশ প্রহরীতে চা পেলে ছেলেমানুষের মতো আহ্লাদে আটখানা।

'কিন্তু মুখোস পরে দাঁড়ালে বোঝা যাবে না! মুখোস পরেছে বোঝা যাবে না!'

নাও যেতে পারে। সব মুখোস কটাই নারী পুরুষের মুখ। কি সজীব। সহসা দেখলে তো মনে হবে জীবন্ত মানুষের মুখ। রঙের কত অসাধারণ জ্ঞান থাকলে এটা হয়, কত নিপুণ কারিগর হলে এমন মুখোস তৈরি করা যায়, হাতে নিয়ে না দেখলে বোঝার উপায় থাকে না। গিরগিটি গোঁফের মুখোসটাও দেখলাম।'

'তা হলে কি সিম্যান মিশানে এটাই কেউ পরে খেলা দেখিয়েছে? গিরগিটি গোঁফের মুখোসটার মতো—হুবহু একরকম জানো!'

'খেলা, কিসের খেলা!' মুখার্জিদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আর বোলো না, তোমরা তো যেতে। আমার যাওয়া হয়ে উঠত না সিম্যান মিশানে। একদিন মনে নেই সুরঞ্জন গান গাইল—ঐ যে কি গান—অধীর রঙের টব বাজাচ্ছিল—আর বংশীদা গানটা শুনে চটেমটে লাল—মনে নেই, আরে বংশীদার পিছনে লাগলে তো সুরঞ্জনরা ঐ গানটাই গায়।'

'প্রবাসে যখন যায় গো সে। বলি বলি বলেও বলা হল না।' মুখার্জি গানের কলিটা ধরিয়ে দিলেন সুহাসকে।

সুহাস বলল, 'হ্যাঁ তো—যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে। আমায় নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে—টপ্পা গান গাইল। হাত তালি কুড়াল।'

'সেদিন সিম্যান মিশানে গিরগিটি গোঁফের লোক দেখলি কোথায়! মুখোস পরে খেলা দেখালে সবাই টের পেত লোকটা মুখোস পরে আছে। যতই মিশে থাক মুখের সঙ্গে ধরা পড়তই। তবে তোরা আনাড়ি, তোদের কথা আলাদা। বল কি বলছিলি!'

'সেদিন কেন দেখব।'

'কবে দেখলি!'

মুখার্জিদার কপাল কুঁচকে গেল। সুহাসের উপর কিছুটা যেন বিরক্ত। তিনি বংশীর বাঙ্কে ধপাস করে বসে পড়লেন। বংশীদার ওয়াচ চলছে, অধীরেরও। তারা ফোকসালে নেই। চারটে না বাজলে ইনজিনরুম থেকে কেউ উঠে আসতে পারবে না। তা ছাড়া চারটে-আটটার ওয়াচের লোকেরা দিবানিদ্রা দিচ্ছে। ওঠার সময় হয়নি—ডেক-জাহাজিরা কাজেকর্মের টুইনডেকে না হয় আফটারপিকে ঘোরাঘুরি করছে। নীচের ফোকসালগুলি প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে সুহাস দরজা ফাঁক করে কি দেখে দরজা বন্ধ করে অধীরের বাঙ্কে মুখোমুখি বসে বলল, 'জাহাজ ছাড়ার দুদিন আগে তোমাদের খুঁজতে মিশানে ঢুঁ মেরেছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর দেখি, তোমরা নেই। চলে আসছিলাম।'

'তারপর?'

'এত তারপর তারপর করলে পারব না। আমার কিছু কেন মনে আসছে না। গোলমাল পাকিয়ে ফেলছি। তোমরা ছিলে, না ছিলে না—না কিচ্ছু মনে করতে পারছি না।'

মুখার্জিদা যে নিবিষ্টমনে কিছু ভাবছেন, তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়। নিবিষ্টমনে কিছু ভাবলে বুড়ো আঙুলটার নোখ কামড়ান। আর মাঝে মাঝে থু থু করে জিভ থেকে কি বের করার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, 'এখনই ঘাবড়ে গেলে চলবে! এ যে বাবা অনেক ঘাটের জল ঘোলা করবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। দেখ তারপর,মনে করতে পারিস কি না। ম্যাক কি মুখোস পরে খেলা দেখাচ্ছিল!'

'একটা লোক ডায়াসে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল! তবে ম্যাক কি না জানি না।'

'কিসের ম্যাজিক!'

সুহাস সব খুলে বলল।

'জামা খুললে কি হত বল তো! চার্লি তো খাপ্পা। বলল, এই ঠাণ্ডায় কেউ জামা খুলতে পারে! লোকটা জাহাজিটাকে কি কাবু করে ফেলল। যাই বলছে, করে যাচ্ছে। কান ধরে ওঠ বোস পর্যন্ত।'

'থাম! আমি অত শুনতে চাই না। চার্লি বলল, জামা খুলে ফেললে কি হত!' মুখার্জির এক ধমক।

'হ্যাঁ, তাই তো বলল। আমি যদি জাহাজিটার হেনস্থা সহ্য করতে না পেরে উঠে যেতাম, আর আমাকে নাস্তানাবুদ করলে চার্লির সহ্য হবে কেন, সেও উঠে যেত—আমরা দু'জনেই তার শিকার হতাম।'

'চার্লি তোকে খুবই ভালবাসে। কেন যে বাসে—যাকগে—সেন্ট পার্সেন্ট না হলেও ফিফটি ফিফটি ধরে রাখতে পারিস। সন্দেহটা আমার অমূলক নয়। আরও কেউ ঘোরাঘুরি করছে। সে কে বুঝতে পারছি না। ম্যাক নিজেই নয় তো!'

'চার্লি আমাকে সত্যি ভালবাসে। সকালে তো ওর ব্রেকফাস্ট থেকে কলা আপেল পর্যন্ত দেয়।' ম্যাক সম্পর্কে সুহাসের যেন কোনও কৌতূহল নেই।'

'দেখেছি।' বলে ঠোঁট টিপে হাসলেন মুখার্জি। দু'জনে খুব মসগুল হয়ে খাও। খাওয়াটা ভাল। তবে দেখবে ধরা পড়ে না যাও।'

'দিলে কি করব বল! না খেলে রাগারাগি করে। মুখ গোমড়া। ভয়ে ভয়ে খাই। আবার কোন উপদ্রবে ফেলে দেবে।'

'শুধু ভয়!' মুখার্জি কেমন ঠাট্টার সুরে কথাটা বললেন। তারপর উঠে পড়লেন।

'উঠছ কেন? বোস না। চা করে আনছি।'

জাহাজিদের এই এক প্রলোভন। চায়ের নামে পাগল। যে যার চা নিজে বানিয়ে খায়। যাদের 'বিশু' একসঙ্গে তাদের একজন ঠিক করা থাকে। সে-ই গ্যালি থেকে চা বানিয়ে নীচে নিয়ে আসে। তাদের 'বিশু'তে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। সব কটা ঘাড় বাঁকা—না পারব না। অধীরকে বল। না, পারব না, কেষ্টকে বল। তারপর তোযামোদ করে কাউকে রাজি করাতে হয়। চা চিনি কনডেনস্ড মিল্ক নিয়ে সে তখন উপরে উঠে যায়।

আর এই সময় সুহাস নিজেই চা বানিয়ে খাওয়াতে রাজি। মুখার্জি খুব খুশি। বললেন, 'সিগারেট থাকলে দে।'

সপ্তাহে রেশনে ক্যাপস্টেনের কুড়িটা করে পাঁচটা বড় প্যাকেট পায় তারা। সুহাস সিগারেট খায় না। সে রেশন থেকে খুব কমই সিগারেট তোলে। কোনও কোনও বন্দরে কিনারায় লোকদের কাছে সিগারেটের খুব চাহিদা। তখন সে তার সিগারেট কাউকে তুলতে দেয় না। বুনোসাইরিসে সে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে প্রায়ই গুচ্ছের আপেল, আঙুর কিনে আনত। একবার তো দুটো ক্যাপস্টেনের প্যাকেট পেয়ে একজন বুড়ো মতো মানুষ দামি একটা কম্বলই তাকে উপহার দিল। এ সব কারণেই বন্দর বুঝে সিগারেট তোলে, না হয় তার রেশনের সিগারেট সুরঞ্জনই তোলে।

সে বলল, 'দাঁড়াও, আছে কি না দেখি।'

লকার খুলে একটা আস্ত প্যাকেটই পেয়ে গেল সুহাস। বলল, রেখে দাও। আমি তো খাই না। তারপর বলল, 'জানো ম্যাকের সেই ছবিটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। চার্লি ম্যাকের কেবিনে খুঁজে দেখেছে।'

'কিসের ছবি?' অবাক মুখার্জি।

'দাঁড়াও চট করে চা-টা করে আনছি। বলছি সব। সুহাস কেতলি চা চিনি কনডেনসড্ মিল্ক নিয়ে উপরে উঠে গেল। গ্যালিতে ভাণ্ডারি নেই। মেসরুমে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। আঁচ পড়ে গেছে কিছুটা। সে তাড়াতাড়ি কেতলিতে জল ঢেলে উনুনে বসিয়ে দিয়ে গ্যালির ফোকরে গলা বাড়িয়ে বলল, 'অ ভাণ্ডারি চাচা তোমার আঁচ কিন্তু পড়ে যাচ্ছে।'

ভাণ্ডারি কাত হয়ে শুল। বলল, 'খুঁচিয়ে কটা কয়লা দিয়ে যা বাপজান।'

সে কেন যে আজ সবার অনুরোধই রক্ষা করছে। কেমন যেন সাহস পেয়ে গেছে। মুখার্জিদা তার সঙ্গে আছে—অন্তত মুখার্জিদা যে ভাবে ঝড়ের মধ্যে গেলেন, এবং যেভাবে ম্যাকের কেবিন ঘাঁটাঘাঁটি করছেন তাতে সে আর একা নয়—চার্লি সে আর মুখার্জিদা—তিনজনে মিলে ম্যাকের হত্যাকাণ্ডের একটা কিনারা ঠিক করে ফেলতে পারবে। মুখার্জিদার উপর তার এই অগাধ বিশ্বাসের হেতুতেই বোধ হয় মন আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠছে। সে চা করে, উনুন খুঁচিয়ে কটা কয়লা দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। কাপ বের করে মুখার্জিদাকে দিল, নিজেও চুমুক দিল চায়ে। তারপর বলল, 'আরে যে ছবিটা ম্যাক কিনারায় গেলে পকেটে রাখত। তোমাকে তো বলেছি। কি খারাপ লাগছে না, ম্যাকের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। বেচারা।'

'থাম। ম্যাককে নিয়ে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। নিজের কথা ভাব। ম্যাকের অদৃষ্ট। আর অপঘাতে মরার বিষয়টা বেশি মনে না রাখাই ভাল। আমরা কেউ ভাল নেই, মনে রাখিস। যেখানে যাচ্ছি কেবল শুনছি ম্যাক, তার বউ, ছেলপিলে! আরে আমাদেরও তো বাড়িঘরে কেউ আছে! ম্যাকের নিষ্ঠুর মৃত্যু একদম আমি সহ্য করতে পারছি না। তারপর—না। ঠিক আছে আমি উঠছি। ছবি পাওয়া যায়নি, কোথাও আছে। ছবিটা পকেটে নিয়ে গেছে বলেই ধরে নিতে হবে, ম্যাক জানত, তার বিপদ হতে পারে—আমি বিশ্বাস করি না। ছবিটা সরিয়ে ফেলারও কোনও কারণ নেই। মাথাটা আমার ঘোলা করে দিস না।

ওঠার সময় মুখার্জি বললেন, 'তোর কি শরীর সত্যি ভাল নেই! কাজে গেলি না কেন! কাজে না গেলে চলবে! কাজে না গেলে ভাববে না, ম্যাকের মৃত্যু তোকে কাহিল করে ফেলেছে। ম্যাকের মৃত্যুতে তুই মুষড়ে পড়েছিস! আর কেউ তো কাজ নাগা করেনি। কাজ না করলে জাহাজ চালু থাকবে কি করে! এতে শত্রুপক্ষ টের পাবে না, তুই কিছু আঁচ করেছিস? তুই ভয় পেয়ে গেছিস! এ-সব ক্ষেত্রে ভয় পেলে অসুবিধারই সৃষ্টি হয় মনে রাখিস। যা কাজে যা। ম্যাকের পর তুই নির্ঘাত টার্গেট, টের পেলে অদৃশ্য আততায়ী সাবধান হয়ে যাবে এটা কি বুঝিস!'

সুহাসের মুখ নিমেষে কালো হয়ে গেল। আতঙ্কে গা শির শির করছে। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নেওয়া দরকার। না হলে মুখার্জিদা ভাববে ভীতু, কাপুরুষ। মরার ভয়ে আগেই মরে ভূত। তা ছাড়া মুখার্জিদা যখন জীবনের এতটা ঝুঁকি নিতে পারেন, সে পারবে

না কেন! কারণ খ্যাপা সমুদ্রে জাহাজের এত কিনারায় অন্ধকারে বিচরণ করা খুবই সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ না। যে কোনও সময় ছিটকে পড়তে পারতেন—এবং দরিয়ায় হাফিজ হয়ে যেতে পারতেন—সেই মানুষের সামনে তাকে দুর্বল হলে চলবে কেন! এতটা ঝুঁকি নিতে পারেন জীবনের, আর সে টার্গেট এমন অনুমানের ভিত্তিতেই মুখ কালো করে ফেললে রাগ হবে না মুখার্জিদার!

সে বলল, 'ধুস বাদ দাও। শোনো তোমাকে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।'

'খুব তো রাগ দেখিয়ে বিষম খেলি! এখন আবার এত কথা কেন!'

সুহাস কিছুটা যেন লজ্জায় পড়ে গেছে তার আচরণের জন্য। সে সহজ হতে পারছিল না। মুখার্জিদার সিগারেট শেষ। মুখার্জিদা নিজেও পরিচয় দিতে যাননি—নিশ্চয়ই তার মাথার মধ্যে রহস্যের জট পাকিয়ে গেছে। তাঁকে বললে বুঝতে পারবেন, উইন্ডসহোলের আড়ালে, অন্ধকারে কে রঙের টব রেখে দিয়েছিল। সকালে সে উঠে দেখেছিল, রঙের টবটা নেই। হ্যাঁচের দুটো কাঠ তোলা। অন্ধকারে রঙের টবে হোঁচট খেলে, হ্যাঁচের খোলে যে কেউ গড়িয়ে পড়তে পারত। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাতু। জোর বেঁচে গেছে।

'জানো মুখার্জিদা আমার মনে হয় রঙের টবটা কেউ ইচ্ছে করেই রেখে দিয়েছিল। অন্ধকারে এমনভাবে রেখে দিয়েছিল, মনেই হবে না, উইন্ডসহোলের ছায়ায় একটা রঙের টব আছে। আমার তো বোটডেক থেকে যমুনাবাজু দিয়েই নামার কথা। তুমি বললে বলে গঙ্গাবাজু ধরে গেলাম।

'কবে?'

'আরে তুমি ছুটে নেমে এলে না বোটডেক থেকে—আমি কি দেখে দৌড়ে গেলাম! মনে হচ্ছিল অনুসরণকারী আমার গায়ে নিশ্বাস ফেলছে!'

মুখার্জিদা বললেন, 'তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার মনেই নেই।'

'সকালে গিয়ে দেখি, টবটা নেই। লক্ষ্য করার কথা না। কিন্তু ম্যাকের মৃত্যু যেন সত্যি পাখা বিস্তার করছে। সব মনে পড়ছে। যমুনাবাজু ধরে গেলে, টবের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া বিচিত্র ছিল না। পাশেই মরণ ফাঁদ। ছিটকে হ্যাঁচের মধ্যে পড়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। কে যে রাখল টবটা!'

'কাঠ তোলা ছিল বলছিস?'

'তাই তো দেখলাম। কে ত্রিপল তুলে দুটো পাটাতন সরিয়ে রেখেছে। কার কাজ! যে কেউ বিপদে পড়তে পারত। রক্ষা ছিল, পড়ে গেলে বলো!'

তা বিশ ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে খোলে পড়ে গেলে কি হয় সেটা অনুমান করেই মুখার্জিদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তুই যে এত রাতে আমার সঙ্গে উঠে গিয়েছিলি ঠিক কেউ লক্ষ্য করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মরণ ফাঁদ তৈরি করে রেখেছিল মনে হয়। যাকগে, আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা কেউ হয়তো পছন্দ করছে না। একজন অভিজ্ঞ জাহাজি তোর পেছনে আছে সে টের পেয়েছে।'

তারপর হঠাৎই খেপে গেলেন মুখার্জিদা, 'তোর এত কাণ্ডজ্ঞানের [illegible], কই আগে তো বলিসনি! এত বড় খবরটা চেপে রেখেছিস!'

'চেপে রাখব কেন! আমার মনেই হয়নি, আমি কিছু ভাবিওনি। তুমি যে বললে,

আমিই টার্গেট। তাই মনে পড়ে গেল।'

'তুই টার্গেট আমি বলতে যাব কেন? আমি বলেছি তুই নির্ঘাত টার্গেট টের পেলে— অর্থাৎ যদি তুই টার্গেট হোস, হতেও পারিস, নাও পারিস। সবই অনুমান। রঙের টবটা যেই রেখে দিক, সে তোমার ভাল যে চায় না, এটা বুঝতে কি কোনও অসুবিধা আছে! অন্য কোনও কারণেও রাখতে পারে অথবা পড়ে থাকতে পারে। যাই হোক তোর কাছে কলম-টলম থাকলে দে তো।'

সুহাস লকার থেকে কলম বের করে দিয়ে বললেন, 'চিঠি লেখার প্যাডটা দে।'

সে প্যাডও বের করে দিল।

'পাশে বোস।'

সে বসল।

মুখার্জিদা হঠাৎ কলম প্যাড নিয়ে পড়লেন কেন সে বুঝল না। প্যাডের উপর পাঁচটা মহাদেশকেই এঁকে ফেললেন। বুঝে নিতে হয়—কোনটা কোন মহাদেশ—ঠিক অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পুবে গোলমতো একটা প্রায় বৃত্ত রচনা করে বললেন—'এই যে দেখছিস জায়গাটা, এটাই ওশিয়ানিয়া—হাজার হাজার ছোট বড় দ্বীপের ছড়াছড়ি। দ্বীপগুলিকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় বুঝলি। যেমন মেলানেশিয়া—প্যাডের উপর গোলমতো একটা বৃত্ত এঁকে জায়গাটা তিনি দেখালেন। তারপরই প্রশ্ন করলেন জীবনানন্দের কবিতা পড়েছিস? পড়িসনি। বলিস কি—তাঁর কবিতা এটা—বুঝলি, আবার আসিব ফিরে। ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়। হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে। হয়তো ভোরের কাক হয়ে—এই কার্তিকের নবান্নের দেশে—তিনিই কোনও কবিতায় যেন লিখেছিলেন—মালয় সাগরে—মেলানেশিয়ার কথা তাঁর মনে হতে পারে—পাশের সমুদ্রটা মাইক্রোনেশিয়া আর উপরের দিকটায় আছে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলি। বিস্ময়ের শেষ নেই! ইস্টার দ্বীপের নাম শুনেছিস? গালাপেগাস? শুনিসনি—অবশ্য আমরা তার অনেক নীচে ঘোরাঘুরি করব। কোরাল সিতেই যাচ্ছি। বিশমার্ক সিতেও যেতে পারি। নেরু দ্বীপে যাচ্ছি বোর্ডে লিখেছে কিন্তু আমার মনে হয় না, নেরু দ্বীপে জাহাজ যাবে। যাবে কাকাতিয়া কিংবা ওসানিয়া দ্বীপে। ফসফেটের পাহাড়— দ্বীপগুলিতে নানাদেশের জাহাজ ফসফেট নিতে আসে। তবে খুব বেশি জাহাজ দেখা যায় না। সব বন্দরেই প্রায় জেটি বলতে কিছু নেই। জাহাজ নোঙর ফেলে রাখে। টাগবোটে মাল এলে পিপেগুলি তুলে ঢেলে নেওয়া হয়। যে জন্য এত সব বলা, এই এলাকায় যে কোনও জাহাজ যদি গা-ঢাকা দেয়, কারও সাধ্যি নেই খুঁজে বার করে। কত সব লেগুন আছে—লেগুনের ভিতর ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকা যায়। শোনা যায় সি-ডেভিল লুকেনার এই সব অসংখ্য দ্বীপের কোনও একটাতে আত্মগোপন করে থাকতেন। এমন সব দ্বীপ আছে চাষবাসের খবরই রাখে না—এমন সব অনেক দ্বীপ আছে যেখানে একটা গাঁয়ের ভাষা অন্য গাঁয়ের মানুষেরা বোঝে না। পাশাপাশি গাঁয়ের ভাষা আলাদা। কোনও দ্বীপ গড়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির কালো লাভায়। প্রবাল দ্বীপেরও ছড়াছড়ি। শুধু কঠিন পাথর আর ক্যাকটাস। দুর্লভ সব কচ্ছপ। প্রাগৈতিহাসিক কালের পাখি জীবজন্তু। যুগ যুগ ধরে এই সব অজানা ভূখণ্ড ছিল জলদস্যুদের গুপ্ত আস্তানা। প্যালিকানও দেখতে পাওয়া যায়। আরও কত সব বিচিত্র পাখি। সিন্ধুঘোটকও

দেখতে পাবি ভাগ্যে থাকলে। তবে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল বলেই, গুপ্তধনেরও আশা রাখে কেউ কেউ। মাটি টানার কাজ আসলে অছিলা। তারা আসলে অনেকেই আসে গুপ্তধনের খবরাখবর সংগ্রহ করতে। দ্বীপের বুড়ো মানুষদের কাজে লাগায়।'

একটু থেকে মুখার্জিদা বললেন, 'আমাদের কাপ্তানও জাহাজ নিয়ে এদিকটাতেই ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসেন। কেন কে জানে!'

'তবে কি কাপ্তান গুপ্তধনের খোঁজে যাচ্ছেন!' বলতে গিয়ে সুহাসের কপাল কুঁচতে গেল। কিছুটা যেন সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। 'লোকটা কি পাগল! এখানে কোন দ্বীপে কোন জলদস্যু কি গুপ্তধন রেখে গেছে খোঁজা কি চাট্টিখানি কথা! আমার মাথায় কিছু আসছে না দাদা।'

মুখার্জিদা বললেন, 'আস্তে। দু-কান হলে তুমিও শেষ, আমিও শেষ!'

এগারো

সুরঞ্জনের সঙ্গে কথাবার্তা সব রাতের পরিতে। তাঁর এবং সুরঞ্জনের একই সময়ে পরি। বারোটা-চারটা। সুরঞ্জন স্টোকার—পরি তার স্টোকহোলডে। তিনি সুখানি—পরি তাঁর হুইল-রুমে। ব্রিজ থেকে সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেই চিমনি। যা কিছু গোপন কথাবার্তা চিমনির আড়ালে দাঁড়িয়ে। সুরঞ্জন স্টোকহোলডে নেমে যাবার আগে চিমনির গোড়ায় বসে থাকে। মুখার্জি ব্রিজে উঠে যাবার সময় ঘড়ি দেখে বলে দেন, কটায় সুরঞ্জনকে উঠে আসতে হবে। দুজনেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। মধ্যরাতে জাহাজ নিঝুম। ইনজিনরুম আর ব্রিজ ছাড়া কেউ জেগে থাকে না। ঘোর মাতালের মতো জাহাজ টলতে টলতে ভেসে যায়। ডেকে, ব্রিজে কিছু আলো জ্বালা থাকে—মাস্তুলের আলো দুটো খুবই উজ্জ্বল। আর সব কেমন নিস্তেজ। সেই আলো অন্ধকারে তারা চিমনির আড়ালে গোপন পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে।

গিরগিটি গোঁফের মুখোশটা নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার। মুখার্জিদার সাংকেতিক কথাবার্তা থেকে সুরঞ্জন টের পেয়েছে তার সঙ্গে মুখার্জিদা গিরগিটি গোঁফের মুখোশ নিয়ে কথাবার্তা বলতে চান। চিমনির গোড়াতে সুরঞ্জন বসে সিগারেট টানছিল। মুখার্জিদা এখনও আসছেন না। তার জুড়িদাররা সবাই একে একে নীচে নেমে যাচ্ছে। সুরঞ্জন সবার শেষে নামে। কোলবয় দুজনও নেমে গেল। মনুকে নিয়ে মুশকিল। মইনুদ্দিন—সে সুরঞ্জনের কিছুটা চেলা গোছের। বয়সের ফারাক খুবই। তবু সুরঞ্জনকে দাদা দাদা করে।

'দাদা তুমি বসে থাকলে।'

'যা। যাচ্ছি।'

'মসলা আছে?'

মসলা মানে টোবাকো। সুরঞ্জন পকেট থেকে সিগারেট বের করে দিল। বলল, 'মসলা নেই।' মনু বলল, 'ম্যাচেস দাও।' সুরঞ্জন সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আগুনটা এগিয়ে দিল। বলল দেশলাই নেই। তবু মনুর নামার লক্ষণ দেখা গেল না। যতক্ষণ উপরে বসে থাকা যায়। খোলামেলা হাওয়ায় বসে থাকতে সবারই ইচ্ছে হয়। কয়লার বাঙ্কার তো অন্ধকূপের সামিল। হাওয়া বাতাসের বড় টানাটানি। টন টন কয়লার পাহাড়। পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে

সারাক্ষণ বেলচায় কয়লা ভরতে হয় গাড়িতে—কষ্ট তো হবেই। কয়লার ধুলোয় বাঙ্কারে নিঃশ্বাস ফেলাও কঠিন। সুট ভরতেই দম বের হয়ে যায়। নীচে নেমেই হাড্ডাহাড্ডি কাজ। দানবের মতো ফার্নেসগুলো আগুন উগরে দেবে। ফায়ারম্যানরা ফার্নেস থেকে আগুন টেনে নামাবে আর কোলবয়রা জল মারবে—ধোঁয়া, আগুন, জলের হুড়োহুড়ি। উইন্ডসহোলের নীচে না দাঁড়ালে শ্বাস নিতেও কষ্ট। মনু নীচে নামার আগে দম নিচ্ছে। সহজে নড়বে বলে মনে হয় না। সুরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, বসে থাকলি কেন, যা নীচে যা। ছোট টিন্ডালকে বলবি আমার নামতে একটু দেরি হবে।

বারোটা বাজতে আর পাঁচ সাত মিনিট বাকি। মধ্যরাতের পরি। পরিদাররা ছাড়া মধ্যরাতে জাহাজে কেউ জেগে থাকে না। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। অষ্টমীর চাঁদ এইমাত্র দিগন্তে টুপ করে ডুবে গেল। সমুদ্রের সোঁ সোঁ গর্জন ছাড়া আর কিছুই যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মনু চিমনির গোড়ায় বসে আছে দেখতে পেলে, মুখার্জিদা সোজা হুইলরুমে সিঁড়ি ধরে উঠে যাবেন। কারণ সবাই তো জানে, মুখার্জিদার সঙ্গে সুরঞ্জনের বাক্যালাপ বন্ধ। ডগওয়াচ নিয়ে কথা কাটাকাটির পর মুখার্জিবাবু ফোকসালই ছেড়ে দিলেন।

মনু নেমে যেতে থাকল। চিমনির জালিতে সুরঞ্জন বসে আছে। একটা পা সিঁড়ির রডে। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুট নীচে স্টোকহোলড। ফার্নেস ডোর খুলে দিলে আগুনের হলকায় সারা স্টোকহোলড ঝলমল করে উঠল। উপরে এখনও ঠাণ্ডা আছে। নীচে বলতে গেলে আগুনের নরক। কোথাও হাত দেওয়া যায় না—দিলেই হাতে ফোসকা পড়ে যায়। সুরঞ্জন কয়লা মেরে মেরে এতই মজবুত যে তার আগুন কিংবা কয়লা নিয়ে কোনও ত্রাস নেই। সে কুঁড়ে নয়, একাই দুজনের কাজ সামলাতে ওস্তাদ। এ-জন্য টিন্ডাল তাকে খুবই সমীহ করে। দেরি করে নামলেও কৈফিয়ত দিতে হয় না। এটাই তার সুবিধা।

সুরঞ্জন দেখল একটা ছায়া লম্বা হয়ে আবার বেঁটে হতে হতে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুখার্জিদা বোধহয় আসছেন—আর কারও এ-সময় বোট-ডেকে উঠে আসার কথা না। কাজ ছাড়া বোট-ডেকে ঘোরাঘুরি করলেও অপরাধ। কারও সাহসই হবে না অকারণে বোট-ডেকে উঠে আসার। ব্রিজ থেকে কেউ যদি তাকে অনুসরণ করে থাকে! ব্রিজে দেখল কেউ নেই। চিমনির আড়ালে যদি কেউ থাকে, ঝুঁকে দেখে নিল। যমুনাবাজুর লাইফবোট দুটোর আড়ালে—না কেউ নেই। সে নিশ্চিন্তে দেখা করতে পারে। এত রাতে বোট-ডেকে শলাপরামর্শ করার যে নিশ্চিন্ত জায়গা নয়, সে ভালই বোঝে। গঙ্গাবাজুর দিকে, দুটো কেবিন। কেবিন দুটোরই দরজা বন্ধ। কাপ্তান শুয়ে পড়েছেন। দশটা বাজলেই তিনি নিজের কেবিনে চলে যান। তার ঘর খুবই সাদামাটা। কেবল মাথার উপর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি ছাড়া একটা লকার—একটা র‍্যাক—এবং র‍্যাকে সব চামড়ায় বাঁধানো মোটা মোটা বই। ডেকজাহাজিদের কাছেই খবর পেয়েছে সুরঞ্জন। কেবিন রং করার সময় তারা দেখেছে সব।

মুখার্জিদা খুবই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিঁড়ি ধরে উঠে গেলেন। তবে এখুনি নেমে আসবেন। কারণ কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁকে উঠে যেতেই হবে। সুরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সে আছে। তিনি তা যে বিলক্ষণ টের পেয়েছেন, তাঁর হাত তোলার ভঙ্গি থেকেই সে বুঝে ফেলেছে। সে চিমনির ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে ফেলল। কেবিন থেকে

যদি বাড়িয়ালা বের হয়ে আসেন, তবে ঝামেলা হতে পারে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে কৈফিয়ত চাইতে পারেন। চিফ তখন সেকেন্ডকে তলব করবে। সেকেন্ড তলব করবে ইঞ্জিনসারেঙকে। তিন নম্বর পরির স্টোকার কেন কাজ ফেলে বোট-ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! চিমনির অন্ধকারে বসেছিল কেন! এ ধরনের কৈফিয়ত কাপ্তান চাইতেই পারেন। তাকে নিয়ে হুজ্জোতি শুরু হয়ে যেতে পারে জাহাজে। যতটা সতর্ক থাকা যায়।

মুখার্জি নেমে এসে খুবই সন্তর্পণে তাকে চিমনির আড়াল থেকে ডেকে নিলেন। তারা যমুনাবাজুর লাইফ-বোটের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে সরে পড়া দরকার। কারণ থার্ডমেট দেরি দেখলে, মুখার্জিকে খুবই অদায়িত্বশীল ভাবতে পারেন।

দুজনেই এখানে কথাবার্তা বলতে পারে সহজে। সমুদ্রের গর্জন এবং ইঞ্জিনের গুম গুম আওয়াজে তাদের কথাবার্তা কারও কানে যাবার কথা না। কাছাকাছি কেউ জেগেও নেই।

মুখার্জি বললেন, 'শোন সুরঞ্জন, গিরগিটি গোঁফের মুখোসটি নিয়ে আবার একটা ঝামেলায় পড়া গেল। ওটা পরে নাকি সিম্যান মিশানে কে ম্যাজিক দেখিয়েছে।'

'যাঃ হতেই পারে না।' সুরঞ্জন এক বাক্যে সব উড়িয়ে দিল। বলল, 'তুমি বুঝছ না কেন, ডায়াসে কেউ মুখোস পরে খেলা দেখাচ্ছে আমরা তো জানি না। মুখোস পরলে বোঝা যেত না! গিরিগিটি গোঁফের মুখোসটা তো ম্যাকের কেবিনে পড়ে আছে।'

'কিন্তু চার্লি যে বলল, দেখেছে।'

'সুহাস?'

'সুহাসও বলল, দেখেছে।'

'কবে?'

'জাহাজ ছাড়ার দু-দিন আগে। গোঁফো লোকটা হিপনোটিজম জানে। সবাইকে হিপনোটাইজ করল, কেউ বুঝতে পারল না, লোকটা আসলে মুখোস পরে আছে বুঝতেই পারেনি কেউ।'

'গোটা হলসুদ্ধ হিপনোটাইজ করা কি সোজা কথা। কি জানি আমি কিছু বুঝছি না দাদা। নানা দেশের জাহাজি—কে কি খেলা দেখালে, গান গাইল, গিটার বাজাল মনেও করতে পারছি না—ম্যাকের ঘরে সেই মুখোসটাই পড়ে আছে বলল চার্লি?'

'তাই তো বলল। আমার বিশ্বাসই হয় না, ম্যাক এ-কাজ করতে পারে। কেন করবে বল! তাকে তো একদিনও স্বাভাবিক দেখিনি—কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে ফেরে। কোনও দুরভিসন্ধি থাকলে, একজন মানুষের পক্ষে রোজ রোজ বেহুঁশ হয়ে ফেরা অসম্ভব। তবে কখন কোথায় মদ গেলে আজও বোঝা গেল না। কেবিনে বসে মদ গেলে বলেও শুনিনি। ম্যাকের মদ গেলার ধন্দও কম তাড়া করছে না। তার পরই মুখার্জি বললেন, 'তুই দেখেছিস মুখোসটা?'

'দেখেছি।'

'চাবিটা দে। চার্টরুমে রেখে দিতে হবে।' বলে দ্রুত চাবিটা পকেটে পুরে মুখার্জি বললেন, 'চার্লি নাকি হল থেকে বেরিয়েই বলেছে লোকটাকে সে কোথায় যেন দেখেছে! কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না।'

সুরঞ্জন বলল, 'এমনও তো হতে পারে ম্যাকের কেবিনে চার্লি মুখোসটা দেখেছে মুখোসটা দেখে সে ভয়ও পেতে পারে। গোঁফজোড়া ঝুলে আছে। তারপর হয়তো সে মুখোসটার কথা ভুলে গেছে। মুসকিল কি জানো, গাবদা লোকেরা ঝুল গোঁফ রাখলে দেখতে একইরকম লাগে। লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে মানে, সেই মুখোসটার কথা চার্লির মনে হতে পারে। মুখোস ঠিক বোধ হয় বলা উচিত না—ওই কিম্ভূতকিমাকার মুখ তার অবচেতন মনে ছায়া ফেলতে পারে। লোকটাকে তাই চেনা মনে হতে পারে কোনও মানসিক দুর্বলতা থেকে যে নয় কে বলবে। বুঝতেই পারছ চার্লি আগের চার্লি নেই। পাঁচ সাত মাসে কি ছেলেটা কি হয়ে গেল। এত বিনয়ী আর ভদ্র, ভীতু স্বভাবেরও হয়ে গেছে। এগুলো কিন্তু ভেবে দেখা দরকার। ম্যাকের মৃত্যুরহস্য খুঁজে বের করা কঠিন আর আমার তো মনে হয় এ-সব ঝামেলায় আমাদের জড়িয়ে পড়াও ঠিক হবে না। দুর্ঘটনা ভাবলেই ক্ষতি কি!'

মুখার্জিদা খেপে গেলেন, 'তুই কি রে। এর মধ্যে থ্রিল আছে না। যদি জাহাজের কেউ হয় ধরা পড়বেই। সে জাল বিছিয়ে যাচ্ছে। জালে কে পড়বে, তুই, সুহাস না চার্লি এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমিও হতে পারি। ম্যাক গেল তারপর কে যায় দ্যাখ।' মুখার্জিদা টবের প্রসঙ্গও তুললেন। 'তবে জাহাজ যাচ্ছে বিশমার্ক-সিতে। যারাই যায় তারা একবার জলদস্যুদের ঘাঁটি খুঁজে বেড়ায়। তারা কোথায় যে তাদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখে হারিয়ে গেল কেউ জানে না। সি-ডেভিল লুকেনার যে বাড়িয়ালাকে কোনও প্রলোভনে ফেলে দেয়নি কে বলবে। তিনি জাহাজে উঠলে ঠিক মাটি টানার কাজে এদিকটায় নেমে আসবেনই। জাহাজি সারেঙরাও বলেছে, এই এক দোষ ব্যাঙ্ক লাইন কোম্পানির। বাড়িয়ালা কোম্পানির এজেন্ট হয়েও যে কাজ করছে না কে বলবে।'

কে যেন উঠে আসছে। বোট-ডেকে কে উঠে আসতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে বোটের নীচে মাথা আড়াল করে মুখার্জি বললেন, 'কেউ না। শব্দটা নীচে উঠছে। এলিওয়েতে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। বাটলারে ঘরের দিকে মনে হয়।'

মুখার্জি বললেন, 'শোন আমার যা যা মনে হয়েছে। ভেবে ভেবে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—আমরা মনে রাখিস প্রফেসনাল নই—আমাদের ভুলচুক হবেই। কি করে যে এত সূত্র পেয়ে যায় গোয়েন্দারা তাও বুঝি না। গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে পড়ে মনে হয়েছে, সমাধানের অঙ্কটা মাথায় আগেই রেখে দেওয়া হয়। লেখক তারপর নানা বাহানা সৃষ্টি করেন। কাহিনীর জায়গায় জায়গায় লাঠি ফেলে রেখে যান। তারপর সব কুড়িয়ে নেন। নিজের খুশিমতো পটভূমি সৃষ্টি করেন, তারপর রহস্যের জাল একে একে ভেদ করেন। জালটা নিজেই বুনে ফেলেন, তারপর নিজেই খোলেন। বিস্তর পড়াশোনার দরকার হয়। অথবা কল্পনা—শালা ও দুটোর একটাও আমাদের নেই। নিরেট জাহাজি। সারাজীবন তুই বয়লারে কয়লা হাঁকড়ালি আর আমি স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গেলাম। সুহাস তো এ-ব্যাপারে আরও নবিশ।'

তারপর মুখার্জি পকেট থেকে কি বের করে দেখালেন—'এটা কি?'

'এ তো দেখছি শোনপাটের সরু দড়ি।'

'দেখেছিস হলুদ রং—একেবারে মাস্তুরে রঙের সঙ্গে মিলিয়ে কিনেছে। মাস্তুলের নীচে কিছুটা পড়েছিল। তুলে রেখেছি। জাহাজের কত গেরো জানিস তো—ফসকা গেরোই

কতরকমের—ডেকজাহাজি কেউ সঙ্গে আছে মনে হয়। ফিতে টানলেই গেরো আলগা। ডেরিক হুড়মুড় করে পড়ে গেছে। কাজেই দুর্ঘটনা নয় ধরে নেওয়া যায়।'

সুরঞ্জন দড়িটা হাতে নিয়ে দেখছে। দড়িটা কাছিতে তবে জড়ানো ছিল। সুরঞ্জন সহসা প্রায় লাফিয়ে উঠল যেন—'তা হলে তো বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজটা করা হয়েছে। মাস্তুলের আড়াল থেকে দড়ি টেনে কেউ কাজটা করেছে ভাবছ!'

'ভাবনা ছাড়া কি সম্বল বল। আততায়ী সুহাস এবং ম্যাককে খুন করার জন্যই জালটা পেতে ছিল। সুহাস বেঁচে গেল চার্লি তাকে ডেকে নিয়ে গেল বলে।'

'না, বুঝছি না কিছু!' সুরঞ্জন হতাশ হয়ে গেল।

'আমি যা সিদ্ধান্তে এসেছি, ভেবে দ্যাখ—ঠিক কি না। প্রমাণ করা যদিও কঠিন, তবু এটা মনে হচ্ছে, এক নম্বর চার্লি যে কোনও কারণেই হোক জাহাজে আত্মগোপন করে আছে। বাধ্য হয়ে থাকতে পারে, অথবা নিজের কোনও সমূহ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাপ্তান চার্লিকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। সেটা কি হতে পারে জানি না। দু নম্বর, চার্লির ঠাকুরদা ধনকুবের—দুই ছেলের সঙ্গেই তাঁর বনিবনা ছিল না। চার্লির বাবা কাকা দুজনই ডিভোর্সি বিয়ে করেন। গুচ্ছের বাচ্চাকাচ্চাসহ। তারা কোথায়! ধনকুবের যদি তিনি সত্যি হয়ে থাকেন, চার্লির বাবাকে জাহাজে পড়ে থাকতে হচ্ছে কেন? তিনি কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'তিন নম্বর, চার্লি ছেলে নয়, মেয়ে।'

'মেয়ে বলছ!'

'হ্যাঁ তাই বলছি। সে কারও সঙ্গে মেশে না। পুরুষের ছদ্মবেশে আছে। নাবালক ছিল এতদিন, অসুবিধা ছিল না। জাহাজেই চার্লি বড় হয়ে গেল। খবরটা একটু লেটে বুঝেছি। তার আগেই কেউ টের পেতে পারে। ম্যাকের সঙ্গে চার্লির ভাব ছিল। অবসর সময়ে দাবা খেলত। চার নম্বর, চার্লির কেবিনে সুহাস ছাড়া সেই ঢুকতে পারত। সুহাস ছাড়া ম্যাকই ছিল চার্লির কাছের লোক। ম্যাক টের পেয়ে গেছে ভেবেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তা হলে সুহাসের কি হবে?'

'সুহাসকে এ-সময় সরিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। পাঁচ নম্বর, ধুরন্ধর আরও কেউ চার্লিকে অনুসরণ করছে। তার কেবিনের পোর্টহোলে উঁকি মারছে। পোর্ট অফ সালফার থেকেই ঝামেলা। সুহাসের সঙ্গে এমন কোনও আচরণে যদি অনুসরণকারী টের পায় চার্লি কিশোরী বালিকা তবে তার জটিল অঙ্ক মিলে যাবে ভেবেছে।'

'ভুল তোমার সিদ্ধান্ত, বাদ দাও তো—তাই যদি হয় লোকটা একদিন অন্ধকারে জাপটে ধরতে পারে—এত কষ্টের কি দরকার। টিপেটুপে দেখলেই টের পেত মেয়ে না ছেলে।'

মুখার্জি ব্যাজার মুখে বললেন, 'আহাম্মক আর কাকে বলে। জাহাজে বাড়িয়ালা হলগে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি কি না করতে পারেন। জানের ভয় শুধু না, নসিব একেবারে আন্ধা করে দিতে পারেন তিনি। সংশয় থেকে সব হয়। বোধ হয় কোনও সংশয়ও আছে, যদি সত্যি চার্লি মেয়ে না হয়ে ছেলেই হয়, তখন কি হবে। অন্ধকারে জাপটে ধরলে কি হয় বোঝ না। সুহাসকে দিয়ে বুঝছ না। বড় টিন্ডাল জাপটে ধরতে গেল, আর সুহাস

ছুটে পালাচ্ছিল। সারেঙ সাব শুনে সবার সামনে বড় টিন্ডালকে খড়ম পেটা করলেন। সবাই টিন্ডালের মুখে থুথু ছিটাল! বড় টিন্ডালকে দেখলে ওরা জাতভাইরা এখনও থু থু ফেলে। কত মাস আগের ঘটনা, এখনও কেউ ভুলতে পারছে না।

'জাহাজি বলে কি ইজ্জত নেই।'

'তা হলে উঠি। সুরঞ্জন উঠতে চাইলে মুখার্জি বললেন, 'সব গোয়েন্দার দেখছি একজন সহকারী থাকে। সেক্রেটারি থাকে—বিশ্বস্ত চাকর থাকে—আমার শালা কিচ্ছু নেই। এত বেছে তোকে সহকারী নিয়োগ করলাম গোপনে, আর তুই কথায় কথায় সব ঝেড়ে ফেলতে চাস। কোনও নিষ্ঠা নেই। নিষ্ঠা না থাকলে বড় হওয়া যায় না জানিস। যাই বলি, উড়িয়ে দিতে চাস। একজন সহকারী সব সময় ধৈর্য সহকারে শুনবে। বোঝার চেষ্টা করবে, সব আদেশ মাথা পেতে নেবে—দুটো একটা প্রশ্নও যে করবি না, তা বলছি না। তবে সব সময় সব প্রশ্নের উত্তর আশা করবি না। কি বুঝলি?'

'সব প্রশ্নের সব সময় উত্তর আশা করব না।'

'হ্যাঁ তাই। টিপেটুপে দেখতে গেলেও ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকে বোঝার চেষ্টা করবি। পোর্ট অফ সালফার থেকে অনুসরণকারী চার্লির পেছনে লেগেছে। চার্লি তার বাবাকে কিছুই বলছে না। কেন বলছে না বল।'

'আমি কি করে বলব?'

'কোনও কারণে বাবার প্রতি চার্লি বিশ্বাস হারিয়েছে। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না। বাবাকে সে বোধ হয় খুব গ্রাহ্য করে না। কাপ্তানও তার পুত্র বল, মেয়ে বল চার্লিকে ভয় পায়। শাসন করার অধিকার তিনি হারিয়েছেন।'

সুরঞ্জন হাই তুলে বলল, 'তোমার ধারণা।'

'হাই তুলছিস। তুই কি রে। এত বড় বিপদে হাই তুলতে পারলি।'

'আচ্ছা বলো তো, হাই উঠলে কি করব? তুমি অযথা রাগ করছ। টিন্ডাল হয়তো চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিয়েছে—আমি যাই।'

'টিন যোগাড় করেছিস?'

'করেছি।'

'যা বলেছিলাম ঠিকঠাক করে যাচ্ছিস?'

'মনে তো হচ্ছে।'

টিমনির গোড়ায় এসে সুরঞ্জনের কি মনে হল কে জানে—সে ডাকল, 'মুখার্জিদা।'

মুখার্জি ফি:র কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'টিন কিন্তু পাইনি। একটা রঙের টব পেয়েছি। ওতে চলবে না?'

'চলবে। কোথায় রেখেছিস?'

'আমার বাঙ্কের নীচে। কেউ দেখলে ভাববে ময়লা ফেলার জন্য রেখেছি। ভাল করিনি?'

'তোর তো যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, এই তো সহকারী। এখন ছাপটাপ পাওয়া গেলেই বোঝা যাবে তিনি কে। সবার জুতো ভাল করে লক্ষ্য করবি। খালি পায়ে কেউ নিশ্চয়ই পোর্টহোলে উঁকি দিতে যাবে না।'

'নিশ্চয় করে কিছু বলা যাবে না দাদা।'

'কেন?' মুখার্জি হতবাক হয়ে গেলেন।

'আরে জুতো পরে গেলে ডেকে কেউ হাঁটছে বোঝা যাবে না?'

'কেন যদি ক্যাম্বিশের জুতো পরে যায়। যেতেই পারে। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস জাহাজে কারও থাকে না। ভয় কখন কি কোথায় ফুটে যাবে। মগড়াকে বলেছিস, সকালে জল মেরে ঝাঁটা মেরে পরিষ্কার করে দিতে?'

'বলেছি। মগড়া রাজি হয়েছে। তবে শর্ত আছে।'

'কি শর্ত দিল?'

'আমাকে গাঁজা ভাঙ ধরতে হবে।'

'তার মানে?'

'কার্ডে যা পায় হয় না। নেশাভাঙে টানাটানি পড়ছে। নাম লেখাতে পারলে কিনার থেকে সে বেশি মাল কিনতে পারবে। আমিও রাজি। একগাল হেসে বলল, কোই দিককত নেই হবে বাবু।'

'সাবাস। ওকে দিয়ে জুতো চুরি করাতে হবে। যদি ছাপটাপ পাওয়া যায়। পোর্টহোলের কাছে আটা ময়দা যাই হোক ছড়িয়ে রাখলে হারামির বেটা যাবে কোথায়। ঠিক পায়ের ছাপ দেখা যাবে। কার জুতোতে আটা ময়দা লেগে আছে দেখা শুধু। মগড়ার তো সবার কেবিনে ফ্রি পাশপোর্ট। এক পাটি জুতো গায়েব করতে অসুবিধা হবার কথা না।'

কিন্তু সব বৃথা। যথানিয়মে গ্যালি থেকে আটা ময়দা চুরি করে সুরঞ্জন গোপনে চার্লির পোর্টহোলের পাশে ছড়িয়ে রাখে, যথানিয়মে মগড়া জল মেরে ঝাঁটা মেরে খুব সকালে ধুয়ে দেয়। কিন্তু জুতোর ছাপ, নিদেন পক্ষে কোনও পায়ের ছাপ পড়ে না। সুরঞ্জন রোজ রোজ রাতে কাজটা করার সময় খুবই সন্তর্পণে হাঁটা চলা করে। ক্যাম্বিসের জুতো পরে হাঁটা চলা করলে টের পাওয়ার কথা না। টের পেলে মুখার্জি জানতেন। সুহাস ঠিক এসে বলত, রাতে কে আবার হাঁটাহাঁটি করছে।

মুখার্জি ভেবে পেলেন না বোকার মতো কাজটা করা ঠিক হচ্ছে কি না। কেন যে মনে হচ্ছে ম্যাক নেই বলে অনুসরণকারীও নেই। আবার এমনও হতে পারে অনুসরণকারী তার চেয়েও ধড়িবাজ। ফাঁদ পেতে তাকে ধরা কঠিন। সে টের পেয়ে গেছে হয়তো জাহাজে তার পিছু নিয়েছে কেউ।

দিন যায়। জাহাজও যায়। জাহাজ তো এখন বেশ হেলেদুলে যাচ্ছে। জাহাজে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা আর ঘটছে না। সুহাসও কোনও খারাপ খবর দিচ্ছে না। চার্লিকে দেখলে সুহাস আগের মতো ছুটে যেতে পারছে না। চার্লির এটা ছদ্মবেশ—যদি সত্যি মেয়ে হয়, কিছুটা যেন তার হতভম্ব অবস্থা। এমনকি একদিন চার্লি পিছিলে চলে এসেছিল, ডাকাডাকি করেছে—সুহাস অধীরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, সে পিছিলে নেই।

'পিছিলে নেই তো গেল কোথায়।' চার্লি বড়ই অধীর হয়ে উঠছে—সুহাসের জন্য। যদি কোনও খবরটবর থাকে। মুখার্জি নিজেই সুহাসকে ডেকে বললেন, 'যা না, দ্যাখ না কেন খুঁজছে। কোনও খবরটবর যদি পাস। মুখোসটার হদিস পাওয়া গেল না। দুটো মুখোস দেখা গেছে থার্ড মেট আর ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ারের কেবিনে। একটা মুখোস একজন পাদ্রির আর একটা মুখোস এক বালকের। হিমশীতল পাথরের মতো ঠাণ্ডা চোখের মুখোসটার

তো কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যদি চার্লি খোঁজটোজ পেয়ে যায়।'

'নেই। অনেক খোঁজাখুজি হয়েছে। তুমিও চেষ্টা করেছ। চার্ট-রুম থেকে চাবি চুরি করে যার তার কেবিনে ঢুকে খুঁজেছ। কিছু পাওয়া যায়নি। চার্লি তো দিব্যি খোস মেজাজে আছে। বললাম, চার্লি, আর ইউ গার্ল। সোজা জবাব, নো নো, মি বয়। সবটাই এখন আমার কাছে প্রহসন মনে হচ্ছে।'

সুহাস কাজে যাবে বলে জামা প্যান্ট পাল্টাচ্ছিল। মুখার্জি বাঙ্কে বসে আছেন। এ তো আরেক গভীর গাড্ডা। তাঁর মাথা খারাপ অবস্থা। তুই বললি—চার্লি আর ইউ গার্লি!'

'বলব না কেন? সে যদি আন্তরিক হয়, তবে আমাকে বলতে বাধা কোথায় বলো। কই বলল না তো, মি গার্ল। তার তো উচিত সব খুলে বলা। তোমরাই কেন ভাবছ, চার্লি বালিকা, বুঝছি না। মি বয়! বলে হাউহাউ কান্না। কি বলল জানো, আমরা নাকি সবাই মিলে তাকে নিয়ে মজা করছি। মজা আমরা করছি না চার্লি করছে। কোথায় সে কখন কাকে দেখছে, আর তার ভয়ে জড়সড়। নাটক বুঝলে। উইনচে আর কাজে যাচ্ছি না।'

'কোথায় কাজ করছিস তবে?'

'ইঞ্জিনরুমে। তেল জুট সিরিস নিয়ে রেলিং ঘসামাজা করছি। এখন তো মনে হচ্ছে, আমিই তামাসার পাত্র হয়ে গেলাম।'

'আরে গাধা তুই বলতে গেলি কেন, তুমি কি মেয়ে। তোর কি মাথায় কিছু নেই।' বলে মুখ ভ্যাংচালেন মুখার্জি।

'কেন তুমি যে বললে ফিফটি ফিফটি।'

'এখন আর ফিফটি ফিফটি বলছি না। সেন্ট পারসেন্ট ধরে রাখ।'

'ধরে রাখতে হয় তোমরা রাখ। আমার কিচ্ছু আসে যায় না। আমি যাচ্ছি। আর কিছু বলার আছে!'

'কাজে গেলেই কি রেহাই পাবি। চার্লিও যে তোর উপর অভিমানে কেবিন থেকে বেরই হচ্ছে না এটা কি তোর একবারও মনে হয়েছে। তোকে দেখতে না পেলে চার্লি সব অন্ধকার দেখে এটা বুঝিস?'

সুহাস লকার খুলে কি খুঁজল। পেয়েও গেল। ওটা ছুঁড়ে দিল মুখার্জিদাকে। বলল, 'এই নাও, দেখ কি লেখা আছে। ওটা চার্লি আমাকে দিয়েছিল—তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। কলিজ বলে একটা জাহাজডুবির ঘটনা এতে লেখা আছে। চার্লি তার বাবার ডাইরি থেকে উদ্ধার করেছে।

মুখার্জি পড়ে চমকে গেলেন। কাপ্তান ডাইরিতে কলিজ কবে ডুবেছে, কি তারিখ, কেন ডুবল—মিত্রপক্ষের মাইনফিল্ড, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪২ সাল আরও কিছু খবর—তিনি পড়তে পড়তে কেমন রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'এত বড় খবরটা তুই অবহেলায় ফেলে রেখেছিস। তুই কি বুঝতে পারিস না, কাপ্তান জাহাজটার খোঁজেই ঘোরাঘুরি করছেন।'

'কোনও খবরই আমার কাছে আর গুরুত্ব পাবে না। চার্লি ডেকে বের হচ্ছে না, আমার উপর অভিমান করে নয় বুঝলে। চার্লি অসুস্থ। তাই বের হতে পারছে না। শুয়ে আছে। কাপ্তানবয়কে দিয়েই চার্লি খবরটা পাঠিয়েছে। সঙ্গে আমাকে কেবিনে যেতেও বারণ করে

দিয়েছে। বুঝতেই পারছ তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কোনও মূল্য নেই। চার্লি যে অসুস্থ তারও খবর রাখো না। কাপ্তান জাহাজটার খোঁজে আসুন আর মাটি টানার কাজে আসুন আমার কিছু যায় আসে না।'

'কি হয়েছে?'

'আমি কি করে বলব। কাপ্তানবয় বললেন, 'চিন্তা করার কিছু নেই। ও হয়। ক'মাস ধরেই নাকি হচ্ছে। দু-দিন হল উঠতে পারছে না।'

'উঠতেই পারছে না, এত অসুস্থ!'

'বলল তাই। তাকে কাপ্তান এবারে ডাক্তার দেখাবেন। ঘাটে জাহাজ লাগলেই।'

সে সিঁড়ি ধরে উঠে যেতে চাইলে হাত ধরে ফেললেন মুখার্জি। টেনে ফোকসালে ঢুকিয়ে দিলেন। দরজা বন্ধ করে বললেন, 'খুবই দুরারোগ্য ব্যাধি, মাঝে মাঝে যখন হয়, সহজে সারবে বলে মনে হচ্ছে না। তারপর থুতনি নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, অসুখটা খুবই কঠিন দেখছি। মুখ ব্যাজার করে রাখিস না--ভগবানকে ডাক ভাল হয়ে যাবে। বলে তিনি মুচকি হাসলেন।

বারো

'জাহাজ আর ঘাটে লাগছে। ঘাটই খুঁজে পাচ্ছে না হারামির বাচ্চারা। সারাদিন চোখে দূরবিন লাগিয়ে খোঁজাখুঁজি করছেন। মর ঘুরে। রাস্তাঘাট চেনে না, জাহাজের মতি গতি ভাল না, কোথায় নিয়ে এসে ফেলল রে বাবা। আঠারো দিন হয়ে গেল! কথা ছিল না বারো চোদ্দদিনের মাথায় ডাঙা পাওয়া যাবে! কোথায় ডাঙা—?'

বংশী তেলের ক্যান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিংকার করছে। এইমাত্র উপরে উঠে কেন যে তার মেজাজ বিগড়ে গেল কেউ বুঝতে পারছে না। চেঁচামেচি শুনে সবাই উপরে ছুটে এসেছে! বংশীর আবার কি হল! মাঝে মাঝেই বংশী খেপে যায়। অনিশ্চয়তা শুধু বংশীকেই কাবু করে ফেলেনি, সবাই যেন তার শিকার। সত্যি তো এতদিন তো লাগার কথা না, জাহাজ কি তবে সমুদ্রে নিজের খুশি মতো বিচরণ করছে! জাহাজ কি সত্যি অজানা সমুদ্রে ঢুকে গেল?

ইনজিন সারেঙ স্টোকহোলডে নেমে গেছেন। তিনি উপরে থাকলে বংশীকে ধমকধামক দিয়ে থামাবার চেষ্টা করতে পারতেন। যা মুখে আসছে বলছে বংশী। 'কুত্তার বাচ্চারা ভেবেছে কি! আমরা মানুষ না। দেব জাহাজে আগুন লাগিয়ে। কার সাধ্য আছে—রোখে।'

ভাণ্ডারি বলল, 'বংশীদা আগুন দেব? নিয়ে যাও।'

বংশী আরও খেপে গেল। তেড়ে গেল ভাণ্ডারিকে।

'মিঞা তোমরা কি মানুষ না। তোমাদের ঘরবাড়ি নেই!'

এ-সময় মাথা গরম করে লাভও নেই। সত্যি তো, আঠারো দিন হয়ে গেল! ডাঙার দেখা নেই। ডাঙা পেলেও কিছুটা স্বস্তি। তার চেঁচামেচিতে ডেকজাহাজিরাও জড়ো হয়েছে। এটা ঠিক, জাহাজ কোথায় আছে না আছে কোনও খবরই তারা পায় না। জানেও না, কি হচ্ছে না হচ্ছে। তারা জাহাজের মাট বল্টু ছাড়া কিছু না। আর পিছিলে চেঁচামেচি করলে, কে শোনে! কুত্তার বাচ্চা বলে গাল দাও, আগুন লাগাও কেউ শুনতে আসছে

না। আর উত্তেজনা কিংবা গোলমাল যতই হোক, সারেঙ যতক্ষণ নালিশ না দিচ্ছে, তাঁর কোনও গুরুত্ব থাকে না।

মুখার্জি উঠে এসেছেন। তিনি ক্যানটা তুলে পিছিলের বেঞ্চিতে রেখে দিলেন। ডেকে চিত হয়ে শুয়ে আছে বংশী। যেন সে আর কাজে যাবে না। পরি ছেড়ে চলে এসেছে। ভাঙুক সব। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। ইনজিনে পিস্টন রডে, ক্র্যাঙ্কওয়েবে—সর্বত্র তেল খাওয়াতে হয়। না হলে ইনজিন গরম হয়ে গিয়ে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। টানা আঠারো দিন জাহাজ চলছে। ইনজিনের বিরাম বিশ্রাম বলে কিছু নেই। মবিল ঠিকমতো জয়েন্টে না পড়লে গাঁটে গাঁটে ব্যথা। তারপর অবশ। খুবই জরুরি কাজ। মুখার্জি মাথার কাছে গিয়ে বললেন, 'ওঠ। যা নীচে।'

'না যাব না।'

'জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। যা বলছি।'

'যাব না, যাব না। কেউ কিছু বলবে না। দেখতে পাচ্ছ না, আমরা মানুষ না, কি ভাবছ তোমরা। তুমি না সুখানি---কই বলতে পারছ, জাহাজ কোথায়। জানো কিছু?' কোন সমুদ্রে জাহাজ বলতে পারো?'

'জানি।'

'কোথায় জাহাজ?'

'আগে কাজে যা। তোর একার ঘরবাড়ি বিবি বাচ্চা পড়ে নেই মনে রাখবি। জাহাজ অজানা সমুদ্রেও ঢুকে যায়নি। অজানা সমুদ্র বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। আমাদেরও ঘরবাড়ি আছে। দেশে বউ আছে। রাস্তায় ছেলে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। চিঠি পেলে মার কাছে দৌড়ে যায়। চিঠি চিঠি—সারা কলোনিতে খবর রটে যায়---দেবু মুখার্জির চিঠি এসেছে।'

'চিঠিই সব নয় দাদা! বুঝছ না কেন! তোমরা কেন বলছ না, জাহাজ দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে। কেন বলছ না বলো! তোমাদের মতলব ভাল না, বুঝি না মনে করো!'

'সবাই রাজি হবে। টাকা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। —ছেলেমানুষি করিস না। আমাদের অপদস্থ করিস না। কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। এতকাল জাহাজে চাচাদের রাজত্ব ছিল। মুখ বুজে সব সহ্য করে আসছে। কোনও গোলমাল পাকায়নি। তোরা উঠেই গোলমাল পাকালে, কোম্পানি পছন্দ করবে কেন। বাঙালিবাবুদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছিস। ওঠ। কই সুহাস তো তোর মতো ভেঙে পড়েনি। দামড়া কোথাকার। বিয়ে করে জাহাজে উঠতে কে বলেছিল! উঠলি কেন! যা নীচে।' মুখার্জি হাত টেনে তুলে বসালেন বংশীকে। তারপর মবিলের ক্যান হাতে ধরিয়ে বললেন, 'মেয়েমানুষের অধম!' জোর করে তুলে প্রায় ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলেন পিছিল থেকে।

বংশী হেঁটে চলে যাচ্ছে। মুখার্জি জানেন, কিচ্ছু করার নেই। বাড়িয়ালার মর্জি না হলে জাহাজ হোমে ফিরবে না। জাহাজে কি বড় রকমের কিছু ঘটতে যাচ্ছে! তারা সাধারণ জাহাজি—অধিকাংশ নিরক্ষর—তাদের নামও নেই জাহাজে। সুখানি, টিন্ডাল, সারেঙ ছাড়া ডাকখোঁজও করেন না অফিসার ইনজিনিয়াররা। সাদা চামড়ার ইজ্জত কত জাহাজে উঠলে বোঝা যায়। বন্দরের রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে, ম্যান কোথায় যাচ্ছ। এতদিন এক জাহাজে থেকেও সম্পর্ক দুই মেরুর! তারা বাসিন্দাও দুই মেরুর। খানাপিনা সব আলাদা। তারা

কি খায় সাদা চামড়ার লোকগুলি খোঁজ রাখে না। তারাও ডাইনিং হলে লাঞ্চ কিংবা ডিনারে কি পরিবেশন করা হয় জানে না। তারা মাদুর পেতে খায়। আর ডাইনিং হলে ডিনারের সময় মিউজিক বাজে। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠনও টাঙিয়ে দেওয়া হয়। অতিথি অভ্যাগত বন্দরে লেগেই থাকে। মেসরুম মেট, মেসরুমবয়, কাপ্তানবয়, স্টুয়ার্ড থেকে চিফকুক সব খিদমতগার। তাদের সম্বল ভাণ্ডারি। ডেক-ভাণ্ডারি ইনজিন-ভাণ্ডারি। অসুখ বিসুখে সেকেন্ডমেট দাওয়াই দেন। অব্যবস্থার চূড়ান্ত। তার উপর বংশীর এই বিদ্রোহ—সুহাসের নির্বুদ্ধিতা, মুখোসের রহস্য, ম্যাকের মৃত্যু—বুনো ফুলের গন্ধ, সি-ডেভিল লুকোনোর থেকে কলিজ জাহাজ ক্রমে রহস্যকে গভীর করে তুলেছে।

মুখার্জি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, চার্লি কেন বাবার ডাইরি থেকে 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' নামে জাহাজটির খবর সুহাসকে পাচার করল। বাবার কোনও বিপদ হতে পারে—কিংবা তার বাবা যে মাটি টানার নামে প্রবাল দ্বীপগুলি ঘুরে বেড়াবার অছিলা খোঁজেন, এমনও প্রমাণ এতে কি থাকতে পারে! প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটি আগে ছিল প্রমোদতরণী। যুদ্ধের সময় জাহাজটি মার্কিন সরকার বাজেয়াপ্ত করে। চার্লির ঠাকুরদা সেই জাহাজের যদি মালিক কিংবা অংশীদার হন! কলিজ জাহাজ কোথায় ডুবেছে তারও উল্লেখ আছে পাচার করা খবরটিতে। চার্লি কি নিজের জীবন বিপন্ন, এমন আশঙ্কা করছে!

ফোকসালের সিঁড়িতে সুহাসের সঙ্গে দেখা। সে কেন কাজ ফেলে পিছিলে এসেছিল জানেন না। সুহাস সিঁড়িতে উঠে ফের নেমে এল, মুখার্জিকে বলল, 'দাদা, তুমি বুঝলে কি করে বুনো ফুলের ছবি এঁকে চার্লি আমাকে দেখাচ্ছিল!'

'হঠাৎ তোর এই অবান্তর প্রশ্ন কেন বুঝছি না!'

'না, বুঝলে কি করে?'

'বুনো ডেইজি ফুল দেখাবার জন্য কিনারায় চার্লি তোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখিয়েছে?'

'না।'

'আবার দেখাতে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য যদি খুঁজে পায়। ডেইজি ফুল দেখাবার তার এত শখ কেন বুঝি না। আসলে সে কিছু দেখাতে চায়, তবে বুনো ডেইজি ফুল নয়, তুই বোকা বলে বুঝতে পারছিস না। এবার তো অসুস্থ। গিয়েছিলি কেবিনে?'

'যাব কিনা বুঝতে পারছি না। চার্লি তো বারণ করেছে।'

'যদি যাস, কলিজ জাহাজের আর কোনও খবর যদি পারিস নিবি।' পরে কি ভেবে বললেন, 'না থাক। কোনও খবরেই কৌতূহল দেখাবি না। চার্লি নিজে থেকে বললে শুনবি। হুঁ হাঁ এই পর্যন্ত। তোকে কোনও মন্তব্য করতে হবে না।' তারপর ঘড়ি দেখলেন, কি করা যায়, বংশীর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে। চোখে তন্দ্রার মতো এসেছিল। দিল ভেঙে! কিছু ভাল না লাগলে পিছিলের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকা যায়। আর সুমদ্রের ঢেউ ভাঙাভাঙির খেলা, দিগন্তব্যাপী অসীম সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি জীবনের নানা খুঁটিনাটি তুচ্ছতা সহজেই দূর করে দেয়। কিনার কালই দেখতে পাওয়া যাবে। তারা নিউ হেবরিডস দ্বীপপুঞ্জ পার হয়ে এসেছে—কাছে কোথাও কোনও প্রবাল দ্বীপে জাহাজ ভিড়বে। অফিসারদের কথাবার্তা থেকে তিনি এমন বুঝেছেন। প্রমোদ তরণী, যুদ্ধের কাজে শেষে

সামরিক দপ্তর ব্যবহার করতে পারে চার্লির ঠাকুরদা হয়তো অনুমানই করতে পারেননি। প্রমোদ তরণীতে তিনি যে নিজেও এই অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেননি কে বলবে। লুকেনারের অগাধ ধনসম্পদের কথা দ্বীপবাসীদের মুখে প্রায় কিংবদন্তীর সামিল। জনশ্রুতি পাহাড়ের খাঁজে, কোনও মৃত আগ্নেয়গিরির বুকে ধনসম্পদ লুকানো আছে। অথবা এও মনে করা হয়—ধনসম্পদের খোঁজ পেয়ে গেলেই আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা। কেউ ফিরে আসতে পারে না। রাক্ষুসে হাঙরেরা খেয়ে হজম করে ফেলে অথবা দেখা যায় জাহাজ এবং সব নাবিকেরা মৃত। পরে দেখা যায়, জাহাজ খালি এবং মৃত মানুষগুলির কোনও খোঁজই পাওয়া যায় না। চরায় আটকে পড়ে থাকে জাহাজ।

তবে কোথায় এমন সব আজগুবি ঘটনা ঘটছে কেউ বলতে পারে না। যে কোনও দ্বীপ কিংবা পাহাড় আর আদিবাসীদের গুরুত্ব এ-জন্য অসীম। যারা এই ধনসম্পদ উদ্ধারে যায় তারাই হারিয়ে যায়—বিষয়টা গোঁজামিলের ব্যাপার। কারণ জনশ্রুতির ল্যাজা-মুড়ো এক করা সব সময়ই কঠিন। এই বিসমার্ক সি এবং কোরাল সিতে অজস্র জাহাজের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে। তবে অধিকাংশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার। চরায় জাহাজ উঠে গেছে, বনজঙ্গল গজিয়ে গেছে জাহাজের চারপাশে এমন দৃশ্য সে নিজেও দেখেছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধে নিউগিনি থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এলাকা ছিল প্রবল উত্তপ্ত। জাপ বাহিনী নিউ ব্রিটেন দ্বীপের রাবাউলে পাঁচটি এয়ার স্ট্রিপও তৈরি করে ফেলে। বিশাল নৌবহর। নিউগিনির মোরসবি দ্বীপে মিত্রশক্তির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। মিত্রশক্তিকে পিছু হটতে হয় বাধ্য হয়ে এবং কোরাল সিতেই প্রথম মিত্রশক্তি বড় ধরনের জয়লাভের পর যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ জাপ বাহিনীর ক্রমে কমে আসতে থাকে। প্রায় এক লক্ষ জাপ সেনা হয় যুদ্ধবন্দি নয় সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যায়। সঙ্গে অজস্র জাহাজ উভয় পক্ষের। বোমারু বিমান শয়ে শয়ে। ভাবতে গেলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

এই এলাকা এখন কত শান্ত নিরীহ! শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর পারপয়েজ মাছের ঝাঁক। কখনও বড় এনজেল মাছের ঝাঁক। অজস্র বিষাক্ত মাছেরও ছড়াছড়ি। এই এলাকাটি ভয়াবহ নানা কারণেই। তিনি এখানে আরও ঘুরে গেছেন বলেই জানেন। মাছে মাছি না বসলে, খাওয়ার উপযুক্ত বলে ধরা হয় না। মাছের এই বিচিত্র লীলাভূমিতেই জাহাজ এখন ঢুকে গেছে। ব্যাপ্ত মহিসোপান পার হয়ে অনন্ত মহাসাগর। আবার তারই বুকে সিন্দুর টিপের মতো সবুজ কিংবা মেরুন রঙের দ্বীপ ঝলমল করে ওঠে। কখনও মনে হয় দূর থেকে সবুজ পান্নার মতো দ্বীপটি ভেসে আছে। লাল বালুকাময় দ্বীপ থেকে কালো লাভায় তৈরি এই অজস্র দ্বীপমালায় বিচিত্র সব পাখি, কুমির, কচ্ছপ থেকে প্যালিকান, পেঙ্গুইন কি নেই! বংশীটা কেন যে ভাবতে পারছে না, এই যাত্রা তাদের কোনও দুঃসাহসিক অভিযানের সামিল। ভাবলে বাড়ির জন্য এতটা হতাশ হয়ে পড়ত না।

সুহাস সহসা যেন মনে করিয়ে দিল, 'কি ভাবছ বলত। আমাকে কেবল দেখছ! কথা বলছ না! এত কি দেখার আছে আমাকে বুঝি না। তুমি কিছুতেই বলছ না।'

'বুনো ফুল এঁকে তোকে কেন দেখাচ্ছিল জানতে চাইছিস তো?'

'আরে না। বুঝছ না কেন চার্লি, ব্লেজিং স্টার বলো, ওয়াটার লিলি বলো, নিজের শখ থেকেও আঁকতে পারে।'

'শখ থেকে আঁকা ছবি ময়লার ঝুড়িতে কেউ ফেলে রাখে!'

'কেন পারে না।'

'না পারে না। আমি তো ব্রিজ থেকে বিকেলের ডিউটি সেরে নামার সময় দেখতে পেলাম—গুচ্ছের কাগজ, নানা রঙিন ফুলে আঁকা। নিশ্চয় তোকে ফুলগুলি চেনাবার জন্যই এঁকেছিল। চেনা হয়ে গেলে, আর সে ফুলের দাম থাকে! বাজে কাগজ হয়ে যায় না। কাপ্তানবয় নিশ্চয়ই ওর বিছানার নীচে থেকে কুড়িয়ে ওগুলো ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে রেখেছিল। সেই থেকেই অনুমান। ঝট করে বলে ফেলতে পেরেছি। চার্লি তোকে ফুলও এঁকে দেখিয়েছে। ডেইজি ফুল কিন্তু সেখানে এঁকে দেখায়নি। এত সুন্দর আঁকতে পারে! চার্লির সত্যি অশেষ গুণ—অথচ নির্দোষ সরল, এই বলে থামলেন, ছেলে বলবেন, না, মেয়ে বলবেন—আহাম্মকটা তো মেয়ে বলায় চটেই লাল! তিনি বললেন, 'চার্লির অকপট সারল্য ছবিগুলিতে ধরা যায়। আবার ছবিগুলির মধ্যে কোথাও যেন ক্রোধ ফুটে উঠেছে। আগ্নেয়গিরির সুপ্ত লাভার মতো। কাগজগুলি সব রেখে দিয়েছি।'

তারপর কি ভেবে চুপ করে গেলেন। কাগজগুলি সব রেখে দিয়েছি বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তিনি বললেন, কাগজগুলি রেখে দিয়েছিলাম, তবে আর দরকার নেই। তুই নিয়ে নিতে পারিস।'

'আমি নিয়ে কি করব।'

'তা অবশ্য ঠিক। কাগজগুলি রেখে দিয়েছি বললে, সুহাস যে চার্লিকে বলবে না, দাদা কাগজগুলি রেখে দিয়েছে, কেন রেখে দিয়েছে, কোথায় যে ফুলে বিষাক্ত পোকার বাস থাকে কে বলতে পারে। তিনি যেন আঁকা ছবিগুলির ব্যাপারে কোনও গুরুত্বই দিতে চাইছেন না। শুধু বললেন, 'বুঝতে পারছিস আমি যা ভাবি তা ঠিকই ভাবি।'

সুহাস ক্রমেই মানুষটার প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। তিনি নীচে নেমে যাচ্ছেন। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। এখন যেন তাঁর আর কারও সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। সোজা ফোকসালে গিয়ে শুয়ে পড়বেন দরজা বন্ধ করে। বংশীদা আবার গোলমাল শুরু করেছে খবর পেয়েই উপরে ছুটে এসেছিলেন।

বংশীদার চোখ মুখ দেখলেও তার আজকাল ভয় হয়। হতাশ চোখ। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ কমে গেছে! ধরেই নিয়েছেন দেশে আর তাদের ফেরা হবে না। কখনও কখনও কাজে যেতেই চান না। ঠেলেঠুলে পাঠাতে হয়। কাজের পোশাক পরে উপরে উঠে গিয়ে বসে থাকেন। ঠেলেঠুলে কাজে পাঠানো কত ঝামেলা সে এক ফোকসালে থেকে বুঝেছে।

মুখার্জিদাও যেন বংশীকে নিয়ে উচাটনে আছেন। বংশী যতক্ষণ কাজে নেমে না যাচ্ছে, তিনি নিশ্চিন্তে শুতেও যেতে পারেন না। চার ঘন্টা ডিউটি, আট ঘন্টা বিশ্রাম। ব্রিজ থেকে নেমে হাত মুখ ধুয়ে চা খান পিছিলের বেঞ্চিতে বসে। এই করতে করতেই সকাল হয়ে যায়—তারপরও তিনি আটটা পর্যন্ত জেগে থাকেন—বংশীদা কাজে না নামা পর্যন্ত বড় অস্বস্তি তাঁর।

হতেই পারে। কারণ দেশ ভাগের পর কলকাতা বন্দর খালি হয়ে যাবার কথা। জাহাজিরা সব পূর্ব পাকিস্তানের। কোম্পানির আজন্মকাল থেকেই তাঁরা কাজ করে আসছেন। ব্যাঙ্ক লাইন, ক্লক লাইন, সিটি লাইন, বি আই কোম্পানি সর্বত্র তারা—তাদের বাপ, নানা

এবং আরও আগে যাঁরা ছিলেন—একেবারে যেন বংশগত এই ধারা। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় তারা ভিনদেশি। এত বড় বন্দর তো ভিনদেশিদের উপর ভসরা করে ফেলে রাখা যায় না। ভারতীয় নাবিকেরা উঠে আসতে শুরু করায় তারা বিপাকে পড়ে যেতেই পারে। ভাল চোখে দেখার কথাও না। রুজি রোজগারের প্রশ্ন। পেটে হাত পড়লে তো সংঘর্ষ বাধবেই। কাজে কামেও তারা খুব পটু। তুলনায় ভারতীয় নাবিকেরা কিছুটা কামচোর—কোম্পানিগুলির দোষও দেওয়া যায় না। বংশীর জন্য ভারতীয় নাবিকেরা ফেরে পড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কাতেই মুখার্জিদা ভুগছেন।

যেন ভারতীয় নাবিকদের যশ অপযশের দায় মুখার্জিদার মাথায় কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। ঘুম ভাঙলেও তিনি বাথরুমে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি দেবেন। দেখবেন, বংশীদা আছে কি নেই। কেউ থাকলে বলবেন, 'কাজে গেছে?'

'গেছে।' ব্যস যেন আর কিছু জানার তাঁর আগ্রহ নেই। কাজ ফেলে ইদানীং মাঝে মাঝে চলেও আসেন বংশীদা। একজন গ্রিজারকে মাঝে মাঝে উঠে আসতেই হয়। স্টিয়ারিং ইনজিনে মবিল দিতে পিছিলে আসতেই পারে। পিছিলের বেঞ্চিতে বসে চা সিগারেট খাওয়াও যায়। কিন্তু বংশীদা স্টিয়ারিং ইনজিনের ঘরে না ঢুকে নিজের ফোকসালে নেমে যান। তারপর বাঙ্কে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকেন। তাড়া না দিলে তাঁকে নড়ানো যায় না। এই এক উটকো ঝামেলা বংশীদাকে নিয়ে। কখনও চোখ জবাফুলের মতো লাল, বাঙ্কে মটকা মেরে পড়ে থাকেন। ঘুমটুম যেন সব গেছে তাঁর।

সুহাসের মাঝে মাঝে ভয়, কিছু না শেষে একটা করে বসেন। জাহাজিদের মানসিক অবসাদ দেখা দিলে খুব আতঙ্কের। মুখার্জিদাও ভাল নেই। অথচ কি করে যে বুঝে ফেললেন, চার্লি তাকে বুনোফুলের ছবি এঁকে দেখিয়েছে, কোনটা কি ফুল—কত কিসিমের ফুল যে হয়, চার্লির সঙ্গে পিকাকোরা পার্ক ঘুরে না বেড়ালে জানতেই পারত না। সব ফুল তো আর সব জায়গায় ফোটে না! না ফুটুক, সে ফুলগুলি এঁকে দেখাতে পারলেই খুশি। সে একা ছিল কেবিনে। দরজা বন্ধ ছিল। কেউ জানার কথা না। অথচ মুখার্জিদা টের পেয়ে গেছেন।

চার্লি অসুস্থ, খবরটা তিনি জানেন না বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সে ডাকল, 'মুখার্জিদা।'

মুখার্জি খেয়ালই করেননি, সুহাস তাঁর পিছু পিছু ফোকসালে এসে ঢুকেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন। খুশি না। কাজ ফেলে গুলতানি। যা উপরে যা। হয় এমন কিছু ভাবছিলেন, নয় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে তাঁর। সুহাস বলবে কি বলবে না ভাবছিল।

মাঝে মাঝে মুখার্জিদার গম্ভীর মুখ দেখলে সমীহ না করে উপায় থাকে না। দীর্ঘকায় মানুষটির মুখে চোখেও আভিজাত্য আছে। মুখার্জিদা তাঁর বাঙ্কে বসে বালিশ চাদর ঠিক করছিলেন অথচ তার দিকে তাকাচ্ছেন না।

'আমি যাই দাদা।' কেমন ভয়ে ভয়ে বলল সুহাস।

'তামাসা দেখতে এসেছিলি?'

'কিসের তামাসা বলছ?'

'তবে যাই বলছিস কেন। চোরের মতো আমার ফোকসালে ঢোকা কেন! কতবার

বলেছি, যখন তখন না বলে ঘরে ঢুকবি না, মনে থাকে না।'

সুহাস বিস্ময়ে থ। তিনি কখনও বলেননি, তার ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা বারণ।

সে বলল, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকলে তো ল্যাটা চুকেই যেত। চুকছে কি, কি বলতে এসেছিলে সোজা বলে ফেল। সারারাত ঘুমাই না, দিনেও যদি চোখ বুজতে না পারি মেজাজ ঠিক থাকে!' বলেই শুয়ে পড়লেন। গরম পড়ে যাওয়ায় জামা গায়ে রাখা যায় না। কি ভেবে উঠে বসলেন। জামা খুলে পকেট হাতড়ালেন, সিগারেট লাইটার বের করে শুয়েই সিগারেট ধরালেন। বললেন, 'যা বলতে হয় বলে ফেল—তোরা সবাই এক একটা চিজ।'

এরপর আর কিছু বলা যায়? সুহাস উঠে পড়ল।

'যাচ্ছিস কোথায়।' তিনি সিগারেট টানতে টানতে নিবিষ্ট মনে আগুনটা দেখছেন। লাইটারের আগুন। লাইটার নেভাতে যেন ভুলে গেছেন তিনি।

'না, আমি বলছিলাম—'

'না, আমি বলছিলাম বলে কোনও কথা থাকতে পারে না। বল, বলছিলি, চার্লি অসুস্থ খবরটা সত্যি আমি জানতাম কি জানতাম না। ফুলের কথা বলায় বিভ্রমে পড়ে গেছিস। কি তাই তো?'

সুহাস তাজ্জব।

'কি রে চুপ মেরে গেলি!'

'তুমি কি জ্যোতিষি জান!'

'ও সবে বিশ্বাস নেই। কিছু ঘটনা ঘটলে, আরও কিছু ঘটনা ঘটে। সব কিছুরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে। জ্যোতিষীরা যা করে—এই যে চট করে মুখ দেখে, হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, কোষ্ঠি গণনা, কিছু কিছু ফলেও যায়—আরে মানুষের রোগ, শোক, ব্যাধি, মৃত্যু তো থাকবেই, অশান্তিও থাকে। দুর্ঘটনাও ঘটবে। সব মানুষের জীবনেই এগুলি থাকে। এগুলো যে কেউ বলে দিতে পারে। কেউ কেউ একটু বেশি পারে। চর্চা করলেই পারে। আসলে মিলুক না মিলুক সৌভাগ্যের কথা কে না শুনতে চায়। এর উপরই সব জালিয়াতি, জোচ্চুরি চলে থাকে জ্যোতিষির নামে। ধরে নে আমি কিছু চর্চা করছি। আমার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাবি না।'

সুহাস সব শুনে বলল, 'তুমি তবে জানতে চার্লি অসুস্থ। অথচ না জানার ভান করে বললে, অভিমানে সে কেবিন থেকে বের হচ্ছে না।'

'না জানতাম না।'

'এত জানো, আর এটা জানতে না। ওর কেবিনের পাশ দিয়ে তো কাজে যাও।'

'যাই, তবে চার্লি এখন আমার মাথায় নেই। চার্লি সুস্থ না অসুস্থ তা নিয়েও মাথা ঘামাবার দরকার মনে করছি না।'

'চার্লি অসুস্থ। কি হয়েছে কিছু জানো!'

'বললাম তো, না।'

'কাপ্তানবয় যে বলল, মাঝে মাঝে হয়।'

এবার কেন যে না উঠে পারলেন না মুখার্জিদা তার দিকে তাকালেন। তারপর কেমন

হাসি মুখে বললেন, 'আরে বন্ধু বয়ঃসন্ধিক্ষণের দোয। বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে কষ্ট পাচ্ছে। দেখলাম তো কাপ্তানবয় হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে চার্লির কেবিনে ঢুকছে। এতে চার্লি অসুস্থ হয় কি করে! প্রকৃতির নিয়ম। কোমরে তলপেটে কত জায়গায় ব্যথা হতে পারে। সবার যে হয় তাও না। তবে কারও কারও হতেই পারে।

'চার্লি তবে অসুস্থ নয় বলছ।'

'অসুস্থ তবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।' ঘাড় তুলে, ছোট্ট একটা রঙের খালি কৌটো খুঁজছিলেন তিনি। সুহাস তাড়াতাড়ি বাঙ্কের নীচ থেকে খালি কৌটো এগিয়ে ধরলে ছাই ঝাড়লেন আগুনের। সে উঠেও পড়তে পারছে না। অসুস্থ তবে ধর্তব্যের মধ্যে নয় কেন, সে বুঝছে না। এই যে বললেন, খুব দুরারোগ্য ব্যাধি—সহজে ছাড়ছে না, কখন কি বলেন নিজেও বোধহয় মনে রাখতে পারেন না। অসুস্থ হলে তো দেখতে যাওয়ারই রীতি। তার সঙ্গে চার্লির এত ভাব, অথচ সেই চার্লিই খবর পাঠিয়েছে, সে যেন না যায়। কি যে খারাপ লাগছিল!

মুখার্জিদা বললেন, 'খুব একা একা লাগছে নারে!'

কেন মুখার্জিদা তাকে এ-কথা বলছেন, তাও সে বুঝছে না। চার্লি কাছে থাকলে কি করে সময় কেটে যায় টের পায় না সে—এটা অবশ্য ঠিক। চার্লির যে কত রকমের প্রিয় গাছ আছে, কত রকমের যে তার শখ ছিল, সে ঘোড়ায় চড়তে পারে—কখনও কখনও ঘোড়ায় চড়ে বনভূমির পর বনভূমি পার হয়ে যেত। তার পড়াশোনার জন্য শিক্ষয়িত্রী আসত বাড়িতে—ভাঙা লঝঝড়ে ফোর্ড গাড়িতে আসত। চার্লি নাকি তার পড়ার ঘর থেকেই দেখতে পেত, গাড়িটা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছে। তার তখন নানা কূটবুদ্ধি গজাত।

পড়তে আর কার ভাল লাগে—জঙ্গল থেকে কখনও সে শুঁয়োপোকা পাতায় করে টেবিলের উপর রেখে দিত। ব্যস দেখামাত্রই লাফ, পুয়োর ডেভিল! আর সঙ্গে সঙ্গে মিসকে খুশি করার জন্য বলত, মিস, লেট মি গেট ইয়ো সাম কফি। সঙ্গে সঙ্গে নাকি চার্লির প্রতি এত প্রসন্ন হয়ে উঠত যে, তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, পোকামাকড়ের দোষ কি বলো! তারা তো ঘুরে বেড়াবেই। যা জঙ্গল আর কাঁটাগাছের পাহাড়!' যেন পোকাটা ভুল করেই প্রাসাদের মতো বাড়িটার কোনও কক্ষে কাঁটাগাছের তাড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢুকে গেছে। তখন নাকি চার্লির বেদম হাসি পেত। হাসি সামলাবার জন্য ছুটত পাশের ঘরে।

'চার্লি তোর খুব কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে এটা কি টের পাস? চার্লি এত কি কথা বলে তোর সঙ্গে তাও বুঝি না।' মুখার্জিদা সিগারেটের আগুন খালি কৌটোয় ঘষে নির্ভিয়ে দেওয়ার সময় যেন কিছুটা স্বগতোক্তি করলেন।

সুহাস কি বলবে ঠিক যেন ভেবে পেল না। ঘোড়ায় চড়ে ক্যাডো লেকের চারপাশে চার্লি ঘুরে বেড়াত। কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাও বুঝতে পারছে না। এতটুকু ছেলে ঘোড়ায় চড়তে পারে কখনও! অবিশ্বাসও করা যায় না। দড়ি দড়ায় ঝুলে যে-ভাবে ফল্কা থেকে বোট-ডেক কিংবা কখনও দড়ির মই বেয়ে যেভাবে দ্রুত টাগবোটে নেমে গেছে, তাতে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। ম্যাপল আর সাইপ্রাস

গাছের জঙ্গল। ভিতরে ঢুকলে রাস্তা খুঁজে বের করাই কঠিন। তবে চার্লি নাকি জানত, নীচের হাইওয়ের মোড়ে যে বুড়ো থাকে—জর্জ মরিস না কি যেন নাম বলেছিল, সে মনে করতে পারে না, ওই বুড়োর ছোটমতো ধাবাই ছিল তার শেষ গন্তব্যস্থল।

সেখানে গেলেই বুড়ো বের হয়ে আসত। তার ভাঙা গ্যারেজ পাশে। ট্রাক নিয়ে ড্রাইভাররা হাইওয়ে ধরে সেতু পার হয়ে কোথায় যে চলে যায়—ট্রাক ড্রাইভারদের সম্পর্কেও তার ছিল অশেষ কৌতূহল। বুড়ো মানুষটা শীতের ঠাণ্ডায় জমে গেলেই বলত, কফি উইথ হুইসকি? চার্লি বলত, নো নো, নো হুইসকি, ওনলি কফি। ঘোড়ার জিন ধরে রাখত সে। বুড়ো মানুষটা ঘোড়া একদম পছন্দ করত না। বুড়ো কফি নিয়ে কাউন্টারে উঁকিঝুঁকি মেরে বলত, ওয়েল নাইস বয়, গেট ইট। বুড়ো কিছুতেই নাকি তার প্রিয় স্প্যানিস ঘোড়াটির কাছে ঘেঁষত না। সে তখন নাকি হা হা করে হেসে উঠত। বলত ইয়ো লাভ ট্রাকারস। নট মি! বুড়ো লোকটা নাকি প্রথম জীবনে ছিল মেষপালক, তারপর রাস্তার দিকনির্ণয়গুলিতে রং করত। সারা টেকসাস, নিউ মেক্সিকো তার ঘোরা। গমের মজুত গোলাতে কিছুদিন কেরানিরও কাজ করেছে। তবে তার এখন ধাবাটিই প্রিয়। ধাবার চারপাশে বুনো ফুলের বাগানটি চার্লির উপহার দেওয়া। বুড়োর এ-জন্য নাকি কৃতজ্ঞতারও শেষ ছিল না। একা সারাদিন ধাবা সামলায়। শীত বসন্তে কখনও কোনও ট্রাকার যত রাতই হোক, বুড়োকে দেখেনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুহাস বলল, 'কত কথা বলে, কি বলব। কোনও মাথামুণ্ডু নেই। ওর ঠাকুরদা নাকি টেকসাস ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার পাইওনিয়ার ছিলেন।'

'টেকসাস! বলিস কি! সে তো ভয়ঙ্কর জায়গা!'

'তাই তো বলে!'

তেরো

টেকসাস শব্দটি মুখার্জির মাথায় কেমন পেরেক পুঁতে দিল। সুহাস দেখছে, মুখার্জিদা বিড়বিড় করে বকছেন—'টেকসাস! টেকসাস!'

'কি হল তোমার!'

'লোমহর্ষক!'

টেকসাসের সঙ্গে লোমহর্ষক শব্দটি কেন যে ত্বরিতে জুড়ে দিলেন মুখার্জিদা! মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, 'ভাল না, ভাল না। টেকসাস মোটেই ভাল জায়গা নয়।'

'টেকসাসে তুমি গেছ?'

'কেউ যেতে পারে না। দস্যু তস্করদের দেশ। অপহরণ, খুন, জখম জলভাত। প্রেম করতে চাইলে শেষ পর্যন্ত ফুল ফুটবে না। তার আগেই অপহরণ। খুঁজতে গেলে মরবে। সাঁ করে বুকের মধ্যে অরণ্যের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে তরবারির খোঁচা।'

তারপরই কি ভেবে বললেন, 'ঘোড়ায় চড়া তাদের প্রিয় নেশা। চার্লি কি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে! তার মানে, চার্লির ঠাকুরদা, কি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতেন?'

'ঠাকুরদা জানতেন কি না জানি না। তবে চার্লি খুব ছোট বয়েস থেকেই ঘোড়ায় চড়তে পটু।'

'রক্তের দোষ। ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার পায়নিয়ার না ছাই। দস্যুবৃত্তি। স্রেফ দস্যুবৃত্তি। ঘোড়ার পিঠে বস্তা বস্তা স্বর্ণপিণ্ড। ঘোড়া ছুটছে। পাহাড়ি পথে আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি চার্লির ঠাকুরদা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা পাহাড়ের উপত্যকা জুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলেছেন। চোখ বুজলেই টের পাই।'

'কি যে বলছ, বুঝছি না! এত নাটক করছ কেন, তাও বুঝছি না।'

'তুই বুঝছিস না, আমি কি সব বুঝছি! চার্লি কি করে টেকসাসের হয় বুঝি না! ওর বাবা তো কার্ডিফ না হয় লন্ডন থেকে জাহাজে ওঠেন। আমি তো ভেবেছিলাম, চার্লিরা ওয়েলসের লোক—মানে ইংরাজ। খাঁটি রাজার জাত। এখন দেখছি রক্তেই দোষ থেকে গেছে—'

'টেকসাস কোথায় বলবে তো!'

'টেকসাস মানে, হলিউডের খুন জখম দাঙ্গা ধর্ষণের ছবি। সে দেখা যায় না। তুই তো মেট্রো গোল্ডেন মেয়েসের ছবি দেখিসনি—হলিউডের ঘোড়াগুলি ছুটতে থাকলে মনে হবে, তোর ঘাড়ে এসে বুঝি পড়ল! প্রথমবার তো মেট্রোতে ছবি দেখতে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে প্রায় দৌড়ে পালাচ্ছিলাম। দুর্ধর্ষ খুনি কাউবয়দের ওখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। টেকসাস হল সেই দেশ, বুঝলি। চার্লি কি ঘোড়ায় চড়ে একাই ঘুরে বেড়াত!'

'তাই তো বলল। বেটসি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল বলে তো জানি না। জর্জ মরিসের কথা অবশ্য মাঝে মাঝে বলে। ট্রাকারদের সঙ্গে মরিসের নাকি খুব ভাব। বুড়ো মানুষ। খুবই সজ্জন।'

'ট্রাকার মানে?'

'ট্রাক ড্রাইভার-টাইভার হবে। তবে চার্লি ট্রাক ড্রাইভার বলে না। ট্রাকারই বলে।'

'বুড়ো লোকটা কি করত?'

'ছোট্টমতো স্টপ অফ ছিল তার। ওই ধাবাটাবা গোছের—হাইওয়ের ওটাই শেষ ধাবা। তারপর নদী পার হয়ে পাহাড় আর পাহাড়—গিরিখাত, উপত্যকা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাক চালিয়েও বসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'চার্লি তা হলে অজ্ঞাতবাসে ছিল বলছিস?'

'না, অজ্ঞাতবাসের কথা বলেনি।'

'এটা অজ্ঞাতবাস ছাড়া কি! গাধা কি আর গায়ে লেখা থাকে! তাদের বাড়ির আশপাশে লোকজন ছিল কি না জানতে হয়, জায়গাটা শহর না গ্রাম, জানতে হয়! ওর ঠাকুরদা ফুলের কারবারি। অফিস কাছারি, লোকজন থাকবে না!'

'বুড়ো লোকটাকে ছাড়া আর কাউকে চিনত বলে জানি না। ও না বললে, কি করব? বানিয়ে বলতে হবে। যে ভাবে জেরা করছ, যেন আমিই আসামি। ম্যাককে ডেরিক ফেলে খুন করেছি।'

'তুমি খুন করেছ না অন্য কেউ খুন করেছে—পরে ঠিক হবে। তবে চার্লির রিপোর্ট ঠিক নয়। কলিজ জাহাজডুবিতে পাঁচ হাজার মার্কিন সেনাই তলিয়ে গেছে—মিছে কথা। সবাইকে উদ্ধার করা গেছে। কেবল পাঁচজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। চারজন ক্রু এবং স্বয়ং কাপ্তান। তারা জলের তলায় নিখোঁজ, না অন্য কোনও রহস্য আছে বুঝছি না।

সুহাসের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। মুখার্জিদা গুল মারছেন না তো! বলতেও পারছে না, যা খুশি বলে যাচ্ছ—চার্লির দায় পড়েছে—মিথ্যে রিপোর্ট দিতে। ডাইরিতে যা পেয়েছে, তাই টুকে দিয়েছে। তার বাবার ডাইরি হাতানো কি কঠিন যদি বুঝতে, তাও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথাও যদি খুনের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বলেছে, প্রমিজ, ইউ উইল মেনসান দিস টু নো ওয়ান।

মুখার্জিদা শুয়ে আছেন। তাঁর সেই চিরাচরিত মুদ্রাদোষ—পা নাচাচ্ছেন। চোখ বুজেই কথা বলছেন। যেন কত দুশ্চিন্তা মাথায়। রহস্য উন্মোচন বোগাস! সে উঠতে যাচ্ছিল।

মুখার্জিদা বললেন, 'উঠছিস কেন! বোস! চার্লির টুকলিফাই রিপোর্টে দেখছি, জাহাজডুবির দু-একজনের সাক্ষাৎকারও আছে। ফলস ইন্টারভিউ। অবশ্য এটা আমার ধারণা। জাহাজের উপর কাপ্তান এবং ক্রুদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না—বিশ্বাসযোগ্য নয়। অশুভ প্রভাবে পড়ে হয়েছে—বিশ্বাস করতে পারছি না। কোনও যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ না কে বলবে!'

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের মাথা গরম। বাঙ্কে ঘুসি মেরে বলল, 'ও কি আজে বাজে বকছ! তুমি কি কলিজ জাহাজে ছিলে! ঘরে কি নেশাটেশা করছ! বাটলার, কাপ্তানবয়ের সঙ্গে তো দোস্তি খুব। এ-সব রোগ তো আগে ছিল না।'

মুখার্জিরা করছেন না। যেন তিনি সুহাসের কথা শুনে মজা উপভোগ করছেন।

'আমার যে কি মুশকিল!' সুহাস নিরাশ গলায় বলল।

'কি মুশকিল!'

'চার্লি যে ব্যাজার মুখে বলল, 'সুহাস প্লিজ!' তার তো একজন অনুসরণকারী এমনিতেই জাহাজে উঠে এসেছে—তার উপর যদি খবর পাচার হয়ে যায়, কাপ্তানের ডাইরি থেকে—ধরা পড়ে যাবে না! ধরা পড়লে বাপের কাছে মুখ দেখাবে কি করে। সে তো একমাত্র আমাকেই সব বলে! বলাটা কি দোষের!'

মুখার্জি হাই তুলে বললেন, 'মোটেই দোষের না।'

'জানো, আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, কাউকে বলব না। নট এ লিভিং সোল, নো ওয়ান। আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড।' সুহাসের চোখে মুখে হতাশা। মিথ্যা রিপোর্ট নিয়ে না আবার মুখার্জিদা ঝামেলা পাকান।

মুখার্জিদার এতে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হল না। যেন চার্লিই আসামি। চার্লি জল ঘোলা করার জন্য কলিজ সম্পর্কে মিথ্যা খবর রটাবার চক্রান্ত করছে। মুখার্জিদা হেসে ফেললেন। খুব কাবু ছোঁড়া। বললেন, 'বলদা। আর কারে কয়! যা সত্য তাই কইলাম চাঁদু। বোঝলা।'

সুহাস বুঝল, নিজের দেশজ ভাষাটি ব্যবহার করে তাকে মুখার্জিদা আরও উপহাসের পাত্র করে তুলছেন। সে রেগেমেগে বের হবার মুখে শুনল, মুখার্জিদা বলছেন, 'আমিও কথা দিচ্ছি কেউ জানবে না, নো ওয়ান, নট এ লিভিং সোল। আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড। চার্লি ঠকেছে। চার্লির কোনও দোষ নেই। ডাইরিতে তাই আছে। যা পেয়েছে, তাই দিয়েছে। কাপ্তানের চাতুরি হতে পারে—অথবা প্রাথমিক খবর যে রকম হয় আর কি! উল্টাপাল্টা। পরে আরও খবরটবর নিয়ে হয়তো জেনেছেন, যাঃ আমিও শালা বুদ্ধু—তোর কি আর কিছু বলার আছে?'

'না।'

'তা হলে যা। কি যে মুশকিলে ফেলে দিস না, বুঝি না। চার্লি জলে পড়ে গেলে, তুইও জলে পড়ে যাস। চার্লি খারাপ কিছু করতে পারে না, এমন ধরেই নিয়েছিস, এ-সব লাইনে থাকলে—সবাই সন্দেহভাজন বুঝলি—চোখ তো আমার দুটো। দেখার চেয়ে বোঝার ব্যাপারটা গুরুতর। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার মতো। সিঁড়িটাই খুঁজে পাচ্ছি না। কলিজ জাহাজ নিয়েই বা এত মাথা ব্যথা কেন বুঝি না! আর সত্যি কলিজ জাহাজের খোঁজে তিনি যাচ্ছেনও কি না, ঠিক জানা নেই। সব তো অনুমান নির্ভর।'

সুহাস উপরে উঠে যাচ্ছে। সুহাসের পায়ের শব্দ পেলেন মুখার্জি। যত দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে সুহাস লাফিয়ে উপরে উঠে যায়—তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। যেন ক্লান্ত কোনও বুড়ো মানুষ উপরে উঠে যাচ্ছে। বেচারা খুবই ধন্ধে পড়ে গেছে। ডেরিক যে তার মাথায়ও একদিন ভেঙে পড়বে না, বিশ্বাস করতে পারছে না।

তিনি লাফিয়ে নীচে নামলেন, তারপর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলেন। ঘুমের বারোটা বেজেছে, ঘুম আর আসবে না। সুহাসকে ভয়ের মধ্যে রাখা আদৌ ঠিক হবে না। যাও খবর পাচ্ছিলেন, তাও যাবে। চার্লি না বললে তিনি তো জানতেনই না, টেকসাস অঞ্চলে এক বনভূমিতে চার্লি বড় হয়ে উঠেছে। ঘোড়ায় চড়ে বনভূমির পর বনভূমি পার হয়ে গেছে। বাড়িটা কি রকম। প্রাসাদ, না বাংলো টাইপ—পাহাড়ের মাথায় ওঠার রাস্তা পাকা না কাঁচা! পাথর ফেলে সিঁড়ির মতো করে নেওয়া হয়নি তো—তিনি তো কিছুই জানেন না। চার্লি তাঁর সঙ্গে কথাও বলে না—কেই বা বলে রাজার জাত, অহঙ্কার থাকতেই পারে। ট্রানসমিশান রুমে একদিন ঢুকতে গিয়ে বেকুফ—রেডিও অফিসারের গম্ভীর গলা—কি চাই! প্রায় ট্রেসপাসারসের দায়ে অভিযুক্ত হতে যাচ্ছিলেন আর কি!

তিনি পিছিলে উঠে দেখলেন, সুহাস ডেকে নেই, মেসরুমে নেই। গ্যালিতে যদি থাকে, সেখানেও নেই। ইনজিনরুমে ঢুকে গেছে তবে। সেখানে তাকে পাকড়াও করা যায়। তবে মুখার্জির পক্ষে ইনজিনরুমে ঢোকা উচিত হবে না। তিনি তো ইনজিনরুমের কেউ না। তার কি কাজ থাকতে পারে তবে ইনজিনরুমে! সেকেন্ডের ওয়াচ চলছে। নীচে তিনি আছেন। তাঁকে দেখলে, অসময়ে সুখানি ইনজিন রুমে কেন ভাবতেই পারেন।

সাত পাঁচ ভেবে পিছিলের বেঞ্চিতে বসে থাকলেন মুখার্জি। আর সমুদ্রে কিছু দেখার চেষ্টা করছেন। এই সমুদ্র নীল হাঙরের সাম্রাজ্য। এদিকটায় সমুদ্রে অনেক চোরা স্রোত আছে, আর অজস্র প্রবাল প্রাচীর চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট নীচে গাছের শেকড় বাকড়ের মতো ছড়িয়ে আছে। কত সব বিচিত্র রকমের সামুদ্রিক জীব থেকে গাছপালা, সমুদ্রের তলায় ঘন বনাঞ্চল তৈরি করে রেখেছে। উপর থেকে তা বোঝারই উপায় নেই।

তিনি কেন যে ভাবতে ভাবতে সেই অতল সাম্রাজ্যের রহস্যের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন বুঝতে পারছিলেন না। হাজার লক্ষ বছর কি তার চেয়েও বেশি সময় ধরে প্রবাল সঞ্চিত হতে হতে ওই সব প্রাচীর গড়ে উঠছে, ভাঙছে, ডুবছে, সমুদ্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—বিচিত্র জলজ প্রাণীর বিশাল সাম্রাজ্য সমুদ্রের নীচে যেন লুকিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। প্রাচীরগুলি সরীসৃপের মতো যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। নানা প্রজাতির মাছ, নানা রং তাদের, বর্ণ-ছটায় পাগল হয়ে চক্রাকারে ঘুরছে স্রোতের গভীরে।

আর তখনই কেন যে মনে হল, সুহাসকে আসল কথাটাই বলা হল না।

অবশ্য এখনই বলা ঠিক হবে কি না, তাও ভাবছিলেন। কারণ বললেই সুহাস ফাঁপরে পড়ে যেতে পারে।

বাথরুমের ভিতর থেকে কেউ যেন উঁকি দিয়ে তাকে দেখল?

কে লোকটা।

তিনি দেখলেন, লতুমিঞা বেসিনে হাতটাত ধুয়ে এদিকে আসছে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে সে বলছে, 'বসে আছেন মুখার্জিবাবু। ঘুমোলেন না। মন খারাপ।'

তা আজকাল চুপচাপ বসে থাকলেই সবার মনেই এই ধন্ধ দেখা দেয়। ভাল নেই কেউ। মুখার্জিবাবুও বোধহয় ভাল নেই।

তাঁর কি ষষ্ঠইন্দ্রিয় ক্রমে সজাগ হয়ে উঠছে। না হলে লতুমিঞাকে এড়িয়ে যাবেন কেন। আর তখনই মনে হল, দড়ি টানার ব্যাপারে অথবা ডেরিক তুলে রাখার ব্যাপারে লতুমিঞার হাত থাকতে পারে এমন একটা সংশয় তাঁর আছে। যেই ডেরিক তুলে রাখুক, একা তুলতে পারেনি। অন্তত দু'জনের দরকার। দু'জনের মধ্যে কখনও কখনও কেন যে লতুমিঞার মুখ ভেসে উঠত তিনি বুঝতে পারতেন না।

লতুমিঞা হোস পাইপ ফেলে রেখে এসেছে ডেকে। এদিকটায় তার আসারও কথা না, যমুনাবাজুতেই উঠে আসার কথা। ওদিকটাতেই তাদের গ্যালি। কিংবা ফোকসালে দরকার টরকার থাকলে, যমুনাবাজু দিয়েই ঢোকার কথা, তবু কেন যে তাঁকে দেখে গেল লতুমিঞা, বুঝতে পারলেন না।

তিনি ডাকলেন, 'চাচা, শোনো।'

লতু উঠে এল ফের।

আচমকা বলে ফেললেন, 'বাটলারের সঙ্গে লাইন আছে তোমার।'

লতুর মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

তিনি বললেন, 'শোনো চাচা রসদঘর থেকে চুরি-চামারি হচ্ছে। মালের বোতল হাপিজ। কিনার আসছে—পয়সা কামাবার ধান্দা করছ শুনতে পেলাম।'

লতুমিঞা বলল, 'তোবা, তোবা।' সে কান ধরল, জিভ কাটল। বলল, 'আমার কোনও কসুর নাই। ঝুট বাত। বাটলারের সঙ্গে আমার লাইন নেই আল্লার কসম!'

মুখার্জি সহসা হেসে ফেললেন। 'লতুমিঞা এত ঘাবড়ে যাও কেন বল তো! লাইন থাকলে দোষের কি আছে। আরে সব চিজ মাঙ্গা, বাটলার তো মাল সরাতেই পারে। ফাঁক করে দিতে পারে। দ্বীপের লোকজন নৌকায় এলে, কিছু মাল তো রাতের অন্ধকারে হাপিজ করা হয়েই থাকে। তুমি না থাকো, আর কেউ থাকবে।'

'সে আমি জানি না, কে আছে! আমারে জড়াবেন না।' কেমন বিমর্ষ মুখে লতুমিঞা তাকাল মুখার্জির দিকে। বলল, 'কিছু শুনছেন।'

'শুনলাম, ডজনখানেক মালের বোতল হাপিজ, বাটলার হিসাব দিতে পারছে না।'

'মিথ্যে কথা মুখার্জিবাবু। হিসাব ঠিক মিলিয়ে দেবে। কার ঘরে ক' বোতল হজম হয়, বাটলারই ভাল জানে। পানি মেশালে ধরে কার সাধ্য।'

'কাপ্তানবয় তো মিঞা খবরটা রাখে।'

'কি খবর।' কশপ আমতা আমতা করে কিছুটা কাশল।

'একটা পেটি পাওয়া গেছে—কেউ বোধ হয় সরাবার তালে ছিল। ছিল কশপের স্টোররুমে এখন ওটা কাপ্তানবয়ের ঘরে পাচার।'

'ধরা পড়েছে কেউ?'

'না। কাপ্তানবয়কে বলে দিয়েছি, পেটি তোমারা ঘরে কেন? সে জবাব দিতে পারেনি। সে তো বলল, সে কিছু জানে না। তাকে নাকি অপদস্থ করতে চায় কেউ। তারই কারসাজি। তুমি পেছনে নেই তো? মিঞাসাব তোমার স্টোরে পেটি আসে কোত্থেকে।'

'আমি কিছু জানি না মুখার্জিবাবু। আল্লার কসম।'

মুখার্জি বেশ রগড় বাধিয়ে দিতে পেরেছেন। সুহাসেরও অভিযোগ কাপ্তানবয়, বাটলারের সঙ্গে এত দোস্তি কেন। দোস্তিটা যে করতে হয়েছে, কেন, বুঝবি পরে। মগড়াই খবরটা দিয়েছিল, 'মুখার্জিবাবু, তাজ্জব বাত। পেটি দেখলাম কশপের স্টোর রুমে। সেই পেটি সরে গেল কাপ্তানবয়ের ঘরে। কি করে যায়।'

'কিসের পেটি?'

'কিসের পেটি আবার, মালের পেটি মুখার্জিবাবু।'

'তাই বুঝি!'

এটা যে বাটলারের কাজ বুঝতে অসুবিধা হয় না। রসদঘরের তালাচাবি তার জিম্মায়। কার হিম্মত আছে সরায়। তিনি বাটলারকে ধরেছিলেন, কাপ্তানবয়কেও ধরেছেন, কশপকেও বাজিয়ে দেখলেন। কাপ্তানবয়ের মুখ সেই থেকে চুন। জানাজানি হয়ে গেল কি করে। কে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছে। কাপ্তানবয়, তাঁকে দেখলেই তোষামোদ করছে এখন— 'মুখার্জিবাবু লাগবে!'

'না। লাগবে না। আমি খাই না।'

'লাগলে বলবেন!'

সুতরাং লতুমিঞা মাল পাচারের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও কাপ্তানবয় আছে। একবার মালের পেটি সরিয়েছে যখন, তা আর রসদঘরে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

মগড়া ডেক ধরে হেঁটে আসছে। কনুইতে বালতি ঝাঁটা। সেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—'ওরেব্বাস।' দূরে কি দেখছে মগড়া! মুখার্জিরও চোখ গেল। দূরের সমুদ্রে সবুজ একটা গোলাকৃতি কিছু ঘুরছে। সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে উঠছে—কোনও অতিকায় সমুদ্রদানব ঘোরাফেরা করছে যেন। আশ্চর্য সেই জল কিছুটা প্রাচীরের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। জাহাজে সোরগোল পড়ে গেল। কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে। কি ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সবাই প্রায় বোট-ডেকে নয় পিছিলে এসে জড়ো হয়েছে। চার্লিকেও দেখা গেল বোট-ডেকে দূরবিন চোখে—আরে সুহাসও দাঁড়িয়ে আছে চার্লির পাশে। বড্ড গা চাটা স্বভাব সুহাসের। তিনি চটে গেলেন! আর তখন সুহাসও কি দেখে ছুটে আসছে পিছিলের দিকে।

সুহাস চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে—'হাঙরের ঝাঁক। উড়ন্ত পাখিগুলি ঝাঁকটাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে।'

পাখিগুলি কত বড় আর কি রং বোঝা যায় না। রোদের জন্য চোখ টাটাচ্ছে। এই

গরমে সমুদ্রের জলও উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সুহাস কেবল বলছিল, 'দানব,—বিশাল হাঁ, চার পাঁচ হাত উঁচুতে লাফিয়ে উড়ন্ত পাখি গিলে জলে ঝপাস করে পড়ছে। পাখিরাও ছাড়ছে না। জল পায়রা নয়, অতিশয় অ্যালবাট্রসই হবে। পাখিদের সঙ্গে হাঙরের খণ্ডযুদ্ধ। পাখিগুলি ধারালো ঠোঁটে হাঙরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

নিমেষেই গোলাকার প্রাচীরের মতো সবুজ বৃত্তটি জলে মিশে গেল—পাখিদের ওড়াউড়িও নেই। শান্ত সমুদ্র—হাঁপাতে হাঁপাতে মুখার্জির পাশে বসে পড়ল সুহাস!

মুখার্জি জানেন, ব্লু-সার্কের রাজত্ব পার হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এতে হুড়ো-হুড়ির কি থাকতে পারে তিনি বুঝলেন না। সবাই উঠে এসেছে। এমনকি চার্লিও অসুস্থ শরীর নিয়ে বের হয়ে এসেছে।

'চার্লি কিছু বলল তোকে?' মুখার্জিদা ওর ঘাড়ে হাত রেখে এমন প্রশ্ন করলেন।

'না তো! কি বলবে!'

তিনি দেখলেন, অনেকেই ঘোরাঘুরি করছে পিছিলে। এখানে বলা ঠিক হবে না। কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, 'না বলছিলাম, হাঙর বুঝলি না। খুবই রাক্ষুসে মাছ। উড়ন্ত পাখি জলে লাফিয়ে ধরে ফেলতেই পারে। পাখিগুলিও কম যায় না, ঠুকরে হাঙরের মাংস খাবলে খুবলে খেয়েছে।'

'তাই তো দেখলাম।' সুহাস বলল।

'দেখো। দেখে শেখো। নিরীহ পাখিরাও সুযোগ পেলে হাঙরের মাংস খুবলে খায়। হাঙরের ঝাঁককেও তাড়া করে নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রে যখন ভেসে পড়েছ শিশিরে আর ভয় কি! আমার সঙ্গে এসো সোনা, কথা আছে।

সুহাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার নাটক!'

মুখার্জি হেসে দিলেন। বললেন, 'আয় এদিকে। তারপর নীচে নিয়ে গেলেন সুহাসকে। বললেন, আট নম্বর মুখোসটার খোঁজ পাওয়া গেছে।'

'আট নম্বর মুখোস!'

'আরে যে মুখোসটার হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল না। একুশটা মুখোসের একটা কার কাছে আছে, আমরা কি জানতাম!'

সুহাস বললে, 'সকালে তো কিছু বলনি! এখন বলছ! আট নম্বর মুখোস কাকে উপহার দিয়েছিলে, কিছুই তো ম্যাক লিখে রাখেনি। সব কটার লিখে রেখেছে, একটার লেখেনি কেন?'

'সেই তো রহস্য! কেন লিখে রাখেনি ম্যাক। সব কটা মুখোসের নামও আছে, কাকে দিয়েছে তাও লেখা আছে। যেগুলো দেয়নি, দেয়ালে আছে, একটা মুখোস কম। হিসাবে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা পাওয়া গেছে! তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি করতে হবে?'

'ওটা পরে রাত বারোটায় চার্লির পোর্টহোলে গিয়ে একবার উঁকি দিতে হবে।'

'আমি!'

'হ্যাঁ কেন! ভয় পাচ্ছিস?'

'চার্লি পোর্টহোলের পর্দা খোলা রাখে না।'

'সে ব্যবস্থা হবে।'

'সে ব্যবস্থাও করে রেখেছ! না না আমি পারব না। মুখোস পরে চার্লির পোর্টহোলে কিছুতেই দাঁড়াতে পারব না। রাতে পোর্টহোলে এমনিতে গিয়ে দাঁড়ালেও চিৎকার করে উঠতে পারে। আর মুখোস পরে গেলে কি যেন হবে, না ভাবতে পারছি না। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না।'

'না গেলে তো বোঝা যাবে না। হিমশীতল ঠাণ্ডা পাথরের চোখ আছে কি না মুখোসে, ওটা না পরে গেলে তো বোঝা যাবে না।'

মুখোসটা নিয়ে সুহাস সত্যি ঘোরে পড়ে গেল। সে রাজি হয়নি। তার পক্ষে পোর্টহোলে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর মুখোসটা মুখার্জিদা পেলেন কি করে! কোথায় আছে। মুখার্জিদার লকারে। তিনি নিজেই কি তবে অনুসরণকারী। এ তো তবে আর এক রহস্য। চার্লির কেবিনের পাশে শেষ রাতে হাঁটাহাঁটি করেন কেন! একবার তো ধরা পড়ে গেলেন! অথচ তখন এমন অভিনয় যে তার কোনও সংশয়ই ছিল না মুখার্জিদার উপর। তিনি মাপজোক করে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কতটা দূরত্বে দাঁড়ালে, পোর্টহোলের বরাবর মুখ ভেসে ওঠে। অনুসরণকারী লম্বা না বেঁটে না মাঝারি মাপের—সে-রাতে তাও নাকি তাঁর ইচ্ছে ছিল দেখার। ঝড়ের রাতে সুযোগ বুঝেই প্রাণ হাতে করে কাজটা সেরেছেন।

কিন্তু এ কেমন কথা, মুখোসটা কার—তিনি তা জানেন না। কোথায় আছে তাও তিনি মুখ ফুটে বলছেন না। আছে তো দেখাও। তাও দেখালে না। বললেন, আছে—যথাসময়ে দেওয়া হবে। তুই রাজি না হলে মুশকিল। বলে তিনি চিবুক চুলকাতে থাকলেন। সহ্য হয়! তুমি নিজেই আসলে অনুসরণকারী? তোমাকে চিনতে বাকি আছে! বেহুঁশ রমণীকে পর্যন্ত ধর্ষণ করতে পার, তোমার মুখ দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে! এখন সাধুপুরুষ! আমার সাধুপুরুষ রে! চার্লিকে বলে দেওয়াই ভাল। জানো, অনুসরণকারীর খোঁজ পাওয়া গেছে। তোমাকে ভয় দেখিয়ে জাহাজ-ছাড়া করতে চায়। পারে—আহামদ বাটলারকে জাহাজ-ছাড়া করে ছাড়ল না! তুমি কি চার্লি বিশ্বাস করতে পার, তিন নম্বর কোয়ার্টারমাস্টারের ষড়যন্ত্র। বুঝিও না বাপু—জেদের মাত্রা কেন শেষে এতদূর গড়ায়!

জিন পরী বিশ্বাস করে না আহামদ। করতে নাই পারে। তাই বলে এ-ভাবে পিছু লাগা। আহামদ বাটলার ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেই দেখতে পায় সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে কোনও মানুষ যেন চিৎ হয়ে পড়ে আছে বাঙ্কে। সে ত্রাসে ছুটে বের হয়ে গেলে অন্ধকার থেকে হামাগুড়ি। তিনি ঢুকে যান। চাদর, কম্বল, বিছানা লন্ডভন্ড করে অদৃশ্য হয়ে যান। লোকজন ঢুকে কিছু দেখতে পায় না। কোথায় সাদা চাদরে ঢাকা মরা মানুষ। আর আহামদ বাটলার তোমারও বলিহারি যাই—চাদরটা সরিয়ে দেখবে না, সত্যি না ফলস মেরে গেছে কেউ! বালিশ কম্বল সাজিয়ে মরা মানুষের ছলনা করে গেছে কেউ!

ছাল চামড়া তোলা গরু ভেড়ার কবন্ধ দেখতে দেখতে শেষে তুমি বরফঘরেও মেয়েমানুষের লাশ দেখে ফেললে! আতঙ্কে কি না হয়! বুদ্ধি বিবেচনা কাজ করবে না! ভোঁতা মেরে গেলে!

না কিছু ভাল লাগছে না। সে উপরে উঠে গেল। তেলের টব, সিরিস, জুট সব

জমা দিল কশপের স্টোরে। পাঁচটায় ছুটি। কাল জাহাজ ধরছে। সব আনন্দ মাটি। ডাঙায় নেমে ঘোরাঘুরির আনন্দও মাথায় উঠেছে। সে বাথরুমে ঢুকে স্নানটান সেরে নীচে নেমে গেল। শুয়ে পড়েছে বাঙ্কে। তারপরই মনে হল, চার্লি তাকে যেতে বলেছে। চার্লি কত সরল অকপট, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে—তাও এরা জানে না।

ইউ আর সো জেন্টল্। চার্লি তার গা ছুঁয়ে যখন কথাটা বলে, গা তার শির শির করে! সেই চার্লিকে নিয়ে উপহাস! সে নাকি চার্লির পোষা কুকুর। খারাপ লাগে না!

অধীর তো ক্ষেপে গিয়ে রাস্তা রুখে দাঁড়িয়েছিল—'চাকর বাকরের মতো চার্লির সঙ্গে নেমে যাস, লজ্জা করে না!'

'না লজ্জা করে না।'

সুরঞ্জন তো একদিন কোন বন্দরে যেন বলেই ফেলল, 'জানিস সবাই তোকে চার্লির পোষা কুকুর ছাড়া কিছু ভাবে না।'

আর কিছু না ভাবলেই হল। সুহাসও ছেড়ে কথা বলেনি।

আরে পোষা কুকুর হলে গায়ে হাত রেখে বলতে পারে, ইয়োর টাচ ইজ সো জেন্টেল আই ফিল ফর অ্যান ইনস্ট্যান্ট, অ্যাজ ইফ টাইম হ্যাড স্টপড, অ্যান্ড অল দ্য ডার্কনেস ইজ গন।

চার্লির এমন সুন্দর কথাবার্তায় তার যে কি হয়, ওরা কি করে বুঝবে!

চার্লি কত ভদ্র এরা মেশে না বলে জানে না। বংশীদার খোঁজখবর পর্যন্ত নেয়। বংশীদা ডিপ্রেসানে ভুগছে তাও জানে। বংশীদার কথা উঠলে বলবে, বেচারা। সদ্য বিয়ে করে সফরে কেউ বের হয়।

অদ্ভুত সব কথাও বলে চার্লি। 'জানো তো, বিয়েটা হল ঈশ্বরের পবিত্র সিদ্ধান্ত। বিয়েটা হল, সিঙ এ নিউ সঙ টু দ্য লর্ড। সিঙ ইট এভরি হোয়ার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্লড। সিঙ আউট হিজ প্রেইজেস।'

এমন ঈশ্বর বন্দনা যেন নিষ্পাপ চার্লির মুখেই মানায়। সব সময় চার্লির সব কথার অর্থও সে বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না কি বলতে চায় চার্লি। তবু বোঝে, তার গা ছুঁয়ে দিলে চার্লি টের পায়, সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

এ-সব কথার অর্থ কি বোঝে অধীর! বুঝলে কখনও বলতে পারে। সুরঞ্জন, লজ্জা করে না, তু করলেই ছুটে যাস। তুই কি রে! চার্লি তার মধ্যে ঈশ্বরের স্পর্শ পায়, বলে কি লাভ! বললেই মজা করতে পারে। উপহাসও।

কি বললি, বিয়েটা হল সিঙ এ নিউ সঙ টু দ্য লর্ড!

হ্যাঁ তাই তো।

এত টুকুস টুকুস কথা কে শেখায় রে?

কে আবার শেখাবে? আমি বুঝি না মনে কর। বংশীদার বিয়ে করেই জাহাজে উঠে আসা উচিত হয়নি। বউটার কষ্ট, বংশীদার কষ্ট। চার্লি ঠিক বোঝে। বিয়েটা কত পবিত্র ব্যাপার চার্লি না বললে টেরই পেতাম না। ঈশ্বরের উপর পরম বিশ্বাস—সে তো তার অনুসরণকারীকেও ভয় পায় না। না হলে বলতে পারে, গড হ্যাজ মেড এভরিথিং ফর হিজ পারপাসেস—ইভিন দ্য উইকেড ফর পানিশমেন্ট।

কখন যে অধীর সুরঞ্জনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিভাবে যে চার্লির প্রসঙ্গে চলে আসে সে বুঝতে পারে না।

আবার চার্লি!

শোন সুহাস, চার্লিকে বলবি, হিউম্যান বিইংস আর অ্যানিমেল, জাস্ট দ্য সেম অ্যাজ এ ডগ অর এ কাউ। বংশীকে জোরজার করে হলেও কিনারায় নামাতে হবে। সর্বরোগহর বিষহরি বুঝলি! ওকে এ-ছাড়া নিরাময় করা যাবে না। কি সব কথা!

গরম পড়ায় ফোকসালে থাকা যাচ্ছিল না। সে চুপচাপ শুয়ে থাকায় অধীর কেষ্টরা ফাঁপরে পড়ে গেছে।

তারা তো জানে না, মুখার্জিদা কি বলে গেছেন! মুখোসটা পরে গভীর রাতে একবার উঁকি দিতে হবে চার্লির পোর্টহোলে, সে সোজা বলেছে, যেতে পারবে না, উঁকি দিলে নিজেই সে অনুসরণকারী হয়ে যাবে। মুখার্জিদার কি মতলব কে জানে!

অধীর কেষ্ট তাকে মনমরা দেখেই তাতাতে চেয়েছিল। সে কারও কথা আমল দেয়নি। চার্লিকে নিয়ে ঠাট্টা করায় সে আরও খেপে গেছে।

এমন জঘন্য চিন্তা ভাবনা, চার্লির মাথাতেই আসবে না। হিউম্যান বিইংস আর অ্যানিমেল! শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। চার্লি কত ভাল, কি করে বোঝাবে! চার্লিকে কেউ খাটো করলে সে কষ্ট পায়। ধর্মভীরু শান্ত স্বভাবের চার্লি। তা তো হবেই, মা নেই, শৈশবে প্রকৃতি বন জঙ্গল পাহাড়ে একা বড় হয়ে উঠেছে। গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি আর পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রটি ছাড়া তার তো কেউ আর সঙ্গী ছিল না। সমাধিক্ষেত্রের পাশেই তাদের নিজস্ব গির্জা। চারপাশে যত দূর চোখ যায় রেড ম্যাপলের জঙ্গল। দূরে পাহাড়শীর্ষে কখনও বরফে মাখামাখি। চার্লি তো ঈশ্বরের মহিমা বেশি টের পাবেই। আর ওই স্টপ অফের বুড়ো মানুষটা। বুড়ো মানুষটাই হয়তো তাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলত। বুড়ো মানুষেরা তো ঈশ্বরের বেশি কাছাকাছি থাকেন।

না হলে চার্লি বলতে পারে, দ্য লর্ড লাভস দোজ হু হেট ইভিল। হি প্রটেকটস দ্য লিভস অফ হিজ পিপল অ্যান্ড রেস্‌কিউজ ফ্রম দ্য উইকেড।

চার্লির এই আত্মবিশ্বাসই সম্বল। বোটডেকে অপদেবতার উপদ্রব জেনেও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। পোর্টহোলে হিমশীতল পাথরের মতো ঠাণ্ডা চোখ দেখেও অবিচল থাকতে পারে। না হলে চার্লিও আহামদ বাটলারের মতো পাগল হয়ে যেত। জাহাজ ছেড়ে পালাত। এত উপদ্রবের পরও চার্লি সকালে স্বাভাবিক। বরং চার্লির কথা শুনে সেই ঘাবড়ে যেত— আবার কে পোর্টহোলে ঘোরাঘুরি করছে, হাঁটাহাঁটি করছে।

সে ঘাবড়ে গেলে চার্লি হেসে বলত, হি প্রটেকটস। ভয় কি! এটা কত বড় সাহসের জায়গা ভেবে তার চোখে জল এসে গেল।

চার্লির জন্য, না, ঈশ্বরের মহিমা টের পেয়ে সে বুঝতে পারল না।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

সে ওপরে ওঠার সময় মুখার্জিদা সিঁড়িতে দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন।

'উপরে।'

'উপরে কোথায়।'

'চার্লির কাছে।'

'এখন যাবি না, আয়।'

'না, যাব। ছাড়ো।'

'পাগলামি করিস না। সোনা আমার। লক্ষ্মী ছেলে। মাথা গরম করলে চলে!'

'ছাড়ো হাত। আমি পোষা কুকুর!'

'কে বলেছে, তুই পোষা কুকুর!'

'সবাই তো বলছে।'

'কার পোষা কুকুর!'

'জানি না। হাত ছাড়ো বলছি।'

'পাগলামি করিস না। মুখার্জিদা ওর হাত কিছুতেই ছাড়ছেন না। যেন এখন কোথাও গেলেই সব তার ভন্ডুল হয়ে যাবে। সে বলল, 'আমি পারব না বলে দিলাম।'

'ঠিক আছে তোকে যেতে হবে না। আয় আমার সঙ্গে। মুখোসটা দেখবি বলেছিলি!' বলেই সতর্ক চোখে চারপাশে তাকালেন মুখার্জিদা। সে আর কি করে! মুখোসটা দেখারও আগ্রহ আছে তার। সে মুখার্জিদার কেবিনে ঢুকে বলল, 'কোথায় পেলে!'

'কি কোথায় পেলাম?' মুখার্জি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'পাব। আজকেই পাবার কথা! মুখোসটার কথা বলছিস তো।'

মুখার্জিদার কথার কোনও খেই পাচ্ছে না সুহাস। এই বললেন, মুখোসটা দেখবি বলছিলি, আয় আমার সঙ্গে। আর এক্ষুণি বলছেন, কি, কোথায় পেলাম? মুখোসটার কথা বলছিস?

হঠাৎ সুহাস খেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে নিয়ে আর কত তামাসা করবে!'

মুখার্জি দ্রুত উঠে গেলেন। সুহাসের মুখ চাপা দিলেন হাতে। জোরজার করে ধরে ফেললেন—যেন না হলে সে এক্ষুণি দরজা খুলে ছুটে পালাবে।

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ। অযথা উত্তেজিত হোস না। কে কোথায় আছে জানি না। তুই বুঝতে পারছিস না কতবড় বিপদ আমাদের সামনে।' সুহাসের বিপদ না বলে, আজ প্রথম বললেন, আমাদের বিপদ। এতে সুহাস কিছুটা যেন দমে গেল। সে ঘামছিল। উত্তেজনায় মুখ চোখ লাল। হাওয়া পাইপ সুহাসের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেলেঙ্কারি করতে যাস না। আমাকে তুই অবিশ্বাস করছিস! আমি বুঝি। কিন্তু হাতের কাছে কোনও প্রমাণ পাচ্ছি না!'

সে বলল, 'তুমি অযথা মুখোস নিয়ে পড়েছ। লোকটা মুখোস পরে চার্লিকে তাড়া করবে কেন বুঝি না। সে তো আবছা অন্ধকারে থাকে। তার চুল সাদা, দাড়ি গোঁফ আছে—অস্পষ্ট অন্ধকারে এমন টের পেয়েছে চার্লি। মুখোস পরার কি দরকার! এমনিতেই অনুসরণ করতে পারে। মুখোস পরার দরকার হবে কেন?

'তা অবশ্য জানি না। মগড়া বলেছে, সে জানে কোথায় আছে মুখোসটা। আমাকে দেখিয়ে আবার জায়গারটা জায়গায় রেখে দিয়েছে। কোথায় রেখেছে, কিছুতেই বলছে না। বলেছে, সে আমাকে দিতে পারে, তবে ওটা আবার ওকে ফেরত দিতে হবে।'

সুহাস কেমন ঘাবড়ে গেল। বলল, 'মগড়ার এত সাহস! চার্লির ঘরে তো সকালে বাথরুম পরিস্কার করতে মগড়া এমনিতেই যায়। তার দরকার কি পোর্টহোলে উঁকি দেবার। চার্লি কেবিনে কি করছে না করছে দেখার এত আগ্রহ কেন তার! তুমি শেষে আমাকে মগড়া হতে বলছ!'

মুখার্জিদা কথা বলছেন না! শুধু ঠোঁটে আঙুল রেখে সতর্ক করে দিচ্ছেন, আস্তে। সে যতটা পারছে নিম্নস্বরে কথা বলছে ঠিক, তবে উত্তেজনায় মাঝে মাঝে নিজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে। কেবল বলছে, 'শেষে মগড়াকে লেলিয়ে দিলে!'

তিনি যেন কারও আসার প্রত্যাশায় আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও সূর্য ডোবেনি—পোর্টহোলে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। তবে ঘরে আলো জ্বালিয়ে না রাখলে, ঘর অন্ধকার। বার বার সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ পেলেই দরজা খুলে তিনি উঁকি দিচ্ছেন, তারপর ফের হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন দরজা বন্ধ করে দিয়ে। তার কথার কোনও জবাব দিচ্ছেন না।

সুহাস টের পাচ্ছে, মুখার্জিদা অস্থির হয়ে পড়ছেন। হাতের মুঠো শক্ত হচ্ছে, আবার আলগা হচ্ছে, সব তাঁর অজান্তে। তাঁর কোনও গূঢ় অভিসন্ধি নেই তো। সুহাসের যে কি হয়, মাঝে মাঝে মুখার্জিদাকেই ভয় পেতে শুরু করে। সে এই অবস্থায় কোনও আর প্রশ্ন করতেও সাহস পাচ্ছে না। চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে আছে। চার্লি মেয়ে না ছেলে, এই রহস্য এত গোলমাল পাকিয়ে ফেলতে পারে সে ভাবতেই পারে না। যেন এই রহস্যটা জানাজানি হয়ে যাওয়া মারাত্মক কোনও অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার তো মনে হয়নি কখনও—তবে খুবই ঢিলেঢালা শক্ত টুইলের শার্ট পরে, আর সবসময় কেমন অস্বস্তির মধ্যে যেন চার্লি চলাফেরা করে। জাহাজেই এটা হয়। যেন শরীরে তার জামা এঁটে বসে যাচ্ছে—এমন আতঙ্ক। জামা টেনে ঢিলেঢালা রাখার জন্য কিছু মুদ্রাদোষ গড়ে উঠেছে চার্লির। হাঁটা চলার সময় এটা সে বেশি লক্ষ্য করেছে। বয়লার সুট, কিংবা যাই পরে বের হোক চার্লি, তাকে ঠিক যেন মানাচ্ছে না, সে কলার টানছে, জামার হাতা টেনে দিচ্ছে, বগলের দু-দিকের জামা টানছে, প্যান্ট টানছে—এগুলি যে কোনও অস্বস্তি থেকে গড়ে উঠতে পারে তার মনেই হয়নি। অথচ চার্লি তো সোজা বলে দিয়েছে, মি বয়। তারপর আর কি কথা থাকতে পারে। তারপরও মুখার্জিদারা ভাবেন কি করে, যে চার্লি মেয়ে, ছেলে নয়।

আর তখনই সহসা কে নেমে এল সিঁড়ি ধরে। মুখার্জিদা দ্রুত উঠে গেলেন। দরজা সামান্য ফাঁক করে যেমন দেখছিলেন এতক্ষণ, তেমনি দরজা সামান্য ফাঁক করতেই একটা হাত এগিয়ে এল। কাগজে মোড়া কিছু। এবং দ্রুত ওটা দিয়ে যেন কেউ অদৃশ্য হয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে যে দেখবে তারও সময় পেল না। মুখার্জিদা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। কাগজের মোড়কের ভিতর কি আছে জানার যেন বিন্দুমাত্র তাঁর স্পৃহা নেই। মোড়কটা তাঁর কোলের মধ্যে পড়ে আছে।

সুহাস প্রকৃতই বিধ্বস্ত। কে দিল! কার হাত। মুখার্জিদা কিছু বলছেন না। সে কথা বলতে গিয়ে দেখল, গলা বসে গেছে কেমন। সে গলা খাকারি দিল। গলা খুস খুস করছে। যেন গলায় কফ আটকে আছে। কোনও রকমে গলা পরিস্কার করে বলল, 'কে

দিয়ে গেল?'

'জানি না। দেখতে হয় দ্যাখ। এক্ষুণি ওটা আবার ফেরত নেবে।'

হাতে নিয়ে দেখতেও কেমন আতঙ্ক! কি দেখতে পাবে কে জানে!

সে কোনওরকমে হাত বাড়াল।

হাত তাঁর কাঁপছে।

মুখার্জিদা বললেন, 'বড্ড নার্ভাস দেখছি।'

তিনি নিজেই কাগজের মোড়কটা খুলে দেখালেন। সুহাস পাশের বাঙ্কে উবু হয়ে দেখতে গেলে বললেন, পাশে বোস। দেখেছিস, কেমন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মুখ। এই দ্যাখ, হাতের কি নিপুণ কাজ। মাথার দিকে দুটো কব্জা লাগানো আছে। বাবরি চুল। পরে দেখাচ্ছি। বলে ভাঁজ করা মুখোসের সামনের দিকটা মুখে এবং পেছনের দিকটা মাথার পেছনে ফেলে তার দিকে তাকাতে থাকলেন। ঈশ্বরের পুত্র কে বলবে! চোখ দুটো যেন শীতল হয়ে গেছে। তার গা শির শির করতে থাকল। মুখার্জিদাকে কেন যে একটা দানবের মতো দেখাচ্ছে।

মুখার্জি মুখোসটা পরেই কথা বলতে থাকলেন, 'চার্লিকে গিয়ে দেখানো দরকার—এটাই কি না! চার্লি পোর্টহোলে উঁকি দিলে টের পাওয়া যেত এই মুখোশটা দেখেই সে ভয় পেয়েছিল কি না! এমনও তো হতে পারে ঘোরে পড়ে কিছু দেখেছে! এমনও তো হতে পারে, জাহাজে ওঠার সময়ই চার্লির কোনও আতঙ্ক ছিল। কোনও বুড়ো মানুষের আতঙ্ক।

সুরঞ্জন একা বোটডেকে অপেক্ষা করছে।

গভীর রাত। পরিষ্কার আকাশ। অজস্র নক্ষত্রের ওড়াউড়ি আকাশে। পৃথিবী কেমন নির্জন হয়ে আছে। সমুদ্র আপন মহিমায় বিরাজ করছে চারপাশে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব কিছু।

জ্যোৎস্নার এ হেন দৃশ্য দেখতে কার না ভাল লাগে। সুরঞ্জনেরও ভাল লেগে গিয়েছিল। সে ভুলেই গেছে মুখার্জিদার জন্য তার এখানে অপেক্ষা করার কথা। রেলিঙে ঝুঁকে সে সিগারেট খাচ্ছিল।

তারপর কেন যে মনে হল, এই চন্দ্রকিরণ জাহাজের সঙ্গে রওনা হয়েছে ডাঙার দিকে। কে একা পড়ে থাকতে পারে সফেন সমুদ্রে! কার ভাল লাগার কথা। জাহাজ যেখানে যাবে চন্দ্রকিরণও যাবে সেখানে।

তা হলে চলো, আমরা তো ডাঙায় যাচ্ছি, তুমিও না হয় সঙ্গে থাকবে। না না কোনও অসুবিধা হবে না। তারপরই সুরঞ্জন হেসে ফেলল। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় জ্যোৎস্না, এবং সমুদ্রও যে বন্ধু হয়ে যায় সে টের পেল।

চিমনির আড়ালে সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেটটা সমুদ্রে টোকা মেরে উড়িয়ে দিল। তাকে রোজই এ-ভাবে আজকাল অপেক্ষা করতে হয়। তার একটা সিগারেটও শেষ। এখনও মুখার্জিদা কেন যে আসছেন না।

সবাই জানে সুরঞ্জনের বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই মুখার্জিদার সঙ্গে। একসঙ্গে এ-জন্য

মধ্যরাতে ডেকেও উঠে আসে না তারা। আগে পরে করতেই হয় কে আবার দেখে ফেলবে। দেখে বলবে, বাজে কথা, দুজনকেই তো দেখলাম পাশাপাশি ডেকে হেঁটে যাচ্ছেন—কিংবা পিছিলেও দেখা গেছে। কেউ তো কাউকে এড়িয়ে চলছে না।

এই ক্যামোফ্লেজ কাঁহাতক রক্ষা করা যাবে তাও সে জানে না। কখন না, সবার সামনে 'মুখার্জিদা শোনো' বলে ডেকে ওঠে। সতর্ক থাকতেই হয়। হয় মুখার্জিদা এসে এখানটায় অপেক্ষা করেন, নয় সে। অন্তত দু'জনের দেখা না হওয়া পর্যন্ত একজনকে অপেক্ষা করতেই হয়।

শুধু পরিতে উঠে আসার সময় কে আগে যাচ্ছে, দরজায় টোকা শুনলে টের পাওয়া যায়।

আজও ভেবেছে, মুখার্জিদা হয়তো আগেই উপরে উঠে গেছেন। মধ্যরাতের জাহাজ বড় বেশি একা। ডেকে কিংবা বোটডেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি করলেই টের পাওয়া যায়, কেউ কোথাও নড়ানড়ি করছে। তার এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করারও হেতু থাকতে পারে না। কারও চোখে পড়লে, প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে, এত রাতে বয়লার রুম থেকে উঠে আসা কেন! কি দরকার এখানটায়।

তাদের বসার জায়গা তিন নম্বর বোটের পাশটাতে। সে ইচ্ছে করলে সেখানে বসে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু মুশকিল, এতই আড়াল আবডাল যে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। কেউ দেখে ফেললে হৈ চৈ শুরু হয়ে যেতে পারে। ওখানটায় বসে এত রাতে কি করছিলে!

হঠাৎ তার ঘাড়ে একটা হাত চেপে বসল! সে খুব দ্রুত সরে দাঁড়াতে দেখল, মুখার্জিদা।

'ঘাবড়ে গেছিলি!'

'হঠাৎ যমুনাবাজু ধরে উঠে এলে। আমি তো গঙ্গাবাজুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি!'

দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে বোটের আড়ালে চলে গেল। মুখার্জিদা চিমনির আড়ালে বোধহয় কোনও কথা বলতে চান না।

হামাগুড়ি দেবার সময়ই সুরঞ্জন বলল, 'খবর কি?'

'খবর ভাল না।'

'কাল যে বললে জাহাজের অন্তত একটা রহস্যের কিনারা করা যাবে মনে হচ্ছে। রহস্যটা টের পেলে পথ পরিষ্কার। সিঁড়িটা খুঁজে পাবে। খুব তো খুশি ছিলে। শিসও দিলে। এখন বলছ, খবর ভাল না।'

'কি করে খবর ভাল হবে বল! অর্বাচীন নির্বোধ হলে আমি কি করতে পারি। বলে তিনি হাঁটুর কাছে প্যান্ট টেনে একটু সহজ হয়ে বসতে চাইলেন। অর্বাচীন নির্বোধ না হলে বলে, আর ইউ গার্ল? ওকে কি আমি বলেছি, চার্লি বয় না গার্ল খোঁজ করতে! নিজের গলায় ফাঁস পরতে চাইলে আমি কি করব! এটাই তো জাহাজের সবচেয়ে বড় রহস্য! দুম করে বলে ফেললি, আর ইউ গার্ল! বল, রাগ হয় না! বললেই চার্লি স্বীকার করবে শি ইজ এ গার্ল! কখনও করে! এখন তো মনে হচ্ছে কিছুই করতে পারব না। চার্লি সতর্ক হয়ে যাবে না! কিংবা চার্লিকে যিনিই বাধ্য করেছেন, ছেলের পোশাকে থাকতে তিনি কি খবরটা পেয়ে যাবেন না।'

সুরঞ্জন হাঁটুর উপর হাত রেখে সামান্য কাত হয়ে শুল। কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে শুনছে। সে মুখার্জিদার কথাও বুঝতে পারছে না। চার্লি মেয়ে না ছেলে প্রশ্নটা আবার মাথায় পেরেক পুঁতে দিচ্ছে কেন তাঁর! এই না কলিজ্ঞ জাহাজের রহস্যটা খুব জটিল মনে হয়েছে! তা ছাড়া ছেলের পোশাকে থাকাটাও অস্বাভাবিক ভাবছে কেন। জাহাজের শুধু একজন মেয়ে আর সব দামড়া, বিশ বাইশ মাসে সব অমানুষ—অ্যানিমেল—টের পেলে বন্য হয়ে উঠবে না। ষাঁড়ের গুঁতোগুঁতি জাহাজে কত তুমি নিজেই জানো। সেই আতঙ্কেও ছেলে সাজিয়ে রাখতে পারে। এত সুন্দর দেখতে, কি ধারালো চোখ মুখ, আর পাতলা, যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়—পাখি। হাঙরেরা টের পেলে পাখির ডানা ভেঙে দেবে সহজ কথা। তছনছ করে দেবে। ছিঁড়ে ফুঁড়ে খেতে পারে।

সুরঞ্জন বলল, 'না, কিছু বুঝছি না! খবর ভাল না বলছ কেন! মগড়া যায়নি!'

'গেছে।'

'সুহাস দেখল!'

'দেখেছে।'

'কিছু বলল!'

'মগড়াকে সন্দেহ করছে।'

সুরঞ্জন উঠে বসল।

'মগড়াকে! কি যে বল! এত বুদ্ধু! মগড়ার সাহস হবে!'

'সাহস হবে না বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু—মগড়া তো বলছে না, কার কাছে মুখোসটা আছে! ও তো বলছে না, মুখোসটা সে পায় কোথায়! রাখে কোথায়। কিছু বললেই এক কথা, নিখোঁজ মুখোসটা নিয়ে জলে পড়ে গেছিলে—তাই দেখলাম। জাহাজেই আছে। জাহাজে থাক না থাক বড় কথা নয়। আসলে মুখোসটা পরে চার্লিকে অনুসরণ করবে কেন?'

'তোমার কি মনে হয়।'

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা ঠিক—চার্লি মেয়ে না ছেলে যদি কেউ প্রথম টের পায়, তবে সে মগড়া। বাথরুম সাফসোফ আর কে করে। গঙ্গাবাজুর কেবিনগুলিতে সেই ভোরে কড়া নাড়তে পারে। চার্লি গঙ্গাবাজুতেই থাকে। মগড়া টের পেতেই পারে। ডেকটোপাজ ধরিয়া ওদিকে যায় না। বাথরুমে চার্লির অসতর্ক মুহূর্তে সে কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।'

'সেটা কি?' সুরঞ্জন আর একটা সিগারেট ধরাবার সময় প্রশ্ন করল।

'কি, আমি জানি না। চেপে ধরতে হবে। কোথায় ধরা যায় বল তো। চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিলে উপায় আছে! সে বলবে না, মুখার্জিবাবু বুলছে, আমি ছোটাসাহেবের কেবিনে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি। তিনি সাব না মেমসাব—আচ্ছা, আজব বাত বুলছে! হামার কি আর কৈ কামওম নেই।'

সুরঞ্জন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

মুখার্জি বললেন, 'থেমে গেলি কেন?'

'না বলছিলাম, এ-বয়সে তো মেয়েদের পাছা ভারী হয়। বুক ঢেকেঢুকে রাখাও তো সহজ নয়।'

'পাছা ভারী না পাতলা, আমি হাত দিয়ে দেখেছি! না তুই! যা ঢোলা প্যান্ট শার্ট পরে—পাশ বালিশের খোল, মনে হয় গায়ে বস্তা চাপিয়ে রেখেছে। কার সাধ্য আছে পাছা ভারী না পাতলা, কে সন্দেহ করবে—বুকে দুটো কুসুম কলি ফুটছে।'

'ফুটছে মানে?'

'ফুটছে মানে, ফুটে উঠছে।'

'কত দিন এটা সম্ভব। তা-ছাড়া ধরো এই যে অসুস্থ—যদি ডাক্তার দেখায় সেখানে তো কারও কোনও জারিজুরি থাকবে না। ধরা পড়বেই।'

মুখার্জির মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভাবল সুরঞ্জন ঠিকই বলেছে। কাপ্তানবয় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। ইতিমধ্যেই আতঙ্কে পড়ে গিয়ে কিছু পাচার করে ফেলেছে। একটা ম্যাপ এবং কিছু বই। কিছু চিঠিপত্র। দুটো-একটা রেখে বাকি সব ফেরত দিয়েছে। কাপ্তানবয়কে বুঝতেই দেয়নি, সব তিনি ফেরত দেননি। এখন সে-ই তাঁর বড় আড়কাঠি। সে-ই পারবে। কাপ্তান ঘরে না থাকলেও সে যখন তখন ঢুকতে পারে কেবিনে। কাপ্তানের একমাত্র অনুগত এবং বিশ্বস্ত। মানুষটি যে খুব খারাপ তাও না! ভাল মানুষই বলা চলে। তবে কিছুটা অর্থলিপ্সা আছে। তাতেই ফেরে পড়ে গেল। পাছে মুখার্জিবাবু থার্ডমেটের কানে লাগিয়ে দেয়—রসদঘর থেকে পেটি পাচার, সেই আতঙ্কে জো হুজুর হয়ে আছে। এখন তো আরও বেশি হাতের মুঠোয়। আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়েও দিয়েছেন। যাবে কোথায়! এই যে বলে, চিঠিপত্র মেলে ধরলেই চুল খাড়া হয়ে যাবে। কাপ্তানের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কার মারফত পাচার হল! আর এক সংশয়—এবং কাপ্তানবয় সে-ভয়ে কাবু।

'শোন, যদি জাহাজে ডাক্তার উঠে আসেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু খবর-টবর চেষ্টা করলে পেয়ে যেতেও পারি। তবে কতটা সুবিধে হবে তাতে বুঝি না। প্রেসক্রিপসান,ওষুধ, এ-থেকেও ধরা যেতে পারে। অবশ্য ধরা যাবেই এমন কথা নেই। যিনি এত চতুর—তাঁর পক্ষে, কখনই ঢিলেঢালা কাজ করা সম্ভব নয়। তোর কাজ, জাহাজ লাগলে, কিনারায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়া। দ্বীপটায় জেটি নেই—জাহাজ বয়াতেই বাঁধা থাকবে। নৌকো ছাড়া পারাপারের আর কোনও সুযোগ নেই। জায়গাটা তোর প্রথমে চিনে রাখা দরকার। মানুষজন বলতে দ্বীপের কিছু বাসিন্দা। মাছের কিছু আড়ত আছে। কিছু স্টিমার লঞ্চ ভাড়া খাটে। আর সব নৌকা—উকন গাছের কাঠে তৈরি। আমাদের কঁড়ুই গাছের মতো দেখতে গাছগুলি। হয়তো কঁড়ুই গাছই—এরা উকন বলে। খুব শক্ত কাঠ। কাঠের গোলা আছে অনেকগুলো। পাকা রাস্তা। সমুদ্রটাকে ঘিরে রেখেছে। কোম্পানির নিজস্ব শহর এলাকায় রাস্তাটা ঢুকে গেছে। জীবিকা বলতে মাছ ধরা, না হয় ফসফেট কোম্পানীর কুলি কামিনের কাজ। মানুষগুলো দেখতে বেঁটেখাটো, তামাটে রং। ভারতীয়দের সঙ্গে চেহারায় খুব মিল। তবে কাফ্রিদের মতো লোকজনও আছে। চাষ আবাদের চল বিশেষ নেই।'

'কি খায় তবে?'

'পাশের দ্বীপগুলোতে চাষ আবাদ হয়তো হয়—দু-চার মাইল, কিংবা পাঁচ দশ কি আরও বেশি দূরে দূরে অজস্র দ্বীপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে আমিও সব ভাল জানি না। জাহাজ ভিড়লেই নেমে যাবি। নামলেই টের পাবি, নানা লোক কানের কাছে ফিসফিস

কথা বলছে। জলদস্যুদের কথাও বলবে। তাদেরই বংশধর তারা—ঘরে নিয়ে যেতে চাইবে। জলদস্যুদের বংশলিপি থেকে কিছু নথিপত্রও গোপনে দেখাতে পারে। যদি প্রলুব্ধ করা যায়। কি সব হিজিবিজি লেখা—একটা বর্ণও উদ্ধার করা সম্ভব না, কি ভাষা তাও জানা যায় না। ঘুরতে গিয়ে গুপ্তধনের লোভে এ-ধরনের চক্রে পড়ে না যাওয়াই উচিত। জান-মান নিয়ে টানাটানি—সুযোগ পেলেই হল।'

'হেঁটেই ঘোরাঘুরি করা যাবে?'

'হেঁটেই পারবি। বন্দর এলাকাতে কিছু মানুষজনের ঘরবাড়ি, হোটেল। সাইকেল ভাড়া নিতে পারবি। টাট্টু ঘোড়ারও চল আছে। পয়সা বেশি খরচ করতে পারলে আরবি ঘোড়াও মিলতে পারে। দ্বীপের ভিতরে ঢুকে যাবার মুখে কিছু আস্তাবল আছে। সাইকেল চালাতে জানিস!'

'জানব না কেন?'

'জানলে ভাল। সাইকেলে কিছু অসুবিধাও আছে। দ্বীপের বন্দর এলাকাতেই সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যায়। বেশি দূর যেতে পারবি না। ঝোপজঙ্গল, পায়ে হাঁটা পথ। উঁচু-নিচু এলাকা। পাথর আর পাথর। সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গাগুলিতেই কিছু বসতি আছে। সবচেয়ে সুবিধা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারলে।'

দ্বীপটার এত বিবরণ কেন দিচ্ছেন মুখার্জিদা সুরঞ্জন বুঝতে পারল না। জীবনেও ঘোড়ায় চড়েনি। এমনকি কখনও ঘোড়া দেখলেই মনে হয়েছে, হয় কামড়ে দেবে, না হয় লাথি মেরে ভুঁড়ি ফাঁসাবে। ঘোড়া গরু ষাঁড় তার কাছে সমান। সাইকেলই নিরাপদ। বন্দর ছেড়ে আর যাবেই বা কোথায়।

'তুমি দ্বীপটা ঘুরে দেখেছ?'

'দেখেছি। আবার দেখিওনি।'

'সাইকেলে?'

'না। ঘোড়ায় চড়ে বসতে পারলে কোনও ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম, ওর সঙ্গে লোক দেয়। পরে কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে, বেশ মজা। একা একা যত দূরেই যাও, কেউ দেখার নেই। তবে গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চারা ঝামেলা পাকায়। ঘিরে ধরে। ক্যাপস্তান, ক্যাপস্তান বলে চিৎকার—কান ঝালাপালা করে দেবে। পয়সা চাইবে। রুটি চাইবে। উলঙ্গ। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে পেট শ্রীঘট।'

'সুন্দরীদের দেখা পাওয়া যাবে না?'

সুরঞ্জন দ্বীপটার কথা শুনে সুন্দরীদের কথা না ভেবে পারেনি। পাথর, পাহাড়, কচ্ছপ আর নানা জাতের পাখির ওড়াউড়ি—তার ভিতর কোনও জঙ্গলে, কোনও কুটির নির্মাণ করে যদি কেউ থেকে যায়—কে জানে, কে আছে! মুখার্জিদা ঘোড়ায় চড়ে কি খুঁজে বেড়াত!

মুখার্জিদা কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না। সুন্দরীদের কথায় বিরক্ত হতে পারেন। এত লঘু করে দেখলে হবে কেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সুন্দরীদের কথা আসে কি করে।

'আরে কি হল! কথা বলছ না কেন?' সুরঞ্জন কনুইতে গুঁতো মারল মুখার্জিকে।

'আরে আমি ঠাট্টা করলাম। আচ্ছা বলো, আমরা কি ভাল আছি! মেজাজ বিঁচে থাকলে

কি করব। উটকো এক ঝামেলায় আবার জড়িয়ে পড়ছি। সুন্দরীদের কথা ভাবলে মন হালকা হয় বোঝোই তো। বলো কি বলছিলে?'

না, কোনও কথা না। মুখার্জি কাত হয়ে বোটডেকে শুয়ে আছেন। একেবারে গুম মেরে গেছেন।

'আচ্ছা বাবা দোষ হয়েছে।' বলে সুরঞ্জন মুখার্জির সামনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল। বলল, 'যা যা বলছ সবই তো করছি। এত টেনশান আর কাঁহাতক সহ্য হয়। চার্লি মেয়ে এই এক টেনশান, জাহাজ কবরে যাচ্ছে এই এক টেনশান। বংশীদার পাগলামি বেড়ে যাচ্ছে—জাহাজ কবে দেশে ফিরবে কে জানে! তার উপর আমরা যেন সত্যি কেউ খুন হতে যাচ্ছি। মুখোস তো তাড়া করছেই। কলিজ জাহাজ আরা এক বাঁশ।

সুরঞ্জন হঠাৎ যেন মুখার্জিকে কোনও সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছে, 'আচ্ছা দাদা ম্যাকের ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ভাবতে পারছ না! পারলেই নিশ্চিন্তি। মুখোস টুখোস বাজে ব্যাপার। কেউ অনুসরণকারী, বাজে ব্যাপার। তোমার মাথায় দুশ্চিন্তাও থাকে না তা হলে, ডেরিক কে তুলে রাখল, কে খুন করল—ভুল-ভালও তো হতে পারে! ভুলে ডেরিক হয়তো নামানোই হয়নি! লজঝরে জাহাজের কোথায় নিরাপদ বলো! আজ এটা ভাঙছে, কাল ওটা খুলে যাচ্ছে—ডেরিক মাথায় ভেঙে পড়তেই পারে। এই তো শুনলাম বয়লার চকও নাকি কিছুটা বসে গেছে। কোনদিন যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে সব! দাও, জাহাজটাতে আগুন লাগিয়ে—ভূতের গুষ্টিসুদ্ধ পুড়ে মরুক। বংশীদা ঠিকই বলে, আগুনের কাছে সব ভূত জব্দ।

'থাম!' মুখার্জিদা গম্ভীর গলায় বললেন।' 'ভূতের কোনও দায় নেই, ভূতের মাথাও পরিষ্কার না। সে কারও অনিষ্ট করে না। ভয়টা মানুষ ভূতের। ভয়টা গুজবের। গুজবের কানমাথা থাকে না। গুজব শুনতেও ভাল লাগে, বিশ্বাস করতেও ভাল লাগে। অলৌকিক হলে তো কথাই নেই! ভিতরের দিকে ঢুকে সেবারে বি-সেভেনটিন বোমারু বিমানও দেখলাম একটা। পড়ে আছে। গোঁত্তা খেয়ে ভেঙে পড়ে আছে। দ্বীপের লোকেরা বলল, দুষ্টু হাওয়ার কাজ।'

সুরঞ্জন একটা ফের সিগারেট ধরাল। সে উত্তেজনা বোধ করছে। কিছুই তো জানে না। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এই সব এলাকায় সে আসেওনি! দুষ্টু হাওয়ার কথাও কখনও শোনেনি।

'খাবে নাকি।' বলে একটা সিগারেট মুখার্জিদার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আমরা কি তবে দুষ্টু হাওয়ার চক্রে জড়িয়ে পড়ছি!'

'কি জানি! তোর মাথায় তবু যা হোক সুন্দরীরা নাচানাচি করে। আমার তো শালা সুহাসের কথা ভেবে ঘুমই আসে না। কেউ দ্বীপে মরে পড়ে আছে, তা দুষ্টু হাওয়ার কাজ। হয়ে গেল। না আছে পুলিশ, না আছে প্রশাসন বলতে কিছু—কিছু হলে তার কৈফিয়তও কেউ তলব করবে না।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে মুখার্জি বললেন, 'মুশকিল কি, কেউ অবিশ্বাস করবে না। বিমানটা দেখে আমারও মনে হয়েছে, হতেও পারে। মনে হয় ইভিল উইন্ডস সত্যি হয়তো আছে। ভাঙা বিমানটার গায়ে দেখলাম, আলকাতরা দিয়ে লেখা—হয়তো বিমানের ক্রু এবং পাইলট অলৌকিক উপায়ে বেঁচে গিয়েছিলেন—

বিমানের গায়ে লিখে রেখেছেন—ইট ওয়াজ দ্য ব্ল্যাকেস্ট অফ ব্ল্যাক নাইটস—দ্য ওয়ার্স্ট ইভিল ওয়েদার আই হ্যাভ এভার সিন ইন মাই লাইফ।'

'দ্বীপবাসীরা মড়ক লাগলে ভাবে না তো দুষ্টু হাওয়ার কাজ!'

'ভাবে। যেমন যুদ্ধের সময়টায় তারা দুষ্টু হাওয়ার কবলেই পড়ে গেছে এমন ভাবত। যারা বেঁচে আছে তারা তো তাই বলে—ঘোস্ট অফ ওয়ার। যুদ্ধের সব ভূতেরা দ্বীপের যেখানে সেখানে লুকিয়ে পড়েছে এমনও ভাবে।' বলে মুখার্জিদা হুস করে সিগারেটে জোর টান দিলেন একটা।

সুরঞ্জন বলল, 'যুদ্ধের ভূত জঙ্গলে দেখেছ?'

'দেখেছি! তবে জঙ্গলে নয়। সমুদ্রে। অতল জলে সে ফুটে আছে।'

'দেখতে কেমন?'

'একটা ফুলের মতো!'

'কি বলছ?'

'যা দেখেছি তাই তো বলব। বানিয়ে বলে কি লাভ! দ্বীপটার বেলাভূমি জুড়ে এখানে সেখানে অদ্ভুত সব ছোট ছোট পাহাড় আছে। একেবারে গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড় মনে হবে। সমুদ্রের জল থেকে ভেসে উঠছে, আবার জোয়ার এলে ডুবে যাচ্ছে। পাহাড়ের খাঁজে সমুদ্রের জল ভারী স্বচ্ছ। পঞ্চাশ ষাট ফুট গভীরে বিমানের একটা মুন্ডু দেখেছিলাম। ককপিট নানা রঙের স্পঞ্জে ঢেকে গেছে। মনে হয় গভীর জলে পাহাড়ের গোড়ায় সবুজ লাল নীল একটা ফুল ফুটে আছে। না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যুদ্ধের ভূত সমুদ্রের নীচে কত সব কুহেলিকা সৃষ্টি করতে পারে! দ্বীপের মানুষ জন—এই সব দেখিয়ে পয়সা-টয়সাও চায়।

সুরঞ্জন বলল, 'যুদ্ধের ভূত বলছ কেন? ভূত আসে কোত্থেকে। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ বলো।'

'সব দেখার পর ঘোস্টস্ অফ ওয়ার না বললে যেন দ্বীপগুলিকে ছোট করা হয়।' মুখার্জি দু-হাত উপরে তুলে বললেন, 'মারাত্মক সব দৃশ্য। দ্বীপের যত্রতত্র ভাঙাপোড়া সব মিলিটারি ছাউনি। দ্বীপটার চারপাশে বিশাল বিশাল এয়ার স্ট্রিপ অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে গেছে। মরা এয়ারস্ট্রিপ ধরে দূরের বনজঙ্গলে সহজে হারিয়ে যাওয়া যায়।'

সুরঞ্জন বলল, 'যুদ্ধ তো কবেই শেষ। বারো চোদ্দ বছরের কথা। এয়ারস্ট্রিপের আশপাশে মানুষজনের বসতি গড়ে ওঠেনি!'

'কোথাও উঠেছে, কোথাও খাঁ খাঁ করছে সব। যতদূর চোখ যায়, রেন ফরেস্ট, কোথাও পাহাড়ি ক্যাকটাস। কোথাও কোনও প্যালিকান পাখি আবার উড়ে এসে ঘরবাড়ি বানাবার চেষ্টা করছে।'

'প্যালিকান পাখি দ্বীপে নামলে দেখতে পাব!'

'তা জানি না। তবে দেখা যায়। বড় বড় কচ্ছপও দেখতে পাওয়া যায়। সব দ্বীপে নয়। কোনও কোনও দ্বীপে। প্রাগৈতিহাসিক জীবেরাও ঘোরাফেরা করে। সব শোনা কথা।'

দুজনই চুপচাপ। কেউ আর কথা বলছে না।

মুখার্জি নীরবতা ভেঙে বললেন, বিশ্বাসই করা যায় না, এই সেদিন এখানে যুদ্ধের

তান্ডব চলছিল। দ্বীপগুলিতে কামানের গর্জনে কান পাতা যেত না। সব এখন অতীতের গর্ভে। দ্বীপের লোকজন যে যার মতো যুদ্ধশেষে যেখানে যা পেয়েছে, বাড়ির সামনে ডাই করে রেখেছে। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন। তবু মানুষ হারিয়ে যায় না। বেঁচে থাকে। ঘরে ঘরে ইস্পাতের হেলমেট। তাতে খাবার জল ধরে রাখে কেউ। কেউ বাসন-কোসনের মতো ব্যবহার করে। মৃত সৈনিকদের পরিত্যক্ত হেলমেট ভূতের কথা বড্ড বেশি মনে করিয়ে দেয়। সামান্য জনবিরল জায়গাতেই অন্ধকারে গা ছমছম করে। মনে হয় জঙ্গল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে কেউ। যুদ্ধের বিভীষিকা সহজেই গ্রাস করতে পারে। সতর্ক থাকা ভাল।

তারপর ফের দু'জনই চুপ হয়ে গেল। কেমন কঠিন হয়ে উঠছে, দু'জনেরই মুখ। নিরাপদ নয় তারা কেন যে এমন ভাবছে। পরির কথা মনে থাকল না। সমুদ্রের সোঁ সোঁ গর্জন আর ইনজিনের শব্দ মিলে কেমন সব ভুতুড়ে গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে মাথার ভিতর।

অগত্যা সুরঞ্জনই বলল, 'আচ্ছা মগড়াকে সত্যি সন্দেহ করা যায়!'

'যেতে পারে। মাপজোকের হিসাবে কোনও গোলমাল নেই। মাঝারি হাইটের মানুষের পক্ষেই সম্ভব রেলিঙের উপর উঠে ঝুঁকে পড়া। পোর্টহোলের মুখোমুখি হতে গেলে মাঝারি হাইট না হলে অসুবিধা আছে। চার্লির পোর্টহোলে গিয়ে দাঁড়ালে এটা বোঝা যায়। তবে এটাও সংশয়, মগড়া যাবে কেন? যদি যায়ই, ধরে নেওয়া যাক, গন্ধ শুঁকে টের পেয়ে গেছে, কৌতূহল কিংবা আবিষ্কার, যাই ভাবিস, সে যদি ধরা পড়ার ভয়ে মুখোস পরে যায়ই—তা সে সামান্য বোতলের লোভে ফাঁস করবে, বিশ্বাস করতে মন চায় না। বোতলের লোভে এমন আহাম্মকের মতো কাজ করতে পারে—নিজের বিপদের কথা ভাববে না!'

'তাও বটে!' সুরঞ্জন পায়ের নখ খুঁটছে।

আবার দু'জনেই চুপ। কেউ কোনও কথা বলছে না। সমুদ্রের জ্যোৎস্নায় জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।

সুরঞ্জন সহসা কি ভেবে বলল, 'চার্লির অনুসরণকারীর কথা কি মগড়া জানে! মানে চার্লি তার পোর্টহোলে মুখোস দেখতে পায়, মগড়া কি জানে?'

'জানলে উঁকি দিতে সাহস পায়! চার্লি জানেই না ওটা মুখোস। ওর ধারণা কোনও বুড়ো মানুষ তার পিছু নিয়েছে। পোর্টহোলে উঁকি দিচ্ছে। মগড়া ধরা পড়ে না যায়, মুখোসটা পরে উঁকি দিতে পারে। মেয়ে মানুষের গন্ধ—ঠিক থাকে কি করে! টের পেলে মগড়া কেন, জাহাজসুদ্ধু চার্লির পোর্টহোলে ঢুকে যেতে পারে। মগড়াকে দোষ দিয়ে কি লাভ! যেতেও পারে, নাও পারে। গেছে তার প্রমাণ কোথায়! মুখোসের খোঁজ দিয়েছে বলে, সে-ই অনুসরণকারী কিছুতেই প্রমাণ হয় না।'

সুরঞ্জন বলল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

মুখার্জি কোনও সাড়া দিল না।

খুব সকালে জাহাজিরা যে যার মতো উঠে পড়েছে। রেলিঙে ঝুঁকে আছে। চিৎকার কিনারা দেখা যাচ্ছে—চেঁচামেচি।

সবার ঘুম ভেঙে গেল। কেউ আর নীচে থাকতে পারেনি। যেন কতকাল শুধু জল আর জল—ডাঙা দেখার আকর্ষণ কি গভীর এদের চোখ মুখে তা বড় বেশি প্রকট। দ্বীপের ছড়াছড়ি, একেবারে গা ঘেঁসে যাচ্ছে জাহাজ—গাছগাছালি সব চোখে পড়ছে। কোনও দ্বীপে ঘন সবুজ অরণ্য। অথবা কোনও দ্বীপে পাথরের খাড়া পাহাড়—যেন এই মাত্র সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠেছে দ্বীপটা। আকাশ মেঘলা। শেষ রাতে দু এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ফল্কার ত্রিপলে ছোপ ছোপ জলের দাগ লেগে আছে এখনও। আর অজস্র পাখির ওড়াউড়ি। ঢেউয়ের মথায়ও পাখিরা নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে।

এ-ভাবে সাত আটটা দ্বীপ জাহাজ দু-পাশে ফেলে রেখে এগিয়ে গেল। দ্বীপগুলিতে কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়েনি। তবে রাতের বেলা হলে জাহাজিরা টের পেত বসতি আছে কি নেই। দ্বীপে আগুন জ্বলত। ঘরবাড়ি থাকলে জঙ্গল ফুঁড়ে আলো ভেসে উঠত। কাজেই মানুষজন থাকতেও পারে নাও পারে। জঙ্গলের ভিতর যে বাড়িঘর বানিয়ে লোকালয় গড়ে ওঠেনি কে বলবে! এমন সুন্দর নির্জন নিরিবিলি দ্বীপে মানুষের চিহ্ন থাকবে না হয়। যেন জাহাজের যে কেউ সুযোগ পেলে নেমে পড়ত। জাহাজে আর ফিরত না। বন্দিজীবন—কাঁহাতক আর ভাল লাগে। সমবয়সী কোনও নারী আর শস্যক্ষেত্র কিংবা মিষ্টি জলের হ্রদ থাকলে তো কথাই নেই। মানুষের এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না।

চার্লি ডেকচেয়ারে বসে আছে। সে চোখে দূরবিন লাগিয়ে দ্বীপগুলি দেখছে। দেখাই স্বাভাবিক—কি দেখছে, সুহাস অবশ্য বুঝতে পারছে না। ছুটেও যেতে পারছে না—তার প্রতি মুখার্জিদা থেকে প্রায় সবারই কম বেশি নজর। তা ছাড়া চার্লি যদি সত্যি মেয়ে হয়—সে তো কোনও মেয়ের সঙ্গেই কখনও ঘনিষ্ঠ হয়নি। এত কথাও কেউ তার সঙ্গে বলেনি। কি করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাও ভাল জানে না। ভাবতে গিয়ে সত্যি সে বিপাকে পড়ে গেল।

আচ্ছা মেয়ে হলে চার্লি বলত না! এত কথা বলে, সে তার আসল পরিচয় যে লুকিয়ে রেখেছে তাই বা বলবে না কেন! পছন্দ অপছন্দ সব কথাই বলে। সে তো ভেবেই পায় না, কেন অস্বীকার করবে সে মেয়ে নয়। অথচ মুখার্জিদা এক এক করে যে-ভাবে যা বলে যাচ্ছেন, সব প্রায় ঠিকঠাক ফলে যাচ্ছে। এটা যদি সত্যি হয়! কারও চাপে সে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। সে তো কোনও ক্ষতি করেনি তার। ক্ষতি করতেও পারবে না। জীবন সংশয় হলেও না। কি যে আছে চার্লির মধ্যে ভেবে পায় না। কিশোরী সে। তার শরীর শিরশির করছিল ভাবতে গিয়ে। ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে চলে যায়, যে যাই বলুক, তাতে তার কিচ্ছু আসে যায় না। চার্লি তার কোনও ক্ষতি করতে পারে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। এই একটা ধন্ধ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

তবে অকারণ যাওয়াও যায় না। গ্যালিতে চর্বি ভাজা রুটি হচ্ছে। তার গন্ধ ছড়াচ্ছিল। চা যে যার কাপে ঢেলে নিচ্ছে। সুরঞ্জন তাকেও এক কাপ চা দিয়ে গেছে। ডাঙা দেখলেই এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আর দেশে ফিরে গেলে কি না জানি হবে! দূর থেকে চোখে ভেসে উঠবে নদীনালার দেশটা—ঢাকের বাদ্যি বাজতে শুরু করবে ভিতরে।

ঢাকের বাদ্যি এখনও কম বাজছে না। কাজের নামে বের হয়ে পড়া গেলে বাঁচা যেত।

ঘড়ি দেখল—সে ইচ্ছে করলে কাজের অছিলায় কাপের কাছে চলে যেতে পারে—সারেঙ তাকে বলে দিয়েছেন, ফোর্থ-ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মেরামতির কাজ করতে হবে। কোথায় করতে হবে জানে না।

চার্লি এখনও কিছু বলছে না। জাহাজ থেকে চার্লি নেমে যেতে পারবে কিনা, তার শরীর ভাল নেই, অসুস্থ—নাও নামতে পারে। একা একা দ্বীপে ঘুরতে তার ভাল লাগবে না। সুরঞ্জন কিংবা মুখার্জিদা তাকে আজকাল সঙ্গেও নিতে চান না। খারাপ জায়গায় গিয়ে তোর কি হবে। আমরা খারাপ জায়গায় যাচ্ছি। মুখার্জিদা আসলে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই বাহানা সৃষ্টি করেন। চার্লির সঙ্গে ঘোরাফেরায় বাবুর রাগ।

রাগ কি এক কারণে! মুখার্জিদার কোনও কথাই গ্রাহ্য করছে না। মুখোস পরেও যেতে রাজি হয়নি। মুখার্জিদা খুবই গুম মেরে গেছেন। দরজা বন্ধ করে ফোকসালে কি যে সারাদিন করে! দরজায় কড়া নাড়লে, বিরক্ত হন। তার সঙ্গে কথা বলাও প্রায় যেন বন্ধ। মগড়াকে নিয়ে পড়েছেন। মগড়া মুখোস পরে সত্যি পোর্টহোলে উঁকি দিয়েছে কিনা, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। কিংবা গেলেও তিনি চেপে গেছেন। চার্লিকে বললে হত, তুমি একদম ভয় পাবে না। মগড়ার মাথা খারাপ আছে। তারই কাজ।

তারপর ভাবলেই সে কেমন গুটিয়ে আসে। কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার সত্যি যদি সে হয়। চার্লি জেনেশুনে তাকে জড়াবে না, সে তো বলল, তুমি যাও সুহাস। তোমাকে আর জড়াতে চাই না। মুখার্জিদাকে বলবে কিনা বুঝতে পারল না। জড়াতে চাই না কথাটা তো ভাল না। বিপদের গন্ধ আছে কোথাও।

বিকেলে জাহাজ নোঙর ফেলে দিল। বাঁধাছাঁদার কাজও শেষ। সে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে। দড়ির সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। চার্লি আগেই রেডি। সে নেমে গেছে। দুপুরে কত কথা হল—এখানে কোথায় আস্তাবল আছে—ঘোড়া আছে—ইচ্ছে করলে সে চার্লির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখতে পারে।

'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ কেন। তুমি অবাক হচ্ছো কেন!'

'আমি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব। পড়ে মরি আর কি!'

'সে দেখা যাবে।'

চার্লি আর কোনও কথাই তার শুনতে চায়নি। চার্লি অসুস্থ, অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘোড়ায় চড়া ঠিক হবে না শুনে ক্ষিপ্ত। 'আমি অসুস্থ, কে বলেছে!'

'বারে বের হলে না, চুপচাপ কেবিনে শুয়ে থাকলে তিন-চারদিন। কিছু না-হলে কাজে বের হতে না!'

'আমার কিচ্ছু হয়নি।' বলে ফিক করে হেসে ফেলেছিল। জামা প্যান্ট অভ্যাসবশে একটু বেশি টানাটানি করছিল চার্লি।

সারেঙসাব ঝুঁকে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই কোথায় যাচ্ছিস। কখন ফিরবি। মুখার্জিবাবু জানে!'

চার্লি নৌকায় টাল সামলাচ্ছিল। দেশি নৌকা, পাটাতন নেই। দু'জন লোক, খালি গা, মাথায় ক্যাম্বিশের টুপি—পরনে হাফ-প্যান্ট, তালিমারা, তামাটে রঙের, চুল কোঁকড়ানো

এবং ঠোঁট ভারি, ওরা বৈঠায় চাড় দিচ্ছে। জাহাজের নীচে অপেক্ষা করছিল, কেউ যদি যায় কিনারায়।

চার্লি বুকে হাত রেখে কি ইশারা করল সারেঙকে। যেন বলতে চাইল, আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কোয়ার্টার মাস্টারকে বলে দেবে। তারপর দেখা গেল অধীর, কেষ্ট, ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ছে, 'কোথায় যাচ্ছিস।'

'জানি না।' সুহাস হাত তুলে বলল।

ক্রমে নৌকা দূরবর্তী হচ্ছে। চারপাশে টাগবোট আর দেশি নৌকা। কিনারায় দুটো মোটরবোট এগিয়ে যাচ্ছে। গ্যাঙওয়েতে সিঁড়ি না ফেলতেই ওরা নেমে যাওয়ায় সবাই অবাক। দড়ির সিঁড়ি ধরে নামা যায় সহজেই। পিছিলে কেউ আগেই নেমে গেছে। সে কে?

মুখার্জি খবরটা পেয়ে ছুটে এলেন উপরে—'কি বলব বলুন', সারেঙসাবের দিকে তাকিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন।

সারেঙসাব বললেন, 'বাড়িয়ালা কেন যে এত আসকারা দিচ্ছে ছোটসাবকে বুঝি না। জাহাজে বাঁধাছাদার কাজ তো ভালভাবে শেষও হয়নি—দড়ির সিঁড়ি কে লটকে দিল পিছিলে!'

মুখার্জি বুঝলেন, সুরঞ্জনের কাজ। তার নেমে যাবার কথা। কখন গ্যাঙওয়েতে কাঠের সিঁড়ি নামানো হবে, সে আশায় সে বসে থাকেনি। কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বন্দর এলাকা খুব বড় নয়, ঘিঞ্জিও নয়। ফসফেট ছাড়া আর কিছু বাইরে যায় বলেও মনে হয় না। নারকেলের ছোবড়া কিছু যায়। ছোট ছোট টাগবোর্ট ভর্তি করে লঞ্চ টেনে নিয়ে যায় পাশের কোনও দ্বীপে। শহর বন্দর সবই আছে—জেটিও আছে সেখানে। দ্বীপটা বোধ হয় খুব দূরেও নয়। শহরটার নাম মাদাঙ, দ্বীপের নাম কি যেন—মনে আসছে না—তারপরেই মনে পড়ল, বাগবাগ দ্বীপ, স্থানীয় লোকেরা বাগবাগে যায় চাল আটা ময়দা চিনি কিনতে। এখানেও পাওয়া যায়, তবে মাঙ্গা। বাগবাগ থেকেই দ্বীপের বাসিন্দারা সস্তায় সব কিছু কিনে আনে। নৌকা ভর্তি মাছ নিয়ে যায়। নানা কিসিমের মাছ। মাছের বদলে তারা চাল আটা ময়দা চিনি এমন কি জামাকাপড় জুতো তুলে আনে। সকাল সন্ধ্যায় লঞ্চ ছাড়ে। অবশ্য চার পাঁচ বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। লোকজন বেড়েছে। মোটর বোট সংখ্যায় তো অনেক। মোটর বোট কিংবা স্টিমারে মাদাঙ যাওয়া যায়—।

জাহাজ টাল খাচ্ছে না—কারণ দ্বীপের ছড়াছড়ি বলে, সমুদ্রের ঢেউ বেশি মাথা তুলতে পারে না। আর প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেতে খেতে ঢেউয়ের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় বোধ হয়।

এসব ভাবতে ভাবতে মুখার্জির মনে হল, তিনি খুবই ঠকে গেছেন। কাপ্তানবয়ের কথা ভবে ঠিক নয়। চার্লির তো বের হবার কথা না। অসুস্থ। তারপর কেন যে সহসা তিনি খুশি হয়ে উঠলেন, বোঝা গেল না। শিস দিতে দিতে নীচে নামার সময় দেখা হল অধীরের সঙ্গে। অধীর বলল, নেমে গেল—হোঁড়ার ডরভয় নেই দেখছি। তিনি তার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন। যেন নিশ্চিত জেনে গেছেন কিছু এবং তখনই তার মন বিমর্ষ হয়ে গেল। পাখটার বুদ্ধিসুদ্ধি কম। কি না আবার ঝামেলা পাকায়।

তবে চার্লি যতক্ষণ কাছে থাকবে—কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। কি ভেবে তিনি আর নীচে না নেমে সোজা ডেক পার হয়ে মেসরুম-মেটদের আস্তানায় উঁকি দিলেন। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, না, কাপ্তানবয় ঘরে নেই। কাপ্তানের ঘরে যদি যায়, অপেক্ষা করতে হবে।

কি ভেবে ইতস্তত এলিওয়েতে ঢুকতে গিয়ে মনে হল, কোথাও থেকে তেল জুট পোড়া গন্ধ আসছে। ধোঁয়াও দেখতে পেলেন নীচে—কোল-বাঙ্কারে। এখন তো কারও ডিউটি নেই বাঙ্কারে। ডিউটি থাকলেও তেল জুট পোড়া বিশ্রী গন্ধ উঠবে কেন! সিঁড়ি ধরে বাঙ্কারে ঢুকে অবাক। বংশী। চুপি চুপি কয়লার বাঙ্কারে ঢুকে তেল জুটে আগুন লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন—'কি করছিস! মরবি নাকি!' ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে। বাঙ্কারের বাইরে বের করে বেলচায় চেপে তেল-জুটের আগুন থেঁতলে দিলেন। চেঁচামেচি করলেন না—কারণ লোকজন জড়ো হলে কেচ্ছা। বংশী কি চায়, সবই পুড়ে মরুক। সে কি সত্যি জাহাজটাতে আগুন ধরিয়ে দেবার কথা ভাবছে!

কি যে করা! বংশীকে চোখ রাঙিয়েও লাভ নেই। কিছুটা তোষামোদের গলায় বললেন, 'তোরা সবাই মিলে পাগলামি করলে, কি করি বলত! আয়। ছেলেমানুষি করিস না। কত বড় বিপদ হতে পারত বুঝিস। কয়লার গ্যাসে আগুন ধরে গেলে রক্ষা আছে। কেউ বাঁচবে!'

বংশী কোনও কথার জবাব দিল না। সে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। যতক্ষণ না বংশী পিছিলে উঠে গেল তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সুরঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। এ তো একেবারে সত্যি খেপে গেছে! পরিণতির কথা ভাবল না। আর তখনই কাপ্তানবয় নেমে এসে বলল, 'মুখার্জিসাব, অসময়ে।'

'শোনো।'

কিছুটা আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'চার্লি কি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল!'

'জি সাব।'

'জি সাব রাখো। কি হয়েছিল বল তো!'

'তা বলতে পারব না। কোমরের নীচে হটওয়াটার ব্যাগ নিয়ে শুয়ে থাকত। ব্যথায় কাতর মুখ। কাপ্তান, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। শুধু বলছেন, চাইল্ড। মাই চাইল্ড। আর তো কিছু জানি না।'

'এক্ষুনি তো বের হয়ে গেল! কাপ্তান জানে!'

'জানে। বলেই গেছে। সুহাস সঙ্গে যাবে শুনেই বললেন, যাও। বেশি রাত কোর না। সরাইখানায় ঢুকে মাছভাজাটাজা খেতে বারণ করলেন।'

ইস্ তাঁরও ভুল হয়ে গেছে। সুহাসকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল। অভিজ্ঞ জাহাজিরা জানেন। বন্দরে নামলেই দু-পাশে নানা কিসিমের সরাইখানা, লম্বা লম্বা তাজা মাছ ঝুড়িতে। লাফাচ্ছে। যে কোনও একটা চাইলেই আস্ত ভেজে দেবে। টেকচাঁদা মাছ খুবই সুস্বাদু। বড় বড় গলদা চিংড়িও পাওয়া যায়। তবে মুশকিল টেকচাঁদা মাছ কম সরাইখানাতেই পাওয়া যায়। শোলের পোনার মতো দেখতে লম্বা লাল বেলেমাছও পাওয়া যায়। তাও সুস্বাদু। তবে পয়সার লোভে বিষাক্ত মাছও এরা ভেজে দেয়। তা সামান্য দাস্ত বমি

পরে হলে, কি খেয়ে হয়েছে, বোঝা মুশকিল—সেই ভেবেই চালিয়ে দেওয়া। যারা জানে, তারা ঠিকই ধরে ফেলে। সুহাসকে বলে দেওয়া উচিত ছিল, মাছভাজার গন্ধে মজে যাস না। বরফঘরের বাসি পচা মাংস খেয়ে খেয়ে কিনারায় নামলে মেজাজও ঠিক রাখা যায় না। লোভে পড়ে যেতেই হয়। টাটকা মাছভাজার গন্ধ—মাথা ঠিক রাখা দায়।

যাঁরা জানেন, সঙ্গে একটি রুপোর কয়েন রাখেন।

কয়েনটি ছুঁড়ে দাও মাছে, মাছ বিষাক্ত হলে কয়েনটি সঙ্গে সঙ্গে নীল হয়ে যাবে। অন্তত খুব বিষাক্ত মাছের ক্ষেত্রে এটা ঘটবেই।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে, চার্লি যতক্ষণ সুহাসের সঙ্গে আছে নিরাপদ! ম্যাকের খুনের পেছনে কার কি মোটিফ তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। চার্লি সংশয়ের উর্ধ্বে এমনই বা ভাবেন কি করে।

না আবার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

যদি চার্লি নিজে না খায়।

যদি চার্লি সুহাসকে খাওয়ায়।

বিষয়টা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। চার্লি যে তাকে ছাড়া জাহাজ থেকেই নামছে না! যেখানে যাচ্ছে, সঙ্গে নিচ্ছে। পোষা গ্রে-হাউন্ড। যেন জীবন দিয়ে সুহাস লড়বে, দরকারে গলা কামড়ে ধরবে প্রতিপক্ষের। চার্লিকে সন্দেহ করা ঠিক না। তবে দড়িটার কি হবে। দড়িটা তো সে কাছে রেখে দিয়েছে। অনুমান, দড়ির বাকি অংশ জাহাজেই আছে। এই ধরনের দড়ি ক্যামোফ্লেজ করতে পারে মাস্তুল কিংবা ডেরিকের সঙ্গে। মাস্তুল, ডেরিক, চিমনির রং হলুদ। চিমনির উপরে কালো বর্ডার দেওয়া। তাঁর মনে হয়, আরও কেউ দড়ির ফাঁসে জড়িয়ে যাবে। একজনকে দিয়ে শেষ হচ্ছে না। ম্যাক কি টের পেয়েছিল, চার্লি মেয়ে—তার জন্য কি মাথায় ডেরিক ফেলে মেরে ফেলা হল।

ভাবতে ভাবতে মুখার্জি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কাপ্তানবয়কে বললেন, ঠিক আছে যাও। চার্লি ভাল আছে জেনে খুব ভাল লাগল।

কাপ্তানবয় চলে যাচ্ছিল, মুখার্জি ডাকলেন।

'শোনো।'

কাপ্তানবয় ফিরে এলে বললেন, 'রিফ এক্সপ্লোরারে বাড়িয়ালা কবে যাবেন জানো?'

'রিফ এক্সপ্লোরারে! সেটা আবার কি বাবু!'

'এই একটা জাহাজ। দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলে আছে।'

'মাটি টানার কাজে আসেনি!'

'না।'

মুখার্জিবাবু এত খবর পান কি করে! সে বুঝল, আসলে চিঠিপত্র কিছু সে পাচার করেছে। তবে খুব জরুরি চিঠিপত্র নিশ্চয় নয়। কারণ এগুলো বিছানার নীচে ছিল, দিতে অসুবিধা হয়নি। তা থেকে মুখার্জিবাবু জানতে পারেন। সে বলল, 'মাটি টানার কাজে আসেনি তা তবে মরতে এল কেন?'

'কেন মরতে এল, আমিই বা জানব কি করে? কোথায় নোঙর ফেলে আছে তাও জানি না। নাম শুনে তো মনে হয়, প্রবাল প্রাচীর নিয়ে গবেষণার কাজেটাজে এসেছে।

সঙ্গে ডুবুরি নিশ্চয় থাকবে—এ দিককার প্রাচীরগুলো তো সব আটদশ ফ্যাদম জলের তলায়।

'কোনও বাহানা নয় তো!'

'বাহানা বলছ কেন?'

'সঙ্গে ডুবুরি আছে বলছেন।'

'থাকতে পারে। আছে বলিনি। কাপ্তান রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন কথা আছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

কাপ্তানবয় লেখা পড়া জানে না—তাই রক্ষে। সে রিফ-এক্সপ্লোরারের নামই শোনেনি। চিফমেট সেকেন্ডমেটের সঙ্গে যদি যাওয়া-টাওয়া নিয়ে কথা হয়—সে ভেবেই প্রশ্ন করা—কিন্তু সত্যি সে কিছু জানে না।

এমন একটা পরিস্থিতি যে তিনি না বললে, কাপ্তানবয়ের যেন নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই। তিনি বললেই যাবে, নতুন স্ট্যান্ড-বাই। একেবারে নিথর। ঘামছিল খুব—কাপ্তানবয় কাঁধের তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। বেঁটেখাটো মানুষ—বয়সও হয়েছে, বুড়োই বলা যায়—সাদা উর্দি গায়—এবং দেখলে মনে হবে বড়ই নিষ্পাপ মুখ।

'মাল পাচার করবে কখন?'

কাপ্তানবয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'ভয় নেই। কেউ জানবে না। তা জাহাজে আসা তো দুটো বাড়তি পয়সা কামানোর জন্য। আবার কবে জাহাজ পাবে তাও তো জান না। যা মুফতে রোজগার করা যায়। সুযোগ পেলে আমিও করতাম।'

এতে যেন কাপ্তানবয়ের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! সে বলল, 'জি সাব কি যে বলেন, আপনি করতে যাবেন কেন! আমরা গরিব গুরবো মানুষ!'

মুখার্জি হেসে ফেললেন। তাঁকে কি সাব বলছে তোষামোদ করার জন্য।

'আমি খুব বড়লোক ভাবছ!'

'না, তা না। আপনারা ছোট কাজ করতেই পারেন না। আপনাদের তো জানি।'

আপনাদের বলতে কাপ্তানবয় বাঙালিবাবুদের কথা বলতে চাইছে। ফেরে পড়ে আসা। দেশ থেকে না তাড়ালে, উদ্বাস্তু না হলে জাহাজে কে উঠত!

'ঠিক আছে যাও। দেখবে খুঁজে। আসল চাবিটা কিন্তু এখনও হাতছাড়া। চাবিটার কোনও ডুপ্লিকেট নেই মনে হচ্ছে।' খুঁজে দেখো, যদি পাও দেবে। আমিও খুঁজছি।'

কাপ্তানবয়ের মনে ধন্দ, কাপ্তানের কেবিনে কি আছে না আছে মুখার্জিবাবু কি জানেন। 'আমি খুঁজে দেখছি' বলায় মনে হল, মুখার্জিবাবু কি নিজেও গোপনে ঢুকে যান। ফাইভারের মৃত্যু, আহামদ বাটলারের জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়া, মুখার্জিবাবুর খোঁজাখুঁজি, কি একটা জাহাজ কোথায় নোঙর ফেলে আছে—সবই নানা ধন্দ সৃষ্টি করছে। জাহাজটার নিজের অপবাদের শেষ নেই—সে আপশোসের গলায় বলল, 'গতিক ভাল লাগছে না। কি যে হবে! মাটি টানার কাজ কবে শেষ হবে কিছু জানেন?'

'তা আট দশ মাস ধরে রাখ। সুযোগ যখন এসে গেছে; সহজে কি কাপ্তান নড়বে! মনে তো হয় না।'

কাপ্তানবয় মুখ কালো করে ফেলল। মুখার্জির বলার ইচ্ছে হল, মুখোসটার খবরই রাখো না মিঞা। চার্লিকে কেউ অনুসরণ করছে তাও জানো না। জানলে নিশ্চয় বলতে, সাহেবের পোর্টহোলে নাকি কে উঁকি দিয়েছে। এখন কে কোথায় আরও উঁকি দেয় দ্যাখো। তিনি আর দেরি করলেন না। বোটডেক থেকে নেমে আসার সময় দেখলেন, জাহাজিরা যে যার ফোকসাল থেকে সেজেগুজে কিনারায় নেমে যাচ্ছে। সুরঞ্জনকে পাঠিয়ে কোনও লাভ হল কি না এ মুহূর্তে কিছুই বুঝতে পারছেন না। চার্লি নিজেই নেমে গেছে। ডাক্তার এবং ওষুধের দোকান, প্রেসক্রিপশান, ওষুধের রশিদ এগুলি সংগ্রহ করার কারণেই পাঠানো। চিনে রাখা। কিন্তু খোদ রোগী নিজেই কিনারায় নেমে গেছে। তার কেন যে মনে হয়েছিল, মেয়েলি সংক্রান্ত অসুখের চিকিৎসা কোনও কারণেই কাপ্তান অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে—এই যেমন নিউ-ক্যাসল, অথবা জিলঙ বন্দরে করাবেন না—চার্লি ধরা পড়ে যেতে পারে সে মেয়ে। ছেলে সাজিয়ে রাখতে চাইলে, ডাক্তার দেখাতে গেলে বিপদে পড়তে পারেন কাপ্তান। ছোটখাটো বন্দরে—নেটিভ ডাক্তারদের ততটা হয়তো ভয় থাকার কথা না। ফাঁস হবার কম আশঙ্কা।

এই সব আগাম আশঙ্কা তাঁর মাথায় কাজ করলেই সব গুবলেট করে ফেলেন তিনি। সুরঞ্জনকে পাঠিয়েও কোনও লাভ হল না। তবে এলাকাটা চিনে রাখতে পারলে আখেরে যে লাভ হবে না তাও বলা যায় না। আসলে সেজন্যই তো পাঠানো। নেমে গিয়ে সুরঞ্জন ভালই করেছে। তার কথার গুরুত্ব দিতে শিখেছে, এতে তিনি খুশি। নীচে নেমে সুহাসের ফোকসালে দরজা ঠেলে উঁকি দিতেই দেখলেন, বংশী তাড়াতাড়ি কি গোপন করার চেষ্টা করছে। কিছু ভাল না লাগলে স্ত্রীর ফটো লুকিয়ে দেখার প্রবণতা গড়ে উঠেছে বংশীর। কেউ দেখে ফেলবে ভয়ে স্ত্রীর ছবি লুকিয়ে দেখে। নজর দিলে, বৌ তার অসতী হয়ে যাবে—জাহাজিরা মেয়েমানুষ দেখলে কি ভাবে, তার তো জানতে বাকি নেই। জাহাজে মেয়েমানুষের ছবি সাংঘাতিক ব্যাপার—আর সে যদি কচি ডাবের শাঁস হয়। রক্ষা আছে! বংশী এটা ভালই বোঝে।

মুখার্জি বললেন, 'বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলে!'

'না না। আমি কিছু দেখিনি! কোনও কথা বলিনি! সত্যি বলছি। তুমি যাও। আমি কিছু লুকিয়ে ফেলিনি, বিশ্বাস করো।'

'আমি দেখব না। যত খুশি দ্যাখ। কথা বল। বললাম, কিনারায় যা। হাল্কা হতে পারবি। কিছুতেই নড়বি না। খারাপ হলে বউকে মুখ দেখাবি কি করে!'

বংশীর চোখ লাল হয়ে উঠছে। জবা ফুলের মতো চোখ। মুখার্জি বুঝলেন, তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা বংশী সহ্য করতে পারছে না। দরজা টেনে বের হয়ে এলেন তিনি।

তখনই মগড়া উঁকি দিচ্ছে তার ফোকসালের ভিতর থেকে। মুখার্জির কি মনে হল নিজেও জানেন না—কিছুটা যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েই ছুটে গেলেন ফোকসালের ভিতরে। নীচে কেউ নেই। সুযোগ। দরজা বন্ধ করে মগড়ার চুল ধরে মাথা ঝাঁকাতে থাকলেন, 'শুয়োর, হারামি, মনে করিস আমি কিছু বুঝি না। মনে করিস অন্ধকার থেকে উঁকি দিলে ছোটসাব দেখতে পাবে না। বল শুয়োর, কেন পোর্টহোলে গিয়েছিলি। কাপ্তান তোর গলা কাটবে। বাঁচতে চাস তো বল।' সোজাসুজি আক্রমণ।

মগড়া হাউহাউ করে উঠলে, তিনি গর্জে উঠলেন, 'চউপ। একদম চউপ। পায়ে পড়ছিস কেন! বল গিয়েছিলি কিনা। মুখোসটা পরে গিয়েছিলি কি না। একদম হারিয়া করে দেব বল, বল।'

'হা বাবু গেছিলাম। জেনানা আদমি আছে বাবু—জাহাজে জেনানা ঘুমতা হ্যায়। মাথা বিলকুল খারাপ হোগিয়া। বাবু—আমার কসুর আছে বাবু।'

'মুখোসটা চুরি করেছিলি?'

'নেহি বাবু।'

'তবে।'

'বাতিল গোসলখানায় সাফ করতে গিয়ে মিলে গেছে বাবু!'

'বাতিল গোসলখানা!'

'ঐ বাবু পাথরউথর হ্যায় না, কফিনভি হ্যায়। কোমড মে থা। লিয়ে আসি!'

'নিউপ্লাইমাউথে নেমে গিয়েছিলি জেনানার গন্ধে।'

'নেহি বাবু। ও ঝুট বাত।'

'পার্ল-হারবারে, লস এনজেলসে?'

'নেহি বাবু। ওভি ঝুট বাত আছে।'

তবে আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখোসটা ব্যবহার করে? সে কে! সুযোগ বুঝে মগড়া সেখান থেকে নিয়ে আসে। আবার জায়গারটা জায়গায় রেখে দেয়। যার মুখোশ সে টের পায় না।

'খবরদার আর কখনও যাবি না। মনে থাকবে? যদি যাস, তবে ম্যাকের মতো তোর জানও খতরা হয়ে থাকবে। কি বুঝলি।'

'জান খতরা হয়ে যাবে!'

'চল মুখোসটা কোথায় আছে দেখাবি। প্রায় হাত ধরে টানতে টানতে মুখার্জি মগড়াকে ধাক্কা মারতে মারতে সিঁড়ি ধরে উপরে তুলে নিয়ে গেলেন।

কেউ টের পেতে পারে ভেবে উপরে উঠে মগড়ার হাত ছেড়ে দিলেন মুখার্জি। ধস্তাধস্তি হলে জাহাজিরা ছুটে আসতে পারে। মুখার্জিবাবুকে সবাই কম বেশি সমীহ করে। মগড়াকে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, এমন কৌতূহলও দেখা দিতে পারে। উপরে উঠে মুখার্জি একেবারে সাদাসিধে মানুষের মতো, খুব সতর্ক গলায় বললেন, 'বেইমানি করবি তো তোর লাশও গায়েব হয়ে যাবে।'

পনেরো

মুখার্জি আর দেরি করলেন না। কিনারায় তারও নেমে যাওয়া দরকার। বাতিল বাথরুমে ঢুকে তিনি যা দেখলেন, তারপর আর জাহাজে চুপচাপ বসে থাকার কোনও অর্থ হয় না। সুরঞ্জনের সঙ্গে তার এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার। কিনারায় না নেমে গেলে কথাবার্তা বলা মুশকিল।

গ্যাঙওয়েতে ডিউটি পড়ে যাবে তাঁর। ফোকসাল আর পিছিলে গ্যানজাম চলবে। কাজ-কামের চাপ থাকবে না বিশেষ। সুরঞ্জনকে একা পাওয়ার সুযোগই পাওয়া যাবে না।

একমাত্র কিনারায় নেমে খুশিমতো আলোচনা করতে পারবেন।

পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো—কি করা যায়—এমন সব চিন্তা ভাবনার সূত্র থেকেই মন স্থির করে ফেললেন, দেখা যাক, কিনারায় নেমে সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করা যায় কি না! সাইকেলে আর কতদূর যাবে! ঘুরে ফিরে জাহাজে ফেরার রাস্তাতেই সে নেমে আসবে। তা ছাড়া যদি সময় পান তিনি নিজেও আস্তাবল থেকে এক দু শিলিং দিয়ে ঘোড়া পেয়ে যেতে পারেন। দ্বীপের উঁচু জায়গায় উঠে গেলে, দূরে কোথাও যদি রিফ-এক্সপ্লোরার জাহাজটিকে আবিষ্কার করা যায়।

কিনারায় নেমে কাঠগোলার দিকে হেঁটে যেতে থাকলেন। মাছের আড়তগুলি সমুদ্রের ধারে। কিনারায় নেমেই মাছের আঁশটে গন্ধ পেলেন। বাতাসে গন্ধ ভেসে আসছে। সমুদ্রের কিনারায় মাইলখানেক কি তারও বেশি হবে জায়গা জুড়ে বালিয়াড়ি। নারকেল গাছ আর ঝাউ গাছের ছড়াছড়ি। গাছগুলির জন্য মাছের আড়ত চোখে পড়ছে না।

কিছুটা ভিতরে ঢুকলেই সরাইখানা। এবং চার পাঁচ বছরে এত বদলে গেছে যে মনে করতে পারলেন না, কোনদিকে গেলে আস্তাবল, কিংবা সাইকেল ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।

বাজারের দিকটায় ঢুকে তিনি অবাক। ফুলকপি বাঁধাকপি থেকে সব রকমের তরিতরকারি। এবং দোকানে দোকানে ফলের প্রাচুর্য। আপেল আঙুর থেকে ন্যাসপাতি খেজুর—কি নেই! দ্বীপের ঢালু জায়গায় স্কুল হাসপাতালও চোখে পড়ল। দালানকোঠার ছড়াছড়ি।

দ্বীপটার বন্দর এলাকা আগের মতো আর ছোট নেই। বেশ কিছু নতুন পাকা রাস্তাও তাঁর চোখে পড়ল। পিদগিন ভাষায় নানা সাইনবোর্ড দোকানের মাথায়। ইংরাজি হরফ বলে তাঁর পড়তে অসুবিধা হয় না।

স্থানীয় লোকদের পিদগিন ভাষা অর্থাৎ আধখ্যাচড়া ইংরাজি কথাবার্তা দুর্বোধ্য। তারা তাঁর কোনও উপকার করতে পারবে বলেও মনে হল না। তবু দু একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, সাইকেল কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়! কিংবা আস্তাবলগুলি কোনদিকে উঠে গেলে পাওয়া যাবে?

নৌকা থেকে নেমে কিনারায় কিছুটা হেঁটে গেলে পাকা রাস্তা। আগে এদিকটায় ফাঁকা ছিল—কিনারায় উঠেই টের পেয়েছিলেন! অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সমুদ্রের ধারে এবারে অজস্র ঝুপড়ি উঠে যাওয়ায় রাস্তাটা খুঁজে পেলেন না। হেঁটে যাচ্ছিলেন। পাকা রাস্তায় উঠে গেলে সব চিনতে পারবেন। একসময় পাকা রাস্তাটা ঠিকই আছে দেখতে পেলেন। ঐ তো ডানদিকের পাহাড়টা। সমুদ্র থেকে নাক জাগিয়ে রেখেছে! জলের নীচে যুদ্ধবিমানের মুণ্ডু হয়তো আগের মতোই পড়ে আছে।

নানা ইশারায়ও কাজ হচ্ছে না। মুখার্জি বোঝাতেই পারছেন না, আস্তাবলগুলি কোনদিকে। বেঁটেমতো সব লোকজন—তামাটে রং, চুল খাড়া। নাক থ্যাবড়া উঁচু দুইই আছে। বেঢপ সাইজের মানুষজন—বুক কোমর সব এক মাপের। এবং বাচ্চারা আগের মতোই দোকানের সামনে ভিড় করছে। কিন্তু জাহাজিদের দেখে ছুটে আসছে না। ঘিরেও ধরছে না তাঁকে। কাপস্তান কাপস্তান বলে চিৎকারও করছে না। কাজে সবাই এতই ব্যস্ত

যে কে দ্বীপে এসে নামল, কে জাহাজে উঠে গেল তার প্রতিও তাদের বিশেষ নজর নেই।

মুখার্জি জানেন পিদগিন ভাষা প্রবাল দ্বীপগুলির নিজস্ব ভাষা নয়। ইংরাজির জগাখিচুড়ি বলা যায়, তারা কাজ চালিয়ে নেয় এই ভাষায়। বিশ বাইশ হাজার মাইলের মধ্যে কাজ চালিয়ে নেবার মতো এই একটাই ভাষা। ইংরাজি আর অস্ট্রেলীয় ইতর ভাষার এক জগাখিচুড়ি অনুকরণ। সেবারে ফিলের সঙ্গে আলাপ না হলে এত কথা জানতেও পারতেন না। দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে গিয়ে ফিলের কথা মনে পড়ে গেল।

মিঃ ফিলের ওখানে একবার যাওয়া দরকার। সুযোগমতো ঘুরে আসা যাবে। ক্রোশ দশেক দূরে নির্জনে এক টিলাতে তাঁর ডেরা। উকন গাছের ছায়ায় সাদা বাড়িটা বড়ই রহস্যজনক মনে হয়েছিল। দ্বীপের একটা পরিত্যক্ত অঞ্চল কেন তিনি বেছে নিয়েছেন তা জানারও কৌতূহল হয়নি। তিনি একজন যুদ্ধ পলাতক সৈনিক হতে পারেন, এটাও তাঁর মাথায় আসেনি। ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক। তাঁর নিজস্ব আস্তাবলে বেশ বড় দুটো ঘোড়াও আছে। মুরগির খামার, কিছু শস্যক্ষেত্র এবং বাড়িটার ভেতরে বিশাল সব কাচের জার—নানা সামুদ্রিক জীব-জন্তুর আখড়া।

ফিল একা থাকেন।

একা কেন?

আসলে জাহাজের নানা দুর্গতি মুখার্জিকে ফিল সম্পর্কে সজাগ করে দিচ্ছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে যাচ্ছে। পিদগিন ভাষায় দোকানের নাম-টাম চোখে ভেসে না উঠলে হয়তো ফিল সম্পর্কে এত কথা তাঁর মনে হত না। মনেই পড়ত না, আরে এই দ্বীপেই তো সেই মানুষটিকে দেখেছেন তিনি।

তিনি কি এখনও আছেন!

থাকবেন না, যাবেন কোথায়!

ফিল যে একা থাকেন, সেবারেই টের পেয়েছিলেন মুখার্জি। কিছু স্থানীয় লোক তার বান্দা, এও মনে হয়েছিল। সামান্য সরষের তেল উপহার পেয়ে ফিল কী খুশি! কে যে তাঁকে বলেছে, সরষের তেল মাথায় মাখলে সুনিদ্রা হয়। সামান্য তেলের জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিলেন। তা হলে ফিল কি অনিদ্রায় ভুগতেন! কেন!

আসলে জাহাজিরাই খবর দেয়। বিশেষ করে বাঙালি জাহাজিরা সরষের তেল মাথায় মাখে দেখেই কিনারায় মানুষজনের নানা প্রশ্ন—মাথায় এই তেল! আর তার উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ বলতে যেন সব বাঙালি জাহাজিরাই ওস্তাদ। একেবারে ঘুমের বিশল্যকরণী। মাখো আর সুনিদ্রা যাও। ফিল সেই সুনিদ্রার আশাতেই জাহাজে উঠে এসেছিলেন।

এক বোতল সরষের তেলের বিনিময়ে ফিলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। তিনি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। জাহাজেও উঠে আসতেন। তাঁদের সঙ্গে খানাও খেয়েছেন। বাঙালি রান্নার তারিফও করেছেন। মুখার্জিও গেছেন তাঁর ডেরায়। ডেরা না প্রাসাদ এই মুহূর্তে কেমন গুলিয়ে ফেললেন মুখার্জি। প্রাসাদের অন্ধকার দেয়ালে তিনি ডুবুরির পোশাকও ঝুলতে দেখেছেন।

তিনিই তাঁকে বলেছিলেন, দ্বীপগুলির ভাষার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। কোরাল সিতে

সাতশরও বেশি ভাষা। অধিকাংশ ভাষার হরফ পর্যন্ত নেই। এক দ্বীপের লোক অন্য দ্বীপের লোকদের ভাষা একদম বোঝে না। ফলে পিদগিন ভাষাই এদের সম্বল। কম বেশি সব দ্বীপের লোকেরাই বোঝে।

ফিল তার পিয়ানোটা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বিগ ফেলা বক্কাস!'

'মানে?'

ফিল হেসে বলেছিলেন, 'টিদয়ালা সেম সার্ক—সয়ো হিটিম, হি ক্রাই আউট।'

ফিল আমি কিছু বুঝছি না! পিয়ানো, বিগ ফেলা বক্কাস হতে যাবে কেন?'

ফিল তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, 'রেগে যাচ্ছ কেন! পিয়ানো বললে বুঝবে না। দ্বীপের লোকজন 'বিগ ফেলা বক্কাস' বললে বুঝবে।' আরও বুঝিয়ে বলার জন্য ফিল বিস্তারিত করলেন তাঁর ব্যাখ্যা—'এ বিগ বকস—উইদ টিদ অল দ্য সেম সাইজ, অ্যান্ড ইফ ইয়ো হিট, ইট মেক্স এ নয়েজ। কি বুঝলে মুখার্জি।'

'দারুণ তো। পিয়ানোর জন্য এত কথা খরচ।'

লোকটির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুখার্জি সরাইখানাগুলির বিজ্ঞাপন পড়তে থাকলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা—স্পাক ম্যান ইনা কামিন। কি হতে পারে। স্পাক কথাটা গালাগাল তিনি জানেন। হয়তো বোঝাতে চাইছে—ইনটকসিকেটেড পার্সনস উইল নট বি অ্যাডমিটেড। অস্ট্রেলীয় স্পার্ক অথবা স্পার্কি শব্দ থেকেই স্পার্ক কথাটার উৎপত্তি এও ফিল তাঁকে বুঝিয়েছিলেন। নেশাগ্রস্ত লোকদের অস্ট্রেলিয়ানরা স্পার্ক অথবা স্পার্কি বলে গালগাল দেয় ফিল না বললে মুখার্জি জানতে পারতেন না। আসলে পিদগিন ভাষায় সামান্য ইতরবিশেষে বোঝায়—স্পার্ক ম্যান হি নো কাম ইন।

তিনিই বলেছিলেন, পাপুয়া নিউগিনি থেকে নিউ হেব্রিডস দ্বীপগুলির সর্বত্রই এই এক অসুবিধা মুখার্জি।

মুখার্জির মনে হল, ফিলের সঙ্গে তার দেখা করা খুবই জরুরি।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জির মাথায় খেলে গেল—জনৈক অ্যালেন পাওয়ারের লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির বয়ান। অ্যালেন কাপ্তান মিলারকে কিছু খবর দিয়েছেন চিঠিতে। চিঠিটা লেখা বোথ-বে হারবার থেকে। সামরিক দপ্তরের লোক বোধহয়। অনেক খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছেন কলিজ জাহাজ সম্পর্কে। জাহাজটি কবে কোন তারিখে বাজেয়াপ্ত করা হয়, প্রমোদ তরণীর খোল নলচে পাল্টে কবে জাহাজটিকে ট্রুপ ট্রানসপোরট ক্যারিয়ারে পরিণত করা হয়—তার খুঁটিনাটি তথ্যও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেভেনথ্ মিলিটারি মিশানে জাহাজটি ডুবে যায় তার খবরও আছে। জাহাজডুবির তারিখ, সাল, এস পিরিতু সান্ত থেকে কতটা নর্থ ইস্টে জাহাজডুবি হয়েছে তারও উল্লেখ আছে।

মুখার্জির মাথায় এগুলিই তাড়া করছে।

অথচ আসল খবরের উপর তিনি কোনও গুরুত্ব দেয়নি। ফিলের কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলন। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গেই তো তার দেখা হয়। সবার স্মৃতি মনে রাখাও কঠিন। জাহাজি জীবনে সারা পৃথিবী চষে বেড়ালে ফিলের মতো অসংখ্য চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যেতেই পারে। দ্বীপে নেমে পিদগিন ভাষার সাইনবোর্ড দেখেই ফিলের কথা বোধ হয় মনে পড়ে গেল।

শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড সিপ।

শি মানে তবে কলিজ! কলিজ জাহাজ!

পলকে পড়ে চিঠিটি কাপ্তান-বয়ের হাতে ফেরত দিলেও মুখার্জির ঠিকই মনে পড়ছে—অ্যালেন লিখেছেন, 'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড সিপ' এটা তাঁর কথা না। একজন ডুবুরির কথা।

ডুবুরিটি কে?

সে কি ফিল!

কিন্তু চিঠিতে ফিলের নাম তো ছিল না। জাহাজেরও নাম ছিল না। ডুবুরির নাম ফিলিপ। ফিলিপ আর ফিল কি একই ব্যক্তি। মাথাটা কেমন ঝন ঝন করে উঠল।

'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড সিপ' নোটস্ ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার।

'অসি' ডাইভার আবার কি!

ডাইভার ডুবুরি বোঝা যায়।

কিন্তু 'AUSSIE' খুবই গোলমেলে ব্যাপার। আমেরিকান হলেও কথা ছিল। এই 'অসি' শব্দটাই তাঁকে কাবু করে ফেলায় বোধ হয় আর শেষ পর্যন্ত এগোতে সাহস পাননি। 'অসি' নিয়ে বিড়ম্বনার খুব দরকার আছে বলেও তাঁর মনে হয়নি শেষে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আসল রহস্য সেখানেই।

'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড সিপ' নোটস ফিলিপ অ্যান 'অসি' ডাইভার হু ফেল আন্ডার দ্য স্পেল অফ দ্য লাকসারি লাইনার টুয়েলভ ইয়ার্স এগো অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অফ দ্য রেক।'

ফিলিপ যদি ফিল হয়, 'অসি' যদি অস্ট্রেলীয় হয় আর লাকসারি লাইনার যদি কলিজ হয়, তবে তবে—তারপর থতমত খেয়ে মুখার্জি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন 'তবে কি!'

'তবে কাজ কিছুটা এগুবে। বুঝলে বুদ্ধু!' নিজে এতটা বুদ্ধু এই প্রথম যেন টের পেলেন মুখার্জি। হাসলেন আপন মনে। নিজেকে বুদ্ধু বলায় খুশিই হতে পেরেছেন। কাপ্তান রিফ একসপ্লোরারে যাবেন, ফিলিপের কাছেও যেতে পারেন। আটঘাট বেঁধেই যে কাপ্তান এগোচ্ছেন বুঝতে কষ্ট হল না তাঁর।

হাঁটতে হাঁটতে একটা টিলার মাথায় উঠে এসেছেন। রাস্তার পাশে বাগান, কুঁড়েঘর, মুরগি কুকুর। কুকুর তাড়া করতে পারে। কিছু বস্তিও পার হয়ে গেলেন। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে মা। বিশ বাইশ বছরের যুবতী। কোনও সংকোচ নেই। মুখার্জি সেদিকে তাকালেন না। সুরঞ্জনকে খুঁজে না পেয়ে কিছুটা হতাশ। দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তবে কোনও জাহাজ দেখা গেল না। তাঁদের জাহাজ খাড়ির ভেতরে। কাছেই। নেমে গেলেই হল। আর কোথায় খোঁজা যায়। মোষের কিছু গাড়ি যাচ্ছে সার বেঁধে। কিছু সাইকেল আরোহী চেঁচাচ্ছে গাড়িগুলি রাস্তা জ্যাম করে রেখেছে বলে।

খুবই অন্যমনস্ক মুখার্জি। তিনি হাঁটছেন। জাহাজে ফিরে যাবেন কিনা ভাবছেন! তখনই মনে হল কে যেন তাঁকে ডাকছে। এদিক ওদিক তাকালেন। তালপাতার টুপি মাথায় সুরঞ্জন চায়ের দোকান থেকে উঠে আসছে। বাবু তবে হাওয়া খাচ্ছেন! মসগুল হয়ে গেছে কিছু যুবতীর পাল্লায় পড়ে। কারণ দোকানগুলো সবই মেয়েরা চালায়। লুঙ্গির মতো পোশাক, আর পাতলা ফ্রক পরে থাকায় সুরঞ্জন বোধ হয় যুবতীকে ছেড়ে নড়েনি। কথাবার্তাও

হয়ে যেতে পারে। কিছুটা ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'এখানে বসে কি করছিলি!'

টুলি খুলে মাথা চুলকাতে থাকল সুরঞ্জন। কোনও কথা বলছে না।

'সাইকেল পাসনি?'

'না।'

'ওরা কোন দিকে গেল জানিস?'

'কারা?'

'চার্লি, সুহাস।'

'চার্লি সুহাসকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে।

'কোথায়?'

'যাবে? এস।'

'না।'

'শোনো মুখার্জিদা, ছোঁড়া মরবে বলে দিলাম। দু-বার পড়ে গেছে। জাপটে ধরে থাকে ঘোড়ার পিঠ। আর ঘোড়াও বলি যাই, পা ছুঁড়ছে। চার্লি ঘোড়ার লাগাম ধরে বশে আনার চেষ্টা করছে। এক লাফে চড়ছে, আবার নেমে পড়ছে। পাদানিতে পা, জিনে পেট ঠেকিয়ে অদ্ভুত কায়দায় উঠেই আবার নেমে পড়ছে। বুঝলে না ঘোড়ায় চড়া সুহাসকে শেখাচ্ছে। লাগাম ধরে সুহাস ঘোড়া টেনে নিয়ে যেতেই ভয় পাচ্ছে। দামড়া কোথাকার। লজ্জা করে না, তুই কি রে! পড়ে গেলি! হাত পা ভেঙে পড়ে থাকবে বলে দিলাম।'

মুখার্জি এদিক ওদিক কি দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' যেতে যেতে বললেন, 'চার পাঁচ বছরে দেখছি দ্বীপটার বেশ উন্নতি হয়েছে। আগের মতো মনে হয় রাস্তাঘাট খুব দুর্গম নয়। দোকানগুলিতে এত ভিড়ও দেখিনি। ফসফেট কোম্পানি দেখছি স্থানীয় লোকদের অভাব অভিযোগের দিকে বেশ নজর দিয়েছে। এটা খুব ভাল ব্যাপার।' বলেই হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন সুরঞ্জনকে। ওরা বাতিঘরের পেছনটাতে নিজেদের আড়াল করে ফেলল।

মুখার্জি বললেন, 'দ্যাখ কে যাচ্ছে?' আঙুল তুলে দেখালেন।

'সেকেন্ড! সেকেন্ড কোথায় যাচ্ছে!'

'দেখা যাক।' বলে মুখার্জি বললেন, 'মাথার টুপিটা দে।'

সুরঞ্জন টুপিটা এগিয়ে দিল।

'দাঁড়া। আমি আসছি।'

'কোথায় যাবে।'

'তুই দাঁড়িয়ে থাক। আমি আসছি। যাবি না কিন্তু।'

পাতার টুপি পরলে, স্থানীয় বাসিন্দা একেবারে। তবে রোদ তেতে নেই। কিংবা রোদে চাঁদি ফাটারও কথা না। রোদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই পাতার টুপি পরার চল। রাতেও পাতার টুপি পরে স্থানীয় লোকজন হাটবাজার করে, কিংবা অফিস থেকেও ফেরে। কিছুটা বাসিন্দাদের মতো সুযোগ সুবিধে নেবার জন্যই যেন মুখার্জি মাথায় পাতার টুপি সেঁটে দিলেন। দ্বীপের লোকজনের মতো হাঁটতে থাকলেন।

সূর্য হেলে গেছে সমুদ্রে। ডুবেও গেল। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে কিছুটা নীলবর্ণ

ধাবণ করল। খাড়ির দু-পাশে বিদ্যুতের আলো ঝকমক করে উঠল। জ্যোৎস্না উঠেছে। দুটো ছোট টিলা পার হয়ে নীচে নেমে যেতেই টের পেলেন মুখার্জি, সেকেন্ড যেন সতর্ক হয়ে গেছে। গাছের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেছেন। মুখার্জি জঙ্গলের ভিতর বসে পড়লেন। খানিক দূরে চার্লি আর সুহাস। দুটো ঘোড়া। দুজন স্থানীয় লোক সঙ্গে। আর পাথরের আড়ালে তিনি দেখলেন, সেকেন্ড সহসা অদৃশ্য।

ঝোপ জঙ্গল ফাঁক করে মুখ কিছুটা জাগিয়ে রাখলেন তিনি। নিশ্চয় সুহাস এবং চার্লিকে তিনি অনুসরণ করছেন। কাছে কোথাও আছে। সেকেন্ড কি করে দেখা দরকার। হাতের কাছে এমন সুযোগ পাওয়া যাবে তিনি কল্পনাই করতে পারেননি।

জাহাজ থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন, মগড়াব উদ্ভট খবর দিতে। মগড়া তাকে বাতিল বাথরুমে নিয়ে দেখিয়েছে—কোথায় সে মুখোসটা রাখে। কোথায় সে মুখোসটা পায়—একটা বাতিল কমোডে মুখোসটা উল্টো পিঠে বসিয়ে রাখা হয়। কমোডের সাদা রঙের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায়। হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না, উল্টো পিঠে বুড়ো মানুষের মুখোস আঁকা আছে। মগড়া বলেছে, মুখোসটা সে কখনও কখনও দেখেছে, কমোড থেকে কেউ নিয়ে যায়। কে নিয়ে যায় সে অবশ্য জানে না। বাতিল ঘরের চাবি চার্টরুমে থাকে। দরকারে সে নিয়ে আসে ঘরের ঝুলকালি সাফ করার জন্য।

মুখার্জি হামাগুড়ি দিতে থাকলেন।

কাছে যাওয়া দরকার। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট নয়।

বাতিল ঘর থেকে কখনও উধাও হয়ে যায় মুখোসটা। মগড়ার কৌতূহল ছিল। সে চার্লির বাথরুমে ঢুকে টের পেয়েছে সব। লুকিয়ে জাহাজে নারী দেখার বাসনা কার না হয়! লোভে পড়েই ঘোরাঘুরি। চার্লির অনিষ্ট করার কথা সে কখনও ভাবে না। প্রায় পায়ে পড়ে এই ধরনের স্বীকারোক্তির পর তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, আর ধরবি না। ধরলে পিটিয়ে ছাল চামড়া তুলে নেব।

তিনি হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় গজ দশেকের মধ্যে এগিয়ে গেলেন। আর স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সাপের মতো গর্ত থেকে মুখ বার করে কেউ চার্লিকে দেখছে। চার্লির সঙ্গে সুহাসের আচরণ লক্ষ্য করছে বোধ হয়।

একবার মনে হল হাত বাড়িয়ে মুখোসটা মুখ থেকে টুক করে তুলে নিলে কেমন হয়! বেইজ্জত করার সুযোগ পেয়ে হাত বেশ নিশপিশ করছে। কারণ এত কাছে কেউ আছে সেকেন্ড টেরই পায়নি। কেমন আবিষ্ট হয়ে গেছে যেন। কি দেখছে এত! কাপ্তানের চর নয় তো। কাপ্তান কি অদৃশ্য জায়গা থেকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেকেন্ডকে! কাপ্তানের নির্দেশেই যদি কাজটা করে থাকে সেকেন্ড—ভাবতেই তিনি কেমন গুটিয়ে গেলেন।

তা হলে চার্লির অনুসরণকারী এই!

টুক করে মুখোস খুলে নেবার কথা আর মুখার্জির মাথায় থাকল না। দ্রুত টিলা থেকে নেমে এলেন। সুরঞ্জনকে পেলে হয়। বড় একা মনে হচ্ছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না। সুরঞ্জন যদি মেয়েটার নেশায় পড়ে যায়। দোষও দেওয়া যায় না। লাইনের মেয়ে বলেই মনে হয়। গত সফরে জাহাজ থেকে নামলে ঘিরে ধরেছিল এক দঙ্গল মেয়ে॥

যুবতী প্রৌঢ়া বালিকা সব বয়সের।

একজন তো প্রায় নাবালিকা। তবু তাঁর জামা ধরে টানছিল।

মুখার্জির হাসিও পাচ্ছিল, আবার এক ধরনের মজা। তাকে হাসতে দেখেই বাচ্চা মেয়েটা একেবারে জোঁকের মতো লেগেছিল। সে না পেরে বলেছিল, 'তুমি কিছু বোঝো এ সবের! তুমি পারবে?'

আশ্চর্য সেই ছোট্ট বালিকার চোখে কি ক্ষোভ—যেন তাকে অপমান করা হয়েছে! সে তেরছা চোখে বলেছিল, 'আই নো দিস লাইন।' খুবই গর্বের সঙ্গে কথাটা বলেছিল। তারপর ছুটে পালিয়েছিল বস্তির দিকে। অশ্লীলতার চূড়ান্ত।

মুখার্জি দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন।

এবারে আর তারা যেন সেই। ম্যাজিকের মতো লাইনের মেয়েরা সব উধাও। সুরঞ্জনের কপাল ভাল বোধ হয়—পেয়ে যেতেও পারে। তবে পেয়ে গেলে মুশকিল, তিনি সত্যি ত্রাসে পড়ে যাবেন। সুরঞ্জনকে এখন সেখানে না পেলে মুশকিলে পড়ে যাবেন।

না, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি কিছুটা ত্রাসে পড়ে গেছেন এমন ভেবেই যেন সুরঞ্জন বলল, 'তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন, এস বসি।' পাশের একটা দোকানে নিয়ে বসাল তাঁকে। মুখার্জি দরদর করে ঘামছেন।

'কি হল বলবে তো!'

'সেকেন্ড।'

'সেকেন্ড কি। সেকেন্ড অনুসরণকারী?'

'সত্যি। সেকেন্ডই তো ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেকেন্ড ছাড়া কে আর ওখানে সাপের মতো ফণা তুলে ঝোপের মধ্যে বসে থাকবে।'

তিনি আর কোনও কথা বলতে পারছেন না। কিছুটা অবোধ বালকের মতো তাকিয়ে আছেন। কিছু যে ভাবছেন বোঝাই যায়।

'কি হল তোমার?'

'কি যে হয়নি তোকে কি করে বোঝাই। সেকেন্ড এত কাছে থেকে কেন দ্যাখে। লুকিয়ে কেন দ্যাখে! মুখোস পরে কেন দ্যাখে! তিনি তো ইচ্ছে করলেই চার্লির কাছে গিয়ে বলতে পারতেন, আর তোমরা! দেখি তো আমি পারি কি না। বলে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানাটানি করলেও অশোভন হত না। এ যে খুবই অশোভন মনে হচ্ছে। চার্লি মেয়ে না ছেলে বোঝার জন্য আড়ালে হাঁটাহাঁটি করারই বা কি দরকার। কত বড় অফিসার! তার এক ধমকে আমাদের কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে যায়—আর তিনি কি না—না ভাবতে পারছি না। তোর কি মনে হয়?'

সুরঞ্জন বলল, 'তুমি কি সেন্ট পার্সেন্ট সিওর চার্লি মেয়ে?'

'সেন্ট পার্সেন্ট।'

সুরঞ্জন কিছু ভাবছ। ভাবলে সে দু আঙুলে ঠোঁট চেপে ধরে তার। মাঝে মাঝে ঠোঁটের নীচে হাত বুলায়।

'সেন্ট পার্সেন্ট হলে তো সেকেন্ডকে লেলিয়ে দিতেই পারে কাপ্তান।'

'লেলিয়ে দিতে পারে মানে?'

'চোখে চোখে রাখা আর কি। দামড়াটাও আমার মনে হয় শুঁকে শুঁকে ঠিক ধরে ফেলেছে, চার্লি মেয়ে। আড়াল আবডাল পেলে কার আর মেজাজ ঠিক থাকে। চার্লি জড়িয়ে ধরলে সাহস আছে না করতে পারে। বুনো ফুলের গন্ধে কে না পাগল হয় বলো!'

'পাগল হলে শেষ হয়ে যাবে! সম্পূর্ণ বিনাশ। আর এক ফাইভার। আফশোসের শেষ থাকবে না।'

'ফাইভারের খুনের দৃশ্যটা যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন মুখার্জি। ওয়ারপিন ড্রামের উপর ঝুলে পড়ে আছে। মাথা থেকে রক্ত চোঁয়াচ্ছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'কেক দেবে—কেক দিতে বলি দুটো।'

টিনের খুপরি ঘর বলে হাওয়া বাতাস কম। তবে বেশ ঠাণ্ডা। বিজলি আলো আগে এদিকটায় ছিল না—টিম টিম করত লণ্ঠনের আলো, বড় দোকানে হ্যাজাক কিংবা ডে-লাইট জ্বলত—এখন সবই কত পাল্টে গেছে—জুন জুলাই মাস। শীতকাল শুরু বোধহয়, এই হেমন্তের হাওয়ার মতো মেজাজি ঠাণ্ডা হাওয়া, বেশ আরামদায়ক—কেক হলে মন্দ হবে না। মুখার্জি বললেন, 'নে।'

ওদের কেক দিয়ে কাউন্টারের দিকে চলে গেল যুবতী। অন্য সময় হলে, কত কথা বলত তারা, মেয়েটির কাছ থেকে দ্বীপের নানা খবরও নিত, কিন্তু আজ তারা এ সব কিছু ভাবতেই পারছে না।

সুরঞ্জন চায়ে চুমুক দিয়ে দু হাত ঝেড়ে কেমন কিছুটা মুক্ত হয়ে যাবার মতো বলল, 'মুখোসের রহস্য বের করা গেল, তবে কি তোমার মনে হয়, মুখোসটা সেকেন্ড চেয়ে নিয়েছিল ফাইভারের কাছে। ফাইভার কি জানত, মুখোসটা যে সেকেন্ডকে দেওয়া গেল, ডাইরিতে তার নাম লেখা চলবে না।'

যমের মতো জাহাজে সেকেন্ডকেই ভয় করত ফাইভার। যখন তখন সেকেন্ড ফাইভারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে, পায়ের উপর জুতোর চাপ দিচ্ছে। ফাইভারের সহনশীলতার পরীক্ষা। ফাইভারের কাজের ত্রুটি থাকত বলে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারত না। অথচ সেকেন্ড ঠিক ত্রুটি খুঁজে বের করত। মেজাজ গরম করে ফেলত। অমানুষিক নির্যাতন। চোখে দেখা যায় না।

মুখার্জি শুধু 'হুঁ' উচ্চারণ করলেন।

মুখার্জি আলগা করে এক টুকরো কেক মুখে ফেলে বললেন, 'আট নম্বর মুখোসের তবে এই পরিণতি ' যাকগে, এখন কি করবি বল। আমার তো মনে হয় চার্লিকে সোজাসুজি বলা দরকার—সুহাসের জীবন বিপন্ন। হয় তোমার ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে হবে, নয় সুহাসের সঙ্গে তোমার মেলামেশায় আমরা বাধা দেব। দরকারে কাজ বন্ধ করে দেবার হুমকি দেওয়া যেতে পারে।'

'ওতে কি কাজ হবে।' সুরঞ্জনের মধ্যে কেমন দ্বিধা দেখা গেল। তারপর কি ভেবে বলল, 'চার্লি যে মেয়ে, ফাইভার কি টের পেয়েছিল তোমার মনে হয়?'

'নির্ঘাত টের পেয়েছে। আর তোকে বলে রাখি, ফাইভার নিজেও জানত। রাতে গোপনে ডেরিক তুলে রাখতে সেও যেতে পারে। তবে এটা যে তার মাথায় ভেঙে পড়বে সে আঁচ করতে পারেনি। পকেটে তার বউয়ের ছবি, সুহাস ঠিকই ধরেছে, পকেটে ছবি নিয়ে

সে কখনও জাহাজে ঘোরাঘুরি করেনি। কারণ জাহাজই তার নিরাপদ জায়গা মনে হয়েছে। কিন্তু সেদিন সকালে সে জানত কেউ খুন হবে। ডগওয়াচের শেষে সে-ই গোপনে ডেরিক তুলেছে কারও নির্দেশে। নিজের পকেটে ছবিটা রেখেছে আতঙ্কে।

'তিনি কে?'

'আমি জানি না, তিনি কে? তবে আমি জানি, আমাদের মতো আরও অনেকে টের পেয়ে গেছে চার্লি মেয়ে। আমি নিজেও বুঝেছিলাম চার্লি মেয়ে। চার্লির কথাবার্তা, চাউনি, সুহাসের দিকে তাকালে সহজেই তাকে ধরা যায়, একজন পুরুষ কখনও পুরুষের দিকে ওভাবে তাকায় না। মেয়েলি চাউনি, কান্নি মেরে দেখা মেয়েদের স্বভাব—হাঁটাচলায়ও বোঝা যেত। তোকে খুলেই বলছি, আমিও মাঝে মাঝে বের হয়ে পড়তাম। গোপনে খুঁজে দেখতাম, ওরা কোথায় যায়, কি করে! চার্লির প্রতি সুহাসের আকর্ষণ প্রবল। ভাল লাগছিল না। নিষ্পাপ ছেলেটা বেঘোরে মারা পড়বে শেষে!'

'তুমি দেখেছ কিছু?' ওরা কিছু করছিল!

'না, কিছুই দেখিনি। ছেলেমানুষের মতো সুহাস গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। বুনো ফুলের খোঁজে গেছে, ছবি এঁকে দেখাত, কখনও সে নিবিষ্ট মনে চার্লির ছবি আঁকা দেখেছে, সবল শিশুর মতো। চার্লির ছবির হাত খুবই সুন্দর—অবাক হবারই কথা। নির্দোষ মেলামেশা।'

'তা হলে আর এত ভাবছ কেন?'

'ভাবছি। কেন যে ভাবছি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।' মুখার্জিকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

সুরঞ্জন বিল মিটিয়ে দেবার সময় বলল, 'মুখোসটা সেকেন্ড নিজের কেবিনে রাখল না কেন? বাতিল ঘরটায় ফেলে রাখল কেন। কি মোটিফ মনে হয়?'

'তেমন কিছু না। এ নিয়ে ভাববার কারণ আছে বলে মনে হয় না। সেকেন্ড মনে করতে পারে, মুখোসের কথা চাউর হয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি হতে পারে। কাপ্তান নিজেই সর্বত্র খুঁজে দেখতে পাবেন। সেকেন্ড সেই আতঙ্কে হয়তো রাখেনি। বাতিল ঘরে রেখে দিয়েছে।'

'তুমি যে বলছ, কাপ্তান সেকেন্ডকে চার্লির পেছনে লাগিয়েছেন!'

মুখার্জিদা খেপে গেলেন, 'বোঝার চেষ্টা করবি। না বুঝে কিছু বলবি না। লেলিয়ে দিয়েছেন কি বলেছি! সংশয়েব কথা বলেছি, লেলিয়ে দিতে পারেন বলেছি।'

'তবে এখানে একটা গন্ডগোল থেকে যাচ্ছে না?'

'গণ্ডগোল কি একটা, চার্লি কিছুই তার বাবাকে বলছে না, বললেও কাপ্তান ঢোক গিলে হজম করছেন। মুখোসের কথা জাহাজে চাউর হয়ে যাক চান না। এতে তাঁর নিজেরও বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে।'

'বিপদ, কিসের বিপদ!'

'তা তো জানি না। শোন, কাল সকালেই আমি বের হয়ে যাচ্ছি। জাহাজে, ফিরতে রাত হয়ে যেতে পারে। তোরা সাবধানে থাকবি। বংশীকে ভাল ঠেকছে না। উন্মাদ হয়ে গেছে। বাঙ্কারে আগুন লাগাবার চেষ্টা করছিল। নির্বোধ। কয়লায় আগুন ধরে গেলে

রক্ষা আছে! বেটা নিজেও পুড়ে মরতে পারে। জাহাজে আগুন ধরিয়ে সব অপদেবতাদের নাকি ভাগাতে চায়। জাহাজটা জ্বলে গেলে, অপদেবতারাও সব পুড়ে মরবে। বোঝো এবার—কি নিয়ে আমরা জাহাজে আছি। তবে কাউকে বলতে যাস না। বংশীকে নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। বাতিল ঘরটায় বংশীকে নির্বাসনেও পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। এত বড় অপরাধের শাস্তি জাহাজে কি, আমি নিজেও জানি না।'

সুরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, 'মজার ব্যাপার! মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন আবার পেছনে লোকও লাগিয়ে রেখেছেন। কি রাগ হচ্ছে না! তার সঙ্গে কলিজ জাহাজের সুড়সুড়ি, গুপ্তধন, সি-ডেভিল লুকেনার—আছি বেশ।

ষোল

কলিজ জাহাজে কোনও গুপ্তধন যদি থাকে! থাকা অস্বাভাবিক না। এই গুপ্তধনের খোঁজে কাপ্তান মিলার রিফ একসপ্লোরারে হয়তো যাবেন। নিউপ্লাইমাউথেই খবর পেয়েছিলেন হয়তো, রিফ একসপ্লোরার প্রবাল সমুদ্রের তলদেশে গবেষণার কাজ চালাতে যাচ্ছে। খবরের কাগজে যে কোনও অভিযানের কথাই ফলাও করে প্রচারিত হয়। ছবিটবিও প্রকাশ করা হয়।

কাপ্তান মিলার যোগাযোগ করে হয়তো জেনেছেন, জাহাজ ডুবির জায়গাতেই তারা অনুসন্ধানের কাজ চালাবে। সঙ্গে পাঁচ জন ডুবুরি এবং গবেষণাগারও থাকছে। অ্যালেন পাওয়ারের চিঠিটি আর একবার ভাল করে দেখা দরকার। ফিল কলিজ জাহাজের ধ্বংসাবশেষই বা পাহারা দিচ্ছে কেন! যাই হোক কলিজে এমন কোনও গুপ্ত ব্যাপার আছে যা ফিলিপ এবং মিলার দুজনেই জানেন।

বেশ রাত হয়ে গেছে ফিরতে। সুরঞ্জনকে আগে নৌকোয় পাঠিয়ে দিয়েছেন মুখার্জি। জাহাজে একসঙ্গে উঠে যাওয়া বিপজ্জনক। সুরঞ্জনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। নাটকটা জমেও গেছে। কাজেই তিনি পরের নৌকায় জাহাজে উঠে এলেন। সুহাসকে সব বলা দরকার। চার্লিকেও।'

চার্লিও কোনও বড় রকমের ষড়যন্ত্রের শিকার। মুখার্জি এটাও কেন যে না ভেবে থাকতে পারছেন না। একটি স্বাভাবিক জীবনকে এভাবে অস্বাভাবিক করে রাখার কী হেতু থাকতে পারে! চার্লিকে বলা দরকার—সেকেন্ড মুখোশ পরে তোমাকে অনুসরণ করছে। কেন করছে, সে তো এমনিতেও অনুসরণ করতে পারত। মুখোশের দরকার হচ্ছে কেন। সামনাসামনি পড়ে গেলে ধরা পড়ে যাবার ভয়। তাই কি কখনও হয়। কত রকমের অজুহাত সৃষ্টি করা যায়। মুখোশ পরার দরকার হচ্ছে কেন! লোকটা কি কোনও বিকৃত রুচির শিকার!

কি কারণ! খুলে বলো। নিশ্চয় কিছু জানো তুমি, বলছ না। কেন বলছ না, কেন বলতে পারছ না। রিফ একসপ্লোরারে কি তুমি যাচ্ছ। যাচ্ছ মানে, কাপ্তান কি তোমাকে সঙ্গে নেবেন। নিলে খুব ভাল হয়। দ্যাখ চার্লি, অকপট না হলে আমরা কিছুই করতে পারব না। তারপর কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন। চার্লিকে জেরা করার কোনও অধিকারই নেই তাঁর। তিনি জাহাজের সামান্য কোয়ার্টার মাস্টার। তার উপর নেটিভ ইন্ডিয়ান। চার্লি

সাহায্য না চাইলে তিনি আগ বাড়িয়ে কিছুই করতে পাবেন না।

সুহাস পারত। সে তো গ্রাহ্যই করছে না। এমনকি চার্লি সম্পর্কে কোনও খবরও আর দিচ্ছে না। উল্টে তাঁকেই সন্দেহ করছে। কি যে করা।

জাহাজে উঠে ফোকসালে ঢুকে গেলেন মুখার্জি।

রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা একটানা গ্যাঙওয়েতে ওয়াচ দেবেন। ডেকসারেঙ রাজি হয়েছেন। রাত জাগতে কার আব ভাল লাগে। তাব দু'জন জুবিদাব। তারাও খুশি। হঠাৎ মুখার্জিবাবুর মাথায় পোকা ঢুকে গেল কেন, তারা ভেবে পাচ্ছে না হয়তো। যাই হোক এখন গিয়ে খেয়েদেয়ে সুহাসের সঙ্গে কথা বলা দরকাব। তাঁর ফোকসালে ডেকে পাঠালে সুহাস দৌড়ে চলেও আসবে।

তিনি নীচে নেমে দেখলেন, ডেক জাহাজিরা অনেকেই জাহাজে ফেরেনি। বংশী কোথায়! বংশীও তো নেই। সে গেল কোথায়। ছোট টিন্ডাল বলল, বংশীকে নিয়ে অধীর কিনারায় গেছে। ঘড়ি দেখলেন তিনি। রাত ন'টা বাজে। সুহাস কোথায়! সেও কি কিনার থেকে ফিরে আসেনি? এত রাত করছে ছোকরা! সবাই না ফিরলে, হাত মুখ ধুয়ে রাতের খাওয়াও সারা যাচ্ছে না।

অধীর বংশী সিঁড়ি ধরে তখন নেমে আসছে। বংশী ফিরে আসায় কিছুটা যেন হাল্কা হতে পারলেন, সুহাস ফিরে এলে উদ্বেগ আরও কমে যাবে।

ফোকসালে তিনি ঢুকে কিনারার পোশাক খুলে ফেললেন। পাতার টুপিটা মাথায় আছে। ওটা খুলে হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। সুযোগ বুঝে টুপিটা সুরঞ্জনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। না দিলেও সুরঞ্জন কিছু মনে করবে না। টুপিটা বরং রেখেই দেবেন ভাবলেন। প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন। দরকারে সুরঞ্জন না হয় আর একটা পাতার টুপি কিনে নেবে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

তিনি উঁকি দিলেন।

ডেক টিন্ডাল এবং দু-জন ডেক জাহাজি কিনার ঘুরে এল। একজনের মাথায় একটা বস্তা।

তখনই দেখল, সুরঞ্জন আর সুহাস সিঁড়ি ধরে একসঙ্গে নামছে।

খেতে বসে পাতে শাক পেয়ে সবাই খুশি। কিনার থেকে কেউ শাক তুলে এনেছে। মাংস কেউ ছুঁয়েও দেখল না। টাটকা মাছের ঝোল—হোক না সামুদ্রিক মাছ, তবু টাটকা শাক-সবজি মাছ খাওয়ার আনন্দই আলাদা। সবার একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল। নীচে নামার সময় মুখার্জি সুহাসকে ইশারায় তার ঘরে যাওয়ার কথা বলে গেলেন।

দরজা খোলাই ছিল। তবু সুহাস একবার টোকা দিল।

মুখার্জি বললেন, 'আয়।'

সুহাস ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মুখার্জিদার কড়া হুকুম—দরজা খুলে কোনও কথা নয়। দরজা বন্ধ করে কথা।

সে বলল, 'হঠাৎ ডাকলে।'

'বোস কথা আছে।'

সুহাস বলল, 'আমারও কথা আছে।'

কাগজের প্যাকেটটি মুখার্জি দেখতে পাননি। মুখার্জিকে অবাক করে দেবার জন্য হাত পেছনে রেখে সুহাস কথা বলছিল। পরে কাগজের প্যাকেটটি এগিয়ে দিল।

'কে দিল!' মুখার্জি কিছুটা অবাক।

তারপর বললেন, 'কি আছে এতে?'

'কি আছে খুলে দ্যাখ না। কলিজ নিয়ে তো তোমার মাথা খারাপ। কলিজ রহস্য— খুলে দ্যাখ না।'

তিনি প্যাকেটটি উল্টে পাল্টে দেখলেন। বিশ্বাস হচ্ছে না। কলিজ-রহস্য সুরাহা করার জন্য তাকে কেউ কিছু দিতে পারে! বললেন, 'কে দিল?'

'চার্লি। চার্লি হাতের কাছে যা পেয়েছে দিয়েছে। তোমার যদি কাজে লাগে?'

'চার্লি আমাকে দেখতে দিয়েছে, না তোকে!'

'আচ্ছা ফিচেল লোক তো তুমি! তুমি এত জেরা করছ কেন বলো তো! চার্লি তো সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। সে আমাকে দিল, কি তোমাকে দিল, কি আসে যায়!'

যাক তবে সুহাসের তার প্রতি আর কোনও সংশয় নেই। চউপ বলায় সুহাস খুবই খেপে ছিল। ছোঁড়ার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।

খামের ভিতরে এক গাদা ছবি। কলিজ জাহাজের ছবি। জাহাজটা ডুবছে। তার ছবি। অসংখ্য সেনা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে আত্মরক্ষার জন্য নামছে, সাঁতার কাটছে—লাইফ বোট দুলছে ঢেউয়ে। উদ্ধার কার্যের এমন যাবতীয় ছবি দেখতে দেখতে সহসা মুখার্জির মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'চার্লি এ সব ছবি বইপত্র কোথায় পেল?'

'জানি না। কিছু বলেনি। ঘোড়ায় চড়তে পারছি না বলে খেপে আছে। কথা বন্ধ। আমি আনাড়ি, আমাব কিছু হবে না। যা মুখে আসে বলল। দ্যাখ না, বলে সে তার হাত পা জামা প্যান্ট টেনে দেখাল। ছাল চামড়া উঠে গেছে। সে চেষ্টা করছে। চার্লি সহজে ছাড়ছে না এও বুঝতে পারলেন মুখার্জি। খুশি হলেন। বললেন, 'হয়ে যাবে।'

'জানো, উঠে বসতে পারছি। কিন্তু ঘোড়া কদম দিলেই কেমন মাথা ঘুরতে থাকে। কেবল মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেলাম।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে। আমারও হত। সাইকেল আর ঘোড়া, একবার চড়ে বসতে পারলে ঠিক তর তর করে পালে হাওয়া লেগে যায়।'

সুহাস কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলতে গিয়ে 'জানো, চার্লি না বাতাসের আগে ছুটতে পারে। ইস কোনও ভয় ডর নেই। ঘোড়াটার পেটে গুঁতো মারলেই হল। লাগাম ধরে কোনদিকে কিভাবে টানলে, খুশিমতো ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাও দেখাল। আচ্ছা তোমরাই বল, এক দুদিনে হয়।'

মুখার্জি পাতা উল্টে যাচ্ছেন। আর ছবি দেখে বলছেন, 'কলিজ জাহাজে দেখছি একটা বিশাল লাউনজও আছে। প্রমোদ তরণীর খোল নলচে পাল্টে ফেললেও লাউনজ দেখছি অক্ষত রেখেছিল। আরে দেখছিস? এই সুহাস—দ্যাখ লাউনজের দু-পাশে দুটো গ্রিক দেবীর মূর্তি। ঘোড়ার পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই নারী। লাউনজের ছবিটা দেখেছিস!' বলে সুহাসের সামনে এগিয়ে ধরলেন ছবিটা।

'প্রমোদ তরণীর লাউনজে ফুর্তিফার্তাও চলত। জোড়ায় জোড়ায় সম্ভ্রান্ত নারী পুরুষ।

কারো চোখে চশমা, হাঁটুর উপর সংবাদপত্র। পায়ের উপর পা তুলে বসে আছেন। কেউ একা নিবিষ্ট মনে তাস খেলছেন। ওদিকটায় দ্যাখ—থামের আড়ালে নারী-পুরুষ কত ঘনিষ্ঠ--টেবিলে টেবিলে হুইস্কি, শ্যাম্পেনের ফোয়াবা—আর মাথার উপর দুই নারীমূর্তি আর এক সিঙ্গি ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়ার আবার শিং হয় কখনও!'

'ঘোড়াটা দেখেছিস? আরে দ্যাখ না!'

'দেখেছি।'

'এটা আবার কি রকম ঘোড়া! ঘোড়ার কখনও শিং থাকে। তাও আবাব একটা শিং!'

সুহাস ছবিটা দেখে বলল—'এটা ঠিক ঘোড়া নয। চার্লি তো বলল, ওটা গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের বর্ণিত এক রকমের একশিঙ্গি অশ্বাকৃতি কল্পিত জন্তুবিশেষ। ওটা ঠিক ঘোড়া নয়।'

লাউনজের ছবিটা খুবই আকৃষ্ট করছে মুখার্জিকে। তিনি ঝুঁকে দেখছেন। সুসজ্জিত বিশাল কক্ষ—কারুকাজ করা থাম, আলোর বাহার। নাচের আসর বেশ জমে উঠেছে। ছবিটা দেখলে এমনই মনে হবার কথা। চার পাশে সম্ভ্রান্ত পোশাকে নরনারীর নানা ভঙ্গিমার ছবি। কার্পেটের নীল রঙটাও যেন খুব তাজা। থামের আড়ালে এক জোড়া দম্পতি উঁকি দিয়ে কি যেন দেখছে। তাঁর কেন যে মনে হল এক সিঙ্গি ঘোড়া তাদেব কোনও কারণে কৌতূহল উদ্রেক করছে। শিল্পীর তারিফ করতেই হয়। নেহাতই ছবি, না কোনও ফলক অথবা ঢালাই-এর কাজ করা কোনও ভাস্কর্য, বোঝা কঠিন। নারী দু হাত মেলে দিয়ে যেন ঘোড়ায় চড়ে উধাও হয়ে যেতে চাইছে।

কোনও দুর্মূল্য ভাস্কর্য কি না কে জানে!

আসলে, চার্লির বাবা কাপ্তান মিলার হয়তো সুযোগ খুঁজছিলেন। সমুদ্রের তলায় কলিজ জাহাজে অনুসন্ধান চালাতে হলে ডুবুরির দরকার। খুবই ব্যয়সাপেক্ষ বলে রিফ এক্সপ্লোরারকে দিয়ে যদি কাজটা ফাঁক তালে করিয়ে নিতে পারেন। আর কিছু না পাবলেও কলিজ কতটা জলের তলায়, এবং ডাঙা থেকে কত দূরে, কি ভাবে জলের তলায় ডুবে আছে তার মোটামুটি একটা হিসাব পেয়ে যেতে পারেন।

আর যদি কোনও গুপ্তধন কিংবা দুর্মূল্য ভাস্কর্য উদ্ধারের ব্যাপাবে থাকে তা হলেও রিফ এক্সপ্লোরারের সাহায্য নিতে পারেন। তারপবই মনে হল অত বোকা নন তিনি। গুপ্তধন উদ্ধারে তিনি তার নিজের লোকজনের উপরই বেশি নির্ভর করবেন। প্রাথমিক কাজটুকু সেরে নেওয়ার জন্য তিনি রিফ এক্সপ্লোরারে হয়তো যাচ্ছেন।

তবে কলিজ জাহাজের সঙ্গে চার্লির অস্বাভাবিক জীবনযাপনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে এটা কিছুতেই তাঁর মাথায় আসছে না।

তবু যা হোক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পাওয়া গেল।

তারপরই কি ভেবে মুখার্জি সুহাসকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, 'তোকে এগুলি চার্লি দেখতে দিল কেন?'

'বলল, কলিজ জাহাজের খবর চেয়েছিলে—এগুলি পেলাম। চার্লি তো আর কিছু বলল না। আগেও তো দিয়েছে।'

'চার্লি জানে, খবরটা আমার জানা দরকার? তোর নয়।' মুখার্জি পাতা উল্টে যাচ্ছেন

কাগজটার—তার দিকে তাকাচ্ছেন না।

'তা জানে কি না জানি না। বললাম না, চার্লি ভাবে নিশ্চয়ই আমার কোনও জরুরি দরকার আছে!'

'দরকারটা কিসের। এমন প্রশ্ন চার্লির মনে উদ্রেক হবে না! হঠাৎ কেন কলিজ নিয়ে পড়লি, তার সংশয় হবে না! কোনও প্রশ্ন না করেই তোকে দিয়ে দিল! তার বাবার বিপদ হতে পারে। ধরা পড়লে যে আরও দু একটা খুন হবে না জাহাজে কে বলতে পারে।'

সুহাসের মুখ বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সে কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, 'তা হলে দিয়ে দাও। সকালেই ফেরত দেব। বলব, না আমার কোনও দরকার নেই। কলিজ নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই বললেই হবে।'

মুখার্জি হেসে ফেললেন। '—তোর না থাকলেও তার আছে। আর তুই যতই মনে করিস, আমাকে ভাল জানে না, মুখ চেনা, আর দশটা জাহাজির মতোই হয়তো আমাকে ভাবে—আমি কিন্তু তা মনে করি না। চার্লি জানে জাহাজে আমরা সংখ্যায় বেশি। শুধু বেশি নয়, সংখ্যায় প্রায় আমরা ওদের দশগুণ। কোনও বিপদে তোর পেছনে আমরা সবাই আছি এটা সে ভালই বোঝে। তোর পেছনে থাকা মানে, চার্লির বিপদেও আমরা আছি। এটাও সে ভালই বোঝে। তুই যাই নিয়ে আসিস না কেন, সে বোঝে, একা তুই দেখছিস না, আরও কেউ কেউ দেখছে। মুখে বলতে হয় বলা, দ্যাখো সুহাস ঘুণাক্ষরে কেউ যেন টের না পায়। টের পেলে সাংঘাতিক কিছু যে ঘটে যেতে পারে না সে তা ভালই জানে। তোকে সাবধান করে দিয়ে আসলে ইঙ্গিতে সবাইকে সাবধান করে দেয়। বুঝলি কিছু?'

সুহাস জবাব না দেওয়ায় তিনি তার দিকে তাকালেন। সুহাস এত জটিল ব্যাপার-স্যাপার ভাল বোঝেও না। সে খুবই কাতর হয়ে পড়ে। মুখ দেখলে মায়া হবারই কথা। তখন মুখার্জির খুব খারাপ লাগে। সুহাস যে খুব ঘাবড়ে গেছে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

তবে একেবারে আনাড়ি সুহাসকে তিনি ভাবতে পারেন না। ম্যাকের পকেটে স্ত্রীর ছবিটাই তার প্রমাণ। সুহাসই বলেছিল, 'উইনচে কাজ করতে যাবার সময় সে তার স্ত্রীর ছবি রাখবে কেন বলো? নিরাপদ জায়গায় সে কখনও স্ত্রীর ছবি রাখে না। ভীতু স্বভাবের কি না জানি না, তবে ছবিটা পকেটে থাকায় আমার মনে হয়েছে, জাহাজে কিছু ঘটছে এমন আঁচ করছিল।

মুখার্জি হাওয়া পাইপ ঘুরিয়ে দিলেন। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। উঠে গিয়ে লকার খুললেন। লকারে সব রেখে দিলেন যত্ন করে। বললেন, 'তোকে একটা কাজ করতে হবে। জিজ্ঞেস করবি অ্যালেন পাওয়ার বলে কাউকে চেনে কি না চার্লি। চিনলে, সে কবে কখন তাকে কোথায় দেখেছে। অ্যালেন কাপ্তানকে চিঠি দেয়। তাকে দেয় কি না তাও খবর নিবি। অ্যালেন তার আত্মীয় কি না, কিংবা অ্যালেন তার বৈমাত্রেয় ভাই ভগিনীপতিদের কেউ যদি হয়। নামটা মনে থাকবে তো? যদি মনে করতে না পারে বলবি, বোথ-বে-হারবার থেকে অ্যালেনের চিঠি আসে। কলিজ সম্পর্কে সে অনেক খবর রাখে। মনে হয় মার্কিন

সামরিক দপ্তরে কাজটাজ করে।'

একটু থেকে বললেন, 'মনে থাকবে তো নামটা।'

'অ্যালেন পাওয়ার।'

'বেশ তো মনে রাখতে পারিস। ম্যাকের পকেটে স্ত্রীর ছবিটা রাখার ব্যাপারে তোর ধারণাই সত্য। তোর বুদ্ধির সত্যি তারিফ করতে হয়। ম্যাক জানত, ডেরিক কারো মাথায় ভেঙে পড়বে। সে নিজে গিয়েছিল ডেরিক তুলতে। গভীর রাতে ডেকে তখন অন্ধকার। লগ বুক ঘেঁটে দেখলাম, জেনারেটার অচল, স্ট্যান্ড-বাই জেনারেটারও চালু করা যায়নি। লগবুক ঘেঁটে উদ্ধার করেছি। অন্ধকারেই কাজটা সারা হয়েছে। শোনপাটের হলুদ রঙের দড়ির বাকি অংশটা পাওয়া গেছে। ওতে রক্তের দাগ আছে। অন্ধকারে ছুরি দিয়ে দড়ি কাটতে গিয়ে হাতফাত কেটেছে মনে হয়। রক্তে মাখামাখি দড়িটা। খুনি হাতে খুবই বড় রকমের চোট পেয়েছে।'

'দড়ির বাকি অংশটা কার কাছে আছে? সুহাস না বলে পারল না।

যেখানেই থাক ঠিকই আছে। যে রেখে দেবার সে ঠিকই রেখে দিয়েছে। বেচারা ম্যাক জানতই না, সে তার নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে। খুব খারাপ লাগে ভাবলে।'

সুহাস বলল, 'ম্যাককে খুন করে কি লাভ!'

'লাভ কি জানি না, তবে ম্যাক টের পেয়ে গেছিল, চার্লি মেয়ে। হয় চার্লির আচরণে আততায়ী টের পেয়েছে, নয়তো, চার্লি তার বাবাকে কোনও নালিশ দিয়েছিল। 'আচ্ছা হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কাউকে কখনও দেখেছিস?'

'নালিশ কেন? হাতে ব্যান্ডেজ! কিছু বুঝছি না।'

'বলতে পারে, ম্যাক যখন তখন আমার কেবিনে ঢুকে পড়ছে। আরও কিছু বলতে পারে। চার্লির সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। কিন্তু কোথায় কী ভাবে কে নজরদারি চালাচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। শেষে খুনের সূত্র খুঁজতে গিয়ে নিজেই না আবার হজম হয়ে যাই।'

সুহাস বলল, 'আচ্ছা তুমি কি বলত! ম্যাক অসময়ে ডেরিক তুলতে কেন যাবে! তার কি দরকার!

'সে কি আর নিজে গেছে। তাকে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এবং সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় তিনি তার ওপরওয়ালা। এমন ওপরওয়ালা যাকে যমের মতো ভয় পেত ম্যাক। অন্ধকারে ডেরিক তোলার কি মানে, ফসকা গেড়ো দেবার কি মানে সে সবই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তার হুকুম পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুধু তাই না। হুকুম গোপন করারও শর্ত ছিল বোধ হয়।'

সুহাস সহসা খুবই অধীর হয়ে পড়ল—'আচ্ছা কি বলছ বল তো, জেনেশুনে সকাল বেলায় সে ডেরিকের নীচে গিয়ে তবে কাজ করতে পারে! হয় কখনও। সে তো জানে, যে কোনও সময় ডেরিক পড়ে যেতে পারে মাথায়।'

'সে জানে, তবে সে ভাবেইনি, তার মাথায় ডেরিক খুলে পড়বে! হ্যাঁ সংশয় ছিল, কখন না খুলে পড়ে। পকেটে ছবিটা রেখেছিল।'

'তাহলে আমি খুন হতে যাচ্ছি ম্যাক টের পেয়েছিল।'

'মনে হয়।'

সহসা সুহাস চিৎকার করে উঠল, 'কেন, কেন আমি খুন হতে যাব। আমি কি করেছি। আমার কি দোষ!'

মুখার্জি ওকে টেনে বসালেন। জাহাজ নোঙর ফেলে আছে বলে নিঝুম। একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনার কথা। সিঁড়ি ধরে কেউ নেমে এলেও স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। দুপদাপ শব্দ। উপরের ছাদে হাঁটাহাঁটি করলেও টের পাওয়া যায়—এমন এক করুণ নৈঃশব্দের ভিতর এই চিৎকার করে ওঠা কতটা মারাত্মক হতে পারে সুহাস যদি বুঝত।

'দোষ তোমার, চার্লির প্রেম। চার্লি তোমাকে ভালবাসে।'

'প্রেম বলছ কেন। আবার চার্লি। চার্লি মেয়ে তোমরা ধরেই নিয়েছ।'

'নিয়েছি। তোকে রক্ষা করার উপায় চার্লিই বাতলাতে পারে। ইচ্ছে করলে চার্লিকে তুই অ্যাভয়েড করতে পারিস। কিন্তু চার্লি ছাড়বে না। তোকে না দেখলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিছুটা মনে হয় হিস্টিরিয়াগ্রস্তও হয়ে পড়তে পারে। ঝড়ের রাতে গভীর সমুদ্রে রাতের অন্ধকারে যে নারী ডেকে বেড়াতে পারে সে যে তার অবদমিত ইচ্ছার প্রকোপে ঘোরে পড়ে যায়। সে তার অবচেতন সত্তায় প্রস্ফুটিত হতে চায়। সে তো জানে না আসলে সে কি করছে। সে কিছু করে বসলেও বলার থাকবে না।'

'কিছু করে বসলে মানে?'

'সে মেয়েদের পোশাক পরে তোর কেবিনে গট গট করে নেমে আসতে পারে। চিৎকার করে বলতে পারে, মি গার্ল সুহাস। আমাকে ষড়যন্ত্রকারী জোর করে ছেলে সাজিয়ে রেখেছে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে এতদিনের সতর্কতা সব যাবে। এবং তার জন্য বড় খেসারত দিতে হতে পারে যারা তাকে জোর করে মেয়ে সাজিয়ে রেখেছে।'

'তুমি কি বলছ!'

'ঠিকই বলছি। আমার মাথার মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া চলছে। তোকে ছাড়া তারা চার্লি শান্তও রাখতে পারবে না। কোনও দুর্ঘটনায় তোর মৃত্যু হলে চার্লি শোকে মূহ্যমান হ যেতে পারে—কিন্তু কাউকে দায়ী করতে পারবে না সে জন্য বার বার ফাঁদ পাতা হ পারে। তোর ক্ষতি করা সহজ কাজ না ষড়যন্ত্রীরা ভালই বোঝে।'

সুহাসের গলা খুবই নির্জীব শোনাল!

'তা হলে ঘোড়ায় চড়া আমার ঠিক হবে না বলছ!'

'কেন ঠিক হবে না!'

'ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে যদি মরে টরে যাই।'

'ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অত সহজে কেউ মরে না। আর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে যদি সত্যি মারা যাস—তবে তোর মরাই ভাল।'

'চার্লির সঙ্গে একা বের হতে কি বারণ করছ।'

'না, তা করব কেন।'

'কি করি বলতো?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। যা বলছে করে যা। আমাদের লোক তোর পিছনে পাহারায় থাকবে।'

কে?'

'কে জেনে লাভ কি? থাকছে। থাকবে চার্লি কেন, কোনও দুরাত্মাও বুঝতে পারবে না, তারা তোমায় অনুসরণ করছে। আমিও এক সময় করেছি।'

'জানি।'

তারপর থেমে বলল, 'মুখোশধারী তবে তুমি?'

'না।'

'তবে মগড়া!'

'না।'

'তবে কে?'

'সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব। সাবধান, কেউ যেন না জানে। চার্লিও না। মুখোশের সূত্র ধরেই আমরা এগোচ্ছি।'

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব! সে কিছুতেই কেন জানি বিশ্বাস করতে পারছে না। মানুষটা দাম্ভিক, চাপা স্বভাবের। তাদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কথা বলেনি। সারেঙকেই ডেকে কাজ বুঝিয়ে দেয়। গঙ্গাবাজু ধরে হেঁটে এলে সেকেন্ড, জাহাজিরা যমুনাবাজু ধরে হাঁটতে থাকে। বেঁটেখাটো মানুষ—চোখ পিংলা, চুল পাতলা, সব সময় মনে হয় অদ্ভুত রাশভারি। সেই লোক এমন একটা জঘন্য কাজে লিপ্ত ভাবতেও খারাপ লাগছে। সে উঠে পড়ছিল।

মুখার্জি বললেন, হাতে সময় নেই। চার্লি তার কাকার কোনও খবর রাখে কি না। রাখলে কোথায় আছেন তিনি! কি নাম। কি কাজ করতেন। সব জেনে নিবি।'

চার্লির কাকা রাচেল জাহাজডুবিতে মারা গেছেন।'

'জাহাজডুবি! কোথায়। কবে?'

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।'

উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছেন মুখার্জি। তিনি স্থির থাকতে পারছেন না।

'কোথায় মারা গেছেন! জাহাজের নাম কি!'

'তা জানি না।'

'কোন সমুদ্রে!'

'তাও জানি না।'

'তার নাম কি ফিল।'

'তাও জানি না। বলে তো আঙ্কিল রাচেল। ফিল হবে কেন?'

'তবে কি জানিস, ঘণ্টা জানিস। এত করে বললাম, সব খবর নিবি। আমরা কি করব। একমাত্র তুই পারিস, তোর কাছেই চার্লি সব বলে। তার কাকার নাম জানতে হয় না। বুঝলি না, তার বাবা-কাকাকে সম্পত্তি থেকে তার ঠাকুরদা বঞ্চিত করেছেন। ত্যাজ্য পুত্র। এত বড় সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে! সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য একটা কেন, দশশটা খুন করতে পারে। আমার মনে হয়, ক্ষমতা-পাগল, আর অর্ধ-পাগল মানুষেরা সব পারে।'

সুহাস উঠতে যাচ্ছিল—মুখার্জি বললেন, 'শোন, তোর জেনে রাখা ভাল। সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার কোনও মনোমালিন্য হয়নি। ইচ্ছে করেই দু'জনে মিলে নাটক করেছি। আলাদা

ফোকসালে না থাকলে, গোয়েন্দাগিরি করার অসুবিধা হচ্ছিল। সুরঞ্জনকে ডাকি।'

সুহাস বলল, 'এত রাতে ডাকবে। শুনলাম তুমি নাইটওয়াচ নিয়েছো। টানা আটঘণ্টা রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে না। একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে।'

'ও তোকে ভাবতে হবে না। সারাটা দিন ছুটি। রাত বারেটার আগে জাহাজে ফিরলেই হল। দরকারে ওয়াচে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। আমার অভ্যাস আছে। দাঁড়িয়েও ঘুমোতে পারি। টুলে সারাক্ষণ বসে ঝিমোলে এত রাতে কে টের পাবে। টানা বারো চোদ্দ ঘন্টা কিনারায় ঘুরে বেড়াতে পারব। কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।' তারপরই কি ভেবে মুখার্জি বললেন, 'এবারেও কি চার্লি তোকে নিয়ে বুনো ফুল খুঁজে বেড়াবে? ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে—কিসের মতলবে।'

সুহাস বলল, 'এখানে নাকি ঘুরে বেড়াতে হলে হয় সাইকেলে না হয় ঘোড়ায়। অন্য কোনও যানবাহনের সুবিধা নেই নাকি? চার্লি তো সাইকেল চালাতে জানে না। আমিও না। ঘোড়ায় উঠে কদম দিতে শিখলেই প্রায় শেখা হয়ে যায়। আরও কত কথা বলল, ঘোড়ার পিঠে চেপে বসতে পারলে—সে নাকি কখনও বেইমানি করে না। চেপে বসাটা জানা দরকার। বাকিটা ঘোড়া নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ছুটবে, লাফিয়ে ঝোপজঙ্গল ডিঙিয়ে যাবে—কিছুতেই ঝেড়ে ফেলবে না পিঠ থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরবে, তবু না।'

মুখার্জি হাসলেন। বললেন, 'আমি অশ্ব-বিশারদ নই। আমি জানব কি করে! চার্লির বাপ ঠাকুরদা ঘোড়ায় চড়ে মানুষ। সে আমায় চেয়ে ভাল জানবে। গত সফরে কোনওরকমে টানাহ্যাঁচড়া করে শিখে ফেলেছিলাম। এ-সফরে দেখা যাক কতটা পারি। 'তারপর থেমে বললেন, 'চার্লিকে এখুনি মুখোশধারীর নাম বলা ঠিক হবে না, সে ঘাবড়ে যেতে পারে। চার্লি কি আজ কিছু টের পেয়েছে?'

'না তো! কি টের পাবে।'

'বব মুখোশ পরে আজও জঙ্গলে বসেছিল। টের পায়নি!'

'বলছো কি! আমি তো দেখলাম, মগড়া জঙ্গল থেকে নেমে যাচ্ছে। ডাকতেই ছুটে পালাল।'

সতেরো

কলিজ জাহাজডুবির জায়গাটার নাম সহসা মুখার্জি গুলিয়ে ফেললেন। তালপাতার টুপি মাথায়। রোদ বেশ প্রখর। তিনি ঘোড়ায় চড়ে দুলকি চালে যাচ্ছেন। রাস্তার দু-ধারে কিছু বসতি আছে দেখতে পেলেন।

এদিকটায় দুটো টিলা ছিল—হয়তো ফসফেট কোম্পানি টিলার সব মাটি সরিয়ে নিয়েছে। দ্বীপের এই একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় লুণ্ঠন হচ্ছে বলা চলে। টিলা দুটো দেখতে পেলেন না। রাস্তায় সার সার ঘোড়ায় টানা মালগাড়িও দেখতে পেলেন। কাঠের বাক্সমতো—ফসফেট বোঝাই হয়ে খাড়ির দিকে যাচ্ছে। বাঁশের জঙ্গল দু-পাশে, অনাবাদি জমিগুলিতে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে।

ঘাসের জমিগুলি পার হয়ে তিনি দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবেন ভাবলেন। জায়গাটার নাম কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। ঘোড়ার লাগাম টেনে পকেট থেকে ডাইরি বের

করলেন।

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে থাকা সহজ না। অভ্যাস না থাকলে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। তবু তিনি ডাইরির পাতা উল্টে দেখলেন, জায়গাটার নাম এসপিরিতো সান্তু। সান্তু জায়গাটা কোথায়? কাছে কোথাও কি। তিনি মনে করতে পারলেন না, ফিলের বাড়ির টিলায় দাঁড়িয়ে কাছে কোথাও কোনও দ্বীপ দেখতে পেয়েছিলেন কি না!

সামনে কিছুটা জলাভূমি। সমুদ্রের জল ভাটার সময় এখানে হাঁটুর উপর থাকে না। ক্রোশ খানেক জলাভূমি সহজেই পার হয়ে যাওয়া যায়। তারপর কিছুটা চড়াই—পাথরের মালভূমির মতো জায়গাটা। ক্যাকটাস আর সব নাম-না জানা গাছ। আখের চাষও হয় এদিকটাতে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে তিনি সেবারে মাইলের পর মাইল আখের চাষ দেখেছিলেন। আখের জমিগুলির পাশ দিয়ে উঠে গেলে, ঘণ্টাখানেকের পথ।

সমুদ্র বাঁ-দিকে পড়ে থাকল। কাছাকাছি কোথাও জাহাজ দেখতে পেলেন না। মোটর লঞ্চে মাদাও যাচ্ছে কিছু যাত্রী এবং পণ্য। দুটো ঘোড়াও লঞ্চে দেখতে পেলেন। এই অঞ্চলের একমাত্র যানবাহন এখনও ঘোড়া। তবে এবারে তিনি রাস্তায় ফসফেট কোম্পানির গাড়ি দেখতে পেয়েছেন। দ্বীপটার যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখে ভালই লাগছিল। আখের জমিগুলি পার হতেই দেখলেন, রাস্তার পাশে তামার ফলকে লেখা—গো আপ, ওঃ মাই ওয়ারিয়ার্স এগেনস্ট দ্য ল্যান্ড অফ মেরাথাইম অ্যান্ড এগেনস্ট দ্য পিপল অফ পিকো। তামার ফলক দেখে মুখার্জি কিছুটা অবাক হলেন। কিসের সংকেত এটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। যেন কেউ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ফলকে যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছে। গেল সফরে তামার এই সাইনবোর্ডটা ছিল কিনা মনে করতে পারছেন না। ফলকের নীচে মাইলের হিসাব। খাড়ি থেকে দূরত্ব বোঝাতে চাইছে, না, ফিলের প্রাসাদের দূরত্ব এই ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখার্জি তাও বুঝতে পারছেন না।

পাশে সুন্দর কাঠের গির্জা—কিন্তু কোনও লোকালয় আছে বলে মনে হল না। নীচে যতদূর চোখ যায়, বিশাল সব গাছের অরণ্য। একেবারে দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে। সহসা কেন যে মনে হল হয়তো এখান থেকেই ফিলের এলাকা শুরু।

এদিকটায় রাস্তা বেশ চওড়া। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। মসৃণ। যুদ্ধের সময়কার না নতুন, তাও বুঝে উঠতে পারছেন না। ফিলের নির্দেশমতোই সেবারে তিনি গিয়েছিলেন। —সমুদ্রের কিনার ধরে যাবে। সমুদ্রের ধারে আমার বাড়ি। রাস্তা হারিয়ে ফেললে, সমুদ্রের দিকে চলে যাবে। অলওয়েজ অ্যাট লেফট—মনে রাখবে। সমুদ্র বাঁ-দিকে থাকলে রাস্তা হারাবার ভয় থাকবে না।

এই দ্বীপগুলির সৌন্দর্য এনিতেই মুগ্ধ করে—কিছু সারস পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দুটো ঈগল পাখিও দেখতে পেলেন। কাক, চড়াই এবং শালিখ পাখিও ওড়াউড়ি করছে। জঙ্গলে এক ধরনের ছোট্ট নীল রঙের বাঁদর হুটোহুটি করছে। নানা জাতের সরীসৃপও আছে। তবে রাস্তায় কিংবা জঙ্গলে তাদের দেখা পাওয়া গেল না। প্রাগৈতিহাসিক জীবের উত্তরসূরী এরা, ফিল তাকে এমনই বলেছিলেন। তিনি এই টিলাটায় উঠেও দেখলেন, সমুদ্র তাঁর বাঁ-দিকেই আছে॥

নীচে পাহাড় সোজা নেমে গেছে—দূরে কোথাও বড় জাহাজ চোখে পড়ছে না।। কিন্তু

এক্সপ্লোরার জাহাজটির কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর সামনেই আবার একটি তামার ফলক—লেখা—শাউট উইদ জয় বিফোর দ্য লর্ড, ওবে হিম গ্ল্যাডলি, কাম বিফোর হিম, সিঙিং উইদ জয়।

আশ্চর্য, এ তো অদ্ভুত কথাবার্তা। কে লিখে রেখেছেন! কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ!..না, সরকার থেকে এমন সব ঈশ্বর ভজনার কথা প্রচার করা হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। এই দ্বীপগুলি ব্রিটিশদের। সরকার মনোনীত একজন কমিশনারের অধীন। নিউক্যাসেলে তার অফিস। তবে সবই শোনা কথা। দু আড়াই হাজার মাইল দূরত্বে বসে দ্বীপগুলি শাসন করাও কঠিন। অসংখ্য এমন সব কত দ্বীপ আছে যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের পদচিহ্নই পড়েনি!

তিনি যত এগুচ্ছেন তত ফলকের সংখ্যাও ক্রমে বেশি দেখতে পাচ্ছেন। ফলকগুলি ঝক ঝক করছে। তামার না পেতলের এটা অবশ্য তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে অনুমান করতে পারছেন না। একটা পাথরের উপর বসানো ফলকের সামনে দাঁড়ালেন। হাত দিলেন। তবে তামার না পেতলের বোঝা গেল না।

তিনি কি রাস্তা ভুল করলেন—গত সফরে এ-ধরনের কোনও ফলক কি চোখে পড়েছে। কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তাঁর জল তেষ্টা পাচ্ছে, বোতল খুলে জল খেলেন। এখানে মিষ্টিজলের অভাব। শীত আসছে, বোধহয় কিছুটা হেমন্তের কাছাকাছি ঋতু। তবু রোদ প্রখর। তাঁকে আবার ফিরতে হবে বলেই সকাল সকাল জাহাজ থেকে নেমে এসেছেন—কিছু লোকালয় পার হয়ে গেলেন।

এদের জগাখিচুড়ি ইংরাজি না বুঝলেও ফিলের কথা বলায়, সবাই যে কি ভাবে সাহায্য করবে—কেউ কুর্নিশ পর্যন্ত করছে তাকে। পারলে তাকে আপ্যায়ন করে ঘরেও নিয়ে যেতে চাইছে। মিঃ ফিল, নামটা খুব আর পরিচিত নেই—তবে খাঁটি গোরা সাহেব এবং পাদ্রি বাবা বলতেই লোকগুলি তার ঘোড়ার পেছনে ছুটতে থাকল।

বাড়িগুলি অধিকাংশ কাঠের। মাথায় টালির ছাউনি। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ প্রায় নিশ্চিহ্ন। এখানে নতুন করে মানুষ যেন নতুন প্রেরণার উৎস থেকে ঘরবাড়ি বানিয়ে, চাষ আবাদ করে একটি ছিমছাম পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইছে। মুখার্জি সেবরে ফিলের বেডরুমে পাদ্রির পোশাকও আবিস্কার করেছিলেন।

ফিল কি তবে ধর্মযাজক!

তিনিই কি এই সব বাণী প্রচার করছেন ঈশ্বরের! হাজার হাজার মাইল ব্যাপ্ত সমুদ্রে কি তিনি, সেই কোনও সন্তের মতো নীল লণ্ঠন হাতে নিয়ে দুর্গম পথ পরিক্রমায় বের হয়েছেন। তাই যদি হয়, তবে এলেন পাওয়ার বর্ণিত ডুবুরি মানুষটির সঙ্গে ফিলের সম্পর্ক কোথায়! দেয়ালে ডুবুরির পোশাক ঝুলতে দেখেই কি তিনি দু'জনকে এক লোক ভেবে গুলিয়ে ফেললেন। নিজের এই অবিবেচক চিন্তাভাবনার প্রতি তাঁর কিছুটা করুণা হল। অকারণ সময় নষ্ট করা যায় না। তবু ভাবলেন, একবার যখন এসেই গেছেন, দেখা করে যাওয়া ভাল। তা-ছাড়া ফিলের খুবই প্রভাব আছে, বিপদে ফিলকে দরকার হতে পারে।

এই বিপদের মুহূর্তে জাহাজ ছেড়ে আসা তাঁর ঠিক হয়নি এমনও ভাবলেন। এলেনই যখন, সঙ্গে এক বোতল সরষের তেল নিয়ে এলে ফিল যৎপরোনাস্তি খুশি হত। নাভিনিদ্রা

কাকে বলে সেবারে মুখার্জি বুঝিয়ে দেবার সময় দেখেছেন, খুব আগ্রহ নিয়ে ফিল সব শুনছেন। ফিল তাঁর নোটবুক বের করে তেল ব্যবহারের মুদ্রাগুলিও লিখে রেখেছিলেন। এই তামাসার কথা ভাবলেও খারাপ লাগে।

আসলে শিশুর সদ্য দাঁত ওঠার মতো। সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষ। রাজার জাতকে কব্জায় পেলেই বেকুফ বানিয়ে তখন তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। লিখুন, মুখার্জি বলেছিলেন।

নাভিনিদ্রা হল ভাবতীয় কুম্ভক—

কুম্ভক কি?

কুম্ভক মানে এক ধরনের আসন। যোগবল তৈরি করার জন্য আসনটির ব্যবহার হয়ে থাকে। নাভিনিদ্রা প্রায় তার সমগোত্র। তেল ব্যবহারের পদ্ধতি লিখে নিন।

ঠিক দ্বিপ্রহরে স্নানের আগে—স্নানটান রোজ করা হয় তো?

ফিল বলেছিলেন, হয়।

অবগাহন স্নান কালে বলে জানেন?

ফিল বলেছিলেন, না।

পুকুর কিংবা নদীর জলে কোমর পর্যন্ত নেমে যেতে হবে। দ্বীপে নদী আছে?

নেই।

হ্রদ আছে?

আছে।

বাড়ির কাছাকাছি?

কাছেই।

কোমর জলে নেমে ডুব দেবেন। ডুব কাকে বলে জানেন তো! যাকে বলে অবগাহন স্নান!

জানি। তবে অবগাহন স্নান কি জানি না!

ডুব মানে বেদিং। তাকেই অবগাহন বলে।

মুখার্জির খাপছাড়া ইংরাজি থেকে সাধ্যমতো বোঝার চেষ্টা কবেছিলেন ফিল। অবগাহন কাকে বলে তাও হয় তো বুঝে নিয়েছিলেন।

মুখার্জি বলেছিলেন, স্নানের আগে বাঁ হাতে এক গণ্ডুষ সরষের তেল। তারপর ডান হাতের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ সহযোগে, সেই তেল প্রথমে নখাগ্রে, পরে নাভিমূলে, তারপর নাসিকা এবং কর্ণকুহরে—বাকি তেল তালুতে দেবার সময় বলতে হবে, ওম ব্রহ্মাণেভ্য নম।

ব্রহ্মাণেভ্য নম মানে?

ব্রহ্ম থেকে জাত যিনি, তাঁকে প্রণাম।

আসলে জাহাজে থাকলে বিদেশের বন্দরগুলিতে খাঁটি গোরা সাহেবদের সঙ্গে মজা করার বাতিক সব নাবিকদেরই থাকে। সাহেবদের সঙ্গে রগড় করার জন্য কিছুটা তরলমতি হয়ে গিয়েছিলেন মুখার্জি। সেই বাতিক থেকেই একজন খাঁটি গোরা সাহেবকে বাগে পেয়ে যা খুশি মুখে আসে গড়গড় করে বলে গেছেন। ফিল চলে যাবার পর সে কি তাঁর অট্টহাসি! কিন্তু তাজ্জব মুখার্জি।

দু-দিন বাদেই হাজির হয়ে বলেছিলেন ফিল, মুখার্জি, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ! আমার নাভিনিদ্রা হচ্ছে। কি করে সকাল হয়ে যায়, টেরই পাচ্ছি না। শরীর ঝরঝরে। জড়তা থাকে না। এ তো আশ্চর্য যোগবলের,কথা বাতলে গেলে। আচ্ছা নাভিনিদ্রায় কি মানুষ হাওয়ার উপর ভেসে থাকে। মানে বলছি শরীর কি বিছানা থেকে উপরে উঠে যায়!

যেতে পারে। তবে আপনি খাঁটি সরষের তেল জোগাড় করবেন কি করে। আমার জাহাজ তো ছেড়ে দেবে—কবে আসব জানি না। আর আসাই হবে কি না জানি না। মাদাঙে খোঁজ করলে চর্বি ব্যবসায়ীরা তেল আনিয়ে দিতে পারে।

এই সব মজার কথা ভেবে মুখার্জির এখন বেশ খারাপ লাগছে। মানুষটিকে তাঁর কত দরকার—কে যে কখন বিপত্তারিণী হয়ে দাঁড়ায় কেউ বলতে পারে না। ফিল ঠিকই খোঁজ রাখে খাড়িতে কোন দেশের জাহাজ ভিড়েছে—তার যথেষ্ট লোকবল আছে।

তিনি সকালেই আশা করেছিলেন, মোটর লঞ্চে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে ফিল তাঁর জাহাজের খোঁজে চলে আসবেন। কিন্তু না আসায় তাঁর আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবেই তিনি বের হয়ে পড়েছেন—অথচ আসল জিনিসটিই তিনি ফিলের জন্য আনতে ভুলে গেছেন। ফিল ছেলেমানুষের মতো তবে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। ইউ আর সো কাইন্ড বলে হ্যান্ডসেক করে একেবারে প্রাসাদের নানা অলিন্দ পার হয়ে নিজের ছোট্ট এবং দীনজনের বাসোপযোগী ঘরটাতে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতেন।

একজন খাঁটি গোরা সাহেব এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে আছে কিসের আশায়। ভাবতে গেলে বড় বিস্ময় লাগে।

অ্যালেন পাওয়ারের চিঠির বক্তব্যও খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড শিপ। কি এমন গ্র্যান্ড যে তাঁর জাদুর টানে একজন মানুষ দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারেন না। কলিজ জাহাজের গুপ্তধনের খবর কি ফিলিপ রাখতেন। ডুবুরির পোশাক পরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যদি মিলে যায়।

কাপ্তানবয়কে দিয়ে চিঠিগুলি ফের পাচার করার দরকার আছে। তখন ততটা গুরুত্ব দেননি। গুরুত্ব দেননি বললে ঠিক হবে না। কাপ্তানের অগোচরে চিঠিগুলি আনা হয়। ধরা পড়লে চরম সর্বনাশ। চিঠিগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বেচারা কাপ্তানবয় মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়েছিল। মুখার্জির খুব খারাপ লাগছিল।

ফিল ফিলিপ হতে পারে, কিংবা ফিলের কথা সেই মুহূর্তে তাঁর মাথায়ও ছিল না। নামটাও হয়ত ভুলে গেছিলেন ফিলের। পিদগিন ভাষায় জগাখিচুড়ি ঝামেলাতেই পলকে নামটা মগজে ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিরও গুরুত্ব বুঝে ফেলেছেন। ফিল ফিলিপ হলে—ইস তিনি আর ভাবতে পারছেন না।

ঘোড়া দুলকি চালে কদম দিচ্ছে।

মাথায় ফিল।

ফিলের ঘরে তিনি একটা বড় মানচিত্রও দেখেছিলেন—বিশাল মানচিত্রের উপরে লেখা ব্যাটেল গ্রাউন্ডস অফ দ্য পেসিফিক। তখন কিছুই তাঁর খুঁটিয়ে দেখার আগ্রহ হয়নি। এত বড় মানচিত্রে ফিল কি খুঁজে বেড়ান। তিনি মাঝে মাঝে সারারাত এই মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রাত কাবার করে দিতে পারেন—এমনও বলেছেন।

সত্যি রহস্য।

জাহাজে চার্লি আর এই দ্বীপে ফিল। চার্লি তো বলেছে, তাঁর কাকা জাহাজ ডুবিতে নিখোঁজ।

আবার সামনে পেতলেব ফলক।

উই লিভ উইদিন দ্য শ্যাডো অফ দ্য অলমাইটি, শেলটারড বাই দ্য গড, হু ইজ অ্যাবাভ অল গডস।

পরের ফলকেও লেখা—লর্ড, থ্রো অল দ্য জেনাবেশানস ইয়ো হ্যাভ বিন আওয়ার হোম, বিফোর দ্য মাউনটেনস্ ওয়্যার ক্রিয়েটেড, বিফোর দ্য আর্থ ওয়াজ ফর্মড, ইয়ো আর গড উইদাউট বিগিনিং অব এন্ড।

ফলকের লেখাগুলি পড়তে পড়তে মুখার্জি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। জন্মের আগেও তিনি। পরেও তিনি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগেও তিনি, পরেও তিনি—নিরবধি কালের আগেও তিনি, শেষেও তিনি। ফলকগুলি পড়তে পড়তে তাঁর মনে হচ্ছিল চৈতন্যময় এক জগতের ওপার থেকে কেউ যেন ইশারায় এই সব বাণী প্রচার করে যাচ্ছে।

তিনি যতটা দুর্বল বোধ করছিলেন ফলকের লেখাগুলি পড়তে পড়তে তা আর থাকল না। সত্যি এক অজ্ঞাত ইচ্ছের সূত্র ধরে তাঁর জীবন। তাঁর কেন সবার। সুহাসকে তিনি বক্ষা করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। সবই পূর্ব পরিকল্পিত। ফলকের লেখাগুলি তাঁকে মুহূর্তে দৈববিশ্বাসী করে তুলেছে।

এটা মুখার্জি বুঝলেন, এতে যেমন খারাপ হতে পারে আবার ভালও হতে পারে। সব সময় দুশ্চিন্তা—মনে হয তিনি একা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি সত্যি আর একা নন। আরও একজন আছেন, যিনি জন্মের আগেও থাকেন, পরেও থাকেন। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন।

প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর। এবং চারপাশের বনজঙ্গল পার হয়ে যাবার সময় মনে হল, কাছেই কোথাও ড্রাম বাজছে। নাচ গান হচ্ছে। দূরে গাঁয়ের কোথাও উৎসবে নাগরা টিকারা বাজছে।

পাহাড়ের মাথায় অদ্ভুত এক অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। যে ঈগল পাখিটা মাথার উপর উড়ে আসছিল, সেটা এখন মাথার উপর পাক খাচ্ছে। দ্বিতীয় ঈগল পাখিটা সমুদ্রে ছোঁ মেরে একটা বড় বাইণ মাছ তুলে আনছে। মাথার উপর গাছের ডালে এসে বসল। ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

তিনি ফের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ঈগল পাখিটা আর তাঁকে অনুসরণ করছে না। সামনে সেই ফিলের সাদা রঙের বাড়ি। নীচের একটা ছোটখাটো বন্দরও দেখতে পেলেন। লোকলস্কর তেলের পিপে, বাদাম তোলা কাঠের নৌকা, দেশি নৌকা, মোটর বোটের ছড়াছড়ি। বড় বড় ঝুড়ি, কাঠের পেটি তোলা হচ্ছে স্টিমারে।

গত সফরে তিনি এ-সব কিছুই দেখতে পাননি। চারপাশে লোকালয় গড়ে উঠেছে, বাজার—চায়ের দোকান পর্যন্ত। ঘোড়াটার লাগাম ধরে হেঁটে কিছুটা যেতেই ছুটে আসছে কেউ। ভিনদেশি মানুষ হয়তো টের পেয়েছে লোকটা। কেন এখানে, কি চাই, কাকে চাই, জানার জন্য ছুটে আসতেই পারে।

নির্জন দ্বীপে সবাই সবাইকে চেনে। তিনি অপরিচিত, এবং ভিনদেশি—মাথর উপর ঈগল পাখিটা এতক্ষণ তাঁর ভিতর গভীর সংশয়ের উদ্রেক করেছে। ঈগল পাখিটা ফিলের প্রাসাদ পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাঁকে পৌঁছে দিল, না তিনি ফিলের সাম্রাজ্যে ঢুকে গেছেন এমন খবর পৌঁছে দিল!

কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। এখনও ফিলের প্রাসাদের দিকটা বেশ নিরিবিলি। নানা প্রজাতির পোকামাকড় চোখে পড়ল একটা দোকানে। নানা শেকড়-বাকড়েরও। ফুল ফলের বীজও রাখে দোকানি। আশ্চর্য, খরিদ্দার বিশেষ নেই। নীচে সমুদ্রের বেলাভূমিতে যত লোকজন, উপরে ঠিক ততটাই যেন জনশূন্য—বেলা পড়ে আসছে।

ফিলের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে দ্রুত ফিরে না গেলে যথাসময়ে জাহাজঘাটায় পৌঁছতে পারবেন না। বেশ চিন্তিত মুখে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ ফিলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' বলে মুখার্জি ডাইরির পাতা থেকে একটি চিরকুটে তাঁর নাম এবং জাহাজের নাম লিখে দিলেন।

লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। গাট্টাগোট্টা বেঁটে তামাটে রঙের পুরুষ। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু—ল্যাটিন আমেরিকানদের মতো দেখতে।

লোকটি বোবা কি না তাও বোঝা গেল না। কারণ তাঁকে লোকটি কোনও প্রশ্নও করেনি—এমনকি চিরকুট দিলেও না। সে সোজা হেঁটে চলে গেছে।

এমনও হতে পারে, ভিনদেশি লোক দেখা করতে এলে, একমাত্র ফিলের সঙ্গেই দেখা করতে আসেন—লোকটি হয়তো তা ভালই জানে। হাফপ্যান্ট পরনে। মাথায় লালরঙের বেল্ট বেঁধে রেখেছে। চুল বড় বড়। বেল্ট বেঁধে চুল সামলাচ্ছে। কিছুটা ডাকাত ডাকাত চেহারা।

বাড়িটা বেশ একটা বড় টিলার মাথায়। আগে সোজা উঠে যাওয়া যেত। তবে কষ্টকর ছিল। এখন ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে হবে কিছুটা পথ। পাশেই পর পর দু-তিনটে আস্তাবল।

সামান্য কটা পেনি দিলেই আস্তাবলে ঘোড়া রাখা যায়—তিনি আস্তাবলে তাঁর ঘোড়ার জিম্মা দিয়ে ফিরতেই দেখলেন, সিঁড়ি ভেঙে ফিল দ্রুত লাফিয়ে নেমে আসছেন। গায়ে জামা নেই—পায়ে জুতো নেই। লম্বা দাড়ি। পরনে হলুদ রঙের একটা লুঙি। একেবারে স্থানীয় লোকদের পোশাক পরেই তিনি এত দ্রুত নেমে আসবেন, মুখার্জি অনুমানই করতে পারেননি। ফিল কত বদলে গেছেন।

ফিল কাছে এসেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যেন ভাষা নেই ফিলের। তাঁর সঙ্গে ফিলের দেখা হতে পারে আর কখনও, হয়তো আশাই করেননি ফিল। ফিলকে নিয়ে সেবারে তামাসায় মজে যাওয়ায়, কিছুটা অপরাধ বোধও কাজ করছিল মুখার্জির ভিতর। ফিল যতটা স্বাভাবিক হতে পারছেন, তিনি ততটা হতে পারছেন না। তিনি টের পেলেন, ফিলের আলিঙ্গনে যথেষ্ট উষ্ণতা আছে।

তাঁদের পরস্পর দেখা হয়ে যাওয়াটা যেন খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। ফিল হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছেন—'কবে জাহাজ এল? আর বোল না, আমি তো জানিই না, তোমার জাহাজ খাড়িতে ঢুকে গেছে? কতদিন আছ?'

'যাক আমাকে মনে রেখেছ! এই যথেষ্ট। ভুলে যাওনি দেখছি।'

'খুব ভাল। আমি তোমাকে মনে রেখেছি, না তুমি আমাকে মনে রেখেছ! একদম সময় পাই না, আমারই তো উচিত ছিল, কোথাকার জাহাজ, কারা আছে। কত জাহাজই তো আসছে—খবর নিতে নিতে নিরাশ। তুমি সেই কবে এসেছিলে—চার পাঁচ বছর তো হয়ে গেল।'

ফিল লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। যাকে দেখছেন, তাঁকেই বলছেন, মিঃ মুখার্জি ডিনা ব্যাঙ্কের কোয়ার্টর মাস্টার।

মুখার্জি উঠে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। রাত হয়ে গেলে রাস্তা চিনে যাওয়া কষ্টকর। অবশ্য র‍্যাতে জ্যোৎস্না থাকবে দ্বীপে, এই যা ভরসা। আলিঙ্গনের বহর দেখেই মনে হয়েছে, ফিল সহজে ছাড়ছেন না।

তিনি যে তাঁর বাড়িটায় সর্বত্র এক বিশাল অ্যাকোরিয়াম গড়ে তুলতে চান, মুখার্জি সেবারেই টের পেয়েছিলেন। সব সময় ব্যস্ত সব মানুষজন, কাঠ, কাচ, রজন, এনামেলের পাত নিয়ে ঠক ঠক দেয়াল জুড়ে বিশাল লম্বা সব অ্যাকোরিয়াম গড়ে তুলেছেন ফিল। ফিলের এই এক নেশা। নেশা এখনও যে নেই কে বলবে! অ্যাকোরিয়ামের পাশে নিয়ে দাঁড় করাবেন। টানা হলঘরের মতো বিশাল সব জলাধার। কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর জলাধারের ভিতর—এবং নানা প্রজাতির মাছ। সমুদ্রের তলাকার দুর্লভ সব প্রবালের গাছপালা এবং শ্যাওলা—আশ্চর্য সব বর্ণচ্ছটা তৈরি করছে নীল জলের ভিতর।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে গেলে মনে হয় সমুদ্রের তলদেশে কোনও প্রবাল প্রাচীরের পাশ দিয়ে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। গতবার এ-সব দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সহজে ছাড়তেই চাইতেন না। মাছগুলির নাম থেকে কোন মাছের কি স্বভাব তাও বলেছেন। তাঁর এই বিশাল সাম্রাজ্যটিকে ঘুরিয়ে দেখাতে না পারলে তিনি স্বস্তি পান না।

ফিল যে একজন ডুবুরি এ-বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ থাকার কথা নয়। তবে ফিল আসলে ফিলিপ কিনা, তাই তিনি জানতে এসেছেন।

তিনিই সেই কিপার অফ দি রেক কি না, যদি হন, তবে কলিজ সম্পর্কে খোঁজ খবর পাওয়া সহজ হবে। কেন জাহাজের কাপ্তান মিলার কলিজের ধ্বংসাবশেষের খোঁজে এখানে এসেছেন তাও জানা যাবে। এ জন্য কলিজ সংক্রান্ত সব পেপার কাটিঙও সঙ্গে রেখেছেন।

ফিল তাঁকে নিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে যাবার সময়ই মনে হল, বসার ঘরের এক কোণে কারা চুপচাপ বসে আছে।

আরে এ যে জাহাজের চিফমেট, আর সেকেন্ডমেট। ঠিক খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন কাপ্তান।

তিনি কিছুটা চমকে উঠলেন। তাঁকে এখানে দেখলে, ওপরয়ালাদের নিশ্চয় খুশি হবার কথা না। ফিল তাঁর হাত ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন, একবার ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

মুখার্জি নিজেকে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন। পলকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন বলে রক্ষা। পেছন থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হবে। তাদের জাহাজের একজন কোয়ার্টার মাস্টারের এত বড় আস্পর্ধা, জাহাজ ছেড়ে একা এতদূরে চলে এসেছে ভাবতেই পারে! তিনি কোনওরকমে ভিতরে সেই কাচের জলাধারগুলি পার হয়ে বললেন, 'ফিল তোমার জন্য

কারা অপেক্ষা করছেন!'

'বাদ দাও। তোমার জাহাজ থেকেই এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কি খাবে বলো।'

'ফিল কিছু মনে কোর না। আমি কিন্তু ভুলে গেছি। রাস্তায় এসে মনে হল।'

'কি ভুলে গেছ!'

'সরষের তেল।'

'ওহো! মুখার্জি, তোমার তেল মাদাঙ থেকে আসছে। মাদাঙে প্রায়ই ভারতীয় নাবিকরা আসে। ও জন্য ভেব না। তুমি যা উপকার করেছ! তুমি হয়তো ভাবছ, সেটা কি—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ। আমার ঘরে এসো।'

'তোমার পিয়ানোটা আছে? বলতে রাতে কিছু ভাল না লাগলে, পিয়ানোতে সুর তোলার চেষ্টা করতে।'

'আছে। তবে দরকার, হয় না।'

'সেই মানচিত্রটা?'

'আছে। তার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকি না।'

'ওরা কেন এসেছে, কি চায় কিছু বলল?'

'বলেছে। ওরা কলিজ জাহাজের খোঁজ নিতে এসেছে। আমি কিছু জানি কি না। কে এক অ্যালেন পাওয়ার নাকি লিখেছেন, ফিলিপ নামে এক ডুবুরি কলিজের কিপার অফ দ্য রেক! কি সব আজগুবি কথা বলো তো! আমার কি দরকার, একটা ডুবন্ত জাহাজের পাহারাদার হয়ে বেঁচে থাকা। বোকারা এসব ভাবে।'

খুবই অকপট কথাবার্তা।

'তা হলে তুমি ফিলিপ নও!'

'কেন ফিলিপ হলে কি তোমার সুবিধে হয়। ফিল আর ফিলিপে তফাতই বা কি! আসলে কি জানো, আমি কেউ নই। না ফিলিপ, না ফিল।

ফিলের হেঁয়ালি কথাবার্তা মুখার্জির ভাল লাগছে না। তাঁকে ফিরতে হবে। ফিলের বেশভূষা সন্ত মানুষের মতো। এই ফিলকে তাঁর চিনতেও কষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন, 'ফিল আমরা খুবই বিপদের মধ্যে আছি। জাহাজে নানারকম জটিলতা দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনায় আমাদের ফিফথ ইনজিনিয়ার মারা গেছেন। খুনটুন নয় কে বলবে!'

প্রাসাদের এদিকটায় ফাঁকা জায়গা। একটি টিনের চালাঘর। ফিল মাথা নুয়ে ঘরে ঢোকার সময় বললেন, 'দুষ্টু লোকেরা মনে করে, দে ক্যান হাইড দেয়ার ইভিল ডিডস অ্যান্ড নট গেট কট।' বলে ফিল হা হা করে হাসলেন।

তারপর ফের বললেন, 'দে লাই অ্যাওয়েক অ্যাট নাইট টু হ্যাচ দেয়ার ইভিল প্লটস—ইনস্টিড অফ প্ল্যানিং হাউ টু কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম রঙ। এসো। কতদিন পর দেখা। কেমন আছ? তোমাকে খুবই অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার বলো তো। তুমি তো খুবই আমুদে লোক ছিলে।'

সামান্য গ্রিনপিজ সেদ্ধ, দু কাপ কফি রেখে গেল নিনামুর বলে লোকটি। এদিকটায় নিনামুর সামলায় মনে হয়। বারান্দায় কাঠের একটি টুল। ছোট দুটো টিপয় এনে রাখা

হয়েছে।

ঢালু জমি অনেক নীচে নেমে গেছে। এবং সেখানে চাষ আবাদ, যত দূর চোখ যায় চাযের জমি এবং ট্রাকটারের ধোঁয়ায় কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আছে জায়গাটা।

ফিল বললেন, 'খুন ভাবছ কেন?'

'সে অনেক কথা।'

মুখার্জি কফিতে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, 'তোমার কি সময় হবে? একবার জাহাজে আসা দরকার। তুমি ফিলিপ কিনা জানতে আমিও এসেছি। কলিজ জাহাজ সম্পর্কে তুমি যদি কিছু জান? সান্তু এখান থেকে কতদূর। তোমার এখান থেকে সান্তু যেতে হলে কিসে যাওয়া যায়?'

'সে যাওয়া যাবে। যেতে চাও, নিয়ে যাব। বেশি দূর নয়। ওদিকের টিলটা দেখছ—ওখানে উঠে গেলে দেখা যায়।'

'আচ্ছা ফিল', বলে একটা সিগারেট ধরালেন মুখার্জি, 'রিফ এক্সপ্রেসবারের কোনও খবর রাখ? কাছাকাছি কোথাও আছে মনে হয়। কলিজ জাহাজ সম্পর্কে খোঁজ নিতে তিনি সেখানেও যোগাযোগ করতে পারেন। দ্যাখ ফিল, আমরা নিরুপায় বলেই তোমার কাছে এসেছি। কাপ্তানের পুত্র চার্লিও রহস্য। তোমাকে আমি বিশ্বাস কবতে চাই।'

ফিল মুচকি হাসলেন। বললেন, 'এই হলগে মুশকিল বুঝলে মুখার্জি, কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না, হাউ শর্ট ম্যান'স লাইফস্প্যান। ভাল, কাজ না করলে লাইফ ইজ এমপটি। অল উইল ডাই। হু ক্যান রেসকু হিজ লাইফ ফ্রম দ্য পাওয়ার অফ গ্রেভ! এ-সব ভাবলে, মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি থাকে না। স্বার্থপরতা থাকে না। শুধু ভাল কাজের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। তোমার কুম্ভক আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমার এ-জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আর যাই করি অবিশ্বাসের কাজ করব না। করে লাভও নেই। ফিলিপকে নিয়ে তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। কলিজ নিয়েও না। গুজব মানুষকে কিভাবে বিচলিত করতে পারে, কিভাবে মানুষকে অমানুষ করে দেয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।'

মুখার্জির এত কথা ভাল লাগছিল না। তিনি শুধু বললেন, 'তা হলে তুমি ফিলিপ নও? কলিজ সম্পর্কে কিছু জানো না?'

ফিল চুপ করে থাকলেন।

'বলো চুপ করে আছ কেন?'

'মুখার্জি, কেন আমাকে বিরক্ত করছ। আমি সব ভুলে গেছি। মরীচিকা সব। সব মরীচিকা। সমুদ্রের নীচে পাহাড়ের তলদেশ খুঁজে বেড়ালে ধীরে ধীরে উপরের আকাশ এবং নক্ষত্র কত রহস্যময় দেখায় তুমি জানো না!'

মুখার্জির মনে হল, ফিল কোন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে যেন এখন মুক্ত। সে তার পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করতে চায় না। কলিজের কথা উঠলেই মুখ ব্যাজার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হেসেও দিয়েছেন। বলেছেন, 'শোনো মুখার্জি, হ্যাপি আর দোজ হু আর স্ট্রং ইন দ্য লর্ড, হু ওয়ান্ট অ্যাভব অল এলস টু ফলো, হিজ স্টেপস। আমি তাঁকে সমুদ্রের নীচে প্রথম খুঁজে পাই। পরে গভীর নিদ্রার মধ্যে।'

মুখার্জি বললেন, 'উঠছি। যদি পারো এসো।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালে, ফিল বললেন,

'এসো।' তারপর তিনি কাছের সমুদ্র অতিক্রম করে অন্য একটি রাস্তা ধরে যাবার মুখেই আঁতকে উঠলেন। দেয়ালে সেই গ্রিক নারীমূর্তি, এবং এক সিঙ্গি ঘোড়া। কলিজের সেই বিশাল ভাস্কর্যটি এখানে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষিত আছে। মুখার্জি বললেন, 'এটা কি, এটা কি ফিল! এটা তুমি কোথায় পেলে?'

দেয়ালে চালচিত্রের মতো গেঁথে দেয়া গ্রিক দেবীদের সামনে এগিয়ে গেলেন ফিল। কি দেখলেন। তারপর বললেন, 'তোমার পছন্দ!'

মুখার্জিও পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিছুটা বুদ্ধি লোপ পাবার মতো পরিস্থিতি তাঁর। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন সহজেই। কারণ তিনি এখন আর ফিলের বন্ধু নন। তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন সত্যসন্ধানী। ভাস্কর্যটি দেখে এতটা অবাক হবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। এটা কোথায় পেলে, বলাও উচিত হয়নি।

ফিল গ্রিক দেবীদের তখনও অপলক দেখছে।

'কি পছন্দ তোমার।'

'দারুণ দেখতে।'

ফিল কি বলবে, গ্রিক দেবীদের নিয়ে যাও! যে-ভাবে কথা বলছে! পছন্দ! পছন্দ হলে নিয়ে যাও যেন বলল বলে।

মুখার্জি বললেন, 'দেবী প্রতিমা। দুর্গাঠাকুরের মতো লাগছে।' দুর্গাঠাকুর সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যাও সঙ্গে।

তারপরই ফিল কেন যে তাঁকে একা রেখে কোনদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আসছি বলে কোথায় গেল! শেষে এলেনও ঠিক। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তের মতো ফিল বললেন, 'হাউ ওয়ান্ডারফুল টু বি ওয়াইজ, টু আন্ডারস্ট্যান্ড থিংস! গভীর নিদ্রা মানুষকে শান্তি দেয়, সুখ দেয়। আমার চোখ খুলে গেল মুখার্জি। এই নাও মুখার্জি। তোমারা প্রণামি।' বলে, একটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁর হাতে দিলেন।

মুখার্জি বললেন, 'না, না। কি পাগলামি করছ ফিল।'

'রেখে দাও। বিপদে আপদে কাজে আসবে। কখন কোথায় ঝামেলায় পড়বে কে জানে। মুদ্রাটি স্থানীয় লোকদের দেখালেই তোমাকে মান্য করবে। কিছুটা ঋণশোধ বলতে পারো।'

টনটন করছে। যেন চেপে বসেছিল—পারছিল না—চার্লির সহ্য করার ক্ষমতাও যেন লোপ পাচ্ছে। কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে—চার্লিও কোনও রকমে টলতে টলতে কেবিনে ঢুকে দরজা লক করে দিল। হাসফাঁস করছে—আর পারছে না। জামা খুলে নীচে ফেলে দিল। লাথি মেরে সরিয়ে দিল জামাটা। পটাপট ব্রেসিয়ারের ফিতে টেনে খুলে ফেলল।

বিড়বিড় করে বকছে চার্লি! 'আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি।'

শরীর থেকে ছাল-চামড়া তুলে নেবার মতো ব্রেসিয়ার টেনে চিৎকার করে উঠল, 'নো মি বয়।'

ব্রেসিয়ার বিছানায় ছুঁড়ে দিল। প্যান্ট টেনে খুলে ফেলল। আয়নায় সে নিজেকে দেখতে পারত। না, দেখতে ইচ্ছে করে না। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে। ব্রেসিয়ার থেকে স্তন ফেটে

বের হয়ে আসছিল। সব খুলে ফেলায় হাল্কা-আরাম। জ্বালা করছিল। ব্রেসিয়ার খুলে ফেলতেই ভাঁজ করা রুমালগুলি নীচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে গেল। সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল—শরীরে যেন তার আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। সে ভারী আরাম বোধ করছ। হাল্কা। তবু ভিতরের জ্বালা মরছে না।

নো মি বয়।

এই এক আচ্ছন্নতা তার শৈশব থেকে। সে আজ কি যে করে ফেলল। কেমন হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল—সে বালিশ আঁকড়ে মুখ গুঁজে দিল। তার শরীর থর থর করে কাঁপছিল। তার কোমর থেকে উরুর ছিল আয়নায় ভেসে উঠছে। যেন সে সত্যি বড় অসহায়। বিছানায় পড়ে থাকার ভঙ্গিমাটুকু বড় করুণ।

অনেকটা পথ সে সুহাসকে ঘোড়ায় চাপিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে। সে আর পারছিল না। সুহাসের ঘাড়ে লেগেছে। মেরেই ফেলত। সে কি করেছিল—মনে করতে পারছে না। যেন সে তার ঘোর থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ খুলে হাউ হাউ করে কাঁদতে পারলে বাঁচত। কাঁদতে পারছে না। ছটফট করছে। কেন কাঁদতে পারছে না।

সে উঠে বসল। তার যে এখনও সম্পূর্ণ হুঁশ ফেরেনি বোঝাই যাচ্ছে।

সে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাভিমূলে নরম উলের মতো সোনালি উষ্ণতার জন্য এতটুকু তার আতঙ্ক নেই। সে যেন ইচ্ছে করলে এখন দরজা খুলে ডেক ধরেও ছুটে যেতে পারে। কি করবে বুঝতে পারছে না। আচ্ছন্ন ভাবটা যে কাটেনি—সে তা এখনও টের পাচ্ছে না। টের পেলে, সত্যি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলতে পারত। দেয়াল ধরে বসে পড়তে পারত। এবং শরীর উবু করে নিজের এই আতঙ্ক থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরও বেশি কুশলি হতে পারত।

সে কিছুই করছে না।

সে কেবল ভাবছে, কেন সে নির্জন পাহাড়ি উপত্যকায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল।

কোনও ফুল।

নিশ্চয়ই বুনো ফুল।

সে দেখতে পেল দূরে মাইলের পর মাইল জুড়ে ব্লুস্টেম ঘাসের ছড়াছড়ি।

সে চিৎকার করে উঠেছিল, 'সুহাস সামনে দ্যাখ। দিগন্ত জুড়ে আমার ঠাকুরদা ঘাসের বীজ বুনে গেছেন। দ্যাখ কি সুন্দর সবুজ আর নীল স্বচ্ছ সৌন্দর্য আকাশের নীচে খেলা করে বেড়াচ্ছে। ব্লুস্টেম ঘাসের ডগায় সাদা ফুল। দ্যাখ সুহাস তিনি কত সুন্দর ছিলেন—তিনি তাঁর জাহাজে এই সব দ্বীপেও ঘুরে গেছেন। ডরোথি ক্যারিকো জাহাজে ইস্টারের ছুটিতে, অথবা কোনও প্রমোদ ভ্রমণে যাত্রী নিয়ে বের হয়ে পড়তেন সমুদ্রে। আমার ঠাকুরদাকে বুঝতে চেষ্টা কর।'

ও কি দারুণ অভিজ্ঞতা! ঘাসগুলির ভিতর ঘোড়া হেঁটে যাচ্ছে। সে আর সুহাস পাশাপাশি দুই অশ্বারোহী। সে দেখতে পাচ্ছে সুহাস খুবই মুগ্ধ হয়ে গেছে এমন এক উপত্যকায় নেমে এসে। সুহাস যত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তত দুলকি চালে ঘোড়ার উপর থেকে সে বলছে, 'ডরোথি ক্যারিকোর ছবি আছে আমাদের দেয়ালে—কি বিশাল জাহাজ! সি ওয়াজ এ্যা গ্র্যান্ড সিপ। দেয়াল জুড়ে তার রেপ্লিকা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় সুহাস।

আমার ঠাকুরদা তবে এখানেও এসেছিলেন।'

সুহাস তার দিকে যেন তাকাল।

'এগুলো তো কাশফুল। ব্লুস্টেম বলছ কেন বুঝি না।'

'সুহাস না না, তুমি কাশ বলবে না। ওতে আমার ঠাকুরদার অমর্যাদা করা হবে। তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন জান না। তিনি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমাকে দিয়ে গেছেন।'

আচ্ছন্ন অবস্থায় বোধ হয় চার্লি হুবহু সব মনে করতে পারছে। কারণ সেই উপত্যকার নীচে নির্জন বালিয়াড়িতে যা ঘটে গেল—সে ভাবতে পারছে না—অথচ সে নিজে কেন যে দেয়াল ছেড়ে নড়তে পারছে না। কোনও নগ্ন নীরব বর্ণমালার সৌন্দর্য তার চেয়ে প্রবল কিনা সে এখনও কিছুই বুঝছে না।

কারণ সে কখনও নিজেকে দেখে না। দেখতে তার ভাল লাগে না। দেখলে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সে হাল্কা, আরাম বোধ করছে এখন, ফ্রি ফ্রম অল বাইন্ডিংস—এ যে এক জাদুকরের স্পর্শে সে জেগে যাচ্ছে বোঝায় কি করে!

'সুহাস দ্যাখ দ্যাখ।'

সুহাস তাকাল।

সে আঙুল তুলে দূরে দেখাচ্ছে—'কেনিফ্লাওয়ার। পাথরের খাঁজে খাঁজে ফুটে রয়েছে। আমাদের পাহাড়গুলিতে কেনিফ্লাওয়ারের ছড়াছড়ি। আহা আমি যদি কখনও সেই সব উষর অঞ্চলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম। এস, ওদিকে না। সব আছে সুহাস, বুনো ডেইজি ফুল দেখতে পাচ্ছি না। আমি যে কি করি।'

সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

এমন সুন্দর উপত্যকায় ঘাস পাথর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তারা এত দূরে নিরিবিলি কোনল উষর অঞ্চল আবিষ্কার করতে পারবে, সে আশাই করতে পারেনি।

সে কেবল বলছিল, 'অন আইদার সাইড নিয়ার টাইলার, গোল্ডেন কোরিওপসিস স্ট্রেচ অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান সি।' কিছুটা দূরে, ঘাসের ভিতর ঢুকে সে বলেছিল ঐ দেখ নীচের দিকটায় এমন অজস্র গোল্ডেন কোরিওপসিস ফুটে আছে।

তারপর বলতে গিয়ে যেন গর্বে বুক ফুলে যাচ্ছে চার্লির।'—অবশ্যই এটা আমার ঠাকুরদার পক্ষেই সম্ভব সুহাস। তুমি জানো সুহাস, দাদুর এই বুনো ফুল, অ্যাট্রাক্টস গ্রোয়িং নাম্বার অফ ভিজিটার্স..হু কাম টু সি আওয়ার স্প্রিং ওয়াইল্ড ফ্লাউয়ার্স। আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফ্‌ট অফ মাই চাইল্ডহুড। সিনস দেন ইট হ্যাজ বিন মাই জয়। ইয়েস, দিস ইজ ওনলি মাই জয়—কি করে যে তোমাকে বোঝাব!'

'তুমি জান সুহাস, ওয়াইলড ফ্লাওয়ার্স অফ আওয়ার উডল্যান্ড ইন এপ্রিল মেক দ্য ইয়ার হেভি উইদ সেন্ট।'

সে আরও কিছুটা নেমে গেছে তখন।

সুহাস তাকে ডাকছে।

'চল ফিরি। কতদূরে চলে এসেছি। রাস্তা চিনে ফিরে যেতে পারব না।'

'পারব। তুমি সুহাস জান না অ্যাটামাসকু লিলি কি আশ্চর্য সুন্দর। জানো, এ ওম্যান

হু পুলস ইট আপ বাই দা রুট উইল সুন বিকামস প্রেগন্যান্ট। একটা আস্ত লিলি, গাছ থেকে তোলা কত কঠিন তুমি জান না। এই অ্যাটামাসক্ লিলি ব্লুমস কুইকলি আফটার স্প্রিং রেইনস। সেই দুর্লভ জাতের লিলি কখন ফুটবে, সেই আশায় দম্পতিরা তাঁবু খাটিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে। সামান্য দূরে এসেই তোমার ভয় ধরে গেল! তুমি কি সুহাস! দুর্লভ লিলি ফুল খুঁজে পাই কি না দেখি। ঠাকুরদা এত সব ফুলের বীজ বুনে গেছেন—আর তিনি তাঁর উত্তরাধিকারের জন্য দুর্লভ লিলি ফুল এখানে রোপণ করে যাবেন না, হয়! এস। প্লিজ সুহাস। এখনও তো সূর্য অস্ত যায়নি সমুদ্রে। এখনও তো কচ্ছপেরা উঠে আসেনি সমুদ্র থেকে। এখড়ও তো পাখিরা ওড়াউড়ি করছে মাথার উপর। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন!

সুহাস অনেক পেছনে পড়ে গেল কেন! সে কি আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

সে কি জাহাজে ফিরে যেতে চায়?

'না, না, জাহাজে আমার একদণ্ড মন টেকে না। এই টিলা পার হয়ে আরও কতদূর যাওয়া যায় এস না, দেখি। মানুষ তো এ-ভাবেই বের হয়ে পড়ে। কখনও একা। কখনও দু'জনে। আমরা তো একা নই। তবে নেমে আসতে সাহস পাচ্ছ না কেন! সে সুহাসকে উজ্জীবিত করছে—ডোন্ট হাইড ইয়োর লাইট, লেট ইট শাইন ফর অল।'

তার আচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছে। সে সব মনে করতে পারছে। দেয়াল থেকে সরে গিয়ে বিছানায় বসল। হাতে ভর করে যেন বসে আছে।

সে সুহাসকে বলতে চাইছে, লেট ইয়োর গুড ডিডস গো ফর অল টু সি—অ্যান্ড ফর মি অলসো সুহাস। বনে জঙ্গলে তুমি দেখতে পাচ্ছ না—কি সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে। ফুল তুমি ভালবাস না?

সুহাস আমি আর পারছিলাম না। আমার কোনও দোষ নিয়ো না সুহাস। এটা আমার আরও হয়েছে। বিশ্বাসই করতে পারি না আমি মেয়ে। আমার যে কি হয়। ভেতরে আমার কষ্ট বাড়ে। স্থির থাকতে পারি না। অচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এবং সর্বত্র যেন হাহাকার—কি যে করি। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—সত্যি বলছি—বিশ্বাস কর, প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—পারিনি। বুনো ডেইজি ফুল দেখবার আগ্রহে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।

অদৃশ্য এক জগতে ঢুকে যাচ্ছিলাম।

সব পোশাক খুলে ফেললাম।

তুমি রাগ করলে আমার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

তুমি ডাকছিলে, 'চার্লি তুমি কোথায়?'

বনজঙ্গলে ঘোড়া ছুটিয়ে তুমি ডাকছিলে, 'চার্লি এ-কোথায় তুমি আমাকে এনে ছেড়ে দিলে! আই হ্যাভ লাভড ইয়ো ভেরি ডিপলি।'

না আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছিলাম।

সত্যি বলছি, আমি অনুভব করলাম, গড হ্যাভ মার্সি অন আস।

আমি অনুভব করলাম—আমার বিকশিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেবল বলছিলাম, বেন্ট ডাউন অ্যান্ড হিয়ার মাই প্রেয়ার ও লর্ড, অ্যান্ড অ্যানসার মি, ফর আই অ্যাম ডিপ ইন ট্রাবল।

তুমি ডাকছিলে, চার্লি, প্লিজ ফিরে এস। আমাদের জাহাজে ফিরতে হবে।

আমার কোনও হুঁশ ছিল না। আমি থর থর করে কাঁপছিলাম। শরীর থেকে সব জামা কাপড় খুলে ফেলতে থাকলাম। তুমি চেষ্টা কর, আমাকে খুঁজে দ্যাখ আমি কে?

পাথরের উপর চুপচাপ বসেছিলাম, সূর্যাস্তের সময় যে-ভাবে বসে থাকে জলকন্যারা, আমার কেন যে চুপচাপ ঠিক সে-ভাবে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল জানি না। আমি তো জানি না, হাউ টু এনসার। কি করে সাড়া দিতে হয় আমার কিছুই জানা নেই। কেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই পাথরের উপর কোনও ছবির মতো আমার অস্তিত্ব, বিশ্বাস করবে না, সমুদ্রের ঢেউ এসে আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের জলকণায় আমি ভিজে যাচ্ছিলাম।

আমার কি যে ভাল লাগছিল! আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বন জঙ্গল, অসীম সমুদ্র, অনন্ত জলরাশি, কিছুই দৃশ্যমান নয়। কেমন এক নীল নীহারিকার মধ্যে আমি ঢুকে যাচ্ছি। কোনও প্রাণিজগতের সাড়া পাচ্ছি না। আমি জানি না, ঈশ্বর এর চেয়ে বেশি অনুভবের মধ্যে কখনও আমাকে নিয়ে যেতে পারেন কি না। আমি তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি শুধু—যেন বলছ, ফর আই অ্যাম দ্য লর্ড—আই ডু নট চেঞ্জ।

কেন এমন হয় জানি না।

পেছনে পাথরের উপর ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলাম সুহাস। ইস তুমি বুঝবে না, ভিতর যেন অনন্তালোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বসন্তকালে কোনও সানফ্লাওয়ার যে অনুভবে বিকশিত হতে থাকে। আমিও তাই হচ্ছিলাম। অধীর হয়ে পড়ছি। আমার মাথা এলিয়ে পড়ছে। এক হাতে ভর দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছি। এবং আমার সেই বুনো ডেইজি ফুলটিকে লজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবৃত করছি। যেন তুমি খুঁজে না পাও। যেন তুমি খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হও। বালকের মতো সরল নিষ্পাপ চোখে তুমি আমাকে আবিস্কার কর—এ-ছাড়া সত্যি বলছি কিছু চাইনি সুহাস।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনি।

মনে হচ্ছিল অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি ধীরে ধীবে এগিয়ে আসছে। পাথর জ্বলে উঠছে, খুরের আঘাতে। আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম। নড়বার শক্তি ছিল না। কেউ সাহায্য না করলে, কেউ জাগিয়ে না দিলে বোধ হয় আমার এই আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পাবার উপায় ছিল না।

তুমি অবাক বিস্ময়ে নিশ্চয়ই আমাকে দেখছিলে। তুমি বিশ্বাস করতে পারছিলে না—চার্লি, জাহাজের সেই দুরন্ত বালক কখনও সমুদ্রের ধারে জলকন্যা হয়ে যেতে পারে!

আমি টের পাচ্ছিলাম, তুমি প্রথমে এসে পেছনে দাঁড়ালে। কিছুটা বিব্রত। বিশ্বাস করতে পারছ না। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালে। নতজানু হলে। সত্যি জীবন্ত কেউ কিনা তোমার সংশয় হচ্ছিল। এমনকি তুমি একটা কথা বলতে পারছিলে না।

আমি বললাম, ওয়ান নাইট আই ওয়াজ স্লিপিং, মাই হার্ট ওয়েকেনেড ইন এ্যা ড্রিম। আই হার্ড দ্য ভয়েস অফ মাই বিলাভেড।

তুমি আমার গায়ে হাত দিলে।

যেন কোনও মর্মরমূর্তির গায়ে হাত দিচ্ছ। তোমার হাত শির শির করে কাঁপছিল।

অথচ কোনও কথা না।

তুমি নতজানু হয়ে আমার কি সব দেখছ।

আমি চোখ মেলে তাকাতে পারছি না।

শুধু বললাম, আই হিয়ার দ্য ভয়েস অফ মাই বিলাভেড। হি ইজ নকিং অ্যাট মাই ডোর।

তুমি শুধু বললে, ওপেন টু মি। প্লিজ আনল্যাচ দ্য ডোর। প্লিজ রাইজ আপ, মাই লাভ, মাই ফেয়ার ওয়ান।

সুহাস আমার সব তছনছ হয়ে গেল।

আই জামপ্ড আপ টু ওপেন দ্য ডোর।

আমি তোমাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলাম। আই অ্যাম সিক উইদ লাভ।

আমি তোমার চুলের গন্ধ নিলাম।

তুমি আমার শরীরে কি খুঁজে বেড়াচ্ছ বুঝতে পারছি। কোমল নরম উলের উষ্ণতা ক্রমে বুনো ডেইজি ফুল হয়ে ফুটে উঠল। তুমি মুগ্ধ বালকের মতো কি করবে ভেবে পাচ্ছিলে না। শুধু জড়িয়ে রেখেছিলে। আমরা তো জানি না দ্য ওসেনস, হাউ দেয়ার ওয়েভস অ্যারাইজ ইন ফিয়ারফুল স্টর্ম। আচ্ছন্ন না থাকলে, আমি কখনই পারতাম না। আর যখনই আচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছিল, চিৎকার করে উঠলাম, নো মি বয়।

তুমি আমাকে জড়িয়ে রেখেছ।

তুমি বললে, ফর আই হ্যাভ বিন আউট ইন দ্য নাইট অ্যান্ড অ্যাম কভারড উইদ ডিউ।

তুমি আমার কোমর জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসলে এবং নাভিমূলে গাল রেখে বুনো ডেইজি ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে গেলে। আমি নড়তে পারছিলাম না। তারপর কি করতে হয় কিছুই যে জানি না।

তখন পিছিলে শোরগোল।

সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। ঘাড়ে চোট লেগেছে। ঘাড় নাড়াতে পারছে না। সে যে খুব অস্বস্তি বোধ করছে তার আচরণেই টের পাওয়া যাচ্ছে। চার্লি তাকে ফোকসালে রেখে ছুটে কেবিনে চলে গেছে।

সবাই উঁকি দিয়েছে। 'কি হল? কি করে পড়লি—' এসব নানা প্রশ্ন। তার এক কথা, 'পড়ে গিয়ে লেগেছে।' তার এক কথা, 'দ্যাখ তো মুখার্জিদা ফিরল কি না। কোথায় যে যায়!' দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় সুহাসের মুখ খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

বংশী বলল, কোথায় আর যায় বোঝ না।

বংশী বাঙ্কে বসে পা দোলাচ্ছে। উপরের বাঙ্কে শুয়েছিল। নীচের বাঙ্ক ছেড়ে দেওয়ায় তাকে উপরে উঠে যেতে হয়েছে। সেই সারেঙসাবকে খবর দিয়েছে, সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে জখম। নুনজলের সেঁক দেওয়া হচ্ছে। অধীর বাঙ্কের পাশে একটা টুল নিয়ে বসে গেছে। সুহাসের ঘাড় ফেরাতেও কষ্ট। সে কেবল বলছে, এখনও এল না। রাত তো কম হয়নি। মুখার্জিদা না ফেরায় তার যেন আতঙ্ক বেড়ে গেছে। খুবই ঘাবড়ে গেছে

মনে হয়। সুরঞ্জন আর মুখার্জিদা একই সঙ্গে বের হয়ে গেছে।

জাহাজে মাল তোলা হচ্ছে। ইনজিনরুমে কাজের চাপ নেই বললেই হয়। টানা আট ঘণ্টা একজন করে ফায়ারম্যান নীচে থাকলেই হল। এখন কিছু হাল্কা কাজ ফায়ারম্যানদের করতে হয়। কাজের চাপ কম বলেই মুখার্জির সঙ্গে বের হয়ে যেতে পেরেছে সুরঞ্জন। বন্দরে এসে একটা মাত্র বয়লার চালু রাখা হয়। জাহাজ চালানো বাদেও নানা খুচরো কাজ থাকে—একটা বয়লার সে-জন্যই চালু রাখা হয়। জেনারেটার, জেনারেল সার্ভিস পাম্প উপরের ট্যাঙ্কগুলিতে জল তোলার কাজ। বন্দরে এলেও জাহাজে কাজ থেকে যায়। সুরঞ্জনের অবসর এখন অনেক। মুখার্জিদার সঙ্গে যেতেই পারে।

অস্বস্তিতে সে শুয়ে থাকতে পারছে না। একবার উঠে বসছে। আবার শোবার চেষ্টা করছে। ঘাড় ভাল করে ফেরাতেও পারছে না। সারেঙসাব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন, 'আমার কথা কেউ শোনে! এখন কিছু হলে কোথায় যাব!'

কিনারায় লোক নেমে যাওয়ায় জাহাজে ভিড়ভাট্টা কম। সকাল থেকেই টাগবোটে মাল আসছে। বড় বড় তামার পিপে ভর্তি ফসফেট। ডেরিকগুলো সব তুলে দেওয়া হয়েছে। ডেরিকে মাল তোলা হচ্ছে। সারা ডেকে ফসফেটের গুঁড়ো। কিনারায় লোক নেমে গেলে জল মেরে সাফ করা হয়েছে। ফল্কার কাঠও ফেলার কাজ থাকে। বৃষ্টিবাদলা হলে ফসফেট গলে যাবে সব। নানা ঝামেলার মধ্যে সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে নতুন ঝামেলা পাকাল—কাপ্তানকে রিপোর্ট করা দরকার। সুহাস কিছুতেই রাজি না। মুখার্জিদা না এলে কিছু হবে না।

সারেঙ এতেও ক্ষুব্ধ।

'আরে মুখার্জিবাবু কি তোর ওপরয়ালা। ভালমন্দ দেখার কি দায় তার।' কিন্তু ওই এক গেরো—কাপ্তানের পুত্রটি সুহাসের গায়ে এঁটেলির মতো কামড়ে রয়েছে। সে-জন্যই যত আরও ঝামেলা। তিনি কি যে করেন।

মুখার্জিদা বোধহয় গ্যাঙওয়েতেই খবরটা পেয়েছিলেন। তিনি ছুটে এসেছেন। তিনি তো ভাল নেই। ম্যাকের হত্যারহস্য শুধু নয়, কলিজ জাহাজের রহস্যও তাঁর মধ্যে সমান বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। মুখোসের হদিস পেয়ে গেছেন, কে মুখোস পরে চার্লিকে অনুসরণ করছে তাও তিনি জানেন, কিন্তু কেন এই অনুসরণ, একজন নারী যদি জাহাজে থাকেই তার জন্য মুখোস পরে ঘুরে বেড়াবার কি দরকার—তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পাশে বসলেন—তারপর কোনও প্রশ্ন না করে চোটপাট শুরু করে দিলেন।

'আমরা কি তোর চাকর। হ্যাঁরে—তুই আর চার্লি এয়ারস্ট্রিপ পার হয়ে কোনদিকে গেলি, চার্লির লাগেনি তো! ঘোড়া থেকে পড়ে গেলি—দেখি—বলে তিনি ঘাড়ে হাত দিতে গেলে সুহাস প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—'লাগছে।'

'খুব লাগছে।'

'ঘাড় তো ঘোরাতে পারছি না!'

তারপর আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মুখার্জি বললেন, 'সেরে যাবে।' বংশীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর খাওয়া হয়েছে? না হলে খেয়ে নে। আমার দেরি হবে। বসে থাকিস না।' অধীরের দিকে তাকিয়েও সেই এক কথা।

'বসে থাকলি কেন! যা। সুহাসের খাবার নীচে দিয়ে যা।'

বংশী অধীর বের হয়ে গেলে, দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'থাক, সুহাসের খাবার নীচে পাঠাতে হবে না। হরেকেষ্টকে ডেকে দে।' বলে দরজা বন্ধ করতেই দেখলেন, সুহাস উঠে বসেছে। সে শুধু বলল, 'ঘাড়ে লেগেছে। তবে ঘাবড়াবে না। সেরে যাবে। চার্লি মেয়ে। তোমার কথাই ঠিক।'

'মেয়ে! মানে ওম্যান!' তাহলে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি।

'ইয়েস ওম্যান। তোমার কথাই ঠিক। সেন্ট পার্সেন্ট ঠিক। তুমি এ-ভাবে তাকিয়ে আছ কেন! যেন ভূত দেখছ! না আমার খুব লাগেনি—বলছি তো সেরে যাবে।'

তিনি ধীরে ধীরে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিছু ডেকজাহাজি খবর পেয়ে সুহাসকে দেখতে এসেছে। মুখার্জিদা খুবই বিরক্ত। বললেন, 'ভাল আছে। যাও ভিড় বাড়াবে না!' উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, 'চার্লি শেষে তোর কাছে ধরা দিল!'

'আমি জানি না দাদা! আমার কাছে ধরা দিল কি দিল না বলতে পারব না। কিন্তু,' বলে, লজ্জায় সুহাস কিছুটা বিচলিত বোধ করল। কী করে বলা যায়। নারী যদি জলকন্যা হয়ে যায়, যদি পাথরের উপর বসে থাকে, নিরাবরণ হয়ে থাকে তার কথা সে একজন বয়স্ক লোকের সামনে বলে কি করে! কিছুটা আমতা গলায় বলল, 'তোমরা কি আমাদের ফলো করছিলে!'

'করছিলাম তো। দেখি তোরা দু'জনেই সহসা উধাও। বেটা সুরঞ্জন সাইকেল নিয়ে ঢুকবে কি করে! আমি একাও যেতে পারছিলাম না। কোপটা যে কার উপর পড়বে বুঝতে পারছি না।'

'কোপটা আমার উপরই পড়েছে। চার্লি না থাকলে মেরেই ফেলত!'

'দাঁড়া আমাকে ভাবতে দে।' বলে তিনি পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের উপর ঠুকলেন। কিছু ভাবলেন! তারপর বললেন, 'আমার ঘরে যেতে পারবি! ধরব।'

'না, না ধরতে হবে না।'

সুহাস পায়ে চটি গলিয়ে বাঙ্ক ধরে উঠে দাঁড়াল। মনে হয় কোমরেও কিছুটা চোট পেয়েছে। কিন্তু সে যে এত শান্ত হয়ে আছে কি ভাবে তাও বুঝতে পারছেন না মুখার্জি।

সুহাসকে দেখে মনে হচ্ছে তার যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। যে কোনও আতঙ্ককে সহজে তুচ্ছ করতে পারে, অন্তত তার কথাবার্তা এত স্বাভাবিক, এবং তিনি যে আশঙ্কায় ভুগছিলেন, আজ তার একটা তবে মহড়া হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, 'পড়ে টড়ে লাগেনি বলছিস? হেঁটে যেতে পারবি তো।'

'পারব।' বলে সুহাস কোনও রকমে পা টেনে টেনে মুখার্জির ফোকসালে ঢুকে গেল।

মুখার্জিদা বললেন, 'সুরঞ্জনকে ডাকি। সুরঞ্জন বোধহয় খবরটা পায়নি।'

'ডাক। ওর জানা দরকার।'

মুখার্জিদা সুরঞ্জনের ঘরে গিয়ে দেখলেন নেই। বোধহয় ডেক থেকে নামেনি। মনু জাল বুনছে। তাকেই বলে এলেন, 'সুরঞ্জনবাবুকে বলবে, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।'

তিনি যে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে আছেন তাও বোঝা গেল। কারণ সিগারেটে আগুন দিতে ভুলে গেছেন। দেশলাইটা পকেটে রেখে দিয়েছেন। সিগারেট টানতে গিয়ে টের

পেলেন আগুন ধরাননি। দেশলাই খুঁজতে গিয়ে এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াচ্ছেন। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে দেশলাই বের করলেন—কিন্তু সিগারেট ধরালেন না। হাতের দু আঙুলে সিগারেট—মাঝে মাঝে মুখ মুছছেন হাতে। এগুলো মুখার্জিদার দুর্বলতার লক্ষণ সে আগেও টের পেয়েছে। বাঙ্কে বালিশটা মুখার্জিদাই টেনে বললেন, 'বসে থাকতে কষ্ট হলে শুয়ে পড়।'

'না কিছু কষ্ট হচ্ছে না। তুমি ভেব না।'

'কি হল বলবি তো!'

'চার্লির ধারণা তার ঠাকুরদা এই দ্বীপটায়ও বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন। জাহাজটার নাম ডরোথি ক্যারোকা না কারকার কি যে বলল মনে করতে পারছি না। ওর ঠাকুরদার প্রমোদ তরণীর নাম নাকি ওরকমেরই ছিল!'

'তারপর।'

'তারপর এক একটা ফুল দেখছে আর কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছে। কাশের জঙ্গলে ঢুকে বলেছে ওগুলো নাকি ব্লুস্টেম ঘাস। বল কি বলি! পাগল। বুনো ফুলের মধ্যে চার্লি নাকি নিজেকে ফিরে পায়। এক একটা ফুল আবিষ্কার করছে, আর বলছে, সুহাস, আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফট্ অফ মাই চাইল্ডহুড! বল কি বলি! ফুলগুলি জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে!'

সুহাস বুঝতে পারছে, মুখার্জিদা অস্থির হয়ে পড়ছেন। অধৈর্যের চূড়ান্ত। কিন্তু সবটা না বললে বুঝবেন কি করে।

সে বলল, 'জানো, ক্রমে কেমন আচ্ছন্ন হতে হতে আমার কথা ভুলে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাকছি, চার্লি, সাড়া নেই। গাছের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছি, নেই। ঘাসের মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়াটাকেও দেখতে পেলাম না। ছুটলাম। ঢালু জমি পার হয়ে পাথরে লাফ দিয়ে নামতেই দেখি দূরে পাথরের গায়ে সমুদ্র লেগে আছে। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আর মানুষের অবয়বে কেউ বসে আছে দেখতে পাচ্ছি। যত এগিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, সে চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে। ঘাবড়ে গেছি। সুহাস বলতে গিয়ে ঢোক গিলল। জ্যান্ত মৎস্যকন্যা। ভয়ে হয়তো পালাতাম। দেখি ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। সাহস ফিরে পেলাম। কিছু দূরে জামা প্যান্ট পড়ে আছে। আর তখনই ডেকে উঠলাম, চার্লি। ওর জামাপ্যান্ট তো আমি চিনি। কোনও সাড়া নেই।'

'তারপর?'

আবার ঢোক গিলল। সবিস্তারে বলতে পারল না। শুধু বলল, 'ওর হাত ধরে তুলে আনলাম। বললাম, কি ছেলেমানুষি করছ! চার্লি, প্লিজ, কে দেখে ফেলবে! তুমি ওম্যান। তুমি গার্ল! ছিঃ ছিঃ শিগগির জামা প্যান্ট পরো। কিছুতেই পরবে না। জোরজার করে পরিয়ে দেবার সময় ঠাট্টা করে বলছি, দেন ইয়ো আর এ গার্ল। সঙ্গে সঙ্গে চার্লি আর্তনাদ করে উঠল, নো মি বয়!'

'আর তখনই একটা লোক যমদূতের মতো কোত্থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল। দেখি, দেখি'...সে কেমন তোতলাতে থাকল।

'কি দেখি!' মুখার্জিদা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠছেন।

'ঘোড়া থেকে নেমেই আমাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিল। উঠতে পারছিলাম না।'

সুহাস হাঁপাচ্ছে। কিছুটা দম নিয়ে বলল, 'আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না—কী করে ঘটে গেল সব। চার্লি চোখের পলকে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে বসল। মনে হল চার্লি বুঝি পালাচ্ছে। না, চার্লি পালাচ্ছে না। সোজা ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে গেল। বুটের ডগায় লোকটার মাথায় বিদ্যুৎ বেগে লাথি মারল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। চার্লি লাফিয়ে নেমে এল—আমার মাথা তখনও ঘুরছে। উঠতে পারছি না। শিশুর মতো বগলে নিয়ে ঘোড়ায় তুলে ছুটতে থাকল।' বলতে বলতে সুহাস শিউরে উঠছে। 'টিলাতে উঠে দেখছি, লোকটা নীচে উঠে দাঁড়িয়েছে। মরে যায়নি। খোঁড়াচ্ছে।'

টিলার উপর থেকে চার্লি চিৎকার করে বলছে, আই উইল রিওয়ার্ড ইয়োর ইভিল, উইদ ইভিল। নাথিং ক্যান স্টপ মি।

জঙ্গলের মধ্যে চার্লি নিমেষে আমাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল,—সুহাস ফের হাঁপাচ্ছে। যেন দম পাচ্ছে না।

'বুনো ডেইজি ফুল খুঁজে পেলি!' মুখার্জি সিগারেট ঠুকছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের মুখ আশ্চর্য সুষমায় ভরে গেল। মুখ নিচু করে বলল, 'পেয়েছি।'

'আর কিছু?'

সুহাস কেন যে লজ্জায় কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না! অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'এই প্রথম চার্লি স্বীকার করেছে, সে নারী। বলেছে, আই অ্যাম স্লিম টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড্। আই নিড ইয়োর হেলপ সুহাস। আই নো দ্যাট ওয়ান ডে ইয়ো উইল কাম অ্যান্ড হ্যাভ মার্সি অন .মি।'

মুখার্জি খুবই বিচলিত। সঙ্গে সাফল্যের সুখও অনুভব করছেন। তিনিই ঠিক। শি ইজ ওম্যান। 'আই অ্যাম স্লিম, টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড।' চার্লির অকপট স্বীকারোক্তি।

তিনি দেখলেন, সুহাস ফের শুয়ে পড়েছে। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আর কোনও কথা বলছে না। সুহাস যে খুবই ভেঙে পড়েছে বোঝা যায়। আশঙ্কা শেষে এ-ভাবে সত্যি হবে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর কি অপরাধ তাও সুহাস বোধ হয় বুঝতে পারছে না। খুবই ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তা হলে নিউপ্লিমাউথ থেকেই সুহাসকে খুন করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

না হলে ফল্কার পাশে খালি টব অন্ধকারে রেখে দেবে কেন! ডেকের অন্ধকারে কিছু পড়ে থাকলে রাতবিরেতে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক। সুহাস যে তার সঙ্গে গভীর রাতে বোটডেকে উঠে গেছে তা কেউ লক্ষ্য রেখেছে। সে যে ফেরার সময় যমুনাবাজু ধরে নীচে নেমে আসবে তাও চক্রান্তকারীর জানা। ভাগ্যিস যমুনাবাজু ধরে নামেনি। গঙ্গাবাজুতে নেমে এসেছিল। কেউ অন্ধকারে ঘাপটি ঘেরে বসে আছে ভেবেই তো সুহাস ছুটে গিয়েছিল। না গেলে বুঝতেও পারত না, অদৃশ্য চক্রান্তকারী সুহাসের জন্য মরণ ফাঁদ সৃষ্টি করে রেখেছে। অন্ধকারে হোঁচট খেলে নির্ঘাত সে ফল্কার নীচে জাহাজের খোলের মধ্যে পড়ে যেত। দুটো কাঠও খুলে রেখেছিল ফল্কার। ঠিক খালি টবটার পাশেই। পড়ে গেলে সুহাস

ছাতু হয়ে যেত।

সুহাসকে এখন বেশি জেরা করাও ঠিক হবে না। অথচ জেরা না করলে বুঝতেও পারবেন না, অ্যালেন পাওয়ার সম্পর্কে কিছু জানা গেল কি না। চার্লির প্রসঙ্গ তোলা যায়। চার্লি ছিল বলে সে রক্ষা পেয়েছে বললে সুহাস খুশিই হবে। সুরঞ্জনটা কি করছে! তাকে সব বলা দরকার। সুহাসকে একা ফেলে রেখেও যেতে মন চাইছে না। সুহাস তাঁর খুবই অনুগত আর বিশ বাইশ মাসে সম্পর্ক কত গভীর হয়ে যায় সে জানে। জাহাজ থেকে নেমে যে যার লটবহর নিয়ে বিদায় জানাবার সময় সবারই চোখ ছল ছল করে ওঠে। কবে দেখা হবে, কি দেখা হবে না! অথচ জাহাজে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়ে ঘরে ফেরার সময় বোঝা যায় কি গভীর টান। কেউ কেউ বুকে জড়িয়ে কেঁদেই ফেলে। জাহাজি জীবনে এই এক জ্বালা।

তিনি উঠে গিয়ে দরজায় ডাকলেন, 'অধীর আছিস?'

তিনি ডাকলে সাড়া না দেওয়ার কথা নয়। অধীরও কি উপরে বসে আছে! আশ্চর্য অধীরের ফোকসালে গিয়ে দেখলেন, সে নেই, সুরঞ্জনের ফোকসালও ফাঁকা। চারজন জাহাজি ফোকসালের চারটে বাঙ্কে থাকে। কেউ নেই। গেল কোথায় সব! রাত দশটা বাজে। ঘড়ি দেখে টের পেলেন। সুহাসের ফোকসালে শুধু বংশী শুয়ে আছে। যা করে থাকে—স্ত্রীর চিঠি না হয় ছবি দেখে। তাকে দেখেও যেন দেখল না।

অধীর নেই দেখছি।

বংশী শুয়ে থেকেই বলল, 'কোথাও গেছে।'

বংশীকে বলেও লাভ নেই। তিনি পর পর সব ফোকসাল খুঁজে কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনকি ডেকসারেঙ, ইনজিন সারেঙের ঘরও খালি। অগত্যা নেমে এসে বংশীকে বললেন, 'আমার ফোকসালে গিয়ে শুয়ে থাক। দরজা বন্ধ করে যাস।'

তিনিও দরজা বন্ধ করে সুহাসের কাছ থেকে সব খবর নিচ্ছিলেন! সেই সেই ফাঁকে সবাই ঘর খালি রেখে কোথাও উঠে গেল! জাহাজে এমন কি হল, ফেকসাল খালি করে সবাই উপরে উঠে গেছে! কি ব্যাপার! সাংঘাতিক কিছু কি ঘটে গেল! কেউ কি আবার কোনও দুর্ঘটনার শিকার। মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল। ফোকসাল সব খালি হয়ে গেলে, জাহাজটা যে কি সাংঘাতিক ভুতুড়ে ভুতুড়ে মনে হয় এই প্রথম টের পেলেন তিনি।

বংশী গেল কি না কে জানে! সুহাসকে একা ফেলে উপরে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। ফের নিজের ফোকসালে ঢুকে দেখলেন, বংশী তার কথা রেখেছে। সে পাশের বাঙ্কটায় বসে আছে।

'শোন বংশী। আমি উপরে যাচ্ছি। আমি ফিরে এলে যাবি।'

একা সুহাসকে ফেলে যাবি না বলতে পারতেন। কিন্তু বললেন না। কি দরকার। এতে সুহাস আরও কাতর হয়ে পড়তে পারে। যতই বলুক তার কিছু হয়নি, কিংবা সে ভয় পায় না, সব রকমের দুর্যোগের মুখোমুখি হওয়ার সাহস সে রাখে—বলতে হয় বলে বলা। তা ছাড়া কিছু একটা হয়ে গেলে হাত কামড়াতে হবে।

'ওর যা লাগে দিস। তোর খাবার দেবে সুহাস?'

সুহাস উঠে বসার চেষ্টা করলে বললেন, 'উঠছিস কেন?'

'বাথরুমে যাব।'

'বংশী যা। ওকে ধরে নিয়ে যা।'

'ধরতে হবে না। একাই যেতে পারব।'

'পারবি তো, পড়ে টড়ে যাবি না তো!'

'না না। তুমি কেন যে এত উতলা হয়ে পড় বুঝি না! ভালই তো আছি।'

সহসা ক্ষেপে গেলেন, 'ভাল আছিস তো গুম মেরে গেলি কেন! উঠতে পারছিস না। তবু বলছিস পারবি!'

'পারব। দ্যাখ না।' বলে সন্তর্পণে সে উঠে বসল। বাঙ্কের রেলিঙ ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর বের হয়ে গেলে মুখার্জি বংশীকে বললেন, 'সঙ্গে যা। সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। যাই বলুক, গায়ে মাখবি বা।'

বংশী উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজায় দাঁড়াতেই তিনি ছুটে গেলেন ডেকে। আর আশ্চর্য, দেখলেন ঠিক বোটডেকের নীচে জাহাজিদের জটলা! ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জাহাজিরা!

সামনে পেলেন গালির ভাণ্ডারি ইমতাজকে। বললেন, 'কি হল চাচা! তোমরা সবাই এখানে! সুরঞ্জন কোথায়!'

'তা তো জানি না।'

বুকটা ধক করে উঠল।

জটলার মধ্যে ঢুকে বললেন, 'কি হয়েছে? সুরঞ্জন কোথায়!'

সুরঞ্জন বের হয়ে বলল, 'শুনেছ!'

যাক সুরঞ্জনের কিছু হয়নি। কিছুটা যেন হাল্কা হতে পেরেছেন।

'কি হয়েছে?'

'কি আর হবে!' বাপ ব্যাটাতে লেগে গেছে!'

'বাপ ব্যাটা।'

'আরে চার্লি খেপে গেছে। ঘর থকে সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। জামা প্যান্ট লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে। পোর্টহোল দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে সব। একবার নাকি প্রায় উলঙ্গ হয়ে বের হয়ে আসছিল। কাপ্তান বোটডেকের সব আলো নিভিয়ে দিয়েছেন! অন্ধকারে কি হচ্ছে বোঝাও যায় না। চিফমেট সেকেন্ডমেন্ট সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। কাউকে ওদিকে যেতে দিচ্ছেন না। যা মুখে আসছে গালাগাল দিচ্ছে চার্লি। কাপ্তানকে কি বলেছে জানো? চিৎকার করতে করতে ছুটে গেছে কাপ্তানের কেবিনে। হুল্লোড়। কাপ্তান একটা চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে চার্লিকে কেবিনে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজা লক করে দিয়েছেন। ভাগ্যিস অন্ধকার! কেচ্ছা। কেউ টের পায়নি।'

মুখার্জি বললেন, 'অন্ধকার কোথায়। জ্যোৎস্না উঠেছে। জ্যোৎস্নায় বোঝা যাবে না।?'

'সে তো জানি না!'

'কাপ্তানবয় কোথায়?'

'ওর কেবিনে। কেউ বের হতে পারছে না। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে। বোটডেকে কাউকে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। চার্লি খেপে গেল কেন বলো তো?'

'চার্লি তার বাবাকে কি বলেছে বলবি তো!'

'আমি কি শুনেছি। কাপ্তানবয় এসে বলল, 'জানেন, এমন ভাল মানুষের কপালে এই দুর্গতি! শত হলেও তোর বাবা—গুরুজন, তাকে বলতে পারলি, ইয়ো ক্রেজি ওল্ড গোট!'

'ও এটুকু! আর কিছু বলেনি?'

'স্টিঙ্ক কি, দাদা!' একপাশে ডেকে নিয়ে সুরঞ্জন মুখার্জিকে প্রশ্ন করল।

'স্টিঙ্ক!'

'তাই তো বলল কাপ্তানবয়। চার্লি নাকি বাবার দরজায় লাথি মেরে বলেছে, ইয়ো স্টিঙ্ক!'

'স্টিঙ্ক মানে তো দুর্গন্ধ।'

'দুর্গন্ধ!'

'তাই তো জানি! কাপ্তানবয় শুনল কি করে!'

'সে কাপ্তানের কেবিনে কোনও কাজে গিয়েছিল বোধ হয়।'

'আর অফিসার ইঞ্জিনিয়াররা কোথায়!'

'সব কটা তটস্থ। যে যার কেবিনে চুপচাপ বসে আছে। কাপ্তান একবার ব্রিজে, একবার চার্টরুমে, একবারা নিজের কেবিনে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছেন। আচ্ছা কাপ্তেনের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো। যাকে সামনে পাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে। বাস্টার সোয়াইন বিচ বলতেও মুখে আটকাচ্ছে না!'

'যাক তা হলে চার্লি রিভোল্ট করতে চাইছে! এদিকে খবর রাখিস, সুহাসকে আজ মেরেই ফেলত!'

'কে মেরে ফেলত!'

'সে কে জানে না! তারই প্রতিক্রিয়া এখানেও চলছে কি না জানি না! কি যে হবে!'

সুরঞ্জন বলল, 'চার্লি?'

'না, চার্লি না। চার্লিকে অযথা আমাদের সন্দেহ করা ঠিক হয়নি!'

আঠারো

জাহাজিরা যে বোটডেকের ছাদের নীচে জটলা করছে, নিশ্চয় কাপ্তান টের পাননি। টুইনডেকে নামার সিঁড়ির ঠিক কাছে না গেলে বোঝা যায় না, সেখানে জাহাজিদের কোনও জটলা আছে। মাঝে মাঝে কাচ ভাঙার শব্দ তারা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাতুড়ি দিয়ে দড়াম দড়াম দরজায় কেউ মারছে। কে মারছে, কাপ্তান না চার্লি, বোঝা যাচ্ছে না।

জাহাজিরা ফলে চিফকুকের গ্যালির ছাদের নীচে নিজেদের আড়াল করে রেখেছে। মুখার্জি ডেকে ছুটে আসার সময় শুধু দেখেছেন সেকেন্ডমেট বোটডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, জাহাজিরা ডেকছাদের নীচে ঘাপটি মেরে আছে। তিনিও বোধ হয় বেশ বিচলিত। জাহাজের সর্বময় কর্তা যদি অস্থির হয়ে পড়েন, তবে জাহাজিরাই বা ঠিক থাকে কি করে!

অথচ আর কোনও টুঁ শব্দ হচ্ছে না। কেউ কেউ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরেও পড়ছে। ইঞ্জিন সারেঙ চিফকুকের গ্যালিতে বসে আছেন। তিনিও বুঝতে পারছেন না, কেন চার্লি এত খেপে গেল! কেন কাপ্তান পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়েছেন। ঘোর

দুর্যোগে সমুদ্রে যিনি এত অবিচল থাকেন, তাঁর এমন কি হল, যে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারছেন না।

আর তখনই মনে হল, ঠিক সিঁড়ি ধরে কে নেমে আসছেন, চিৎকার করতে করতে, বলছেন, 'লিসন মাই ফেইথফুল সেলরস লিসন ক্লোজলি টু মাই প্রেয়ার—হিয়ার মাই আরজেন্ট ক্রাই? আই উইল কল টু ইয়ো হোয়েনেভার ট্রাবল স্ট্রাইকস, অ্যান্ড ইয়ো উইল হেলপ মি।'

মুখার্জি থ। কাপ্তান দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন বোটডেকে। এমন নিরুপায় মানুষ মুখার্জি যেন জীবনেও দেখেননি! তাঁর চকচকে পোশাক আজ নোংরা মনে হচ্ছে। অন্তহীন এক অরাজকতার শিকার যেন তিনি। জাহাজের অফিসার-ইঞ্জিনিয়াররা কেউ যেন তাঁর নয়। একমাত্র বিশ্বস্ত তাঁর এই নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত জাহাজিরা।

বোধ হয় কাপ্তান পিছিলে উঠে যেতেন। অন্তত তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসার ভঙ্গি দেখে মুখার্জির এমনই মনে হয়েছিল! তিনি ঘোর দুর্যোগে পড়ে গেছেন। দু-হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও এই অবিচল মানুষটিকে বোঝা যায় তাঁর রাশ আলগা হয়ে গেছে। অথচ তিনি পিছিলে ছুটে গেলেন না। ডেকছাদের নীচেই জাহাজিরা গা ঢাকা দিয়ে আছে টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

সবাই একে একে সরে পড়তে থাকলে, তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

মুখার্জি যাচ্ছেন না।

মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাপ্তানকে দেখছেন।

তাঁর সুন্দর চকচকে সাদা পোশাকে কিসের দাগ!

চার্লি কি কফির পেয়ালা ছুঁড়ে মেরেছে কাপ্তানকে। আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি! এই কি তবে সেই রিওয়ার্ড। কাপ্তান কি তবে চার্লির সেই নিশ্চিত ইভিল—কফির কাপ ছুঁড়ে মেরে বুঝিয়ে দিল!

না, মাথায় কিছু আসছে না। তবে সেকেন্ড কে? সে মুখোস পরে অনুসরণ করে কেন? কাপ্তানের চর! চর হলে এ-সময় তাকে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না কেন। চর হলে কেন তিনি তাঁর নাবিকদের সম্বোধন করলেন, লিসন মাই ফেইথফুল সেলরস, লিসন ক্লোজলি টু মাই প্রেয়ার…

প্রেয়ার কথাটাই বা বললেন কেন!

তাঁর আদেশ জাহাজে শিরোধার্য। সমুদ্রে ফাঁসির হুকুম দিলেও। তবে কেন তিনি চার্লি কিংবা সুহাসের পেছনে চর নিয়োগ করবেন। সুহাস যদি তাঁর পথের কাঁটা হয়, জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে পারেন। দেশেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। চার্লিকেও পারেন।

তবে পারছেন না কেন।

তাঁর এই কাতর প্রার্থনা কি যে করুণ! মুখার্জির নিজেরই খারাপ লাগছিল। চার্লি তাঁকে অসম্মান করতেই বা সাহস পায় কি করে! ইয়ো ক্রেজি ওল্ড গোট, ইয়ো স্টিঙ্ক—বাবাকে এভাবে কুৎসিত কথাবার্তা বলা কত অশোভন চার্লি বুঝবে না! চার্লি বুঝবে না, সে তার বাবাকে খাটো করলে নিজেই খাটো হয়ে যায়!

এটা কি কোনও আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে! অবদমিত আকাঙ্ক্ষার আগ্নেয়গিরি, লাভার

মতো বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে! চার্লির কাছ থেকে এমন অস্বাভাবিক আচরণ তিনি যেন কিছুতেই আশা করেননি। চার্লি কি মনে করে তার এই নিগ্রহের মূলে তার বাবা। এটাও তো ঠিক, চার্লিকে ছেলে সাজিয়ে রাখা কেন। কি দায় পড়েছে একজন পিতার, তার কন্যাকে অকারণে এই নিগ্রহের মধ্যে ফেলে রাখার! না তিনি কিছুই বুঝছেন না।

মুখার্জি পিছিলে ফিরে এলে সবাই ঘিরে ধরল।

সুরঞ্জন মেসরুমে ঢুকে গেছে। ভাণ্ডারিকে কিছু বলছে হয়তো। খাবার সব ঠাণ্ডা। গরম করেও নিতে পারে খাবার। তার ধারণা, সবার খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সে দেখল, খাবার প্রায় সব পড়েই আছে। কেউ খায়নি তবে। তার পছন্দ হচ্ছিল না, মুখার্জিদা বক বক করুক।

সে একবার সিঁড়ি ধরে নীচেও নেমে গেল। সুহাস নেই। খালি ঘর। সবাই ডেকে উঠে গেছে, সুহাস যায়নি কেন? সে বুঝতে পারছে না, সুহাস কোথায় থাকতে পারে! তার কি হয়েছে তাও জানে না। মুখার্জিদার দরজা ঠেলে দিতেই দেখল, সুহাস ক্ষিপ্ত। গজ গজ করছে। বলছে 'কারও সাড়া শব্দ নেই—না মুখার্জিদার না সুরঞ্জনের। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'উপরে চলে আয়। ওদিকে তোমার তামাসা জমে উঠেছে। পরে বলা যাবে। আমি যাচ্ছি। বংশীদা খেয়েছ?'

বংশী ঘাড় নেড়ে বলল, খেয়েছে।

উপরে উঠে বুঝল, মুখার্জিদাকে সবাই এখনও জেরা করছে। কাপ্তান চিৎকার করে কি বলছিল, জানতে চাইছে। মুখার্জিদা বেঞ্চিতে বসে বলছেন, 'তোমরাই আমার বিশ্বস্ত জাহাজি। বিপদে তোমরাই আমার সব।' কাপ্তান শেষ পর্যন্ত হাত তুলে যা হোক স্বীকার করলেন।

'এ-কথা কেন মুখার্জিবাবু?'

'তা তো জানি না।'

'চার্লি খেপে গেল কেন? কাপ্তান খেপে গেল কেন?'

সারেঙ ধমক দিলেন, 'মুখার্জিবাবু কি করে বলবেন কাপ্তান খেপে গেল কেন? কাপ্তান কি তাঁকে ডেকে বলেছেন, মুখার্জি চার্লি খেপে গেছে। পার তো আমাকে উদ্ধার কর। তোমরাও যা জান, তিনি তার চেয়ে বেশি জানবেন কি করে।'

সুরঞ্জন আর পারল না। খিদে পেলে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। মুখার্জিদা না এলে খেতেও পারছে না। অথচ মুখার্জিদা যেন মজা পেয়ে গেছেন—তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয়, জাহাজে এটা এমন কিছু ঘটনা নয়। যখন কিছুই তেমন ঘটনা নয়, তবে বকবক করছ কেন! দেরি করছ কেন? খেয়ে নাও। যেন খুবই লঘু চিত্ত। তিনি বললেন, 'আরে কি দেখতে কি দেখেছে!'

'না, মানে, ছোটসাব নাকি মেয়েদের পোশাকে বের হয়ে এসেছিল?' কয়লায়ালা হাফিজের খুব রগড়…'আমি শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ালে বখশিস দেবে?'—বলে সে লুঙ্গিটা মাথায় তুলে সবার সামনে কোমর দুলিয়ে ঘুরে গেল। সামনে সারেঙসাবকে দেখেই জিভ কেটে এক দৌড়।

জাহাজিদের মধ্যে বেশ রগড় জমে উঠেছে। বাপ ব্যাটার লড়ালড়ি বোঝো এবার! ঘরে ঘরে যে যার মতো কেচ্ছাও ছড়াচ্ছে। ওপরওয়ালারা বেইজ্জত হলে কে না খুশি হয়! বড় রকমের কোনও দুর্যোগের আভাস থাকতে পারে এর মধ্যে তারা ভাবতেই পারে না। চার্লি যে কিন্যার থেকে আকণ্ঠ মদ্যপান করে ফেরেনি—কিংবা কোনও নারী সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার আছে এমনও চাউর হয়ে গেল। কেউ তো বলল, 'সুহাসকে তো চার্লিই ফোকসালে দিয়ে গেছে। দু'জনেই টলছিল। জাহাজ হোমে ফিরছে না বলে খেপে ছিল, মদ্যপান করে ঝাল মেটাল।' কেউ বলল, 'সুহাসও কিনার থেকে ফিরেই শুয়ে পড়ল। ঘোড়া ল্যাং মেরেছে। আরে কার ল্যাং খেয়ে জব্দ কে জানে! মুখার্জিবাবু তো কাউকে ফোকসালে ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না।'

মুখার্জির কানেও উড়ো কথা ভেসে আসছে। তিনি গা করছেন না। জাহাজিদের তো কিছুই সম্বল নেই—এতে যদি মজা পায় পাক না। তিনি নীচে নামার মুখেই দেখলেন, সারেঙ হন্তদন্ত হয়ে পিছিল থেকে ছুটে আসছেন।

'মুখার্জিবাবু।'

তিনি ঘাড় ফেরালেন।

'মেজমালোম!'

'কোথায়?'

'কি বলছে বুঝতে পারছি না। মেজমালোম সুহাসকে খুঁজছে মনে হয়। আপনি দেখুন কথা বলে!'

মেজমালোম মানে সেকেন্ডমেট। এত রাতে এদিকে! সুহাসকেই বা খুঁজছে কেন! তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। দৌড়ে গেল, ইয়েস স্যার। বলুন।

সুহাসের নাম ঠিক বলতে পারছেন না। কেবল বলছেন 'দ্যাট ইয়াঙ সেলর—আই মিন সাঁস।'

'সাঁস নয়। সুহাস।'

'ইয়েস সাঁস!'

মুখার্জি আর ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা না করে বললেন, 'ওর তো শরীর ভাল নেই। নীচে যাবেন?'

'দিস ইজ দ্য মেসেজ।' বলে তিনি একটি খাম ধরিয়ে দিলেন। কার লেখা—কাপ্তান নিজে লিখেছেন। সারেঙকে ডেকে বললেই পারতেন। মেসেজ পাঠালেন কেন। আশ্চর্য তিনি—দেখলেন, নাম, এবং নীচে মাস্টার অফ দ্য শিপ লেখা। উপরে লেখা, আই নিড ইয়োর হেল্প। তারপর লিখেছেন, ওনলি এ ফুল ডেসপাইজেস হিজ ফাদার'স অ্যাডভাইস, এ ওয়াইজ সন কনসিডারস ইচ সাজেশান! চার্লিকে তুমি বোঝাও।'

'ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। ও খাচ্ছে।'

সেকেন্ডমেটকে চিরকুটটি ফেরত দিলেন না মুখার্জি। চার্লি কথা শুনছে না। চার্লি অবুঝ। চার্লি সুপুত্র নয়। এমন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদি সুহাস তাঁর পুত্রের মতিগতি ফেরাতে পারে। তাঁর হাসি পাচ্ছিল। এত কাণ্ডের পর একজন সাধারণ জাহাজির কাছে এতটা নতি স্বীকারও কেমন খারাপ লাগল। সুহাস গিয়ে কি করবে। সুহাসকে একা ছেড়ে

দেওয়াও যায় না। এটা আদেশের পর্যায়ে না পড়লেও পরোক্ষে যেন তিনি সুহাসকে এখুনি যেতে বলছেন। বাবা হয়ে মেয়ের কাছ থেকে কি করে পুত্রের আচরণ আশা করেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। খুবই রহস্য।

নীচে নেমে দেখলেন আবার ভিড়। এত খারাপ লাগে—নানা প্রশ্ন, 'সেকেন্ডমেট পিছিলে কেন এসেছিলেন, কাকে খোঁজাখুঁজি করছেন, কে সে!'

তিনি সোজাসুজি বললেন, 'সুহাস। সুহাসকে কাপ্তান তাঁর কেবিনে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

কথাটা শুনেই সুহাস বলল, 'আমাকে?'

'হ্যাঁ তোমাকে।'

সুরঞ্জন বলল, 'ছেলে বদমাইসি করল, আর টানাটানি সুহাসকে নিয়ে।'

মুখার্জির কিছু ভাল লাগছে না।

'আরে মিঞারা এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন। এখানে কি তামাসা! সার্কাসও নয়। জন্তু জানোয়ারও উঠে আসেনি। যাও।' বলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। সুরঞ্জনকে সব খুলে বললেন। বসে পড়লেন। মাথাটা তাঁর বেশ ধরেছে। বসে কপাল টিপছেন। কোনও কথা বলছেন না।

সুরঞ্জন বলল, 'ভেঙে পড়লে চলবে! কিছু বলো!'

সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রেডি হয়ে নে। আজ কপালে আমাদের দুর্ভোগ আছে। এই অধীর ওর জুতো পালিশ করে দে তো। মোজা ভাল না থাকলে, বের করে দিচ্ছি।' বলে তিনি আলমারি খুলে একটা পাট করা সাদা শার্টও বের করে দিলেন।'

সুরঞ্জন বলল, 'আমার তো মনে হয় কাপ্তানকে সব খুলে বলা দরকার।'

'কি খুলে বলবে?' চোখমুখ কুঁচকে গেল মুখার্জির।

'এই যে জাহাজে যা যা ঘটছে!'

'কি ঘটছে?' মুখার্জি বিরক্ত।

'তাহলে বলা উচিত হবে না?'

'না।'

'কিন্তু আজকে যা ঘটল?'

'না, তাও না!'

সুরঞ্জন সুবিধে করতে না পেরে বলল, 'যা খুশি কর, আমার কিছু বলার নেই। আরে তিনিই তো সব। তিনি জানবেন না! এমন তো নয়, আমরা তাঁকে নালিশ দিতে পারি।'

মুখার্জি কেমন নিরাশ। তিক্ত গলায় বললেন, 'তোর দেখছি সত্যি মাথাটা গেছে। চিরকূটে কি লিখেছেন! দেখার পরও বলছিস আজকের ঘটনা তাকে বলা দরকার। চার্লি কি জানে না! বলার দরকার থাকলে সে-ই বলবে! আর যাই করুক চার্লি সুহাসের কোনও ক্ষতি হয় এমন কাজ করতে পারে না। যদি মনে করে সুহাসের কিংবা তার ঘোর বিপদ সামনে তবে দরকারে বলতেই পারে। আবার বলতে নাও পারে। চার্লি তার বাবাকে নির্ভরযোগ্য না মনে করে বলতে যাবে কেন! নিশ্চয়ই কোনও অশনি সংকেত দেখা দিতে পারে বললে।

সুহাস জোর পাচ্ছে না। সে সেজেগুজে বসে থাকল। তার যেন উঠতে ইচ্ছে করছে

না। কোমরে ব্যথাটা আছে। ঘাড়েও। সত্যি যেন ফ্যাসাদে পড়ে গেছে।

সুরঞ্জন খেপে গিয়ে বলল, 'হয়েছে ভাল, মেয়ে আর বাবা দু'জনেরই এক কথা— আই নিড ইয়োর হেল্প। জাহাজে আর কাউকে পেলি না। সেদিনের ছেলে, সে তোদের কতটা সাহায্য করতে পারে!'

সুহাস উঠে দাঁড়ালে, মুখার্জি বললেন, 'অধীরকে ডাক সুরঞ্জন। তুই, অধীর বোটডেকের দুই সিঁড়ির আড়ালে বসে পাহারা দিবি। অধীর ফরোয়ার্ড ডেকের দিকে, আর তুই আফটার ডেকের দিকে। সুহাস কাপ্তানের কেবিন থেকে বের হলে লক্ষ রাখবি।'

সুহাসের মুখে ব্যাজার হাসি—'আমার কি ফাঁসি হবে! যা করছ! যেন আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারার মতলব আছে কাপ্তানের।'

মুখার্জি বললেন, 'কাপ্তানের না থাক, আর কারও থাকতে পারে। মার খেয়েও লজ্জা হয় না। এক ঘুষিতে কাত। পাল্টা ঘুষি চালাতে পারলি না। শেষে এক অবলা তোকে উদ্ধার করে নিয়ে এল!'

সুহাস বের হবার মুখে বলল, 'আচমকা সবাই মারতে পারে কিছু বুঝে ওঠার আগে। কে কতটা সাহসী আমারও জানা আছে।'

কিছুটা তুচ্ছ করতে শিখছে—এটা ভাল। মুখার্জি এমন ভাবলেন। অন্তত সুহাস নিজেকে সামলে নিয়েছে।

মুখার্জি বললেন, 'গ্যাঙওয়েতে থাকব। সুরঞ্জন বিপদের গন্ধ পেলে দেরি করবি না। আমিও বোটডেকের নীচে আছি।'

সুহাস বোটডেকে উঠে গেল। কাপ্তানের কেবিনের পাশে চিফমেট সেকেন্ডমেট অপেক্ষা করছেন। সে ঢুকেই অভিবাদন করল। তার গলা শুকিয়ে উঠছে। বুক কাঁপছে। কিন্তু সে যতটা পারছে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। তিনি কি বলবেন সে জানে না। কেন ডেকেছেন তাও জানে না। যদি আজকের ঘটনার কথা জানতে চান, কিংবা চার্লি যা বলেছে তা কতটা ঠিক, কতটা কি গোপন করেছে—এসব কারণেও ডাকতে পারেন। সে দেখল, তিনি পিছন ফিরে বসে আছেন। সাদা হাফশার্ট হাফ প্যান্ট পরনে—ঘরে বিশাল র‍্যাক, ভারী ভারী সব বই, নীল রঙের ক্যালেন্ডার—সাদা বিছানা, সবুজ সোফা, লাল কার্পেট, মাথার উপরে যিশুর মূর্তি। ফুলদানিতে গোলাপ গুচ্ছ।

তিনি তার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'গড্ ব্লেসেস গুড ম্যান, অ্যান্ডকনডেমস্ দ্য উইকেড। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। চার্লি আজ আবার অস্বাভাবিক আচরণ করছে। কেন করছে জানি না। তুমিই পার তাকে সামলাতে। আমি অন্তত তাই বিশ্বাস করি। দ্যাখ তাকে স্বাভাবিক করে তুলতে পার কি না! চেষ্টা করতে আপত্তি কি!'

সুহাস ফের অভিবাদন জানিয়ে বের হবার মুখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার দিকে তাকালেন না। চাবিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে আটকে রাখা হয়েছে। কি অবস্থায় আছে জানি না। দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছি না। দ্যাখ সে আবার যেন কেবিন থেকে ছুটে বের হয়ে না যায়। চার্লি তোমাকে পছন্দ করে। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। চার্লির কোনও ক্ষতি হয় নিশ্চয়ই তুমি চাও না। আমিও চাই না। আমাদের দু'জনেরই এ-জায়গাটায় দুর্বলতা আছে।' বলে তিনি দরজার কাছে এসে চিফমেট সেকেন্ডমেটকে

ইশারায় চলে যেতে বললেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

শেষে আবার সেই বোটডেকে সে একা। বোটডেকের আতঙ্ক এক নারী—যে রাতে, কিংবা রাত সুনসান হয়ে গেলে রেলিঙে চুপচাপ গোপনে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যে বরফঘরের ভূত নয়, সে যে চার্লি, আজ আর সুহাসের বিশ্বাস করতে কোনও দ্বিধা থাকল না। ছদ্মবেশের খোলস চার্লির বোধ হয় অসহ্য ঠেকত। তাকে দেখার জন্য অস্থিরও হয়ে পড়তে পারে। কতকাল থেকে চার্লি তার কাকছে বুনো ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে যে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। পারেনি। যার জন্য ফুটে থাকা নিভৃতে, সেই যদি দৌড়ে পালায় ক্ষোভ জ্বালায় ছটফট করতেই পারে, ভুতুড়ে কাণ্ড ভাবে, তবে অপমানে জ্বলে উঠতেও পারে।

চার্লির কোনও দোষ নেই।

কেন যে মনে হল, চার্লি বড় নিঃসঙ্গ একা। এবং কিছুটা বোকা। সে তো মুখ ফুটে বলতে পারত, মি গার্ল সুহাস। সে কেন স্বীকার করতে না। চার্লি বোটডেকে গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থেকে যে তাকে আতঙ্কে ফেলে দিত তখন বুঝতে পারত না।

সে ব্রিজে দেখল, কেউ নেই। কোথাও থেকে আচমকা কেউ নেমে এলে প্রস্তুত থাকা ভাল। কিনারায় ঘর বাড়ির আলো—পাহাড়ের ও-পাশে কোম্পানির শহর—সেখান থেকেও আলোর উৎস উঠে আসছে পাহাড়ের মাথায়। চিমনির পাশের আলোটা বাতাসে দুলছে।

সে চাবিটা হাতে নিয়ে দেখল। তার তাড়াতাড়ি চার্লির কেবিনে ঢুকে পড়া দরকার। তবে সে জানে, সুরঞ্জন অধীর সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে। নীচের কেবিনগুলো থেকে কেউ বের হলে তারা দেখতে পাবে। কেবল এলিওয়েয়ের সিঁড়িটায় তারা নজর রাখতে পারবে না। ওটা ভিতরের দিকে। এলিওয়ে থেকে সিঁড়িটা বোটডেকে উঠে এসেছে। সাহেব-সুবোরা এই সিঁড়িটাই বেশি ব্যবহার করেন। সে সে-দিকটায় নিজেই নজর রাখছে।

ইস কি করেছে!

পায়ের নীচে সব কাচ ভাঙা কাপ প্লেট ডিস জলের গ্লাস—ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চাদর তোয়ালে, কাটা ছেঁড়া ম্যাট্রেসের ছড়াছড়ি। দরজার সামনে যাওয়াই কঠিন। সে নিচু হয়ে ম্যাট্রেস সরিয়ে দেবার সময় দেখল, ফালা ফালা করে কেটে ফেলেছে ম্যাট্রেসটা। আর তখনই ঘাড়ের উপর কার নিঃশ্বাস।

সে চমকে গেল।

সে অতর্কিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখল, কাপ্তানবয় সামনে। তাকে ইশারায় কোথাও যেতে বলছেন।

কতদূর যেতে হবে বুঝতে পারল না সুহাস। কাপ্তানবয় বুড়ো মানুষ। তিনিও যেন ভাল নেই। তার চোখমুখ দেখে সুহাসের এমনই মনে হল।

'কিছু বলবেন!' খুব সতর্ক গলায় কথাটা বলল সুহাস। কেউ যেন শুনতে না পায়। এত রাতে মানুষটার জেগে থাকাও বিচিত্র ব্যাপার।

যাই হোক সুহাস সব শুনে আশ্বস্ত হল। খারাপও লাগছে।

কাপ্তানবয় বললেন, 'আমি আছি। ছোটসাব কিছুই খায়নি। কোন সকালে খেয়ে বের হয়েছেন, মুখে কিছু দেওয়াই গেল না। যদি পারেন, ওকে কিছু খাইয়ে যাবেন। যখন যা দরকার বলবেন। চিমনির আড়ালে আমি আছি। ডাকলেই পাবেন।

উনিশ

ভাঙা কাচ, ছুঁড়ে ফেলা জামা-প্যান্ট ডিঙিয়ে সুহাস চার্লির দরজার সামনে চলে গেল। দরজায় কান পাতল। যদি কোনও সাড়া পাওয়া যায়। না, ভিতরে একেবারে সে চুপ। ভিতরে সে নড়াচড়া করছে না। দরজা খুলে কি দেখবে তাও জানে না। চার্লি যদি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকে! কাপ্তান যদি কন্যার ছদ্মবেশ ধরা পড়ায় খুনটুন করে ফেলে রাখেন! কত রকমের বীভৎস চিন্তা যে মগজে জট পাকিয়ে তুলছে।

দরজা খুলতেই ভয় পাচ্ছে সে।

তার হাত কাঁপছিল।

লক খুলে ধীরে ধীরে দরজা ফাঁক করতেই অবাক—এ কি ঘরে যে কেউ নেই। সে ছুটে পালাবে ভাবছিল, আর তখনই দেখল নীল কার্পেটে দু-খানি পা দেখা যাচ্ছে। মাছরাঙার মতো সুন্দর লাল নীল রঙের কোনও উর্বশীর পা। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক পা বাড়িয়ে সে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করবে তারও যেন সাহস নেই। চার্লির যদি কিছু হয়—তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। খাটের আড়ালে চার্লি পড়ে আছে। ভিতরে ঢুকলে কি দেখবে কে জানে!

তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সে জোর পাচ্ছে না। তবু কোনও রকমে দরজা লক করে খাটে ভর করে দাঁড়াল। পা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তারপর কি ভাবে পড়ে আছে চার্লি সে জানে না। দরজা খোলার পর তো চার্লির উঠে বসার কথা। তার ঘরে কে ঢুকে গেছে—সে কে দেখবে না! তাহলে কি চার্লির হুঁশ নেই। চার্লি নিজেই কিছু করে বসেনি তো। ক্ষোভে দুঃখে, অভিমানে কিছু একটা করে বসতেই পারে।

সে জোরে শ্বাস ফেলল। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সে চোখ বুজে আছে। আতঙ্কে। কি না শেষে দেখতে হয়!

আতঙ্ক—কাপ্তান তাকে কেন পাঠাল। চার্লি যদি খুন হয়। তাকে যদি তিনি জড়িয়ে দিতে চান। দৌড়ে পালাবে কি না তাও ভাবছে। তারপরই মনে হল, না সে পালাতে পারবে না। চার্লিকে ফেলে সে কোথাও যেতে পারবে না। খুন হলেও না। চার্লি নিজে কিছু করে বসলেও না। তাকে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দিলেও না।

আরও কত কথা যে মনে হচ্ছে। জাহাজডুবির পর কোনও জলমগ্ন নারীকে সে উদ্ধার করার জন্য যেন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। খাটের ওপাশে লম্বা হয়ে পড়ে আছে চার্লি। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখ আড়াল করা। সে পাশে গিয়ে বসল। তার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছে—কেন চার্লির সাড়া শব্দ নেই, কেন চার্লি উঠে বসছে না।?

সে ডাকল, 'চার্লি।'

সে আর পারছে না। মুখের কাছে হাত নিয়ে গেল। হাত তার কাঁপছে। সে শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠা নামা টের পেল শরীরে। মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল। পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল চার্লিকে।

চার্লি তাকে অপলক দেখছে!

চার্লি তাকিয়েই আছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, 'সুহাস এত রাতে তার

কেবিনে ঢুকে যেতে পারে। কি করে ঢুকল, কি ভাবে! দরজা লক করা বাইরে থেকে। চার্লি ফের চোখ বুজে ফেলল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সুহাস চার্লিকে ঝাঁকিয়ে বলতে থাকল, 'চোখ বুজে ফেললে কেন। আরে আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না! দ্যাখ, এই, এই।' চার্লি সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। উঠে বসল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

সুহাস স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মেয়েরা কান্নাকাটি করলে কি ভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় সে জানে না। সে বসে থাকল বোকার মতো। কেবিনের এ কি লণ্ডভণ্ড অবস্থা! আলমারি খোলা। ভিতর থকে যা পেয়েছে হাতের কাছে, সব ছুঁড়ে ফেলেছে। খাটের বিছানা চাদর বালিশ সব। তারপর দরজা লক করে দিয়ে গেলে, সে কাঁদতে কাঁদতে কখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না। সে কিছুতেই হাঁটু থেকে মুখ তুলছে না। আজ সে প্রসাধনও করেছিল বোঝা যায়। সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেও, সে তার দামি গাউন, স্কার্ট, ফারের কোটে হাত দেয়নি।

সুহাস ভাঙা-ফ্রেম ছবি এবং যত্রতত্র ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে থাকল। দরজার বাইরে এসেও জামা প্যান্ট কোট সব তুলে নিল। আলমারির ভিতর ভাঁজ করে রেখে দিল। আসলে সে চায় চার্লি স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। চার্লি যে খুবই বিশ্রী কাণ্ড করে বসে আছে টের পাক।

ঘরের ভিতরও এখানে সেখানে কাচের টুকরো পড়ে আছে। চার্লির খালি পা, হাত পা কাটতে পারে। সে না বলে পারল না, 'ওঠো। দ্যাখ, আরে করছ কি, হাত পা যে কাটবে! খাটে বোসো। আগে সব জড়ো করে বাইরে নিয়ে যাই—নীচে কিন্তু এখন নামবে না।'

চার্লি খাটে উঠে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ভাঁজ করে বসে থাকল। যেন ঘরের আসল মানুষটি ঘরে ফিরে এসেছে। আর তার ক্ষোভ নেই। সে যা বলবে তাই করবে।

'যাও হাত মুখ ধোও। কি ছিরি হয়েছে মুখের দেখেছ?'

চার্লি উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। চোখে মুখে জল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখও দেখল।

সুহাসের এক দণ্ড সময় নেই। সে তার ঘাড়ের ব্যথাও যেন আর টের পাচ্ছে না। দরজা খুলে বের হবার সময়ই চার্লি ছুটে এল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ সুহাস!' এই প্রথম কথা বলল চার্লি। যেন তাকে একা ফেলে রেখে গেলে সে ভয় পাবে। অবোধ বালিকার মতো আবদার, 'না তুমি কোথাও যাবে না।'

'আরে যাচ্ছি না। কি করে রেখেছ কেবিনটা। সব তো ছুঁড়ে-ফুঁড়ে তেজ দেখালে। রাতে শোবে কিসে! আসছি।' বলে সে দরজা বন্ধ করে চিমনির আড়ালে চলে গেল। কাপ্তানবয় উইন্ডসোলে হেলান দিয়ে বসে আছে, হয়তো সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। সুহাস তাড়াতাড়ি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'চাদর বালিশ ওয়াড় দিন। ম্যাট্রেস আজকের মতো চালিয়ে দিচ্ছি। কাল পাল্টে দেবেন।' বলেই এক দৌড়ে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল। চার্লিকে বলল, 'আমি এখানেই। ওদিকে পোর্টহোলে কিছু ছুঁড়ে ফেলনি তো! তোমার যে কি হয় বুঝি না! বাবাকে এ-ভাবে কেউ গালাগালি করে। তিনি তোমার গুরুজন

না!'

সুহাস চার্লির কেবিনে ফের ঢুকে গেলে কাপ্তানবয় বাইরে সব রেখে গেল। চাদর বালিশ ওয়াড়। সুহাস সব তুলে নিয়ে এল। দরজা খোলা রাখতে পারছে না, যদি সে টের পেয়ে যায়, চার্লি মেয়ে—তবে আর এক কেলেঙ্কারি। কাপ্তানের কি করে এত বিশ্বাস তার উপর সে কিছুই জানে না! না কি সে জানে, তার কাছে চার্লি ধরা দিয়েছে। বিশ্বস্ত থাকার মূল্যও কম না—এমনই মনে হল তার। কি যে জাঁতাকলে পড়া গেল। আগে চার্লি, তার বাবা ছিল জাঁতাকলে, এখন সেও জড়িয়ে গেল! এর কি পরিণাম তাও বুঝতে পারছে না। চার্লির আচ্ছন্ন ভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যে তাকে ভিড়িয়ে দেওয়া এটা বুঝতেও তার অসুবিধা হচ্ছে না। এখন ভালয় ভালয় চার্লিকে স্বাভাবিক করে তুলতে না পারলে ঘোর বিপদে পড়ে যেতে পারে।

যে চার্লির টেবিল পরিস্কার করে সাদা চাদর বিছিয়ে দিল। চিনে মাটির জগে জল রাখল। প্লেটে খাবার ঢাকা। প্লেট সাজিয়ে বলল, 'খেয়ে নাও চার্লি। খাওয়া নিয়ে রাগ করতে হয়! জানো তো আমার বাবা বলতেন, বোকারা রাগ চেপে গেলে না খেয়ে থাকে। আমার বাবা জানো রোজ নদীতে স্নান করেন। নদীতে স্নান করলে পুণ্য হয় জানো। দুমাইল রোজ হেঁটে যান নদীতে স্নান করবেন নলে—তোমার ঠাকুরদা কত দূর দেশে চলে গেছেন, বুনো ফুল খুঁজতে। আমার বাবা কত নদীর মোহনায় গেছেন ডুব দিতে। আসলে জীবনে সবাই পুণ্য অর্জন করতে চায়।'

সে চার্লির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এস খাবে। বোসো। তোমাকে খাইয়ে আমিও যদি কিছুটা পুণ্য অর্জন করতে পারি' বলে হাসল সুহাস। চার্লি খেতে বসে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'আচ্ছা এ-ভাবে কান্নাকাটি করলে ভাল লাগে! কাল আমরা আরও দূরে চলে যাব। আমাদের দেখতে হবে না দ্বীপের আর কোথায় তোমার ঠাকুরদা বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন! সব কি আমাদের দেখা হয়েছে, তুমিই বল। তুমি এত সুন্দর তোমার ঠাকুরদার পুণ্যফলে বোঝো না। তোমার কি মাথাগরম করা সাজে। এতে তোমার ঠাকুরদা খাটো হয়ে যাচ্ছেন না!'

'আমরা কিন্তু সারাদিন ঘুরে বেড়াব!' সেই এক অবোধ আবদার যেন বালিকার। চার্লি তাকিয়ে আছে।

'নিশ্চয়। আসুক না সেই লোকটা মজা দেখাব।'

চার্লি ফের শক্ত হয়ে গেল। মুখ তার কঠিন হয়ে গেল।

এই রে এ-সময় বোধ হয় এসব কথা বলা ঠিক হল না। সে বলল, 'জান, ফিল বলে এখানে একটা লোক আছে, সে নাকি সেই 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' জাহাজের কিপার অফ দি রেক হয়ে আছে। তার ওখানেও না হয় দরকারে ঘুরে আসা যাবে। আমাদের মুখার্জিদার সঙ্গে খুব ভাব। দ্বীপের আসল কর্তা নাকি তিনি। তাঁর খুব প্রভাব দ্বীপে। তাঁর ঘরে বিশাল সব কাচের জারে প্রবাল পাহাড়ের নানা রঙের ছবি। বিশাল হলঘরে ঢুকলে নাকি মনে হয় সমুদ্রের তলদেশে ঢুকে যাচ্ছে সবাই। এ কি খাচ্ছ না কেন? খাও। ইচ্ছে করলে আমরা কাল সমুদ্রের তলদেশেও ঘুরে বেড়াতে পারব।'

'তুমি খেয়েছ!'

'কখন!'

'ঘাড়ে খুব লাগেনি তো! কাছে এস।'

সুহাস কাছে গেলে বলল, 'ফুলে আছে দেখছি।'

'তা থাক। তুমি খাও।'

'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না! এত খেতে পারব না। তুমি আমার পাশে বোসো।'

কে বলবে এই চার্লি কিছুক্ষণ আগে তার বাবাকে কটুকথা বলেছে। কি হয়েছিল! চার্লি তার বাবার উপর এত খেপে গেল কেন? কি কারণ? সে তো ফেরার সময় থেকেই ফুঁসছিল। চার্লিকে কত কিছু প্রশ্ন করার আছে। ওর কাকা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। কোন জাহাজ! কোন সমুদ্রে! চার্লি কখনও তার শৈশবে কোনও বুড়ো মানুষের মুখ দেখে ভিরমি খেয়েছিল কি না, আততায়ী যদি সে-সব খবর রাখে! সে ভিরমি খেলে, কি খুঁজত আততায়ী! তার শরীর। চার্লিকে তার ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছে, যদি তাই হয় তবে কাপ্তান তাকে জাহাজে নিয়ে উঠেছেন কেন। অপহরণের ভয়ে! চার্লির আর দিদিরা কোথায় থাকে? তার ভাইদের খবরও মুখার্জিদা নিতে বলেছেন। অ্যালেন পাওয়ার সম্পর্কেও। কিন্তু সুহাসের যে কি হয়—এখন তাকে এ-সব প্রশ্ন করা যায়?

বরং চার্লি যে তার শৈশব ফেলে এসেছে তার টুকরো টুকরো ছবির কথা মনে করিয়ে দিলে সে খুশি হবে।

চার্লি কাঁটা চামচে মাংসের টুকরো মুখে দিচ্ছে। ম্যাস্ট পটেটোজ চামচে তুলে মুখে দিচ্ছে, কখনও কাঁটা চামচে মাংসের টুকরো মুখের কাছে এনে তাকিয়ে থাকছে। খাবে কি না যেন বুঝতে পারছে না। আসলে চার্লি এখনও অন্যমনস্ক। সে বোধ হয় কিছু বলতে চায়—অথচ বললে যদি সুহাসের বিপদ হয়, কিংবা এমন কোনও প্রিয়জনের বিপদ হতে পারে সে যা চায় না। অন্ধকূপের মধ্যে পড়ে সে যেন বের হয়ে আসার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চার্লিকে মুখোসটার কথা বলা যেত। সে বলতে পারত, ববের কাজ। মগড়াও উঁকি দিয়েছে। দড়িরও খোঁজ পাওয়া গেছে। কে আততায়ী মনে হয় শিগগিরই ধরা পড়বে। আসলে ডেরিক ফেলে আমাকে সরিয়ে দেবারই চক্রান্ত ছিল। টব রেখে, ডেরিক ফেলে শেষে আচমকা আক্রমণ করে—তবে আমি আর আগের মতো ভীতু নই। মুখার্জিদা যা বলছেন, ঠিক মিলে যাচ্ছে। জাহাজে সবার আগে মগড়া টের পায় তুমি মেয়ে। তারপর মুখার্জিদা, আর কে অবশ্য জানি না। সেকেন্ড হতে পারে—তবে মুখার্জিদা এখনও সেকেন্ডকে জড়াতে পারছেন না বোধ হয়। বিকৃত রুচি থেকেও হতে পারে। কিন্তু গিরগিটি গোঁফের লোকটা যে আবার কোথা থেকে উদয় হল।

তার কি মোটিফ—সে কি জাহাজেরই কেউ! তুমি সব খুলে না বললে জানাও যাবে না। মুখার্জিদা বার বার বলছেন, চার্লিকে নিয়ে বসা দরকার। আরও যে বিপদ সামনে তাও টের পেয়েছেন। ফিলের কাছেও গেছেন।

'তুমি কি ভাবছ বল তো! কি ভাবছিলে?'

'আরে না কিছু না। তুমি খাও।' বলে সুহাস নিজের অন্যমনস্কতা আড়াল দেবার

জন্য বলল, আমাদের তো স্টিফ গোল্ডারউড দেখাই হল না। তুমি বলেছিলে না, ফুলগুলি দলা-পাকানো তুলোর মতো দেখতে। লাল নীল সবুজ হলুদ ফুলে গাছ ছেয়ে থাকে। নানা বর্ণের কাচপোকা ওড়াউড়ি করে বলছিলে। প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে বেড়ায় তার উপর! বিচিত্র বর্ণের সব প্রজাপতিতে গাছটা এত ঢাকা থাকে আসল ফুল খুঁজে বের করাই কঠিন বলেছিলে। ও দারুণ মজা হবে খুঁজে বের করতে পারলে। বুনো ফুলের এই সৌরভে পাখিরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে বলছিলে। যদি খুঁজে পাই না, বীজ তুলে নেব। আবার যে দ্বীপে যাব, তুমি আমি সেই বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেব। কি মজা হবে না। জানো, বুনো ফুলের গন্ধ থাকে আমি জানতামই না। মুখার্জিদাই বললেন, থাকে। তুই টের পাস না। মুখার্জিদা এত সব টের পায় কি করে বুঝছি না।'

যেন অবাধ্য শিশুটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। অন্তত সুহাসের আচরণে তাই প্রকাশ পাচ্ছিল। সেও যে কেন এত আগ্রহ বোধ করছে, পেট না ভরলে যেন সেই আধপেটা খেয়ে থাকছে।

চার্লি মাথা নিচু করে আবার ডাকল, 'সুহাস!'

'বল।'

'আমরা কোথাও যদি চলে যাই।'

'কোথায়?'

'কোথাও। আমি তো তোমার সঙ্গে থাকছি। ভয় পাবে?'

'ধুস তুমি থাকলে ভয় পাব কেন।'

'আমরা অনেক দূরে চলে যাব। কেউ জানবে না সুহাস। তুমি যাবে তো!' চার্লি তার দিকে তাকাচ্ছে না। প্লেটের খাবার ঘাঁটছে চামচে।

'নিশ্চয়ই যাব। তুমি বললে না গিয়ে পারি! আমার আর কে আছে?'

'আমারও তো আর কেউ নেই।'

'কেন তোমার বাবা!'

চার্লি মাথা নিচু করে বসে থাকল।

'আরে কি হল! খাও। বললাম তো যাব।'

তারপর চার্লি নিজের মনেই যে বকছে, 'গড সেভ মি। দ্য ফ্লাডস হ্যাভ রাইজেন। ডিপার অ্যান্ড ডিপার আই সিঙ্ক। আই অ্যাম একজস্টেড।'

সুহাস শুনতে পাচ্ছিল না। কেমন বিড়বিড় করে বকছে চার্লি। সুহাস মাথায় হাত রেখে বলল, 'অকারণ কেন কষ্ট পাচ্ছ বলো তো! আমরা তো আছি। তুমি সব খুলে না বললে বুঝব কি করে। তুমি একা নও। তুমি বিশ্বাস কর, তুমি একা নও। আমরা আছি না! খাও। ভেব না।'

চার্লি সুহাসের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল—তারপর চামচ দিয়ে খাবারগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকল।

'তুমি একা নও, বলছি তো। বিশ্বাস করতে না চাও, দেখবে, সবাইকে ডাকলে এক্ষুনি চলে আসবে। আমি জানি তোমার উপর প্রচণ্ড নিগ্রহ চলছে। কেন এই নিগ্রহ, আমরা তো কিছুই জানি না চার্লি। না জানলে—কি করে বুঝব, তোমার জন্য আমাদের কি করা

দরকার। দেখছ না তোমার বাবা পর্যন্ত বলছেন, মাই ফেইথফুল সেলর…'

'সুহাস,…চার্লি তার দিকে তাকাল। যেন বুঝতে চাইছে, সুহাস সত্যি তাকে স্তোকবাক্য বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে কি না, না পরম আন্তরিকতা থেকে তাকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে।

কি বুঝল কে জানে—সুহাসের চোখে যে আর্তি ফুটে উঠেছে, এতে সে বোধ হয় কিছুটা সহজ হতে পারছে। বলল, 'আই অ্যাম ওনলি উইপিং অ্যান্ড ওয়েটিং ফর মাই গড টু অ্যাক্ট।'

'তোমার ঈশ্বর আশা করি তোমাকে রক্ষা করবেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমার পাশে সব সময় থাকবেন। তুমি খাও। তুমি না খেলে যে আমি শান্তি পাচ্ছি না, এটা তুমি বুঝতে পার না! তুমি না খেয়ে থাকলে আমিও আর জলগ্রহণ করব না বলছি। খাও।' সুহাস ধমক দিল।

এমন কথায় চার্লি যেন আরও ভেঙে পড়ল। হাউ হাউ করে কাঁদছে—বলছে, 'সুহাস আই ক্যান নট ইভিন কাউন্ট অল দোজ হু হেট মি উইদাউট কজ। দোজ হু প্লট টু পানিস মি, দো আই অ্যাম ইনোসেন্ট। দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি পানিসড্ ফর হোয়াট আই ডিড নট ডু।'

'তুমি কোনও দোষ করনি, তবু তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। কেন! তুমি অকপট হও চার্লি। কে সে গিরগিটি গোঁফের লোকটি, কে সে? সে কেন মিশনে হিপনোটাইজ করছিল একজন নাবিককে? নাবিকটিকে তুমি চেন? তাকে তো আমরাও জাহাজে দেখিনি। এক গাল দাড়ি লোকটার! দূর থেকে বোঝারও উপায় ছিল না। সে কি ম্যাক! ফলস দাড়ি গোঁফ পরে লোকটির বান্দা হয়ে গিয়েছিল! আমাদের উচিত ছিল ডায়াসের কাছে যাওয়া। এত ভড়কে গেলে, কিছুতেই কাছে যেতে দিলে না। হাত ধরে টানতে টানতে মিশন থেকে বের করে আনলে।

চার্লি কিছু বলছে না। কাঁদছে আর খাচ্ছে। সে না খেলে সুহাস জলগ্রহণ করবে না ভয়েই যেন গিলছে। প্রচণ্ড বিষম খেল খেতে গিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে খেলে বিষম তো লাগবেই। সে কাশছিল। মুখের খাবার ছড়িয়ে পড়ছে। সুহাস তাড়াতাড়ি মুখের কাছে জলের গ্লাস নিয়ে গেল। বলল, 'শিগগির জল খাও। নাও হয়েছে—আর খেতে হবে না।' বলে, সে এঁটো বাসন টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বের করে রাখল। চাদরও বাইরে বের করে দিল। দরজা সামান্য ফাঁক করে পিঠে ঠেস দিয়ে প্লেট ডিস সব রেখে দিল। সুহাস জানে, কাপ্তানবয় সব নিয়ে যাবে।

সুহাস বলল, 'ওঠো।'

রুমালে মুখ মুছে চার্লি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারছে না। খুবই ভেঙে পড়েছে। সুহাস তাকে ধরে নিয়ে গেল বিছানার দিকে। সে শুয়ে পড়লে, পা দুটো তুলে গায়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। পাশ ফিরে শুয়ে আছে চার্লি। তাকে একা ফেলে রেখে যেতেও মন চাইছে না। শিয়রে বসে, আশ্বাস দেবারা চেষ্টা করল, 'তুমি যে বলতে হি প্রটেক্টস। তোমার সব বিশ্বাস তছনছ হয়ে গেল কি করে! তোমাকে শাস্তি দিলে রক্ষা পাবে সে! তুমি তো বলতে, হি উইল সেভ ইয়ো ফ্রম ইয়োর এনিমিজ।'

চার্লি সুহাসের দু হাত জড়ো করে নিল বুকের কাছে। বলল, 'আই নো, হি প্রটেক্টস।

আই নো পাওয়ার বিলঙস টু গড। আই ট্রাস্ট ইন দ্য মার্সি অফ গড ফরেভার অ্যান্ড এভার।'

'তবে তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ কেন বুঝি না। তোমার বিশ্বাসের দাম থাকবে না! তোমার কেউ কখনও ক্ষতি করতে পারে বল!'

চার্লি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক হয়ে গেলেই চার্লির মধ্যে বোধহয় সাহস ফিরে আসে। সে সহজ হয়ে যায়। সরল অকপট কথাবার্তা। তখন সে শরীরে তার শক্তিও ফিরে পায়।

সুহাস ইজেলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আবার দেখছি সেই মুখের ছবি আঁকছ—কি ব্যাপার বল তো! পর পর মুখের ছবি।' চার্লি এক টানে আরও কটা নিখুঁত মুখ এঁকে ফেলল। মুখগুলি পিনে গেঁথে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল।

'তুমি চেনো একে?' চার্লি একটু সুরে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।—এ কে, এ কে? এই লোকটা কে!

পিছু পিছু সুহাসও। চার্লি যেন প্রদর্শনী করছে।

সুহাস সব ছবির মুখই চিনতে পারছে। সব অফিসার ইনজিনিয়ারদের মুখ। শুধু একটা মুখ ঠিক চিনতে পারছে না। মুখটা কার বুঝতে পারছে না। নিউপ্লিমাউথে এই মুখের ছবিটাই বোধহয় আঁকতে চেয়েছে। বার বার কেন একই মুখ, একই ছবি। চার্লি কেন এ-ভাবে একটি মুখে এত রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে!

সে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চার্লি তার রঙের বাক্স বের করে পাশের টেবিলে সাজিয়ে রাখছে।

'তুমি চিনতে পারছ না?'

কথা বলছে চার্লি আর কাজ করছে। কাপে জল নিল। তুলি ভেজাল। চার্লি কি করতে চায়, কেন এত রাতে ওই পাগলামি, সে কিছুটা বিব্রত। অস্বস্তিও। কোনও রকমে চার্লিকে স্বাভাবিক করে তোলাই তার কাজ। সে অনায়াসে বলতে পারে, রাত হয়েছে, এবারে শুয়ে পড়ো। আমারও তো জানো শরীরটা ভাল নেই। কিন্তু বলতে পারছে না। আবার যদি গুম মেরে যায়। সব তছনছ করে ফেলে। ঝামেলার তবে শেষ থাকবে না।

আর সুহাস কি দেখছে?

চার্লি কালো কালিতে মুখে লম্বা গিরগিটির গোঁফ এঁকে দিতেই চমকে গেল সে। আরে এই লোকটাই তো বেলাভূমিতে তাকে আক্রমণ করেছিল—এই লোকটাই। দূর থেকে দেখলে মুখোস, সামনে থেকে, দুরাত্মা। চার্লি কি তাকে সনাক্ত করতে চায়? সে কে বারবার মুখ এবং গোঁফ এঁকে সনাক্ত করতে চায়!

দূর থেকে দেখলে এক রকমের কাছ থেকে দেখলে আর এক রকমের। সুহাস বলল, 'কে তিনি!'

চার্লি গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ শক্ত হয়ে গেল। বলল, 'প্রোসরপিনা।'

'প্রোসরপিনা! সে আবারা কি বস্তু। কে সে? প্রোসরপিনা কি কারও নাম! না কোনও ভৌতিক রহস্য চার্লিকে তাড়া করছে।

সুহাস আর কোনও প্রশ্ন করতে পারছে না। লোকটা কি তবে জাহাজেই আছে। এ

তো সেকেন্ডের মুখও নয়। কাপ্তানের মুখও নয়। এ আবার কে জাহাজে হাজির। মুশকিল, সাহেব-সুবোদের মুখ সব সময়ই তাকে গোলমালে ফেলে দেয়। জাহাজে উঠে সে যে কতবার কতজনের মুখ গুলিয়ে ফেলেছে। প্রায় দু তিন মাস লেগে গেল মুখগুলি চিনতে। প্রথমে সে কেন যে তফাত বিশেষ কিছু খুঁজে পেত না। পরে সাবইকে চিনতে পারত। তবে ভিড়ের মধ্যে চিফ ইনজিনিয়ারকে দেখলে, সে এখন সনাক্ত করতে পারবে না। তিনি কেবিন থেকে বেরই হন না। তাঁকে সে একদিনই দেখেছিল। জাহাজের চিফ, তিনি শুধু কেবিনে বসে থাকেন, মদ্য পান করেন, তাস খেলেন, তাস তোলেন—আর বন্দর এলে রাতে নেমে যান। কি যে দরকার জাহাজে লোকটার এমনও মনে হত।

পরে অবশ্য সে বুঝেছিল, না লোকটির সত্যি দরকার আছে। জাহাজ সমুদ্রে। ইনজিনরুমে সেকেন্ড ইনজিনিয়ারের ওয়াচ। সহসা সে দেখেছিল দ্রুত তিনি নেমে আসছেন—সেকেন্ড সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছে। না কোনও কথা না, টর্চ মেরে কি দেখিয়ে ফের দ্রুত উপরে উঠে গেলেন। সেকেন্ড ইনজিনরুমে পাহারায় থেকেও যা টের পাননি, তিনি তাঁর কেবিনে বসে তা ধরতে পারেন। ইনজিনের শব্দ এতই ভাল জানা, তালগোল পাকালে, শব্দ থেকে ত্রুটি ধরে ফেলার এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার জন্যই বোধহয় তিনি চিফ। সুহাস দেখেছিল, ব্যালেস্ট পাম্পর নাটবল্টু আলগা।

তবে কি চিফ! তিনি তবে প্রোসরপিনা!

সুহাস না বলে পারল না, 'কে প্রোসরপিনা?'

'জানি না সুহাস। আই হিয়ার এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।'

'কি বলছ?'

'ইয়েস আই হিয়ার।'

চার্লি কি মাঝে মাঝে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে! তার কথার জবাব দিচ্ছে না। চার্লি তাকে নিয়ে গেল বাথরুমে। পোর্টহোল খুলে অদূরের অন্ধকারে একটি উইন্ডসহোল দেখিয়ে বলল, মধ্যরাতে সে আসে। আমাকে শাসায়। বলে, দ্য প্ল্যান্ট নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ, সো ইগনোর হিম।'

সে কে? কাকে ইগনোর করতে বলছে!

চার্লি সত্যি যেন ভূতগ্রস্ত!

তার কথার জবাব দিচ্ছে না। বলছে 'দ্যাখো উইন্ডসহোলের একটা পাইপ বাথরুমে ঢুকেছে। উইন্ডসহোলের মুখটিকে সে চোঙ-এর মতো ব্যবহার করে। সে জানে, সেখানে কথা বললে, আমি তার কথা শুনতে পাব। সে আমাকে শাসায়, 'হি ইজ ব্লাইন্ড গাইড লিডিং দ্য ব্লাইন্ড অ্যান্ড বোথ উইল ফল ইনটু এ ডিচ্।' সুহাস জানে অদূরের উইন্ডসহোলের মূল পাইপটি ক্রস বাঙ্কারে ঢুকে গেছে। তারই কোনও শাখা-প্রশাখা চার্লির বাথরুমে। মুক্ত বায়ু প্রবেশের এই ব্যবস্থাটি তাকে কিছুটা হতবাক করে দিল।

'আর কি বলে?'

'গেট অ্যাওয়ে ফ্রম হিম, হি ইজ এ স্যাটান।'

'সে কে! কেন বলছ না সে কে? না আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব। তুমি তাকে চেন না! তিনি কি চিফ?'

'না।'

'তবে কে? তিনি কি সেকেন্ড?'

'না না।' চার্লি চিৎকার করে উঠতে গেলে সুহাস বুঝল, আবার সে ভুল করছে। সে বলল, 'ঠিক আছে। এস।' চার্লির হাত ধরে বাথরুম থেকে টেনে বের করে আনল।

চার্লি তখনও বলে যাচ্ছে, 'সে শাসায়—আই হিয়ার এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।'

না আর কোনও প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। মেঘের ওপার থেকে যে কণ্ঠস্বর শুনতে পায় তাকে আর কি বলা যায়! তবু কেন যে না বলে পারল না, 'তিনি কি তোমার বাবা?'

কুড়ি

সহসা চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—তুমি কি সুহাস! আমি কি বাবার মুখে গোঁফ এঁকেছি।' সুহাস বলল, 'না।'

'তুমি তো সব মুখগুলিই চেন, চেন কিনা বল। পর পর চিনতে পারছ না!' চার্লির চোখে মুখে হতাশা। তারপর মুখগুলির আরও কাছে গিয়ে বলল, 'চিফের মুখ কোনটা, কে চিফ!'

'কেন এই যে। গোলগাল ফুটবল।'

চার্লি বলল, 'আমি কি চিফের মুখে ফলস্ গোঁফ এঁকেছি না জুলপি।

'না, তা অবশ্য আঁকোনি। সত্যি ভুল হয়েছে। গোঁফ তো ওটার এঁকেছ!'

চার্লি বলল, 'তা হলে দেখে নাও ফের।' যেন পরীক্ষা নিচ্ছে সুহাসের। দেখে নাও বলে গোঁফ জোড়া সাদা রং দিয়ে মুছে দিল। তারপর সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিনতে পারছ।'

'চেনা চেনা লাগছে! দেখেছি কোথাও। তবে কে ঠিক মনে করতে পারছি না। আচ্ছা তোমার বাবা তাকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেননি তো!'

'জানি না। মনে হয়, না। কারণ তাঁর জানা দরকার তোমার ক্ষতি হল তার আরও বড় ক্ষতি হবে। মনে হয় তিনি তা ভালই জানেন।' বলে চার্লি বিছানায় পড়ে সহসা খামচে ধরল বালিশটা। মুখে প্রচণ্ড তিক্ততা। আবার সেই চিৎকার, 'আই উইল রিওয়ার্ড ইয়োর ইভিল, উইথ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি।'

'চার্লি ফের পাগলামি শুরু করলে। চলে যাচ্ছি। শোনো এভাবে চলে না। সব খুলে বল তোমার বাবাকে, এই কি নিজে ফুঁসছ, অথচ কাউকে কিছু বলছ না। নাকি তোমাকে ভূতে পায় মাঝে মাঝে। কিচ্ছু বুঝছি না।'

'হ্যাঁ পায়! হটো। বের হয়ে যাও! আমাকে ভূতে পায়! আমি ভূত!'

'আরে আমি কি তাই বলেছি নাকি। কিন্তু তুমি যে বলছ, মেঘের ওপার থেকে কণ্ঠস্বর শুনতে পাও।'

উইন্ডসহোলে মুখ রেখে কথা বললে তাই শোনা যায়। একটা পাইপ আমার বাথরুমে, অন্য পাইপটা গেছে ক্রস বাঙ্কারে। বাথরুমে এস। দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি!'

'কোথায়?'

'বাইরে যাচ্ছি। উইন্ডসহোলে মুখ ঢুকিয়ে কথা বললে মেঘের ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে কি না বুঝতে পারবে।'

'ঠিক আছে। আমি শুনতে চাই না। আমরা কি করতে পারি বল।'

'কিছুই না।'

'তুমি কি জান, মুখোসটা পাওয়া গেছে। বুড়ো মানুষের মুখোস নয়। যিশুর মুখ। আবছা অন্ধকারে বুড়ো মানুষের মনে হয়।'

চার্লি বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে। শক্ত করে সুহাসের হাত ধরে রেখে বলছে, 'জানি।'

'জান? বলছ কি!'

'সুহাস, তখন যে আমি সেই বুড়োমানুষটাকেই দেখতে পাই। মুখোস পরে অনুসরণ যেই করুক, তাকে ভয় পাই না।'

'বলছ কি, অনুসরণকারীকে ভয় পাও না?'

'না।'

'সেই বুড়োমানুষটি কে? কে তিনি!'

'তিনি আমার ঠাকুরদা জোহানেস মিলার।'

সুহাস হতভম্ব। চার্লিকে তবে কোনো অনুসরণকারী তাড়া করছে না। তাড়া করছে তার ঠাকুরদা। ভারি তাজ্জব ব্যাপার! ঠাকুরদা তো চার্লিকে তার উত্তরাধিকার করে গেছেন। সেই ঠাকুরদাই আবার তাড়া করছে। চার্লির কি মাথার কোনো গোলমাল আছে। ঠাকুরদার অপ্রশংসা করলেও চার্লি অখুশি। অথচ সেই ঠাকুরদার তাড়া তাকে এই নিগ্রহে ফেলে দিয়েছে। তবে তার বাবাকে গালমন্দ করল কেন? নিগ্রহের হেতু যদি কেউ হয় তবে তো সেই বুড়োমানুষটা।

অথচ জঙ্গল পার হয়ে যখন তাকে নিয়ে ছুটছিল, তখন তো চার্লি ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠছিল। চোখ জ্বলছিল তার। ঘোড়ার পিঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটাও তাকে কাবু করে ফেলছে। তার সেই ভয়ঙ্কর চিৎকার এখনও যেন সে শুনতে পাচ্ছে—আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ দ্য ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি। এসব কথারই বা অর্থ কি। যদি তার উপর কোনও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার না থাকে তবে এ-ভাবে আচমকা কলার টেনে আততায়ী ঘুষিই বা মারল কেন! আবার চার্লিই বলছে, তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে সাহস পাবে না। চোখের সামনে এত বড় সংঘাত হবার পরও চার্লির কি করে বিশ্বাস, সে নিরাপদ।

কিন্তু এ-মুহূর্তে কিছুই বলা আর সম্ভব নয়। চার্লির চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে তো দরজা খোলা রেখে যেতে পারে না। চার্লিকে এ-অবস্থায় বোঝাতেও পারে না, ফক্কার পাশে টব রেখেছিল, শিকার ধরার জন্য, ডেরিক খুলে দিয়েছিল, তাকে খুন করার জন্য। আচমকা ঘুষি মেরে তাকে শেষ করে দেবার চেষ্টাও তো করেছে! তবু কেন চার্লি বলছে, সে নিরাপদ। তার গায়ে কেউ হাত দিতে সাহস পাবে না। কাপ্তানের সাহস না থাকলে কার এত সাহস তার গায়ে হাত দেয়!

চার্লি কি তাকে সাহসী করে তুলতে চায়। খুনের আতঙ্কে সে কাবু হয়ে পড়লে চার্লি কি খুব দুর্বল বোধ করবে!

চার্লি তো সুহাসের বিপদ টের পেয়েই শাসিয়েছিল, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি। সেই তো জাহাজে ফিরে তার বাপের কেবিনে তেড়ে গিয়েছিল। যা মুখে আসে বলেছে।

চার্লিই তো বলেছিল, তোমাকে জড়াতে চাই না সুহাস। তুমি যাও।

জড়াতে চাই না কেন বলেছিল! চার্লি তবে সব জানে। চার্লি চারপাশ থেকে কেমন অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে বোধহয়। চার্লি নিজের উপর আস্থাও হারিয়ে ফেলতে পারে। তাকে নিয়ে চার্লি পালাতে হয়। দুর্বল মুহূর্তে চার্লি নিজেকে সামলাতে পারেনি। তার অর্থ তো একটাই দাঁড়ায়, চার্লি জানে তার রক্ষার আর কোনো উপায় নেই। কোনো দ্বীপে নিখোঁজ হয়ে গেলে কেউ আর তাদের খোঁজ পাবে না। তার ক্ষতিও করতে পারবে না।

চার্লি তার দু-হাত নির্ভয়ে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। চোখ বুজে আছে। সে কেন যে তার হাত সরিয়ে নিতে পারছে না। সে ইচ্ছা করলেই নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে না। আবার চার্লির মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এই নিরুপায় মেয়েটির জন্য সে সব করতে পারে। তার কাছে চার্লি ছাড়া সব অর্থহীন। সারা শরীরে চার্লির আশ্চর্য সুষমা। হাতে পায়ে মুখে এবং নাভিমূলে। স্তনের আশ্চর্য আকর্ষণে মুখ ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। একজন ধনকুবেরের বংশধর কত সহজে সব ফেলে তার সঙ্গে চলে যেতে চায়। নিখোঁজ হয়ে যেতে চায়। পাতার কোনো কুটির নির্মাণের কথা বলে, শস্য বোনার কথা বলে, সমুদ্রে ডুবে মাছ ধরার কথা বলে, আবার আগুন জ্বেলে আকাশের নীচে বসে থাকার কথা বলে। সে মাথা পাতলেই তারা যেন বের হয়ে যেতে পারে। সে মাথা পাতলেই চার্লি কোনো দ্বীপে বুনো ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারে।

সে কেমন বোকার মতো চার্লির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। চার্লির বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, আমি যাব। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে—চলে যাব। আমরা দুজনেই তোমার ঠাকুরদার ইচ্ছেকে সম্মান জানাব। আমরা দু'জনেই বুনো ফুল হয়ে ফুটে থাকব। কথা দিচ্ছি চার্লি। যখন বলবে, যখন বুঝবে—আমি তোমার সঙ্গে আছি। বলে এই প্রথম চার্লিকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলল।

আসলে এ-সময় তার বাবা মা-র মুখ মনে পড়ছে। বাবা তো সে ফিরবে বলে কত রাত ঘুমায় না। মা তার গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে চিঠির আশায়। কবে সে ফিরবে!

সুহাস নিজেকে সামলে নিল। তার ঘন চুলে চার্লি দু-হাত শক্ত করে চেপে রেখেছে। সারা শরীর চার্লির থরথর করে কাঁপছে। এতটা ভেঙে পড়া বোধহয় উচিত হয়নি। নিজেকে সামলে সে উঠে দাঁড়াল।

চার্লি যে এখনও স্বাভাবিক নয় তার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কে অনুসরণকারী চার্লি যেন জানতে চায় না। এই অনুসরণকারীকেই তো সারা জাহাজে সে আর চার্লি খুঁজে বেড়িয়েছে। মুখোস সম্পর্কেও তার কেন জানি, কোনো আগ্রহ নেই। মুখোসটা পাওয়া গেছে বলা ঠিক হল কি না তাও বুঝতে পারছে না। মুখার্জিদা তো বার বার বলেছেন, কিছুই যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। যা ঘটছে দেখে যাও। বুড়োমানুষের মুখ তাড়া করতে পারে মুখার্জিদা যেন এমনও বলেছিলেন। মানুষটাকে কেন যে খুবই প্রাজ্ঞ মনে হল তার। মুখার্জিদার কথাই ঠিক—বুড়োমানুষের মুখই তাকে তাড়া করছে। অনুসরণকারী আর কেউ

নয়। অনুসরণকারী তার সেই মৃত ঠাকুরদা। খুবই ভৌতিক ব্যাপার। যে মরে যায় সে কেন অনুসরণ করবে! মানসিক বিভ্রম থেকেই কি চার্লির এই নিগ্রহ! মুখোস এবং অনুসরণকারীকে ঠাকুরদার মুখের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে। চার্লির ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার। তা হলে সে আর ঘোরে পড়ে যাবে না। ঘোরে পড়ে গেলেই ঠাকুরদা, ঘোরে না পড়ে গেলেই অনুসরণকারী। তখন সে তাকে নিজেও খুঁজতে বের হয়। মুখার্জিদাকে সব খুলে বলা দরকার। তিনি চার্লির আচরণ থেকে যদি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন।

সে বলল, 'চার্লি আমি যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

'তুমি যাবে!'

যেন সুহাস চলে গেলে জলে পড়ে যাবে চার্লি।

'কত রাত হয়েছে! বুঝছ না। ওরা ডেকের অন্ধকারে অপেক্ষা করছে। তুমি কিন্তু তোমার বাবার কথা শুনবে। তিনি তোমাকে নিয়ে খুবই অস্বস্তিতে আছেন। হুট করে মেয়ে সেজে কেবিন থেকে বের হয়ে যাবে না। যা ছিলে তাই আছ, থাকবে। দেখি না শেষ পর্যন্ত রহস্য কতটা গড়ায়।'

'আমি তো মেয়ে।' চার্লি উঠে বসল।

'জানি।'

'তবে কেন আমি গাউন পরে বের হতে পারব না বল?'

'কেন, তুমি যে বলতে, নো মি বয়। হঠাৎ মেয়ে সাজার এত শখ কেন!'

'আমি তো আর কাউকে ভয় পাই না।

'কি বলছ চার্লি ভয় পাও না! কিসের ভয়ে, তবে বলতে নো মি বয়!'

চার্লি কিছুটা যেন সম্বিত ফিরে পাচ্ছে। বলল, 'ঠিক আছে মি বয়।'

চার্লিকে কি আবার ভয়ের জুজু তাড়া করছে!

সুহাস বলল, 'শোনো, মন দিয়ে শোনো। মালবাহী জাহাজে জানই তো মেয়ে থাকে না। কাপ্তানই একমাত্র তার স্ত্রী অথবা প্রিয়জনকে নিয়ে উঠতে পারেন। তুমি সেই সূত্রেই উঠে এসেছ। মনে রাখবে জাহাজের নাবিকরা সব খেপে আছে। তাদের মাথার ঠিক নেই। কতকাল তারা ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে থাকতে পারে! তারা যদি জন্তু হয়ে যায় রক্ষা আছে! সমুদ্রের একঘেয়েমি থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাহাজিরা কত কিছু করে থাকে। আমাদের ইমতাজ মিঞা তো শাড়ি পরে, বুকে ফলস পরে কতদিন ফোকসালে ফোকসালে নেচে বেড়ায়। গুনাইবিবি সেজে গান গায়। নাচে। এতে কেউ রাগ করে না। বরং মজা উপভোগ করে। কেউ টব বাজায়, কেউ থাল বাজায়। পিছিলে গুনাইবিবির গানও হয়। আসর বসে যায়। গান হয়—ও চাচা আমারে যে করবেন বিয়া, মায়রে করবেন কি। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে পড়ে। কোমর বাঁকিয়ে আঁচল উড়িয়ে নাচে। বাড়িঘরের কথা ভুলে থাকে!'

সুহাস দরজা খোলার আগে বলল, 'মেয়ে সেজে বের হলে ভাববে না, তুমিও সং সেজে মজা করছ। এটা কি ভাল দেখাবে!'

'বের হব না বললাম তো।' চার্লির মুখে লজ্জার হাসি।

'ভয় পাবে না?'

'না।' বলেই হঠাৎ উঠে সুহাসকে চুমু খেল।

'হি প্রটেকটস্।' সুহাস বলল। 'দরজা বন্ধ করে দাও।'

চার্লিও যেন দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছে। সে-ও বলল, 'ডি প্রটেকটস্।' দরজা লক করে দিল চার্লি।

দরজা খুলে বের হয়ে সুহাস ভূত দেখার মতো কাপ্তানকে দেখে ঘাবড়ে গেল। তিনি তবে সব শুনেছেন! তিনি তাঁর কেবিনে শুয়ে পড়েননি! কখন এলেন। ধরাচুড়ো-পরা পাথরের মতো স্থির। যেন চোখের পলক পড়ছে না। দরজা বন্ধ ছিল—সব কি তিনি শুনেছেন। এমন কি নিখোঁজ হয়ে যাবার পরিকল্পনা। তার বুক ধড়াস করে উঠল।

কাপ্তান বললেন, 'মাই বয়, হি ইজ ওকে?'

'ইয়েস স্যার। ও কে।'

'মেনি থ্যাংকস।' বলে তিনি তাঁর কেবিনের দিকে হেঁটে চলে গেলেন। আর তখনই সে দেখতে পেল উইন্ডসহোলের পাশ থেকে একটা ছায়া উইংসের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। উইন্ডসহোলে কান পেতে রাখলে কি চার্লির কেবিনের কথা সব শোনা যায়।

ইস এত বোকা সে!

তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কিন্তু তখন তো মনে হয়েছিল তিনি অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছেন। তার কথাবার্তায় কাতর অনুনয় বিনয়—অগাধ বিশ্বাস আছে বলেই তাকে চার্লির কেবিনে পাঠাচ্ছেন—যদি সে পারে চার্লিকে শান্ত করতে। শেষে এই গুপ্তচরবৃত্তি! অদৃশ্য ছায়া। না মাথায় কিছু আসছে না। কেমন সে অসার বোধ করছে। তার এক পা হেঁটে যাবার যেন ক্ষমতা নেই। চার্লির দরজায় কান পাতলে ভিতরের কথাবার্তা কি শোনা যায়। সে কি খুব জোরে কথা বলছিল! অন্তত ইঞ্জিন চালু থাকলে সে দেখেছে, দরজায় কান পাতলে ভিতরের কোনো কথাবার্তাই কানে ভেসে আসে না। সমুদ্রের গর্জন, আর ইঞ্জিনের শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। বন্দরে কিছুই থাকে না। না সমুদ্রের খেপা আর্তনাদ, না ইঞ্জিনের কঠিন ধাতব শব্দ। একেবারে শান্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নীরব বন্দর এলাকা। শুধু হাওয়ায় চিমনির আলোটা দুলছে।

তার গলা শুকিয়ে উঠছে।

সে দৌড়ে বোটডেক থেকে নেমে যেতেই দেখল—সুরঞ্জন, অধীর, মুখার্জিদা ছুটে এসেছেন।

সে হাঁপাচ্ছে।

সে প্রচণ্ডভাবে ঘামছিল।

'কি হল!' মুখার্জিদা ফিস ফিস করে বলছেন।

সুহাস বলল, 'জল খাব। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

অধীরে দৌড়ে চিফকুকের গ্যালি থেকে জল নিয়ে এলে, সুহাস ঢক ঢক করে সবটা জল খেয়ে বলল, 'চল।'

ডেকের উপর দিয়ে চারটে ছায়া আবছা অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে।

মুখার্জিদা বললেন, 'কথা বলছিস না কেন?'

'কি বলব বল!'

'চার্লি তার বাবাকে তেড়ে গেল কেন? তোকে ডেকে পাঠাল কেন? অধীর তো বলল, তুই চার্লির কেবিনে ছিলি!'

'সবই ঠিক। ছিলাম।'

'চার্লি কিছু বলল?'

'অনেক কথা। এখানে বলা ঠিক হবে না। কে কোথায় আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করছে বোঝা মুশকিল! তোমাদেরও আমাকে দেখেই দৌড়ে আসা উচিত হয়নি।'

মুখার্জিদা বললেন, 'কি করব। সেই যে ঢুকে গেলি আর পাত্তাই নেই। চার্লির কেবিনে তোকে পাঠাল কেন?'

'চার্লিকে শান্ত করতে।'

'আর কিছু না?'

'আর কিছু না বলব কি করে। কি মতলব বুঝছি না।'

সে হেঁটে যাচ্ছে। মুখার্জি পাশে হাঁটছেন। সুরঞ্জন অধীর পেছনে। কিছুটা সুহাসকে পাহারা দেবার মতো করে তারা পেছনে রয়েছে যেন।

সুহাস খুবই দ্রুত হাঁটছিল। মুখার্জিদাও পা মিলিয়ে সঙ্গে দ্রুত হেঁটে আসছেন। ডেক একেবারে খালি। গ্যালির দরজা খোলা। মেসরুম, বাথরুমে কেউ নেই। এত রাতে থাকার কথাও না। কেবল ইঞ্জিন সারেঙ তার কেবিনে জেগে আছেন। শত হলেও তিনি এদের সবার ওপরওয়ালা, জাহাজিদের বিপদে-আপদে তার দায় থেকেই যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি দরজা খুলে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কাপ্তান সোজাসুজি তাকে কিছু না জানিয়ে সুহাসকে ডেকে নেওয়ার অস্বস্তিও আছে ভেতরে। তাদের দেখেই তিনি বললেন, 'এত রাত করে ফেললি!' কি ব্যাপার।'

মুখার্জি বললেন, 'ও কিছু না।' সারেঙকে এড়িয়ে যাবার জন্যই কথাটা বলা।

'ও কিছু না বলছেন কেন মুখার্জিবাবু! ছেলেটা সেই কখন গেল কাপ্তানের ঘরে, ফিরল এতক্ষণে! ঘুম আসে!'

সারেঙকে আশ্বস্ত করার জন্যই যেন বলা, চার্লি কি আরম্ভ করেছে দেখছেন তো! বাপকে যা তা গালগাল করছে। সুহাসের সঙ্গে চার্লির দোস্তি আছে বলেই ডেকে পাঠিয়েছেন। তরলমতি, খুবই তরলমতি বালক। বাবাকে মানে না। কি কখন করে বসবে—সুহাস বুঝিয়ে সুজিয়ে যদি শান্ত করতে পারে! আর কিছু না!'

'শান্ত হল?'

মুখার্জিদা বললেন সুহাসকে, 'কি রে মেজাজ পড়েছে!'

'পড়েছে!'

'যাক। মুশকিল সব পুত্রই ডানা গজিয়ে গেলে বাপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চায়। যাক গে, মেজাজ শান্ত হলেই ভাল। কাপ্তান ব্যাটাকে নিয়ে খুবই ফাঁপরে পড়েছেন।' বলে তিনি তারা ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আর মুখার্জি অবাক! নীচে নেমে দেখছেন, কেউ ঘুমায়নি। সবাই যে যার ফোকসালে বসে আছে। এটা যে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার জাহাজে, একজন সাধারণ জাহাজিকে এত রাতে খোদ কাপ্তান ডেকে পাঠিয়েছেন—ভাবাই যায় না। কি এমন ঘটল, সুহাসের এত

কি বরাত জোর যে কাপ্তান খোদ তাকে ডেকে পাঠাতে পারেন! সে ফিরে আসায় সবাই ফের মুখার্জির ফোকসালে জড় হয়েছে। জানতে চাইছে, কেন ডেকে পাঠিয়েছিল।

তিনি সারেঙকে যা বলেছেন, তাদেরও তাই বলে বিদায় করলেন। বললেন, তোমরা সবাই দেখছি আহাম্মক। আরে সুহাসের সঙ্গে বের হয়ে যায় দেখ না! মতি স্থির নেই ছোকরার। যদি কিছু আকাম-কুকাম করে আসে, সুহাসই ভাল বলতে পারবে। এতে তোমরা ঘাবড়ে গেলে কেন বুঝি না। যাও। শুয়ে পড়গে। রাত কত হয়েছে টের পাও না। সুহাসকে এত রাতে বখশিস দিতেও ডাকতে পারে না—আর তিরস্কারের কথা তো আসেই না। জাহাজে সারেঙ থাকতে সুহাসকে তিরস্কার করতে পারে কাপ্তান। এমনই বা ভাবলি কি করে! সারেঙ আমাদের মুরুব্বি। তাকে ডিঙিয়ে ঘাস খেলে সহ্য করব কেন?'

এরপর আর আশ্বস্ত না হয়ে উপায় কি। যে যার মতো সিঁড়ি ধরে ফোকসালে ঢুকে গেল। হরেকেষ্টও চলে গেল। তার পরি আছে বয়লার-রুমে। বারোটা-চারটার পরি। খুব তাড়াহুড়ো নেই বলে দেরিও হয়ে গেছে। সুহাস না ফেরায় সেও অস্বস্তিতে ছিল। একটা বয়লার চালু। একজন ফায়ারম্যান আর একজন কোলবয়ই যথেষ্ট। দুশোর মতো স্টিম রাখলেই চলে যায়। স্টিম নেমে গেলেও ব্যস্ততার বিশেষ কিছু থাকে না। ক'বেলচা কয়লা মেরে দিলেই হল।

মুখার্জি হরেকেষ্টকে তাড়া লাগালেন, 'যা যা। দেরি করিস না। এই অধীর তুই জেগে থেকে কি করবি। যা শুয়ে পড়গে।' অধীর চাইছিল, মুখার্জিদা তাকে বলুক চলে যেতে। সবার মতো চলে গেলে স্বার্থপর ভাবতে পারে। সেও চলে গেল।

এখন ফোকসালে তারা মাত্র তিনজন। মুখার্জিদা বললেন, 'শুয়ে পড় সুহাস। আমরা পাশের বাঙ্কটায় বসছি। আরে ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আমাদের অসুবিধা হবে না।'

ভাঙা বাঙ্কে বসা ঠিক হবে না—তাও আবার তারা দু'জন, সুহাস এ-জন্য এক পাশে সরে ওদের জায়গা করে দিতে গেলে, বালতিটা উপুড় করে তার উপর দুটো লুঙি ভাঁজ করে পেতে দিলেন মুখার্জিদা। তিনি বালতিটার উপর বসে বললেন, 'আমার সুবিধে অসুবিধে তোমার এখন দেখতে হবে না। সময় হাতে কম। সুরঞ্জন মন দিয়ে শোন। ভুলে গেলে যেন মনে করিয়ে দিতে পারিস। বল, হাঁপাচ্ছিলি কেন! এত দেরি হল কেন! কি দেখলি!' সুহাস যতটা পারল গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল। কেবল বলল না, চার্লি তাকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যেতে চায়। কথাটা বলতে তার কেন যে বিবেকে বাধল তাও বুঝল না। যেন চার্লির বিশ্বাসের অমর্যাদা করা হবে। নিখোঁজ হওয়ার কথা সে কিছুতেই বলতে পারল না।

'চার্লি তার ঠাকুরদার তাড়া খাচ্ছে। মুখোস নয়?' মুখার্জিদা কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন।

'তাই তো বলল!. মুখোসের কথা গ্রাহ্যই করল না। অনুসরণকারীর খবরেও তার আগ্রহ নেই!'

'বলেছিলি মুখোসটা যিশুর!'

'বলেছি।'

'সেকেন্ড ফলো করছে বলেছিলি?'

'না তা বলিনি। তোমাকে তো বললাম, যা পরিস্থিতি তাতে বেশি বলাও যাচ্ছিল না।'

সুরঞ্জন বলল, 'কাপ্তান দরজায় এসে কখন দাঁড়াল, টের পাসনি?'

'না। তবে আমি তো দরজা খুলে মাঝে মাঝে বের হয়েছি। কাপ্তানবয় বোটডেকে বসে আছেন। মনে হয় কাপ্তানবয় চলে গেলে তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনও হতে পারে আমার দেরি দেখে তিনি না এসে পারেননি।'

'হুম।' বলে একটি অতি দীর্ঘশ্বাস এবং বিস্ময়সূচক শব্দ ছাড়া মুখার্জির মুখ থেকে আর কিছু শোনা গেল না।

সুহাস দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। মুখার্জির সেই চিরাচরিত মুদ্রাদোষ, হাত পা নাচানো। হাত মুঠো করা, খুলে ফেলা। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন।

তারপর হঠাৎ তিনি বলে ফেললেন, 'চার্লি সব ঠিক বলেনি! প্রথম কথা চার্লিকে সেকেন্ড জাহাজে উঠেই অনুসরণ করছে। লস এনজেলস থেকে নয়। চার্লি টের পেয়েছে লস এনজেলসে, পার্কে বেড়াতে গিয়ে টের পেয়েছে। চার্লি জানেই না, এখানেও সে তাকে অনুসরণ করছে। সেকেন্ডের দুটো মুখোস আছে। একটা যিশুর, আর একটা গিরগিটি গোঁফের। যেখানে যেটা দরকার পরছে। দরকারে যিশুর মুখোস খুলে দিলেই তার গোঁফ ঝুলে পড়ছে। ওটা নিশ্চয়ই ফলস গোঁফ। চাইনিজম্যান মনে হয়েছিল কি গুঁফো লোকটাকে?'

'কি করে বুঝব? মিশনে লোকটার কাছে যেতে দিলে তো! কাছে না গেলে বুঝব কি করে। আর আমার অত মনেও নেই। আমার তো কোনও আতঙ্ক ছিল না লোকটাকে নিয়ে—চার্লির ত্রাস কেন তাও বুঝছিলাম না। আসলে জান ব্যাপারটাকে আমি পাত্তাই দিইনি। তা ছাড়া এখন তো দেখছি মুখোস-টুখোস সব বাজে ব্যাপার। আচ্ছা তোমাদের কি ধারণা? চার্লি কি মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে!'

সুরঞ্জন বলল, 'হারাতে পারে। আসলে মানসিক ভারসাম্য হারালেই সে স্বাভাবিক হয়ে যায়। না হলে তোকে বলবে কেন, দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি প্যানিসড ফর হোয়াট আই ডিড নট ডু। তার মানে, তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যার জন্য সে মোটেই দায়ী নয়! তুমি কি মনে করছ মুখার্জিদা। এও বলেছে—তারা সব ইনফ্লুয়েনসিয়েল ম্যান! আমরা জানি, সে ধনকুবেরের নাতনি। তাকে নাতি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এর চেয়ে বড় শাস্তি একটি মেয়ের পক্ষে আর কি হতে পারে।'

মুখার্জি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। হ্যাঁ হুঁ কিছু বলছেন না। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পা নাচিয়ে যাচ্ছেন। কি ভেবে উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা নিজে ধরালেন, একটা সুরঞ্জনকে দিলেন। তারপর সিগারেট মুঠো করে ধরে হুস করে পর পর দুটো টান মেরে প্রায় চোখ বুজে ফেললেন।

চোখ খুলে বললেন, এটা একটা পয়েন্ট। তবে এর অন্য দিকটাও ভাবার দরকার আছে।

তখনই সুহাস বলল, 'তোমাদের আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দ্যাখ এর সঙ্গে চার্লির কোনও বিপদ জড়িয়ে আছে কি না। আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি। চার্লিই কিন্তু তার ঠাকুরদার উত্তরাধিকারী হবে।'

'হয়নি!' সুরঞ্জন প্রশ্ন না করে পারল না।

'তা তো জানি না। বলল, আমাকেই ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছেন।'

'চার্লি জানল কি করে সে তার ঠাকুরদার সব পাবে? কিংবা তাকে দিয়ে গেছেন! শোনা কথার দাম কি! চার্লির সব কথা মেনে নেওয়াও যায় না। বিশ্বাসও করা যায় না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে কে কখন কি বলছে তার দামও দেওয়া যায় না।'

মুখার্জি বললেন, 'এগুলো পরে ভাবা যাবে।' কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

সুরঞ্জন কিছুটা চটে গেল। 'এত বড় একটা খবর—তুমি গুরুত্বই দিচ্ছ না। তুমি কি! খুব সোজা অঙ্ক—আসলে অপহরণের ভয়ে কাপ্তান মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন—যদি বড় কোনও ষড়যন্ত্র টের পান, নিয়ে আসতেই পারেন। আসলে দেখা দরকার চার্লি প্রকৃতই সম্পত্তির মালিক কি না! আর এ জন্যই কাপ্তান মেয়েকে নিয়ে জাহাজে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এর ভিতর অন্য কোনো ষড়যন্ত্র নেই কে বলবে। জাহাজ তো ভাল জায়গা নয়। জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে মেয়েটা যে বড় হয়ে যাবে তিনি জানতেন। জাহাজে একটা ডবকা ছুঁড়ি ঘুরে বেড়ালে তোমরা কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারতে! বল পারতে তোমরা?'

মুখার্জি বললেন, 'একটা ডবকা ছুঁড়িকে ছেলে সাজিয়ে রাখা কি কোনও শাস্তির পর্যায়ে পড়ে। টাইববিঙ ছেলে সাজিয়ে রাখলে চার্লি বলবে কেন, দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি পানিসড ফর হোয়াট আই ডিড নট ডু। মনে রেখ চার্লি কখনও কিন্তু হি বনেনি, দে বলেছে। হি বললে, একজনকে ভাবা যেত। হি বললে আমরা তার বাবাকে সনাক্ত করতে পারতাম। হি যখন নয় তারা বেশ কয়েকজন। তারা বেশ সব ক'জনই চায়, চার্লির শাস্তি। এই তারা কে কে হতে পারে। তার বাবা, তার দিদিরা, তার ভাইয়েরা এবং তার নিখোঁজ কাকাও থাকতে পারেন। চার্লি বলেছে, জাহাজডুবিতে তিনি নিখোঁজ। আমার মনে হয় চার্লি তাও ঠিক বলেনি। মুখার্জি ছাই ঝেড়ে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, আমি কি ক্লিয়ার?'

সুরঞ্জন বলল, 'তুমি কি ভাবছ তার কাকা জাহাজডুবিতে মারা যাননি।'

মুখার্জি বললেন, 'মারা গেছেন কি যাননি বলা এখন ঠিক হবে না। তবে সবই চার্লির শৈশবের ঘটনা। মনে রাখবে, চার্লি জাহাজে উঠে এসেছে ঠিক তার বয়ঃসন্ধিকালে। নিশ্চয় এমন কোনও বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন কাপ্তান, যাতে তাঁর স্বার্থে চার্লিকে তুলে না এনে পারেনি। স্বার্থ নানারকম হতে পারে। এক অপহরণের ভয়, দুই ব্ল্যাকমেল, তিন খুন—সব কিছুই সম্ভব। তবে চার্লি সব ঠিক জানে না। জানে না এজন্য সে একজন পরিচারিকার কাছে মানুষ। পরিচারিকা যা বলেছেন, সে তা বিশ্বাস করেছে। ম্যাক এবং সেকেন্ডের আসল পরিচয় কি? তারা কি তার আত্মীয়। অথবা চার্লির আত্মীয়দের এজেন্ট। ম্যাক মানে আমাদের ফাইভার দেখেছিস, সেকেন্ডকে কি তোয়াজ করত। সেকেন্ড তাকে যখন তখন নিগ্রহ করত। সে কিছু বলত না। সাধারণত, জাহাজে ফাইভারদের কপালে সব সময়ই এই নিগ্রহ থাকে। সেকেন্ড তার মাথার উপর। তার হুকুমই শেষ হুকুম। এসব আমরা জানি। তোমরা কি কেউ বলতে পার, ম্যাকের কিংবা সেকেন্ডের হাতে দুর্ঘটনার সময় কিংবা পরে কোনও জখমের চিহ্ন ছিল! দড়ির একটা অংশে রক্তের দাগ আছে। তবে সব আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'গোলমাল কি তোমার এক জায়গায়! তুমি ধরেই নিয়েছ, সেকেন্ড জঙ্গলের দিকে গেছে বলে, জঙ্গলে মুখোস পরে সেই বসেছিল। কি ঠিক বলছি কি না দ্যাখ।'

'বলে যা।' বলে মুখার্জি দু আঙুলে নিজের চোখ চেপে রাখলেন। অর্থাৎ যেন মনোযোগের কোনও অভাব না ঘটে।

'কিন্তু সুহাস কি বলেছে। এই সুহাস বল না।'

মুখার্জি বললেন, 'জঙ্গল থেকে মগড়া উঠে এসেছিল। ডাকতেই ছুটে পালাল। কি সুহাস তাই তো?'

'তা হলে তুমি নিশ্চিত হও কি করে, সেকেন্ড জঙ্গলে বসেছিল মুখোস পরে। শুধু মাথা দেখেছ। তাও দূর থেকে—তাও আবার জ্যোৎস্নায়।'

মুখার্জি মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিক ঠিক।'

'তোমার আর একটা সিদ্ধান্তও ভুল।' সুরঞ্জন আর কথা বলছে না। কি ভুল বলবে তো। মুখার্জি রেগে যাচ্ছেন।

'ম্যাকের আততায়ীকে প্রায় যেন সনাক্তই করে ফেলেছ! কেন না ম্যাক সেকেন্ডকে যমের মতো ভয় পেত। সেকেন্ড ম্যাককে নিয়ে গিয়ে ডেরিক তুলেছে। সেকেন্ডের হাতে কিন্তু কোনও ক্ষত নেই। সেকেন্ডই খুনি এমন সিদ্ধান্ত চট করে নিতে যেও না। অবশ্য ম্যাকের হাতে ক্ষত ছিল কি না বলতে পারব না। আমি কাছেই যাইনি। তবে চার্লি মেঘের ওপার থেকে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ছবি এঁকে সে গুঁফো লোকটাকেই সনাক্ত করছে। কিন্তু লোকটাকে সুহাস চিনতে পারল না কেন?'

সুহাস বাধা দিল, 'না না।' আমি দেখেছি তাকে। জাহাজেই দেখেছি মনে হয়। তবে ঠিক মনে করতে পারছি না তিনি কে?'

'তোর উচিত ছিল সুহাস, সব কটার মুখেই গিরগিটির গোঁফ এঁকে দেখা। তোর কাছে কোনও মুখই বিশেষ তফাত মনে হয় না। তবে চার্লি একজনকে ঠিক সনাক্ত করেছে আমার মনে হয়। সেকেন্ডকে নিয়ে আর পড়ে থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। আরও কেউ। কিংবা আরও অনেকে।'

মুখার্জি ছাই ঝেড়ে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'চার্লি কিছুতেই বলল না, কে মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে থাকে! উইন্ডসহোলে মুখ রেখে কথা বলে! এ তো আচ্ছা ঝামেলা। তোর কি মনে হয়নি সুহাস, দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ, ইগনোর হিম। কাকে ইগনোর করার কথা বলছে। তোর মাথায় কি কিছু নেই! কবে থেকে শাসাচ্ছে তাও জানতে হয়।'

সুহাস বলল, 'অত আমার মাথায় আসেনি। আমাকে তোমরা কি পেয়েছ বলো তো। কবে থেকে শাসাচ্ছে চার্লি না বললে জানব কি করে। চার্লিকে তো বললাম, তিনি কি সেকেন্ড! সে তো স্রেফ বলল, না সেকেন্ড নয়। তার বাবাও না।'

মুখার্জি হতাশ গলায় বললেন, 'নাও এবার। আমরা কি করতে পারি। তবে বলে রাখি, এই সিদ্ধান্তটা বোধ হয় আমার ভুল নয়। চার্লির কাকা সম্ভবত বেঁচে আছেন। এবং এই দ্বীপেই আছেন। দেখি কি করা যায়। রক্তমাখা বাকি দড়িটাও খোঁজা দরকার।'

'তবে কে?' সুরঞ্জন সংযম হারিয়ে চিৎকার করে উঠল। 'চার্লিকে কে শাসায়। চার্লি কি জানে না মনে করিস? উইন্ডসহোলের পাশ থেকে শাসায়! উইন্ডসহোলের একটা শেকড় ওর ঘরে ঢুকে গেছে! বোটডেকে উইন্ডসহোলের ছাড়াছড়ি।'

মুখার্জি বললেন, 'সত্যি তো বোটডেকে উইন্ডসহোল কি একটা?'

সুহাস বলল, 'চার্লির বাথরুমের পোর্টহোল থেকে দেখা যায়। সুটের মুখে পাটাতনের পাশে। দু নম্বর বোটের কাছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'সেখানে সে রোজ মধ্যরাতে এসে দাঁড়ায়?'

'রোজ কি না জানি না। তবে দাঁড়ায়।'

সুরঞ্জন মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি সব বলছে! শোনো। সে চার্লির ঘর থেকে বের হবার সময়ও নাকি দেখেছে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কেউ। প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলে না তো চার্লি!'

মুখার্জি বললেন, 'প্রেতাত্মা হোক, খুনি হোক, অপহরণকারী হোক, কেউ রেহাই পাবে না। দেখি না কতদূর যেতে পারে।' আসলে সুহাসকে সাহস দেবার জন্যই বলা। কারণ সুহাসের উপর দিয়ে যে ঝড় যাচ্ছে তাতে সেও আবার না কিছু একটা করে বসে। মুখ ওর কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

'তুমি উঠছ কেন?' সুহাস না বলে পারল না। কথা যেন শেষ হয়নি। কথা শেষ না করেই মুখার্জিদা উঠে চলে যাচ্ছেন। ঠিক কাজ করছেন না। গ্যাঙওয়েতে তার ডিউটি। এত রাতে কেউ গ্যাঙওয়েতে নেমে দেখবেও না সুখানি জাহাজ পাহারা দিচ্ছে কি না। ডিউটি করছে কি না। সবাই তো চার্লি আর কাপ্তানকে নিয়ে তটস্থ।

মুখার্জি বললেন, 'আসছি। পেচ্ছাপ করে আসছি। অনেকক্ষণ থেকে চেপে আছি।'

সুহাস বলল, 'জানো কেবিন থেকে বের হতেই কাপ্তান বললেন, হি ইজ ওককে মাই বয়?'

'আমি আসছি।' বলে তিনি দরজা খুলে উপরে ছুটে গেলেন। আর কেন যে মনে হল সিঁড়ির অন্ধকারে কেউ আগে লাফিয়ে উঠে গেল। চোখের ভুল নয়তো। হতে পারে। সে যাই হোক, হালকা হয়ে নীচে নেমে বললেন, 'কি বলছিলি? হি ইজ ওককে মাই বয় বলল।'

'তা না বলে উপায়!'

সামান্যক্ষণ কি ভেবে মুখার্জি বললেন—

'না বলছিলাম তিনি কি তবে জানেন, চার্লি নিতান্ত আমার একজন বন্ধু। আমি কিছু তার জানি না।'

মুখার্জি তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'না তুমি কিছু জান না। তিনি হি বললে, তোমার কাছে চার্লি 'হি'। তিনি 'শি' বললে চার্লি তোমার কাছে 'শি'। ভুল যাতে না করো, হি বলে তা বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক আছে, সুরঞ্জন যা। ঘুমিয়ে নে। কাল সকালে বের হচ্ছি। আমার ফিরতে রাত হবে! সুহাস তুই যাবি? কাল তো আমাদের ছুটি আছে। চার্লিকে নিতে পারিস। একদিন ফিলের ওখানে সবাইকে যেতে বলেছে। ওর ইচ্ছে এখানকার সব কিছু ঘুরেফিরে দেখি। একা তোদের ফেলে রেখে মন যেতে চাইছে

না। তুই বললে, চার্লি নিশ্চয়ই যাবে। গেলে ফিল খুবই খুশি হবেন।'

'সুরঞ্জন যাবে না?' সুহাস না বলে পারল না।

'ও তো ঘোড়ার ল্যাং খেতেই শিখল না। নিয়ে যাই কি করে! সাইকেলে যাওয়া যায় না। ঘাড় কোমর তোর ঠিক আছে তো? সুহাসের দিকে চোখ সরিয়ে মুখার্জি এমন প্রশ্ন করলেন।

'সে দেখা যাবে।' সুহাস ঘাড় কোমর নিয়ে গ্রাহ্য করল না।

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু সতর্ক থাকবি। আর শোন, বাটলারকে আমার নাম করে বলবি,' তারপর কি ভেবে বললেন, 'না থাক, আমিই যাব।' সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুইও যা। আমার ফোকসালে থাকার দরকার নেই। নিজের ফোকসালে চলে যা। দরজা লক করে শুয়ে পড়। যতটা পারিস ঘুমিয়ে নে।'

একুশ

কিন্তু সকালে কেন যে মত বদলালেন মুখার্জি কিছুই বোঝা গেল না। কিনারার লোকজন আজ উঠে আসছে না কেউ। মালও তোলা হবে না। রবিবার। ছুটির দিন। সকালেই এসে জাহাজের নীচে একটা মোটর বোট লাগল। মোটর বোট থেকে এক ঝুড়ি গলদা চিংড়ি, গোটা আটেক পুরুষ্টু মুরগি আর আখ, আনারস, নারকেলসহ নিনামুর হাজির। মুখার্জি বললেন, 'আরে তুমি। কি ব্যাপার। ফিলের কাণ্ড দ্যাখ। আমি যেতে পারব না বলে করেছে কি! এত মাছ! ও সারেঙসাব, শিগগির আসুন।'

সারেঙসাব খবর পেয়েই উপরে উঠে এসেছেন। সব দেখে তাজ্জব। কে পাঠাল!

'দেখুন ফিলের কাণ্ড।' বলে ঝুড়ির ঢাকনা খুলতেই জ্যান্ত চিংড়ি সব লাফিয়ে পড়তে থাকল। মুরগিগুলি কোকরো কো করে ডেকে উঠল। জাহাজিরা সবাই ছুটে এসেছে। ফিল কে? ফিলের কথা তারা জানাতে চাইল। মানুষটি তার বিদেশী অতিথির সম্মানার্থে তার নিজস্ব খামার থেকে সব পাঠিয়েছে। বেগুন, টমেটো, পটল, ঝিঙে কিছুই বাদ নেই। ফিল খুবই সজ্জন ব্যক্তি এমন বললেন মুখার্জি। এমন কি একটা থলেতে কাঁচা লঙ্কা পর্যন্ত। গন্ধরাজ লেবু। ফিল তবে সবই মনে রেখেছে।

আগে মুখার্জির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে জাহাজে বাঙালি খানা খেয়ে খুশি হয়েছিল। আসলে এই দ্বীপের এবং অন্যান্য দ্বীপগুলিতে চাইনিজ রান্নার চল আছে। ভারতীয় রান্নারও। ফিল মনে রেখেছে। মুখার্জি ডালের সঙ্গে গন্ধরাজ লেবু খেতে ভালবাসেন।

লোকটার মগজ এত সাফ—অথচ ফিল কিংবা ফিলিপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে—সব হেঁয়ালি কথাবার্তা। সে যিশুর বার্তা ঘরে-ঘরে, দ্বীপে-দ্বীপে পৌঁছে দিচ্ছে। এবং বসতি মানুষজনের বাড়িয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপগুলিতে। এ ছাড়া সে কিছুই যেন মনে রাখতে চায় না। তিনি ফিলের মিশনারি কাজকর্ম দেখে খুশি হলে, যেন খুবই আনন্দ হবে তাঁর। সেজন্যই হাতে সময় নিয়ে বারবার তাঁকে ফিলের ওখানে যেতে বলেছেন।

আজই যাবে ঠিক করেছিলেন। যাওয়া হল না। যাওয়া কতটা ঠিক হবে ভেবেই যাননি। তাঁর হাতে অনেক কাজ—এখনি একবার যাওয়া দরকার বাটলারের ঘরে। বন্দরে এলেই বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে জাহাজের একটি মোটামুটি সব কিছুর তালিকা পৌঁছে দিতে হয়।

শুল্ক বিভাগ এখানে নামেমাত্র থাকলেও তাঁরা নিয়মনীতি মেনে চলেন। তালিকায়, জাহাজে কি আছে, কতজন ক্রু, তাদের নাম, ঠিকানা, অফিসার ইঞ্জিনিয়ারদের নাম ঠিকানা সই সব খবরই থাকে। চিফ মেটের কাজ হলেও বাটলার নানা ব্যাপারে চিফ মেটকে সাহায্য করে। এখন তাঁর কাজ একটি তালিকা হাতানো। অন্তত অফিসার ইঞ্জিনিয়ারদের নাম ঠিকানা তাঁর দরকার।

অবশ্য এতে তিনি কাজ কতটা উদ্ধার করতে পারবেন জানেন না। দেখাই যাক না, অফিসার ইঞ্জিনিয়ারদের আসল পরিচয় কি। তারা টেকসাসের লোক না সত্যি ওয়েলসের লোক তাও বোঝা যাবে। টেকসাস কিংবা অন্য যেখানকারই হোক, যদি তারা ওয়েলসের ঠিকানা দেয় তা হলেও কিছু করণীয় নেই। দিতেই পারে। তারা ভারতীয় জাহাজি বলে, মার্কিন মুলুক থেকে অফিসার ইঞ্জিনিয়ার নেবে তেমন ভাবাও ঠিক না। আবার নিতেও পারে। নানা সংশয়ে পড়েই বাটলারের কাছে যাওয়া।

নিনামুরকে যাওয়ার আগে বললেন, 'আমার ঘরে এসে বোস। আরে এস। তোমার কর্তাকে এক বোতল সরষের তেল দেব। নিয়ে যবে।' নিনামুর কিছুতেই বাঙ্কে বসবে না। সুহাস সুরঞ্জন এবং সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেও নিনামুর খুব সহজ হতে পারছে না।

কর্তার সঙ্গে ওঠাবসা করেন, সে কি করে এমন মানুষের বিছানায় বসতে সাহস পাবে। লাল বেল্টটি মাথায় ঠিক বেঁধে রেখেছে। তবে আজ সে লুঙ্গি পরেনি। হাফ প্যান্টও নয়। পারিপাট্য আছে জামা-কাপড়ে। ভেট নিয়ে এসেছে—মালিকের সম্মান বলে কথা। মুখার্জির কথাবার্তাও খুব ভাল বুঝছে বলে মনে হয় না। সে উসখুশ করলে মুখার্জি বললেন, 'ঠিক আছে যাও।' বলে ফিলকে একটা ছোট্ট চিঠিতে জানালেন, তিনি হাতে সময় নিয়ে যাচ্ছেন। দরকারে তিনি দু-একদিন থাকতে পারেন। সঙ্গে জাহাজের আরও দু-একজন যেতে পারে এমনও ইঙ্গিত দিলেন চিঠিতে। নিনামুরকে বললেন, 'বোটে অপেক্ষা কর। আমাকে কিনারায় নামিয়ে দিয়ে যাবে।'

তারপর তিনি আর দেরি করলেন না। কারও সঙ্গে তাঁর কথা বলারই সময় নেই যেন। দেয়ালে ছোট্ট আয়না ঝুলিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দাড়ি কামানো দরকার মনে হল। চিৎকার চেঁচামেচিরও খামতি নেই। 'এই অধীর, গরম জল দিয়ে যা। আমার ব্রাশ কোথায় গেল। কিছুতেই জায়গারটা জায়গায় থাকে না।' জাহাজিদের এই দোষ। জামা-কাপড় থেকে পেস্ট সাবান, যে যার মতো তুলে নেয়। কার দেখার দরকার হয় না। এই নিয়ে বচসাও হয়, আবার মিটেও যায়। অধীর বলল, 'দাঁড়াও দিচ্ছি।'

সে ছুটে গিয়ে মুখার্জিদার সেভিং ক্রিম থেকে ব্লেড সব নিয়ে এল। কাপে করে গরম জল রেখে গেল। সুহাস তখনও ঘুম থেকেই ওঠেনি। ছুটির দিনে সবারই ঘুম ভাঙতেও দেরি হয়। কাল রাতে সুহাসের ঘুমও বোধহয় ভাল হয়নি। সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। সুরঞ্জনকে ডেকে বললেন, 'তোরা চা খেয়ে নিস। ওকে ডাকতে যাস না। আমি যাচ্ছি। আজ তো ভোজ। দারুণ।'

'তুমি ফিরবে কখন?'

'কাজ হয়ে গেলেই ফিরব।'

'কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না! কখন ফিরবে বলে যাবে না। মুরগিগুলো কি হবে! ডবকা ছুঁড়ির মতো চিংড়িগুলি লাফাচ্ছে। পিছিলে দেখগে কি গেঞ্জাম! আর তুমি বের হয়ে যাচ্ছ! সারেঙসাব কেবল বলছেন, কি হবে না হবে মুখার্জিবাবু বলে যাবেন না!'

জুতো ব্রাস করতে করতে বললেন—'যাচ্ছি হরসাগামে। ফিরতে বারোটা-একটা বেজে যেতে পারে। সারেঙসাবকে বলবি, ডেক জাহাজিদেরও যেন খেতে বলা হয়। সবাই মিলে খাওয়ার মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে। জাহাজিরা কেউ যেন বাদ যায় না।'

'হঠাৎ হরসাগামে যাচ্ছ!'

'যাচ্ছি কাজ আছে বলে। সব সময় কৈফিয়ত।'

সুরঞ্জন আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সকাল বেলায় এত কি জরুরি কাজ— যে তিনি হরসাগামে চললেন। সেখানে সব আস্তাবল পর পর। আস্তাবলে গিয়ে কি হবে। তরপরই চকিতে সে এই তাড়াহুড়োর ব্যাপারটি ধরে ফেলল। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে হলে রেজিস্ট্রি খাতায় সই করতে হয়। ঠিকানা দিতে হয়। কাল কে কে ঘোড়া নিয়ে গেছে, কি নাম, ঠিকানা কি, হয়তো খোঁজ নিতেই চললেন তিনি।

সবাইকে বোকা ভাবে! সুরঞ্জন গজ গজ করছে। আসলে আজকের সকালটা সত্যি মনোরম। মুখার্জিদা না থাকলে কেমন ম্যাড়মেড়ে—কিচ্ছু ভাল লাগে না। মুখার্জিদা না থাকলে যা পরিস্থিতি জাহাজে তাতে আতঙ্কেরও কারণ থাকে। তার কেন যে মন সায় দিচ্ছিল না, মুখার্জিদা এ-সময় বের হোক।

সে না বলে পারল না, 'এত বোকা ভাবছ। তোমার মাথা তো সাফ জানতাম! গুঁফো লোকটার হাসি খুঁজতে যাচ্ছ! ভাবছ তুমিই বুদ্ধিমান। আর সবাই নির্বোধ। ধূর্ত লোকেরা ক'পা হাঁটতে হয়, ক'পা পিছোতে হয় ঠিকই জানে। জাহাজের ঠিকানা কখনও দেয়! দিলে ধরা পড়ে যাবে না!'

মুখার্জি সুরঞ্জনের দিকে বেশ তারিফ করার চোখে তাকালেন। একজন হবু গোয়েন্দার সহকারী যদি তার কর্তার গতিবিধি আঁচ না করতে পারে তবে আর তাকে দরকার হবে কেন?

তিনি বললেন, 'দেখতে দোষ কি! নামগুলি টুকে আনব ভাবছি।'

'কিচ্ছু পাবে না ব'লে দিলাম। যাচ্ছ যাও। তবে কোনও কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'শোন সুরঞ্জন, আমরা সামান্য জাহাজি—এখানে কোনও পুলিশ ফাঁড়ি নেই। খবর দিতে গেলে সেই মাদাঙ। আমরা কে, যে আমাদের অভিযোগ তারা শুনবে। কাপ্তান ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই। যেই খুন করুক, সময়টা ঠিক বেছে নিয়েছে। পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, কাপ্তান ছাড়া কেউ নেই। খুন না দুর্ঘটনা—তিনি ছাড়া কারও কথা কানে তুলবে না। কাপ্তানের কাছে যাব! যাওয়া ঠিক হবে! এত সব কাণ্ড ঘটছে জাহাজে, তারপরও কি তাকে বিশ্বাস করা যায়! মাই ফেইথফুল সেলর! জানা আছে কত ফেইথফুল! নাটক বুঝলি!'

মুখার্জি সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে উঠে যাবার মুখে ছোট টিন্ডাল বলল, 'সারেঙসাব ডাকছে।'

তিনি যেতে যেতেই বললেন, 'আরে ডাকাডাকির কি আছে! তাঁর কথামতোই সব

হবে। তিনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। সারেঙসাব আর চেয়ে কি কম বোঝেন। মেনু কি হবে তাঁর কাছে জেনে নাও।'

কারণ মুখার্জি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ থেকে নেমে যেতে চান। নিনামুরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। সে ঠিক গ্যাঙওয়ের সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে। একবার বাটলারের ঘরেও উঁকি মেরে যেতে হবে। ফালতু ডাকাডাকি কার এ সময় ভাল লাগে!

আর তখনই হরেকেষ্ট ছুটে এসে তাকে তালপাতার টুপিটা দিল।

'রোদে বের হচ্ছ! সুরঞ্জন পাঠিয়ে দিল।'

এই এক স্বভাব তাঁর। তাড়া থাকলে ভুলের অন্ত থাকে না। টুপিটার খুবই দরকার। ডেকে এসেও মনে হয়নি। বেশ কড়া রোদ উঠেছে। চারপাশে যতদূর চোখ যায় দ্বীপটা রোদে ঝলমল করছে। তিনি পকেট হাতড়ে কি খুঁজলেন—না আছে। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার নিতে ভুল করেননি।

প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে বাটলারের কেবিনে গিয়ে টোকা মারলেন।

পর পর সব কেবিন। বাটলারের কেবিনটা সবার শেষে। আগের দুটো কেবিনে, দু'জন মেসরুম বয় চারজন মেসরুম-মেট ভাগাভাগি করে থাকে। পরের কেবিনটাতে থাকে চিফ কুক, সেকেন্ড কুক। মাঝখানের রাস্তা পার হয়ে কাপ্তানবয়ের কেবিন। তারপর বাটলারের কেবিন। কেবিনে কেউ নেই। ছুটির দিনেও এদের বিশ্রাম নেই। যে যার কাজে নেমে গেছে। বাটলার আছে কি না? তবু টোকা মারতেই দরজা খুলে বাটলার এক গাল হেসে বলল, 'মুখার্জিবাবু কি ব্যাপার!'

'ব্যাপার কিছু না। একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন।'

'তোমাকে এই যে তালিকা দেওয়া হয় না, জাহাজে রসদ কি আছে না আছে, ক্রু, অফিসার কতজন, কি নাম, ঠিকানা—তালিকার একটা কপি আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে।'

'এক্ষুনি দরকার? দরকার তো দাঁড়ান। দেখছি খুঁজে।'

'খুঁজে রেখে দিয়ো। আমি বিকেলে এসে নেব।'

বাটলারের সঙ্গে কথা বলে দুটো উইন্ডসহোল পার হয়ে চিমনির গোড়ায় এসে মুখার্জি হতবাক। সামনে সুটের মুখে কে উবু হয়ে আছে! কয়লার সুট। কয়লা ফেলার মুখ এটা। তিন ফুটের বর্গাকৃতি একটি পাটাতন তুলে দিলেয়ই মুখটা গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে প্রায় বিশ বাইশ ফুট নীচে ঢুকে গেছে। হাতির শুঁড়ের মতো বিশাল চোঙওলা মুখ ওখানে ঢুকিয়ে দিলেই ঘণ্টা চার-পাঁচেকের মধ্যে বাঙ্কার কয়লার পাহাড় হয়ে যায়। সেই সুটের মুখে কে উবু হয়ে আছে? পড়ে গেলে একেবারে ছাতু হয়ে যাবে। কাজ নেই কাম নেই, এখান থেকে কয়লা তোলার কথাও নেই। তোলা হলেও মই লাগিয়ে তোলা যেতে পারে। খরচ বেশি। কোম্পানি এত দরাজ! মাথায় মুহূর্তে নানা সংশয় উঁকি দিতেই ভাবলেন—একবার দেখাই যাক না, কে সে!

অবাক—চার্লি! উইন্ডসহোলের পাশে পাটাতন তুলে চার্লি ঝুঁকে কি দেখছে!

মুখার্জিকে দেখে কিছুটা যেন বিব্রত বোধ করছে চার্লি।

মুখার্জি বললেন, 'গুড মর্নিং চার্লি।'

চার্লি মুখার্জিকে দেখে আদৌ খুশি নয়। বিশেষ করে এই অসময়ে! মুখ গোমড়া। তবু সাড়া দিল, 'গুড মর্নিং।'

মুখার্জির সব মনে পড়তেই মুখে মজার হাসি খেলে গেল। আই অ্যাম স্লিম, টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড। চার্লি সত্যি ফুল ব্রেস্টেড। তার ঘাড় গলা দেখে আর এটা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। চুলও তার বড় হয়ে গেছে। বেশ কোঁকড়ানো চুল। দেবী-প্রতিমার মতো মুখখানি ঝলমল করছে। চার্লি এখানে কি করছে! সাদা বয়লার সুট পরনে। একবার জোক করতেও ইচ্ছে হল,আর ইউ গার্ল? কিন্তু তিনি অত্যন্ত সংযত গলায় বললেন, 'এভাবে কেউ ঝুঁকে দেখে! নীচে কি কিছু পড়ে গেছে! কি খুঁজছ। এত ঝুঁকে দেখছ, পড়ে গেলে কি হবে?'

'কিছু না। পড়ে যাব কেন?'

চার্লি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। প্রায় বিশ-বাইশ ফুট নীচে বাঙ্কার। অন্ধকারে কিছু দেখা যাবারও কথা নয়। এদিকটায় আর কাউকে দেখা গেল না। অফিসার ইঞ্জিনিয়াররা কিনার দেখা গেলে পাশের রেলিঙে এসে ঝুঁকে দাঁড়ান। এই রাস্তাটায় অফিসার ইঞ্জিনিয়াররাই হাঁটাহাঁটি করেন। আর এই উইন্ডসহোলের পাশে মধ্যরাতে কি সে এসে সুটের পাটাতনে দাঁড়ায়!

চার্লি দ্রুত পাটাতন তুলে সুটের মুখ বন্ধ করে সরে পড়ল। একটা কথাও বলল না।

যাক চার্লি আবার আগেকার চার্লি। সুহাসের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি কাজে লেগেছে। এতে তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। চার্লিকে দেখেই মনে পড়ে গেল, আরে সুহাসকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। একা কতদিক সামলাবেন বুঝতেও পারছেন না। রেলিঙে ঝুঁকে হাতের ইশারায় নীচে নিনামুরকে জানিয়ে দিলেন, তিনি আসছেন। কারণ এক্ষুনি তাঁকে একবার ফোকসালে ফিরে যেতে হবে। একটু দেরি হবে। বেচারা নীচে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। সবই তিনি গোলমাল করে ফেলছেন। গ্যাঙওয়েতে পরির সময় মাথা এত পরিষ্কার থাকে—আর ফোকসালে ঢুকে গেলেই সব ভুলভাল হয়ে যায়। গণ্ডগোলের মূলেও ফিল। সাতসকালে ভেট পাঠানোতে তিনি তাজ্জব।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছিলেন ডেক ধরে। সুরঞ্জন পিছিলে বসে আছে—সে বুঝতেই পারছে না, কিনারায় গেলেন না কেন মুখার্জিদা। ফিরে আসছেন কেন! আবার কি কিছু ফেলে গেলেন। বেঞ্চিতে আর বসে থাকা যায়! সে নেমে মুখার্জিদার দিকে এগিয়ে গেল—'কি ব্যাপার! ফিলে এলে! কিনারায় গেলে না!'

মুখার্জিদা তাকে ইশারায় সঙ্গে আসতে বললেন। মেসরুম পার হবার মুখে দেখলেন, মুরগি হালাল করতে বসে গেছে—কয়লাআলা হাফিজ। সে মুরগির নলি কেটে হাতে চেপে রাখছে। দৃশ্যটা দেখতে তাঁর ভাল লাগছিল না। খেতে বসলেও দৃশ্যটা মনে পড়বে। খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। যে কোনও নৃশংস ঘটনাই তাঁকে পীড়নে ফেলে দেয়। তিনি সিঁড়ি ধরে তরতর করে নামার সময়ই বললেন, 'সুহাস উঠেছে? সুহাসের সঙ্গে জরুরি কথা আছে। ও উঠেছে কি!'

সুরঞ্জন বলল, 'উপরে তো দেখলাম না। উঠেছে বলে মনে হয় না। কি দরকার?'

'আয় না।'

সুহাসের ফোকসালে উঁকি দিতেই মনে হল, সে উঠেছে ঠিক—তবে কেমন মনমরা। মুখার্জিদাকে দেখেও দেখল না। কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না মুখার্জিদা উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে।

সুরঞ্জন বলল, 'দেখছ ছোঁড়ার কাণ্ড! আরে তোর হল কি। আমাদের এত দেখার কি দরকার হল। তুইও বংশী হয়ে গেলি শেষে!'

সুহাস অগত্যা কি করে! বলল, 'কিছু বলবে।'

'আয়। নেমে আয়! মুখ ধোসনি। চা-ও খেলি না। চুপচাপ ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছিস। আমি তো ভাবলাম, ঘুমে কাতর!'

মুখার্জিদা বললেন, 'দেরি করিস না। হাতে সময় নেই।'

সুহাস জামা গলিয়ে মুখার্জিদার ফোকসালে ঢুকলে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, চার্লির কাছে তার পরিবারের কোনও অ্যালবাম আছে? অনেকেই তো সঙ্গে নিয়ে আসে। মন-মেজাজ খারাপ হলে অ্যালবাম খুলে মা-বাবা ভাই-বোনদের ছবি দেখে। বিয়ে করলে বউয়ের। ছেলেপুলে থাকলে তাদের।'

মুখার্জিদা বসছেন না। দাঁড়িয়েই আছেন, সুরঞ্জন বলল, 'এর জন্য ফিরে এলে! কখন যাবে, ফিরবে কখন!'

সুহাস বলল, 'ম্যাকের অ্যালবাম দেখেছি। সে দেখাব। কিন্তু চার্লি তো কোনও অ্যালবাম খুলে তার প্রিয়জনদের ছবি দেখায়নি।'

সুরঞ্জন ফুট কাটল। 'দেখাবে কি, প্রিয়জন থাকলে তো দেখাবে!'

মুখার্জিদা সুরঞ্জনের কথা গ্রাহ্য করলেন না। শুধু বললেন, 'আজই খোঁজ করবি—যদি অ্যালবাম থাকে। ডরোথি ক্যারিকো—কি নাম যেন জাহাজটার—যাই হোক, জাহাজটার কোনও নিজস্ব গাইডবুক যদি থাকে। ওর ঠাকুরদা ব্যবসা ভালই বুঝতেন। ব্যবসা রকরমা কি করে করতে হয় তাও জানেন। ডরোথি ক্যারিকোর ছবি, লাউঞ্জের ছবি, কিংবা দ্রষ্টব্য কিছু যদি থাকে জাহাজের তার ছবি গাইডবুকে থাকতেই পারে। চার্লির কাছে না থাকলেও তার বাবার গোপন লকারে থাকতে পারে। চার্লিকে খুঁজে দেখতে বলবি। কলিজ জাহাজের খোঁজে যদি সত্যি আসেন, তবে সঙ্গে ডরোথি ক্যারিকোর গাইড বুকটিও সঙ্গে রাখবেন। কলিজ জাহাজের সঙ্গে ডরোথি ক্যারিকোর মিল কতটা, কি আদৌ কলিজ জাহাজ ডরোথি ক্যারিকো কিনা বুঝতে গাইড বুকটি তার দরকার, বুঝলি কিছু! মাথায় গেছে!'

সুহাস মুখার্জির বালিশ টেনে বাঙ্কে শুয়ে পড়েছে। কিছুই যেন তার শোনার আগ্রহ নেই। কেমন উদাস হয়ে গেছে।

জবাব না দিলে কার না রাগ হয়!

'আরে দেখছ ছোঁড়ার কাণ্ড। আবার শুয়ে পড়ল! এমন চোখে তাকাচ্ছে আমাকে যেন চিনতে পারছে না। কি রে তোর হয়েছেটা কি! ফের শুয়ে পড়লি! চোখে মুখে জল দিলি না। চা খেলি না। কত বেলা হয়েছে। ওঠ বলছি। না উঠলে লাথি মেরে তুলে দেব।'

সুহাস বলল, 'আমি কিচ্ছু করতে পারব না। আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমিই বরং চার্লিকে বলে যাও। কাপ্তান কিছু মনে নাও করতে পারে। দেখলে না রাতে আর

বিশ্বস্ত জাহাজিদের লেকচার মারল।'

'আমি বলতে পারলে, তোকে সাধব কেন?'

সুরঞ্জন বলল, 'চার্লি কি পারবে! আর গাইড বুক, কিসের গাইড বুক! ডরোথি ক্যারিকো কি শহর না ঐতিহাসিক জায়গা। তার গাইড বুক থাকবে!'

মুখার্জির দেরি হয়ে যাচ্ছে। জামার আস্তিন টেনে ঘড়ি দেখলেন—

'তোরা বুঝছিস না। ডরোথি ক্যারিকো প্রমোদ তরণী। ধনকুবেরের বাচ্চারাই ফুর্তিফার্তা করতে বের হয়ে যেত। টাকা উড়ত। নাচা গানা, সাঁতার কাটা, তার লাউঞ্জ সবই বিজ্ঞাপনের ভাষায় অতি চমৎকার। ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণের জন্য গাইডবুক থাকতেই পারে। দেখিস না বিমান কোম্পানিগুলির কত সুন্দর সুন্দর গাইডবুক থাকে। কোথায় কি সুযোগ-সুবিধা গাইডবুক না থাকলে ভ্রমণার্থীরা আকর্ষণ বোধ করবে কেন?'

সুহাস বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কথার গুরুত্ব বুঝতে চাইছে না। সুরঞ্জনও যেন পাত্তা দিচ্ছে না তাঁর কথা—গাইডবুক শেষে তোমাকে গাইড করবে! হয়েছে বেশ! এই সুহাস এত মনমরা হলে লাথি মেরে সত্যি জলে ফেলে দেব। ওঠ। যা বলছি শোন।'

সুহাস বালিশ থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'ঠিক আছে চার্লিকে বলব। এখন যাও তো!'

উপরে ওঠার সময় দু'জনই লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে মুখার্জি, সুরঞ্জন। এটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙা—দু-পাশের রড ধরে কখনও সিঁড়িতে পা না রেখেই নীচে আসা সড়াত করে, একেবারে জলভাত। ওঠার মুখে মুখার্জি বেশ চিন্তিত। দ্বিধা-দ্বন্দ্বও কম না। না বলে পারলেন না, 'সুহাসের কি হয়েছে বলতে পারিস! কিছুই গা করছে না!'

'আরে বুঝছ না—নারী। নারী এখন যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে আছে। স্লিম, টল, ফুল ব্রেস্টেড হয়ে আছে—যেদিকে ছোঁড়া তাকায় চার্লি এখন তার দেবীরূপেণ সংস্থিতা। মাথা ঠিক রাখতে পারে! তুমি হলে পারতে? চাপ সৃষ্টি করে লাভ নেই। মাথা খারাপ—রাতে ছোঁড়া আকাম কুকামও করতে পারে। দেখছ না, কেমন ক্লান্তি মুখে। অলস। রাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি বোঝাই যায়।'

আর তখনই নীচে থেকে হাঁকছে সুহাস, 'মুখার্জিদা শোনো। ও মুখার্জিদা!'

ওরা মেসরুম পার হয়ে পিছিলে ঢোকার মুখেই সুহাসের চিৎকার শুনে ছুটে গেল নীচে।

সুহাস দরজার বাইরে দ্বিতীয় সিঁড়ির পাশে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে।

'কি হল!'

'শোনো।'

'না, এখন আমার শোনার কিছু নেই।'

'শোনোই না।'

হয়তো খুবই জরুরি খবর। সুহাস তো মাঝে মাঝে এভাবেই, কলিজ জাহাজের কাগজপত্র তার মুখের উপর ছুঁড়ে দিত। যদি ডরোথি ক্যারিকোর ছবি-টবি চার্লি আগেই তাকে দিয়ে

থাকে—এ সব ভাবতে ভাবতে নীচে ছুটে গেলেন।

'কি বল!'

'ভিতরে এস না!'

তবে খুবই গোপন খবর।

মুখার্জি ভাবলেন, যা হোক ছোঁড়ার মাথা ঠিকই আছে। সুরঞ্জনও ঢুকে গেছে। কি খবর কে জানে। খবরের মূল সূত্রগুলি তো সুহাসই যোগাড় করে দেয়। না হলে জানতেই পারত না—চার্লির মা নেই। চার্লি ধনকুবেরের নাতি, বেটসির দুর্ঘটনা, চার্লিকে তার ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছে! এমনকি প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটিরও প্রাথমিক রিপোর্ট সুহাসই সংগ্রহ করেছিল—এত সব মাথায় যখন মুখার্জির কাজ করছে—তখন, সুহাস যা বলল!

'কি বললি!' রেগে আগুন মুখার্জি।

'না বলছিলাম, চার্লিকে বোটডেকে দেখলে!'

'এ-জন্যে ডেকে আনলি।'

'না বলছিলাম, যদি দেখে থাকো।'

'দেখে থাকলে কি হবে! এই হারামজাদা, তুই নিজে উঠে দেখতে পারিস না, চার্লি বোটডেকে না, তোর কেবিনে? আমার কি দায় পড়েছে চার্লি কোথায় আছে দেখার!'

মুখার্জি সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কি করব বল! যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। বোঝো! ধুস শালা, যাবই না। যা হয় হোক! চার্লি শেষে তোর মাথাটিও খেল!'

সুরঞ্জন বলল, 'অযথা রাগ করে লাভ নেই। আমি বুঝি কি হয়! বলে সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা ওপরে যা। নিজের চোখে দেখে আয়, তোমার দেবীরূপেন সংস্থিতা কেমন আছেন!'

সুহাস কিছুটা বিব্রত বোধ করছে। এ জন্য মুখার্জিদাকে ডেকে আনা উচিত হয়নি। বোকার মতো তার উচাটন এভাবে ধরা পড়ে যাবে বুঝতেই পারেনি। মুখ ব্যাজার করে বাঙ্কে বসে পড়ল।

আর কি যে মায়া বেড়ে যায়। মুখার্জি নিজের ক্ষোভ সহজেই হজম করে বললেন, 'চার্লি বেশ স্বাভাবিকই আছে। তুই দেখছি অস্বাভাবিক আচরণ করছিস। যা। উপরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা চাপাটি হচ্ছে খেয়ে নে। ফিল কত কিছু পাঠিয়েছে। এত বড় বড় গলদা চিংড়ি। মুরগি। ফিস্টি হচ্ছে। ফূর্তি কর। গুম মেরে কেবিনে পড়ে থাকিস না। সব গুলি মেরে ফুর্তিফার্তা করতে শিখ। চার্লিকে দেখলাম বোটডেকে সুটের পাটাতন তুলে ঝুঁকে কি খুঁজছে। আমাকে গুডমর্নিংও বলেছে। ভালই আছে—এখন তুমি ভাল না থাকলেই আমাদের বিপদ। যত সব ঝামেলা!'

বাইশ

সুহাস চোখে মুখে জল দিল। দাঁত মাজল। ফোকসালে নেমে আয়নায় মুখ দেখল। তার দাড়ি কামাতে হয় না। ঈষৎ নীলাভ দাড়ি গালে, সমুদ্রের জল হাওয়ায় গায়ের রঙ খুলে গেছে। নোনা হাওয়ায় গুণ। মনেই হয় না, রাতে না ঘুমিয়ে সে খুবই কাহিল। সে তবে জোর পাচ্ছে না কেন! উপরেও উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এক অজানা আতঙ্কে, না, চার্লির

সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাকে সামলাবে কি করে—কারণ চার্লি যদি সত্যি জোরজার করে—আচ্ছন্ন অবস্থায় চার্লি ভালও ছিল না—এখন তারা যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে সে জানে না।

কেমন কুহক মনে হয়। গত রাতের ঘটনা কেন যে এখনও তার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। চার্লির কাশের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া, তার খোঁজাখুঁজি, চার্লির সমুদ্রস্নান, সাঁতার কাটা—এবং ক্লান্ত শরীর টেনে এনে পাথরে জলকন্যার মতো বসে থাকা সবই যেন এক কুহেলিকা। কেবিনে খুবই অবিন্যস্ত পোশাকে চার্লির পড়ে থাকাও সে কেন যে সহ্য করতে পারছে না। চার্লির সব দেখে ফেলার পর, সে কিছুটা গুটিয়েও গেছে। আর সে আগের মতো নেই। ভিতরে তার ঝড় উঠে গেছে। কি করবে! দরজা খুলে কাপ্তানকে দেখার পর ভয়ে সে হিম হয়ে গিয়েছিল—চার্লি জানে না, তার বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে হয়তো সব শুনেছেন। সেই অদৃশ্য প্রেতাত্মাও···

চার্লি তাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চায়।

কোথায় কতদূরে সে জানে না। প্রকৃতই সে যেতে চায়, না, আচ্ছন্ন অবস্থায় যা ভাবে, তাই প্রকাশ করে ফেলে—সে বুঝতে পারছে না। কি ভাবে চার্লির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তাও বুঝতে পারছে না। মুখার্জিদার কথামতো কাজ না করলেও খেপে যাবেন। প্রমোদ তরণীর খবর নিতে বলে গেছেন। শুধু কি ডরোথি ক্যারিকো—সেই লোকটা কে? চার্লি নিশ্চয় তাকে চেনে। না হলে বলে কি করে, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল নাথিং ক্যান স্টপ মি। কোনও অজ্ঞাত অপরাধী যে লোকটা নয়—লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেবারা ক্ষমতা রাখে চার্লি এমনও মনে হয়েছে তার। আসলে নির্জন বালিয়াড়িতে মার খাওয়ার পর থেকে সে কিছুতেই তার হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

মাঝে মাঝে সে তার অবসাদ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে। পারেনি। চার্লির কেবিনে সে ঢুকে বুঝেছিল, সে শক্ত না থাকলে চার্লি আরও ভেঙে পড়তে পারে। তাকে সাহস যুগিয়েছে। যা বলেছে, তাতেই সায় দিয়েছে। কোনও কারণেই চার্লি হতাশ হয়ে পড়ুক সে চায়নি। যেন জাহাজ তার শেষ বন্দর পেয়ে গেছে—দড়িদড়া গুটিয়ে শুধু নেমে পড়া।

বুনো ফুলের গন্ধে সেও আচ্ছন্ন—কিন্তু তাকে শক্ত হতেই হবে। ঘরে সে পায়চারি করছিল, মাঝে মাঝে বের হয়ে আবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল।

অধীর চা আর চার-পাঁচ টুকরো মেটে সেদ্ধ রেখে গেছে। চাপাটি রেখেছিল। চাপাটি খেল না। চা, মেটে সেদ্ধ খেয়েছে। উপরে সবাই গুলতানি করছে বোঝা যায়। দৌড়ঝাঁপও টের পাওয়া যাচ্ছিল। বড় গামলা এনে কেউ রাখছে। তার শব্দও সে নীচে বসে টের পাচ্ছিল। উপর থেকে নেমেও আসছে অনেকে। তাকে ডাকাডাকি করেছে। সে ওপরে ওঠার কোনও মেজাজ পায়নি। সে কেন যে এভাবে জড়িয়ে পড়ল।

না আর দেরি করা ঠিক হবে না। যা হয় হবে—চার্লির কেবিনে না যাওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। চার্লি একবার খোঁজ নিতে আসতে পারত। বোধহয় কোনও অসুবিধা আছে তার। বরং সে গেলে দৃষ্টিকটু দেখাবে না। কাপ্তান এত রাতে বিশ্বাস করে চার্লির কেবিনে পাঠাতে পারেন যখন···।

সে উঠে গেল উপরে। মেসরুমে সবাই ব্যস্ত। গামলায় মুরগির মাংস, বড় বড় গলদা চিংড়ি ছাড়ানো। নারকেল কোরা। সরু চাল বেছে একটা গামলায় আলাদা রেখে দেওয়া—বিরিয়ানি হবে হয়তো। কনডেনস মিল্কের কৌটো সাজানো—পায়েস হবে হয়তো—অথচ তার কিছুতেই আগ্রহ নেই। সে এমনকি মেসরুমে চুপি দিয়েও দেখল না। সহসা কেন সবই এত অর্থহীন হয়ে গেছে সে বুঝতে পারে না।

সুরঞ্জনও বসে গেছে। আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। সুহাসবাবু সেজে উঠে আসায় রসিকতাও করল, 'এই যে আমাদের গেস্টের যা হোক পাত্তা পাওয়া গেছে! চললি কোথায়!'

'আসছি' বলে, সুহাস সুরঞ্জনকেও এড়িয়ে গেল।

'আরে যাচ্ছিস কোথায়!'

সুরঞ্জন আলুর খোসা হাতে নিয়েই ছুটে এল।

'কোথাও না।'

'কোথাও না মানে!'

'বোটডেকে যাচ্ছি।'

সুরঞ্জন বলল, 'বোটডেকে যাচ্ছ যাও, সেখানে জমে যাবে না। ফিরে এসে কাজে হাত লাগা। দেখছিস না এলাহি ভোজ হচ্ছে। বসে থাকলে চলবে! তোমার তো আমরা কেউ নই। একবার বলতেও পার না, চার্লির কাছে যাচ্ছ। চার্লির কাছে গেলে কি আমরা খেয়ে ফেলব। একেবারে ভেড়া বনে গেলি! আমাদের কোনও দাম নেই!'

সুহাস হাসল। গায়ে মাখল না। এটাও এক ধরনের ক্যামোফ্লেজ করে রাখা—কারণ সুরঞ্জন সবই জানে। ঠাট্টা হোক, গম্ভীর চালে হোক কিংবা দরদ দিয়েই হোক তার ত্রিশঙ্কু অবস্থার কথা টের পেয়ে মুখার্জিদাকে বলেছে, 'দেবীরূপেণ সংস্থিতা। সুহাসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তোমার হলে কি করতে! অযথা গালমন্দ করছ!'

সুহাস যে খুবই অন্যমনস্ক তার হাঁটার ভঙ্গি দেখেই টের পাওয়া যায়। সে উঠেও গেল। সিঁড়ি ধরে বোটডেকে উঠে চার্লির কেবিনে কড়া নাড়ল। চার্লি নেই। লাইফবোটের পাশে ডেকচেয়ারে চুপচপ বসে আছে চার্লি। হাতে তার একটা সদ্য আঁকা ক্যাকটাস। সামনে ইজেল। এত সব ঘটে যাবার পরও চার্লি ছবি আঁকার কথা ভাবতে পারে! তার কিছুটা অবাক হবারই কথা। চার্লি কি বুনোফুলের ছবি আঁকতে পারলে সব দুঃখ ভুলে থাকতে পারে! প্রায় নিঃশব্দে সে চার্লির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লি ছবিটা দেখতে দেখতে কেমন মজে গেছে। ক্যাকটাসটা ডালপালা মেলে দিয়েছে। বিশাল দুটো রঙিন পাথর এনামেল রঙের—কোথাও খয়েরি এবং হলুদ রঙের সমাবেশ। ক্যাকটাসের ডালে আশ্চর্য নীল সাদা দুটো ফুল। নীচে লিখে রেখেছে ব্ল্যাক চোল্লা। ক্যাকটাসটা এত সজীব। আর ঊষর অঞ্চলের আভাস ফুটিয়ে তুলেছে মাত্র কয়েকটা রেখা টেনে। আরও সব পাশে পাথরের খাঁজে খাঁজে রঙিন ফুলের বাহার। কোনটার কি নাম নীচে অবশ্য কিছু লেখা নেই।

সুহাস ডাকল, 'চার্লি!'

চার্লি মুখ ঘুরিয়ে সুহাসকে দেখল। তারপর ছবিটার দিকে তাকাল। তারপর থেমে থেমে বলল, 'অল মাই লাইফ আই হ্যাভ লাইকড ওয়াইলড ফ্লাওয়ারস—কিছু ভাল লাগছে

না সুহাস। কি যে করব! মাথা কেমন করতে থাকে। বসে বসে এই কিছু করা। তুমি কি কিছু বলবে!'

'ছবিটা দেখি!'

চার্লির গুণগ্রাহী সে। বলল, 'দারুণ এঁকেছ। সারা উষর অঞ্চলে ফুল ফুটিয়ে রেখেছ দেখছি। দারুণ। এটা আমি নেব। দেবে তো! উষর অঞ্চলে সব সময় ফুল ফুটিয়ে রাখা তো খুবই কঠিন।'

'দেব না কেন! সত্যি তুমি নেবে?' যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না সুহাসের কথা।

আসলে সুহাস কিছুটা নিজেও স্বাভাবিক থাকতে চায়। এ সব কথা বলার জন্য এখানে সে আসেনি। তার তো খবর নেবার কথা ডরোথি ক্যারিকোর কোনও ছবি আছে কি না। তাদের পারিবারিক অ্যালবামের খবরও নিতে বলেছে।

চার্লি উঠে দাঁড়াল। তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'লাগছে?'

'সামান্য। সেরে যাবে। চিন্তা কোরো না। ভিতরে যাবে?'

ছবিটা নিয়ে সে সুহাসের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে গেল। সুহাস ভিতরে ঢুকলে চার্লি বলল, 'মুখার্জি বের হয়ে গেল কেন?'

সুহাস পাশের সোফায় বসে বলল, 'হরসাগামে যাবে বললেন। কি যে করছেন! তবে সবই তো দেখছি মিলে যাচ্ছে। মুখার্জিদা আগেই টের পেয়েছিলেন, তুমি মেয়ে। আমার বিশ্বাস হত না। তিনি তো ঠিকই বলেছেন। মুখোসটার খবর কিছু রাখ?'

'না।' চার্লি ছবিটার চার কোনায় পিন গেঁথে দিচ্ছে।

'মুখার্জিদা ধরে ফেলেছেন! সেকেন্ড মুখোসটা পরে অনুসরণ করত। এখানেও করছে। মুখোস পরার দরকার কেন আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। তবে মগড়াকে নিয়েও বোধহয় সংশয় আছে। আচ্ছা কাল যা হল—লোকটা কি তোমার চেনা?'

'না না, আমি কাউকে চিনি না।' কেমন ভীতবিহ্বল গলায় চার্লি চিৎকার করে উঠল। তারপর কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন! আমরা আর একা নই। বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার চোখ মুখ কেন এত বিহ্বল দেখাচ্ছে। কি কারণ খুলে বল। মুখার্জিদা তো বললেন, তুমি সব কিছু বলছ না—কেন বেটসি খুন হয়েছে ভাবছ। কেন, বুড়োমানুষের মুখ দেখলে তুমি ভিরমি খাও বুড়োমানুষের মুখ তোমাকে তাড়া করে—তিনি কি তোমার পিছু নিয়েছেন, সেকেন্ড কি জানে, বুড়োমানুষের মুখ দেখলে ভয় পাও! তোমাকে ভয় দেখিয়ে তার কি লাভ!'

'সুহাস আমাকে কেন পীড়ন করছ। প্লিজ, আমাকে পীড়নে ফেলে দিয়ো না। মাথা ঠিক রাখতে পারি না। আমি চাই না, তুমি ছাড়া আর কেউ জানুক, আই অ্যাম টল, স্লিম অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড। তুমি আমাকে ইচ্ছে করলে রক্ষা করতে পার। আমি ভয় পাই সুহাস, দ্য টাইম ইজ কামিং, ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ হিয়ার, হোয়েন ইউ উইল বি স্ক্যাটার্ড, ইচ ওয়ান রিটার্নিং টু হিজ ওন হোম—লিভিং মি অ্যালোন।'

'কেন তুমি এত একা বোধ করছ। কেন তোমাকে একা ফেলে সবাই চলে যাবে! দেশে ফিরে গেলে—তোমার বুনো ফুলের সাম্রাজ্যে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারবে। ইস কি মজা হবে।'

কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য চার্লি বলল, 'সকালে কি খেলে!'

'খেয়েছি। ফিল তার খামার থেকে চিংড়িমাছ মুরগি পাঠিয়েছে। পিছিলে ভোজ হচ্ছে। মেটে সেদ্ধ, এক কাপ চা।'

চার্লি ফোন করল সার্ভিস রুমে।

কাপ্তানবয় এলে বলল, 'দু-গ্লাস ব্লু চেরিজ জুস।'

চার্লি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইছে।

সুহাস তবু নাছোড়বান্দা।

'আমি একা কেন জানব, ইয়ো আর ফুল ব্রেস্টেড। সেই লোকটাও তো দেখেছে। তুমি নারী সেই গুঁফো লোকটাও জানে।'

চার্লির যেন গা কাঁটা দিয়ে উঠল। জলে ডুবে যাবার মতো দু হাতে যেন কোনও অবলম্বন খুঁজছে। সে বসে পড়েছে বিছানায়। খুব ঘামছে। কোনওরকমে যেন বলল, 'সুহাস, আজ কিন্তু আমরা বের হচ্ছি না। বাবা বিকেলে বের হয়ে যাবেন। তুমি চলে এস।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'রিফ এক্সপ্লোরারে।'

'তোমাকে বলেছেন, রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন। তিনি একা যাচ্ছেন না সঙ্গে কেউ যাচ্ছে।'

'চিফমেট যাবেন। সেকেন্ডমেটও যেতে পারেন। ওখানে তাঁরা ডিনারে যোগ দেবেন।'

রিফ এক্সপ্লোরার জাহাজটির খবর মুখার্জিদাও জানে। এত সব খবর তিনি আগে থেকে পান কি করে! জাহাজে সমুদ্রতলের কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। হয়তো কলিজ জাহাজের খোঁজখবর করতেই যাওয়া। ডিনার যে বাহানা নয় কে বলবে। সুহাস ব্লু চেরি জুসের গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে ফের কি ভেবে রেখে দিল। যেন এক্ষুনি না বলতে পারলে পরে ভুলে যেতে পারে।

সে বলল, 'কলিজ সম্পর্কে তুমি কিছু জান চার্লি! না মানে, ছবি-টবির কথা নয়। জাহাজের লাউঞ্জের ছবি, কলিজ ডুবছে তার ছবি দেখিয়েছ। তার আগের ছবিও। কেবিন, লাউঞ্জ, এলিওয়ে, বিলোডেকের ছবি পর্যন্ত। আমি বলতে চাই, কলিজ সমুদ্রের তলায় ডুবে যাবার পর কোনও অনুসন্ধানকারী দল ছবি-টবি যদি জলের নীচ থেকে তুলে নিয়ে যায়। যত গভীরই হোক, তিন চারশ ফুট জলের নীচেও শুনেছি স্বচ্ছ কাচের মতো সব পরিস্কার। ছবি তোলা কঠিন না। অবশ্য আমি সঠিক কিছু জানিও না। সম্ভব কি অসম্ভব তাও জানি না।'

চার্লি বলল, 'আমিও কি জানি! বই-টই পড়ে যতটুকু জেনেছি। শুধু এটুকু জানি, কলিজ ওয়ানস এ লাকসারি লাইনার অ্যান্ড দেন এ ওয়ারসিপ, হ্যাজ বিকাম অ্যা মিউজিয়াম অফ ওয়ারস গ্রেট ওয়েস্ট।'

সুহাস বলল, 'কলিজ কত টনের জাহাজ জান? তুমি যা দিয়েছিলে তাতে বোধহয় কত টনের জাহাজ উল্লেখ ছিল না।'

'দাঁড়াও।' বলে চার্লি দরজা খুলে বের হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল না! সুহাস ঘরে

আছে, দরজা বন্ধ করার দরকারও নেই। কোথায় বের হয়ে গেল, তাও বুঝল না। সে তার বাবার কেবিনে যেতে পারে। সে স্বাভাবিক থাকলে বাবাও তার কেমন নিরীহ গোবেচারা মানুষ। ভদ্র, শান্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী।

সুহাস ভাবল ডরোথি ক্যারিকো সম্পর্কে এক্ষুণি কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পেতে পারে। বিপদের গন্ধ পেলে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। জাহাজ সম্পর্কে কৌতূহল থেকেই বিশেষ করে কোনও বিশাল জাহাজ সমুদ্রের অতলে ডুবে গেলে, তার কি চেহারা দাঁড়ায়—বছরের পর বছর সমুদ্রগর্ভে ডুবে থাকলে নোনাজলে জাহাজ ক্ষয় পেতেই পারে—তারপর একদিন সব ঝুর ঝুর করে যে ঝরে যাবে না—তাও তো বলা যায় না। সমুদ্রগর্ভে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ একশ বছর পর জাহাজের কি পরিণতি হয় জানার কৌতূহল থেকেই যেন সে কলিজের পরিণতি জানার আগ্রহ বোধ করছে।

চার্লি খুব উৎসাহ নিয়ে উঠে গেছে। সুহাসের এত আগ্রহ—চার্লি স্থির থাকে কি করে! সে হয়তো খুঁজছে। তার বাবা যদি কেবিনে থাকেন তিনিও তাকে সাহায্য করতে পারেন। তবে কলিজ সম্পর্কে কোনো সংশয় সামান্য একজন জাহাজির মনে কেন উদ্রেক হতে পারে এমন অবিশ্বাস একজন দুর্ধর্ষ কাপ্তান অনুমান নাও করতে পারেন।

চার্লিকে যে এতটা মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, চার্লি যার এত বশীভূত তাকে খুশি রাখার জন্যও তিনি চার্লিকে সাহায্য করতে পারেন। আর, তখনই কেন যে মনে হল রাতে দরজা খুলে তো সে তাঁকেই দেখেছিল—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—সেই সি-ডেভিল লুকেনারের মতো। হিমশীতল চেহারা। ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন, মেনি থ্যাঙ্কস। আর সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছিল।

মূর্ছা গেলেও খুব অস্বাভাবিক মনে হত না। কে জানে, সি-ডেভিল লুকেনারের প্রেতাত্মা যদি সত্যি কাপ্তানের উপর ভর করে তবে তো তিনি সহজেই টের পাবেন—কলিজ সম্পর্কে এত খবর নেবার উৎসাহ কেন!

চার্লি ঢুকেই বলল, 'আছে। সব আছে। ছবিগুলি রিফ এক্সপ্লোরারই পাঠিয়েছে। এই দ্যাখ!' কি খুশি চার্লি। ছবিগুলি একটা বড় খামের ভিতর।

সুহাস বলল, 'জাহাজটা কত টনের!'

বাবা তো বললেন, 'আটাশ হাজার টনের।'

'সে তো বিশাল জাহাজ!' সুহাস অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

সুহাস তাকিয়েই আছে!

'ছবিগুলি দ্যাখ।' বলে চার্লি ছবি টেনে খাম থেকে বের করছে।

সুহাস বলল, 'কলিজ কি তোমাদের প্রমোদতরণী ডরোথি ক্যারিকোর চেয়ে বড়।'

'না। ডরোথি ক্যারিকো জাহাজও আটাশ হাজার টনের। এত বড় জাহাজ—খুব কমই ছিল। দাদু তার সব উজাড় করে জাহাজটা তৈরি করেছিলেন। কি ছিল না জাহাজে, বার, ক্যাসিনো, বলরুম, সুইমিং পুল, লাউঞ্জ—সব। লাউঞ্জে ছিল দুর্লভ গ্রিক রোমানশৈলিতে তৈরি মূর্তিভাস্কর্য। আচ্ছা তুমি মিকেল-এঞ্জেলোর নাম শুনেছ?'

'না।'

'র‍্যাফেলের নাম?'

'তিনি আবার কে!'

চার্লির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু কোনও অবজ্ঞা নয়। যেন এই সরল নিষ্পাপ তরুণের পক্ষে পৃথিবীর আর কোনও নামই মহার্ঘ নয়। সে ছাড়া। চার্লি ছাড়া তার কাছে সব নামই অর্থহীন। চার্লি বলল, 'যদি কখনও রোমে যাও দেখতে পাবে হেলেনিসটিক প্রথায় তৈরি অপূর্ব সব মিউজেসের মূর্তি—সক্রেটিস, সোফোক্লিস আরও কি সব নাম! আমিও মনে রাখতে পারি না।' চার্লি তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। তাকে দেখছে। কোনও মিউজিসের মূর্তির মতো কি তাকে দেখাচ্ছে! না হলে মেয়েটা এত অবাক হয়ে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে কেন?

সুহাস চার্লির এই অপার কৌতূহলে কেমন মজে গেল। বলল, 'তুমি কোথায় দেখলে এ সব?'

'রোমে। রোমে না গেলে জানব কি করে! জাহাজ সিসিলিতে গেলে বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সব ঘুরে ঘুরে দেখেছি। পৃথিবীর যত জায়গায় যাও, যত শিল্পকীর্তিই দেখ না রোমে না গেলে সব অর্থহীন। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। এথেন্সের ভাস্কর অ্যাপোলোনিয়াসের মূর্তিটি তোমাকে দেখাব। বোরগিজ গ্যালারিতে তোমাকে নিয়ে যাব। 'দ্য রেপ অফ প্রোসরপিনা' বলেই চার্লি কেমন কাঁপতে থাকল। তার শরীর থর থর করে কাঁপছে।

'এই, এই, চার্লি চার্লি! কি হল তোমার। রেপ বলছ কেন! প্রোসরপিনা কি। আমি কিছু বলছি না। তোমার চোখে জল কেন! মূর্তিটিতে কি আছে! আরে কথা বলছ না কেন! যা বাব্বা, সত্যি চার্লি, না আমি উঠছি। তোমার যে মাঝে মাঝে কি হয়!'

চার্লি বলল, 'দানব।' কিছু বলল না।

'দানব! কে সেই দানব!'

'জানি না। চার্লি গুটিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল, 'একজন সুকুমারীকে রেপ করার সময় মুখের কি চেহারা হয় না দেখলে বুঝতে পারবে না।'

'বাদ দাও তো! আমি রোমে যেতে চাই না। রোমে গিয়ে আমার কি হবে। আমাকে দেখাতে হবে না! রোমে গিয়ে কাজ নেই।'

'তুমি না দেখলে যে বুঝতে পারবে না, কি কুৎসিত জঘন্য আর বীভৎস দানব অসহায় এক কুমারীকে উলঙ্গ করে দিয়ে কাঁধে ফেলে পালাবার চেষ্টা করছে। তুমি না দেখলে কুমারীর সেই অসহায় করুণ আর্তনাদ যে বুঝতে পারবে না সুহাস। মূর্তির আসল মানে আমার মনে নেই। কোঁকড়ানো চুলের ভিতর গভীর অতলে মুখগহ্বর, সিংহের মতো মুখ। চোখে আগুন। মূর্তির সামনে আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম। একটা কুকুর পায়ের নীচে বসে 'ঘেউ ঘেউ' করছে। দেখা যায় না! নরক!'

সুহাস কথার মোড় ঘোরাতে চাইছে। কিন্তু কেন যে সে চার্লিকে আর আয়ত্তে আনতে পারছে না। চার্লি অবিন্যস্ত হয়ে উঠছে যেন। গেল বুঝি সব। সে বলল, 'আর কি কি দেখলে।'

'যাকগে।' চার্লি বোধহয় দৃশ্যটা ভুলতে চাইছে। সে বলল, 'জান অ্যাপোলোনিয়াসের মূর্তিটির মজবুত শরীর এবং গঠন মিকেলএঞ্জেলোকে এতই অভিভূত করেছিল, পোপের

কথায়ও তিনি কান দেননি। পোপ শিল্পীর মূর্তির গঠন পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হতে বলেছিলেন। তাঁর এক জবাব—হয় না।'

তারপরই চার্লি বলল, 'তুমি দাঁড়াও।'

সে দাঁড়ালে চার্লি দরজা লক করে দিল।

চার্লি তার গা থেকে জামা খুলে নিচ্ছে। তারপর সে প্যান্ট খুলতে চাইলে সুহাস বলল, 'না না ছিঃ এটা কি করছ! কি পাগলামি শুরু করলে!' কেমন কাতর চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে চার্লি! সে কি জ্যান্ত কোনও মিউজেসের মূর্তি দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠছে! সে কি অস্থির হয়ে উঠছে—মূর্তিটি সামনেই আছে—খুলে দেখলেই হল! শুধু সুহাস রাজি হলেই তার দুঃখ থাকবে না।

'প্লিজ সুহাস। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না! তুমি নিষ্পাপ থাকবে। আমি শুধু মূর্তিটি তোমার মধ্যে আবিষ্কার করতে চাই।'

সুহাস আর বাধা দিল না। চার্লির কথামতো ঘাড় বাঁকিয়ে হাত শক্ত করে রাখল বুকের উপর। ওর জানুদেশের পেশি ফুলে উঠল। নাভিমূলের নীল নরম উলের উষ্ণতা ভেদ করে সে সজীব হয়ে উঠতে চাইল কোনো গ্রিক দেবতার মতো। তার হাসিও পাচ্ছিল। এই এক মজা চার্লির সঙ্গে। যেন সে চার্লির সঙ্গে মজা করছে। মজা করছে বলেই স্বাভাবিক থাকতে পারছে। তার শরীরে চার্লি যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তার সুড়সুড়ি লাগছিল।

আসলে চার্লি তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে কোনও গ্রিক মূর্তির সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুড়সুড়ি দিচ্ছে মনে হবে। আলতো হাতে তাকে স্পর্শ করছে। শিল্পী যেমন মূর্তিটির সৌন্দর্য যাচাই করে, চার্লি প্রায় অনুরূপ ভাবভঙ্গি করে যাচ্ছে। আর এত গম্ভীর যে হাসলেও অপরাধ হয়ে যাবে।

চার্লি তার বাঁ হাত উপরে তুলে দিল। কলের পুতুরে মতো সে যেন চার্লির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাত নীচে নামিয়ে বলল, 'না না, এ ভাবে না! তুমি কি! কিছু বুঝতে পারছ না। ঠিক আছে।' কিছুটা সরে গিয়ে ফের বলল, 'ডান কাঁধ উঁচু কেন! আর একটু নামাও। আর একটু। ঠিক আছে।'

'পেশি শক্ত কর।' চার্লি পেশি টিপে দেখল।

'হচ্ছে না।'

চার্লি বাঁ পাটা সরিয়ে দেবার ইশারা করল।

'হ্যাঁ ঠিক আছে। নড়বে না।'

চার্লি তার স্কেচ করছে।

সুহাসের হাত পা ধরে যাচ্ছে। এতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? কি যে করে!

স্কেচ শেষ করে চার্লি উঠে দাঁড়াল। সুহাসকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'হ্যালেলুজা! থ্যাঙ্ক ইয়ো, লর্ড। হাউ গুড ইয়ো আর।'

সুহাস জামা প্যান্ট পরে ভাবল, পাগল। সত্যি পাগল। কি যে হয়!

তবু সুহাস সৌজন্য রক্ষার্থে বলল, 'খুশি!'

কেন যে হঠাৎ মুখ নিচু করে ফেলল চার্লি! কেমন এক সঙ্কোচ এবং লজ্জায় সে

সুহাসের দিকে তাকাতে পারছে না। বিহ্বল হয়ে পড়ার মতো। সুহাস ডাকল, 'চার্লি কি হল!'

'কিছু না।' চার্লি বোধহয় আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। বলল, 'দেখবে না?'

কি দেখাত চাইছে চার্লি। আবার কি সে চায় সেই নির্জন বালিয়াড়ির মতো সে চার্লির সব কিছু দেখুক। সুহাস উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছে। আর তখনই চার্লি তার স্কেচটি সুহাসের সামনে মেলে ধরল। সুহাস বুঝল, চার্লি চায় তার সব স্কেচ সুহাস দেখুক। সে অন্য কিছু দেখাতে চায় না।।

সুহাস লজ্জায় পড়ে গেল—'খুব সুন্দর। দারুণ। আমি এত সুন্দর দেখতে বিশ্বাস হয় না।'

'ধুস, সুন্দর না, ছাই।' বলে এক ঝটকায় স্কেচটি কেড়ে নিলে সুহাস বলল, 'রাগ করলে!'

'না না। রাগ করব কেন। তুমি কি সুন্দর, সুহাস তুমি জান না।' বলে, সে চলে গেল লকারের সামনে। লকার খুলে তুলে রাখল স্কেচটি। লকার বন্ধ করে বলল, 'এস, দেখবে।

সুহাস চার্লির পাশে বসলে, খাম থেকে রিফ এক্সপ্লোরারের তোলা ছবিগুলি বের করে দেখাতে থাকল।

সুহাস বলল, ''কলিজকে তো চেনাই যায় না। এত বনজঙ্গল গজিয়ে ফেলছে শরীরে। আমি তো ভাবলাম বার চোদ্দ বছরে নোনা লেগে জাহাজ ঝুরঝুরে হয়ে গেছে।'

চার্লিও বোধহয় অবাক। ছবিটি দেখতে দেখতে বলল, 'আসলে জান সুহাস ডেথ ডু নট প্রিভেইল আন্ডার দ্য সি ফর ডিকেডস। তাই না, না হলে জাহাজের গায়ে বনজঙ্গল গজিয়ে যাবে কেন! অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য কলিজ হ্যাড ডাইড, দ্য সি হ্যাড বিগান টু গিভ ইট এ নিউ লাইফ। কি ঠিক বলছি না!'

'ঠিক ঠিক। সমুদ্র তার নিজের মতো করে সব বাঁচিয়ে রাখে।'

চার্লি বলল, 'দেখছ না, জাহাজের গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কত সব রঙ-বেরঙের স্পঞ্জ। ঘাসে কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে আছে। জাহাজ নিজেই এখন প্রবাল প্রাচীর। যুদ্ধের লিভিঙ মনুমেন্ট। দ্য সিপ হ্যাভ বিকাম এ রিফ, এ ফেস্টিভ গার্ডেন হোম ফর থাউজেন্ডস অফ ক্রিয়েচারস। কত সব মাছের ঝাঁক—উড়ছে, ঘুরছে, ফিরছে। নেচে বেড়াচ্ছে।'

চার্লি কথা বলছে, আর মাঝে মাঝে সুহাসকে চুরি করে দেখছে। সুহাস ছবিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

চার্লি যেন সুহাসকে সজাগ করে দেবার জন্য সামান্য ঠেলা মেরে বলল, 'কি দারুণ লাগছে! দ্যাখ ডেকে সেই বুনো ফুলের ছড়াছড়ি।'

সুহাস মজা করে বলল, 'সমুদ্র দেখছি তোমার মতোই গোপন প্রেমিক। তোমার মতোই বুনো ফুলের জন্য পাগল!'

'ধ্যাত!'

'আরে রাগ করছ কেন!'

'দ্যাখ না। কি সুন্দর না। খাঁজকাটা পদ্মপাতা অসংখ্য। দ্যাখ চিত্রকরের সব তুলির টান—ওঃ দারুণ। কত সব ক্যাকটাস। জলজ ঘাসের ছবি এটা। দ্যাখ না। মনে হয় না সমুদ্রের নীচে আগুন ধরে গেছে!'

'তাই তো! দেখি দেখি!' বলে সুহাস চার্লির বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ল। ছবিটা চার্লির হাতে।

সুহাস ছবিগুলি দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে যে ছলনা করে চার্লির কাছ থেকে গোপন খবর পাচার করার তালে আছে ভুলেই গেছে।

সুহাস বলল, 'তারিফ করতে হয়, ক্ষমতাও আছে। সমুদ্রের এত গভীরে ডুবে যায় কি করে! হোক না ডুবুরি! আচ্ছা যদি হাঙ্গর তাড়া করে!'

'হাঙ্গর তাড়া করে কি না, আমি কি জানি। আমাকে কি বলেছে, হাঙ্গর তাড়া করলে ডুবুরিরা কি ভাবে আত্মরক্ষা করে। এমন সব কথা বলো না, যেন আমি সবজান্তা।'

চার্লির অকপট কথাবার্তায় সুহাসের খুবই খারাপ লাগছে—ছলনা করে চার্লির কাছ থেকে কি গোপন খবর সে উদ্ধার করতে পারবে। যা দিয়েছে, সরল বিশ্বাসেই সুহাসের হাতে তুলে দিয়েছে। কোনও কপটতা ছিল না। তবে চার্লি এখনও নিজেকে রহস্যাবৃত করে রেখেছে। কেন রাখছে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। এতটা ধরা দেবার পরও কেন বলে, দ্য টাইম ইজ কামিং, ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ হিয়ার! কেন বলে, ইচ ওয়ান রিটার্নিং টু হিজ ওন হোম—লিভিং মি অ্যালোন।

ইট ইজ হিয়ার! হিয়ার বলতে কি জাহাজ বোঝাতে চায়—না টেকসাসের ক্যাডো লেক বোঝাতে চায়। লিভিং মি অ্যালোন, বলতে কি সে তার সেই বনবাসে ফিরে যাবে। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন তার! ইচ ওয়ান বলতে কি পরোক্ষে তাকেই বলতে চায়, সেও তাকে ফেলে চলে যাবে! সেই নিঃসঙ্গ জীবনে চার্লি ছাড়া আর কেউ থাকবে না! শুধু বনজঙ্গল, উষর অঞ্চল আর বুনোফুলের রাজত্বে চার্লিকে কি নির্বাসনে রাখা হবে!

চার্লি যে তার পাশে বসে একের পর এক ছবি দেখিয়ে যাচ্ছে খেয়ালই নেই। কত কথা বলছে। সে হুঁ হাঁ এই পর্যন্ত—ছবি নিয়ে কোনও মন্তব্য করছে না।

চার্লি হঠাৎ ছবিগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোমার বলো তো? ভাল লাগছে না। ছবিগুলি তুমি দেখছ না কেন?'

'আরে দেখছি তো। কি যে করো না।'

সুহাস হাঁটু গেড়ে ছবিগুলি তুলে নিচ্ছে। জড়ো করছে ছবিগুলি।

'আমি ঠিকই দেখছি!' সুহাস নিস্পৃহ গলায় বলল।

'ছাই দেখছ! আমি কিছু বুঝি না মনে করো। তুমি পছন্দ করছ না। কি সব সুন্দর ছবি—আর তুমি কেমন আগ্রহ হারিয়ে ফেলছ! খারাপ লাগে না বলো!'

'ছবিগুলো কে দিল!'

'বললাম না, রিফ এক্সপ্লোরার ছবিগুলি বাবাকে প্রেজেন্ট করেছে। কতবার এক কথা বলব।'

'হ্যাঁ তাই তো! আচ্ছা ছবিগুলির মধ্যে লাউঞ্জের কোনও ছবি নেই তো।'

'লাউঞ্জ!'

'আরে তুমি আগে কলিজের ছবি দিয়েছিলে না—বা রে! মনে করতে পারছ না—লাউঞ্জে দুই গ্রিক দেবীর ভাস্কর্য আর একটা একর্সিঙ্গি ঘোড়া—এবারে কি ডুবুরিরা তার কোনও ছবি তোলেনি! ডুবুরিরা কি লাউঞ্জের ছবি তোলেনি! জাহাজের এত সব ছবি দেখলাম, কই এবারে তো লাউঞ্জের ছবি দেখলাম না। দেখতে ইচ্ছে হয় না! সমুদ্রে ডুবে গিয়ে লাউঞ্জের কি পরিণতি! তোমার ঠাকুরদা বুনো ফুল ভালবাসতেন—লাউঞ্জে নিশ্চয়ই বুনো ফুলের রাজত্ব হয়ে গেছে। তুমিই তো বলেছ সমুদ্রের গভীরে মৃত্যু চিরদিন বিরাজ করে না! কি বলনি! সমুদ্র আবার তাকে নিজের মতো সাজিয়ে তোলে। প্রবাল প্রাচীর গড়ে দেয়। লাউঞ্জটি যে এখন সমুদ্রের লিভিং মনুমেন্ট হয়ে নেই কে বলবে! কি বলো! এখন কথা বলছ না কেন, চুপ করে আছ কেন! দুর্লভ সব ভাস্কর্যে লাউঞ্জটি সাজিয়েছিলেন তোমার ঠাকুরদা। কি ঠিক বলছি কি না! সমুদ্রে তার ইচ্ছেমতো নিশ্চয়ই লাউঞ্জটি জলের অতলে সাজিয়ে রেখেছে, নানা রঙিন স্পঞ্জে কিংবা শ্যাওলার রাজত্ব গড়ে উঠেছে, কই কোনও ছবিতেই তার কোনও সাক্ষ্য নেই!'

'নেই! দেখেছ ভাল করে!'

'দেখেছি!'

তেইশ

চার্লি তার ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরল। কোনও গূঢ় চিন্তা মাথায় এলে চার্লির এটা অভ্যাস। তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা যে বললেন সব ছবি এতে আছে। কলিজ জাহাজটির খোঁজ রিফ এক্সপ্লোরার আগেই পেয়েছে। শুধু সমুদ্রে কলিজই তো ডুবে নেই, আরও কত জাহাজ, বোমারু বিমান। বাবাকে তো চিঠিতে কলিজ সম্পর্কে জানিয়েছে, অ্যাজ উই ডোউব থ্রো ফরটি ফিট, দেন ফিফটি ফিট, দেন সিক্সটি ফিট অফ সিলটি ওয়াটারস দ্যাট সিমড লাইক টেপিড শ্যাম্পু উই কুড সি হার লাইন অন হার সাইড, লাইক এ মর্টেলি উন্ডেড বার্ড কাম টু ফাইনাল রেস্ট অন এ কোরাল স্লোপ।'

'চিঠিটা দেখাতে পার!' সুহাসের মধ্যে ফের গুপ্তচরবৃত্তি কাজ করছে।

'কোথায় বাবা রেখেছেন, জানব কি করে? আচ্ছা দাঁড়াও বাবাকে জিজ্ঞেস করি।' বলে ছুটতেই সুহাস তার হাতে ধরে ফেলল। বলল, 'থাক যেতে হবে না। কি হবে চিঠি দিয়ে। তোমার কথাই যথেষ্ট। তবে কি জানো?' বলে, দম নিল সুহাস, 'এত ছবি তুলেছেন, লাউঞ্জের ছবি তোলেননি বিশ্বাস হয় না।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত।' চার্লি সুহাসকে সমর্থন করায় কিছুটা যেন সে লঘু হতে পারছে।

'চিঠিটা কবে দিয়েছে, আই মিন চিঠিটি তোমার বাবা কবে পেয়েছেন!'

'কাল। কাল মানে দুপুরে যখন বের হচ্ছি তখনই দেখলাম, মিঃ জর্জ লুমিস হাজির। রিফ এক্সপ্লোরারের ফটো বিশেষজ্ঞ। ছবিগুলি পাবার পরই বাবার মাথা গরম হয়ে গেল! পাগলের মতো জাহাজে কি বিশ্রী কান্ড। ভাবতেও লজ্জা হয়। রাতে তো দেখলে!'

সুহাসের বলার ইচ্ছে হল, তুমিও কম যাওনি। কিন্তু বলল না।

আসল ছবিটি তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। লাউঞ্জের রহস্য তবে সেই ছবিতে ধরা পড়েছে।

তিনি পাগলের মতো যা তা করে এখন হয়তো ডিনারের নাম করে নিজে স্বচক্ষে কিছু দেখতে চান। তাই রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন।

সুহাস বলল, 'ডরোথি ক্যারিকোর উপর কোনো বই-টই মানে প্রচার পুস্তিকার খবর কিছু রাখ!'

চার্লি বলল, 'এখন লাগবে? এনে দেব! ডরোথি ক্যারিকোর উপর ঠাকুরদা নিজেই একটা বই লিখেছেন। কারণ জাহাজটি তো তাঁর জীবন এবং বাণী। এনে দেব!' বলে চার্লি তার বাবার কেবিন থেকে বইটি এনে সুহাসের হাতে দিল।

সুহাস বোটডেক থেকে ছুটে আসছে। ডরোথি ক্যারিকো জাহাজের ওপর যখন বইটা পাওয়া গেছে, তখন আর ভাবনা কি! মুখার্জিদা শুনে খুবই খুশি হবেন। চার্লি তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছে। 'কি সুন্দর দিন!' চার্লি তাকে বিদায় জানাবার সময় এমনও বলেছিল।

সে বোটডেক ধরে হেঁটে এলে চার্লি কেবিনে ঢুকে গেল।

সুহাস দারুণ মেজাজে আছে। মুখার্জিদা কলিজ জাহাজের গুপ্ত রহস্য বোধহয় এবারে ঠিক আবিস্কার করে ফেলবেন। কাপ্তানের ঘোরাঘুরি কেন এই সমুদ্রে, তাও ধরা যাবে। কলিজ জাহাজটি যে প্রমোদতরণী ডরোথি ক্যারিকো, এ-ব্যাপারে তারও বিন্দুমাত্র যেন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, বইটি চার্লির ঠাকুরদার নাকি জীবন এবং বাণী। এই জীবন ও বাণী হাতে পেলে মুখার্জিদা কি করেন দেখা যাক। মুখার্জিদা সব শুনে খুবই খুশি হবেন—যাক, কাজের কাজ করলি একটা। তুই তো খুবই বুদ্ধিমান দেখছি। দুঁদে গোয়েন্দারাও এত সহজে কাজটা উদ্ধার করতে পারত না। আসলে মুখার্জিদার প্রশংসায় সে কেন যে এত খুশি হয়—সাবাস সুহাস, কি খাবি বল, এই চা লাগা, যেন সুহাস দিগ্বিজয় করে ফিরে এসেছে।

আরও কত কথা বলার আছে। চার্লি বলেছে, সবাই যে যার মতো ঘরে ফিরে যাবে, শুধু চার্লি একা পড়ে থাকবে। এ-সব কথায় গোয়েন্দা গন্ধ থাকতে পারে। অন্তত চার্লির বিপদ না হয়। এ-সব ভেবেই সব খুলে বলা দরকার।

কেন চার্লি নিজেকে এত নিরুপায় ভাবছে—সে বুঝতেই পারছে না। অবশ্য নানা ঝামেলা পাকাচ্ছে জাহাজে—দিন দিন জাহাজ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে—এখন যেন মুখার্জিদা ছাড়া এই রহস্যের কিনারাও কেউ করতে পারবে না।

সে আর কিছুই গোপন করবে না, তাই বলে, তার শরীর থেকে চার্লি জামা কাপড় খুলে নিয়ে ছবি এঁকেছে—কিছুতেই বলতে পারবে না। তার নুড এঁকেছে—ঠিক আঁকা নয়, কিছুটা যেন স্কেচ করে রাখা—পরে স্কেচটি অবলম্বন করে হয়তো কোনও বড় কাজে হাত দেবে।

সে যাই হোক—এখন শুধু মুখার্জিদা আর পিছিলে ভোজ—আর কাপ্তান চিফমেট থাকছেন না—ওঃ এটাও তো গুরুত্বপূর্ণ খবর। কাপ্তান চিফমেট রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন—ফিরতে অনেক রাত হবে—কেন যাচ্ছেন রিফ এক্সপ্লোরারে—জাহাজটা কোথায় নোঙর ফেলে আছে তাও সে জানে না। মুখার্জিদা হয়তো জানেন। তার তো রিফ এক্সপ্লোরার নিয়ে মাথা ব্যথা থাকার কথা না। কলিজ জাহাজের অনেক ছবি সে দেখেছে—তবে

লাউঞ্জের ছবিটি পাওয়া যায়নি। মুখার্জিদাকে সব বলা দরকার।

আসলে সে কাজ অনেকটা হাসিল করে ফিরতে পারছে বলেই মনটা ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল যেন।

আর তখনই ঠিক সিঁড়ির গোড়ায় নেমে আসার মুখে কে যেন ডাকল—'ম্যান ফলো মি!'

ফলো মি!

কাকে বলছে!

কে বলছে!

সে কিছুটা থতমতো খেয়ে গেল!

কেমন হিমশীতল কণ্ঠস্বর।

আবার কেউ বলছেন, 'ম্যান ফলো মি!'

না, ডেকে কেউ নেই। সহসা এক দঙ্গল উৎক্ষিপ্ত মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। ঝড়ো হাওয়া বইছে। বৃষ্টি হতে পারে। সে বুঝতেই পারছে না—কার কণ্ঠস্বর—কোথা থেকে ভেসে আসছে।

সে পা বাড়াতে গেলেই আবার সেই শীতল কণ্ঠ, 'ম্যান ফলো মি।'

কে সে!

চারপাশে তাকাতে থাকলে আবার সেই শীতল কণ্ঠস্বর—'আই অ্যাম হিয়ার।'

আশেপাশে কেউ নেই। কয়েক কদম হেঁটে গেলে চিফকুক-গ্যালি! গ্যালিতে দুজন কুক, থাকতেও পারে, নাও পারে। অন্তত সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার এমনই মনে হল। ডেক পার হয়ে কিছুটা দূরে পিছিলের দিকটায় উৎসবের মেজাজ। লোকজনে ভর্তি। অথচ তাকে কেউ বলছেন, ম্যান ফলো মি। অফিসাররা এ-ভাবে লস্করদের সঙ্গে কথা বলেন। জাহাজের সেও একজন লস্কর। তাকে ছাড়া আর কাকে বলতে পারে! কেউ তো আর আশেপাশে নেই।

আবার হিম ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর—'লুক হিয়ার।'

সে দেখল, অদূরে এলিওয়েের অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট। কিছুই ঠিক অনুমান করা যায় না। দিন দুপুরেও আলো জ্বালা না থাকলে বেশ অন্ধকার থাকে। সেই আবছা অন্ধকার থেকে তিনি তাকেই যেন ডাকছেন। কেন ডাকছেন! ভিতরে ঠাণ্ডা বরফের স্রোত নেমে গেল, তার কেমন ভয় ধরে গেল।

কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছে না।

সে একজন জাহাজি বলেই অনুসরণ করা দরকার। সে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যেও আছে। অথচ সে জানে, একজন দক্ষ জাহাজি কখনও ভয় পায় না। সব কাজেই দরকারে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ছুটির দিনেও জরুরি কাজকর্ম থাকলে কোনও অফিসার প্রয়োজনে তাকে ডাকতেই পারেন। শুধু সেই কণ্ঠস্বরটি তার কেন জানি চেনা মনে হচ্ছে না। অবশ্য সে সবার কণ্ঠস্বর ভাল চেনেও না। বিশ বাইশ মাস সফরে কটাই বা কথা হয়েছে কার সঙ্গে এক চার্লি ছাড়া। কাজকর্ম সারেঙই বুঝিয়ে দেন। কার কোথায় কাজ করতে হবে তিনিই ভাল জানেন।

সে কেমন কিছুটা ঘোরে পড়ে যাচ্ছিল।

সে এলিওয়ের দিকে হাঁটছে।

লোকটি কে?

সেকেন্ড!

থার্ড ইঞ্জিনিয়ার!

না চিফ ইঞ্জিনিয়ার!

সে তো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। লম্বা টুপিতে মুখের আংশিক ঢাকা। তার আগে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। ইঞ্জিনরুমে নেমে যাচ্ছেন। বেশ অন্ধকারই মনে হচ্ছে। ইঞ্জিনরুমেও কোনও আলো জ্বালা নেই। স্কাই লাইটের ফাঁকে সামান্য আলো ফুটে উঠলেও লোকটির টুপি এবং বয়লার সুট ছাড়া কিছুই যেন দৃশ্যমান নয়। আট দশ কদম আগে তিনি ইঞ্জিনরুমের সিঁড়িতে নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছেন।

সেও নেমে যাচ্ছে।

তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান!

কি কাজ ইঞ্জিনরুমে?

সে একজন সাধারণ জাহাজি। তার প্রশ্ন করার কোনও অধিকার নেই। সে বলতেও পারছে না, স্নান খাওয়া হয়নি। সবাই হয়তো অপেক্ষা করছে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি খুবই ক্ষুধার্ত।

সে সিঁড়ির গোড়ায় থামল।

তার হাঁটু অবশ হয়ে আসছে। কেমন এক ঘোর রহস্যময়তা সৃষ্টি করছে যেন কোনও এক কাপালিক।

ইঞ্জিনরুমে এখন কাকপক্ষীও নামে না।

শুধু ব্যালেস্ট পাম্পের কিট কিট আওয়াজ।

শুধু চালু বয়লারের স্টিমককে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ। দানবের মতো জাহাজের মূল ইঞ্জিনটি হাত পা ছড়িয়ে দিয়েছে। অজস্র স্টিম পাইপ, একজস্ট পাইপের ছড়াছড়ি—সিলিন্ডারের ভিতর সব ঢুকে গেছে।

ওপরে স্মোক বক্সের ডালা খোলা।

স্মোক বক্স পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছুটির দিন বলে কেউ কাজে আসেনি।

সে সব চিনতে পারছে। এখানেই তো কতদিন সে নেমে এসেছে। ইঞ্জিনকশপের ঘর থেকে হাতুড়ি বাটালি নিয়েছে। নাট-বল্টু নিয়েছে। অথচ আজ এত অচেনা মনে হচ্ছে কেন! প্রবল আতঙ্ক কেন ভেতরে!

কেমন তাকে কিছুটা বোবায় ধরে ফেলেছে।

ঘুমের মধ্যে তার এটা হয়। সে সব কিছু দেখতে পায়। কেউ তাকে জলে চুবিয়ে মারছে, অথচ সে কিছু বলতে পারছে না। কেউ তাকে পাহাড়শীর্ষ থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, অথচ কিছু বলতে পারছে না। কেউ তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য ঠেলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—বোবায় ধরলে এটা তা হয়—সে কিছু বলতে পারে না। সব বুঝতে

পারে অথচ বলতে পারে না।

সে অবশ্য কিছু বুঝতেও পারছে না। আর ইঞ্জিনরুমে আলো জ্বালা না থাকলে, এমন হতকুচ্ছিত দেখায় তাও জানত না। দানবের মতো ইঞ্জিনের পিস্টন রডগুলো ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে আছে। থামের মতো ঝকঝকে পিস্টন রড অন্ধকারে ক্র্যাঙ্কওয়েভের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সে যে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ধরে ছুটে পালাবে তারও উপায় নেই। কারণ বোবায় ধরলে হাত পা অবশ হয়ে যায়। তার ক্ষমতা থাকে না। সে মরণপণ চেষ্টা করে ঠিক, তবু পালাতে পারে না। ঘুম ভেঙে গেলে টের পায় ঘামে সে ভিজে গেছে।

আব তখনই তাব মনে হল তিনি নুয়ে কি খুঁজছেন।

এই ফাঁকে··।

আব তখনই সেই শীতল কণ্ঠ যেন তাকে মনে করিয়ে দিল, 'এ সন অনার্স হিজ ফাদার, এ সারভেন্ট অনার্স হিজ মাস্টার। পালাবে না!'

সে বলতে পারত, না স্যার পালাচ্ছি না!

আধিভৌতিক রহস্যটি তবে টেরও পায়, সে পালাতে চায়। সে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ধরে উঠে যেতে চায়। তার আর জোর থাকে কি করে!

দীর্ঘ প্রপেলার স্যাফট অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। টানেলে কোনও আলো জ্বালা নেই। সেদিকে সে তাকাতে পারছে না। যেন এক বিশাল গুহাপথ অদৃশ্য হয়ে গেছে কালো পাথরের কোনও গোপন কক্ষ চিরে। যেদিকে তাকাচ্ছে শুধু কুহকের বেড়াজাল। সব চেনা, অথচ অন্ধকার, কি ভয়াবহ করে রেখেছে! বিশাল সব বয়লার দাঁড়িয়ে আছে পর পর। বয়লারগুলির ওপাশে কেউ থাকতে পারে। সেখানে আলো জ্বালা থাকতে পারে। বয়লারের পাশ দিয়ে যাবার রাস্তায়ও ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। যেন এ-মুহূর্তে তার নড়বারও ক্ষমতা নেই।

জেনারেটারের পাশে অজস্র সুইচবোর্ড। কালো রাবারের মোটা তারের প্লাক সুইচে ঢুকিয়ে দিতেই তিন নম্বর বয়লারের শেষ মাথায় প্লেটের উপর আলো জ্বলে উঠল। তার সাহস ফিরে আসছে ঠিক, তবু যে বলছেন, এ সারভেন্ট অনার্স হিজ মাস্টার। জাহাজে ওঠার আগে এটাই ছিল তাঁর মন্ত্রগুপ্তি। অন্তত টি. এস. ভদ্রাজাহাজে প্রশিক্ষণ নেবার সময় কানে কানে সেকেন্ড অফিসর চ্যাটার্জি এই মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তার বিবেকও তাকে তাড়া করছে। সে কিছুতেই তার প্রভুকে অসম্মান করতে পারে না।

কিন্তু তিনি কে?

সেকেন্ড?

চিফ? বা অন্য কেউ। সে মুখ দেখতে পাচ্ছে না কেন?

তিনি নিজেই বিশাল প্লেট কেন টানাটানি করছেন!

পাশে একটা বালতি, কিছু জুট।

'আপনাকে সাহায্য করতে পারি।' বলে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে আবার চিৎকার, 'নো। ইউ ওনলি ফলো মি।'

অর্থাৎ আমি না বললে হাত দেবে না। সামনে যাবে না। আমার মুখ দেখারও চেষ্টা

করবে না।

তাকে কি করতে হবে তিনিই বলে দেবেন।

কোথায় তিনি তাকে কাজ দেবেন!

এই অসময়ে, কখনও তো কাজ হয় না। সে শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলছে। আর ক্রমে সেই ঘোর তার বাড়ছে।

ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে তার এমন হয়।

বালতি জুট দেখে সে বুঝতে পারছে না তিনি কি চান। তাঁর সামনে যেতেও তিনি বারণ করছেন। বালতি জুট থাকলে কি করতে হয় সে যে জানে না তাও নয়। কিন্তু একা কি করে সম্ভব!

তিনি বললেন, 'ম্যান, কাম অ্যালঙ।'

সে কাছে গেলে তিনি ছিটকে দূরে সরে দাঁড়ালেন।

আঙুল দিয়ে তাকে ইশারা করছেন।

অর্থাৎ তাকে জাহাজের খোলে নেমে যেতে বলছেন। ইঞ্জিনরুমের তলায় খোলের মধ্যে অজস্র জলের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের দেয়ালে অজস্র ম্যানহোল। একটা ট্যাঙ্ক থেকে অন্য ট্যাঙ্কে যাবার রাস্তা। খুবই অপরিসর। উবু হয়ে বসাও যায় না! হামাগুড়ি দিয়ে, প্রায় সাঁতার কাটার মতো ট্যাঙ্ক থেকে ট্যাঙ্কে ঢোকা যায়—উপরে উঠে আসার একটাই রাস্তা। সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঠুলি পরানো আলোটা খোলের মধ্যে নামিয়ে দিয়েছেন।

শুধু বললেন, 'গো অ্যাহেড।'

কোথায় কতদূর? নামার সময় বালতি জুট তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। শ্যাওলায় ট্যাঙ্ক পিছল হয়ে আছে, পা ফসকে যাচ্ছে, কোনও রকমে নুয়ে খোলের ভিতর নেমে গেলে তিনি মুখ বাড়ালেন না। মাছ ধরার মতো পাড়ে যেন উবু হয়ে বসে থাকলেন।

সে জানে, আসলে এটা একটাই বৃহৎ জলাধার। ভাগ ভাগ করে অজস্র দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। সব দেয়ালেই একটা থেকে আর একটায় ঢোকার ম্যানহোল। সে পিছলে যাচ্ছিল। উপর থেকে দড়ি ছাড়ার মতো ঠুলি পরানো আলোটা সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

উপর থেকে হাঁক আসছে, 'লুক, দ্য লাস্ট ওয়ান।'

অর্থাৎ শেষ প্রান্তে চলে যেতে বলছেন তিনি। সেখানে কি এই মানুষটি পাচার করার জন্য কোনও নিষিদ্ধ বস্তু রেখে দিয়েছেন। রেখে যে দেয় না, তা নয়। তবে বিশ বাইশ মাসে এমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড কখনও দেখেনি। তাকে এত বিশ্বাসই বা কেন! আবার মনে হচ্ছে, তিনি বলছেন, 'কি ঠিক আছে?'

সে বলল, 'আমি কি করব স্যার? কি কাজ! তলানির নোংরা জল তুলতে হবে?'

কোনও সাড়া নেই।

আমি একা! সে বলতে পারত!

তার জামা প্যান্ট শ্যাওলায়, জং ধরা নোংরা জলে বিশ্রী রং ধরে গেছে। হাতে পায়ে মাথায় জলের বিশ্রী দাগ। এবং সে ক্রমে কেমন এই পচা তলানি জলের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট বোধ করছে।

পাম্প করে নোংরা জল ফেলে দিলেও তলানি সামান্য পড়ে থাকে। জুট দিয়ে মুছে

তুলতে হয় জল। চিপে চিপে জল বালতিতে রাখতে হয়। আট দশ জন জাহাজি সারাদিনে কাজটা তুলতে পারে। তাকে একা এখানে ফেলে রাখা কেন! তার কি দোষ!

আর তখনই মনে হল, মধ্যরাতে চার্লির দরজার বাইরে তিনিই কি দাঁড়িয়েছিলেন। না, সেই মধ্যরাতের প্রেতাত্মা। উইন্ডসহোলের আড়ালে অদৃশ্য এক ছায়ার মতো গোপনে অন্ধকারে যে মিলিয়ে গিয়েছিল! সে যেন শুনতে পাচ্ছে, তিনি বলছেন, মেনি থ্যাঙ্কস ইয়ং-ম্যান!

কাপ্তান তাকে এখানে শেষে শাস্তি দিতে নিয়ে এলেন! তার ঘোর বাড়ছে। সে কেমন ঘোলা ঘোলা দেখছে সব কিছু। আলোর ঠুলিটা হাতে আর ধরে রাখতে পারছে না। হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকে কোনও রকমে বালতিতে জল চেপার সময় মনে হল, এক হ্যাঁচকায় আলোটা কেউ টেনে নিয়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল। সে লাফিয়েও আলোর তারটা ধরতে পারল না। হারিয়ে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ব্ল্যাকেস্ট অফ দি ব্ল্যাক নাইটস।

সে একেবারে বুঝি অন্ধ হয়ে গেল! সে হাতড়াতে থাকল—চিৎকার করতে থাকল, 'আমার কি দোষ! আপনি তো আমাকে ডেকে নিলেন। সে দুমদাম লাথি মারতে থাকল দেয়ালে—চিৎকার করে বলল, 'চার্লি আমি শেষ।'

লোকটি তখন সরল ভাষায় তাঁর আক্রোশের কথা বুঝিয়ে দিলেন, দাঁত চেপে ট্যাঙ্কের মুখে ঝুঁকে বললেন, ইয়ো স্যাটান! ইয়ো আর এ ডেনজারাস ট্র্যাপ টু মি।' তারপরই প্লেট পড়ার শব্দ। প্লেট টেনে মুখটা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর আর কারো সাড়া নেই।

প্লেট পড়ার শব্দও শোনা গেল।

কেমন এক পৃথিবীর গোপন অন্ধকূপে তাকে ফেলে আততায়ী সরে পড়ল।

সে কে?

কাপ্তান?

না অন্য কেউ!

সেকেন্ড?

না অন্য কেউ!

কে সে!

সি-ডেভিল লুকেনার নয়তো! লোকটার মাথা নেই, মুখ নেই, ঘাড় গলা, হাত পা কিছুই নেই। যেন আছে শুধু পোশাকের খোলস। অশরীরী। কিছুতেই সে তার মুখ দেখতে পেল না কেন। টুপির নীচে শুধু অন্ধকার। হাত পা কি দেখেছে! মনে করতে পারছে না। যেন বলয়ার সুট আর টুপি ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। শরীরও না। কে তবে প্লেট তুলল! কোনও দুষ্টু আত্মার কাজ! তাহলে সত্যি কি তিনি সি-ডেভিল লুকেনার! বংশীদা কি তবে ঠিক! সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। বরফের কুচি ঢুকে যাচ্ছে হাড়ে। কে জানে কে সেই অপদেবতা! তার ক্রমে শরীর বরফ হয়ে যাচ্ছে। জলে গড়াগড়ি যাচ্ছে—চেষ্টা করছে বের হবার। আর যত সেই অপদেবতার আতঙ্ক তাকে গ্রাস করছে, তত জলে গড়াগড়ি খেতে খেতে সহসা স্থবির হয়ে গেল। চিৎপাত হয়ে

পড়ে আছে জলে ডাঙায় পড়ে থাকা মৃত মানুষের মতো।'

জাহাজে জল তোলার তোড়জোড় শুরু হচ্ছে তখন। দুটো জলের ট্যাঙ্কার জাহাজের পাশে টাগবোটে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে জল নেওয়া হবে। বার বার ডেকসারেঙ তাড়া দিচ্ছিল, কি ব্যাপার, মুখার্জিবাবু এখনও ফিরছেন না! কখন পাত পড়বে তোমাদের।

ইঞ্জিনসারেঙ বললেন, চলে আসবে। আপনারা না হয় বসে যান!

আর তখন, মুখার্জি ফিরছেন নৌকায়। জাহাজে উঠে আসছেন। নৌকার মাঝিকে পয়সা দিয়ে গ্যাঙওয়ের সিঁড়ি ধরে উঠে আসছেন। অকারণ ঘুরে মরা। কিছুই পাওয়া যায়নি। ঘুরে মরাই সার। আস্তাবলগুলির কোথাও তিনজন ছাড়া আর কারও ঠিকানা ডিনা ব্যাঙ্কের দেওয়া নেই। একটা স্টিমার পার্টি এসেছে—তাদের অনেকে ঘোড়া ভাড়া করেছে। তা-ছাড়া অজস্র নাম—শুধু তিনি খুঁজেছেন, ডিনা ব্যাঙ্ক থকে কে কে আস্তাবলে গেছে। তিনি, সুহাস আর চার্লি ছাড়া আর কেউ ডিনা ব্যাঙ্ক থেকে ঘোড়া ভাড়া করেনি।

সুরঞ্জন ঠিকই বলেছে, এত বোকা ভাবছ কেন? সে জানে, কোনও কারণেই সাক্ষ্য প্রমাণ রাখা চলবে না। যার এতটা সাহস, ঘোড়ার পিঠে চড়ে চার্লিকে অনুসরণ করতে সাহস পায়, সে কখনও রেজিস্ট্রি খাতায় তার নাম রাখে—কিংবা জাহাজের নাম!

মুখার্জিকে উঠে আসতে দেখেই সুরঞ্জন বলল, 'ওই তো আসছে। মাথায় যে কি চাপে!'

তবু সুরঞ্জন ভাবল, যদি কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়ে যায়! তার স্নান সারা। তামার বিশাল ডেকচিতে দুধে চাল দেওয়া হচ্ছে। চালের গুঁড়ো পাওয়া গেলে অবশ্য সিন্নি হত। কারণ মুসলমান জাহাজিরা পায়েসের চেয়ে চালের গুঁড়ো, দুধ, জাফরান, লবঙ্গ, কিসমিস, বাদাম দিয়ে সিন্নি বেশি পছন্দ করে। সিন্নির সবই ভাল, তবে নুন দেওয়া মুখার্জি পছন্দ করেন না। বাটলারও খাবে। মেসরুম-মেটদের বলা হয়েছে। বাটলার বিরিয়ানির মশলা রসদঘর থেকে পাঠিয়েছেন। খুবই উল্লাস সবার। মাদুর পেতে তাস খেলছে অনেকে।

মুখার্জি দৌড়ে পিছিলে উঠে এলেন। টুপি খুলে মাথা চুলকালেন। উঁকি দিলেন দরজায়—রান্নার কতদূর! বিরিয়ানির সুঘ্রাণ। জিভে প্রায় জল এসে গেল। ইঞ্জিনসারেঙ সব তদারক করছেন মেসরুমে বসে। মুখার্জিবাবু ফিরেছেন শুনে তিনি উঠে গেলেন। বললেন, 'গেলেনই যখন কিছু শালপাতা আর মাটির গ্লাস নিয়ে এলে পারতেন। তা হলে মেমানরা আপনার আরও খুশি হতে পারত—সুখ্যাতি হত ফিল সাহেবের।'

মুখার্জি বললেন, 'এখানে শালপাতা কোথায় পাব!'

সারেঙ বললেন, 'আছে। দ্বীপে সবই পাওয়া যায়। যাকগে তাড়াতাড়ি নীচে যান। একটা তো বাজে। কখন গোসল করবেন, খাবেন!'

'মুখার্জি নীচে নেমে গেলে দেখলেন, সবারই প্রায় স্নান সারা। মাথা আঁচড়ে থালা গ্লাস নিয়ে বসে আছে। মুখর্জিদা ফিরছেন না বলেই পাতে বসা যাচ্ছে না। সারেঙ দু-বার সুহাসেরও খবর নিয়েছেন—সুরঞ্জনের এক কথা, 'ওর কথা আর বলবেন না। ছোঁড়া বোটডেকে গেলে আর ফিরতেই চায় না। মরুকগে, আরে জাহাজে তোর পেছনে কে এত লেগে থাকবে। আমরা খেয়ে নেব। তোর জন্য বসে থাকতে বয়ে গেছে।'

মুখার্জি সারেঙকে ডেকে বললেন, 'সবার তো একসঙ্গে জায়গা হবে না। এত লম্বে পাত পেতে খাওয়ার জায়গা তো নেই—লোক তো কম না।'

তা অনেক। প্রায় ষাটজন তো হবেই। সারেঙও জানেন। প্রথম ব্যাচে বসার জন্য বংশীও উঠে যাচ্ছিল। মুখার্জিকে দেখেই বলল, 'এই যে গুরু এসে গেছে। বলে হাঁটু গেড়ে বসল। 'পা দুখানা দেখি। গড় হই। বিরিয়ানি—সোজা কথা। তোমার অশেষ গুণ। দাও দেখি, জাহাজে ভোজ দিলে—সোজা কথা।'

'শুধু পা দুখানি দিলে হবে! তোর যে আরও কত ব্যামো আছে।' বলে পা দুখানা উপরে তুলে দিতেই বংশী পা মাথায় রেখে বলল, 'আবার কবে খাওয়াচ্ছ?'

মুখার্জি বললেন, 'হবে, যা তাড়াতাড়ি। খেয়ে নে। শেষে কম পড়লে ঠকে যাবি।' মুখার্জি সুহাসকে দেখছেন না। আবেদালি লুঙি পরে গেঞ্জি গায়ে বেশ ফিটফাট হয়ে খেতে উপরে যাচ্ছে। ফার্স্ট ব্যাচে বসে যাবার তার তাড়া। মুখার্জি তাকে দেখেই বললেন, 'সুহাস কোথায়?'

আবেদালি জানে না কিছু। সে বলল, দাঁড়ান দেখছি। বংশীর ফোকসালে উঁকি দিয়ে বলল, 'মুখার্জিবাবু সুহাসের খোঁজ করছেন।' হরেকেষ্ট বলল, 'উপরে আছে হয়তো।' কিন্তু সে তো সকাল থেকেই সুহাসকে দেখেনি। সে মুখার্জির ঘরে গিয়ে খবরটা দিতেই মাথা গরম করে ফেললেন তিনি।

'তার মানে! সে সকাল থেকে কোথায় তোমরা জানো না, সকাল থেকে বেপাত্তা। অধীর, সুরঞ্জন—সুহাস কোথায়!' না আর বসে থাকা যায় না। উপরে ওঠার মুখে যাকে পেলেন, 'সুহাস কোথায়?'

মনুর সঙ্গে দেখা। সেও বলল, 'সকাল থেকে তো দেখছি না।'

ওপরে উঠে সুরঞ্জনকে পেয়ে গেলেন।

'সুহাস কোথায়?'

'কোথায় আবার! যেখানে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম, কোথায় থাকতে পারে বোঝ না!'

'তার মানে। এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বেলা কত হয়েছে! ওর জন্য কে বসে থাকবে!'

'সেই তো! বাবু ফিটফাট হয়ে চার্লির কেবিনে গেলেন। সেই কখন! কি রোয়াব! আমাকে পাত্তাই দিল না!'

'পাত্তা দিল না। চার্লির ঘরে এতক্ষণ কি করছে।'

'কি করছে সেই জানে। আমি যেতে পারব না। তোর সামান্য বুদ্ধিসুদ্ধি নেই! তুই জমে গেলি! সময়জ্ঞান তোর থাকবে না! সবাই বসে থাকবে, এটাও বুঝলি না। ছোঁড়া স্বার্থপর বুঝলে। কার জন্য করছ। এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।'

সারেঙসাব এসে বললেন, মুখার্জিবাবু চিংড়ি মাছ রেখে দিলাম। একদিনে সব শেষ করে কি হবে। বাটলারকে বললাম, মাছগুলো বরফ ঘরে রেখে দিতে। কাল ভাবছি—মুখার্জির মাথা গরম। কেমন অসহিষ্ণু—তাঁর কোনও কথা শুনতে ভাল লাগছে না—তবু সারেঙসাব সবার মুরুব্বি। অবজ্ঞাও করা যায় না, দায়সারা গোছের জবাব, 'ঠিক আছে। ভাল করেছেন।'

'কাল বুঝলেন, মুগের ডাল, গন্ধরাজ লেবু, চিংড়িমাছের মালাইকারি...।'

মুখার্জি বললেন, 'সব তো বুঝলাম, আপনার ছোকরা জাহাজির তো পাত্তা নেই।'

'ছোটসাবের কেবিনে গেছে। ওই তো সুরঞ্জনই বলল।'

এবার মুখার্জির অসহিষ্ণুতা যেন চরমে। গেছে যখন, যান এবার। ডেকে আনুন। কে যাবে মরতে ওখানে। আমাদের তে কাজ ছাড়া বোটডেকে গেলে সাহেবদের জাত যায়।

এতো দেরি হবার তো কথা না। ডরোথি ক্যারিকোর কিছু ছবিটবির খবর নিতে বলেছিলেন। ছোঁড়া কি জালে সত্যি জড়িয়ে গেল। খুবই অসহায় বোধ করছেন। সে তো জানে, ফিল তার খামার থেকে কত কিছু পাঠিয়েছে। ভাল মন্দ খাবার লোভও আছে। জাহাজের একঘেয়ে খানা করই বা ভাল লাগে। ভোজের কথা ভেবেও তো তার চলে আসার কথা! এল না কেন? কে যাবে ডাকতে।

'এই সুরঞ্জন, যা না। বাবুকে একবার মনে করিয়ে দিয়ে আয়। আমরা সবাই বসে আছি।'

সুরঞ্জন ইতস্তত করছিল। কারণ চার্লির কেবিনে যাওয়া মানেই সেও লক্ষ্যবস্তু হয়ে যেতে পারে। কি যে হচ্ছে জাহাজে—সে ঠিক বুঝতে পারছে না। তার কেমন যেন ভয় করছে।

মুখার্জি আর পারলেন না।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

সুরঞ্জন মুখার্জিদার অভিমান বোঝে। কেউ কম স্বার্থপর নয় ভাবতেই পারে। সে বলল, 'তুমি চানে যাও। আমি যাচ্ছি। সেই কখন বের হয়েছো, ফিরেও স্বস্তি নেই। আমি যাচ্ছি।'

আর সুরঞ্জন কেবিনে নক করতেই শুনতে পেল, 'কে?'

'আমি স্টোকার সুরঞ্জন। সুহাস কি করছে। সবাই বসে আছে ওর জন্য। মিঃ মুখার্জি পাঠালেন।'

দড়াম করে দরজা খুলে গেল।

'সুহাস!'

'হ্যাঁ ও তো আপনার কেবিনে সকালে এল।'

'সুহাস! সে তো কখন চলে গেছে!' চার্লি ঘড়ি দেখে বলল।

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমি তো বোটডেক থেকে দেখলাম সিঁড়ি ধরে নামছে।'

'পিছিলে নেই'

'নেই!' চার্লি বলল, 'সত্যি নেই' না না আছে। পিছিলেই আছে। আমি নিজে দেখেছি সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। ভাল করে খুঁজে দেখ। দু-ঘণ্টা হবে—সে যাবে কোথায়। বলে দরজা ঠাস করে বন্ধ করে সেও সুরঞ্জনের পেছনে ছুটতে থাকল। যেন আগুনের ভিতর দিয়ে ছুটছে চার্লি। দাউ দাউ করে জ্বলছে। সুহাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে প্রবল যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে।

চব্বিশ

চার্লি ছুটে আসছে দেখতে পেয়েই মুখার্জি প্রমাদ গুণলেন। কিছু একটা হয়েছে। তিনি ছুটে

গেলে সুরঞ্জন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সুহাস বোটডেকে নেই।'

'গেল কোথায়!' মুখার্জি চার্লির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তাকে সামলানো কঠিন। পিছিলে নেই, বোটডেকে নেই—গেল কোথায়?

'দ্যাখ চার্লি ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি তো বিশ্বাস কর হি প্রটেক্টস। তার তো কোনও অপরাধ নেই। গোলমাল বাধালে জাহাজে অনাসৃষ্টি হতে পারে। কেউ রক্ষা পাবে না। আগে খুঁজে দেখা দরকার। তবে পিছিলে নেই। তবু চল, দেখাই যাক। পিছিলে খুঁজে দেখতে ক্ষতি কি।'

সুরঞ্জন মুখার্জির পেছনে পেছনে ছুটছে। চার্লিও। কেন যে চার্লি নিজেকে কিছুতেই শান্ত রাখতে পারছে না—স্থির হতে পারছে না। সুহাসকে নিয়ে তার কেন যে সবসময় এত আতঙ্ক! সারেঙসাব ওদের উঠে আসতে দেখেই তাজ্জব। সঙ্গে আবার কাপ্তানের ব্যাটা। গোলমেলে কিছু কি না কে জানে। ফাইভার মারা যাবার পর থেকেই মুখার্জিবাবু কেমন উচাটনে পড়ে গেছেন।

মুখার্জিকে তিনি বললেন, 'পেলেন!'

'না। চার্লির কেবিন থেকে কখন চলে এসেছে! গেল কোথায়, বুঝতে পারছি না।'

'কোথাও গেছে। বাথরুমে নেই তো!' সারেঙ নিজেই বাথরুমের দিকে গেলেন। বললেন, 'সকাল থেকেই তো নেই।' মুখার্জি দাঁড়ালেন না। নীচে নেমে গেলেন। সবাইকে এক প্রশ্ন, সুহাসকে দেখেছ?

'না। সকাল থেকে দেখিনি।' হাফিজ বলল।

মুখার্জি অধীরকে ডাকলেন, 'তুই একবার দেখে আয় তো বাঙ্কারে আছে কি না!'

মুখার্জি বুঝতে পারছেন না কি করবেন। সারেঙকে সব খুলে বলা ঠিক হবে কি না তাও মাথায় আসছে না। সারেঙসাব ভাবতে পারেন, গোলমালটা কোথায়! কাপ্তান তো সুহাসকে স্নেহ করেন। না হলে এত রাতে ডেকে পাঠাতে পারেন! সব খুলে বলাও যায় না! চার্লি যে ওম্যান প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। চার্লি যে বিপদের মধ্যে আছে তাও প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, চার্লিকে মুখোশ পরে অনুসরণও করছে। সুহাসকে দু দুবার খুন করার চেষ্টা হয়েছে—এ-সব তো তারা তিন চারজন ছাড়া আর কেউ জানে না। সুহাসের জন্য এতটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়াটাও ওদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। বলতে পারে, গেছে কোথাও। কিনারায়ও নেমে যেতে পারে।

তবে একা সে বের হয় না। সারেঙই বারণ করে দিয়েছেন, এখনও জাহাজ চিনতে সময় লাগবে। কিনার চিনতে সময় তো লাগবেই। তবু আজকালকার ছোকরা, কে কার কথা শোনে!

সুরঞ্জন অধীর কোল বাঙ্কারে ছুটে গেল। ওখানে নিয়মিত আছে। স্টোকহোলডে নিয়ামতের ডিউটি। আড্ডায় যদি মেতে যায়।

মুখার্জি ফোকসাল, বাথরুম এমন কি বোটডেকে উঠে গেলেন। চার্লি যেন আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে বলল, একবার ইঞ্জিনরুমে গেলে হত! ইঞ্জিনরুমে নেমে কি হবে মুখার্জি বুঝতে পারছেন না। তাকে তো কোনও ডিউটি দেয়া হয়নি। দিলে সারেঙসাব জানবেন না হয়। তার আগে দেখা দরকার ফক্কাগুলি। ফক্কার কাঠ খোলা রেখে কেউ

যদি জাল পেতে রাখে। তিনি সামনে পেছনে চারটা ফল্কাই দেখলেন। ফল্কার কাঠ খোলা নেই। ফল্কা ত্রিপল দিয়ে কিল এঁটে রাখা। মাল বোঝাই হচ্ছে। বৃষ্টি বাদলায় ভিজে গেলে মাল নষ্ট হতে পারে। এমন কি বাতিল হয়ে যেতেও পারে। সারেঙসাব বাথরুমে ঢুকে গেলেন। চার্লি মুখার্জিকে কেবল বলছে, তোমাদের কিছু বলে যায়নি! গেল কোথায়?

'না।' আমি তো এইমাত্র ফিরলাম।

চার্লির চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। সুহাস, তুমি কোথায়? কোথাও তুমি ঠিক আছ। সাড়া দিচ্ছ না। কিন্তু এত অধীর হয়ে পড়লে মুখার্জি বিরক্ত হবেন। সে চিৎকার করে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। দু একজন অফিসার ইঞ্জিনিয়ারও বের হয়ে এসেছেন। চার্লিকে প্রশ্ন, 'কি ব্যাপার! জাহাজ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছ!'

চার্লি শুধু বলল, 'সুহাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' তারপর নিজেকে সামলে নিচ্ছে। এই দোষ চার্লির, একটুকুতেই ভেঙে পড়ে। মুখার্জি বারবার বলছেন, 'ধৈর্য ধরতে হবে চার্লি! যাবে কোথায়! জাহাজেই আছে!'

'কোথায় আছে! প্রায় দাঁত চেপে নিজেকে সামলে বলল, কখন সামান্য ব্লু বেরিজ জুস খেয়েছে। সবে ডাইনিং হল থেকে ফিরেছি। শুনি সুহাস পিছিলে নেই! কোথায় যেতে পারে! কেন যাবে! বল, কেন সে জাহাজ থেকে নেমে যাবে! জাহাজ থাকলে, কোথায় থাকতে পারে!'

'আমিও তো বুঝতে পারছি না! কি বলব!' চার্লিকে যে আর শান্ত রাখা সম্ভব না মুখার্জি নিজেও বুঝতে পারছেন। তিনিও তো ভাল নেই। চার্লির কথার জবাব দিতে গিয়েও ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। অধীর সুরঞ্জন ছুটে এসে বলল, না স্টোকহোলডে নেই। নিয়ামত বলল, 'গেছে কোথাও। গিয়ে দ্যাখ বাছাধন হয়তো এতক্ষণে পিছিলে হাজির।'

মুখার্জি বললেন, 'কোল বাঙ্কারগুলি দেখেছিস?'

'দেখেছি।'

'ক্রশ বাঙ্কারে দেখলি!'

'ওখানে তো দরজা সিল করা। খোলা হয়নি।'

মুখার্জি ভাবলেন, সব খুলে দেখা দরকার হবে। যদি কিছু হয়েই যায় লাশ পাচার করতে দেওয়া হবে না। আগুন জ্বলবে। কেউ রেহাই পাবে না। তিনি নিজেও কতটা অস্থির হয়ে পড়ছেন, এতেই টের পেলেন। বিচলিত হলে চার্লিকে ধরা রাখা যাবে না। সে কি করে বসবে কে জানে।

বংশী ছুটে আসছে।

সে এসেই বলল, 'কি হয়েছে বলো তো!'

এই আর এক ঝামেলা। তাকে কিছু বলাও যাবে না। মুখার্জি বললেন, 'কিছু না। তুই যা। তোর খাওয়া হয়েছে?'

'কিছু না বলছ কেন! আমি আহাম্মক ভাবছ! তোমরা আহাম্মক! তোমরা মনে কর আমি কিছু বুঝি না। সুহাসকে খুঁজছ। আমি বলছি না, জাহাজে কিছু একটা আছে! সুহাস তার পাল্লায় পড়ে গেছে। তাকে তোমরা কোথাও খুঁজে পাবে না। বললাম, মিলিয়ে নিও। ফাইভার গেল, কাপ্তান নাটক করল, কিসের নাটক—চার্লিকে বলে দেখ না, সে কি দেখতে

পায়! চার্লি তুমি সত্যি করে বল, বোটডেকে মেয়েমানুষ দেখা যায় কি না! কে ডেরিক তুলে রাখে। শয়তান। জাহাজে সমুদ্র শয়তান উঠে এসেছে। কাপ্তানের উপর শয়তান ভর করেছে। হারামির বাচ্চারা পার পাবে ভাবছ!'

মুখার্জি আর পারলেন না!

'কি হচ্ছে!'

'কিছু হচ্ছে না। যা হচ্ছে, তোমরা সবাই জান। মুখ খুলছ না। আগুন লাগিয়ে দিলে বুঝবে!'

মুখার্জি এবার তেড়ে গেলেন—'একদম বাজে কথা না। যা শুয়ে পড়্‌গে। বউয়ের ছবি বের করে দেখগে। আমাকে জ্বালাবি না। বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো চ্যাংদোলা করে জলে হারিয়া করে দেব।'

মুখার্জির তড়পানিতে বংশী কিছুটা মিইয়ে গেল—বিড় বিড় করে বকছে, 'আমার কি, গেলে সবাই যাবে। জাহাজ ডুবলে কে আর রক্ষা পায়। এক দু'-জনের উপর দিয়ে গেল—ভেবেই তেনারা খুশি। আরে দ্যাখ কি হয়। তবে আমিও ছাড়ব না। বলে দিলাম, আমি জানি, কিছু একটা হবে। শুয়োরের বাচ্চা কাপ্তানকে কি করে টাইট দিই দ্যাখ না। জাহাজ নিয়ে ঘুরবে শয়তানের রাজত্বে। ঘোরা বের করে দেব।'

মুখার্জি এখন কি যে করেন! কাকে সামলান। চার্লি তাড়া দিচ্ছে, নীচে নেমে গেলে হয়। চার্লি বোধ হয় আর পারছে না। সে ছুটে যাচ্ছে। কে জানে কেবিনে কেবিনে সে লাথি মেরে দরজা খুলতে বলবে কি না!' এতটা ভেঙে পড়াও ঠিক না। যদি কিনারায় যায়ই, যেতে পারে না, তাও তো বলা যায় না। তাঁর দেরি দেখে কে জানে যদি সে খুঁজতে চলে যায়। তবে একা যাবে এমনও ভাবতে পারেন না। কিনারায় নেমে গেলে ঠিক সুরঞ্জন অথবা চার্লিকে বলে যেত। কাউকে না বলে যাবার মতো অদায়িত্বশীল সে তো নয়। তবু একবার খাঁড়ির জলে নৌকা কিংবা মোটরবোটগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। কিনারায় গেলে ফেরার সময় হয়ে গেছে। তাঁকে চার্লিকে জাহাজের রেলিঙে দেখলে হাতও তুলে দিতে পারে।

না কিছু না। কেউ কোনো বোটে হাত তুলে দিচ্ছে না।

পাল তোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে।

মোটর বোটে কাপ্তান, চিফমেট সেকেন্ডমেট নেমে গেলেন। দূরে স্টিমার পার্টির লোকজন হৈচৈ করে ফিরছে। বোটে পাল তুলে অনেকে খাঁড়ি পার হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। কেবল সুহাসের পাত্তা নেই।

কোথায় যাচ্ছেন কাপ্তান! মুখার্জি বিস্মিত।

'চার্লি তোমার বাবা কোথায় যাচ্ছে জান?'

'রিফ এক্সপ্লোরারে যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

চার্লি নিজেও আর বোধহয় বিশ্বাস রাখতে পারছে না মুখার্জির উপর। যেন মুখার্জি নেহাতই সামান্য ঘটনা ভাবছেন। এতটা উতলা হবার কিছু নেই। কিন্তু চার্লি তো জানে কি হতে পারে! সে তো ভেবে পাচ্ছে না, কারণ তার রক্তে যে সেই এক প্রবল ঈশ্বরে বিশ্বাস—হি প্রটেক্টস। সে তো মরিয়া হয়ে উঠতে পারছে না শুধু ঈশ্বরের কথা ভেবে।

সে তো সিনার হতে চায় না। সে যতই বলুক, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি—কিন্তু পারছে কই! পারলে সুহাসের জীবন বিপন্ন হত না। তবু শেষ পর্যন্ত সে লড়বে। সে ছুটছে। ইঞ্জিনরুমে দৌড়ে সিঁড়ির রেলিঙ ধরে নেমে যাচ্ছে। যদি সুহাস কোথাও পড়ে টড়ে থেঁতলে যায়। কিংবা প্রতিহিংসা—এবং সুহাসকে যদি সত্যিই শেষ করে দেয়। কত কুকথা যে মনে হচ্ছে তার। দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি আপরুটেড।

সে নেমে গেলে মুখার্জিও নেমে গেলেন। অন্ধকার ইঞ্জিনরুম। মুখার্জি আলোগুলি সব জ্বালিয়ে দিলেন। পাগলের মতো ডাকছে চার্লি—'সুহাস, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এনড অফ দ্য ওয়ার্লড। এনসার মি। সুহাস তুমি কোথায়! সাড়া দিচ্ছ না কেন?'

কোনো সাড়া নেই।

মুখার্জি টানেল পথটায় ছুটে গেলেন, ডাকলেন, 'সুহাস আছিস? সুহাস।'

আরে থাকলে তো তিনি দেখতেই পেতেন! ছেলেমানুষের মতো ডাকাডাকি করছেন কেন তিনি নিজেও বুঝছেন না!

চার্লি বিলজে টর্চ মেরে দেখছে। আর ডাকছে সুহাস, তুমি কোথায়? কেন সাড়া দিচ্ছ না। মুখার্জি, সুহাসের সাড়া পাচ্ছি না কেন। আবার আর্তকণ্ঠে ডাকছে। অভয় দিচ্ছে যেন। বলছে ইফ এভরিওয়ান এলস ডেজার্টস ইয়ো, আই ওন্ট সুহাস। বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মুখার্জি আর পারলেন না।

'কি হচ্ছে চার্লি!'

'আমি জানি না মুখার্জি, আমি কিচ্ছু জানি না। ও সাড়া দিচ্ছে না কেন!

'আচ্ছা এত ভেঙে পড়লে চলবে।' তারপর কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'কেন এসব হচ্ছে! তুমি বুঝতে পারছ না, বার বার সুহাসকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে! কে করছে! তুমি সব জান! বল, কে করছে। সুহাসের কিছু হলে আমি তোমাকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। কেউ রেহাই পাবে না। সে যত বড় সি-ডেভিলই হোক।'

চার্লি কিছুই বলছে না। নিরুপায় বালিকার মতো শুধু কাঁদছে। বসে আছে হাঁটু গেড়ে। টর্চ পড়ে আছে প্লেটে।

'আমি জানি না কিছু। আমাকে তুমি কিছু বলবে না।'

'তুমি চেন তাকে?' মুখার্জি ইনজিনরুমে চার্লিকে একা পেয়ে জেরা করছেন। 'তুমি তাকে জান! না হলে কেন বললে, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল উইদ ইভিল। কেন বললে বল। তুমি তাকে চেন! কি অসুবিধা তোমার! কেন তুমি তোমার বাবাকে ক্রেজি ওল্ড গোট বলে গালাগাল দিলে বল! কেন তুমি মুখ আঁকলে গোঁফ আঁকলে!'

'আমি জানি না, কিচ্ছু জানি না মুখার্জি।'

'বিটসি খুন হয়েছে কেন?'

'তাও আমি জানি না!'

'কিছুই জান না। এটা বুঝছ না সব গণ্ডগোলের মূলে তুমি! সেটা কি! বল, চুপ করে আছ কেন? তুমি মেয়ে! ছেলের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াও। তা বেড়াতেই পার।

কিন্তু তুমি কি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সব দেখতে পাও? তোমার কাকার কথা মনে করতে পার। আঙ্কল রাচেলকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে? তোমাদের বুনোফুলের সাম্রাজ্য পার হয়ে কোনও স্টপ অফে ট্রাকারদের সঙ্গে কারও কি দোস্তি ছিল। তোমার দাদা, তোমার দিদিরা কোথায়। তাদের নাম তুমি জান না বিশ্বাস করতে হবে! তোমার ঠাকুরদা সব তোমাকে দিয়ে গেছেন। তোমার শত্রু থাকবে না ভাবছ কি করে!'

'কি ঠিক বলছি।'

চার্লি বলল, 'সুহাসকে তো সব বলেছি।'

'তুমি বলেছ, সেও আমাদের সব বলেছে, যার জন্য তুমি দায়ী নও, অথচ তোমাকে তার দায় বহন করতে হচ্ছে। দায়টা কি। বল! তোমাকে কোনও অনুসরণকারী তাড়া করছে না, তাড়া করছে, তোমার ঠাকুরদা। কেন তাড়া করছে। তা হলে এত খোঁজাখুঁজি কেন। জাহাজেও অনুসরণকারী উঠে আসে কি করে। সুহাসকে নিয়ে কাকে খুঁজতে বের হয়েছিলে। যদি সত্যি সে অনুসরণকারী হয়, কেন সে তোমাকে অনুসরণ করছে। হাজার প্রশ্ন। তোমার ঠাকুরদা কেন জাহাজে উঠে আসবেন। তিনি বেঁচে নেই। তিনি কি করে এই জাহাজে উঠে আসতে পারেন। এতে কি মনে করতে পারি না, তুমি মানসিকভাবে সুস্থ নও। অথবা কি মনে করতে পারি না, তোমার কোনও অজ্ঞাত পাপ আছে। অজ্ঞাত পাপের তাড়নায় তুমি মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেল! বল! কথা বলছ না কেন। সুহাস সাড়া দিচ্ছে না। আমরা তাকে আর কোথায় খুঁজতে পারি। অপেক্ষা ছাড়া আমাদের আর কি করণীয় থাকতে পারে। চার্লি অকপট হও। প্লিজ। কাঁদলে চলবে! তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন!'

'চার্লি শক্ত হও। আমি জানি সুহাসের কিছু হলে মাথা ঠিক রাখকে পারবে না। কিন্তু আমাদের শক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বুঝে দ্যাখ, তোমার বাবা তোমাকে জাহাজে তুলে এনেছেন—জাহাজে নিয়ে বছরের পর বছর ঘুরছেন। জাহাজেই তুমি বড় হয়ে গেলে! কেন! তাঁর কি কোনও দূরভিসন্ধি আছে। তাঁর কিংবা আর কারও। তুমি তো বলেছ, ইভিন কাউন্ট অল দোজ হু হেট ইয়ো উইদাউট কজ।'

তারা তোমাকে কি শাস্তি দিতে চায়! সব খুলে না বললে কিছু করা যাবে না। আমরা চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় তুমি সবাইকে চেন।

তোমার কাকার নাম নিশ্চয়ই জানবে। বল জানি কি না।'

'আঙ্কেল রাচেল বেঁচে নেই। তিনি বেঁচে থাকলে আমার এই দুর্গতি কিছুতেই হত না মুখার্জি। চার্লি রুমালে মুখ চেপে কথা বলছে।'

'আচ্ছা আঙ্কেল রাচেলকে দেখলে চিনতে পারবে! মুখার্জির চোখে প্রত্যাশা ফুটে উঠছে।'

'বুঝতে পারছি না। আবছা মনে আছে।'

'কবে তাকে শেষ দেখেছ।'

'আমি খুবই ছোট। এই চার পাঁচ বছর। যুদ্ধে যাবার আগে তিনি ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঠিক চিনতে পারব কিনা জানি না।'

মুখার্জি কিছুটা দম নিলেন যেন। 'যুদ্ধে তিনি কবে যোগ দেন?'

'যোগ দেন কবে বলতে পারব না। আমার এখন মাথাও ঠিক নেই। সুহাস কোথায়!

সে কোথাও আছে! সাড়া দিচ্ছে না।'

'যেখানেই থাকুক খুঁজে বের করব। চল উপরে উঠি। মিঃ ফিলের কাছে আজ একবার যেতে পারবে?'

'সুহাস কোথায়? ফিল বলছ কেন। সুহাসকে ফেলে আমি কোথাও যাব না। কোথাও না।'

'সুহাসকে ফেলে আমিও যাব না। কথা দিচ্ছি। তাকে খুঁজে পেলেই আমরা যাব। তাকে আমরা ঠিক খুঁজে বের করব। যেখানেই থাকুক। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়াবে না।'

আসলে মুখার্জির কেন যে মায়া হল, এত অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা যে নারীর তার প্রতি আর কতটা নিষ্ঠুর আচরণ করা যায়। তিনি তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের জন্যও কেমন কিছুটা অনুতপ্ত। মুখার্জি চার্লির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, অবোধ কন্যাকে তিনি মাঝে মাঝে দেশে গেলেও এ-ভাবে আদর করেন।

আর জাহাজে যেতে হবে না বাবা।

না, আর যাই!

কিনারায় কোথাও কাজ খুঁজে নাও।

ঠিক কাজ খুঁজে নেব। ভালই লাগে না তোদের ছেড়ে থাকতে। আমাকে ছেড়ে তোদের থাকতে কষ্ট হয়, আমার বুঝি হয় না!' আজ চার্লিকে দেখে নিজের মেয়ের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে।

সুহাসকে খুঁজতে গিয়ে চার্লিকে এ-ভাবে একা পাওয়া যাবে মুখার্জি আশাই করতে পারেননি। ইঞ্জিন রুমের সিঁড়িতে সবাই একে একে নেমে আসছে।

এক প্রশ্ন, পাওয়া গেল?'

মুখার্জি বললেন, 'না।'

চার্লি হেঁটে চলে যাচ্ছে। ব্রয়লার রুম পার হয়ে পাগলের মতো দু হাত মুখে রেখে চিৎকার করছে 'সুহাস তুমি কোথায়? সুহাস উত্তর দাও। সুহাস—'

আসলে এই আর্তডাক কোনও নিবিড় এবং নিরুপম উপাসনার মতো। চার্লি সিঁড়ি ধরে বাঙ্কারে ঢুকে যাচ্ছে। সে কাউকে বিশ্বাস করছে না।

'সুহাস, সুহাস!'

আসলে এক নারী তার প্রিয়জনকে জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রে যেন ডুবে যেতে দেখছে। চার্লি যদি কিছু একটা করে বসে।

বার বার সে বলছে, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্লড।

এই পৃথিবীর শেষেও সে সুহাসের সঙ্গে আছে। ভাবতে গিয়ে তাঁর মতো অভিজ্ঞ জাহাজির চোখেও জল এনে গেল।

তিনি চার্লির পেছনে ছুটছেন। চার্লি একদণ্ড দাঁড়াচ্ছে না। সামনে রঙের টব পড়ল, লাথি মেরে উড়িয়ে দিল। সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে লাফিয়ে। সে কাউকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। দৌড়ে যমুনাবাজুর কয়লার বাঙ্কারে ঢুকে গেল। সুটের মুখে টর্চ মেরে

ঝুঁকে দেখল। সুটের গর্তে কয়লার মধ্যে যদি চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে। গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে ঢুকে গেল। সেখানেও টর্চ মেরে দেখল, যদি পড়ে থাকে।

তারপর কয়লার পাহাড়ে টর্চ মেরে দেখল। সে ছুটে যাচ্ছে। জাহাজের সবাই হাজির। কাপ্তান জাহাজে নেই—কেউ যেন এই উদ্‌ভ্রান্ত করে ছেলেটিকে নিরস্ত করতে পারবে না। এমন কি মুখার্জিও ভয় পেতে শুরু করেছেন। চার্লি ঘামছে। তেলঘামে মুখ চক চক করছে। বিস্ফারিত চোখ। দেবী তাঁর রণচণ্ডী রূপ নিতে শুরু করেছেন। চোখে বিন্দুমাত্র অশ্রু নেই। ঝিম ধরা ভাব চোখ মুখে। দেবী ফল্কায় ফল্কায় ছুটে গেলেন। কাঠ ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকলেন। কারপেন্টারকে ডেকে তার ঘর খুলতে বললেন।

কোথাও তাকে আটকে রাখা হয়েছে।

কারপেন্টার চার্লির রুদ্রমূর্তিতে ভয় পেয়ে মুখার্জিকে বলল, কিয়া মাংতা বাবু।

আরে আগে তোমার স্টোর খুলে দেখাও।

কার্পেন্টার দৌড়ে চাবি নিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে কাঠ, র‍্যাঁদা, বাটালি, হাতুড়ি যা কিছু সামনে পেল ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেকে। তারপর বের হয়ে ক্রশ বাঙ্কারে নেমে দুমদাম দরজায় লাথি মারতে থাকল।

মুখার্জি বসে পড়লেন।

তিনি আর কিছুই ভাবতে পারছেন না।

তিনি তবু চার্লির কাছে গিয়ে বললেন, 'এটা কি হচ্ছে। সব ভাঙচুর করছ। সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ!' তিনি ছুটে গেলেন, থার্ডমেটের কাছে। বললেন, 'একটা বিহিত করুন। আপনারা হাঁ করে দেখছেন!'

থার্ডমেটও খেপে আছেন। সোজা জবাব, 'মাথা গরম ছোকরা। বাপই সামলাতে পারে না, আমাদের দায় পড়েছে! যা খুশি করুক। আরে একজন নেটিভকে নিয়ে তোর এত মাথা গরম করার কি আছে!' কোথাও গেছে। আসবে।'

থার্ডমেট তো ভালমানুষ! তিনিও নেটিভ বলে গালাগাল দিচ্ছেন। এই বর্ণবিদ্বেষও একটা যে হেতু হতে পারে এই প্রথম টের পেলেন মুখার্জি।

তিনি বুঝতে পারছেন, জাহাজে চার্লিকে শুধু সুহাসই সামলাতে পারে। আর কেউ পারে না। কারও সাধ্য নেই। সবাই তামাসা দেখতে বোটডেকে, ফল্কায় জড়ো হয়েছে। এ-ছাড়া তারাও যেন নিরুপায়।

কি যে হবে!

জাহাজে লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

চার্লি কারও সঙ্গে আর কথা বলছে না। চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেছে। সে বোটডেকে ছুটে আসছে কেন।

ইঞ্জিন সারেঙ দলবল নিয়ে ক্রশ বাঙ্কারের দরজা খুলতে গেছেন। মুখার্জিবাবুই বলেছেন, 'খুলে দেখান। চার্লি কাউকে বিশ্বাস করছে না। সুহাস গেলই বা কোথায়। কিছু একটা অঘটন ঘটছে। চার্লি বোধহয় জানে।'

আর এ-সময়ই বোট-ডেকে ছোটাছুটি শুরু হয়েছে। চার্লি কাপ্তানের কেবিনে ঢুকে গেছে। চার্টরুম থেকে চাবি এনে দরজা খোলারও যেন তর সাইসই পাচ্ছে না। কেন লক দুমড়ে

মুচড়ে লাথি মেরে কেবিনের দরজা খুলছে —তাও বুঝতে পারছেন না মুখার্জি! মুখার্জি কেন, কেউ না। সবাই তটস্থ। জাহাজে এ কি অনাসৃষ্টি শুরু হল—আর তখনই দেখা গেল চার্লি বের হয়ে আসছে। হাতে বাপের নিরাপত্তার আগ্নেয়াস্ত্র। পিস্তল তুলে সে হেঁটে যেতেই, অফিসার ইঞ্জিনিয়াররা যে যার কেবিনে ঢুকে দরজা লক করে দিয়েছে। চার্লি নীচে নেমে গেল। এলিওয়েতে রেডিও অফিসারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা গলায় চার্লি বলল, মিঃ উইলিয়াম ডু ইয়ো নো হোয়াই আই হ্যাভ কাম! আই অ্যাম হিয়ার টু টেল ইয়োর ফেট! তারপর সহসা চিৎকার করে উঠল চার্লি এখন কি হবে? স্কাউন্ড্রেল। বলেই দুমদাম দরজায় লাথি মারতে থাকল চার্লি। মুখার্জি এলিওয়েতে কি ঘটছে বুঝতে প্যারছেন না। তিনি বোটডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখার্জি বুঝলেন, এই সুযোগ। চার্লির হাতে পিস্তল দেখে যে যার মতো পালাচ্ছে। মুখার্জি কাপ্তানের ঘরে ঢুকে গোপন চাবিটির খোঁজে সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছেন। না, পাওয়া যাচ্ছে না—কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। র‍্যাক থেকে সমুদ্র সংক্রান্ত সব বই টেনে নামালেন। ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন সব। লকার টানাটানি করেও ফল হচ্ছে না। কাগজপত্র যা পাচ্ছেন, জড় করছেন। কোথায় রাখেন। উপরে যিশুর মূর্তিটা। টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে ওটা টেনে নামালেন। কেন যে তাঁর মনে হচ্ছিল, ঈশ্বরের মুখ মুখোস হয়ে গেলে সাংঘাতিক হয়। দেশ ভাগ হয়। হাজার লক্ষ মানুষ গৃহহারাও হয়। ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ কিছুই বাদ যায় না। তিনি যিশুর মূর্তিটির ভেতর কিছু আছে টের পেলেন। ফাঁপা। ভিতরে কিছু আছে। দুমড়ে মুচড়ে আছাড় মেরে মূর্তিটি ভেঙে ফেলতেই ইউরেকা।

মুহূর্তে কাজ সেরে ফেললেন মুখার্জি। সেই গুপ্তলকার থেকে যা কিছু চিঠিপত্র, ছবি, ডরোথি ক্যারিকোর গাইড বুক, দলিল দস্তাবেজ—এবং তাঁর কিছুই খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই—এইসব কাগজপত্র থেকে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়। সামান্য চিরকুটটি পর্যন্ত যত্ন করে ফাইলবন্দী করে ফেললেন। আর মাঝে মাঝে দরজায় উঁকি মেরে দেখছেন, কেউ যদি কোনও অদৃশ্য জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তিনি জানেন না, নীচে এলিওয়েতে কি হচ্ছে।

তবে খুবই ত্রাসে পড়ে লোকজন ছোটাছুটি করছে, এবং এক বিধ্বংসী আচরণের সাক্ষ্য এখন এলিওয়েতে চলছে, চলুক। ভেবে লাভ নেই। সুহাসের যাই হোক, তিনি এই সুযোগ নষ্ট করতে পারেন না। একটা হেতু আছে, যা চার্লি জানে, অথচ প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। অফিসাররাও জানতে পারেন—কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। নানা দুশ্চিন্তায় তাঁর এখন মাথা ঠিক না থাকার কথা। অথচ খুবই মাথায় কাজ সেরে বের হয়ে পড়লেন। কাপ্তান কেবিনে ঢুকে যাই দেখুক, পুত্রের কাণ্ড ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। কারণ কাপ্তানের নিরাপত্তারা জন্য যে আগ্নেয়াস্ত্রটি সেটিও যখন খোয়া গেছে, তখন আর তাঁর বিষদাঁত কতটা প্রখর হতে পারে।

পঁচিশ

মুখার্জি কাপ্তানের কেবিন থেকে বের হয়ে দেখলেন, বোটডেকে কাকপাখিটি নেই। তিনি নীচে নেমে দেখলেন পিছিলে সবাই জটলা করছে। ডেকের দিকে কেউ যেতে সাহস পাচ্ছে

না। তাঁর এখন কিছুই দেখার সময় নেই। ছুটে আসার মুখে সবাই বলল, 'শিগগির যান। চার্লি দরজায় দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে। মার্কনিসাব দরজা লক করে ভিতরে ঘাপটি মেরে আছেন! চার্লি পাগল হয়ে গেছে। চার্লি মার্কনিসাবের দরজার সামনে হামলা করছে!' মুখার্জি কেমন আচমকা ধাক্কা খেলেন। লোকটিকে তো জাহাজে প্রায় দেখাই যায় না।

দিনরাত ট্র্যানসমিশান রুমে পড়ে থাকে। তার মুখটিও যেন তাঁদের ভাল চেনা নেই। তিনি এই খবরে অন্যসময় হলে খুবই বিপাকে পড়ে যেতেন—এখন তাঁর কাছে সবই অর্থহীন যিনিই সেই ইভিল হোন, সুহাসকে উদ্ধার করতে না পারলে সেই অদৃশ্য শত্রুর শাস্তির যেন আর গুরুত্ব থাকে না। তিনি জানেন, তবু চার্লি থেকে যাবে। চার্লির গায়ে হাত দেবার সাহস কারও নেই—তাও এই দুর্দিনে জানা হয়ে গেছে। সে যদি খুনটুন করে বসে, তবু সে যেন রেহাই পেয়ে যাবে। এত যার দাপট সুহাসের কিছু হলে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবে না কে বলতে পারে!

চার্লিকে শত্রুমুক্ত করতে পারলেও তাঁর একটা যেন সান্ত্বনা থাকবে। তিনি দ্রুত নীচে নেমে গেলেন। ফোকসালের দরজা খুলে লকারে ফাইলটি রেখে ভাল করে টেনে দেখলেন লকার। তারপর দরজা বন্ধ করে লক করে দিলেন। দরজা ঠেলে দেখলেন, নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, যত রাতই হোক, তাঁকে আজ সব কাগজপত্র ফিলের জিম্মায় পৌঁছে দিতে হবে। মানুষটি যে প্রকৃতই ধার্মিক, ঘোড়ায় চড়ে বসলেই টের পাওয়া যায়। মানুষের বসবাস কত সুন্দর হয় তাঁর এলাকায় না ঢুকলে বোঝা যায় না।

এসব ভাবনা যে কেন মাথায় আসছে! অন্তত আর একবার শেষ চেষ্টা। তিনি সুরঞ্জন অধীরকে নিয়ে ছুটতে থাকলেন। চার্লিকে স্বাভাবিক করে তুলতেই হবে। সুহাস তো বলেছে, চার্লি খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী। সে পাপকে ভয় পায়। তার এই পাপবোধই এতদিন তাকে রক্ষা করে আসছে। সে কিছুই করতে পারছে না। প্রতিশোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকতেও সে নিজেকে কষ্ট দিয়েছে, ঈশ্বরের পৃথিবীতে বুনো ফুল হয়ে ফুটে থাকার জন্য সে শাস্তি মাথায় পেতে নিয়েছে। সে জানে, তার ঠাকুরদার ইচ্ছেই এটা।

চার্লি সুহাসকে বলেছে, ওয়ান ডে, ইন এ ভিসান, গড টোল্ড হার সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট ওয়ার গোয়িং টু হ্যাপেন ইন হার লাইফ। চার্লিকে তিনি নাকি বলেছেন, প্রতীক্ষা তোমাকে একদিন বুনো ফুলের সৌন্দর্য প্রদান করবে। চার্লি নাকি ঘুমের মধ্যে এ-সব দেখতে পায়। সে নাকি তার ঈশ্বরকে বার বার প্রশ্ন করে, হাউ অফেন সুড আই ফরগিভ হিম হু সিনস এগেইনস্ট মি? সেভেন টাইমস? ঈশ্বরের জবাব, নো, সেভেনটি টাইমস সেভেন। সুহাসই বলেছে, চার্লির কি যে সব অদ্ভুত ধারণা মুখার্জিদা।'

মুখার্জি ছুটছেন। অধীর সুরঞ্জনও ছুটছে সঙ্গে।

চার্লি কিছু করে বসতে পারে। হাতের কাছে কাউকে না পেলে নিজেকেও শেষ করে দিতে পারে।

কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মুখার্জির। শেষে মার্কনি সাব! মুখোস, অনুসরণকারী, ডেরিক তুলে রাখা কার কাজ তবে! সেকেন্ড কি সত্যি নির্দোষ। তিনি যে সেকেন্ডকে দেখলেন, লাইটহাউজের পাশে, মগড়াকেও দেখেছে সুহাস। মগড়ার এত সাহস!

তিনি ডাকছেন, 'চার্লি, চার্লি। প্লিজ চার্লি পাগলামি করবে না। ওয়েট ফর সেভেনটি

টাইমস সেভেন।'

চার্লি মার্কনি সাবের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাথি মারছে দরজায়।

মুখার্জি চার্লির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ধস্তাধস্তি করে চার্লি পেরে উঠছে না। কেবল বলছে, 'বেটার ইউ কিল মি মুখার্জি। আই উড র‍্যাদার বি ডেড দ্যান এলাইভ।'

'চার্লি প্লিজ লিশেন। তুমি জানো, হি প্রটেক্টস।' সঙ্গে সঙ্গে চার্লির সারা শরীরে ঠাণ্ডা হিমেল স্রোত নেমে আসছে। সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। গায়ে জোর পাচ্ছে না। বসে পড়ছে। পিস্তলটা হাত থেকে আলগা হয়ে গেল।

তার যেন আর দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। দেয়ালে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলছে, 'ওঃ লর্ড হাউ লঙ মাস্ট আই কল ফর হেল্প বিফোর ইউ উইল লিসেন?'

সহসা চার্লি চুপ মেরে গেল। কি যেন খুঁজছে।

চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'কে ডাকে?'

সবই স্বগতোক্তি।

'ইজ দ্যাট হোলি স্পিরিট?'

'কি বলছে।' চার্লির চোখে মুখে ত্রাস।

'হি সিঙ্কস বিনিথ দ্য ওয়েভ! অ্যান্ড ডেথ ইজ ভেরি নিয়ার!'

সে চিৎকার করে উঠল, 'না না।'

আর তখন ইনজিনরুমে ধুন্ধুমার কাণ্ড! নিয়ামত নাকি দেখেছে, খোলের ভিতর থেকে এক অপদেবতা উঠে আসছে। লোমের মতো শ্যাওলা গজিয়ে গেছে অপদেবতার সারা গায়ে। কোনওরকমে নিয়ামত জান বাঁচিয়ে উপরে উঠে এসেছে। ডেকে এসে কিছু বলারও চেষ্টা করল।

গোঙানির মতো শোনাল।

ভূ-ভূ-ত।

তারপরই ধড়াস করে ডেকে পড়ে গেল। মুখে গাঁজলা উঠছে।

ইনজিন রুমে ভূত!

ইনজিন রুমে অপদেবতা!

শ্যাওলা গজিয়ে গেছে শরীরে। সারা জাহাজে তোলপাড়। নিয়ামতের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। বোকার মতো সবাইকে দেখছে। চোখ আগের মতোই ঘোলা ঘোলা। সে আবার পালাতে চাইছে। কখনও বলছে—জিন, কখনও বলছে, শ্যাওলায় ঢেকে আছে—উঠে দাঁড়াতে পারছে না। জাহাজের খোল থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। মাথা তুলে দিচ্ছে। খোল ফুটো করে উঠে আসছে। এমন সব কথাবার্তা। খুবই অসংলগ্ন—কোনও মাথামুণ্ডু নেই।

কখনও বলছে, কবন্ধ।

মুখার্জি নিজেও কেমন কিছুটা বিচলিত। জাহাজে তবে সত্যি কি একটা কিছু আছে। চার্লি ওদের কথাবার্তা বুঝতে পারছে না। সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। চার্লি নিজেও মধ্যরাতে কি সব শুনতে পায়।

সে মুখার্জিকে বলছে, 'এনি ডিজঅনেস্ট গেইন অর ব্লাডসেড!'

'না না। কোনো ব্লাডসেড নয়। ইনজিনরুমে অপদেবতা উঠে আসছে। সমুদ্রের তলা থেকে খোল ফুটো করে উঠে আসছে শ্যাওলায় ঢাকা শরীর। কি জানি কি হচ্ছে জাহাজে--জানি না!'

হঠাৎ চার্লির কি হল কে জানে--'মাই গ্লিটারিং সোর্ড' বলতে বলতে ইনজিন রুমের দিকে ছুটতে থাকল। আর সবাই অবাক। একজন সমুদ্র দানব, সত্যি যদি দানব হয়ে থাকে—জাহাজিদের কুসংস্কারের তো অন্ত নেই—তারা এমন বিশ্বাস করতেই পারে—এমন খবরে চার্লির মাথায় কি করে সহসা জেগে যায়, মাই গ্লিটারিং সোর্ড। চার্লির মাথায় কি দুষ্টু আত্মা ভর করে আছে। মুখার্জি ছুটে যেতে চাইলে, বংশী এসে জাপটে ধরল। কোমর ধরে ঝুলে পড়ল। 'দাদা যাবে না। পায়ে পড়ি। তুমি গেলে আমদের কেউ থাকবে না। যাবে না দাদা! দোহাই যাবে না। আমি তো জানি, সে দেখা দেবেই। সে যখন উঠে আসছে কাউকে রেহাই দেবে না।'

মুখার্জি এক ঝটকায় বংশীকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ছুটতে থাকলেন, সুরঞ্জন এবং সবাইকে ইশারায় ডাকলেন। তিনি সিঁড়ি দরে নেমে যাচ্ছেন অন্ধকার ইনজিনরুমে।

না, নীচে আর কেউ নামতে সাহস পাচ্ছে না। ইনজিন রুমে নেমে যাবার দরজায় সবাই শুধু উঁকি মারছে। নীচে তারা দেখল, মুখার্জি সিলিন্ডারের তলায় নেমে যাচ্ছেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকারে।

পঁচিশ ত্রিশ ফুট নীচে স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। আলো জ্বালা নেই।

বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকারই বলা যায়।

এমন কি নীচে তারা কারও সাড়াশব্দও পাচ্ছে না। তারা হা-হুতাশ করছে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

মুখার্জি নীচে নেমে জেনারেটরের পাশে এসে অবাক—আবার কেউ সুইচ অফ করে দিয়েছে। কার কাজ।

তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। চার্লি কোথায় গেল। ইনজিন রুমেই তো নেমে এসেছে। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! জাহাজটায় কি তবে সব প্রেতাত্মা উঠে এসেছে! চার্লি নিমেষে উধাও। গ্লিটারিং সোর্ড কে! চার্লি কি তাকে চেনে! তবে কি বংশীর কথাই ঠিক! জাহাজে কিছু একটা আছে! সে চার্লিকেও খেল, সুহাসকেও খেল! ম্যাককে তো আগেই খেয়েছে।

মুখার্জির সারা গায়ে লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুইচ জ্বেলে দিতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছেন। জীবনেও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি। দিন যত যাচ্ছে, সত্যি সব ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আর তখনই মনে হল, তিন নম্বর বয়লারের কাছে কারা যেন নড়ানড়ি করছে। কে যেন বলছে 'আমি ধরছি। উঠে এস।'

চার্লির গলা।

না আছে। আরও কেউ আছে। তিনি তাঁর দৃঢ়তা ফিরে পাচ্ছেন। মুহূর্তে তিনি তাঁর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়েছে বুঝতে পারলেন।

কাছে গেলে দেখতে পেলেন সব। নিয়ামত ভয় পেতেই পারে। সত্যি শ্যাওলায় ঢাকা

এক কবন্ধ। মাথায় মুখে শরীরে শ্যাওলা ভর্তি। চার্লি শ্যাওলা তুলে সাফসুফ করছে। কেউ যেন সারা সকাল ধরে জলের তলায় চুবিয়ে ইনজিন রুমের পাটাতনে সুহাসকে ফেলে রেখে গেছে। সুহাস বসে আছে—কিছুটা স্থবির। মায়ের মতো চার্লি তাকে জাপটে ধরে রেখেছে এক হাতে। অন্য হাতে গা থেকে মাথা থেকে শ্যাওলা সাফ করছে। তা হলে চার্লির ব্লিটারিং সোর্ডের এই অবস্থা!

চার্লি সুহাসকে নিয়ে এতই নিমগ্ন ছিল, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাও টের পাচ্ছে না। কিংবা পায়নি। পেলেও তার যেন কিছুই আসে যায় না। সে জানে, হি প্রোটেক্টস্। এই বিশ্বাস তাকে দুর্বল হতে দেয়নি। যদিও সে কিছুক্ষণ আগে তার সেই ঈশ্বরের প্রতি সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল—এখন আর সে তা বোধহয় মনে করতে পারছে না।

মুখার্জি ওদের মাথার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

চার্লির তখনও যেন হুঁশ ফেরেনি!

মুখার্জির স্তম্ভিত প্রশ্ন, 'কি করে হল! কি হয়েছে!' চার্লি এবার তাকাল। সে সুহাসকে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই যেন পড়ে যাবে। দেখল, মুখার্জি এসে গেছেন।

চার্লির যেন আর ভাবনা নেই। বলল, 'কি করে হল জানি না। কিছু বলছে না। অল দিস টাইম আই ওয়াজ লুকিং ডাউন—আনএবল্ টু স্পিক এ ওয়ার্ড। দেন সামওয়ান, হি লুকড লাইক এ ম্যান—টাচড্ মাই লিপস্। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলি। আই ওয়াজ টেরিফাইড বাই হিজ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড হ্যাভ নো স্ট্রেংথ! কাউকে ডেকে বলতে পারিনি সুহাস জলের তলা থেকে উঠে আসতে পেরেছে। আমি নিজেও ভাল ছিলাম না!'

উপরে ইনজিন রুমের দরজায় ভিড়। সুরঞ্জন নেমে আসতে চাইছে জোরজার করে। কিন্তু তাকে কেউ নামতে দিচ্ছে না। কিছু একটা আছে। কিছুই দেখা যায় না। তিন নম্বর বয়লার, কনডেনসার আর উপরের অতিকায় সিলিন্ডার সব অদৃশ্য করে রেখেছে। কেউ বুঝতেই পারছে না, চার্লি কিংবা মুখার্জি ইনজিনরুমের কোথায় আছে। এমন কি কারও সাড়া শব্দও নেই। নীচে এত অন্ধকারই বা কেন! যেন যেই নামবে, তাকেই ইনজিন রুমের অন্ধকার গিলে ফেলবে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ নীচে নেমে যে ইনজিন রুমের আলো জ্বেলে দেবে তারও যেন সাহস নেই।

সুরঞ্জনকে আটকে রাখাই দায়। সারেঙের হুকুমও সে অগ্রাহ্য করে নেমে যেতে চাইলে, ইমতাজ, হাফিজ, আরাফত, বংশী তাকে জাপটে ধরে আছে। নামলেই শেষ। ইনজিনরুমে হাফিজ।

'তোর কি মাথা খারাপ। দেখছিস না, যে নামছে, সেই নিখোঁজ। চার্লি গেল, মুখার্জিও গেলেন। সুহাস বোধহয় তার আগেই গেছে। নিয়ামতের নসিব, খোদার কুদরতে পার হয়ে গেল।'

সারঙে বললেন, 'আল্লা মুবারক।'

মুখার্জি তখন বললেন, 'উঠতে পারবি! ধরব!'

সুহাস কোনও রকমে হাত তুলে দিল।

সে খানিকটা বিশ্রাম চায়। যেন বলতে চাইল, একটু দম নিতে দাও।

চার্লি তখনও বলে চলেছে, 'দেন হি টাচড মি এগেইন অ্যান্ড আই ফেল্ট মাই স্ট্রেংথ

ইজ্ রিটার্নিং।'

চার্লি ফের বলল, 'গড লাভস হিম ভেরি মাচ। আমাকে তিনি যেন বললেন, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেইড। কাম ইয়োরসেল্ফ—বি স্ট্রং, ইয়েস স্ট্রং।'

মুখার্জির দিকে তাকিয়ে কিছুটা অনুনয়ের ভঙ্গিতে চার্লি বলল, 'হি ক্যান হার্ডলি ব্রিদ। ওকে একটু সুস্থ হতে দাও মুখার্জি।'

মুখার্জি এবার নিজেও বসে গেলেন শ্যাওলা সাফ করার জন্য অন্ধকারে ভাল বোঝাও যাচ্ছে না। তাঁর মনে হল, আরে একটা আলোও তো জ্বালা নেই। তিনি দৌড়ে যাবার সময় কি যেন মাড়িয়ে দিলেন। —সাপের মতো পায়ে কিছু জড়িয়ে গেল। একটু ঝুঁকে গোড়ালির কাছে হাত দিলেন। সেই রবারের মোটা বিদ্যুতের তারটি পড়ে আছে। টেনে আনলেন। জলের ট্যাঙ্ক কিংবা বিলজ—অর্থাৎ ইনজিন রুমের অন্ধকার জায়গাগুলি সাফ করার জন্য—তারের ঠুলি পরা আলোটার দরকার হয়। তা হলে কি সুহাসকে কেউ জলের ট্যাঙ্কগুলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে প্লেট চাপা দিয়ে সরে পড়েছে। সে কে?

তিনি দৌড়ে এসে সুইচগুলো সব অন করে দিলেন। মুহূর্তে গোটা ইনজিনরুম আলোকিত হয়ে উঠল। আর তখন উপরে হল্লা। খুবই ভুতুড়ে কাণ্ড। কে জ্বালাল আলো—তাও এতক্ষণ পর। কে সে। নীচের কিছুই দৃশ্যমান নয়। সেই অতিকায় সিলিন্ডার আর কনডেনসার সব আড়াল হয়ে আছে। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারছে, ছুটে পালাচ্ছে।

ইনজিন রুমে যে মুখার্জি এবং চার্লি আছে এটা জাহাজিদের মাথাতেই নেই। তারা বিশ্বাসও করে না। তিনজনকেই গিলে খেয়েছে। নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত জাহাজিরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাসও করে থাকে। সেই এক কথা—কিছু একটা আছে। সি-ডেভিল, লুকেনারই হোক, আর, সেই বরফঘরের মেয়েমানুষের লাশই হোক। তারাই যত কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। কে মরতে যাবে।

সুরঞ্জন অধীরকে ডেকে বলল, 'তোরা কি সবাই পাগল হয়ে গেলি! চল নীচে দেখ' দরকার। চার্লি, মুখার্জিদা কোথায় গেলেন।'

সুরঞ্জনের আর সাহস নেই, একা ইনজিন রুমে নেমে যায়। ভূতের আতঙ্ক বড়ই সংক্রামক ব্যাধি। অধীর সঙ্গে না থাকলে সেও একা নেমে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ সিঁড়ির মুখে উঁকি দিয়ে সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। আতঙ্ক হবারই কথা।

কিছু হলে মুখার্জিদা এতক্ষণে উঠে আসতেন। চার্লি উঠে আসত। অথবা মুখার্জিদা তাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। ইনজিন রুমে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। কেবল সেই ব্যালেস্ট পাম্পের কিট কিট শব্দ না হয় স্টিম ককগুলি ফাঁচ ফাঁচ করছে! সেই কখন নেমে গেল! আর কারও পাত্তা নেই!

অধীর বলল, 'আজব ব্যাপার।'

চার্লি বলল, 'আমি ধরছি ওঠো।'

মুখার্জি বললেন, 'উঠে যেতে পারবি!'

'পারব তো বললাম। দ্যাখ না।'

চার্লি আর মুখার্জিদার উপর ভর করে হাঁটছে সুহাস। জামা প্যান্টে লাল হলুদ ছোপ ছোপ দাগ। জামা প্যান্টে জলের পচা গন্ধ। দম বন্ধ করে মারার মতলবে ছিল কেউ!

সে কে। অথচ এখন কোনও প্রশ্ন করাই ঠিক নয়। চার্লিও চাইছে না, কারণ ক্লান্ত অবসন্ন আর এতই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে সুহাসকে, চার্লি মাঝে মাঝে অজানা আতঙ্কে যেন অস্থির হয়ে উঠছে।

তখনই কেন যে চার্লি কাতর গলায় বলল, 'মুখার্জি, তুমি আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে না তো!'

মুখার্জি কঠিন গলায় দাঁত চেপে বললেন, 'এখনও বলছি, সুহাসের কিছু হলে, তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারব। শুধু তোমাকে নয়, সবাইকে।'

সুহাস এত অবসন্ন, তবু কেন যে না বলে পারল না, 'ওর কি দোষ! চার্লি কি করেছে। তুমি ওকে পুড়িয়ে মারতে চাও!'

বেচারা।

তাদের দেখতে পেলে, হাজার প্রশ্ন। ভিড়। তামাসা। সুহাস তামাসার পাত্র হয়ে যাক তিনি চান না। মুখার্জি ফের আলো নিভিয়ে দিলেন। বললেন, 'সিঁড়িতে বোস। উঠতে দম পাবি না। সিঁড়িতে দু'জন একসঙ্গে পাশাপাশি ওঠা যাবে না।'

সুরঞ্জন হরেকেষ্ট অধীরও ভুতুড়ে আলো অন্ধকারে তাজ্জব হয়ে গেল। ইনজিন রুম নিজের খুশিমতো যা খুশি তাই করছে। কখনও আলো, কখনও অন্ধকার তার। ম্রিয়মান হয়ে গেল। তারা নেমে যেতে সাহস পেল না। ডেকে উঠে গেল! সত্যি ইনজিন রুমে কিছু আছে।

বংশী ফল্কায় বসে হাসছে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'কি রে হিম্মত গেল কোথায়। উঠে এলি কেন। যা। নাম! মজা বোঝো।'

মুখার্জি বললেন, 'চার্লি, তোমার অনেক কাজ। ভেঙে পড়বে না। আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মাথা ঠিক রাখতে পার না। তোমাকে নিয়েও কম আতঙ্ক না। তোমার বাবা তো যা করলেন। জুজু না দেখলে কেউ এত ঘাবড়ায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি জাহাজিদের কাছে…। ইফ এনি ট্রাবল—ট্রাবলটা কি! তুমি জান, কেন তিনি তাঁর ফেথফুল সেলরদের সাহায্য প্রত্যাশা করছেন।'

চার্লি সাড়া দিচ্ছে না।

'যাক গে, তুমি আমাকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না। হয় বিশ্বাস করতে পারছ না, নয় সাহস পাচ্ছ না। তুমি নিজেও বুঝতে পার না, আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারো। শোনো, বাপের কেবিন তো লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে। আলো থাকুক না থাকুক কিছু আসে যায় না। ইনজিন রুমটাকে ভুতুড়ে করে রাখার দরকার আছে। আলো ইচ্ছে করেই নিভিয়ে দিলাম। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। এই সুহাস!'

'বলো!'

'উঠতে পারবি? সিঁড়ি ভাঙতে পারবি? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না তো!'

'আর একটু বসি।'

'চার্লি, তুমি উপরে উঠে যাও। কারপেন্টারকে ডেকে বলো কেবিনে নতুন লক যেন

লাগিয়ে দেয়। এক্ষুনি। আমি সুহাসকে নিয়ে উপরে যাচ্ছি। ভয় নেই, ওকে না নিয়ে উপরে যাব না। কথা দিচ্ছি।'

চার্লি কিছুটা ক্ষোভের গলায় বলল, 'আমাকে কি করতে বলছো?'

'উপরে উঠে যেতে বলছি। কেবিনের লক পাল্টে দিতে বলছি। মন দিয়ে শোনো! কারপেন্টারকে বলবে, কেউ যেন না জানে, অফিসার ইনজিনিয়াররাও ভাল নেই। তোমার রণচণ্ডী মূর্তিতে তারা ঘাবড়ে গেছে। কেউ বের হচ্ছে না। সবাই দরজা বন্ধ করে বসে আছে। এটা একটা সুযোগ। কেবিনে যেখানে যা ছিল, তুলে রাখবে। কেবিনে ঢুকে যেন তিনি কিছু বুঝতে না পারেন!'

চার্লি দ্রুত সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছিল।

এত বাধ্য!

মুখার্জি অবাকই হয়ে গেলেন।

তবে মুখার্জিকে বিশ্বাস করছে. আস্থা ফিরে এসেছে। ভাল! এটাই চান।

'চার্লি!'

সিঁড়ির ধাপ থেকে ঝুঁকে সাড়া দিল চার্লি—'ডাকছ।'

'এদিকে নয়। ওদিকে। স্টোকহোলডে চলে যাও। স্টোকহোলডের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবে সোজা বোটডেকে। মনে হয় কার্পেন্টারও তার কেবিনে গা ঢাকা দিয়ে আছে। উপরে না গেলে অবশ্য কিছু বুঝতে পারবে না।'

চার্লি দৌড়ে নেমে এল। সে স্টোকহোলডে ঢুকে যাবার জন্য ছুটলে তিনি বললেন, 'বুঝতে পারছ, এখন—বাপের কেবিনটির কি ছিরি করে রেখেছ! এই নাও। বলে তিনি পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দিয়ে বললেন, যেখানে ছিল, রেখে দেবে। এটাও নাও। ধরো।'

চাবিটি হাতে নিয়ে চার্লি কি করবে বুঝতে পারল না।

মুখার্জি বললেন, 'তোমার বাবার। যিশুর মূর্তির মধ্যে ছিল। মূর্তিটি তুলে রাখবে। মাথাটি আলগা বসিয়ে দেবে। চাবিটি ভেতরে রেখে দেবে।'

আবার ছুটছিল চার্লি।

আরে এত ছটফট করছ কেন? সব টেনে হিঁচড়ে ফেলেছ। র‍্যাক থেকে বই কিছুই বাদ দাওনি দেখছি। আচ্ছা আচ্ছন্ন হলে কি করে ফেল কিছুই কি মনে থাকে না। সবই দেখছি ভুলে যাও। বাবার লকার মরতে খুলতে গেলে কেন। চাবিটি রাখার আগে লকারটি বন্ধ করে রাখবে। কি মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'এই তো চার্লি। কি সুন্দর তুমি। চার্লি কত ভাল, কেউ বুঝলই না। চার্লি সব পারে। কি বলো। আর দেরি নয়। বি কুইক।'

চার্লি অন্ধকারে বয়লারের পাশ দিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তখনই তিনি সুহাসের হাঁটুর কাছে ঝুঁকে বসলেন। বললেন, 'কি হয়েছিল বল! বলতে কষ্ট হলে, থাক।'

'না। মানে!'

সুহাস যেন অতিশয় রুগ্‌ণ। ক্ষীণকণ্ঠ। তবু যা বলল, যা বুঝতে পারলেন, তাতে

তাঁরও গা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। অশরীরী। সুহাস তার মুখ দেখেনি। মাথায় চ্যাপ্টা টুপি। টুপির অন্ধকারে মুখ ঢাকা।

দিন দুপুরে এমন কাণ্ড ঘটলে কে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে। ট্যাঙ্কগুলি খুব একটা ব্যবহারও হয় না। সমুদ্রে দীর্ঘ পাড়ি দিতে হলে এদিককার ট্যাঙ্কগুলিতে জল নেওয়া হয়—খাবার জলের ট্যাঙ্ক আলাদা। বয়লারে মিষ্টি জলের টানাটানি পড়তে পারে—এভাপরেটর চালিয়েও জল জোগানোর ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার আশঙ্কা থাকলে ট্যাঙ্কগুলিতে জল নেওয়া হয়। এক দুবার সাফ করা যে না হয় তাও না, তবু সুহাসকে এই জলের ট্যাঙ্কগুলিতে এক অশরীরী ঢুকিয়ে দিয়ে গেল!

প্লেট ফেলে দেবার আগে সুহাস স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে, ইয়েস ইউ আর এ ডেনজারাস ট্র্যাপ [illegible] ক্যাপ্টান নিজে তো তখন মোটরবোটে। স্বচক্ষে দেখা! ট্যাঙ্কগুলির অজস্র গলিঘুঁজি। আলো নিভিয়ে দিলে মৃত্যুফাঁদ—অশরীরী তাও জানে। মগজ ঠাণ্ডা না থাকলে বের হয়ে আসা একজন দক্ষ জাহাজির পক্ষেও কঠিন।

'তোর হুঁশ ছিল না!'

'না। কেন যে মনে হল, অন্ধকারে কিছুই নাগাল পাচ্ছি না, কেবল হাতড়াচ্ছি। ম্যানহোলে ঢুকে একটার পর একটা ট্যাঙ্ক পার হচ্ছি—আলো নিভিয়ে দিলে হঠাৎই মনে হল, আসলে শুধু জামা প্যান্ট টুপি ছাড়া তার আমি কিছুই দেখিনি। তারপর আর হুঁশ ছিল না।'

'তারপর!'

'তারপর কিছু জানি না। আলো জ্বলছে না কেন।'

'দরকার আছে।'

মুখার্জি যত দ্রুত সম্ভব জেনে নিতে চান। জানাজানি হয়ে গেলে—হুড়মুড় করে জাহাজিরা সবাই নেমে আসবে। গোলমাল বাধবে। খুবই গুপ্ত খবর—আর কেউ জানুক তিনি চান না। সুরঞ্জনকে পরে বলা যাবে। অধীরকেও। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না, সুহাসের হুঁশ ফিরল কখন। কখন সে শ্যাওলায় মাখামাখি হয়ে প্লেট ঠেলে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করল। তারা তো ডাকাডাকি কম করেনি। সুহাস কি শুনতে পায়নি! সুহাস কি তখন বেহুঁশ হয়ে জলের তলানিতে পড়েছিল।

'টের পেলি কখন। হুঁশ ফিরল কখন?'

'আমি যে কি শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'কি শুনতে পাচ্ছিলি? কেউ কি তোকে ডাকাডাকি করছিল। আমি চার্লি দু'জনেই তো খোঁজাখুঁজি করে গেছি। একবারও মনে হয়নি, খোলের মধ্যে জলের ট্যাঙ্কে তুই পড়ে থাকতে পারিস! কি শুনতে পাচ্ছিলি?'

'মনে করতে পারছি না। কে যেন ডাকছিল, সুদূর থেকে কে যেন ডাকছিল। যেন অন্য জন্মের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'কি শুনতে পাচ্ছিলি।'

সুহাস সিঁড়িতে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ভিজে জামা প্যান্ট আর অজস্র শ্যাওলা লাল নীল, শরীরে শুকিয়ে উঠছে। সে ক্রমে এক বিচিত্র গোব মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। ইনজিন রুমের আবছা অন্ধকারেও তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। কিন্তু তাতে

মুখার্জি বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়ছেন না। অনা জন্মের খবরটা কি জানা দরকার। অন্যজন্ম বিষয়টাও তো খুবই গোলমেলে।

'কে ডাকছিল?' মুখার্জি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

'মনে করতে পারছি না। কিছুটা খালি মাঠে অন্ধকার রাতে কোনও নিখোঁজ বালকের বাবা যদি নাম ধরে ডেকে যায়—'

'তোর বাবার কণ্ঠস্বর?'

'না না। আমার বাবা হবে কেন? আমি কেন মনে করতে পারছি না কে ডেকে গেছে।'

ছাব্বিশ

সুহাস দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গোঁজ করে বসে থাকল। সে কিছুই যেন মনে করতে পারছে না। কে ডেকে গেল! কে তিনি! গভীর রাতে হাতে লণ্ঠন নিয়ে কেউ যেন মাঠ পার হয়ে চলে গেল।

তার বাবা! মানে কতদিন দেশ থেকে তারা চিঠিও পায়নি। বাবা কি তাকে সাহস জুগিয়ে গেছেন।—তুমি খুঁজে দ্যাখো। ঘুলঘুলিতে মাথা গলিয়ে দাও। সামনের দিকে এগিয়ে যাও! বার বার চেষ্টা কর। তুমি শেষ প্রান্তে আছ। একবার ভুল হতে পারে, দু'বার, তিনবার, চারবার হতে পারে। চেষ্টা কর সামনেই তোমার বাতিঘর। দূরে দ্যাখো, ওই যে দূরে। মাথার উপরে কত বড় আকাশ। সমুদ্রের জল তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি হেরে যাচ্ছ কেন। আবার। জলে ডুবে যাচ্ছ কেন? বাতিঘরের আলো দেখতে পাচ্ছ না! সেখানে গেলে সব মিলবে। আহার, উত্তাপ, আশ্রয়।

তাকে বয়লারের দিকে যেতে হবে সে জানে।

বারবার কে যেন ডাকছে।

কেউ ডাকছে—অথচ মনে করতে পারছে না। না ডাকলে তার হুঁশ ফিরত না। সে কে?

মুখার্জি খুবই বিব্রত বোধ করছেন।

সুহাস হাঁটুর ভেতর সেই যে মাথা গুঁজে বসে আছে—কিছুতেই মুখ তুলছে না। সে মনে করতে পারছে না।

কেউ না ডাকলে সে সাহসও পেত না।

'কি রে, কে ডাকল মনে করতে পারছিস না?'

হঠাৎ সুহাস কেমন ভেঙে পড়ার মতো বলল, 'আমার বাবা ডাকবে কেন! অতদূর থেকে তার কণ্ঠস্বর কি করে ভেসে আসবে। কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি তো ভালই ছিলেন। নিউপ্লাইমাউথ বন্দরেও তাঁর চিঠি পেয়েছি। শুধু জানতে চেয়েছেন, আমি সাবধানে চলাফেরা করি কি না। জাহাজে ফিরতে যেন রাত না করি। কবে জাহাজ ফিরছে, দেশে কবে ফিরব—এ-ছাড়া তার তো আর কোনও খবর থাকে না।'

'তবে সে কে? তোর বাবা ভালই আছেন। দুশ্চিন্তা করিস না।'

আর তখনই সুহাসের মাথায় বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। সে মনে করতে পারছে।

অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বাস দেখা দিল। জান, আমাকে কেউ ডাকছিল। সুহাস, ইফ এভরিওয়ান ডেজার্টস ইয়ো আই ওন্ট সুহাস!'

'জান, আমাকে কেউ বলছিল, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্লড।'

মুখার্জি বললেন, সে তোমার পাশে আছে এটুকুই এখন আমাদের সান্ত্বনা। তারপরই মনে হল—চার্লি কতটা পারবে!

পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সে সুহাসের জন্য কতটা যেতে পারবে। নিরুপায় দুই তরুণ তরুণীর হয়ে তিনিও কতটা লড়তে পারবেন জানেন না। তবু তাঁকে শক্ত হতে হবে। সুহাস এবং চার্লিকেও। কেন এত দুর্বল হয়ে পড়ছেন! চার্লি না ডাকলে সুহাসের বোধ হয় আর হুঁশও ফিরে আসত না। চার্লিই তাকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আই অ্যাম উইদ ইয়ো, ইভিন টু দা এন্ড অফ দি ওয়ার্লড। মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় আর কি খবর থাকতে পারে।

বাড়ির কথা তাঁর মনে পড়ছে। স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। ছেলে মেয়ে, ঘর বাড়ি এবং পৃথিবীর এই যে দূরতম প্রান্তে তিনি ভেসে বেড়াচ্ছেন সেও সেই এক টানে। আছি, আমরা আছি—যত দূরেই ভেসে বেড়াও আমরা আছি। কেন যে চার্লির এই সামান্য ইচ্ছের কথা, আজ তাঁকে এত দুর্বল করে দিচ্ছে। মেয়েটার কথা ভেবে চোখে জল এসে গেল।

মেয়ের মুখ মনে পড়ে যাওয়ায়, না চার্লির অসহায় জীবনের কথা ভেবে তাঁর চোখে জল তিনি বুঝতে পারছেন না।

'এ কি, তুমি কাঁদছ দাদা!'

'কোথায়।'

'ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছ কেন!'

'ওঠ। পারবি!'

'পারব।'

শেষে অশরীরীর পাল্লায় তুইও পড়লি! বংশী হলেও না হয় বুঝতাম। মগড়া হলেও না হয় কথা ছিল! লেখাপড়া শিখে ঘণ্টা করলি! মুখার্জি যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটা ধূর্ত। চার্লি মার্কনিসাবের দরজায়ই বা ছুটে গেল কেন! মার্কনিসাব জাহাজে আছে বোঝাই যেত না। হয় ট্র্যানসমিশান রুম না হয় নিজের কেবিন—কিনারায় সে নেমে গেলেও ধরা মুশকিল, কে নেমে গেল! একবার ট্র্যানসমিশান রুমের দরজায় উঁকি দিতে গিয়ে ধমকও খেয়েছেন। নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে ট্রেসপাসারসের দায়ে পড়ে গিয়েছিলেন!

'ধরব?'

'না না ধরতে হবে না। উঠছি তো!' সুহাস বিরক্ত।

'একে ওঠা বলে! আরে আমরা তো আছি। এত ঘাবড়ে গেলি কেন? লোকটার হাত পা মুখ কিছুই চোখে পড়েনি!'

'না। মনে করতে পারছি না। দড়ি ছাড়ার মতো অদৃশ্য সুতোয় জামা প্যান্ট টুপি

ঝুলে ঝুলে ইনজিন রুমে নেমে এল।'

'তোর সঙ্গে কথাও বলল!'

'বলেছে তো!'

'বেশ করেছে। বারবার বলেছি, তোকে সারেঙ ছাড়া কোথাও কেউ কাজ দিতে পারে না। তিনি তোর মুরুব্বি। তাঁর কথা তোর একবার মনে হল না! এদের কথা শোনার জন্য তো জাহাজে উঠে আসিসনি। এরা কে? আমরা এদের চিনি না। ডাকল আর নেমে গেলি!'

'জান আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম! আমার কোনও বোধ-বুদ্ধি কাজ করছিল না।'

'হিপনোটাইজড! আবার বসে পড়লি কেন! কি হয়েছে! আরে তুই তো এখনও স্বাভাবিক নোস দেখছি! বংশীর কথাই আমাকে ঠিক ধরে নিতে হবে! জাহাজে একটা কিছু আছে! আমি বিশ্বাস করি না। বারবার বলছি, গুজবে কান দিবি না। জাহাজটা পুরনো, ঠিক। ভাঙা লঝ্ঝরে ঠিক। সি-ডেভিল লুকেনার বলেও কেউ থাকতে পারেন। তাই বলে তুই অশরীরীর পাল্লায় শেষে পড়ে যাবি। গুজবের শিকার হবি। মানুষ মরে গেলে কিছু থাকে। জাহাজেও তুই নিশির ডাক শুনতে পেলি।'

'আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমার যে কি হয়।'

'মারব এক লাথি। মরে যা। তোর মরে যাওয়াই ভাল। একটা মেয়ে যা পারে, তুই তাও পারিস না। সে তো লাফিয়ে নেমে এল। গ্লিটারিং সোর্ড বলে চিৎকার করতে করতে নেমে এল। গ্লিটারিং সোর্ডের এই পরিণতি। অশরীরীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তুলে আনল তোকে। তোর লজ্জা হয় না। শরীর কেমন করছে। গুঁফো লোকটার ঘুষি খেয়েও লজ্জা হয় না। তোর মরে যাওয়াই উচিত।'

আসলে তিনি আস্থা ফিরিয়ে আনতে চান সুহাসের মনে।

'দুষ্টু আত্মা বলে কিছু নেই। থাকে না। মানুষ মরে গেলে শেষ। তোকে চার্লিই বারবার ডেকে বলেছে, সুহাস ইফ এভরিওয়ান ডেজর্টস ইয়ো—আই ও্ন্ট। চার্লিই বলেছে, আই অ্যাম অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড! আর তুই ভাবছিস, অশরীরী—অশরীরী কখনও বলতে পারে—ইয়ো আর আ ডেনজারাস ট্র্যাপ টু মি! বল, সে কোন অশরীরী, যে তোকে খুন করতে চায়? তার তুই কি ক্ষতি করেছিস, বল!'

সুহাস বলল, 'সেই তো! আমাকে খুন করে তার কি লাভ!'

'লাভ অলাভ পরে হবে। হাঁট। ওঠ। না উঠতে পারলে আমিই তোকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব। ভেবেছিস কি! সবাই মিলে জ্বালাতে শুরু করলি। বংশী, তুই—নিয়ামত, সেও তো ভূত দেখে ছুটে গেছে। তুমি প্লেট ঠেলে উঠে আসছিলে—অন্ধকারে ভূত ভেবে সে ছুটে গেল। ডেকে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল? মুখে গ্যাঁজলা। ভূত এবার কে কি ভাবে দেখে ফেলে বুঝতে পারছিস! চার্লি ছুটে না নেমে এলে তোকে তুলেও আনা যেত না। তোর যে ফের কিছু হত না, অশরীরী তোকে আবার প্লেটের ভিতর ঠেসে দিয়ে চাপা দিত না, প্লেট চাপা দিয়ে নাচানাচি করত না কে বলতে পারে! বল, মেয়েটার কথা ভাববি না!'

তারপর ফের বিড়বিড় করে বকছেন, 'চার্লিরও হয়েছে মরণ। গ্লিটারিং সোর্ড না ছাই! ভোঁতা মাল। এত কিল খেয়ে কেউ হজম করে! রুখে দাঁড়ায় না! রুখে দাঁড়াবার সাহসও হারিয়ে ফেলেছিস! ভোজ, বিরিয়ানি, পায়েস, সব মাটি। সবাই না খেয়ে আছে তোর জন্য।'

'আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে, খিদে পেয়েছে যখন বুঝতে পারছিস, ধীরে ধীরে উঠে যা। চুপচাপ হেঁটে যাবি। কেউ জিজ্ঞেস করলে কোনও কথা বলবি না। অশরীরী টেনে নিয়ে গেছে বললে, খুন করব বলে দিলাম। কিচ্ছু হয়নি। ট্যাঙ্কে পিছলে পড়ে গেছ! উঠতে পারছিলে না। আমি তুলে এনেছি। কি, মনে থাকবে তো।'

'ইনজিন রুমে মরতে কেন এলাম, কেউ যদি জানতে চায়। আজ তো ছুটি।'

তাও তো ঠিক। মুখার্জি ভেবে পাচ্ছিলেন না, সুহাসের এই দুর্গতির কথা কি ভাবে চাউর করা যায়। ওর জামা প্যান্ট, মুখ, চুল শ্যাওলায় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভূতের মতোই দেখতে। তাঁর নিজেরও মাথায় আসছিল না। তারপর এত খোঁজাখুঁজি, কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, শেষে মুখার্জি সাব নিজে নেমে আস্ত ভূত টেনে তুলেছেন ডেকে। ছোটাছুটিও শুরু হয়ে যেতে পারে। মুখার্জি আর মানুষ নেই, তিনিও ভূত হয়ে গেছেন ভাবতে পারে সবাই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না যে। বংশীর যে এক কথা, ভূত কে নয় দ্যাখো। কাকে বিশ্বাস করবে। জাহাজ নিজেই যে ভূত নয়, ভুতুড়ে জাহাজ নয় কে বলবে।

ইনজিন রুমে আলো দপ করে জ্বলছে, দপ করে নিভছে।

ইনজিন রুমে কিছু একটা আছে। সে খুশিমতো আলো জ্বালায় নেভায়। কেউ নেই দরজার মুখে। মুখার্জি হাঁটছেন।

মুখার্জির মাথা গরম। ভূত বিষয়টাই এত বেআক্কেল—যে বলতে হলে সব খুলে বলতে হয়। উঠে গেলে সবাই দৌড়ে আসবে, না পালাবে, তাও বুঝতে পারছেন না। তিনি নিজেও ভাল ছিলেন না। জাহাজে কি যে সব হচ্ছে কেবল ভাবছিলেন।

কি ভেবে বললেন, 'দাঁড়া আসছি।'

তারপর ডেকে উঠে দেখলেন, পিছিলে সবাই জটলা করছে। তাঁকে দেখে অনেকেই ছুটে আসছে। সবাই না। শেষে মনে হল অনেকেও না। কারণ, কেউ কেউ কিছুটা এগিয়েই আবার ফিরে গেছে। কেবল সুরঞ্জন অধীর ফিরে যায়নি। সারেঙসাবও এগিয়ে আসছেন। কিছুটা সংশয়ের গলায় তিনি বললেন, 'ইনজিনে কে যে আলো জ্বালাচ্ছিল, নেভাচ্ছিল।'

মুখার্জি বললেন, 'কেন আমি জ্বালাচ্ছিলাম।'

'তাই বলি, কে জ্বালায়। এদিকে তো সবার এক কথা। জাহাজ ছেড়ে দেবে। কিনারায় নেমে যাবে। কি যে করি। জাহাজে বংশী ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে। ভুতুড়ে জাহাজে কেউ থাকতে রাজি না।'

'কে বলে। কোন শুয়োরের বাচ্চা বলে নেমে যাবে।'

বংশী ছুটে বের হয়ে বলল, 'আমি বলছি।' নিয়ামত ছুটে এসে বলল, 'আমি বলছি।

ভুতুড়ে জাহাজে আমরা থাকব না।'

'ধুস, যাও মাথা ঠাণ্ডা করে গোসল টোসল করে খানা খাওগে। সারেঙসাব পাত পেতে ফেলতে বলুন। সুহাস আসছে। জলের ট্যাঙ্কের ফুটোতে ওর লকারের চাবি পড়ে গিয়েছিল। খুঁজে পাচ্ছিল না। আহাম্মকের কাণ্ড আর কাকে বলে।'

'পেয়েছে খুঁজে।'

'পায়। বলুন। কিছুতেই উঠে আসছিল না। বললাম, খানা রেডি সবাই বসে আছে, তুই কি রে। তোকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। পরে না হয় খুঁজে দেখা যাবে।' তারপর ইনজিন রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'এই সুহাস, বললাম না, পরে খুঁজে দেখা যাবে। আয়। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন।'

সুহাস উপরে উঠে এলে বললেন, 'অবস্থাটা বুঝুন। চাবির খোঁজে তিনি পাতালে ঢুকে গিয়েছিলেন। চাবিটা এখন পেলে হয়।' সুহাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মুখার্জিদার কথাবার্তা কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

মুখার্জির দম ফেলার সময় নেই। তিনি ছুটছেন। সারেঙসাবও ছুটে গেছেন।

'আরে কোথায় যাচ্ছেন। গোসল কখন করবেন।'

তিনি দূর থেকেই হাত তুলে বললেন, 'আসছি। সবাইকে বসিয়ে দিন। আমার জন্য বসে থাকবেন না।'

তাঁর এখন দরকার চার্লির খোঁজ খবর নেওয়া। চার্লি এক দণ্ডে তাঁর এতটা অনুগত হয়ে যাওয়ায় তিনি খুশি। চার্লিই পারে। বাপের কেবিনে ঢুকে চার্লি কতটা কি করতে পারছে, নিজের চোখে না দেখতে পেলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। লক লাগানো হয়েছে কি না। অফিসার ইনজিনিয়ারা কে কি করছে। ধরা পড়ে না যান। কত সব চিন্তা মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

বোটডেকে উঠে দেখলেন, চার্লি তাঁর কথামতোই কাজ সেরে ফেলেছে। কার্পেন্টার নতুন লক লাগিয়ে দিয়েছে। কাপ্তানের কেবিন কেউ খুলে সব তছনছ করে গেছে দেখলে মনেই হবে না। চার্লি বোটডেকে নেই। তাই কেবিনে থাকতে পারে। নক করতেই চার্লি দরজা খুলে মুখ বাড়াল।

'সব ঠিক আছে?'

'আছে।'

'অফিসার ইনজিনিয়াররা বের হয়েছিল?'

'না। বের হয়নি। দরজা বন্ধ করে বসে আছে।'

'ভাল। কোনও ভাবনা নেই। সুহাস ভাল আছে। শোনো, তাকে তুমি জলের ট্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছ, কাউকে বলতে যাবে না।'

'তোমাদের ওদিকে আমি একবার যেতে পারি?'

চার্লির কি কাতর অনুনয়। সে যে তার কেবিনে বসে সুহাসের জন্য ছটফট করছে, বুঝতে কষ্ট হল না। চার্লি স্বাভাবিক না থাকলে এভাবে কথা বলতে পারত না। এমন কি চার্লি হয়তো ভেবেছে, এত সব ঘটে যাবার পর পিছিলে ছুটে যাওয়া তিনি পছন্দ

নাও করতে পারেন। সাত পাঁচ ভেবেই দরজা বন্ধ করে বসে আছে ভিতরে।

তার বেশি কথা বলার সময় নেই। তিনি শুধু বললেন, 'না এখন না। সময় হলে বলব। বরং দেখে নাও আমাদের কর্তারা কে কি করছেন কেবিনে।' বলেই তিনি সোজা বাটলার, মেসরুম মেটদের কেবিনের দিকে ছুটে গেলেন। সব দরজা বন্ধ। নক করতেই বাটলার মুখ বাড়াল দরজা খুলে। সন্তর্পণে। ভূত দেখার মতো কাউকে দেখে ফেলবে— এখন ফ্যাকাসে মুখ। মুখার্জিবাবুকে দেখে খানিকটা স্বস্তি। বলল, 'চার্লি নাকি খেপে গেছে। পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করছে!'

'না না! কে বলেছে।'

'ইনজিনরুমে ভূত? ইনজিনরুমে লীলা খেলা তেনার?'

'ধুস, যত বাজে কথা।'

'নিয়ামত যে ভূত দেখে উঠে এল!'

'আরে বাটলার সাব বুঝছ না, সবার মেজাজ বিগড়ে আছে। কাহাতক কতদিন সমুদ্রে পড়ে থাকা যায়। সব খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে। বাহানা। স্রেফ বাহানা।'

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বাটলারের। মুখার্জি বললেন, 'যাও। পিছিলে চলে যাও। সবাইকে বল, চার্লির মেজাজ পড়েছে। সে ঘরে বসে ছবি আঁকছে। ভয়ের কিছু নেই।'

আসলে জাহাজে ফের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক, যেন কিছুই হয়নি, রেডিয়ো অফিসারের দরজায় নক করলে কেমন হয়! কেন যে মনে হচ্ছে, মুখোস, অনুসরণকারী সব ভাঁওতা। নতুন করে ছক সাজাতে না পারলে আততায়ীর হদিস পাওয়া যাবে না। হাতে কি তার ব্যান্ডেজ বাঁধা। কিন্তু সাহস হল না। তাঁর আস্পর্ধা সহ্য নাও করতে পারেন। তখনই বাটলার একটা খাম বাড়িয়ে দিল। বলল, 'নিন ধরুন। সবার নাম ঠিকানা আছে।'

তিনি সব ভুলে গেছেন-মতো বললেন, 'নাম ঠিকানা? কার?'

'বারে একটা তালিকা চাইলেন না।'

'অ। একদম ভুলে গেছি। দাও।'

আর তিনি দেরি করলেন না। মেসরুমমেট থেকে কাপ্তানবয়কে খবর দিয়ে এলেন, সবাই চলে যাও। খানা রেডি। দেরি কোর না। ইস তিনটে বেজে গেল। কখন খাবে।

তিনি ফিরে এসে দেখলেন, সুহাস তার বাঙ্কে বসে আছে। সে খেতে যায়নি। সুরঞ্জন গেছে উপরে। তার খাবার আনতে। সে এখনও বেশ কাহিল। কিন্তু মুখার্জি বিরক্ত। আলাদা খাওয়ার কি হল বুঝলেন না। ঘরে ঢুকে বসতেই সুহাস বলল, 'যাও বসে থাকলে কেন? চান টান করবে না?'

'যাচ্ছি। তুই বসে আছিস কেন? তুই উপরে যা। ওখানে খাবি। নীচে খাবার নিয়ে আসার কি হল?'

'আমি তো বললাম। সুরঞ্জন কিছুতেই শুনল না।'

'ইস ওর মাথা এত মোটা। আরে তুই না আমার সহকারী? বুঝতে পারছিস না, সুহাস নীচে খেলে কথা হবে না। যা যা চলে যা। সবার সঙ্গে খেয়ে নে। আমি যাচ্ছি।' বলেই তিনি বংশীর লকার টেনে তেল নিলেন হাতে, মাথায় মাখলেন। গামছা কাঁধে

ফেলে উপরে চলে গেলেন। এক দণ্ড সময় নষ্ট করা মানে, আততায়ী আরও এক ক্রোশ রাস্তার ফারাক সৃষ্টি করে ফেলবে। সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। কাপ্তান ফিরে এলে কি হবে তিনি জানেন না। কানে তাঁর কথা উঠবেই। সারা জাহাজ তোলপাড়, চাপাচুপি কতটা আর কাঁহাতক দেওয়া যাবে। সংশয় দেখা দিলে কাপ্তান খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিতে পারেন। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাতে পারেন। এত সব আতঙ্ক থেকেই তিনি ঠিক সাঁঝ লাগার মুহূর্তে, অধীর সুরঞ্জনকে তাঁর ফোকসালে ডেকে পাঠালেন। সব বলে, শেষে বললেন, এই হল চার্লির গ্রিটারিং সোর্ডের পরিস্থিতি। আমাকে বের হতে হবে। ফিলের কাছে যাচ্ছি। আমার ধারণা ফিল এবং চার্লির আঙ্কেল রাচেল একই ব্যক্তি। মিলিটারি ট্র্যানসপোর্ট সিপ, প্রেসিডেন্ট কলিজের নিখোঁজ পাঁচজনের সে একজন। চার্লির ঠাকুরদার প্রমোদ-তরণী ডরোথি ক্যারিকো জাহাজটিই মার্কিন সামরিক দপ্তরে ঢুকে প্রেসিডেন্ট কলিজ হয়ে গেছে মনে হয়। কাপ্তান তারই খোঁজে এসেছেন।

সুরঞ্জন অধীর সব শুনে স্তম্ভিত। অশরীরী ডেনজারাস ট্র্যাপ, জলের ট্যাঙ্ক, ফিল, কলিজ জাহাজ, মুখোস, চার্লির ঠাকুরদার মুখ, সব মিলে কেমন এক রহস্যের ধোঁয়াশা ক্রমে কাবু করে ফেলছে তাদের। তারা একেবারে নির্বাক। অশরীরী কে সে? সুহাসকে ডেনজারস ট্র্যাপ বলছে কেন? কাপ্তান জাহজে ছিলেন না। কে সে তবে?

কত প্রশ্ন।

মার্কনি সাবের দরজায় হামলা।

চার্লির চিৎকার, আই অ্যাম ইয়োর ফেট।

চার্লির গড়াগড়ি—কান্না—বেটার ইয়ো কিল মি, আই উড র‍্যাদার বি ডেড দ্যান অ্যালাইভ। সুরঞ্জন কিছুই বুঝতে পারছে না।

ফিলকে সন্দেহ করছেন। কেন? কিছুই ভেঙে বলছেন না। ফিলকে সুরঞ্জন দেখেনি। শুধু মুখার্জিদার মুখ থেকে সব শোনা। ফিলকে মনে হয়েছে প্রকৃত একজন ধর্মযাজক। মিশনারি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন দ্বীপে। হাসপাতাল, স্কুল, এবং দ্বীপের সব প্রাচুর্যের হেতু ফিল। একজন গরিব মানুষের মতো তাঁর জীবনযাপন। ফিলকে দ্বীপবাসীরা ঈশ্বরের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে। সেই ফিল, চার্লির আঙ্কেল—মুখার্জিদার এমন অনুমানের কি ভিত্তি তাও বুঝতে পারছে না।

সে মাথা নীচু করে বসে আছে। অধীরও বোকা হাবার মতো দেখছে মুখার্জিদাকে।

ফিল মুখার্জিদার কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আজ তার কাছেই যাবেন। উপকারীর ঋণ স্বীকারের আশায় কাপ্তানের ঘর থেকে পাচার করা কাগজপত্র সঙ্গে নিচ্ছেন। ফিলের কাছে জিম্মা রাখবেন। এত আস্থা মুখার্জিদার! সে যে নতুন উপদ্রব সৃষ্টি করবে না কে জানে!

মুখার্জি বললেন, 'কিরে, রা নেই কেন! তোদের সঙ্গে তবে পরামর্শ করছি কেন? তোদের ডেকে পাঠালাম কেন! তোরা কোনও কথা বলছিস না।'

সুরঞ্জন মুখ তুলে তাকাল। মুখার্জিদাকে দেখল। আবার মাথা নীচু করে দিল। বলল, 'কি বলব দাদা! মাথায় কিছুই আসছে না। ভাবছি তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে কি না। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হত। এতটা রাস্তা রাতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া তো সোজা

কথা না। রাস্তা হারিয়ে ফেললে কি করবে। কিংবা যদি অন্ধকার থেকে ভূতটুত উঠে আসে। এ-দ্বীপে যুদ্ধের ভূত তো এখনও জাঁকিয়ে বসে আছে দেখছি।'

'ভূত কারও ক্ষতি করে না। ভূতের ভয়ে মরছিস। তোরাও তবে সবাই বংশী নিয়ামত হয়ে গেলি। অশরীরী কখন দেখা যায়। ঘোর সৃষ্টি হলে। নিজের উপর আস্থা হারালে। আর মনে রাখবি, এই যে রহস্য, এটা মনে হয় নিতান্তই পারিবারিক। এঁরা কেউ অপরাধ জগতের লোক নয়। ফেরে চক্রে সব ভূত হয়ে যাচ্ছে। ফেরে চক্রে খুন হচ্ছে। বর্ণবিদ্বেষও যে কাজ করছে না কে বলবে। এক জন নেটিভ ইন্ডিয়ান শেষে ধনকুবেরের নাতনিকে কব্জা করে ফেলল। সহ্য করবে কেন? কি যে হেতু, ফিলের কাছে না গেলে বোঝা যাবে না।'

মুখার্জি কি ভেবে বললেন, 'আমি ঠিক বলছি। সুহাসের মধ্যে চার্লি কোনও ঐশ্বর্যের খোঁজ পেয়েছে। সুহাসের মধ্যে চার্লির এই মহিমা আবিষ্কারই রহস্যের হেতু নয় কে বলবে। চার্লি না হলে বলতে পারে, আই অ্যাম উইদ ইউ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্লড। বল, বলতে পারে।'

'সবই তো বুঝলাম দাদা। কিন্তু চার্লিকে তার ছদ্মবেশ থেকে বের করে আনা যে খুবই কঠিন।'

'কঠিন বলেই তো চেষ্টা করছি। সোজা হলে কার দায় পড়েছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে পড়ার। রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি। দ্বীপটা যে খুব ছোট নয় দু-আড়াই হাজার বর্গমাইল তো হবেই। পাঁচ সাত হাজার লোকের বসবাস। দুর্গম অঞ্চলে হারিয়ে গেলে বেরিয়ে আসাও কঠিন। আর সত্যি যদি নিশির পাল্লায় পড়ে যাই, তবে তো আরও মজা। দেখা যাবে একই চক্করে সারা রাত ঘোরা ফেরা। জাহাজের এই পরিস্থিতি। অজানা দ্বীপে জঙ্গলে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। এমনিতেই গা ছম ছম করতে পারে। আরে আমিও তো মানুষ!'

'বলছিলাম,' বলে ঢোক গিলল, অধীর।

'কি বলছিলি?'

'কাল সকালে গেলে পারতে না।'

'সকালে গেলে খুশি হতে পারতাম। কিন্তু?'

'কিন্তু কি?'

'কাপ্তান যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে উঠে আসবেন। রিফ এক্সপ্লোরার থেকে ডিনার সেরে ফিরতে কতটা আর রাত হতে পারে? সুহাসকে ডাক তো। কি করছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'শুয়ে আছে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। কেমন মিইয়ে গেছে।'

'মিইয়ে গেলে তো চলবে না। বিপদে ভেঙে পড়লে চলে! প্রতিপক্ষ তবে জোর পাবে না? ডাক। ওর সঙ্গে কথা আছে। ডরোথি কারেকার না ক্যারিকো, ছাই মনেও রাখতে পারি না, পাঠালাম তো—কি খবর আনল কে জানে!'

সুহাস ভিতরে ঢুকে বলল, 'আমায় ডাকছিলে দাদা?'

'দরজাটা বন্ধ করে দে। মুখ এত চুন করে রেখেছিস কেন! কাছে আয় দেখি। যা

দেখালি!' বলে তিনি গায়ে হাত দিতেই সুহাস ককিয়ে উঠল। বলল, 'লাগছে।'

'লাগছে। তা লাগুক। ছাল চামড়া উঠে গেছে? যাক। পুরো ছাল চামড়া খসিয়ে নেয়নি তোমার চোদ্দ গোষ্ঠির ভাগ্য। বোস। ডরোথি ক্যারিকোর খবর কিছু পেলি!'

'চার্লি তো দিল। কোথায় ফেলে এলাম!'

'কি দিল!'

'আরে একটা বই। বলল, ডরোথি ক্যারিকোর ছবিটবি আছে। লাউঞ্জের ছবি আছে। লাউঞ্জ, সুইমিং পুল, টেনিস খেলার মাঠ সবই নাকি জাহাজটায় ছিল। বইটা নাকি তার ঠাকুরদার জীবন এবং বাণী।'

'কোথায় সেটা! কোথায় ফেলে এলি!'

'মনে করতে পারছি না।'

'ইনজিনরুমে নামার সময় হাতে ছিল?'

'ছিল।'

'বইটা দেখছি হাপিজ! বোঝো এবার—আমরা বেড়াই ডালে ডালে, তেনারা বেড়ান পাতায় পাতায়।'

'একবার দেখে আসব ইনজিনরুমে?'

'একা নামতে পারবি?'

সুহাসের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'পারবি না জানি। ওটা নেইও। এত খোঁজাখুঁজি—বইটা কোথাও পড়ে থাকলে চোখে পড়ত না! দাঁড়া দেখি। বলে তিনি লকার খুলে কি সব টেনে নামাবার সময় বললেন, চার্লির কেবিনে সারা সকাল কি করছিলি? কখন গেলি—'

তিনি নিজেই গজ গজ করছেন।

'ডরোথি ক্যারিকোর লাউঞ্জের ছবিটা যে খুব দরকার। ওটা দেখলে বুঝতে পারতাম। কলিজ জাহাজের সঙ্গে মিল অমিল কতটুকু। ওটা হাতের পাঁচ। কোথায় পাই এখন।'

কিছু কাগজপত্র টানাটানি করতে গিয়ে নীচে পড়ে গেল। সুরঞ্জন হাঁটু মুড়ে বসল! কাগজগুলি জড়ো করতে থাকল।

মুখার্জির সময় নেই হাতে। তিনি কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন—আর নানা প্রশ্ন—কিছু তিনি খুঁজছেন—তবু কথার কামাই নেই।

'চার্লি আর কি বলল। কেবিনেই চার্লিকে পেলি?'

'না, ও তো ছবি আঁকছিল। আমি গেলে কেবিনে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করল। রোমে কি সব ছবি দেখে বেড়িয়েছে, বাপের সঙ্গে, তার গল্প করল। প্রেসরপিনা—না কি যেন নাম ঠিক মনে করতে পারছি না, মাইকেল অ্যানজেলো, র‍্যাফেল কত সব শিল্পীদেরও নাম বলল। আমি তাদের নাম জানি কি না, বলল, সে একবার আমাকে রোমে নিয়ে যাবে।'

'প্রেসরপিনাটা কি?'

'ওটা একটা ভাস্কর্য। ভয়ঙ্কর ভাস্কর্য। চার্লি তো তাই বলল। কোনও দানব এক

সুকুমারীকে টেনে বুকের কাছে তুলে নিচ্ছে। প্রায় উলঙ্গ করে ফেলেছে। দানবের শরীরটা মানুষের মতো, মুখটা সিংহের মতো। মূর্তিটির নৃশংস মুখ দেখে চার্লি নাকি ভিরমি খেয়েছিল। একটা কুকুর মূর্তিটির পায়ের কাছে বসে আর্ত চিৎকার করছে।'

মুখার্জি বললেন, 'গুঁফো লোকটার সঙ্গে দেখছি খুব মিল আছে। হিপনোটাইজ বিষয়টা বড়ই গোলমেলে—কে জানে কি হচ্ছে জাহাজে!'

পকেট হাতড়াতে থাকলেন মুখার্জি।

'কি খুঁজছ?'

'আরে বাটলার দিল—তালিকা!'

'কিসের তালিকা!'

'ধুস, কিচ্ছু ঠিক থাকছে না। কোথায় রাখলাম!' তারপর লকারে উঁকি ঝুঁকি মারলেন উঠে—'পেয়েছি।'

সাতাশ

খাম খুলে মুখার্জি দেখলেন, সব ঠিক আছে কি না। সবার নাম আছে কি না। আছে, কাপ্তান থেকে থার্ডমেট, চিফ ইনজিনিয়ার থেকে ফিফথ ইনজিনিয়ার, রেডিয়ো অফিসার, কার্পেন্টার, কেউ বাদ নেই। ডেক জাহাজি, ইনজিন জাহাজিরাও কেউ বাদ নেই। নাম, বাড়ির ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা সব সুন্দর, হস্তাক্ষরে বাটলার কপি করে দিয়েছে। কিছুটা স্বস্তি বোধ করায় মনে হল, শেষবারের মতো মগড়াকে বাজিয়ে দেখা দরকার। তাঁর সব সিদ্ধান্তগুলি যে সঠিক নয়—রেডিয়ো অফিসারের দরজার সামনে চার্লিকে হামলা করতে দেখে টের পেয়েছেন।

মুখোস হয় দুজন পরে ঘুরে বেড়ায় নয় তিনজন। মগড়া, সেকেন্ড ইনজিনিয়ার, এখন হাজির রেডিয়ো অফিসার। সেকেন্ড সত্যি মুখাস পরে সেদিন জঙ্গলে বসেছিল, না অন্য কেউ একবার মগড়াকে বাজিয়ে দেখা দরকার। কারণ সেকেন্ডকে তিনি দেখেছেন ওদিকটায় যেতে, তিনি পরে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্যও হয়ে গিয়েছিলেন। মাইলখানেক রাস্তা অদৃশ্য থাকার পর সেকেন্ড কোনদিকে চলে গেছে জানেন না। তারপর গভীর জঙ্গল, গাছপাল এবং মাঠ। অন্য কেউ যদি হয়। মগড়াকে ডেকে ফের ধাঁতানো দরকার।

'মগড়াকে একবার ডাক তো?' মুখার্জি কাগজপত্র দেখছেন, কিছু খুঁজছেন। গাইডবইও আছে ডরোথি ক্যারিকোর। সবই খুঁটিয়ে দেখা দরকার। বের হয়ে যাবার আগে অন্তত মুখোসটির যদি কিনারা করতে পারেন, কারণ চার্লি তো বলেছে, সে তার ঠাকুরদাকে দেখতে পায়। ঠাকুরদা তাকে অনুসরণ করছে। মুখোস টুখোস সে আর কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না।

মগড়া ঢুকল বলির পাঁঠার মতো। মগড়াকে সুরঞ্জন টেনে নিয়ে এসেছে বলির পাঁঠা যেভাবে টেনে নিয়ে আসে। বোঝাই যায়, মগড়া জাহাজের কাণ্ড-কারখানা দেখে খুবই ঘাবড়ে গেছে। বিচলিত। কাল থেকে জাহাজে যা উৎপাত চলছে।

মুখার্জি চোখ তুলে মগড়কে দেখলেন—হাতের ইশারায় বসতে বললেন—এত সব

কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে থাকলে যা হয় খুবই খাপছাড়া কথাবার্তা মুখার্জির। বললেন, 'মগড়া আর যাস না। বার বার বলছি। তোর কু স্বভাব ছাড়।'

মগড়া বলল, 'আমি কোথাও যাই না বাবু।''

'ফের মিছে কথা বলছিস?'

'না বাবু সাচবাত বুলছি।'

'বুলে কি পার পাবি!' তিনি সুরঞ্জনকে বললেন, 'সিগারেট দে।' সিগারেট দিলে বললেন, 'ধরিয়ে দে।'

সুরঞ্জন সিগারেট ধরাল। নিজেও নিল একটা। দাদার দু হাতই কাগজপত্র খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। সে সিগারেটটা দাদার ঠোঁটে গুঁজে দিলে তিনি ফের কথা বলতে থাকলেন। দু ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটা নড়ানড়ি করছে কথা বলার সময়।

'তা হলে ধরে নিতে হবে সাচবাত। তুই একবারই উঁকি দিয়েছিলি চার্লির পোর্টহোলে! আর দিসনি! চার্লি টের পেয়েছে—মুখোস পরে তার পোর্টহোলে কেউ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। খুন। খুন বুঝিস! রেডিয়ো অফিসার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল বলে রক্ষা। তবে আর যাই বল তোকে রক্ষা করতে পারছি না। মুখোসটা তোর লকারে আছে। তুই চার্লির পিছু নিয়েছিস পোর্ট অফ সালফার থেকে। গায়ের রংটি তো বাবু তোমার কাফ্রিদের মতো। মুখ তো তোমার প্রেসরপিনা—প্রেসরপিনা বুঝিস।'

মগড়া হতাশ হয়ে পড়ছে।

'ধরা পড়ে গেছিস। সত্যি কথা বল, সুহাস তোকে যদি বাঁচাতে পারে। সুহাস বলতেই পারে, চার্লি ওকে তুমি ক্ষমা করে দাও, মাথা খারাপ লোক, বোধবুদ্ধি কম। সে তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায় না। আজ চোখের উপর দেখলি পিস্তল নিয়ে ঘুরতে। তারপর তখন তুই কি করবি, সেটা তোর ইচ্ছে। তোর ভালোর জন্য বললাম। এখনও সময় আছে। বাতিল বাথরুমে ওটা দেখিয়ে ভেবেছিলি পার পাবি!'

মুখার্জি জানেন, চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সত্য মিথ্যা তিনি কিছু জানেন না। তিনি জানেন শুধু মগড়া তাকে বাতিল বাথরুমে নিয়ে মুখোসটা দেখিয়েছে—যেন সে আর কিছুই জানে না। কৌতূহল থেকে সেও একবার মুখোস পরে পোর্টহোলে উঁকি দিয়েছে। কৌতূহল থাকতেই পারে—মালবাহী জাহাজে পরিস্থুরির মতো দেখতে কেউ যদি ঘুরে বেড়ায় কেবিনে, তবে মাথা ঠিক রাখাও দায়।

তিনি হাতে সিগারেটটা নিয়ে ছাই ঝাড়লেন। বললেন, 'দেখাটা দোষের না। সুযোগ পেলে আমরাও উঁকি দিতাম। চার্লি সাহাব না মেমসাব তুইই প্রথম টের পেয়েছিলি। তোকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। এখন কথা হচ্ছে, কি করবি। খুন হবি, না বেঁচে থাকবি। ম্যাক তো চলে গেল। তুইও চলে যাস আমরা চাই না।'

আর সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে মুখার্জির পা জড়িয়ে ধরতে গেল মগড়া। কোনও কথা বলছে না। বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। সে কি বলছে, বোঝাও যাচ্ছে না। তবে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, মগড়াই মুখোস পরে জঙ্গলে বসেছিল। সেই মুখোস পরে যেত। সর্বত্র সে। সুহাস আর চার্লি বনে জঙ্গলে ঢুকে গেলে তার লোভ হত। গায়ের রঙ আর

মুখের জন্য কাছাকাছি থাকলে বিশেষ সুবিধা হত না। ঘুরে পড়ে যেত। মগড়ার কথাবার্তায় তাও বোঝা গেল। নারী পুরুষের লীলা খেলা দেখার লোভেই সে এমন একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে ফেলেছে।

সুরঞ্জন বলল, 'একদম হাউমাউ করবি না। আস্তে। যা ওঠ। মুখোসটা এনে দাদাকে দে।'

মগড়া বের হয়ে গেল, সুরঞ্জনও সঙ্গে বের হয়ে গেল। মগড়া কেমন জড়বুদ্ধি। সে তার লকারে চাবি পর্যন্ত ঢোকাতে পারছে না। লকার থেকে মুখোসটা বের করতেও সাহস পাচ্ছে না। আতঙ্কে চোখ মুখ লাল। সুরঞ্জন নিজেই ওটা নিয়ে দাদার ফোকসালে ঢুকে যাবার সময় বলল, 'তোর যাতে কোনও অনিষ্ট না হয় আমরা দেখছি। মুখার্জিবাবুকে তো জানিস! মাথা গরম লোক। সবার সামনে বেইজ্জত করলে তোর কিছু বলার থাকত!'

মগড়া সুরঞ্জনের পাও জড়িয়ে ধরতে চাইল।

'কি হচ্ছে, ছাড়।'

সুরঞ্জন বলল, 'এই নাও। তবে দাদা একট কথা বলি। যদি মনে কিছু না কর!'

'বলে ফেল। কিছু মনে করব না। তার আগে যে মগড়াকে আমার ধরে আনতে হবে।'

সুরঞ্জন উঠে চলে গেল।

মগড়া এলে মুখার্জি বললেন, 'মুখোসটা তুই পেলি কোথায়? ম্যাক কি মুখোসটা তোকে দিয়েছে?'

'নেহি বাবু।'

'তবে! মুখোস আসে কি করে।'

তারপর মগড়ার কথা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, মুখোসটি সে চুরি করেছে। ম্যাক খোঁজ-খবর যে না করেছে তা নয়। তবে মাতাল লোকের যা হয়, বেহুঁশ অবস্থায় কাউকে মুখোসটা দিয়েছে, নাাম মনে রাখতে পারেনি। তারপর সুরঞ্জনের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'বলে ফেল। দেখছিস তো খুঁজে পাচ্ছি না। কিছু খুঁজছি বুঝতে পারছিস! কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়।'

কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি দেখে সুরঞ্জনও খুব একটা সাহস পাচ্ছে না। কারণ তারা সবাই এখন দর্শক মাত্র। কারও কিছু বলার থাকলে, অন্য সময়ে বললেই ভাল হয়।

এত সব বুঝেও সুরঞ্জন না বলে পারল না—'তোমার সিদ্ধান্তগুলি কিঞ্চিৎ লঘু পাকের হয়ে যাচ্ছে না!'

'লঘুপাক বলছিস। সামান্য গুরুপাক দরকার!'

'তাই তো বুঝতে পারছি না, বলছ এক ঘটছে অন্য। ম্যাকের মৃত্যু নিয়ে সিদ্ধান্তগুলির কথা ভেবে দ্যাখ—তুমি কি বলেছিলে, মনে করতে পারছ। মুখোস তার কোনও ওপরওয়ালাকে দিয়েছে, যাকে ম্যাক বাঘের মতো ভয় পায়।'

'ভুল সিদ্ধান্ত মানছি। আরে বুঝিস না, ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড। খুনের অকুস্থল একটা। কিন্তু তার রাস্তা অনেক। সব রাস্তাগুলি ধরে হেঁটে না গেলে বুঝবে কি করে,

অকুস্থলে কারা যেন রাস্তায় ঢুকেছিল।'

'না, বলছিলাম, ডরোথি ক্যারিকো নিয়েই বা পড়লে কেন। প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকো প্রেসিডেন্ট কলিজ ভাবছ কিসের ভিত্তিতে! সন্দেহ সেকেন্ডকে, এখন দেখছি, রেডিয়ো অফিসার। সন্দেহ বুড়ো মানুষের মুখোস নিয়ে এখন দেখছি সেটা দাঁড়িয়ে গেছে গিরগিটি গোঁফের মুখোসে। শেষ পর্যন্ত এত লঘুপাক সহ্য হবে তো!'

'হবে।' বলেই তিনি ফের 'ইউরেকা'।

বললেন, 'পেয়েছি।'

'কি পেয়েছ।'

'এই সেই ফটো—রিফ এক্সপ্লোরারের তোলা। কলিজ জাহাজের লাউনজ থেকে কেউ পাচার করেছে। সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি দেখছিস?'

'ফাঁকা। বিশাল গ্রিক দেবীর দুই মূর্তি আর একসিঙ্গি ঘোড়ার দেয়ালটা ফাঁকা। মনে হয় কলিজ জাহাজ থেকে কেউ সেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'এটা কি?' বলে তিনি আর একটি বই এগিয়ে দিলেন। তিনি যে কাপ্তানের ঘর থেকে কাগজপত্র তুলে এনেছেন, ফটোগুলি তারই ভেতর আছে তবে!

সুহাস অধীর সুরঞ্জন ঝুঁকে দেখল—গাইড বুকটিতে ডরোথি ক্যারিকোর অসংখ্য ছবি জাহাজের। পাতা ওল্টাতে গিয়ে সবার চোখ আটকে গেল। ডরোথি ক্যারিকোর লাউনজ—হুবহু কলিজের মতো। সেই তিনটি কারুকাজ করা বিশাল থাম পর পর। দেয়ালের কারুকার্য এক। সেই ডান দিকের দেয়ালে দুই গ্রিকদেবী এবং একসিঙ্গি ঘোড়ার ভাস্কর্যটি শোভা পাচ্ছে।

চার্লির পাচার করা কলিজের ছবি তাদের কাছে আছে। ছবিটি বের করে মিলিয়ে দেখলেন। না, ভাবা যায় না।

মুখার্জি গম্ভীর।—'সিদ্ধান্তগুলি বোধ হয় খুব একটা লঘুপাকের নয়।'

সুরঞ্জন চুপ। বেকুফ বলতে গেলে।

সুহাস বলল, 'জানো, রিফ এক্সপ্লোরার থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। জাহাজের ডুবুরিরা কলিজের ভিতরে ঢুকে অনেক ছবি তুলে এনেছে। কাপ্তানকে ছবিগুলি দিয়ে গেছে। আমাকে সব দেখিয়েছে চার্লি। কেবল লাউনজের ছবিটা কেন যে খুঁজে পেল না বুঝতে পারলাম না।'

'রহস্য!' বলে থেমে গেলেন মুখার্জি।

'চার্লি তো বলল, জাহাজটা নাকি যাট সত্তর ফুট গভীর জলে ডুবে আছে। মরটেলি উন্ডেড্ বার্ডের মতো কাত হয়ে আছে। জলের নীচে বারো বছরে কলিজ জানো, হ্যাভ বিকাম এ রিফ, এ ফেস্টিভ গার্ডেন হোম ফর থাউজেন্ড ক্রিয়েচারস। ওর ঠাকুরদার ইচ্ছেই পূর্ণ হল দেখছি।'

'দ্যাখো ঠাকুরদার আরও কত ইচ্ছে আছে', বলেই মুখার্জি তুরুপের তাসের মতো তিনটে ছবিই পাশাপাশি বিছিয়ে দিলেন—আঙুলে ছবিগুলি পটাপট ছুঁয়ে বললেন, প্রথম ছবিটা কলিজের লাউনজ, দ্বিতীয় ছবিটা ডরোথি ক্যারিকোর, তৃতীয় ছবিটা রিফ

এক্সপ্লোরারের সম্প্রতি তোলা। তিনটি ছবিই এক—শুধু শেষের ছবিটার দেয়াল ফাঁকা। ডানদিকের দেয়াল। ভাস্কর্যটি নেই। সম্ভবত চুরি গেছে।'

থেমে মুখার্জি বললেন, 'সেভেনথ মিলিটারি মিশানের প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটি আগে প্রমোদতরণী ছিল তা বোধ হয় তোমাদের মনে থাকতে পারে। খোল নলচে পাল্টে মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট সিপ কলিজ। শুধু লাউনজটি অক্ষত রাখা হয়েছিল, তাও তোমরা জান। কাপ্তানবয়কে দিয়ে পাচার করা কাগজপত্র থেকে আমরা তা জেনেছি। কি কোনও গড়বড় আছে! থাকলে বলবে। বুঝতে পারছ সিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই লঘুপাকের নয়। প্রমোদ তরণীটি যে ডরোথি ক্যারিকো—ছবি তিনটি তার প্রমাণ! অ্যাম আই রাইট!'

অধীর বিস্ময়ের গলায় বলল, 'এত জলের নীচে জাহাজটাকে খুঁজে পেল কি করে! কত জাহাজ তো এই দরিয়ায় ডুবে আছে। আর চুরি করাও তো কঠিন। লোহার দেয়াল কেটে ছবিটিকে পাচার করা হয়েছে। কার কাজ!'

সুরঞ্জন বলল, 'কারও কাজ নিশ্চয়ই। না হলে গ্রিক দেবীরা যাবেন কোথায়!'

মুখার্জি কাগজপত্র ভাঁজ করছিলেন। তাঁর আর কথা বলার সময় নেই। ঘড়ি দেখলেন, ছ'টা বাজে। বের হয়ে পড়তে হবে। একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেওয়া দরকার সব। কাগজপত্রগুলি এখন এতই মূল্যবান যে তিনি কিছুই খোয়াতে চান না। সুরঞ্জনকে বললেন, 'দ্যাখ তো কারও কাছে চটের থলে টলে পাস কি না!'

'চটের থলে!'

'আরে এগুলি নিয়ে যাব, গ্যাঙওয়েতে দেখতে চাইলে কি করব। চটের থলে থাকলে বলা যাবে, জামা কাপড় আছে।'

সুরঞ্জন চটের থলের খোঁজে বের হয়ে যেতে চাইলে মুখার্জি অধীরকে বললেন, 'তুই যা। যাবার আগে আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে একেবারে ফালতু লোক ভাবছিস এটাই দুঃখ। সাবধানে থাকবি। সুহাসকে কোথাও একা ছাড়বি না।' আর কি বলার থাকতে পারে—তিনি পা নাচাতে থাকলেন।

সুরঞ্জনের মনে হল দিগ্বিজয়ে বের হচ্ছেন, পা তো নাচাবেনই। এদিকে যে আমরা একা পড়ে থাকছি সেটা কি বুঝছ! তবে সে কিছু বলল না।

মুখার্জি চটের থলে কিংবা কাপড়ের ব্যাগ এসে গেলেই উঠে পড়বেন—আর কি বলা যায়, সহসা মনে হল বংশীকে অনেকক্ষণ হল দেখছেন না।

'বংশী কোথায়?'

'দাঁড়াও দেখে আসছি। বলে সুরঞ্জন বের হয়ে গেল। ফিরেও এল মুহূর্তের মধ্যে। বলল, বংশী মগড়া ধুনুচি নিয়ে ঘুরছে। ডেকে উঠে গেছে। ইনজিনরুমের দরজায় ধূপ ধুনো দেখাতে গেছে। গোটা জাহাজ ঘুরে আসবে বলে গেছে।'

'এটা ভাল। মনে শান্তি থাকলেই হল।'

সুরঞ্জন বলল, 'দ্যাখো, আমি তোমার সহকারী। কিছু বললে কষ্ট পাও চাই না। তবে তোমার যাওয়ার কারণটা শুধু পাচার করা কাগজপত্র রক্ষার্থে ভাবলে খুব তুখোড় গোয়েন্দার কাজ মনে হবে না। ফিলই চার্লির আঙ্কেল রাচেল ভাবছ কোন সুবাদে!'

'কোন সুবাদে? পিদগিন ভাষার সুবাদে। ওই দ্বীপে আরও একবার ঘুরে গেছি। ফিলের কথা মনেই ছিল না। চার পাঁচ বছর আগেকার কথা। তারপর কত বন্দর, কত দেশ—জায়গাটার নামও ভুলে গিয়েছিলাম। পিদগিন ভাষার বিজ্ঞাপন না পড়লে মনেই পড়ত না, ফিল এই দ্বীপেই থাকেন। ফিল আর ফিলিপ—ধন্দ। চিরকুটে লেখা—চিরকুটটা অবশ্য কাপ্তান বয় পাচার করেছিল—চিরকুট না বলে চিঠি বলাই ভাল—বোথ-বে হারবার থেকে জনৈক অ্যালেন পাওয়ার লিখেছে, ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার হু ফেল আন্ডার দা স্পেল অফ দ্য কলিজ টুয়েলভ ইয়ার্স এগো, অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অফ দ্য রেক। পলকে কেন যে ফিলের কথা মনে পড়ে গেল। ওর ঘরে ডুবুরির পোশাক দেখেছিলাম।'

থেমে বললেন, 'বুঝলি কিছু?'

'বলে যাও।'

'এক নম্বর কলিজ সম্পর্কে কাপ্তানের আগ্রহ। চিঠিটা তার প্রমাণ। দু নম্বর কে ফিলিপ, যে বারো বছর ধরে ডুবন্ত জাহাজের প্রহরী হয়ে আছে! ফিল যদি ফিলিপ হয়! তিন নম্বর কলিজ সম্পর্কে খোঁজ খবর করার কথা শুধু মিলার বংশের কারোর। ওটাতে এমন কিছু আছে, কিংবা ছিল, যার জন্য মিলার বংশের কাছে জাহাজটা খুঁজে বের করা দরকার হয়ে পড়েছে। চার্লির বাবা কাকা ছাড়া কার আর এত গরজ!'

'তা হলে তুমি ভাবছ, ফিল অসি ডাইভার নয়।'

'না। ফিল ফিলিপও নয়। ফিল অস্ট্রেলিয়ানও নয়। ফিলই আসলে চার্লির আঙ্কেল রাচেল। কলিজ জাহাজটা সেই ডুবিয়েছে। অন্তর্ঘাত। জাহাজটার উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, মাইনফিল্ডে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—হয়! জাহাজে এমন কিছু বংশগৌরব কিংবা ধর গুজব, এই গুপ্তধন-টনের আর কি, তোকে কি করে বোঝাই, শুধু বুনো ফুলের সাম্রাজ্য বিস্তারে এত বড় প্রমোদ তরণী নিয়ে ইস্টার দ্বীপ থেকে শুরু করে গ্যালাপ্যাগাস, হাইব্রিডস দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে বেড়াতে পারে কেউ, কোনও গোয়েন্দাই বোধ হয় বিশ্বাস করবে না। জাহাজে কোনও যে গুপ্তধন ছিল না বলবে! শুধু ভাস্কর্যটি সরিয়েছে—বিশাল চোরা কুঠুরিতে আর কি ছিল! চোরা কুঠুরি কখনও খালি থাকে! ভাস্কর্যটি তুলে নিয়ে যাওয়ায় পেছনের চোরা কুঠুরিও দেখতে পেলে রিফ এক্সপ্লোরারের সম্প্রতি তোলা ছবিতে। কার কাজ!'

সুরঞ্জন ব্যাজার মুখে বলল, 'কার কাজ আমি কি করে বলব?'

'ফিলের কাজ। ফিলের প্রাসাদে ভাস্কর্যটি খুব যত্নের সঙ্গে দেয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বিশাল জায়গা জুড়ে। দুর্গা প্রতিমার মতো ঝলমল করছে।'

সুরঞ্জন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'জেনে শুনে সিংহের গুহায় উঁকি মারতে যাচ্ছ!'

'দেখি না কি হয়। দস্যু কবি হয়ে যেতে পারে—আর রাচেল সন্ন্যাসী হতে পারে না! রাচেলকে দেখে বুঝেছি, সরষেতে শুধু ভূত থাকে না। ভগবানও থাকে। তেলের গুণ বলতে পারিস।'

'এত রাতে তাই বলে! মন থেকে সায় পাচ্ছি না।'

'ভয়ের কি আছে! এই দ্যাখ না', বলে পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের করে দেখালেন। বললেন, 'ফিল দিয়েছে। প্রণামী। বিপদে আপদে মুদ্রাটি আমাকে রক্ষা করবে বলেছে।'

ওরা চারজনই মুখার্জিদার সঙ্গে ডেকে উঠে গেল। মুখার্জিদা ডেকসারেঙের অনুমতি নিতে গেলেন। রাতে ফিরবেন না, কখন ফিরবেন তাও জানেন না। ডেকসারেঙকে না বলে গেলে কথা হবে।

মুখার্জিদা ছুটে আসছেন। বোঝা যায় মুখার্জিদা তুখোড় ম্যানেজমাস্টার। জাহাজের দায়দায়িত্ব কারও কম না। হুট করে জাহাজ থেকে নেমেও যাওয়া যায় না। বিশেষ করে রাতের বেলা।

গ্যাংওয়েতে নেমে নৌকায় ওঠার সময় হাত তুলে দিলেন। উপরে চোখ যেতেই দেখলেন, চার্লি রেলিঙে ভর করে তাঁকে দেখছে। চার্লিকেও তিনি হাত তুলে বাই করলেন। এবং নৌকা কিনারায় গেলে লাফিয়ে কিনারায় উঠে গেলেন তিনি। এখন সেজা আস্তাবলের দিকে যেতে হবে। কিনার থেকেও আবছা দেখতে পেলেন অধীর, সুরঞ্জন, সুহাস, কেষ্ট তখনও রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে, বোটডেকে চার্লিও। যতক্ষণ দেখা যায়—মুখার্জির মনটা কেন যে ভারী হয়ে গেল। রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলি টিম টিম করে জ্বলছে।

দেখা যাক—চার্লির ছেলে সেজে থাকর পেছনে অসল রহস্যটা কি। ফিল যদি সত্যি চার্লির আঙ্কেল রাচেল হয়ে যায়! কত যে ভাবনা—তিনি আশা করছেন পাচার করা কাগজপত্র থেকে কিছু অন্তত সূত্র খুঁজে পাবেন। এই সব চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে হাঁটলে, দূরের রাস্তাও কাছের হয়ে যায়। আস্তাবলের সামনে তিনি। ঘোড়ার দাম দর—রাতে ঘোড়া ছাড়তে রাজি না কেউ। আস্তাবলগুলি প্রায় ফাঁকা—রাতের দিকে ঘোড়াগুলি ফিরে আসে। ভাল ঘোড়া একটাও পেলেন না। পেলেও অশ্বরক্ষক ছাড়তে রাজি না। কি করা! একবার মুদ্রাটি বাজিয়ে দেখলে হয়।

মুদ্রাটি পকেট থেকে তুলে হাতের তালুতে রাখলেন। অশ্বরক্ষক যেন ভূত দেখছে। মুদ্রাটি অশ্বরক্ষকের নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে ফের অত্যন্ত কৌশলে লুফে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেল। একেবারে নতজানু। ঘোড়াটিকে আদর করে বাইরে বের করতেই মুদ্রাটি তিনি পকেটে পুরে ঘোড়াটির লাগাম ধরে ফেললেন। লাফিয়ে উঠে গেলেন পিঠে। বেশ তাজা এবং বলিষ্ঠ ঘোড়া। মুদ্রাটির যথার্থই জোর আছে।

সাদা রঙের ঘোড়াটি কদম দিচ্ছে।

শহরের মানুষজন দোকানপাট পার হয়ে গেলেন। কাঠের গুদাম পেছনে পড়ে থাকল। লাইট-হাউস পার হয়ে গেলেই বনজঙ্গল—পাকা সড়কের দু-পাশে। কিছুটা এই রাস্তায় যবেন, পরে বাঁ দিকে উঠে যাবেন—দুটো টিলা পার হয়ে যেতে হবে। জ্যোৎস্না গাছপালায় মাখামাখি হয়ে আছে—কারণ টিলার উপরে তিনি দেখলেন গোলাকার বিশাল বৃত্তের মতো চাঁদটি আকাশে ঝুলে আছে। সমুদ্রের এই এক কুহক—পাশে সমুদ্র এবং বাঁ-দিকে—কারণ ফিল বলে দিয়েছেন অলওয়েজ লেফট। সমুদ্র সব সময় চাঁদকে বড় করে দেখায়।

কিছুট পথ এসে মনে হল, সমুদ্রের গর্জন আর শুনতে পাচ্ছেন না। তিনি ফের উঠে যেতে থাকলেন সন্তর্পণে। দ্বীপের এদিকটায় মাটি তুলে নিয়ে যাওয়ায় নানা আকারের খাদ সৃষ্টি হয়েছে। রাতে মানুষজনের কোনও সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না। যতই জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি মাখামাখি হয়ে থাকুক—খাদগুলি ঘাসের আড়ালে ডুবে আছে। পড়ে গেলে অশ্ব এবং তার আরোহী দুই জখম হবে।

ইচ্ছে করলেই ঘাস মাঠ, লোকালয় পার হয়ে যাবার জন্য তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারছেন না। তাঁর একটাই নিশানা। সমুদ্রের ধারে ধারে—সব সময় তুমি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবে। রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দে। পাথরের চত্বর শুধু মাইলের পর মাইল। ক্যাকটাস এবং স্টোন বার্ড নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পাখির কলরব ছাড়া কিছুই যেন তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

মাথার উপর বড় বড় গাছের ছায়া—গাছগুলি উকন হতে পারে। পাইন, ম্যাপল হতে পারে—রাতের এই নিঝুম জ্যোৎস্নায় চেনা মুশকিল। দ্বীপের বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত। দ্বীপে আখ আনারস হয়, আবার আঙুরের চাষও হয়। পাথরের সাম্রাজ্য বিস্তারও কম নয়, ঘাসের জঙ্গলও মাইলের পর মাইল। আবার ম্যাপল গাছেরও ছড়াছড়ি। উষ্ণ মন্ডল থেকে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের গাছগাছালি জীবজন্তু সবই দ্বীপগুলিতে যে কি করে সহাবস্থান করে বেঁচে আছে বুঝে উঠতে পারেন না। এমন এক বিচিত্র দ্বীপে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় শেষে নেমে এলেন কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কারণ যেদিকেই যাচ্ছেন, সমুদ্রের সাড়াশব্দ নেই।

সঙ্গে একটি টর্চ এনেছেন। সুরঞ্জন ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। ঘড়ি দেখলেন—প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘোড়ার পিঠে—আশ্চর্য এখন পর্যন্ত কোনও লোকালয় চোখে পড়ল না। যতদূর চোখ যায় শুধু নিরন্তর আকাশ আর মাঠ এবং অরণ্য। এমনকি তিনি এয়ারস্ট্রিপও খুঁজে পেলেন না। অন্তত একটা পেলেও তাঁর ভরসা থাকত। কারণ এয়ার স্ট্রিপগুলির মাথাও সমুদ্রের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এ-ভাবে এত রাতে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাও কষ্ট। এবং গাছের ডালপালা হাওয়ায় দুলছে। বেশ জোরে হাওয়া বইছে—তিনি টর্চ মেরে গাছের ডালে কি খুঁজলেন—কোনও পাখির কলরব যদি শুনতে পান। যেন এতে সাহস ফিরে পাবেন। মানুষ-বর্জিত এক বিশাল প্রান্তরে নেমে এসেছেন। তাঁর ঘাম হচ্ছিল। রুমালে ঘাম মুছে বসে আছেন ঘোড়ার পিঠেই। দেখা যাক—বলে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। পাহাড়ের মতো কিছু সামনে একটা দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। ঘাসের ভিতর জোনাকিরা ওড়াউড়ি করছে। কীট পতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

অনেকটা পথ তিনি নেমে এলেন। কোনদিকে যাচ্ছেন, চাঁদের অবস্থান দেখে দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। এখনও চাঁদ আকাশের গায়ে হেলে আছে। শুক্লপক্ষের রাত। আজ পূর্ণিমা—কারণ ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ আকাশে ঝুলছে না। ক্রমে রাত বাড়ছে।

ক্রমে তিনি একটা দেয়ালের মতো লম্বা পাথরের প্রাচীর দেখতে পেলেন। সামনে এগোবার আর কোনও পথ নেই। পাঁচিলটি খুবই খাড়া। পাঁচিলের পাশ দিয়ে আবার

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মধ্যযামিনী। ভয়ঙ্কর দাপাদাপি চলছে জঙ্গলে—কারা দাপাদাপি করছে। টর্চ জ্বালতেই দেখতে পেলেন বীভৎস দু জোড়া চোখ। আকৃতি ডাইনোসোরসদের। সত্যি প্রাগৈতিহাসিক জীব, তবে আকারে বড় নয়। তিনি তারপর আরও দ্রুত নেমে যেতে থাকলেন আর শুনতে পেলেন, সমুদ্রের বিশাল গর্জন। কিন্তু সমুদ্র তাঁর ডানদিকে বিরাজ করছে। তিনি বুঝতে পারলেন ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তাটি ভুল করে ফেলেছেন।

ডানদিকে সমুদ্র পড়লে ফিলের প্রাসাদে যাওয়া যায় না, এটা তিনি ভালই বোঝেন। দ্বীপের কোনও দুর্গম অঞ্চলে নেমে এসেছেন। কিছুটা অস্থিরও হয়ে পড়েছেন—কি করবেন—কোনও লোকালয় পেলেও রক্ষা। তারও উপায় নেই। ঘোড়া ছুটিয়ে উপরে যাবার পথও বন্ধ। কারণ পাশেই খাড়া পাহাড় এবং সমুদ্র। পাহাড়ের পাশে ফুট দশেক উপত্যকা—আর তার অনেক নীচে সমুদ্র। ঘোড়া দু পা তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। এগোলেই নীচে সমুদ্রের জলে পড়ে যেতেন।

হঠাৎ তাঁর মাথায় কি যে বুদ্ধি খেলে গেল। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিলেই সমুদ্র বাঁ-দিকে পড়বে। এত কেন যে ভাবছেন। ভাবা মাত্রই লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন ঠিক—কিন্তু আশ্চর্য ঘোড়াটি আর কিছুতেই নড়ছে না। যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। নীচে পড়ে গেলে উঠে আসা যাবে না। জোরজার করে ক' কদম এগিয়ে যেতেই মনে হল, পাহাড়ের বিশাল দেয়াল মাথার অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সামনে এগোবার আর রাস্তা নেই। নীচে খাদের মতো—সেখানে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

আটাশ

বোধহয় তিনি ভুলই করে ফেলেছেন—তবু ভরসা, কাছে সমুদ্রটি আছে। আবার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে ডাইনে সমুদ্র রেখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কাছে কোথাও কোনও পাথরের উপত্যকার খোঁজ পেলে—ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বেন—এবং চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়বেন—কারণ শরীর আর দিচ্ছিল না। দু'দিন ধরে জাহাজে যা চলছে। আশা ছেড়েই দিয়েছেন। জ্যোৎস্নায় নিস্তব্ধ প্রহরীর মতো সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকলেন। অজানা অচেনা দ্বীপে রাস্তা হারিয়ে ফেললে মাথা ঠিক থাকে না।

একা না বোকা—সুহাসকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তা হলে এতটা নিরুপায় ভাবতে পারতেন না নিজেকে। কিছুটা যেন কি করা যায় এই গোছের যাত্রা। অনেকটা রাস্তা এগিয়েও এসেছেন—মধ্যযামিনীই বলা যায়—আর হঠাৎই মনে হল সমুদ্রে কারা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছিল ভেড়ার পাল বিশাল প্রান্তরে অথবা একদল হারিয়ে যাওয়া গাভী সমুদ্র পার হয়ে উঠে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বাললেন। জ্যোৎস্নায় সব কিছুরই আভাস পাওয়া যায়। স্পষ্ট দেখা যায় না। টর্চ জ্বালতেই চক্ষুস্থির। হাজার হাজার ব্লু সার্ক সমুদ্রে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। ঘুরছে ফিরছে। লাফ দিয়ে উপরে উঠছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে চলেছে। একটা আর একটার ঘাড়ে মাথা তুলে দিচ্ছে। সমদ্র এখানে খাড়ির মতো ক্রমে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। এদিকটায় এত ঝাঁকে ঝাঁকে নীল হাঙরেরা কোথা থেকে ঢুকে গেল। আর তখনই কি দেখে তাজ্জব

হয়ে গেলেন। সমুদ্র থেকে বিশাল পিরামিডের মতো একটা ছায়া ভেসে উঠছে ধীরে ধীরে। তাঁর আর বিন্দুমাত্র সাহস থাকল না। ঘোড়া থেকে তিনি যেন গড়িয়ে পড়ে যাবেন।

এমন আশ্চর্য দৃশ্য জীবনেও দেখেননি। রুপোলি রঙের কুয়াশার মতো পাহাড়টা মাথা তুলে দিচ্ছে সমুদ্র থেকে। ক্রমে বড় হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করতে থাকলে, তার রক্ত হিম হয়ে গেল। আর তখনই মনে হল গুঁড়ি মেরে জঙ্গল থেকে দু'জন প্রায় অদৃশ্য ব্যক্তি লতাপাতায় ঢাকা উঠে এল। এরা কারা? তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি ভাবলেন, দেখাই যাক না—এই সব অপদেবতার পাল্লায় পড়তে হতে পারে, ভেবেই ফিল বোধহয় তাঁকে স্বর্ণমুদ্রাটি উপহার দিয়েছেন।

তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পিঠে তার দুটো আদরের থাপ্পড় মারলেন—যেন বলা, তুমি আর আমি—ওরা আসছে ওরা কারা জানি না। কারণ টর্চ জ্বালতেও ভয় হচ্ছে। তারা আমাকে নিশ্চয়ই দেখেছে। টের পেয়ে ছুটে আসছে।

কাছে এসেই বুনো ঘোড়া ধরার ল্যাসো ছুঁড়ে দিল। এবং তিনি জড়িয়ে গেলেন। তাঁর কোমরে ল্যাসোটি আটকে গেছে—কি নিখুঁত ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি।

জোরজার করে কোনও লাভ নেই—তারা কি চায় দেখাই যাক না। তারা তো দ্বীপেরই কেউ হবে। এবং ফিলের প্রভাব প্রতিপত্তি এই সব দ্বীপে এত বেশি প্রবল যে তাঁকে ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কঠিন। দ্বীপের মানুষেরা সরল অকপট। রাহাজানি, ছিনতাই, চুরি-চামারি তারা জানে না। সরল অকপট হলে যা হয়, খুব ধর্মভীরু। কিন্তু তারাও যদি ইনজিনরুমের সেই অদৃশ্য অপদেবতার কেউ হয়। কেউ তার উপর যে সতর্ক নজর রাখছে না, তারই বা ঠিক কি? এত গোপনে সুহাসকে ইনজিনরুম থেকে তুলে এনেও শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলেন না। তাঁর বাড়িঘর, ছেলেমেয়ে এবং প্রিয় নারীর মুখ মুহূর্তে চোখের উপর ভেসে উঠল, তারা জানেই না, কিছুক্ষণের মধ্যে বড় রকমের হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

দূরে একটা আলো জ্বলছে।

সেই ভেসে ওঠা পাহাড় শীর্ষ থেকেও একটা আলো যেন এপারে সাংকেতিক ভাষায় কাউকে খবর পাঠাচ্ছে, তিনি আক্রান্ত হতে হতে যতটা পারছেন চারপাশ থেকে দেখে নিচ্ছেন। যদি দৈবের বশে বেঁচে যান, তবে ফিলকে সব খুলে বলা যাবে। এখন একমাত্র কোনও দৈবই যেন তাঁকে রক্ষা করতে পারে।

আর আশ্চর্য লোক দুজনের একজন আর কেউ না। নিনামুর।

সে মুখার্জিকে দেখে ঘাবড়ে গেছে। বলল, স্যার আপনি।

তুমি এখানে?

সে কিছুটা তোতলাতে লাগল। বলল, না, আপনি আজ্ঞে আপনি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কর্তা তাঁবুতে আছেন। আজ তো ফুলমুন স্যার। কিন্তু কি করি, ওদিকে যাবার কারও হুকুম নেই। সকাল না হলে—আজ্ঞে আপনি—এই পাহাড়ে, কেন, মা মাথায় আমার আসছে না। নিনামুরের যেন ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

মুখার্জি বললেন, তোমার কর্তা তাঁবুতে কি করছে।

নিনামুর একটা কথাই ঘুরেফিরে বলছে আজ ফুলমুন, কর্তা তাঁবুতে আছেন। বের হবেন।

মুখার্জি এবার তাঁর মুদ্রাটি বের করে নিনামুরকে দেখালেন, বললেন ওকে গিয়ে দেখাও। বলগে, আমি তার কাছেই যাচ্ছিলাম। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ডানদিকে সমুদ্র পড়ছে দেখেই বুঝেছি, সারা রাত সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে হবে। বলবে, খুব জরুরি কথাবার্তা আছে।

নিনামুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ সে কর্তার কাছে গিয়ে এখন সব খুলে বলতে পারবে। ফুলমুনের রাতে তারা পাহারায় থাকে। জোয়ার ভাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই দুর্গম এলাকাতে কখনও কেউ আসে না। তবু কর্তার সতর্কতার শেষ নেই। নিজের কিছু লোকজন নিয়ে, তার কর্তা বিকেলেই বের হয়ে পড়েন। তাদের একটাই কাজ, চারপাশে লক্ষ রাখা। জাহাজি সাহেবকে কর্তা খুবই মানা করেন—তোতোমেরি পাহাড়ে ভাটায় জল নেমে গেলে একটি বিশাল দরজা আবিষ্কার করা যায়। কেউ জানে না। জানেন কর্তা আর তারা। সে দৌড়ে চলে গেল। ফিরেও এল। এসে সেই নতজানু হওয়ার কায়দায় মুখার্জিকে অভিবাদন জানাল।

মুখার্জি ঘোড়া থেকে নেমে পাথরে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। কিছুটা দূরে পিরামিড সদৃশ পাহাড়টি ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে এবং খুবই কাছে চলে আসছে যেন। অদ্ভুত কাণ্ড। পাহাড়ের জেগে ওঠার দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। সমুদ্রে দাপাদাপি চলছে অজস্র হাঙরের। ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তায় কখনও মনে হয়নি, এই সব এলাকায় নীল হাঙরের উপদ্রব থাকতে পারে। পূর্ণিমা রাতে প্রজননের হেতুতে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙর ঢুকে গেছে কি না কে জানে। গভীর জলে তারা বিচরণ করে তিনি জানেন। তবে কি জল এখানে খুবই গভীর—কি যে রহস্য বুঝতে পারছেন না। চাঁদের আলোয় পাহাড়টা রুপোলি হয়ে গেছে যেন। এবং পাহাড় থেকে নানা রঙের বিদ্যুৎছটা বের হয়ে আসছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। ভুতুড়ে পাহাড়টাহাড় ছাড়া এ ভাবে জেগে ওঠার কার দায় পড়েছে তিনি তাও বুঝতে পারছেন না। কিছুটা বেকুবের মতো দৃশ্যান্তর দেখতে দেখতে তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীর আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে।

নিনামুর সামনে এসে না দাঁড়ালে তাঁর কি গতি হত তিনি জানেন না। কারণ নিনামুর এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না এমন দুর্গম অঞ্চলে এত রাতে ফিল তাঁর লোকজন নিয়ে নেমে আসতে পারে। ফিলের কি কাজ থাকতে পারে! রহস্য ঘনীভূত হচ্ছিল—পিরামিড-সদৃশ পাহাড়ে ফিল কি কিছু খুঁজে বেড়ায়। যদি খুঁজে বেড়ায় সেটা কি কোনও অলৌকিক কিছু—!

নিনামুর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটির লাগাম ধরে আগে আগে যাচ্ছে নিনামুর। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে, ফিলের কি ইচ্ছে—এমন সব চিন্তা ভাবনায় কিছুটা তিনি বিমূঢ়। পাহাড়ের মাথায় লাল আলোটা দুলছে। যেন সব সময়ই কোনও পাহারাদার এই পাহাড়ের মাথায় বসে থাকে হাতে লাল লণ্ঠন নিয়ে। বিপদসঙ্কেত পাঠাচ্ছে মনে হয়।

বাঁ-দিকে পাহাড়, ডান দিকে সমুদ্র—কিছুটা দূরে। জ্যোৎস্নারাত বলে বোঝা যাচ্ছে না, কতটা দূর—সেই অলৌকিক পাহাড়। ভাটার টানে জল নেমে যাচ্ছে—উঁচু নিচু অজস্র প্রবাল দ্বীপের অভ্যন্তরে এই অলৌকিক মহিমা দেখার জন্যই কি ফিল ফুলমুনের রাতে এখানে নেমে আসে! এ কি কোনও ঈশ্বর মহিমা উপলব্ধির জায়গা।

আর তখনই মনে হল, ফিল তাঁকে সাহস দিচ্ছে। দূর থেকে ডাকছে, 'মুখার্জি ভয়ের কিছু নেই! সাহস হারিয়ো না। আমরা এখানে আছি। এত রাতে, এই দুর্গম অঞ্চলে ঢুকে গেলে কি করে! ঠিক রাস্তা হারিয়েছ!'

ফিল কি অন্তর্যামী!

তিনি রাস্তা হারিয়েছেন তাও জানে। তারপরই মনে হল, নিনামুরকে তিনি হয়তো বলেছেন, ফিলের প্রাসাদে যেতে গিয়ে এই ফ্যাসাদ।

ফিল ছুটে আসছে। নিনামুর ঘোড়াটি নিয়ে তাঁবুর পাশে চলে গেল। ঠিক তাঁবু নয়। অস্থায়ী আস্তানা গোছের। হয়তো জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ডুবে থাকে জায়গাটা। এ জন্য এখানে বোধ হয় ফিল স্থায়ী আস্তানা তৈরি করতে পারেনি। ফিলের সঙ্গে আরও সব লোকজন আছে—তারা ফিলের খুবই অনুগত বোঝা যায়। সঙ্গে তাদেরও টর্চ এবং লম্ফ আছে। একটা ছোট জাল এবং হলুদ রঙের কাচের জারও দেখলেন। কাঁচের জারে কালো রঙের একটি বিচিত্র আকারের মাছ। দেখলেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয়।

ফিল বললেন, 'স্টোন ফিস। নাম শুনেছ।'

মুখার্জি বললেন, 'না।'

'খুব বিষাক্ত। মাছটি পাহাড়ে যাবার রক্ষী আমাদের। সামনের পাহাড়টায় যাব। ওটাই আমার ঈশ্বরের ভাণ্ডার। তুমি কি যাবে? আমার ঈশ্বরের ভাণ্ডারটি দেখে আসতে পারতে।'

'না না। তোমরা যাও। আমি অপেক্ষা করছি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। শেষে এমন দুর্গতি হবে জানতাম না। ভাগ্যিস তোমাদের দেখা পেয়ে গেলাম।'

ফিল একটা টিনের চেয়ারে বসেছিলেন। মুখার্জি কাছে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মুখার্জিকে বসতে বললেন। মুখার্জি বসলেন না। আর বাড়তি কোনও চেয়ার নেই বলে, ফিল দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মুখার্জির সঙ্গে। পেছনে পাথরের ঝোপজঙ্গল থেকে কীট-পতঙ্গের আওয়াজও ভেসে আসছিল। জায়গাটায় কোনও সমুদ্র গর্জনও নেই। অথচ নীচে কয়েক পা হেঁটে গেলেই সমুদ্র—ভাঁটার টানে জল নেমে যাচ্ছে বোঝা যায়।

ফিলের লোকজন ভূতের মতো ছায়া হয়ে যেন বিচরণ করছে।

এমন আজগুবি দৃশ্য অথবা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবেন—তাঁর মনেই হয়নি। অবিশ্বাস্য ঠেকছে। কি করে সম্ভব, কোনও পাহাড় জলের তলা থেকে ফুলমুনে ভেসে ওঠে। তিনি কি সুস্থ আছেন? আতঙ্কে যে তাঁর চৈতন্য লোপ পায়নি কে বলবে! তাই সব আজগুবি দৃশ্য চোখে ভেসে উঠছে। স্বাভাবিক নন তিনি এমনও ভাবলেন, যা দেখছেন, মরীচিকা হতে পারে। চিমটি কেটে দেখলেন, লাগে। কথাবার্তায় স্বাভাবিক হতে পারছেন না কিছুতেই। কিছুটা বিমূঢ় অবস্থায় সব যেন দেখে যাচ্ছেন। ফিল প্রশ্ন করলে, জবাবে হুঁ হাঁ করছেন। ফিল চাইছে তাঁকে সঙ্গে নিতে। তিনি রাজি হতে পারছেন না। কে জানে,

ফিল এই সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে তামাসাও দেখতে পারে। পাহাড়টকে জলের তলায় হাঙরেরা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে এমনও মনে হল তাঁর। বিষাক্ত মাছটি তাদের রক্ষী! তাই বা কি করে হয়! আর কাচের জারে, জলের মধ্যে মাছটি চোখে ভেসে উঠলেই গায়ে তাঁর কাঁটা দিচ্ছে কেন!

ফিল তখন যেন মন্ত্র জপ করছেন। কারণ মুখার্জি দেখতে পেলেন, সেই পাহাড় শীর্ষের আলোটি আর লাল নেই, হলুদ, তারপর সবুজ হয়ে যাচ্ছে।

চেষ্টা করছেন মুখার্জি ফিল কি বলে শোনার—'অ্যান্ড ইয়েট ও মাই লর্ড, ইয়ো আর আওয়ার ফাদার। উই আর দ্য ক্লে অ্যান্ড ইয়ো আর দ্য পটার।'

মুখার্জি কেমন সম্মোহিত হয়ে পড়ছেন।

ফিল তখনও বিড় বিড় করে বকছেন, 'দ্য কনজিওমিং ফায়ার অফ ইয়োর গ্লোরি উড বার্ন ডাউন দ্য ফরেস্টস অ্যান্ড বয়েল দ্য ওসেনস্ ড্রাই।'

মুখার্জি দেখলেন, ফিলের পার্শ্বচরেরাও সেই ঈশ্বর ভজনায় যোগ দিয়েছে। তারা সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে।

তারপর ফিল বলছেন, ইয়ো ওয়েলকাম দোজ হু চিয়ারফুলি ডু গুড, হু ফলো গডলি ওয়েজ। প্লিজ এ্যাকসেপ্ট মাই অফারিঙ। বলেই ফিল কি নির্দেশ দিলেন, তাঁর একজন পার্শ্বচর দৌড়াতে থাকল, এবং জলের মধ্যে নেমে যেতে থাকল—হাঙরের ঝাঁক ভেসে বেড়াচ্ছে—আর আশ্চর্য লোকটি হাঁটু জলে নেমে যেতেই, সব অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি দেখছেন, লোকটির হাতে সেই হলুদ রঙের জাল, এবং তার ভিতর কাচের জার থেকে মাছটিকে জলের ভিতর জালে ছেড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আশ্চর্য মাথা ঠিক রাখাই মুসকিল। ফিল এ-সব কি করছে!

ফিল যেন ফের স্বাভাবিক হয়ে গেল। বলল, চল, আমি যাচ্ছি। তুমি গেলে খুশি হব। ঈশ্বরের অপার মহিমা গেলে টের পাবে। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। ফিল তারপর কি হুকুম করল, কে জানে! দুটো ঘোড়া এনে কারা যেন সামনে হাজির করল। ফিল বলল, 'দাঁড়িয়ে থাককেল কেন! ঈশ্বর আমাকে এতটা দেবেন বুঝতে পারিনি! পাহাড়টির চমকপ্রদ ঘটনায় তুমি বিহ্বল বুঝতে পারছি। আসলে জোয়ার ভাটার ব্যাপার। এত সব অজস্র দ্বীপে, জোয়ারে জল উঠে এলে এমন সব অনেক দ্বীপ আছে ডুবে যায়—আবার জল নেমে গেলে ভেসে ওঠে। এটি গুপ্ত পাহাড়—ফুলমুনে এখানে আসি। বিশাল দরজাটি জল নেমে গেলে হাঁ করে থাকে। আমরা ঘোড়া নিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে পারি।'

সামান্য ঠেলা মেরে বলল, 'মুখার্জি, তুমি না একজন ভারতীয়। তোমার এত যোগবল থাকতে এতটা বিচলিত হওয়া সাজে না। চল। উঠে পড়। দেখছ না, নীলবাতিটা জ্বলে গেছে। একদম সময় নেই। উঠে পড়। এটা তাঁরই ইচ্ছে, না হলে তুমি এখানটায় মরতে আসবে কেন!'

মুখার্জির বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। ফিলের ইচ্ছেই যেন তাঁর ইচ্ছে। তিনি ঘোড়ায় চেপে বসতেই ফিল জলে নেমে যেতে থাকল। আগে সেই মানুষটি হেঁটে যাচ্ছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশাল হাঙরের ঝাঁক লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে বোধহয়—কারণ কাছাকাছি

কোনও হাঙরের ঝাঁক তিনি দেখতে পেলেন না—পেলেও তারা আট দশ ফুট দূরে থাকছে, ভেসে উঠেই ডুবে যাচ্ছে।

ফিল বলল, 'গুপ্ত পাহাড়ে ঢোকার এটাই একমাত্র রাস্তা। কোনও খাড়া প্রবাল প্রাচীর এখানে আছে। পাঁচ সাতশ ফুট জলের তলা থেকে উপরে উঠে এসেছে। সবই তাঁর ইচ্ছে। কি বল।'

ফিল বলল, 'পেছনে পেছনে আসবে। সাবধান, এদিক ওদিক হলে গভীর জলে পড়ে যাবে। স্রোতের টানে ভেসেও যেতে পার।

মুখার্জি কোনও কথাতেই সাড়া দিতে পারছেন না। ফিল বলেই চলেছে, দ্য লর্ড ইজ গুড। হোয়েন ট্রাবল কামস্ হি ইজ দ্য প্লেস টু গো!

জলে ছপ ছপ শব্দ, জলের ঘূর্ণি, মৃদুমন্দ বাতাসে জলের ঢেউ, অদূরে হাঙরের ঝাঁক, হুটোপাটি তাদের—ফিলের কথা প্রায় কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না। ফিল তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। যত পিরামিড-সদৃশ ছায়াটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তত জলকল্লোলে ভেসে যাচ্ছিলেন। ব্যাগটি ফেলে এসেছেন নিনামুরের কাছে, এই দুশ্চিন্তাও তাঁকে গ্রাস করেছে। ফিল বেশ জোরে জোরে কথা বলছে, প্রায় চিৎকার করে—তিনি জবাব না দেওয়ায় সহসা ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হোয়াট আর ইয়ো থিংকিং, মুখার্জি!'

মুখার্জি বললেন, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!'

'বেশি দূর না। সামনে, এসে গেছি।'

মুখার্জি বললেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হাঙরেরা ছুটে আসছে দ্যাখ।'

'আসবে না। সি, দ্য মেসেঞ্জার কাম রানিং ডাউন দ্য গেট উইদ গ্ল্যাড নিউজ।'

তিনি দেখতে পেলেন সামনেই পাথরের দরজা। ফিল মাথা নিচু করে ঢুকে গেল। মুখার্জিও মাথা নীচু করে দিলেন। জলের ছপ ছপ শব্দ আর নেই। অন্ধকার গুহাপথ। ফিল ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। তার এখন অনুসরণ করা ছাড়া যেন উপায় নেই। কালো চকচকে পাথরের গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হুঁশিয়ারি। এ-এক যেন গর্ভ গৃহে ঢুকে গেলেন মুখার্জি।

ফিল প্রায় ছুটছে। সামনে দুটো লম্প নিয়ে দু'জন ছুটছে। আঁকাবাঁকা সরু গুহাপথ—খুবই দ্রুত কাজ সারতে হবে অন্তত ফিলের ব্যস্ততা দেখে তাও টের পাচ্ছেন।

তাঁকে ফিল নানা কথা বলে আশ্বস্ত করছে—নতুবা ফিলকে অনুসরণ করারও ক্ষমতা থাকত না। টুং টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। পাথরের দেয়াল ভেদ করে এই শব্দ কোথা থেকে বের হয়ে আসছে, কখনও ঝম ঝম, যেন নৃত্য করছে কেউ, পাথরের গভীর থেকে গভীরে, কখনও বাসন ঝনঝন করে পড়ে যাবার মতো শব্দ। সামনে শুধু লম্ফর আলোতে টের পাচ্ছেন, মাথা নুয়ে না ছুটলে, দেয়ালে মাথা ঠেকে যেতে পারে—ফিল তাঁকে নিয়ে অজস্র গালিঘুঁজি পার হয়ে যাচ্ছিল। ইঁদুরের গর্তের মতো আঁকাবাঁকা, কোথাও জল ঝমঝম করে তোড়ে নেমে আসছে। জুতো জামা সব ভিজে যাচ্ছিল। তারপর বেশ প্রশস্ত পথ। দেয়াল অনেক উঁচু, এবং কোনও বিশাল বারান্দার মতো মনে হচ্ছে। পাথরের গা থেকে প্রস্রবণ ধারা—জল পাথরে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। আর তার ভিতর থেকে ফিলের

বিশ্বস্ত অনুচরেরা ডুবে ডুবে কি তুলে আনছে। আর যা দেখলেন—তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—বেশ কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা এবং দুটো ছোট হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল পাথর। মুখার্জি জানেন না—এইগুলি নিছক পাথরই না অমূল্য রত্নরাজি।

এ-ভাবে আরও পাঁচ সাতটি জলপ্রপাতের ভিতর গিয়ে তার অনুচরেরা জলে ডুবে যাচ্ছে। ভেসে উঠছে—পাথরে গলিঘুঁজি অজস্র। কোনওটায় ইঁদুরের মতো ঢুকে যাচ্ছেন, ইঁদুরের মতো বের হয়ে আসছেন। ফিল নির্লিপ্ত। একটি কথাও বলছে না। ঈশ্বরের মহিমা টের পেলে, মানুষের মুখে যে প্রশান্তি জেগে ওঠে, ফিলের মুখে সেই প্রশান্তি। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে বটে, তবে কোনও কথা না। এমনকি তাঁর দু'জন অনুচরের মুখেও আহ্লাদে আটখানা ভাব নেই। নিছক কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকার মতো হাবভাব।

বার বার ফিল ঘড়ি দেখছে কেন?

মুখার্জি আর না বলে পারলেন না, 'ফিল আমি কিছু বুঝছি না। তুমি কি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ?'

'গুপ্তধন! না না। তারপরই কেমন প্রার্থনার ভঙ্গিতে ফিল বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করছে—মাই লর্ড, মাই হোলি ওয়ান, ইউ হু আর ইটারনেল।'

না, কিছু বুঝছেন না! জনশ্রুতির ল্যাজা মুড়ো এক করা যায় না, মুখার্জি না ভেবে পারছিলেন না—সেই গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে বিশাল সব সমুদ্রদানব। কত জাহাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কত নাবিক হারিয়ে গেছে। রক্তমাংসে সমুদ্রের জল লাল হয়ে গেছে, জাহাজ হারিয়ে গেছে কোনও এক অদৃশ্য অশুভ প্রভাবে—এমন সব জনশ্রুতির পেছনে তবে কি এই পিরামিড সদৃশ জলের অভ্যন্তরে গোপন করে রাখা পাহাড়টি সি-ডেভিল লুকেনারের। তাঁর শরীর ঝিমঝিম করছে ভাবতে গিয়ে। অজস্র ফোকর দেয়ালে। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কোনও মুদ্রার গড়িয়ে যাওয়ার ধ্বনি। কোনও প্রশ্ন করার ক্ষমতাও মুখার্জির ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

যখন তাঁরা ফিরে এলেন, গুহাপথের মুখে, জল তখন যেন কিছুটা বেড়েছে। মুদ্রাগুলি কার কাছে তারও যেন কোনও সতর্কতা নেই। ফিলের এত সব বিশ্বস্ত মানুষদের দেখেও অবাক। সেই মানুষটি, যার হাতে ক্ষুদ্র একটি হলুদ রঙের জাল এবং যে আগে আগে যায় জালটি জলে ভাসিয়ে—যার ভিতর সাঁতার কেটে বেড়ায় নিযাক্ত স্টোন ফিস—

তারই বা এত কি মহিমা তিনি বুঝতে পারছেন না।

বোধ হয় জোয়ার শুরু হয়ে গেছে।

বোঝাই যায়, ঘোড়ার প্রায় পেটের কাছে জল উঠে এসেছে। দরকারে লাফিয়ে সমুদ্রে পড়ে যেতেও হতে পারে। সাঁতরে সমুদ্র পার হওয়ার দরকার হতে পারে—কিন্তু এতই প্রবল জোয়ার ভাটার হিসাব যে পাড়ে উঠে না এলে মুখার্জি টের পেতেন না। জলের গুম গুম আওয়াজ ভেসে আসছে। অজস্র দ্বীপ ভাসিয়ে জোয়ারের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে—এ এক যেন কোনও জাদুকরের দেশ থেকে উঠে আসা।

ফিল এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক—তারা কথাবার্তা শুনে এটা টের পেলেন মুখার্জি।

'তা হলে মুখার্জি, কি বুঝলে?'

'কিছু না।'

'ঠিক কিছু অনুমান করতে পারছ!'

'না, না, আমি কিছু অনুমান করতে পারছি না। নিনামুর এদিকে এস। ব্যাগটি কোথায় রাখলে! যেন এতক্ষণে মুখার্জি তাঁর জাহাজের দুর্দৈবের কথা মনে করতে পারছেন। ফিলের সঙ্গে তাঁর যে জরুরি দরকার।

'সকালে এলে না কেন?'

'ফিল, তোমার প্রাসাদে ফিরতে কি সকাল হয়ে যাবে?'

'কেন? যখনই ফিরি না কেন—তোমার কি তাড়া আছে?'

'না তাড়া নেই, তবে দেরিও করতে পারব না। তুমি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছ?'

গুপ্তধন বলছ কেন! আমার কাছে এটা তাঁরই ইচ্ছে। দ্বীপগুলি দেখে বুঝছ না। তিনি না দিলে কোথায় পেতাম। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে গুপ্তধন ভাবাই স্বাভাবিক। বোসো। নিনামুর। তিনি নিনামুরকে ডাকলেন, বললেন, দ্যাখ কি পাওয়া গেছে, ওগুলো নিয়ে চলে যাও। আমরা সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পরে রওনা হচ্ছি। কফি হোক মুখার্জি। এত চুপচাপ কেন বল তো! এবারে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ?

মুখার্জি ভাবলেন, আরও কি হয়ে যাই দ্যাখো! তবে বললেন না। শুধু বললেন, 'হাঙরের ঝাঁকের ভিতর দিয়ে এ-ভাবে যাওয়া যায়, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন। তুমি কি কোনও জাদু জানো?'

'তা জাদু বলতে পার। স্টোন ফিসের জাদু। বিষাক্ত গাছটি জলের তলায় ঘোরাঘুরি করলে হাঙরেরা পালাতে থাকে। মাছটার গা থেকে লালা ছড়িয়ে পড়ে। অস্বাভাবিক সেই লালার গন্ধে পাগল হয়ে যায় হাঙরেরা। মৃত্যু ভয় তাড়া করে তাদের।'

'কিন্তু এত কম জলে!'

'কম কোথায়। সাত আটশ ফুট খাড়া প্রবাল প্রাচীরটি দুটো দ্বীপের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেছে। যে জানে, সে জানে।'

'মনে হয় তুমিই রাস্তাটা আবিষ্কার করেছ?'

'ডুবুরিদের অনেক কিছু জানতে হয়। অভিজ্ঞতাও মানুষকে কত কিছু যে শেখায়।'

'তা হলে তুমি ডাইভার?'

'বলতে পার।'

'ফিল, অকপট হও।'

'তোমার সঙ্গে কবে অকপট ছিলাম না!'

'ফিল, তুমিই ফিলিপ?'

'ফিলিপ বলে কেউ কেউ জানে।'

'তবে তুমিই কি কলিজ জাহাজের কিপার অফ দ্য রেক?'

'ইয়েস। প্রেসিডেন্ট কলিজ। জান মুখার্জি, মানুষ যখন শুধু নিজেকে ভালবাসে তখন তার নানা আতঙ্ক থাকে। মানুষ যখন সবাইকে ভালবাস, গাছ ফুল পাখি কীট পতঙ্গ তখন তার নিজেকে নিয়ে আর ভয় থাকে না। তুমি আর কি জানতে চাও। সেই ভাস্কর্যটির

কথা! আমি জানি, তুমি কেন দুই গ্রিক নারীমূর্তি দেখে আঁতকে উঠেছিলে! কলিজ জাহাজ থেকে ওটি আমি তুলে এনেছি। এর মূল্য স্থির করা কঠিন। এথেন্সের বিখ্যাত ভাস্কর অ্যাপোলোনিয়াসের তৈরি। যুদ্ধ বিগ্রহে গ্রিক ভাস্করদের কত অমূল্য ভাস্কর্য যে নষ্ট হয়েছে—চুরি গেছে, লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে তার খবরই কেউ রাখে না। ছবিটির নীচে তার নাম খোদাই করা আছে। নাও কফি খাও। তোমার মুখ ব্যাজার দেখলে এত খারাপ লাগে! সকালে এলে না, কি যে খারাপ লাগছিল—এত করে বললাম, দু-একদিন থাকো, ঘুরে দেখাই সব। তোমার সময়ই হচ্ছে না।'

উনত্রিশ

সকালেই জাহাজে খবর রটে গেল, চার্লি নিখোঁজ। চার্লিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাপ্তানবয় হন হন করে হাঁটছেন। কাপ্তান, চিফমেট নেমে আসছেন বোটডেক থেকে।

সবার এক প্রশ্ন, জাহাজে এ কি অরাজকতা শুরু হল।

বোটে মাস্তার পড়ে গেল। কাজকাম ফেলে সবাই বোটডেকে হাজির। সেকেন্ড মেটের হুকুম, কিনারার কোনও লোক জাহাজে উঠবে না। জাহাজে মাল ওঠানামার কাজ বন্ধ।

টাগবোটগুলি ফিরে যাচ্ছে।

যারা উঠে এসেছিল, তাদেরও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুহাস অস্থির হয়ে উঠছে। মাস্তারে সে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, না দাঁড়িয়ে উপায় নেই—কাপ্তানের হুকুম, সে কি করবে বুঝতে পারছে না—চার্লির তো এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা না!

তবে চার্লি ভাল ছিল না।

ভাল আর কবে ছিল!

রাতে সে একবার কেবিনে নক করলে দরজা খুলে উঁকি দিয়েছিল চার্লি। চোখ মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। দেখলে ভয় হবার কথা। দরজা খুলে তাকে ভিতরে ঢোকার রাস্তাও করে দিয়েছিল। চার্লির ঘরে পর পর কটা অদ্ভুত ছবি টাঙানো। মনে হয় সে সারা বিকেল সন্ধে ছবিগুলি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অন্যদিনের মতো ছবিগুলি দেখে সুহাসের কোনও মন্তব্যও সে যেন আশা করেনি। তাকে দেখে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, কথা বলতে গেলেই চার্লির গলা ধরে যাচ্ছে।

'কি হয়েছে, বলবে তো!'

'কিচ্ছু হয়নি।'

'তোমার বাবা এখনও ফেরেননি?'

'না। ফিরবেন, সময় হলে ফিরবেন।' কাটা কাটা কথা।

'কিছু ভাল লাগছিল না, মুখার্জিদা ফিলের কাছে গেছেন। দ্বীপের রাস্তাঘাটও তো ভাল না। চিন্তা হয় না বলো! তোমাকে খবরটা দিতে এলাম। মনে হয় মুখার্জিদা আততায়ীকে এবার ঠিক কব্জা করতে পারবেন।'

কোনও কথা শোনার যেন চার্লির কোনও আগ্রহ নেই।

এত রাতে বোটডেকে গিয়ে সুহাস অন্যায় করেছে। চার্লির কথাবার্তায় ক্ষোভের আভাস ছিল।

'তোমার কোনও শিক্ষা হবে না দেখছি। কেন আসো! আর আসবে না। এত রাতে বোটডেকে কখনও আসবে না।'

'ঠিক আছে। আসব না।' বলে দরজা খুলে বের হতে চাইলে চার্লি খপ করে হাত ধরে ফেলেছিল। তারপর নানা কথা—একেবারে স্বাভাবিক। সে খেয়েছে কি না জানতে চেয়েছে। মুখার্জি ঠিক ফিরে আসবেন—ভেবো না, এই বলে আশ্বস্ত করেছে। বলেছে, ইট হ্যাজ বিন মাই জয় টু লার্ন দ্য ডাইভারসিটি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স। নিউ মেক্সিকোর ডগউড, ভারজিনিয়ার রডোডেনড্রেন, নিউ ইংলন্ডের ব্লু ফ্ল্যাগস থেকে প্রেইরির গোল্ডেন রড কিছুই বাদ ছিল না।

হেসে বলেছিল, 'আই অ্যাম নট এ বোটানিস্ট—আই অ্যাম জাস্ট অ্যান এনজয়ার। তবে জানো কোনও বন্য প্রান্তরে ঢুকলেই, আই ফিল এ সেনস অফ আরজেনসি। কি বলো সবারই দরকার না—জীবনের চারপাশে থাকুক কোনও সুন্দর ল্যান্ডস্কেপস। সবুজ গাছপালা জীবনে কত দরকার তাই না! ইফ উই ডোন্ট, উই মাইট ফরফিট হিজ প্রেসাস হেরিটেজ।'

সে বলেছিল, 'উঠছি।'

'আরে বোসো না! জানো আমার ঠাকুরদার খুব আক্ষেপ—বিশ হাজার রকমের বুনো ফুলের মধ্যে তার নাকি সংগ্রহ ছিল মাত্র দু হাজার আটশোর কিছু বেশি। জানো টেকসাসেই পাঁচ হাজার রকমের বুনো ফুল আছে। ঠাকুরদা কি বলতেন জানো, উই লিভ ইন দ্য শ্যাডো অফ ডিজাস্টার। তিনি জানো, জন মুরের খুব ভক্ত।'

'জন মুর? সে কে?'

'জন মুরের নাম জানো না—দ্য ফার্স্ট গ্রেট আমেরিকান অ্যাডভোকেট ফর ওয়াইলডারনেস। ভেরি পপুলার রাইটার অ্যান্ড ন্যাচারেলিস্ট। ও সুহাস, আমি যদি ক্যাডো লেকে ফিরে যেতে পারতাম—সঙ্গে তুমি—দারুণ। দারুণ মজা হত। সেই মেয়েটা কথা নেই বার্তা নেই নিখোঁজ!

মাস্তারে সবার সঙ্গে সেও দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সুরঞ্জন, অধীর। সবার মুখ গম্ভীর। সুরঞ্জন মাঝে মাঝে তার কাঁধে হাত রেখে যেন সাহস দিয়ে যাচ্ছে। এ-সময় ভেঙে পড়লে চলবে না সুহাস। চার্লি কোথায় যেতে পারে? চার্লিকে কিডন্যাপ করা হয়নি কে বলবে! কাপ্তানের চাতুরি হতে পারে। তিনি জানেন, তার সর্বস্ব গেছে। ডরোথি ক্যারিকোর গুপ্তধন গেছে, মুখার্জিদার ইনস্টিংক্ট প্রবল। না হলে, তিনি কিপার অফ দি রেকের কাছে ছুটে যাবেন কেন। কাপ্তান দ্যাখ আরও কি চাল চালে। ভেঙে পড়িস না।'

তারা কেউ নড়তে চারছে না। হুকুম না হলে বোটডেক থেকে কারো নেমে যাবার সাধ্য নেই। সবারই মুখ চুন। দু লাইনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ডেক আর ইনজিন জাহাজিরা। দুই সারেঙ চিন্তিত মুখে পায়চারি করছেন। কাপ্তান চিফমেট নেমে গেলেন কখন। তারা পিছিয়ে গেছেন কাপ্তানের সঙ্গে চিফমেট সেকেন্ডমেট থার্ডমেটও নেমে গেছেন। ওদের

মাস্তারে, দাঁড় করিয়ে রেখে চার্লিকে তারা বোধ হয় জাহাজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অমীয় বলল, 'বংশী কোথায়?'

তারপরই দেখা গেল বংশী লাইন ছেড়ে দিয়ে উইন্ডসহোলে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আছে এই যথেষ্ট। বংশী, সারেঙ টিন্ডাল এমনকি মুখার্জিদাকেও আজকাল পাত্তা দিচ্ছে না। কাপ্তান চিফমেট সবাইকে তারা নিগ্রহের কারণ ভাবছে। বংশী আসায় সুরঞ্জন কিছুটা নিশ্চিন্ত।

শুধু তাদের একজন মাস্তারে নেই।

মুখার্জিদা।

কাপ্তান নাম ডাকতে পারেন। কাজের সময় জাহাজ ছেড়ে যাবার হুকুম নেই। কাজ থেকে ছুটি মিললে যে যেখানে খুশি যেতে পার, ময়ফেলও করতে পারে, কোনও রমণীকে নিয়ে তখন জাহাজে উঠে এলেও দোষের না—কিন্তু কাজের সময় জাহাজে মুখার্জি নেই কেন? কাপ্তান এমন অভিযোগ অনায়াসে তুলতে পারেন। কোথায় গেল! খোঁজো তাকে। সেই নরাধম—যদি কাপ্তান অভিযোগ করেন, চার্লিকে তিনিই কিডন্যাপ করেছেন।

সুরঞ্জন বলল, 'মুখার্জিদা কখন ফিরবেন, কিছু বলে গেছেন তোকে!' যদি সুহাস কিছু বলতে পারে।

সুহাস ভাল নেই। কে ফিরল, না ফিরল তা নিয়েও তার মাথা ব্যথা নেই। সে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই আছে। সে কারো কথাই মনে করতে পারছে না।

সারা জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কাপ্তান। চার্লি গেল কোথায়! থার্ডমেট সঙ্গে। হাতে এক গোছা চাবি। কেবিনগুলি খুলছেন, বন্ধ করছেন। ইনজিনরুমে নেমে গেলেন। টর্চ জ্বেলে দেখলেন। স্টোকোল্ডে ঢুকে গেছেন। কয়লার বাঙ্কারে। না, চার্লি জাহাজের কোথাও লুকিয়ে নেই।

তিনি শেষে বোটডেকে উঠে সব অফিসার ইনজিনিয়ারদেরও মাস্তারে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

সবাই হাজির।

তিনি যে খুবই ব্যাকুল তার চলাফেরাতে টের পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তার মাথাতেও বোধ হয় কিছু নেই—কোথায় থাকতে পারে চার্লি, এমনও ভাবতে পারেন। বিচলিত এবং অস্থির হয়ে পড়লে যা হয়—ছুটে যাচ্ছেন চার্লির কেবিনে, আবার দরজা টেনে চলে আসছেন—ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন বোঝা যায়। এবার সবার নাম ধরে ডাকছেন—জাহাজে কে আছে কে নেই!

দেখা গেল, মুখার্জি নেই।

চিৎকার করে ডাকলেন, 'ডেকসারেঙ!'

ডেকসারেঙ ছুটে গেলেন, 'গুড মর্ণিং হুজুর।'

'কোথায় মুখার্জি?'

তিনি জানেন, মুখার্জি কিনারায় গেছেন। রাতে ফিরবেন না বলে গেছেন। সুতরাং মুখার্জিদা জাহাজে নেই কিনারায় গেছে, রাতে ফেরেননি! এর চেয়ে বেশি কিছু জানেনই

না।

'কোথায় গেছে?'

'কথা আছে তো হুজুর হরসাগামে যাবে। তারপর কোথায় গেছে জানি না।' ডেকসারেঙ ভয়ে কাঁপছেন। অভিযোগ তার বিরুদ্ধেও উঠতে পারে—তুমি ডেকসারেঙ, জানবে না, কে কোথায় গেছে, কখন ফিরবে। জাহাজে কাম কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেলেছ, এমন বেআইনি কাজ হয় কি করে!

'কোথায় তার ডিউটি। কখন তার ডিউটি।'

'রাতে। গ্যাঙওয়েতে।' সারেঙসাব রীতিমতো নার্ভাস। কারণ কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করলেন।

'তার মানে, রাতে কেউ তবে গ্যাঙওয়েতে পাহারায় ছিল না। কে নেমে গেল, উঠে এল হিসাব নেই!' তিনি চিৎকার করে করে উঠলেন, দু হাত উপরে তুলে, আই নিড ইয়োর হেল্প।' সারেঙকে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন, 'কি করতে আছে জাহাজে! কেন আছ? চার্লি কোথায় জবাব দাও। কে তাকে অপহরণ করেছে জবাব দাও!'

সুহাসের দিকে এগিয়ে আসছেন তিনি—শীতল চোখ তার, মৃত মানুষের মতো চোখ, সাদা ঘোলাটে, তিনি এগিয়ে আসছেন! সুহাস হতবুদ্ধি। তার মনে হচ্ছিল দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

সুরঞ্জন বলল, 'শালা যত্তসব নাটক। চার্লি জারজ সন্তান—না হলে জাহাজ ছেড়ে পালায়। কথা রাখে না! কার সঙ্গে পালাল! কাপ্তান কি ভেবেছে! এই তোর সুহাস, আই অ্যাম এলঙ উইথ ইয়ো, ইভিন টু দি এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড। সবই দেখছি নাটক। কার কথা বিশ্বাস করব! জারজ সন্তান না হলে এত বড় নাটক করতে পারে না। শেষে আমাদের ফাঁসিয়ে গেল। হারামজাদি ইতর মেয়েছেলে!'

সুহাস আর পারছে না। সে সুরঞ্জনকেই ঘুসি মেরে বসল।

'খবরদার চার্লিকে অসম্মান করলে মেরেই ফেলব।'

আরে করছে কি ছোঁড়া। হাতাহাতি। তাও খোদ কাপ্তানের সামনে! মাথাটি গেছে, কিচ্ছু নেই। নিজের পরিণামের কথাও ভাবছে না। ছোঁড়া যে মরবে।

সব জাহাজিরা প্রায় ছুটে যাবে ভাবছিল। কাপ্তান সুহাসের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। জুতোর গট গট শব্দ উঠছে। পুরো ইউনিফরম পরা। কতটা বিভীষিকা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। জাহাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করছে না। ইনজিন সারেঙ খুবই বিব্রত বোধ করছেন। সুরঞ্জন ঘুসি হজম করে গেছে। কারণ সে তো জানে, চার্লির কোনও নিন্দেমন্দ সহ্য করার ক্ষমতা সুহাসের নেই। চার্লি নিখোঁজ আর তখন সে চার্লিকে কুৎসিত কথা বলে অপমান করেছে! লাইনের শেষ মাথায় বলে তার কথা কারো কানে যাবার কথা না। সুহাস এক ঘুসি মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে ইচ্ছে করলে চার্লির সম্মান রক্ষার্থে গোটা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

সুরঞ্জনের কোনও অভিযোগ নেই। সে রাগও করেনি—তার উচিত হয়নি এভাবে সব না জেনেশুনে চার্লিকে খাটো করে দেখা। সুহাস না পাগল হয়ে যায়। হয়নি কে

বলবে।

তখনই সুহাসের সামনে চিৎকার—'হাই।'

সুহাস মাথা তুলে একবার শুধু সোজাসুজি তাকাল। তারপর মাথা নামিয়ে নিল।

'চার্লি কোথায়?'

'জানি না।'

'জান। আমি বলছি জান। ইউ নো।'

'জানি না, জানি না।' সুহাস চিৎকার করে উঠল।

'মিছে কথা। সব কটাকে দড়িতে ঝোলাব। আনসার মি সে কোথায়? চার্লির ঘরে রাতে ঢুকে কি করছিলে! আনসার মি। সে কিছু বলেছে তোমাকে?'

'বলেছে।'

'কি বলেছে?'

'জীবনের চারপাশে থাকুক সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। সে গাছপালা ভালবাসে। বলেছে ইট হ্যজ বিন হার জয় টু লার্ন দ্য ডাইভারসিটি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স। সে ফুল ভালবাসে। সে গাছের সঙ্গে, পাহাড়ের সঙ্গে, নদীর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। বনজঙ্গলে তার ঘুরে বেড়ানো নেশা। বলেছে, শি ইজ ওনলি এনজয়ার! কোনও বন্য প্রান্তরে ঢুকলেই শি ফিলস এ সেনস্ অফ আরজেনসি।'

'হোয়াট!'

'ইয়েস, শি ইজ ওনলি এনজয়ার।'

'ইউ হেল, শি ইজ ওনলি এনজয়ার।'

'ইয়েস স্যার শি ইজ...' নট হি।

কাপ্তানের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জোঁকের মুখে নুন ঢেলে দেবার মতো সবাই দেখল তিনি গুটিয়ে গেছেন। তাঁর যেন হেঁটে যাবারও ক্ষমতা নেই। একজন নেটিভের এত আস্পর্ধা তিনি কিছুতেই হজম করতে পারছেন না। শি, নট হি! সব জাহাজিদেরই মনে হল সুহাসের দুঃসাহসই বলতে হবে। কাপ্তানের বাচ্চাটি যে পুত্র নয়, কন্যা—শি বলে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই তাকে দিয়ে হি বলাতে পারেনি। মুখেমুখে তর্ক। কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে এ-ভাবে মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা রাখে সুহাস, সুরঞ্জনও বিশ্বাস করতে পারছে না। সিঁড়ি ধরে কোনওরকমে যেন ব্রিজে উঠে যাচ্ছেন কাপ্তান।

অভয় দেবার জন্য সুহাসের কাঁধে ফের হাত রাখল সুরঞ্জন।

সুহাস কাঁধ থেকে সুরঞ্জনের হাত নামিয়ে দিল। সে যেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চার্লি নিরুপায় না হলে জাহাজ ছেড়ে পালাত না। কোথায় কোন বনজঙ্গলে হারিয়ে যাবে—ইস, সে যদি তখন চার্লির কথার সামান্য গুরুত্ব দিত। চার্লির এমনিতেই বনজঙ্গলের নেশা আছে। একবার বুনো ফুলের জঙ্গলে, কিংবা আখের জঙ্গলে ঢুকে গেলে তাকে নড়ানো যেত না। আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফট অফ মাই চাইল্ডহুড। কত কথা বলত। তাকে যেন হাত পা বেঁধে জাহাজে ফেলে রাখা হয়েছে। বনজঙ্গলের ভিতর চার্লির স্বাভাবিক সৌন্দর্য কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার চোখ ফেটে জল বের

হয়ে আসছে।

তখনই কাপ্তান আবার নেমে আসছেন ব্রিজ থেকে। তাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। জাহাজিদের সামনে এতটা বিচলিত হয়ে পড়া বোধ হয় তাঁর ঠিক উচিত হয়নি। ব্রিজে উঠে গেলেই চারপাশের কিনার। বনজঙ্গল পাহাড় চোখে পড়ায় তিনি নিজেকে হয়তো সামলে নিতে পেরেছেন।

চিফ্‌মেট হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, রেডিও অফিসার মাস্তারে আসেনি। সে কোথায়।

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার দৌড়ে গেল।

'উইলিয়াম কোথায়!' খুঁজছে।

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখলেন—সত্যি তো উইলিয়াম আসেনি। ভাগ্যিস কাপ্তানের চোখে পড়েনি। উইলিয়াম কি জানে না, বোটডেকে মাস্তার দেবার হুকুম হয়েছে! আত্মকেন্দ্রিক হলে যা হয়। জাহাজে কারো সঙ্গে মেশে না—কথা বলে না। যতটুকু দরকার, তার বেশি না। সে হয়তো খবরই রাখে না। তিনি চিমনি পার হয়ে ট্রান্সমিশান রুমের দিকে গেলেন। তারপর কেবিনে—কেবিনের দরজা বন্ধ। ডাকলেন, 'উইলিয়াম কি করছ! এই উইলিয়াম।'

সাড়া নেই।

জোরে দরজা ধাক্কালেন।

না সাড়া নেই। সেকেন্ড আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে ছুটে এলেন। চিফকে বললেন, 'দরজা বন্ধ—উইলিয়াম বোধ হয় কেবিনে নেই।'

মাস্তারে রেডিয়ো অফিসার আসেননি। এবার সব জাহাজিদেরই নজরে পড়ল—মার্কনিসাব মাস্তারে আসেননি। কেন মার্কনিসাব এলেন না—কোথায় তিনি—এবং কাপ্তানের কাছে খবর যেতেই থার্ডমেটকে সঙ্গে নিয়ে কেবিনে গেলেন। ডুপ্লিকেট চাবির গোছা থেকে নম্বর মিলিয়ে থার্ডমেট চাবি বের করতেও যেন পারছিলেন না! 'ইয়ো পুওর ডেভিল—' বলে কাপ্তান কেড়ে নিলেন চাবির গোছা। চাবি খুঁজে দরজার লক আলগা করতেই দেখলেন, না কেউ নেই। সবার ধারণা—মার্কনিসাব যদি কিছু একটা করে বসেন। কাপ্তান দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলেন—জাহাজিরা মাস্তার ভেঙে ছুটে আসছে। এখন যা পরিস্থিতি, কার কখন কপালে কি ঘটবে কেউ যেন বলতে পারে না। চিফ মেটের ধমক খেয়ে সবাই থমকে গেল।

মার্কনিসাব ট্রান্সমিশান রুমে নেই। কেবিনে নেই। কোথায় গেল। তিনি কিনারায়ও নামেন না।

আবার তোলপাড়। বোটের মাস্তার ডিসমিস করে দেওয়া হয়েছে। জাহাজিরা যে যার মতো ভেবে নিচ্ছে। কিন্নারার আকর্ষণে বন্দরে জাহাজ ভিড়লে যখন তখন জাহাজিরা নেমে যায়। মার্কনিসাব আর.চার্লি দু'জনে মিলেই তবে ভেগেছে। কাপ্তানের পুত্রটির চরিত্র-দোষও আছে। কারণ তারা দেখেছে, বন্দর এলে সুহাসকে নিয়ে খারাপ জায়গায় যেত।

কত যে গুজব চাউর হয়ে যেতে থাকল।

অধীর বলল, 'আপনি জানেন, চার্লি সুহাসকে নিয়ে খারাপ জায়গায় গেছে?'

দু নম্বর সুখানি বলল, 'দ্যাখ বাবু, জাহাজে কাজ করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেল। সব বুঝি। বন্দর এলে রোজ নেমে যাবার নেশা কেন বোঝো না। কিসের নেশা। জাহাজিরা পাগল হয় কিসের নেশায়। সুহাসকে কত বারণ করেছি, বাপজি যাস না। গোরাদের সঙ্গে মিশিস না। জাত ধর্ম আছে! যা পায় তাই খায়। জন্মের ঠিক আছে গোরাদের! আমরা জানি না মনে করো। বিধর্মী, বেজাত, মা বোন মানে না—তার সঙ্গে তুই মিশে গোল্লায় যাচ্ছিস। মুখার্জিবাবুকে পই পই করে বলেছি, বাঙালিবাবুকে সামলান—শেষে কি আকাম কুকাম করে বসবে। শত হলেও বয়সের দোষ বোঝেন না। কে শোনে কার কথা! কাপ্তানের ব্যাটা কার পাল্লায় পড়ে দ্যাখো দেশান্তরী হয়েছে।'

অধীর বুঝল, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আর এ সময় বংশীর উদয়—সে পা টিপে টিপে হাঁটছে। পিছিলে উঠে আসার সময় সিঁড়ির রেলিঙ ঝাঁকিয়ে দেখছে—নড়বড়ে রেলিঙে হাত রেখে উঠতে গিয়ে যদি জখম হয়। এমন কি সিঁড়িও ভাঙছে পা টিপে টিপে! সে কেবল বলছে, 'ভাল না, কিছুই ভাল না। বলা যায় না কোথায় কে কখন হাপিজ হয়ে যাবে! আসলে জাহাজে হাপিজের পালা শুরু। শয়তান জাহাজটারই কাজ। গিলে খাচ্ছে। চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। কি মজা! বুড়া জানে দাঁত উঠেছে, কারে খায়, কে যায় দ্যাখো। সুহাস দেখছি বেপরোয়া—আরে তুই শয়তানের পাল্লায় পড়ে গেছিস! তোকে ইনজিন রুমের ট্যাঙ্কে কে চুবিয়েছে! তোরা মনে করিস আমরা কানা! আমার চোখকে ফাঁকি দেয় কোন শালা। হজম করতে পারল না, কাপ্তানের ব্যাটা ইনজিন রুমে নেমে গেল। হজম হয়ে গেল নিজেই।

বংশীর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে রোজ ধূপধুনো দিচ্ছে। যে কোনওভাবে এ-যাত্রা রক্ষা পেলে সে আর যে জাহাজে উঠছে না, বার বার কসম খেয়েছে। সুতরাং অধীর নেমে গেল নীচে। সুরঞ্জন সুহাসকে নিয়ে আগেই নীচে নেমে গেছে। চার্লি শেষে মার্কনিসাবের সঙ্গে ভেগে গেল! তার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

সে নেমে দেখল, সুহাস মুখার্জিদার বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছে। সুরঞ্জন পাশের বাঙ্কে দু হাতে মাথা রেখে বসে আছে। মুখার্জিদা না থাকলে কত অসহায় তারা, দুজনের বসে থাকা, শুয়ে থাকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। চার্লি আর মার্কনিসাবকে নিয়ে নানা কথারও ওড়াউড়ি।

সুহাস উঠে দরজা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়ল। বাইরের ওড়াউড়ি কথাবার্তা সে সহ্য করতে পারছে না। চার্লির রহস্যময় অন্তর্ধানের হেতু কি সে! চার্লি কি বুঝেছিল, জাহাজে থাকলে তার নিগ্রহ বাড়বে। সে না থাকলে, সুহাসের ক্ষতি করার কেউ চেষ্টা করবে না। সুহাসকে বাঁচাবার জনাই কি চার্লি নিখোঁজ হয়ে গেল! না এটা অপহরণ! মার্কনিসাব চার্লিকে অপহরণ করে ভেগে গেলেন।

চার্লিকে নিয়ে জাহাজের রহস্যটাও বোঝা যাচ্ছে না—সুহাস উঠে বসল। জামা গায়ে দিল, প্যান্ট পরল। জুতো পরার সময় সুরঞ্জন আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'জামা প্যান্ট জুতো পরে কোথায় বের হচ্ছিস?'

'দেখি কোথায় যাওয়া যায়।'

আর তখনই মনে হল, সিঁড়ি ধরে কেউ নেমে আসছে। কে! মুখ বাড়িয়ে অধীর দেখল সারেঙসাব। তাঁর হাতে একটা লম্বা কাগজ। কাগজটা দেখিয়ে বললেন, 'কাপ্তানের হুকুম, সুহাসকে আটকে রাখতে হবে।' সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লা মুবারক। চিন্তা করিস না। আমি তো জানি তুই কোনও খারাপ কাজ করতে পারিস না। কাপ্তান, চিফমেট বাইরে নেমে গেছেন। মাদাঙে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ফাঁড়িতে যাবেন।'

সুহাস বসে পড়ল!

'আমি কি করেছি!'

'কি করেছিস জানি না। হুকুম তামিল করলাম। আমার কোনও কসুর নেই।'

আর তখনই কেন যে সুহাসের মনে হল, চার্লিকে কেউ জোরজার করে মোটরবোটে তুলে নিচ্ছে। তাকে নিয়ে দ্বীপ থেকে পালাচ্ছে। চার্লি পাগলের মতো যেন চিৎকার করছে। মার্কনিসাবের মুখও সে ভাল চেনে না। কেবল একটা অতিকায় বীভৎস মানুষের শরীর তার সামনে নাচানাচি করতে থাকল।

সে ভেঙে পড়ল, 'মুখার্জিদা চার্লিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি!'

অধীর সুরঞ্জন বলল, 'এত ভেঙে পড়লে চলে!' প্রিয়জন নিখোঁজ হয়ে গেলে দুর্ভাবনার শেষ থাকে না। শত্রুও যা ভাবতে পারে না, প্রিয়জনের জীবন আশঙ্কায় মনের মধ্যে তাও উঁকি দেয়। সুহাস সত্যি ভেঙে পড়েছে। জাহাজ থেকে যে নেমে যাবে, খোঁজাখুঁজি করবে তারও উপায় আর থাকল না।

সুহাস নিজের ফোকসাল ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। কাপ্তান কি পাগল হয়ে গেলেন! শেষে সুহাসকে তিনি সন্দেহ করছেন! সুহাস কখনও পারে—এতটা তার ক্ষমতা আছে! সুহাস চার্লিকে কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে একবার ভেবে দেখলেন না! সামান্য একজন জাহাজির কি ক্ষমতা তিনি তো ভালই জানেন।

কেন যে মুখার্জিদার উপর তার রাগ গিয়ে পড়ল—সুরঞ্জন বাঙ্কে থাপ্পর মেরে বলল, 'বোঝো এখন! চার্লি রহস্য উদ্ধারে গেলে—আর সেই চার্লিই নিখোঁজ। তাকে নিয়ে মার্কনিসাব ভেগে গেছে। অপহরণ, না ভাব ভালবাসা—কিছুই বুঝছি না।'

জাহাজে কাজকাম বন্ধ থাকলে যা হয়—সর্বত্র গুলতানি—চার্লিকে নিয়ে কারো দুর্ভাবনা নেই। উৎপাত গেছে—রক্ষা পাওয়া গেল, এমনও ভাবছে কেউ। কেউ দেশ বাড়ির গল্পে মেতে গেছে। জল্পনা-কল্পনারও শেষ নেই। এবারে কাপ্তান জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হবেন। তার তো আর কেউ থাকল না।

দুপুরের খাবার সুরঞ্জন নীচে নামিয়ে আনল। অধীর, কেষ্ট, সুরঞ্জন খাচ্ছে। সুহাসকে খাওয়ানো গেল না।

অধীর বলল, না খেলে চলবে! আর মুখার্জিদাই বা কিরকম। ফেরার নাম নেই! তারা বার বার উপরে উঠে রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেশি নৌকাগুলি দেখছে, মোটরবোটে যদি আসেন। কিনারার রাস্তায়ও চোখ গেছে। তবে মানুষজনের ভিড়ে এত দূর থেকে তাঁকে আলাদা করে চেনার সুযোগ কম।

কি যে তারা করে! সুহাস চুপচাপ পড়েই আছে। তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তারা বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে, ঘাবড়ে গেলে চলবে। দ্যাখ মুখার্জিদা কি খবর নিয়ে আসে। চার্লিরও প্রশংসা করছে। চার্লি তাকে আগলে রেখেছিল, চার্লি না থাকলে কি যে হত! আরে তুই বুঝছিস না, চার্লির তুই গ্লিটারিং সোর্ড। সোর্ডটি সে সহজে হাত ছাড়া করবে বলে মনে হয় না। নে ওঠ। খা। কত কথাই না বলছে তারা। সারেঙসাবকে বলাও যাচ্ছে না, দেখুন গে সুহাস কিচ্ছু মুখে দিচ্ছে না।

সারেঙসাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন।

'চার্লি তোর কে হয়! বল!' আবার বলতে পারেন, 'ভয় ধরে গেছে! চার্লি নেই, মার্কনিসাব নেই—আবার কে থাকবে না, এই আতঙ্ক! চার্লি ঠিক ফিরে আসবে। মার্কনিসাবও। কোথাও কিনারায় হয়তো বিনা নোটিসে নেমে গেছে। ঘাবড়ালে চলবে!'

বংশীর যেন পোয়াবারো। তার কথাই ঠিক। ভুতুড়ে জাহাজ। ঘরে ঘরে উঁকি দিচ্ছে। সঙ্গে লতিফ। দুজনেই বলছে, 'মুখার্জিবাবু মিছে কথা বলেছে। চাবি খোঁজা হচ্ছিল, বুঝছেন না মিঞারা সুহাসকে জাহাজের শয়তান ট্যাংকে ঢুকিয়ে মারতে চেয়েছিল। পারেনি। স্রেফ ধাপ্পা মুখার্জির। জানে বাঁচতে চান তো জাহাজ ছেড়ে দিন! চার্লি কেন পালাল বুঝছেন না! কোন আতঙ্কে মার্কনিসাব হাওয়া। অদৃশ্য সেই শয়তান লুকেনার। তার আতঙ্কে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে সব। বোটডেকে মধ্যরাতে নারী আসে কোত্থেকে! আহামদ বাটলার বরফ ঘরে লাশ দেখে কি করে। বলেন আপনারা! আবার কে নাকি এক বুড়ো মানুষ—বরফের মতো সাদা দাড়ি, মরা চোখ, মরা মানুষ হেঁটে বেড়ায় কখনও শুনেছেন, জাহাজে মরা মানুষও উঠে এসেছে। দিনের বেলায় ঘাপটি মেরে থাকে রাতে ঘুরে বেড়ায়। এই হারামজাদা মগড়া—বল, তুই তো জানিস।'

মগড়া ছুটে পালাল।

'না না, আমি কিছু জানি না। আমি কিছু দেখিনি!'

এই সব নানা উপদ্রবের মধ্যে মুখার্জি যখন জাহাজে উঠে এলেন, তখন প্রায় গভীর রাত।

আর তিনি ফিরতেই হল্লা। পিছিলে লোকজন জমে গেছে। কে আগে খবরটা দেবে। তাঁকে নীচে নামতে দিচ্ছে না—তাঁকে ঘিরে রেখেছে সবাই। যার যা খুশি বলে যাচ্ছে—কাপ্তান তাঁর খোঁজ করেছেন, সুহাস কাপ্তানের মুখে মুখে তর্ক করছে, মার্কনিসাব নিখোঁজ, চার্লি নিখোঁজ—সবাই এক এক করে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। প্রাণে বাঁচতে হলে তাদেরও জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে—না হলে রক্ষা নেই—ঘোঁট তবে ভালই পাকিয়েছে বংশী—।

মুখার্জিসাব সবাইকে আশ্বস্ত করলেন, 'ঠিক আছে, জাহাজ ছাড়তে চাও তো সবাই মিলে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

তিনি দেখলেন, ভিড়ের মধ্যে সুহাস সুরঞ্জন অধীর কেউ নেই। চার্লি নিখোঁজ—কেন? এ তো আর এক বিড়ম্বনা। মার্কনিসাবও নিখোঁজ। চার্লি রহস্য, কল্লিজ রহস্য, গুপ্তধন রহস্য—সবই যে তিনি জেনে এসেছেন। তার সব আনন্দ চার্লির নিখোঁজ হওয়ার খবরে

বৃথা হয়ে গেল। তিনি সহসা কেন যে ক্ষেপে গেলেন—'রাস্তা ছাড় বংশী। রাস্তা ছাড় বলছি। যা ঘরে যা। বাইরে ফের দেখেছি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। ঘোঁট পাকানো হচ্ছে!'

তার আর কথা বলতেও ভাল লাগছিল না। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন, সুহাস শুয়ে আছে। অধীর সুরঞ্জন সুহাসকে পাহারা দিচ্ছে।

মুখার্জি দরজা বন্ধ করে জামা প্যান্ট ছাড়লেন। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ফিরলেন। কারও সঙ্গে আর যেন একটা কথাও বলবেন না। বাঙ্কে বসে শুধু বললেন—'জাহাজে তবে সত্যি অরাজকতা শুরু হয়ে গেল।' সুরঞ্জনকে বললেন, 'সময় নেই, সংক্ষেপে বল।'

সুরঞ্জন যা জানে বলল, 'চার্লি হাওয়া। মার্কনিসাব হাওয়া।'

অধীরকে বললেন, 'তোর কি বলার আছে?'

অধীর যা জানে বলল।

সুহাসের দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না। তাকালেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। আরে তুই কি, এখন শুয়ে থাকার সময়! ঘর থেকে তোর বের হওয়া নিষেধ! কে মানে। লাথি মেরে ভেঙে দিতে পারলি না সব। শুয়ে আছিস! জলগ্রহণ করিসনি! তুই মানুষ। মেয়েটা কোথায়, কে নিয়ে ভেগে গেল, মার্কনিসাবের যে চক্রান্ত নয় কে বলবে। কত ধনসম্পদের মালিক চার্লি জানিস!

কিন্তু তিনি জানেন, মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই।

'বল সুহাস? তারপর।'

'চার্লি ফুলের কথা বলেছে।'

'আর কি বলেছে?'

'তার ঠাকুরদার কথা বলেছে। দেয়ালে ফের ছবি এঁকে ঝুলিয়ে রেখেছে।'

'থেমে গেলি কেন? তারপর, কুইক।'

'তারপর আর কিছু জানি না।'

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জি টর্চটা নিয়ে বোটডেকে ছুটলেন। সুটের মুখ পাটাতন ঢাকা আছে কি নেই, চার্লি সুটের মুখে ঝুঁকে এত কি দেখত! ঘর থেকে বের হবার সময়, সুরঞ্জন বলল, 'একা যাবে না।' বলে সে-ও উঠতে গেলে এক ধমক।

'ওখানে কি তামাসা। যাচ্ছি চুপচাপ। সঙ্গে যেতে চান।'

মুখার্জি উঠে যাবার সময় দেখলেন, এখনও জাহাজিরা অনেকে জেগে আছে। সবার মুখ ব্যাজার। কি যে হচ্ছে জাহাজে। টর্চটা আড়াল করে উঠে গেলেন। ডেকে উঠে দেখলেন, শুনশান। একটা পাখি পর্যন্ত মাস্তুলে বসে নেই। ফল্কাগুলি সব খোলা পড়ে আছে। এখানে সেখানে ফসফেট তোলার পিপে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জাহাজের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। এল্লিওয়েতে আলো জ্বলছে, কিন্তু কেউ হাঁটাহাঁটি করছে না। চিফকুকের গ্যালিতেও কেউ নেই। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে চার্লির দরজা খুলতেই অবাক। একের পর এক ছবি দেয়ালে। ছবিগুলি দেয়াল থেকে তুলে নিলেন। কাজে লাগতে পারে। একটা বান্ডিল বগলে নিয়ে বের হয়ে

এলেন। কেবিনের পাশেই উইন্ডসহোল, তার পাশে সুটের মুখ—সেই ছোট্ট পাটাতন। কয়লা ফেলার সময় পাটাতন তুলে নেওয়া হয়। তারপর খোলের তলায় বাঙ্কারগুলিতে কয়লা হুড়হুড় করে পড়তে থাকে।

তিনি খুব সন্তর্পণে কাজ সারছেন। টর্চ জ্বালতেই দেখলেন, ক'টা পেতলের ছোট বল যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পেতলের বলগুলি কুড়িয়ে নিলেন। পাটাতন বন্ধ। এবং সংশয় থেকেই তাঁর এই অনুসন্ধান। চার্লি কি শেষ পর্যন্ত! না ভাবতে পারছেন না। হাঁটু মুড়ে পাটাতন আলগা করে এক হাতে ধরে রাখলেন, ডান হাতে পকেট থেকে টর্চ বের করে বাঙ্কারের খাদে ফোকাস মারতেই শরীর হিম হয়ে গেল।

সুটের তলায় বিশ পঁচিশ ফুট গভীরে একটা লোক মরে পড়ে আছে। আরে এটা কি দেখছেন! কে যেন তার পাশে এসে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে সুটের মুখে। ঝুঁকে দেখছে।

'কে? কে?'

বংশী ছুটছে।

'আবার মরেছে, জাহাজে আবার মরেছে। জাহাজে আবার খুন।' সে ডেকে নেমে পাগলের মতো দু হাত তুলে ছুটতে গেলে মুখার্জি খপ করে তার চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। 'খবরদার, চিল্লাচিল্লি করবি তো ঘুসি মেরে সব কটা দাঁত খসিয়ে দেব। বাড়াবাড়ি করলে তোকেও খুন করে জাহাজে পুঁতে দেব।'

সুরঞ্জন আর অপেক্ষা করতে পারছে না। সুহাসও তাড়া লাগাচ্ছে, 'কোথায় ছুটে গেল দ্যাখ। কখন তো গেল! আসছে না কেন।' অধীরও পায়চারি করছিল। সিঁড়ি ধরে নেমে এলে বোঝা যাবে, সবাই সিঁড়িতে শব্দ শোনার অপেক্ষা করছে।

সুরঞ্জন বলল, 'যা না উপরে। গিয়ে দ্যাখ।''

'আমি পারব না। ভয় করছে।' ভয়ে কাঠ অধীর।

'তবে বোস এখানে। আসছি।' বলেই সুরঞ্জন ডেকে উঠে দেখল প্রায় শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ। মুখার্জিদা বংশীর চুল ধরে টেনে আনছেন। বংশী হাতে পায়ে ধরেও রেহাই পাচ্ছে না। 'লোক খেপানো হচ্ছে। আমাকে ফলো করা হচ্ছে। হতভাগা! কোনও আর কাজ নেই, আমার পেছনে লাগা। বল যা দেখেছিস, ভুলে যাবি। কাকপক্ষী টের পেলেও রেহাই নেই।'

সুরঞ্জনকে দেখে আরও ক্ষেপে গেলেন তিনি। 'আরে আমি তো যাচ্ছি। আমার পেছনে তোরা জোঁকের মতো লেগে আছিস!'

'তুমি বংশীকে নিয়ে পড়লে।'

মুখার্জি বংশীকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, যা। বেঁচে গেলি।' তারপর সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চল।'

এ-সময় আরও দু-চারজন জাহাজি বের হয়ে এসেছিল—'ওদিকে যেন কিসের গোলমাল!'

'কোথায়।' মুখার্জি স্রেফ ধোয়া তুলসিপাতা সেজে গেলেন। 'মিঞাসাবরা সবারই দেখছি এক দশা। তিল পড়ল তো তাল হয়ে গেল। গোলমাল ছাড়া কানে কিছু যাচ্ছে

'কে যেন এদিকটায় আবার মরেছে, জাহাজে আবার খুন, চিল্লাচ্ছিল!'

'এরকম শোনা যায়। যান নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন গে। আমি তো ডেকেই ছিলাম, কোথাও গোলমাল হলে টের পেতাম না!'

'তা অবশ্য ঠিক। কি যে হচ্ছে মুখার্জিবাবু। রাতে একা ডেকে উঠে আসতেও গা শির শির করে। কি সব হচ্ছে বলুন তো!'

মুখার্জিদা অদ্ভুত কথা বললেন, 'কিছু তো হচ্ছেই। না হলে গা শির শির করবে কেন। পোকা মাকড়ও তো হাঁটাহাঁটি করছে না যে গা শির শির করবে।'

কয়লার সুটে কেউ মরে পড়ে আছে—এটাই মুখার্জির সান্ত্বনা। সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মনে হল চার্লি নয় তো! চার্লিকে কেউ খুন করে ফেলে রাখেনি তো। জাহাজ থেকে দু'জন নিখোঁজ—চার্লি আর উইলিয়াম। দু'জনই, দুজনকে তাড়া করতে পারে। অথচ তাঁর কেন যে মনে হচ্ছিল, চার্লি শেষ পর্যন্ত তার দুরভিসন্ধি কাজে লাগাল। উইলিয়ামকে জালে জড়িয়ে সুটের গর্তে ফেলে দিল! মন প্রসন্ন ছিল, অন্তত চার্লির কিছু হয়নি ভেবে। চার্লির অভিসন্ধি তিনি ধরে ফেলেছেন বলেই তো ছুটে গিয়েছিলেন! উইলিয়ামের দরজায় পিস্তল নিয়ে হামলার পরই তো তাঁর মনে হয়েছে চার্লি তাকে ছেড়ে দেবে না। উল্টোটাও হতে পারে। অত উঁচু থেকে টর্চের আলোতে বোঝাও মুশকিল। তিনি কেমন দমে গেলেন। জোর পাচ্ছেন না। দু-রাত ধরে চোখের পাতা এক করতে পারেননি। শরীর আর দিচ্ছে না।

তবু তিনি ডেকে উঠে দম দিলেন। এখন একমাত্র উপায় গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে ঢুকে যাওয়া। গঙ্গাবাজুর বাঙ্কার ফাঁকা। তা না হলে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ শুরু হয়ে যেত। যমুনাবাজুর বয়লার চালু রাখা হয়েছে—যমুনাবাজুর বাঙ্কারে কোনও কোলবয় কয়লা ফেলছে—সে জানেই না গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারের সুটে একটা লোক মরে পড়ে আছে। জানলে জামাপ্যান্টও নষ্ট করে ফেলতে পারে। গভীর রাত, চার্লি নিখোঁজ, উইলিয়াম নিখোঁজ—কে জানে, স্টোকার আর কোলবয় ভয়ে জড়সড় হয়ে বয়লার রুমে বসে আছে কি না! তিনি সুরঞ্জনকে বললেন, 'তুই যা। আমি আসছি।'

'কি যে মাথায় থাকে। হঠাৎ হঠাৎ কি হয় তোমার বলো তো!'

'যা না! বললাম তো আসছি, তবে প্রশ্ন করতেই পারিস। তুই আমার সহকারী বুঝি! এই একটু কাজ, যাব আর আসব।'

'আমি দাঁড়াচ্ছি। তুমি যাও।'

'ঠিক আছে।' বলে সতর্ক নজর রেখে ফের বোটডেকে উঠে গেলেন। চিমনির গোড়া ধরে নামছেন। টর্চ জ্বালছেন না। কম পাওয়ারের আলো নীচে জ্বলছে। স্টোকহোলডে ঠিক দু'জন পরিদার গা লাগালাগি করে বসে আছে। ভয়ে কেউ কাউকে ছেড়ে যাচ্ছে না।

সহজেই তিনি গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে গোপনে ঢুকে যেতে পারলেন। গভীর অন্ধকার। সত্যি যেন ব্ল্যাকেস্ট অফ দি ব্ল্যাক নাইটস। টর্চ জ্বাললেন। কয়লার পাহাড় পার হয়ে সুটের মুখে যাবার আগে কেমন যেন গা ছমছম করতে থাকল। আর এগোতে সাহস

পাচ্ছেন না। টর্চের আলো নিভিয়ে দিলেই যেন তাঁকে মৃত লোকটা উঠে এসে জাপ্টে ধরবে। আর তখনই যেন পাশে তাঁর কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে। ভয়ে হাত থেকে টর্চটা পড়েই যেত। যদি বংশী হয়। ভেবেই সাহস পাচ্ছেন। আলো জ্বেলে দেখলেন, তার পিছু পিছু সুরঞ্জনও নেমে এসেছে!

'তুই!'

'কি ব্যাপার বলো তো?'

'দেখবি?'

'কি দেখব!'

'সুটের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখ না। যদি চিনতে পারিস।' বলে, তিনি সুটের মুখের টর্চ জ্বালতেই সুরঞ্জন আতঙ্কে মুখার্জিকে জড়িয়ে ধরল। চোখ বুজে ফেলেছে। প্রায় দলা পাকিয়ে গেছে। মুখ অক্ষত। বাঁ হাতটা ছড়ানো।

সুরঞ্জন বলল, 'দাঁড়াতে পারছি না। শিগগির চল!'

'চিনতে পারলি?'

'না। মানে ঠিক বুঝছি না। জাহাজে তো কোনও গুঁফো লোক নেই।'

'আমিও চিনতে পারছিলাম না। যাক চার্লি নয়। ইস, কি যে গেছে! চল উঠি। তা'' হলে গিরিগিটি গোঁফের মুখোশ এই!'

সুরঞ্জন পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। সে দৌড়ে আগে চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার পার হয়ে সন্তর্পণে বোটডেকে উঠে এল। হামাগুড়ি দিতে থাকল। মেসরুম মেটদের কেবিনে আলো জ্বালা। সবাই আজ যে যার কেবিনে ফোকসালে এত রাতেও আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। সবার মধ্যে ত্রাস।

তার মাথা নিচু করে দৌড়ে ডেক পার হয়ে এল। তারপর ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে পড়ল। দু'জনই বেদম হাঁপাচ্ছে।

তারা কথা বলতে পারছে না। অধীর বার বার বলছে—'কি হল! হাঁপাচ্ছ কেন? কোথায় গিয়েছিলে।'

মুখার্জি হাত তুলে দিচ্ছেন। কথা বলছেন না। দম নেই কথা বলার। হাত তুলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

সুরঞ্জন এতক্ষণে যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে কৌতূহল দমন করতে পারছে না। বলেই ফেলল, 'লোকটা কে?'

মুখার্জি চান না, সুহাস জেনে ফেলুক, জাহাজে আর একটি খুন হয়েছে। তবে খুনি খুবই কাঁচা কাজ করে ফেলেছে। পাটাতন হড়কে উইলিয়াম সুটে পড়ে গেছে। জাল পাতা থেকে হড়কে যওয়া সবই ঠিক ছিল। লোহার পাতে পেতলের বল সাজিয়ে পাটাতন বসিয়ে দিলে যেই পা দিক হড়কে সুটের পাতালে পড়ে যেতে পারে। তবে সব ঠিকঠক করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। খুনি জানে কখন পড়েছে। কারণ পোর্টহোল থেকে সে গোপনে হয়তো নজর রেখেছে। পড়ার সময় উইলিয়াম চিৎকার করারও সুযোগ পায়নি। বিনা মেঘে প্রায় বজ্রপাত বলা চলে। খুনি ফের পেতলের বলগুলি সরিয়ে পাটাতন

পেতে না রাখলেই পারত। আসলে সে হয়তো চায়নি, আর কেউ খুন হোক। পাটাতন খোলা থাকলে যে কেউ জখম হতে পারত অন্ধকারে। পা দিলেই পাতালে। পেতলের বলগুলিও সব কুড়িয়ে নেবার বোধহয় সময় ছিল না। অকুস্থলে পেতলের বল পড়ে থাকলে তদন্তকারী যে সহজেই সূত্র পে‍ ‍যেতে পারে তাও বোধহয়ে খুনির মনে হয়নি।

'আরে কিছু বলছ না কেন?' সুরঞ্জন অস্থির হয়ে উঠছে।

'কেউ না।' বলে, চোখ টিপে দিলেন মুখার্জি। মুখে কপট গাম্ভীর্য। 'তোর এই এক দোষ সুরঞ্জন, উঠল বাই তো কটক যাই। একজন সহকারীব এত অস্থিরতা ভাল না।'

সুহাস অধীর কিছুই বুঝতে পারছে না। বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

মুখার্জি বললেন, 'সময় নেই। এই যে সুহাসবাবু, জামা প্যান্ট পরে নিন। আপনার অনেক দায়িত্ব। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে চলবে না। এক্ষুনি আপনাকে বের হয়ে পড়তে হবে। আমার এদিকে মেলা কাজ। ফিলকে খবরটা দিতে হবে। খুব জরুরি। চার্লি নিখোঁজ, ফিলকে জানানো দরকার।

'ও বের হবে কি করে! কাপ্তানের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে।' অধীর কিছুটা অস্বস্তির গলায় বলল। 'নিষেধাজ্ঞা! দ্যাখ নিষেধাজ্ঞার কি হয়? পরে ফ্যাল, বসে থাকিস না। আমাদের এখন দরকার, চার্লিকে কোনও কারণে সত্যি যদি কেউ অপহরণ করে থাকে। করতেই পারে। আমরা যাচ্ছি ডালে ডালে, তারা হাঁটছে পাতায় পাতায়। চার্লির বন-জঙ্গলের নেশা আছে বলেই ধরে নিতে হবে সে জঙ্গলে চলে গেছে, একজন হবু গোয়েন্দারও সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলে বিশ্বাস করা কঠিন। কাপ্তানের এটা যে আর একটা জলিয়তি নয় কে বলবে! মেয়েটা জালিয়াতির শিকার। যাকগে ও-সব পরে ভাবা যাবে। তবে সাবধানের মার নেই।'

মুখার্জি এবার সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন, একটা কথা বলি, দ্বীপটা বেশ বড়ই। ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তাও তোর জানা নেই। পথভ্রষ্ট হতে পারিস। দু-চারদিনের রাস্তাও ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। দ্বীপটার মানুষজন ধর্মভীরু। চুরি ছিনতাই ডাকাতির ভয় নেই। সরল অকপট মানুষ তারা। পরিশ্রমী। চার্লি জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেও তার ক্ষতির আশঙ্কা নেই কিন্তু অপহরণের কেস হলে চার্লির বিপদ।'

তিনি থেমে বললেন, 'মুশকিল চার্লির, সে ধরা পড়বেই। জঙ্গলে পালিয়ে থাকলে আজ হোক, দু'দিন পরে হোক। মনে রাখিস চার্লি রাজার জাত। জঙ্গলে কেউ দেখে ফেললে দেবী-টেবি ভেবে পুজো আর্চা শুরু করে দেবে না তাও বলা যায় না। ফিলকে দেখে বুঝেছি। আর ফসফেট কোম্পানির গোরারা সংখ্যায় নগণ্য। তারা দ্বীপটার লোকালয়ে প্রায় যায় না বললেই চলে। আর সেখানে ডানাকাটা পরী যতই দুর্গম অঞ্চলে চলে যাক, একদিন সে ধরা পড়ে যাবেই। ফিলকে শুধু বলবি, মুখার্জি পাঠিয়েছেন। আর এটা রাখ।' বলে পকেট থেকে স্বর্ণমুদ্রাটি বের করে তার হাতে দিলেন। ফিলকে বলবি, 'সে যেন নজর রাখে! একটাই আতঙ্ক, চার্লিকে না কেউ অপহরণ করে!'

সুরঞ্জন বলল, 'দু লাইন লিখে দিতে পারছ না?'

'দিচ্ছি।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। লকার খুলে চার্লির ঘর থেকে সংগ্রহ করা ছবিগুলি

তুলে রাখলেন—

'শোন, সব বোটে, দেশি নৌকার, খাড়ির মুখে, স্টিমারে সর্বত্র ফিল যেন নজর রাখে। তার লোকজন খবর পেলেই বের হয়ে পড়বে। সে চার্লিকে আমাদের চেয়ে বেশি ভাল জানে। একরোখা মানুষ। চোটপাট করলে ঘাবড়ে যাবি না। স্বর্ণমুদ্রাটি তোর কাজে লাগবে। রাস্তায় কিংবা বনে জঙ্গলে এটি তোকে রক্ষা করবে। আর সব সময় মনে রাখবি সমুদ্র বাঁ-দিকে। রাতের বেলা, গাছপালা পাহাড়ের আড়ালে সমুদ্র লুকিয়ে থাকলেও তার ফোঁসফোঁসানির শেষ নেই। অহরহ গর্জাচ্ছে। চুলটা আঁচড়ে নে। জ্যোৎস্না রাতে ঘোড়াও বেশ কদম দিতে পারে।'

মুখার্জি প্যাড বের করে দু ছত্তর লিখে দিলেন, ফিল সুহাস যাচ্ছে। তুমি তাকে দেখতে চেয়েছিলে। দেখাও হবে, কাজও হবে ভেবে পাঠালাম। চার্লি কোথায় চলে গেছে। নিখোঁজ কথাটা লিখতে কেন যে মুখার্জির কলম সরল না। মেয়েটার মুখে, কেন যে বার বার তিনি নিজের আত্মজাকে দেখতে পান। কলম তাঁর থেমে গেল। সুহাসও যেন তাঁর আত্মজ। না হলে এত ঝকমারিতে বোধহয় নাকই গলাতেন না।

'জুতোর ফিতে বাঁধলি না!'

সুহাস যেন বের হয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে।

মুখার্জি বললেন, 'মেয়েটা তোমার জন্যই মনে রেখ সাঁতার জলে নেমে গেল। তুমি দ্যাখো হাঁটু জলে নামতে পারো কি না। পিছিলে নৌকা আছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি। দড়ির সিঁড়ি ফেলা আছে। যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। এই সময়। আশা করি পারবে। আমরা কেউ যাচ্ছি না। মনে রাখবে সব জাহাজে মুখার্জিদা থাকবে না। বাবা মা কারও চিরদিন থাকে না। একা এসেছ একা যাবে।'

সুহাস বের হয়ে গেলে কিছুটা বিষণ্ন মুখার্জি। তিনি কি সব আঁচ করতে পারছেন। জেনেশুনে কি সুহাসকে বাঘের খপ্পরে ফেলে দিলেন! অধীর সুরঞ্জন কখনও মুখার্জিদাকে এতটা দুর্বল হয়ে পড়তে দেখেনি। কি হল, কেন পাঠালেন, কেন বললেন, একা এসেছ একা যাবে! এত রাতে কেন সুহাসকে জাহাজছাড়া করলেন! সকালে গেলে কি হত! সকালে গেলে কতটা আর সময় নষ্ট হত! সবার নজরে পড়ে যেতে পারে ভেবেই হয়তো, অজানা অচেনা দ্বীপে সুহাসকে চার্লির খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন! সুহাসের জীবন কি এখনও তবে জাহাজে বিপন্ন হতে পারে। কি জানি—কিছুই বুঝছে না সুরঞ্জন অধীর। তারা চুপচাপ বসে আছে। দু-হাতে মাথা রেখে মুখার্জিদা কিছুটা শোকাহত মানুষের মতো বসে আছেন। কারও মুখে রা নেই।

অগত্যা কি করা!

সুরঞ্জন বলল, 'এভাবে বসে থাকলে চলবে। বলছ হাতে একদম সময় নেই। ফিলের কাছে গেলে, কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে ফিল তোমার গুরুভাই। তোমার কোনও ঠাকুর দেবতা আছে বলেও তো জানি না। মরা লোকটা কে তাও বলছ না!'

'লোকটা মার্কনিসাব। লোকটা সেই মেঘের ওপারের কণ্ঠস্বর। লোকটা উইন্ডসহেলে গোঁফের মুখোশ পরে চার্লিকে শাসাত। আসলে যার গোঁফদাড়ি নেই সে যদি লম্বা গোঁফ

জুলফির ছদ্মবেশে থাকে, তবে ধরবেটা কে? দ্যাখ আর অবান্তর কথা বলবি না।'

যাক মুখার্জিদা সামলে উঠেছেন। সুরঞ্জন খোঁচা দিয়ে ভুল করেনি। মুখার্জিদা যেন কিঞ্চিৎ লজ্জাই পেয়েছেন। অন্তত তাঁর এই দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তিনি বোধহয় চাইতেন না। সুহাসের জন্য মানুষটার মধ্যে বিশ বাইশ মাসে এত মায়া গড়ে উঠতে পারে মুখার্জিদারা দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ায় তারা টের পেয়েছে। কাঠখোট্টা স্বভাবের মানুষ বলেই তারা মুখার্জিদাকে জানে। কিন্তু মার্কনিসাব, গোঁফ, সবই কেমন তার মাথা গুলিয়ে ফেলছে।

অধীর বলল, 'তোমার খাবার চাপা আছে। খেয়ে নাও।'

'আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। তোরা সবাই খেয়েছিস? বংশী!'

'খেয়েছি।' অধীর বলল।

সুরঞ্জনের খেদোক্তি, 'হয়েছে বেশ, তোমারও খেতে ইচ্ছে করছে না। সুহাসকেও জলগ্রহণ করানো গেল না। সারাদিন কিছুই খায়নি বলতে গেলে। তাকে হুট করে কিনারায় পাঠিয়ে দিলে!'

'যাক, কষ্ট আছে তবে। চার্লির জন্য মন পুড়ছে। এটা দরকার ছিল। একদিন না খেলে কিছু হয় না।'

তারপর তিনি সতর্ক গলায় বললেন, 'মার্কনিসাব মানে উইলিয়ামকে নিয়ে আর কোনও কথা না। কে কোথা থেকে শুনে ফেলবে। আমরা যেন কিছু জানি না। আর আগেই বলেছি বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না। বিনা কারণে গুজবও রটে না। লুকেনারের গুপ্তধন আছে। এখনও এটা আমার কাছে স্বপ্ন না মরীচিকা বুঝতে পারছি না। পাহাড়টা জোয়ার-ভাটায় ভাসে ডোবে। অজস্র ফাঁক-ফোকর। কোথা দিয়ে জল ঢুকছে, কোথা দিয়ে বের হচ্ছে বোঝাই কঠিন। অমাবস্যা পূর্ণিমায় পাহাড়ে একটা দরজা উঁকি দেয়। দরজার ভেতরে ঘোড়ায় চড়ে ঢোকা যায়। লুকেনারের গুপ্তধন, না অন্য কিছু জানি না। ফিল অবশ্য বলেনি—সে বলে, ঈশ্বরের ভাণ্ডার। মানুষের সেবার জন্য ঈশ্বরই নাকি তাকে এই ভাণ্ডারের খোঁজ দিয়েছেন। এখন বুঝে দ্যাখ—অবিশ্বাসও করতে পারি না। সারাক্ষণ পাথরের পাহাড়ে ঝম ঝম শব্দ। ঝন ঝন করে কি বাজছে। টুং টাং সেতারের আওয়াজ, মনে হয় জলের স্রোতে সেই গুপ্তধন নড়ানড়ি করছে। দু-চারটে গড়িয়ে নেমে আসছে। জলের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় পড়ছে। শুধু কুড়িয়ে নেওয়া। পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে ঝোরা। পাথরের খাদ। জল জমছে, জল উপচে পড়ছে। নদী থেকে ডুবে ডুবে তামার পয়সা তোলার মতো। দু একটা স্বর্ণমুদ্রা ডুবলেই পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে নূপুরের ধ্বনি।' তিনি যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন তাও বললেন। অধীর সুরঞ্জন রুদ্ধশ্বাসে শুনছে। জাহাজের খোলে একটা মরা মানুষ পড়ে আছে, তার কথাও ভুলে গেছে। 'পাহাড়টা কোথায়?' সুরঞ্জন না বলে পারল না।

একত্রিশ

মুখার্জি বললেন, 'পাহাড়টা কোথায় জানি না। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। পিরামিডের

মতো দেখতে। হাঙরের ঝাঁক পাহাড়টাকে ঘিরে রেখেছে—যাক গে, এখন তোমাদের কিছু জরুরি কথা জানা দরকার। আমি যদি না থাকি, ধর আমার যদি কিছু হয়—হবেই এমন বলছি না, তবু সতর্ক থাকা দরকার। কাপ্তান আমাকে ছেড়ে দেবেন না।'

তিনি বাঙ্ক থেকে নেমে লকার খুলতেই কিছু কাগজপত্র বাইরে গড়িয়ে পড়ল। কাগজগুলি তোলার সময় শুধু বললেন, 'মহিষাসুর বধ পালা সাঙ্গ। ম্যাকের হত্যাকারী কিংবা চক্রান্তকারীও শেষ। ছবিগুলি দেখে বোঝ। মা আমার রণচণ্ডী রূপ ধারণ করেছিলেন । তাঁরই বিভূতি। তিনি তো জাহাজ থেকে হাওয়া। তা দুর্গতিনাশিনী তিনি, ভয়ের কি আছে!' বলে কাঠে তিনি কয়েকটি ছবি পর পর পিন পুঁতে দেবার সময় বললেন, আগেই বলেছি, 'দেবী তার ছবিতে বুনো ফুল এঁকে দেখাত। মনে আছে বোধ হয় তোদের।'

ছবিগুলি ওল্টাবার সময় বললেন, 'সুহাসকে দেখাত। নিজেও এঁকে দেখত। ডালপালায় কখনও কাঁটার মধ্যে কিংবা মাকড়সার জালে ছিন্নভিন্ন প্রজাপতিও এঁকেছে। ছবিগুলিতে কখনও ক্রোধ ফুটে উঠত—কখনও সুষমা। মনে আছে তোদের!'

যেন তিনি দম নিচ্ছেন। বললেন, 'চক্রান্তকারী উইলিয়াম সেকেন্ডকে অযথা সন্দেহ করেছি। উইলিয়াম এবং ম্যাক দু'জনেই। ডেরিক তারাই শেষ রাতে তুলে রেখেছিল জাহাজ অন্ধকার করে দিয়ে। তার হাতে ক্ষত থাকলেও লুকিয়ে গেছে। তাকে হয়তো হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধারই দরকার হয়নি। কাল লাশ তোলার সময় দেখতে হবে।'

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, মুখোশ পরে মগড়া ঝোপে জঙ্গলে বসে থাকে জানব কি করে বল। ধাতানি না দিলে বেটা স্বীকারও করত না। চার্লি, পিস্তল, তাঁকে খুঁজছে চার্লি, সুহাসই তাকে রক্ষা করতে পারে, কত কিছু বললাম। তবু কি মচকায়! অথচ সেকেন্ডকে সন্দেহ করেছি। লাইটহাউজ পার হয়ে গেছি। তুই তো দেখেছিস লাইটহাউজের জায়গাটা খুবই গোলমেলে। কোন ফাঁকে মগড়া ঝোপে ঢুকে বসে আছে বুঝব কি করে! সেকেন্ডকে বাতিঘর পার হয়ে যেতে দেখেই আমি কিনা বোকার মতো জঙ্গলে ঢুকে গেলাম।

অধীর বলল, 'মগড়ার সত্যি মাথা খারাপ।'

সুরঞ্জন বলল, 'মাথা খারাপ কি ভাল ভেবে লাভ নেই। পাস্ট ইজ পাস্ট। কী হয়রানিটা করল!'

মুখার্জি বললেন, 'মগড়াকে আমি থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। মুখোশের তাড়া না খেলে চার্লি-রহস্য বোধহয় উদ্ধারও হত না। শুধু কি চার্লি-রহস্য—যাক গে কি যেন বলছিলাম?'

অধীর কিন্তু মগড়ার মোটিফ বুঝতে পারছে না। সে তো সব জানে না। কিছুটা জানে।

সে বলল, 'মাথা খারাপ না হলে, কী মোটিফ তার?'

মুখার্জি বললেন, 'মোটিফ একটাই। জঙ্গলে চার্লি সুহাস কি করে! বুনো ফুল দেখতে যায় কেন? ওরা দু'জনে জঙ্গলে যদি ফুর্তিফার্তা করে। দেখে সুখ আর কি! নেশা। বেটার গায়ের যা রং, আর মুখের যা চেহারা, যত দূরেই থাক, চার্লি ঠিক টের পেত, কোনও নেটিভ তাকে ফলো করছে। ধরা পড়ে যেত। রাতের বেলা মুখোশ পরে চতুর হতে

গেছে। সামনাসামনি পড়ে গেলে রক্ষা থাকত। সহজেই চার্লি চিনে ফেলত।

তারপরই মুখার্জি বললেন, 'বাজে কথা থাক। মগড়া আমাদের কোনও ইস্যু নয়।'

মুখার্জি তাঁর লকারের দরজা খোলার সময় বললেন, 'ও হ্যাঁ, ডেরিক তোলার কথা বলছিলাম। তোরা যে কি! খেই হারিয়ে ফেলছি। লকারের দরজাই বা খুললাম কেন। এত জট এক সঙ্গে খোলাও কঠিন। ডেরিক ম্যাক আর উইলিয়াম তুলে রেখেছিল। দড়িটা প্রমাণ। দড়িটার একটা অংশ রক্তাক্ত। আততায়ীর হাত খুঁজলে ক্ষতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। কাল লাশ তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে।'

'এই দ্যাখ।' বলে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে দেখালেন। ডাইরি থেকে রসিদ বের করে দেখালেন। 'ডেক-কশপের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তোরা তো জানিস ডেক-কশপ, মাল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। মগড়া খবরটা দেয়—সেই থেকে ডেক-কশপ কাপ্তান-বয়, বাটলার আমার বান্দা বলতে পারিস।'

'তবে শেষ উপকারটা করেছে কাপ্তানবয়।'

'ডেরিকের কথা কি শেষ?' সুরঞ্জন বলল।

'না শেষ নয়।'

'তবে হুট করে লঙ জাম্প মারছ কেন।'

'না বলছিলাম, কাপ্তান কিন্তু ডেরিক তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়।'

'আবার হাই জাম্প! দড়িটা কে নিল, কে দিল বলবে না!'

'দড়িটা ডেক-কশপ সাপ্লাই করেছে। ঠিক সাপ্লাই বললে ভুল হবে। নিউপ্লিমাউথের শিপিং ট্রান্সপোর্ট এন্টারপ্রাইজ থেকে কেনা। জাহাজে যারা মাল সরবরাহ করে তারাই এ ধরনের দড়ি সাপ্লাই করতে পারে। রসিদে নাম আছে কোম্পানির। দড়িটা কিভাবে হাতাল বলতে পারিস। সোজা—ডেক-কশপ বলিস, ইনজিন-কশপ বলিস সাহেব সামনে দেখলেই ভূত দেখে। কাকে দিয়েছে ডেক-কশপ ঠিক মনে রাখতে পারেনি। এ তো তোর ইনজিন কশপের হাতুড়ি বাটালি হ্যাকস নয়, স্টোরে ফের ফেরত দিতে হবে। দড়িদড়া খরচখরচা জাহাজে সবসময় হয়েই থাকে। লেখাপড়াও জানে না। অভিজ্ঞতার জোরে কাজ চালিয়ে যায় বুঝতেই পারিস।'

'তুমি আবার বল গোলের বাইরে মারছ দাদা। কাপ্তান জড়িত নয় বললে কি সূত্রে!' সুরঞ্জন ছবিগুলি ভাঁজ করতে করতে কথা বলছে।

'নয়, তার কারণ লগবুক। কাপ্তান লগবুকে শো কজ করেছেন সেকেন্ড ইনজিনিয়ারকে! দুটো জেনারেটারই অচল হয় কি করে? কেন আছ জাহাজে!' ম্যাক যে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটারের তার-ফার আলগা করে সর্টসার্কিটের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে, সেকেন্ড জানবে কি করে। ডগ ওয়াচেই কাজটা সারা হয়েছে। কারণ ডগ ওয়াচেই জাহাজের আলো নিভে গিয়েছিল। ব্রিজে ইমারজেন্সি লাইট জ্বলছিল বলে আমি ঠিক টের পাইনি। ইনজিন-রুমে যখন ধস্তাধস্তি, টর্চ নিয়ে ছোটাছুটি তখন ম্যাকের পাত্তা পাওয়া যায়নি। তাকে সেকেন্ড খেপে গিয়ে পরে লাথি মেরেছিলেন।'

'ম্যাকের সত্যি বাড়াবাড়ি। বেটা এত রাতেও মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকতে পারে।

যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারে?'

'মদ ম্যাক ছুঁতই না!' মুখার্জির কথায় সুরঞ্জন অধীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'মদ ছুঁতই না! বলছ কি। নিজের চোখে দেখা—মাতাল হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় টলছে।'

'ক্যামোফ্লেজ। যে মদ খায়, যে অ্যালকোহলিক, জন্মদিনে সে মদ স্পর্শ করে না, হয় না বুঝলি! সিম্যান মিশনেও দেখছি, আড্ডা দেয়, নাচে, কিন্তু বারে ঢোকে না।'

'যা বাব্বা! এ তো আর এক কেলো।' অধীর কিছুরই থৈ পাচ্ছে না-এতো বোকা বনে গেল।

'মাতলামি করে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও গণ্ডগোলে সে নেই। সে মুখোশ বানিয়েছে একুশটা। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটার জন্যই বাকি বিশটা মুখোশ। গিরিগিটি গোঁফের মুখোশটা দেখতে হুবহু উইলিয়ামের মুখের মতো। গোঁফের জন্য প্রায় মুখের অর্ধেকটা হাপিজ। চার্লিকে মুখোশটা উপহারও দিতে চেয়েছিল। আসলে উইলিয়ামের মুখের সঙ্গে গোলমাল সৃষ্টি করা আর কি। উইলিয়াম নকল গোঁফ লাগিয়ে চার্লিকে অনুসরণ করলে, মনে করতেই পারে একট মুখোশ তাড়া করছে। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটাই তুরুপের তাস। সে নকল গোঁফ পরে গিরিগিটি গোঁফের মুখোশ হয়ে যেত।' বলে তিনি, এক জোড়া লম্বা গোঁফ এবং জুলপি লকার থেকে বের করলেন। ছোট্টমতো শিশি। এক জাতীয় আফ্রিকান গাছের আঠা। গোঁফ টানাটানি করলেও উপড়ে আসবে না। জল দিলে আপনি আলগা হয়ে যায়। শিশিটা ওর লকারে আছে। গোঁফ জোড়া এবং জুলপি পরে তিনি সুটের গর্তে পড়ে আছেন। অধীরকে নিয়ে দেখাতে পারিস! যা না, দেখে আয়।'

'আরে আমরা দেখে করবটা কি? গোয়েন্দার সহকারী বলে শেষে আমার গলা কাটা যাবে!' অধীর কিছুই দেখতে রাজি না।

মুখার্জি বললেন, 'যা খুশি করবি! আমার কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়ার দিলাম। ভালমন্দ সব এখন তোদের উপর!'

অধীর না পেরে বলল, 'কাপ্তান কি তবে ধোয়া তুলসীপাতা! লগবুক দেখে খুশিমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে! কাপ্তান শো-কজ করছে। কাপ্তান জড়িত থাকলে জেনারেটরের গণ্ডগোল নিয়ে শো-কজ করত না ভাবছ। ডেরিক তোলার ব্যাপারে কাপ্তানের কোনও দূরভিসন্ধি নেই বললেই হল!'

মুখার্জি বললেন, 'দ্যাখ অধীর, আমি কিন্তু কখনই বলিনি কাপ্তান ধোয়া তুলসীপাতা। ধোয়া তুলসীপাতা হলে ফিলের কাছে এত ছোটাছুটিরও দরকার ছিল না। যাকগে আমি যতটুকু বুঝেছি—তোরা খুবই অধীর হয়ে পড়ছিস!' মাথা তোদেরও ঘুরছে। গোলের মুখে যতই ছুটছি, তোরা মিসপাস করে গুবলেট করে দিচ্ছিস। তবে নাচতে যখন নেমেছি ঘোমটা খুলে ছাড়বই।'

'সে যা খুশি ছাড়। আমাদের কিছু বলার নেই। জাহাজে একটা মানুষ মরে পড়ে আছে, ভেবেই নিয়েছ উইলিয়াম। কি বলব বল! গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি। উইলিয়ামের গোঁফ কবে ছিল!'

'উইলিয়ামই। ওটা ওর ছদ্মবেশ! বিশ্বাস না হয়, ঠিক কি না কাল লাশ তোলার

সময় দেখে নিলেই হবে। উইলিয়ামকে নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন নয়।'

'কে তোকে খুন করল?'

'দেবী, দেবী দুর্গতিনাশিনী।'

'শোনো, মুখার্জিদা তোমার দুর্গতিনাশিনীকে নিয়ে থাক। আমরা উঠছি। কে সুহাসকে ট্যাঙ্কের টবে নিয়ে চুবিয়েছে?

মুখার্জিদা কোনও জবাব দিচ্ছেন না। ছবিগুলি সব উল্টে পাল্টে দেখে পরপর পিন দিয়ে ভাল করে দেয়ালে আটকে দিলেন। লকাব খোলা। নিজের জিনিসপত্র বলতে কিছু নেই—কেবল আজেবাজে কাগজে ভর্তি। সব ছোট বড় ছবি আঁকা আর্ট পেপার।

তিনি আর কোনো কথা বলছেন না। ছবিগুলি টাঙিয়ে দিতেই অধীর সুরঞ্জন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, এ কি রকম ছবি! কোনোটা ফুলের, কোনটা মুখের, কোনটা শুধু জামা প্যান্ট টুপি পরা অদৃশ্য মানুষের ছবি।

চার্লির ছবি সম্পর্কে বোধ হয় তিনি এবার নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করবেন। সুরঞ্জন অধীর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

'এটি দেখছ? ফুলের ছবি। কি সুষমা! নীচে কি লেখা! আটামাসকু লিলি। চারপাশে গাছপালা। এক জোড়া দম্পতি লিলিটার পাশে বসে আছে। নীচে কি লেখা আছে— প্র্যাগন্যান্ট।

'এটি একটি আগুনের ছবি। সারা মাঠ জুড়ে মনে হয় আগুন জ্বলছে। নীচে কি লেখা আছে—টল ব্লেজিং স্টার। যতদূর চোখ যায় শুধু ফুল। দু'জন পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে নারী এবং পুরুষ। কোথায় যাচ্ছে তারা যেন জানে না।'

'আর এ ছবিটা দ্যাখ—চার পাপড়ির ফুল। ফুলের কোরকে মাকড়সার জাল। প্রজাপতি আটকে গেছে। ছটফট করছে। চার্লি ছবিটার নাম দিয়েছে, মেক্সিকান হ্যাট। সম্ভবত ফুলের নামে ছবির নামকরণ করেছে।'

তারপরই আর একটি ছবি টাঙিয়ে দিলেন—মানুষের মুখ। নীচে কি লেখা? 'উঠে আয়। পড়ে দ্যাখ।'

সুরঞ্জন অধীর উঠে গেল। ঝুঁকে লেখাটা পড়ল—বাট নাউ আই স্ন্যাপ মাই ফিঙ্গারস অ্যান্ড কল এ হল্ট টু হিজ ডিজঅনেস্ট গেইন অ্যান্ড ব্লাডসেড। ছবিটার নীচে অত্যন্ত ছোট হস্তাক্ষরে লেখা।

'কিছু বুঝতে পারছিস? কে সে? কার মতো দেখতে। কার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ! বুঝতে পারছিস না! তিনি আমাদের মার্কনিসাব। ওদিকে আমাদের কাজও থাকে না, যাইও না। সে যে বের হয় না তাও না। কিনারায় যায় না, নামে না তাও না। সে জাহাজে কাজের সময় কিনারায় নামত। ফিরত রাত করে। গোঁফজোড়া ছিল তার ছদ্মবেশ। গ্যাঙওয়েব অন্ধকারে তাকে ঠিক চেনা যেত না হয় তো। যাকগে, পরের ছবিটা দ্যাখ?'

'কিসের ছবি?'

'ওটা তো গিরগিটি মুখোশ।' সুরঞ্জন দেখে আঁতকে উঠল।

'এবারে দ্যাখ। ছবিটার গোঁফ সাদা রং দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। কার মতো লাগছে

দেখতে?'

'আগেকার ছবিটার মতো।'

'মনে উইলিয়ামের মতো। মানে মার্কনিসাবের মতো। নীচে কি লিখা আছে?'

'ইয়ো স্যাল বি কমপ্লিটলি ওয়াইপড আউট।'

'কি হল ঘাবড়ে গেলি কেন? দুর্গা দুর্গতিনাশিনী বলায় তো তোরা খেপে বোম। অত সহজে আমরা ছাড়ছি না, আমাদেরও কাপ্তান ছাড়ছে না। আমাকে উপহাস করা! হাই তোলা। বোঝো এবার। দ্যাখ শেষ ছবিখানা!'

বলে, তিনি লম্বামতো কাগজটা আগের ছবির ওপরই টাঙিয়ে দিলেন। চারকোনায় চারটা পিন পুঁতে দিতেই কেমন অতিকায় অদৃশ্য এবং ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা ছবিতে ভেসে উঠল। টুপি, জামা, প্যান্ট সাদা। মুখ দেখা যাচ্ছে না, হাত পা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জামা প্যান্ট টুপির ভিতর মানুষটা অদৃশ্য। মুখার্জি বললেন, 'ভাল করে দ্যাখ।'

হাতে কালো গ্লাভস। মুখে কালো ছায়া। পায়ে কালো মোজা। সুরঞ্জন ভূত দেখার মতো তাকিয়ে আছে।

'এই সেই অদৃশ্য প্রেতাত্মা।' বলে, তিনি গ্লাভস এবং পোশাকটি লকার থেকে খুলে দেখালেন। বললেন, 'কাপ্তান-বয় সাহায্য না করলে অন্ধকারেই থাকতাম। জাহাজে ফেরার সময় প্যাকেটটা হাতে তুলে দিল। কে নাকি তাকে দিয়ে গেছে আমাকে দেবার জন্য। গ্যাঙওয়েতে দিয়ে গেছে। কোথায় পেল জানি না।'

'নীচে কি লিখেছে, সুহাসের দুর্গতিনাশিনী। পড়ে দ্যাখ।'

ওরা ফের ঝুঁকে পড়ল—লেখা আছে, আই উইল পুট অ্যান এন্ড টু অল উইচক্র্যাফট।

'বুঝলি কিছু, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী কাজটি সেরে হাওয়া। এখন ঠেলা সামলাতে হবে আমাদের। সুহাসকে ভাগিয়ে দিয়ে আপাত রক্ষা করা গেল। পরে কি হবে জানি না। চার্লি যে মেয়ে জানাজানি হয়ে গেছে। কাপ্তানের মাথা ঠিক নেই। চার্লিকে খুঁজে না পেলে আমাকে সুহাসকে তিনি শেষ করে দিতে পারেন। প্রতিশোধ চরিতার্থে মানুষ সব করতে পারে। সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে খুনের অপরাধে মাস্তুলের দড়িতে লটকে দিতে পারেন। মনে রেখ সমুদ্রে কাপ্তানই সব। তাঁর অসীম ক্ষমতা। আইন, আদালত তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এখন সুহাস ফিলকে খবর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারে—সে ফিরে এলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে। ফিল খবর পেলে চার্লিকে অপহরণ করা খুবই কঠিন।

এক নিরুপায় নৈঃশব্দের ভিতর তারা চার্লির আঁকা ছবিগুলি ভূতগ্রস্তের মতো দেখছিল। মুখার্জি বাঙ্কে বসে আছেন। সুরঞ্জন অধীর ছবিগুলি দেখুক। কোথাও আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই চার্লি উইলিয়ামকে খতম করে ভেগেছে। সুহাসকে এ-ভাবে রক্ষা করা ছাড়া তার বোধহয় আর কোনও উপায়ও জানা ছিল না। চার্লি জাহাজ ছেড়ে দিয়ে সুহাসকে বিপদমুক্ত করে গেল—এমনও ভাবলেন মুখার্জি। সে না থাকলে সুহাসের শত্রুপক্ষও থাকে না চার্লি ভালই জানত। অনেকের গলায় কাঁটা ফুটে থাকার কারণ সে।

আজ সমুদ্র থেকে ঝোড়ো হাওয়াও উঠে আসছে না। এই গভীর রাতে তারা তিনটে

মাত্র প্রাণী জাহাজে জেগে আছে। কাপ্তান, চিফমেট সেকেন্ডমেট কিনার থেকে ফেরেননি। হয়তো কোনও হোটেলে রাত্রিবাস কিংবা মাদাঙ থেকে ফেরার কোনও স্টিমার ধরতে পারেননি। সকাল হলে, সবাই দেখবে সুটের মুখ খালি। পাটাতন সরানো। তিনি ইচ্ছে করেই পাটাতন তুলে রেখে এসেছেন। নয়তো কেউ জানতেই পারবে না সুটোর গর্তে উইলিয়াম মরে পড়ে আছে। ফুলে ফেঁপে পচা দুর্গন্ধ না উঠলে টের পাবার কথা না। পাটাতন তুলে রেখে এসেছেন—পাটাতন তোলা দেখলেই সংশয় দেখা দিতে পারে। ছোটাছুটি শুরু হতে পারে।

বত্রিশ

আর তখনই মনে হল, দরজার ওপাশে কেউ যেন দাঁড়িয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনছে। ছুটে গিয়ে খটাস করে দরজা খুলতেই অবাক—বংশী। মেজাজ খিচড়ে গেল—এ তো আচ্ছা ঝামেলা পাকাচ্ছে।

'আবার! তোর চোখে ঘুম নেই। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছিস! একা ফোকসালে থাকতে ভয় লাগলে সুরঞ্জনের বাঙ্কে গিয়ে শুয়ে থাক।'

'দাদাগো, আমরা তবে কেউ বাঁচব না। কাপ্তান সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে আমাদের ফাঁসি দেবে! কি গো কিছু বলছ না কেন? আমরা তবে দেশে ফিরতে পারব না!'

আর মাথা ঠিক রাখা যায়। সব যাবে। মুখার্জি যে কি করেন! বংশীর চোখ লাল। চুল উসকো-খুসকো। কত রাত যেন ঘুমায়নি। কষ্টও হয়। তিনি বললেন, 'আস্তে। পাগলামি করিস না। আমি তো আছি। অত সোজা। যা শুয়ে পড়গে।'

বংশী বলল, 'শুয়ে পড়তে বলছ। যাই তবে। শুয়ে পড়ি। কিন্তু আমার যে ঘুম আসে না।'

'আসবে। আমরা তো আছি। যা লক্ষ্মী ভাইটি,' বলতেই বংশী নিজের ফোকসালে ঢুকে গেল।

বলল, 'দরজা বন্ধ করে শোব?'

'বন্ধ করে শুয়ে পড়াটাই উচিত।'

'বাইরে থেকে খুলে যদি কেউ ঢোকে?'

'তবে দে চাবিটা। বাইরে থেকে লক করে দিচ্ছি।' বলতেই মুখার্জি দেখলেন, দরজার চাবিটা পরম বিশ্বাসে মুখার্জির হাতে তুলে দিল বংশী। মায়াও হয়। সবই শুনে ফেলতে পারে। অধীর সুহাস ফোকসালে না থাকায় বোধহয় ঘাবড়ে গেছে। একা থাকতে পারছিল না। উঠে এসেছে। হয়তো সব কথাই শুনেছে—কাপ্তান যে ছেড়ে কথা কইবে না—সামনে মুখার্জির সমূহ বিপদ তাও কান খাড়া করে শুনতে পারে—কি যে শেষ পর্যন্ত হবে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। বংশীর দরজা লক করে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। বললেন, 'ভাল না। বংশী দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে। যেখানে আমি, বংশী সেখানে। তাকে সত্যি ভূতে তাড়া করছে। একেবারে শিশুর মতো আচরণ। যাকগে—সব ভবিতব্য।'

সুরঞ্জন বলল, 'বংশীকে এ-ঘরে নিয়ে এলে হত না?'

'না। তোমাদের কিছুই বলা হয়নি। চার্লি-রহস্যও না। প্রেসিডেন্ট কলিজই প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকো। তার লাউনজের ছবি দেখে আগেই আমরা টের পেয়েছি। রিফ এক্সপ্লোরারের পাঠানো ছবি দেখে বুঝেছি, লাউনজের ভাস্কর্যটি খোয়া গেছে। কার কাছে ভাস্কর্যটি আছে তোমরা জানো। তবে রহস্য আরও গভীর। রক্ষা পেতে চাইলে সব ভাল করে জেনে নাও।'

মুখার্জি কেন যে কিছুটা অন্যমনস্ক।

কি ভেবে বললেন, 'ভাস্কর্যটি দামি না অদামি আমাদের জেনে লাভ নেই। এত সব কথা বলতে আমার ভালও লাগছে না। ফিলই চার্লির নিখোঁজ কাকা। ফিল অকপটে সব স্বীকার করেছে। প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকোর সেই কাপ্তান। প্রেসিডেন্ট কলিজেরও। গুজব, চার্লির ঠাকুরদা জোহানস মিলার গুপ্তধন খুঁজে পান। গুজব, তিনি তাঁর প্রমোদ তরণী নিয়ে গুপ্তধনের খোঁজে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ থেকে, নাউরো, এলিস, ইস্টার, ফোনেক্স, রাবাউল পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন—অসংখ্য দ্বীপে তাঁবু ফেলেছেন, গুটিয়েছেন—প্রমোদ তরণীর যাত্রীরা যখন দ্বীপে ফূর্তিফার্তায় মগ্ন, তিনি তখন ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন। দ্বীপের বুড়োদের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করেছেন—এমন সব গুজব যখন চাউর হয়ে যাচ্ছিল—বলেছি না, বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না, গুজবে দুই পুত্রেরও মাথা খারাপ। গুজবের শিকার দু'জনেই! এই গুজবই কাল হল দু'জনের। ফিল, মানে রাচেল প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটি অন্তর্ঘাতে ডুবিয়ে দিল। যেখানে জাহাজটি ডুবিয়ে দিল, জল কম। মাত্র ষাট সত্তর ফুট। অনেক ভেবে চিন্তেই কাজটা সে করেছে। সে বিশ্বাস করত বাবার গোপন ধন সম্পদ কলিজের কোথাও রক্ষিত আছে।' মুখার্জি থামলেন। তারপর আবার কি কি বলা দরকার কিছুতেই যেন মনে করতে পারছেন না।

'ফিল পেয়েছে গোপন ধন সম্পদ?' অধীরের প্রশ্ন।

'না পায়নি। সে শুধু পেয়েছে ভাস্কর্যটি। কলিজ জাহাজ থেকে ভাস্কর্যটি খোয়া যায় দেখেছিস ছবিতে। ফিলের প্রাসাদে ভাস্কর্যটি দেখে অবাক। সন্দেহ থাকে না সেই ছদ্মবেশী অসি ডাইভার। কিপার অফ দি রেক।'

'কি বলছ? ফিল অসি ডাইভার, কই কখনও তো বলোনি।'

'বলিনি, অনেক কিছুই বলিনি। তা হলে আর গোয়েন্দাগিরি কেন? কাপ্তানবয়কে সালাম—সে না থাকলে এই রহস্যের সূত্র ধরার ক্ষমতা আমার চোদ্দ গোষ্ঠিরও ছিল না। ও খবরটা দিল বলেই—কাপ্তানকে ফাঁসাবার মতো হাতে অস্ত্র পেয়ে গেলে। আরও দিচ্ছি। আমি না থাকলে দরকারে কাজে লাগাবে।'

'ফিলই কি তবে অদৃশ্য আততায়ী! সে সুতো টানছে!' সুরঞ্জন প্রশ্ন করল।

'ধুস। তোরা যে কি! সে কেন আততায়ী হতে যাবে?'

'না, বলছিলাম, সে-ই কি ম্যাককে খুন করিয়েছে?'

'ম্যাককে খুন করেছে উইলিয়াম। কতবার এক কথা বলব! বলেছি না, অন্ধকারে দড়ি কাটতে গিয়ে হাতে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। যেই ডেরিক ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাক, তার এক হাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। উইলিয়াম, ম্যাক সুহাস দুজনকেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

সংশয় ছিল বলেই, ম্যাক কাজের সময় তার শিশুদের ছবি পকেটে রেখে দেয়। এতে আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারি ম্যাক জানত। ফসকা গেরো। ম্যাকও উইনচের তলায় থাকবে। আতঙ্ক থাকতেই পারে। ছবি পকেটে থাকলে ম্যাক নিরাপদ্র ভাবত।' তারপরেই কেমন হতবাক হয়ে সুরঞ্জনের দিকে তাকালেন। 'তুই এতটা নবিশ!' কি করে ভাবতে পারলি ফিল এই খুনের সঙ্গে যুক্ত। ফিল কি জাহাজে ছিল!'

'না, মানে, কোথায় বীজের অঙ্কুর জন্মায়, কোথায় গাছ তার ডালপালা মেলে দেয়, খুঁজতে গেলে, ফিলকে সন্দেহ না করারও কারণ নেই। রেষারেষি বল, ক্ষোভ বল, সব তো ডরোথি ক্যারিকোর গুপ্তধন নিয়ে।'

'না, শুধু গুপ্তধন নিয়ে নয়। ডরোথি ক্যারিকোতে কোনও গুপ্তধনই ছিল না। বড় বড় মেহগিনি কাঠের পেটি উঠতে দেখে জাহাজে, ফিল, ফিল বলব না, রাচেল বলব, বাপের কাজকর্মে ধন্দে পড়ে যায়। কারুকাজ করা দামি কাঠের পেটিতে কি তোলা হচ্ছে? নির্ঘাত হিরে জহরত। সোনা দানা।'

অধীর বলল, 'যখন এত যত্ন, তখন হিরে জহরত পেটিতে আছে আমি দেখলেও ভাবতাম।'

কিছুই ছিল না। ছিল তামার ফলক। তাতে লেখা জোহন্স মিলার যা বিশ্বাস করতেন। মানুষের ধর্মই হল, অমূল্য সম্পদ। পেটিতে তিনি সব ফলক তুলে নিয়েছিলেন, সব দ্বীপে ফলকগুলি পুঁতে আসবেন বলে—ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। ফলকে এমনই সব সাধু বাক্য লেখা আছে বুঝলি। ফিলের প্রাসাদে যাওয়ার রাস্তায়ও পাঁচ-সাতটা ফলক দেখছি। অবিশ্বাস করারও কারণ থাকতে পারে না। সে পেটিগুলি দেখিয়েছে। এখনও আট-দশ পেটিতে তামার ফলক পড়ে আছে। ফিল দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। বাপের স্বভাব পেয়েছে। বুনো ফুলের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে আসে। জনহীন দ্বীপে মানুষের বসতি গড়ে তুলছে। লোকজনের টানাটানি। তুই থাকতে চাইলে তোকেও জায়গা দেবে। চাষবাস থেকে আহার, আশ্রয় উত্তাপের ব্যবস্থা করবে। গির্জা বানাচ্ছে। স্কুল গড়ছে। তার এক দণ্ড ফুরসত নেই। সব খুলে বললে, ফিল কি বলল জানিস, এ-সব নোংরা কাজে আমাকে জড়িয়ো না। সে জাহাজেও আসতে চাইল না।'

'নোংরা কাজ বলছে কেন ফিল?'

'বলছি। সব গুলিয়ে দিস না। দ্যাখ যত বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তার আড়ালে একজন নারী। কি, ঠিক কি না বল, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, ট্রয়ের যুদ্ধ বলিস, সেখানে হয় সীতা, দ্রৌপদী না হয় হেলেন। কি রাইট?'

'রাইট। অক্ষরে অক্ষরে সত্য।' অধীর সমর্থন করল।

'জাহাজেও চার্লি। ম্যাক আর উইলিয়াম দুই ভায়রাভাই। ওরাই একমাত্র লুসিয়ানার লোক। এখন বলবি লুসিয়ানাটা আবার কোথায়। লুসিয়ানার নিউপার্থে দু'জনেরই বাড়ি। চার্লির দুই ভগিনীপতি। দু'জনই উগ্র বর্ণবিদ্বেষী। বলতে পারিস এত খবর কে দিল। বাটলারের খামটা থেকে নাম ঠিকানা। রাচেল, মানে ফিল দেখে বলল, 'সে কাউকেই চেনে না। তবে উইলিয়াম এবং ম্যাকের পুরো নাম দেখে সে বুঝতে পারে তার দাদার

জামাই—জানিসই তো যম জামাই ভাগনা কেউ নয় আপনা।'

সুরঞ্জন বলল, 'একটু চা করে আনি। গলা তোমার শুকিয়ে গেছে।'

'আনবি? আন।'

'তবে কাপ্তান তাদের চিনতেন বলে মনে হয় না।'

'কি কারণ,' অধীর হাতের আঙুল মটকাচ্ছে? ঘুম নেই চোখে। চোখও জ্বলছে। খুবই বিভ্রান্ত ব্যক্তির মতো পাও নাচাচ্ছে।

'চার্লি শেষ বয়সের বুঝলি। কাপ্তান জাহাজে জাহাজে—জামাইদের সঙ্গে দেখা দু' একবার হলেও পনেরো বিশ বছরে মনে রাখার কথা নয়। তিনি তো তখন পাগলা কুকুর। বাপের ধন সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। বাপ উইল করেছেন, তাঁর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি তিনি ন্যাশন্যাল ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টারকে দান করে যাচ্ছেন। একটাই শর্ত, তাঁর পুত্রদের যদি কারও পুত্র সন্তান হয়, তবে উইলটি বাতিল বলে গণ্য হবে।'

'বোঝো এবার। পুত্রদের তো দিলেনই না, নাতনিদেরও বঞ্চিত করলেন। চার্লির দিদিরা তো ছিল। তারা খাপ্পা।' থেমে বললেন ছিল। তবে এটাই একমাত্র দোষ বলতে পারিস চার্লির ঠাকুরদার। নারী-বিদ্বেষী। যৌবনেই তাঁর স্ত্রী পলাতক। পুত্রদের অধার্মিক কাজকর্মে বুড়ো ক্ষিপ্ত। মুখ দেখতেও রাজি ছিলেন না। ফিল শেষ পর্যন্ত নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য হয়ে পড়ায় বুড়ো কিছুটা নরম হয়েছিলেন, তবে সম্পত্তির কানাকড়ি দিতেও রাজি হলেন না। প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকোর কাপ্তানের কাজটি দয়া করেই যেন ডেকে দিলেন।'

'এ-সব কে বলল?'

'কে বলবে। ফিল।'

'গুল ঝাড়ছ।'

'ওঠ। গুল ঝাড়ছি! ফিলকে দেখিসনি! ফিলকে আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। কাপ্তানের চিরকুটটি না দেখলে মনেই হত না, ফিল বলে কারও সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ওর প্রাসাদে নিয়ে গেছে। ভাল পিয়ানো বাজায়—ধর্মসঙ্গীত গায়। বলেছি না সরষেতে শুধু ভূত থাকে না, ভগবানও থাকে। সামান্য সরষে তেল—তার কৃতজ্ঞতা এত ভাবা যায় না।

অধীর বলল, 'দৈব সহায় তোমার দেখছি। ঘানিতে ভূত পিষে তেল বের করে ভগবান পেয়ে গেছ। বাহাদুরি আছে তোমার। একেবারে দরকারে সব হাতের কাছে হাজির। গোয়েন্দাগিরির দাম কোথায়! চিরকুট থেকে ফিল। ফিল থেকে লুকেনারের গুপ্তধন, চিরকুটে শুধু অসি ডাইভারের উল্লেখ ছিল, না আরও বেশি কিছু! তার মানে ভগবান যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়ে দেন!'

মুখার্জি বিরক্ত হতে পারতেন। এখনও ঠাট্টা তামাসা। আর সহ্য হল না। বললেন, 'দেখবি!' লকার খটাস করে খুলে চিরকুটটা দেখালেন, কি লেখা আছে। বোথ বে হারবার থেকে জনৈক অ্যালেন পাওয়ার কি লিখেছে দ্যাখ কাপ্তানকে।'

অধীর সুরঞ্জন দু'জনেই ঝুঁকে পড়ল। দেখল লেখা আছে, 'সি ওয়াজ এ গ্র্যান্ডসিপ—

নোটস ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার হু ফেল আন্ডার দি স্পেল অফ দি লাকজারি লাইনার ট্রয়েলভ ইয়ার্স এগো অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অব দি রেক।'

'কে দিল চিরকুটটি?' অধীর বলল।

'যেই দিক। কি বুঝলি! ডুবন্ত জাহাজ কে পাহারা দেয়। ডুবন্ত জাহাজের খোঁজে কে আসে। কোনও রহস্য নিশ্চয় থেকে যায়। এই রহস্য-তাড়িত হয়েছিলাম বলেই, এখানে এসে পৌঁছতে পেরেছি। এই রহস্য থেকেই কলিজের আবিষ্কার। চার্লি পাটাতন তুলে উঁকি দিয়ে কি দেখে? এই রহস্যই টেনে নিয়ে গেছে বোটডেকে। চার্লির সঙ্গে সুহাসের এত গা মাখামাখি কেন, এই রহস্যই টেনে নিয়ে গেছে কিনারায়। বুনো ফুলে ঘ্রাণ আছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সব দৈব নয় বুঝলি!'

'তা হল বলছ, দুই ভগিনীপতি জানত যে চার্লি মেয়ে?'

'জাহাজে ওঠার আগে সংশয় ছিল। কারণ চার্লির জন্মের আগে তার ঠাকুরদা উইলটি প্রকাশ করেন। লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট অফ জোহান্স মিলার—উইলের কপি আমার কাছে আছে। কাপ্তান জানেনই না এখনও, তাঁর মূল্যবান কাগজপত্র সব চুরি গেছে। তবে টের পাবেন। উইলের কপিটি তোমরা দ্যাখ। পড়। বুঝতে না পারলে বলবে। আমিও সব জায়গায় বুঝতে পারিনি! ফিল বুঝিয়ে দিয়েছে। কাপ্তান ফিরে এলে ধরা পড়বই।'

এবারে ঢোক গিলে সুরঞ্জন বলল, 'চা করে আনি। তারপরে বের করবে। এ তো চমকপ্রদ নাটক। তুমি যে দেখছি শার্লক হোমসের বাবা। তাঁর ভূমিকাটি ভালই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছ। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। চা না খেয়ে তোমার উইল দেখতে গেলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারি। তুমি কি তা চাও।'

'বললাম তো চা করে আন।'

'বের করবে না। আমি এলে বের করবে।'

'বের করছি না। যা তো!'

সুরঞ্জন সিঁড়ি ধরে কিছুটা উঠে গিয়েই মনে পড়ল, সুটের তলার লোকটা মরে পড়ে আছে। সে একা ডেকে যেতে সাহস পেল না। সে ফিরে আসার সময় হঠাৎ মনে হল বংশী ভিতরে গোঙাচ্ছে। সে নেমে এসেছিল অধীরকে সঙ্গে নিয়ে উপরে যাবে বলে, আর বংশীর দরজাতেই তাকে থেমে যেত হল। বংশীর কি হল আবার! ছুটে এসে বলল, 'মুখার্জিদা বংশী···।'

'বংশী কি!'

'বংশী গোঙাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়লেন। দরজা পার হয়ে বংশীর ঘর খুলে অবাক। বংশী কম্বল গায়ে দিয়ে হি হি করছে। শীতে কাঁপছে। এত গরমে বংশীর এই পরিস্থিতি দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল। ব্যাটা ভয়ে জুজু। ভয়ে কাঁপছে! তবু তিনি গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, না জ্বরটর হয়নি! একা সে কিছুতেই ফোকসালে থাকতে রাজি না। আতঙ্কেই মরে যাবে। কি করেন!

অধীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ইচ্ছে হয় বল। তোমার কি ইচ্ছে হত?'

না মাথা গরম করে লাভ নেই।

তিনি পাশের ফোকসালে ঢুকে কেষ্টকে সন্তর্পণে ডেকে ওঠালেন। বললেন, 'আয়।'

কেষ্ট কিছুই বুঝতে পারছে না! সেও ভাল নেই।

মুখার্জিদা বললেন, 'বংশীর পাশের বাঙ্কে শুয়ে থাক। বোধ হয় জ্বর আসছে। তিনি বললেন না, সুটের তলায় মরা মানুষ পড়ে আছে দেখে ভয়ে কাবু। আতঙ্কে ব্যাটা কম্বলে মুখ মাথা শরীর ঢেকে শুয়ে আছে।

সুরঞ্জন বাইরে এসে বলল, 'অধীর চল না উপরে।'

'তা হলে এই সব বীর ভারতবাসী নিয়ে আমার জাহাজে যাত্রা। হয়েছে ভাল! যা অধীর। তারপর কিছু হলে দোষের ভাগী। সব দৈব! দৈব যখন, ডেকে উঠতে ভয় পাচ্ছিস কেন। মারব এক লাথি।'

'মার দাদা। সব মারতে পার। বাধা দেব না।'

মুখার্জি নিজের ফোকসালে ঢুকে আবার শুয়ে পড়লেন। চা এলে উঠবেন। পাচার করা উইলের কপিটি বালিশের তলায় রেখে দিলেন। ওরা নিজের চোখে দেখুক। মূল উইলের কপিটি কি করে কাপ্তান সংগ্রহ করেছেন তিনি জানেন না। তবে যে এত বড় জালিয়াতি করতে পারে তার পক্ষে সব সম্ভব। চার্লি যে ছেলে নয়, মেয়ে, চার্লিকে জাহাজে তুলে নিয়ে আসার পরও বোধ হয় কাপ্তান নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ফিলের ধারণা, সে বেটসিকে খতম করে দিতে একজন ট্রাকারকে ভাড়া করতেই পারে।

চা নিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে ঢুকল সুরঞ্জন। অধীর গায়ে গায়ে। যেন এমন পরিস্থিতি একলা পড়ে গেলেই উইলিয়ামের প্রেতাত্মা তাকে ছুঁয়ে দেবে।

মুখার্জি বললেন, 'দ্যাখ জাহাজে ভূতটুত নিয়ে একটু কি বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না। মধ্যরাতে বোটডেকে নারী। এখন বুঝতেই পারছি তিনি কে। তিনি যে আদ্যাশক্তি মহামায়া চার্লি, বুঝতে কি কোনও অসুবিধা আছে! বেকুফের মতো সবাই জাহাজটাকে দুষছে। জাহাজটা দোষ পেয়েছে। আহমদ পালাল। ব্যাটা দেখবি তো কম্বল তুলে কি আছে বাঙ্কে। মরা মানুষের আর কাজ নেই, হেঁটে গিয়ে আহমদের নরম বিছানার লোভে শুয়ে না পড়লে যেন ঘুম হবে না। সুতরাং ঘোর থেকে সব হয় বুঝতেই পারছ। ঘোরে পড়েই আহমদ বরফ-ঘরে মেয়েমানুষের লাস ঝুলতে দেখে। ঘোর বড় বিষম বস্তু। এক ধরনের মানসিক রোগ এটা বুঝিস?'

'সব বুঝি দাদা। না বুঝলেও আরা তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছি না।' অধীর বড়ই কৃতজ্ঞ যেন মুখার্জিদার উপর।

'এই ঘোরে পড়েই আদ্যাশক্তি মহামায়া বুড়ো মানুষের মুখ দেখতে পায়। মুখোস না, সে দেখে তার ঠাকুরদার মুখ। ঠাকুরদার মুখটি তাকে অনুসরণ করছে।

'কে বলল, ঠাকুরদার মুখ তাকে অনুসরণ করছে। আমরা তো জানি না।' প্রায় সমস্বরে অধীর সুরঞ্জন একসঙ্গে বলে উঠল।

'কে বলবে বোঝ না! কে বলতে পারে? কাকে চার্লি বিশ্বাস করে সব বলত!'

'শেষে চার্লি তার ঠাকুরদার পাল্লায় পড়ে গেল! সুহাসকে নিয়ে লোকটার তবে এত

খোঁজাখুঁজি কেন?'

'খোঁজাখুঁজির অজুহাতে সুহাসকে হয়তো ডেরিকের নীচ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ ডেরিক পড়বেই সে হয়তো জানত। অবশ্য এটা আমার ধারণা। আবার এমনও হতে পারে, পোর্টহোলে গভীর রাতে মুখোশটি দেখে মনে হয়েছে, কেউ তাকে ঠাকুরদার মুখোশ পরে ভয় দেখাচ্ছে না তো! শোন বোঝার চেষ্টা করবি। চার্লি মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদের শিকার হত। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তখনই সে দূরের ঝোপ জঙ্গলে মুখোশ উঁকি দিলে ভাবত কে তাকে অনুসরণ করছে! সে পোর্টহোলেও দেখেছে, মধ্যরাতে মুখোশ। বন্দরে খোঁজাখুঁজি করে বের করা কঠিন। কিন্তু জাহাজে? খুব সোজা। সে তো মুখোশ ভাবত না। বুড়ো মানুষ ভাবত। জাহাজে বুড়ো মানুষটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেল না। এক কথা বার বার বলতেও ভাল লাগে না। তোরা তো জানিস সব।'

'জানলেও রহস্য থেকে যায়। তারপর আর খোঁজাখুঁজি করল না কেন?'

'করল না, সে ধরেই নিয়েছিল, তার ঠাকুরদাই ঘুরে ফিরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। অন্য কেউ নয়। কারণ চার্লি জানত, তাকে কেন্দ্র করে পরিবারে একটি বড় পাপচক্র গড়ে উঠেছে। ঠাকুরদাকে সে ঠকিয়েছে। ঠাকুরদা বড় লেটে বুঝতে পারেন। চার বছরের চার্লি বাথরুম থেকে উলঙ্গ অবস্থায় ছুটে যাকে দেখেছিল, সে তার ঠাকুরদা। বেটসি ছুটে গেছে, সামলাতে পারেনি। মহামায়ার মায়াপাশে সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ। পক্ষাঘাত। যতদিন বেঁচেছিলেন, চোখ বরফের মতো শীতল। বীভৎস। মায়াপাশে বন্ধ চার্লির ঠাকুরদা বাকরহিত। চার্লি এমনিতেই তার ঠাকুরদাকে যমের মতো ভয় পেত। এট বেটসির চক্রান্ত বলতে পারিস। ঠাকুরদাকে দেখলেই ভয়ে পালাত। কাছে থাকত না। অবশ্য তিনি ক্যাডো লেকের প্রাসাদে কমই যেতেন। গেলে বেশিদিন থাকতেনও না। বুনো ফুলের নেশায় যুদ্ধের মধ্যেও দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ থেমে বললেন মুখার্জি, কি তোদের কিছু জিজ্ঞাস্য নেই?'

'না দাদা!'

'নারীর মূলাধারটিই শেষে বুড়োকে আহম্মক বানিয়ে দিল। তিনি এত বড় আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নাগপাশে বন্ধ হয়ে গেলেন। পক্ষাঘাত। দেবীর এই মহিমাটুকু এখানে শেষ করতে পারলে বোধ হয় ভাল হত।' থেমে বললেন, 'লম্বা সাদা দাড়ি, চুল বড়। সাদা চুল আর দাড়ি কিন্তু পক্ষাঘাতে কাবু হয় না। হয় কি?'

'বোধ হয় হয় না?'

'বোধ হয় বলছিস কেন?'

অধীর বলল, 'আমি কোনও পক্ষাঘাতের রুগি দেখিনি—কি করে জানব, পক্ষাঘাতে চুল দাড়ি বাড়ে না কমে?'

'তোদের এটাও জেনে রাখা ভাল, মূলাধারটিকেই আমাদের মুনিঋষিরা দেবী বলেছেন, বিশ্বরূপেণ সংস্থিতা বলেছেন। খুবই উচ্চমার্গের কথা। আর কাপ্তান মিলার কি করলেন, তাকেই অপমান করলেন! ঝাটো করলেন।'

মুখার্জিদা লকারে আবার কি খুঁজছেন। পেয়েও গেলেন। আসলে তিনি জানেন, তাঁর

সহকারীদের সব দেখিয়ে রাখা ভাল—বলেই একটি চিঠি বের করলেন।

এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়।'

কয়েক ছত্রে মেয়েলি হস্তাক্ষরে চিঠি।

ওরা পড়ে বলল, 'কে লিখেছে?'

'কেন, বুঝতে পারছিস না?'

'বেইসি?'

'বেইসি নয়, বেটসি। কি লিখেছে পড়্‌লি!'

অধীর পড়তে লাগল, 'লিখেছে, চার্লি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে যায়। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে মেয়েদের পোশাক পরে বের হয়ে যায়। সব প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে—যতই বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াক কার নজরে কখন পড়ে যাবে। এ-ভাবে তাকে রাখা আর নিরাপদ ভাবছি না। আমার শাসন একদম গ্রাহ্য করে না। ধরা পড়ে গেলে সমূহ বিপদ। তাকে বার বার বুঝিয়েছি—প্রেইজ দ্য লর্ড। হাউ গুড ইট ইজ টু সিঙ হিজ প্রেইজেস। হাউ ডিলাইটফুল, অ্যান্ড হাউ রাইট। সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না। বুঝিয়েছি, এটাই তোমার নিয়তি। জালিয়াতির শাস্তি কত কঠিন তুমি জান না। তোমার বাবা জালিয়াতির মামলায় জড়িয়ে পড়বেন। নিজেকে সংশোধন কর। শুধু তোমার ঠাকুরদার এস্টেটই বেহাত হবে না, তোমার বাবারও জেল জরিমানা হবে। কোনও কথাতেই কর্ণপাত করছে না। আপনি অনুগ্রহ করে জানান, এমত অবস্থায় এই নির্জন জঙ্গল প্রাসাদে আমার কি করণীয়।'

সুরঞ্জন বলল, 'তা হলে বলতে হয় দেবী স্বমহিমায় আবির্ভূতা হলেন।'

অধীর বলল, 'দেবী আর ছদ্মবেশে থাকতে রাজি হলেন না।'

মুখার্জি চিঠিটা ভাঁজ করে আবার কি বের করার সময় বললেন, 'চার্লির জন্ম থেকে চূড়াকরণে সর্বত্র কারচুপি।'

'ষোল বছরে ষোলকলা পূর্ণ। সেই ষোল বছরের ষোলকলা পূর্ণ করার জন্যই চার্লিকে জাহাজে তুলে আনা। কোনরকমে ষোলটা বছর পার করে দেওয়া। তারপরই কাপ্তান চার্লির সোল একজিকিউটার। একুশ বছর বয়সে চার্লি সম্পত্তির মূল অধিকারী। অর্থ পাগল মানুষ এত বড় এস্টেট হাত ছাড়া হয়ে যাবে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। এমন চতুর লোক এত বড় একটা কাঁচা কাজ করতে পারে ভাবাই যায় না। দেবী কখনও স্বরূপে প্রকাশিত না হয়ে পারেন বল!'

'পারে না।'

'তা হলে বুঝতে পারছিস, সুহাসকে কেন তিনি প্রশ্রয় দিতেন।'

'চার্লিকে শান্ত রাখতে।'

'সবই তো বুঝিস দেখছি। জাহাজে উঠে দেখিসনি—রোজ চার্লি একটা না একটা আপদ সৃষ্টি করত। সারা জাহাজ ছুটে বেড়াত। দড়ি দড়ায় ঝুলে বাপের মাথায় পা রেখে ব্রিজে উঠে যেত। ল্যাং মেরে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ফেলে দিত। আরও কত আপদ। সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। চার্লিকে দেখলে সবই পালাত। সবই তো দেখা। কেবল সহাস সামনে

পড়ে গেলে, শান্ত হয়ে যেত। ফিরে যেত মুখ নিচু করে। চোখ নামিয়ে নিত। কাপ্তান সুযোগ পেয়ে গেলেন। কার্য উদ্ধারে সুহাসকে ভাবলেন, সাময়িক হাতিয়ার। তাকে তিনি সরিয়ে দেবার কথা ভাবতেই পারেন না।'

'কি আমি ঠিক বলছি?' বলে সুরঞ্জনের দিকে তাকালেন। তারপর সেই চরম নিদর্শনটি বের করলেন, বালিশের তলা থেকে—

'আমি পড়ে যাচ্ছি—শুনে যা।'

'লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট অফ জোহান্স মিলার, ক্যাডো লেক, টেকসাস। ডেটেড দিস টুয়েলভথ ডে অফ নুন, নাইনটিন থার্টি সেভেন। নীচে সলিসিটারের ঠিকানা, ফ্র্যাঙ্ক ওরেলস, স্টানফোর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া।'

মুখার্জি সহসা উঠে গিয়ে লকারে ফের কি খুঁজলেন—একটা চিরকুট—মেলে ধরলেন, 'এতে কি কিছু বোঝা যায়?' আমি ঠিক ধরতে পারছি না। মনে হয় মিডওয়াইফ ডক ক্যাথির হস্তাক্ষর। যিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে চার্লিকে পুত্রসন্তান বলে ঘোষণা করেছিলেন—তিনি এবারে চিরকুটটি মেলে ধরলেন, ছেঁড়া কাগজও কাজে লাগতে পারে ভেবে রেখে দিয়েছেন। মাত্র দুটো লাইন—ডক ক্যাথি অর দ্য মিডওয়াইফ, নিউ হু হি ওয়াজ, দ্য আইডিয়া দ্যাট এ্যা ম্যান মাইট বি সামবডি এলস অল হিজ লাইফ অ্যান্ড নেভার বি অ্যাওয়েয়ার অফ ইট—অসম্পূর্ণ, আগেও কিছু নেই পরেও কিছু নেই।'

'কোথায় পেলে!' সুরঞ্জন অধীর এর অর্থ সঠিক ধরতে না পেরেও চার্লি যে জালিয়াতির শিকার ভাবতে আর দ্বিধা করল না।

তারপরই মুখার্জি দু'জন সাক্ষীর বয়ান এবং তাদের নাম পড়ে গেলেন। একজন জর্জ মরিস, ক্যাডো লেক, এবং অন্য জন খোদ উইলি বেটসি।

'কি লেখা আছে? পড়, শুনি।'

মুখার্জিদা চোখ বুজে থাকলেন—

সুরঞ্জন পড়ছে, 'সাইনড বাই দি সেইড জোহান্স মিলার অ্যাভাব নেমড টু বি হিজ লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট ইন দি প্রেজেন্স অফ আস···। মনে রাখবি উইল কিন্তু একটি জন্মের আগে এবং অন্যটি চার্লির জন্মের পর। প্রথম উইলে লেখা, ইফ এনি গ্র্যান্ডসন, দ্বিতীয় উইলে লেখা মাই গ্র্যান্ডসন জন মিলার।

'এখানে কি লেখা আছে? পড়।'

'ইন কেস মাই সেইড টু সনস ডু নট হ্যাভ এনি সনস দেন অ্যান্ড ইন সাচ কেস মাই সেইড এস্টেট উইল বি গিভেন টু ন্যাশনাল ওয়াইলড ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টার—সানফ্রানসিসকো।'

'অ্যাম আই রাইট! কাপ্তান মিলার প্রথম উইলের ভিত্তিতে মিডওয়াইফ ডক ক্যাথি এবং স্ত্রী ক্যালির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চার্লিকে পুত্রসন্তান ঘোষণা করে নিজের পিতৃদেব জোহান্স মিলারকে ধোঁকা দেন। প্রতারণা, জালিয়াতির শাস্তি স্টেটগুলোতে এক একরকম। টেকসাসে কি শাস্তি হয় আমার জানা নেই। তবে ফিল বলেছেন, আদালতে প্রমাণিত হলে নির্ঘাত দশ বছরের জেল। উইল বাতিল। তাহলেই বুঝতে পারছ, চার্লিকে খুঁজে

না পেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।'

'এটা বোধ হয় চার্লির আঁকা শেষ ছবি।' লকার থেকে ছবিটা বের করলেন। তোরা তো জানিস ময়লা ফেলার ঝুড়ি থেকে চার্লির সব পরিত্যক্ত ছবি আমি রাতের অন্ধকারে সংগ্রহ করতাম। তোদের বলেছি—ছবিগুলিতে ক্রোধ এবং সুষমা দুইই ফুটে উঠত। এটা অবশ্য চার্লির কেবিন থেকে তুলে এনেছি। দেয়ালে টাঙানো ছিল। বোধ হয় চার্লির এটাই শেষ ছবি।'

তিনি যত্নের সঙ্গে ছবিটা দেয়ালে গেঁথে দিতে থাকলেন।

'আকারেও বড় ছবিটা। চার্লির প্রেসরপিনা। সিংহের মতো মুখ, এক সুকুমারীকে উলঙ্গ করে বাঁ হাতে জাপটে ধরেছে। ছবিটা রোমের আর্ট গ্যালারিতে দেখে সে একবার ভিরমিও খেয়েছিল। অবশ্য তোরা দেখতে পাচ্ছিস ছবিটাকে চার্লি খুব বেশি কালো রং ব্যবহার করেছে। দূর থেকে দেখলে নিশীথের গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু টের পাওয়া যায় না। এমনও নয় ছবিটা সে-ই প্রেসরপিনার নকল। কাছে এলে বুঝতে পারবি, অন্ধকারে উইন্ডসহোলে হেলান দিয়ে সুটের পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। লম্বা টুপি মাথায়। গায়ে কালো পোশাক। হাত পা মুখ স্পষ্ট নয়। সুটের পাটাতনে সে এসে গভীর রাতে দাঁড়াবেই চার্লি জানত।'

'তা হলে কি বুঝলি?'

'হাত পা মুখ স্পষ্ট নয়।' অধীর দেখে বলল।

চার্লি পেতলের বলগুলি জোগাড় করেছে উইনচের বাতিল স্ট্র্যাপার থেকে। উইলিয়ামকে সে চিনতে পেরেছে। যতই গিরগিটি গোঁফ পরে ছদ্মবেশে ধারণ করুক, সুহাসকে ঘুষি মারার সময় সামনাসামনি দেখে চিনে ফেলেছে। মিশনে দেখেছিল দূর থেকে—চিনতে পারেনি। ঘোড়ার পিঠে উঠে চিৎকার করে উঠেছিল, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদইভিল। নাথিং ক্যান স্টপ মি। কেউ পারেওনি। অ্যাম আই রাইট?'

'রাইট।' সুরঞ্জন বলল। 'তা হলে সূত্রটা কি। ম্যাক আর উইলিয়াম শ্বশুরের জাহাজে উঠে এসেছিল উড়ো খবরের ভিত্তিতে। যদি সত্যি চার্লিকে আবিষ্কার করা যায়। সমুদ্রের ধারে আবিষ্কারের কাজটি সম্পূর্ণ হাসিল। ম্যাক আর উইলিয়াম দুজনই ব্ল্যাকমেল করে সম্পত্তির অংশ আশা করতে পারে, কাপ্তান না মানলে, আদালতগ্রাহ্য অপরাধ—উইল বাতিল। অ্যাম আই রাইট? নানা দিক ভেবেই তারা উঠে এসেছিল। কেন চার্লিকে নিয়ে জাহাজে ঘুরছেন মিলার!'

'উইল বাতিল বলছ কেন?' সুরঞ্জনের সোজা প্রশ্ন।

মুখার্জি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি কি কোনও বড় রকমের পয়েন্ট মিস করে গেছেন। এত সহজ বোধগম্য কারণগুলি তো এদের না বোঝার কথা না।

তিনি বললেন, 'ফের আর একবার চার্লি রহস্যের পয়েন্টগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। বোঝার চেষ্টা করবি। বলে তিনি তাঁর ছড়ানো আঙুলে এক একটা পয়েন্ট ছুঁয়ে যেতে থাকলেন।

'এক—জোহান্স মিলার চার্লির জন্মের আগে যে উইলটি করেন, চার্লির জন্মের পর

তা ফের পাল্টান। ওটাই জোহান্স মিলারের লাস্ট টেস্টামেন্ট। আগের উইল তিনি তাঁর গ্র্যান্ডসনকে সম্পত্তি দান করে যান। গ্র্যান্ডসন না থাকলে সম্পত্তির মালিক ন্যাশনাল ওয়াইলড ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টার। তোমরা নিশ্চয়ই জানো চার্লির নিজের দিদিরা তখন বড় হয়ে গেছে। যে যার মতো উড়ে গেছে। চার্লির তখন জন্মই হয়নি।'

অধীর বলল, 'তা হলে দুটো উইল।'

মুখার্জি ধমক দিয়ে বললেন, 'দুটো উইল হয় না বুঝলি। উইল একটাই। শেষ উইলটি আদালতগ্রাহ্য। প্রথম উইলটি আমাদের কাপ্তান ফাঁস কবে জানতে পারেন, তাঁর কোনও পুত্রসন্তান থাকলে সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবেন। এখন তোরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারিস, দুটো উইলের কথা বলছি কেন তবে। কাপ্তান চার্লিকে পুত্র বলে ঘোষণা করেন প্রথম উইলের ভিত্তিতে। কিন্তু পরের উইলে কি আছে—তাতে দেখছি সরাসরি সব বিষয় সম্পত্তি চার্লিকে লিখে দিয়েছেন তার ঠাকুরদা। সঙ্গে একজন সোল একজিকিউটারও নিযুক্ত করে গেছেন। চার্লি, তার বাবা কাকাদের মতো উচ্ছন্নে না যায়, সে জন্য ঠাকুরদা তাঁর বড় পুত্রকেই সোল একজিকিউটার নির্বাচিত করে যান। তবে চার্লি অপঘাতে মারা গেলে, অপহরণ কিংবা নিখোঁজ হলে অথবা উন্মাদ হয়ে গেলে ঠাকুরদার সব বিষয় আশয় চলে যাবে ওয়াইলড ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টারের হাতে। আশা করছি প্রথম উইল এবং দ্বিতীয় উইলের বয়ানের তফাত কোথায় কতটুকু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। গোলমালও থাকার কথা না।'

'না।' খুবই অকাট্য যুক্তি দাদার। ঘাড় কাত করে সুরঞ্জন অধীর দু'জনেই মেনে নিল।

'এত উজবুক তোরা! কোনও গোলমাল নেই ভেবে ফেললি। গোলমালটা কোথায় বুঝলি না! সব সময় মাথায় রাখবি, জোহান্স মিলার তাঁর লাস্ট টেস্টামেন্টে সব বিষয়-আশয় গ্র্যান্ডসন চার্লিকে দিয়ে গিয়েছেন। প্রতিটি বাক্যের প্রথমে কিংবা শেষে তিনি গ্র্যান্ডসন কথাটা উল্লেখ করেছেন। মাই গ্র্যান্ডসন জন মিলার। চার্লির আসল নাম জন মিলার। একবারও বলেননি, শুধু জন মিলার। সব শর্তের শেষে তিনি লিখেছেন, মাই গ্র্যান্ডসন। কোথাও কি লেখা আছে গ্র্যান্ডডটার? বলে তিনি তাঁর ফাইল থেকে উইলের পাচার করা কপিটি খুলে পড়তে দিলেন। বললেন, খুঁজে দ্যাখ কোথাও শুধু জন মিলার লেখা আছে কি না?'

কিছুটা দেখে উল্টেপাল্টে সুরঞ্জন বলল, 'ঠিক আছে বলে যাও : বলে কপিটি মুখার্জিকে ফেরত দিলে তিনি বললন, বুঝতে পারছিস আমার সিদ্ধান্তগুলি খুব একটা লঘুপাকের নয়।

'বার বার এক কথা বলছ কেন বলত।' অধীর বিরক্ত প্রকাশ না করে পারল না।

'বাট আসলে শী ইজ এ গ্র্যান্ডডটার। নট গ্র্যান্ডসন। যদি প্রমাণ হয় উইলের মূল শর্তটিই উপেক্ষিত, জন মিলার ইজ নট এ সন, বাট এ ডটার তা হলে ঠাকুরদার লাস্ট টেস্টামেন্ট ফালতু হয়ে যায় না! ষড়যন্ত্র, কারচুপি, জালিয়াতি মামলার আসামি কাপ্তান এবং তার ছদ্মবেশী পুত্র দু'জনেই—এমন প্রমাণ করা কি আদালতে খুব একটা কঠিন কাজ হবে?'

'আদৌ কঠিন হবে না। জলবৎ তরলং হয়ে সোজা জেলখানার অন্ধকারে।'

মুখার্জি খুবই তৎপরতার সঙ্গে বলে গেলেন—'আর এ-কারণেই ব্ল্যাকমেলের সূত্রপাত। সংশয়, কাপ্তান তাঁর পুত্রকে নিয়ে জাহাজে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন! দিদিরা তো খাপ্পা। ভগিনীপতিরাও। কিছু একটা আছে। উইলিয়াম, ম্যাক দু'জনেই উঠে এসেছিল—চার্লির সঙ্গে ম্যাকের ঘনিষ্ঠতাও এ-কারণে। আঁচ করতেও পারে, নাও পারে। তবে আঁচ করতে পেরেছিল মনে হয়। চার্লিকে নিয়ে কোনরকমে দেশে ফিরে যাওয়া। অপেক্ষা, কখন উত্তরাধিকার চার্লির উপর বর্তায়। বর্তালেই মামলা ঠুকে দেওয়া মহামান্য আদালতের কাছে। মাই লর্ড, জন মিলার আদপেই জোহান্স মিলারের গ্র্যান্ডসন নয়। চার্লি জোহান্স মিলারের গ্র্যান্ডডটার। চার্লির দফা রফা। কাপ্তানের হাতকড়া। কি, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?'

'না।'

'মাথায় তোদের কিচ্ছু নেই। চার্লির দফা রফা হলে কি হচ্ছে। বিষয়-আশয়ের কি কোনও নিষ্পত্তি হচ্ছে। উইল বাতিল হলে স্থিতাবস্থা অথবা ন্যাশনাল ওয়াইলড ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টার বিষয়-আশয়ের মালিক হতে পারে। তা কোর্টের ডিসিসান। ফলে উইলিয়াম আরও একটি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ডেরিক ফেলে ম্যাককে নিকেশ করে দেওয়া হল। সুহাস থাকলে, সেও যেত। এক ঢিলে দুই পাখি। হল না। বার বার ফাঁদ পেতে সুহাসকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মধ্য রাতে উইন্ডসোলের মুখে চিৎকার করে চার্লিকে শাসাত—দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ। আর চার্লি ছেলেমানুষ, এটা তোদের মনে রাখা দরকার। তাকে ব্ল্যাকমেল করাও সহজ। কিন্তু লোকটা জানতই না, চার্লি সরল সোজা এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেও কত সাংঘাতিক হতে পারে। ভালবাসার মহিমা যে ঈশ্বরের চেয়েও প্রবল। কিছুই সে তখন ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রেসারপিনা যে উইলিয়াম বুঝতে কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে! জালিয়াতির ভয় দেখিয়ে বাপ বেটাকে কাবু করাও সহজ।

উইলিয়াম ব্ল্যাকমেল করে চার্লিকে তার তাঁবে রাখতে চেয়েছিল। পরিকল্পনাটি নিখুঁত এবং ভয়ঙ্কর। তাঁবে রাখতে পারলে গাছেরও খাবে তলারও কুড়াবে। একজন তরুণীর পক্ষে এট কত বড় মর্মান্তিক বিভীষিকা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবার কথা নয়। চার্লির কাছে উইলিয়াম সেই প্রোসরপিনা হয়ে গেল। একজন দানব কোনও সুকুমারীকে রেপ করছে। দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠলেই চার্লি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। সুহাস ছাড়া আর কে আছে জাহাজে, উইলিয়ামের কাছে ডেনজারাস ট্র্যাপ হতে পারে? সুহাসের সঙ্গে চার্লি পালিয়ে গেলে ওর যে সর্বনাশ। আমও গেল ছলাও গেল। একজন নেটিভের এতটা বেয়াদপি সে সহ্য করবে কেন? কি আমি ঠিক? ঈর্ষা ঘৃণা, লোভ যৌন লালসায় মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। দানব হয়ে যায়। প্রোসরপিনা হয়ে যায়। উইলিয়াম তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।'

'যা বলছিলাম, তার আগেই জাল পাতা হল। কেন? ম্যাক জানত, চার্লি মেয়ে। ম্যাকের কথার উপর ভিত্তি করে জালটা পাতা হয়েছিল। মরবে, তবে খুন বলে গ্রাহ্য হবে না। নেহাত দুর্ঘটনা। চার্লি যে ফাঁদ পাতল, মরবে, তবে খুন বলে গ্রাহ্য হবে না। দুর্ঘটনা।

পাটাতন হড়কে লোকটা পড়ে গেছে। টিট ফর ট্যাট। অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেত। যাকগে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। আইন-আদালত ভাল বুঝিও না। যা বুঝি তাই বললাম। ঠিক বেঠিক জানি না। কি বলছিলাম?' মাথা চুলকোতে থাকলেন মুখার্জি।

'হ্যাঁ মনে পড়ছে। ডেক কশপ লত্তু মিঞা স্বীকার করেছে ম্যাক কি দরকারে তার কাছ থেকে একটা খালি রঙের টব চেয়ে নিয়েছিল। নেটিভটার বাড়াবাড়ি তাদের পছন্দ হচ্ছিল না বোধহয়। সুহাসের সঙ্গে চার্লির মেলামেশা দুজনেরই চোখের বিষ। উগ্র বর্ণবিদ্বেষীরা কি করতে না পারে! ফিল তো বলল, উইলিয়ামের পূর্বপুরুষ রমণীদের দিয়ে ব্রিড করাত। হাঁস মুরগি পালন—ডিম ফুটে বাচ্চা হলে বড় করা, তারপর বিক্রি। ক্রীতদাস প্রথা বেআইনি হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায় রমরমা। নিগ্রো রমণীদের ক্ষেত্রটি অনুর্বর হয়ে গেলে খামারের কাজে লাগাত। অন্তত আট দশটি নিগ্রো যুবককে পরিবারটি গাছে ঝুলিয়ে চামড়া তুলে হত্যা করেছে। নিউ পার্থের এই পরিবারটির কুখ্যাতির কথা লুসিয়ানার নিগ্রোদের এখনও দুঃস্বপ্ন। এরা দু'জনই সেই পরিবারের। দু'জনেরই এক পদবী—লিনচার। উইলিয়াম লিনচার। ম্যাকি লিনচার।

অধীর সুরঞ্জন দু'জনেই উঠে গিয়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বলল, 'তিনিই তবে আমাদের মেঘনাদ। মেঘের ওপার থেকে কথা বলতেন। চার্লির এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।'

'ইয়েস। উইলিয়াম রোজ মধ্যরাতে বের হয়ে অন্ধকারে উইন্ডসহোলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াত। পাইপ টানত। শাসাত, দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ।'

'কি জঘন্য? সত্যি ভাবা যায় না।' সুরঞ্জন বলল।

মুখার্জি বললেন, 'ছবিটার নীচে চার্লি কি লিখেছে দেখ।'

'লিখেছে', গড ক্রিয়েটেড অল ক্রিয়েচার্স অ্যান্ড অলসো উইকেড টু বি পানিসড।'

'এরপর আর কোনও সংশয় আছে তোদের পাটাতনের নীচে চার্লি ছাড়া কে আর পেতলের বল সাজিয়ে রাখতে পারে। নাও যাও। এবার শুয়ে পড়গে। সুহাস এসে কি খবর দেয় দ্যাখো। কাপ্তানও ফিরে আসবেন। লকারে পাচার করা কাপ্তানের কাগজপত্র থাকল। ফিলের কাছে কপি আছে। মনে হয় না কাপ্তান সহজে পার পাবেন।'

অধীর সুরঞ্জনের ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মুখার্জি বললেন, 'এখনও কি তোদের কোনও সংশয় আছে?'

অধীর মাথা চুলকে বলল, 'না বলছিলাম, সুহাসকে অন্ধকার ইঞ্জিন রুমে নিয়ে গিয়ে কে চুবিয়ে মারতে চেয়েছিল। সুহাস তো বলল, কোনও অদৃশ্য প্রেতাত্মা। তার নাকি মুখ হাত পা কিছুই সে দেখতে পায়নি।'

মুখার্জি যেন কিছুটা হাঁপিয়ে উঠছেন। তা উঠতেই পারেন। দুদিন ধরে যা ধকল যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুধু বললেন, 'আর শরীর দিচ্ছে না। কত রাত যেন ঘুমাই না। কিছুতেই কিছু বুঝতে চাস না। তবে জেনে রাখ কাজটা উইলিয়ামের। শেষ পর্যন্ত না পেরে ট্যাঙ্কের জলে দম বন্ধ করে সুহাসকে খুন করতে চেয়েছিল। কি নিষ্ঠুর বল। পারে। এরা সব পারে। রক্তে দোষ থেকে গেছে।'

অধীর বলল, 'কেউ তো দেখেনি তাকে? তুমিও না। চার্লিও না। সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান করছ!'

'না, না, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নয়।' প্রায় উঠে বসেছিলেন মুখার্জি। তারপর শুয়ে পড়লেন। 'তোরা ওর কেবিনে গেলে দেখতে পাবি চার্লির ঠাকুরদার জীবন ও বাণী বইটি তার ঘরে পড়ে আছে। চার্লি বইটি সুহাসকে দিয়েছিল। বইটি আমার খুব দরকার। ইঞ্জিনরুমে নামার সময় বইটি যে তার হাতে ছিল বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে। বইটি পরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কে নিল! সুহাস বইটি আমাকে দিতে পারেনি। চার্লির কাছ থেকে সে চেয়ে এনেছিল। তারপর সে তো কিছুই মনে করতে পারছিল না। ইঞ্জিনরুম থেকে দাদাশ্বশুরের বইটি উইলিয়াম তুলে নিয়েছে।'

'তুমি দেখেছ, উইলিয়ামের কেবিনে আছে?'

'না দেখিনি। এটা অনুমান। ঠিক অনুমানও বলতে পারিস না। এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার কি হয়?'

অধীর বলল, 'এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার?'

'এও তাই। দেখে আসতে পারিস। বইটি কোথায় যাবে। ইঞ্জিনরুমে সুহাস উইলিয়াম ছাড়া আর কে ছিল যে বইটা নিতে পারে। জাহাজ তো এখন বাপ মা করা অনাথ। গিয়ে দেখে আয় না। ওর কেবিন তো খোলা আছে।'

'ওরে বাব্বা। ওদিকে যেতেই পারব না। মেরে ফেললেও না।'

'তবে চল দেখে আসি। সূত্রটি ঠিক কিনা?'

তিনি যাবার সময় বললেন, 'ফরোয়ার্ড ডেক ধরে যাওয়াই ভাল। কারও চোখে পড়বে না। তবে কেউ বাইরে নেই। খুব সতর্ক থাকারও কিছু নেই।' তিনি উইলিয়ামের কেবিন ঠেলা মারতেই খুলে গেল। খোলাই ছিল। তার টেবিলে অধীর সুরঞ্জন দেখল, সত্যি ডরোথি ক্যারিকো নামে বইটি পড়ে আছে। ভিতরে আলো জ্বালাই ছিল। এখন পর্যন্ত কেউ নেভায়নি।

'এটা এখানে আসে কি করে?'

অধীর সুরঞ্জন মুখার্জির পায়ে গড় হতে গেল। 'তুমি সত্যি গুরুদেব।'

ওরা বের হয়ে আসার সময় দেখলেন সব সুনসান। এমন মৃত জাহাজে হেঁটে বেড়াতেও আতঙ্ক হচ্ছে। কে আগে যাবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি।

মুখার্জি সিঁড়ি ধরে নামার সময় বললেন, 'তাহলে বুঝলি, অদৃশ্য আত্মা কিংবা প্রেতাত্মার কাজ নয়। সি-ডেভিল লুকেনারেরও কাজ নয়। আসলে আমরা নিজেরাই কখন ডেভিল হয়ে যাই। কখন হোলি স্পিরিট হয়ে যাই জানতে পারি না। যত দোষ সব অপদেবতাদের।'

ওরা ঘরে ঢুকে গেলে অধীর দরজা বন্ধ করে দিল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। সুরঞ্জন বলল, 'আমিও খাব।' বলে সেও ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেল। তারপরই বলল, 'আচ্ছা তোমার মনে আছে, চার্লি কিন্তু বলেছিল, তার জন্মাবার আগেই ঠাকুরদা গত হয়েছেন। কেন বলল, বল তো?'

'আরে বুঝছিস না কেন? চার পাঁচ বছরের স্মৃতি তার মনে থাকার কথা না। শুধু হিম শীতল, দাড়ি গোঁফয়ালা একটা মৃতপ্রায় লোককে দিনের পর দিন দেখেছে, স্টাডিরুমে

পড়ে আছে। চার্লি সেদিকে যেতই না। ভয়ে ভিরমি খেত। বড় হলে নিশ্চয় বেটসি বুঝিয়েছে, সে জন্মাবার আগেই তার ঠাকুরদা মারা গেছে। চার্লির দোষ নেই।'

'কিন্তু দড়িটা কে টানল?'

'কে টানবে? উইলিয়াম। উইন্ডসহোলগুলিই ছিল তার ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র। সে সহজে তার কেবিন থেকে বের হত না। আমরা কখনও ওর এলাকায় যেতে পারতাম না। নিষিদ্ধ এলাকা। তাকে আমরা এই জাহাজে কে কবার দেখেছি বল! সে তার কেবিনে খাওয়া-দাওয়া করত। কেবিন আর ট্রানসমিসান রুম। ওর শ্বশুর চিনত না, চেনার কথাও নয়। গোটা পরিবারটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পনের বিশ বছর ধরে কেউ কারও খোঁজ রাখত বলে মনে হয় না!'

'না বলছিলাম, তবে কাপ্তান কেন মাই ফেইথফুল সেলর বলে লেকচার ঝাড়লেন।'

'শেষদিকে তিনি টের পেয়েছিলেন। বিশেষ করে চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বাপকে গালাগাল দেবার সময় উইলিয়াম সম্পর্কে নালিশও দিতে পারে। উইলিয়াম যে কাপ্তানের পুত্রটিকে শাসাচ্ছে, তাও বলতে পারে। ব্ল্যাকমেল করতে পারে। এগুলি কিন্তু কোনও রহস্যের মধ্যেই পড়ে না। অযথা আমাকে আর প্রশ্ন করে জ্বালাতন করিস না। মনটা ভাল নেই। সুহাস না আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। বড় দুশ্চিন্তা মাথায়।'

ওরা দু'জনেই চুপ।

কি আর বলা যায়।

তিনি যা বলছেন, সবই তো মিলে যাচ্ছে। কেবল মুখোস নিয়ে মগড়ার ধোঁকা ছাড়া আর কিছুতেই তিনি বোকা বনে যাননি।

ওরা বসেই আছে।

অগত্যা মুখার্জি বললেন, 'কাপ্তান শেষদিকে টের পেয়েছিলেন মেয়ের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে এবং জাহাজে তাঁর প্রতিপক্ষ উঠে এসেছে। বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মাথাও ঠিক থাকতে না পারে। মাই ফেইথফুল সেলর নিয়ে তোদের মাথা ঘামানোর কি দরকার পড়ল বুঝছি না।'

তারা উঠে পড়ল।

যেন দরজা খুলতেও ভয় পাচ্ছে।

তখনই মুখার্জি ডাকলেন, 'মনে রাখিস এটাও দুর্ঘটনা। চার্লিকে খুনি ভাবিস না। আত্মরক্ষার্থে শুধু নয়, সুহাসকে উইলিয়াম আজ হোক কাল হোক খতম করতই। চার্লি ঈশ্বরবিশ্বাসী। সে মনে করে, উইলিয়াম, সিনার। সে মনে করে সিনারকে শুধু সে সাতবারই ক্ষমা করেনি। আরও বেশিবার করেছে। তা না হলে সেভেনটি টাইমস সেভেনের কথা বলত না। চার্লিই বা কোথায় চলে গেল! কি যে খারাপ লাগছে! তবে আবার বলে রাখছি—এই ঈশ্বরবিশ্বাসী মেয়েটিকে নিয়ে কাপ্তান-যা করলেন, কিছুতেই তিনি পার পেতে পারেন না!'

পার পেলেনও না। সকালেই জাহাজে খবর এল, কাপ্তান মাদাঙে গুরুতর অসুস্থ। চিফমেট ফিরে এসেছেন। জাহাজে ফিরেই লাশ নিয়ে ফের থানা-পুলিশ—পুলিশও এসে

গেল। দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি হতে পারে! লাশ সুটের নীচ থেকে কপিকলে টেনে তোলা হচ্ছে। জাহাজিরা সব বিভ্রান্ত। লোকটিকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কিনারার লোক কি না কে জানে। কয়লার কালি মাখা মুখে জল ঢেলে দিতেই গোঁফ আলগা এবং উইলিয়াম হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সুরঞ্জন দেখল, বাঁ-হাতে ক্ষতের দাগ। বীভৎস শরীর। মুখার্জিদা আসেননি। পুলিশও জেরা করল, সাক্ষীগোপালের মতো। তারপর নৌকায় লাশ নিয়ে চলে গেল।

সারেঙের নজর পড়ল, জাহাজে সবাই আছে, সুহাস নেই। ছেলেটির প্রতি তাঁর মায়া আছে। ভদ্র ছেলে। কোনও কারণেই মাথা গরম করতে শেখেনি। না পেরে মুখার্জিবাবুকে তিনি বললেন, 'সুহাসকে দেখছি না। সে কোথায়!'

'কিনারায় গেছে। মনে হয় বিকেলে ফিরে আসবে। কাজে পাঠিয়েছি।' সারেঙ চলে যাচ্ছিলেন, মুখার্জিবাবু দৌড়ে গেলেন, 'চার্লির কোনও খবর পাওয়া গেছে।'

'না।'

'শুনলাম, কাপ্তান গুরুতর অসুস্থ।'

'ঠিকই শুনেছেন। চিফমেট কাপ্তানের কাজকর্ম দেখবে। মাদাঙে যাবার সময়ই কাপ্তান সংজ্ঞা হারা। হাসপাতালে আছেন। কোম্পানি তাঁকে দেশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।'

'চার্লির কি হবে? কোনও খোঁজই যে পাওয়া গেল না। ছেলেকে ফেলে চলে যেতে পারছেন!'

সারেঙ বললেন, 'কাপ্তানের বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বোধ হয় পক্ষাঘাত।'

মুখার্জি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন সুহাস ফিরে এলেই হয়! চার্লি ফিরে এলে হয়। জাহাজের সব অপদেবতা বিনাশ। ওরা ফিরে এলেই তাঁর আর কোনো অস্বস্তি থাকছে না।

কিন্তু এল না।

বিকেলেও এল না।

রাতেও ফিরল না। সকাল হয়ে গেল। মুখার্জিবাবু না পেরে ছুটে গেলেন ফিলের কাছে। ফিল তো অবাক! বললেন, 'সুহাস তো আসেনি। রাস্তা গোলমাল করে ফেলেনি তো!'

তিনি গেলেন আস্তাবলে। খোঁজ নিলেন, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, ডিনা ব্যাঙ্কের দুজন জাহাজি ঘোড়া নিয়ে গেছে। দু'দিন হল তাদের পাত্তা নেই। ঘোড়ারও না। খাতায় দেখলেন, সুহাস, চার্লি একদিনের হেরফের। কে কোনদিকে যে চলে গেল!

গেল কোথায় ছেলেটা। রাস্তা হারিয়ে ফেলল! কি করেন। ফিলের কাছে ফের গেলেন। দু-দিন হয়ে গেল পাত্তা নেই। ফিল শুনে বললেন, 'চল দেখি।' ফিল তাঁর লোকজনকে খবর পাঠালেন। না কোথাও খোঁজ নেই, না চার্লির, না সুহাসের।

মুখার্জি পাগলের মতো খুঁজছেন। রোজ ঘোড়া নিয়ে চলে যান। টিলায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। সামনে যতদূর চোখ যায় ঘাসের প্রান্তর না হয় ঝোপ-জঙ্গল। সঙ্গে কোনও দিন সুরঞ্জন না হয় অধীর থাকছে। নিনামুর এবং স্থানীয় লোকজনও থাকছে।

রোজ একবার ফেরার সময় আস্তাবলে খবর নেন। কোনও খোঁজ যদি থাকে। একদিন বন জঙ্গলে ঘুরে ফেরার সময় জানতে পারলেন, ঘোড়া দুটো ফিরে এসেছে।

'কোথা থেকে ফিরে এল?'

'তাঘড়ি টিলার নীচে ঘোড়া দুটো ঘাস খাচ্ছিল।'

তাহলে চার্লি আর সুহাস ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে। মুখার্জি তাঘড়ি টিলায় গেলেন। সারা সকাল দুপুর রোদ মাথায় করে টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফিলও সঙ্গে আছে। ফিল বলল, 'চল মুখার্জি। এভাবে সারাদিন রোদে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি।'

আসলে মুখার্জির কেন যে মনে হত সঙ্গে লোকজন আছে বলেই, সুহাস ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। একা থাকলে, লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে দু'জনেই উঠে দাঁড়াতে পারে। হাত তুলে দিতে পারে। তিনি এ-ভাবে একা একা দিনের পর দিন টিলার পর টিলায় দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চার্লি ব্লু স্টেম ঘাসের জঙ্গলে সুহাসকে নিয়ে যদি পালিয়ে থাকে। থাকতেই পারে। সমুদ্রে ঝিনুকের মাংস আর লেবুর রস, দুই উপাদেয় খাদ্য। সমুদ্রের ধারে ধারেও ঘুরে বেড়ালেন।

সুরঞ্জন বলত, 'চল। ফিরি।'

মুখার্জি বলতেন, 'তোরা যা আমি যাচ্ছি। এমন সুন্দর বুনো ফুলের উপত্যকায় ওরা থাকবে না হয় না।'

'গায়ে জ্বর নিয়ে ঘুরছ। তুমিও দেখছি শেষে বিছানা নেবে। চল প্লিজ।'

মুখার্জি ভাবতেন, ফুল ফুটবেই। যেখানেই ফুটুক, তিনি তাদের ঠিক দেখতে পাবেন। সুহাস এতটা বেইমানি করবে না। একবার অন্তত দেখা করে বলবে না, দাদা আমার জন্য ভেব না—আমি ভালই আছি। চার্লি অন্তত একবার দূর থেকে হাত তুলে বলবে না, হি প্রটেক্টস! আমাদের জন্য ভেবো না সুখানি! কিন্তু কারো পাত্তা নেই! এত বেইমান তোরা!

মুখার্জি এবার বিছানা নিলেন।

ফিল দেখতে এলেন। বললেন, কি ঝড়টা না গেছে! ডাক্তার সঙ্গে। ডাক্তার শুধু বললেন, বিশ্রামের দরকার।

তাঁকে সুরঞ্জন অধীর জাহাজ থেকে কিছুতেই আর বের হতে দিচ্ছে না। এমনকি সিঁড়ি ভেঙে উপরেও উঠতে দিচ্ছে না। ডাক্তার বারণ করে গেছেন।

একদিন এসে সুরঞ্জনই খবর দিল, দাদা জাহাজ দেশে ফিরছে। নিউকাসেলে মাল খালাস করে সোজা বাড়ি।

মুখার্জি যেন খুশি হতে পারলেন না। ব্যাজার মুখে বললেন, 'ছেলেটা পড়ে থাকল। চার্লি পড়ে থাকল!'

সুরঞ্জন বলল, 'আমার মনে হয় সব খবর রাখে। জাহাজ ছাড়ার আগে দু'জনেই

উঠে আসবে।'

মুখার্জির কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

জাহাজ ছেড়েও দিল।

মুখার্জি বললেন, 'আজ আর আমাকে বাধা দিস না।' বলে তিনি একাই উপরে যেতে চাইলে, সুরঞ্জন বলল, 'ধরছি। ওঠো, এত দুর্বল হয়ে গেলে কেন বলো তো! যেন সর্বস্ব খোয়া গেছে তোমার!'

মুখার্জি হাসলেন।

তারপর জাহাজ ছেড়ে দিল। সমুদ্রে পড়ল। দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সবাই রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যতক্ষণ দ্বীপটা দেখা যায়। ধীরে ধীরে দ্বীপটা সরে যেতে থাকল। মুখার্জি চোখের পলক ফেলছেন না। আর তখনই মনে হল, টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দূরে দুই মানব-মানবী হাতে নাড়ছে। মুখার্জিও অতি কষ্টে হাত নাড়লেন। অন্ধকার নেমে আসছে। পাখির ওড়াউড়ি চারপাশে। সবাই ডাঙায় ফিরছে।

সুরঞ্জন হাত ধরে বলল, 'এবার চলো। অন্ধকারে কিছুই তো আর দেখা যাচ্ছে না? কি দেখছ?'

মুখার্জি ওঠার সময় বললেন, 'ফুল ফোটা দেখছি। বুনো ফুলের রাজত্বেই চার্লি শেষে সুহাসকে নিয়ে থেকে গেল। ধর আমাকে।'

'ধর' বলেও চুপচাপ বসে থাকলেন মুখার্জি। ডেক ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখনও দ্বীপের বিন্দু বিন্দু আলো দূরে নীহারিকার মতো রহস্যময়। আকাশ নীল। সমুদ্রগর্জন শুনতে পাচ্ছেন। নক্ষত্রমালায় টের পাচ্ছেন নদী নারী নির্জনতার ছবি। সুহাস দ্বীপে তবে চার্লিকে নিয়ে থেকে গেল।

এই অসীম অনন্ত জলরাশির ভিতর জাহাজের গতি ক্রমে বাড়ছে। তিনি বসেই আছেন। এক সময় দেখলেন, দ্বীপের সব বিন্দু বিন্দু আলো নক্ষত্রমালার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে। দ্বীপটিকে আলাদা করে আর চিনতে পারছেন না। বুক তাঁর কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। সুহাস এখন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। ভাবতেই তিনি নিজেকে আর শান্ত রাখতে পারলেন না। চোখে জল এসে গেল। বাবা তার পুত্রের ফেরার অপেক্ষায় আছে। মা তার গাছের নীচে। অপেক্ষা, কবে তার চিঠি আসবে। মা বাবা তো বোঝে না, বুনো ফুলের গন্ধ টের পেলে কেউ আর বাড়ি ফেরে না! যে যার মতো নদী নারী নির্জনতার খোঁজে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।